3/103

[illegible]

Library
SHREE SHREE MA ANANDAMAYEE ASHRAM
3/103 Bhadaini, Varanasi-I
No......[illegible]......
Books should be returned by date (last) noted below or re-issue arranged. Otherwise a fine of -/10/- N. P. daily shall have to be paid.

29.3.77				
30.4.77				
15.9.77				

184

H. P. MAITRA,
Benares
~~CALCUTTA.~~
B 5/15

দাদূ

3/103

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২১০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

R/25

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২১০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
প্রকাশক—শ্রীকিশোরীমোহন সাঁতরা

দাদূ

প্রথম সংস্করণ ... বৈশাখ, ১৩৪২

মূল্য—৪৲

শান্তিনিকেতন প্রেস, শান্তিনিকেতন, (বীরভূম)
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

এক যুগের কবি-গুরু
শ্রীশ্রীদাদূর বাণী
অন্য যুগের কবি-গুরু
শ্রীশ্রীরবীন্দ্রনাথকে
তাঁহার ৭৫তম জন্মদিনে
শ্রদ্ধার অর্ঘ্য দিলাম।

২৫শে বৈশাখ,
১৩৪২ বাং।

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

ভূমিকা (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) ১
উপক্রমণিকা ১১
জীবনী পরিচয় ১১
১। জন্মস্থান ১১
২। জন্মকাল ১২
৩। দাদূর জাতি ১৩
৪। সম্প্রদায় স্থাপন বিরোধী গুরু কমাল ১৩
৫। দাদূর জন্ম ব্যাপারে অলৌকিত্ব আরোপণ ১৬
৬। দাদূর নানাস্থানে অবস্থিতি ১৬
৭। বাংলায় দাদূর পরিচয় ১৭
৮। দাদূর পূর্ণাঙ্গ সাধনা ২২
৯। জনগোপাল বিবৃত দাদূর জীবনী ২৩
১০। বিভিন্ন ধর্ম্মের সঙ্গতি ২৫
১১। বিপক্ষদের কূট আঘাত ২৭
১২। দাদূর ক্ষমা ২৮
১৩। দাদূর সঙ্গে সুন্দরের যোগ ২৯
১৪। জীবনীর সার নিষ্কর্ষ ৩০
১৫। কমাল দাদূ যোগ ৩১
১৬। নবভক্তি ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক রামানন্দ ৩৪
১৭। বৃদ্ধানন্দ কথা ৩৪
১৮। দাদূর পর্য্যটন ও ধর্ম্মের নানা স্তর অতিক্রম ৩৫
১৯। ধর্ম্মের ঐক্য ও একাকারের পার্থক্য ৪০
২০। কথিত ভাষার প্রতি অনুরাগ ৪০
২১। দাদূর ব্রহ্মসম্প্রদায় ৪২
২২। অতি প্রাকৃতে অনাস্থা ৪৭
২৩। স্বাধীন সাধনা ও পরিচয় ৫৫
২৪। অলখ দরীবা ৫৭
২৫। ভগবানের মধ্য দিয়া সর্ব্বমানবের সঙ্গে যোগ ৫৮
২৬। গুরু অন্তরে ৬০
২৭। শিষ্যদের সঙ্গে যোগ ৬১
২৮। জগজীবনের সঙ্গে পরিচয় ৬২
২৯। সৃষ্টি সম্বন্ধে প্রশ্ন ৬৩
৩০। মুসলমান তার্কিক ৬৫
৩১। বশীকরণ প্রার্থিনী তরুণী ৬৫

৩২। শক্তির শুচিতা ৬৬
৩৩। কাল ও ভাবের প্রতি অপক্ষপাত ৬৬
৩৪। দাদূর পুত্র কন্যা ৬৮
৩৫। খ্যাতি ও লোকের ভিড় ৬৮
৩৬। সম্রাট মিলন প্রার্থী ৬৯
৩৭। বাহ্য সহায়তার উপেক্ষা ৭১
৩৮। সীকরীতে শিষ্যদের সঙ্গে প্রশ্নোত্তর ৭২
৩৯। দাদূ আকবর সংবাদ ৭৩
৪০। তাত্ত্বিক ও শুকপাখী ৭৬
৪১। দাদূ ও রাজা ভগবংত দাস ৮০
৪২। জীবনের শেষকাল ৮২
৪৩। দেহত্যাগ ৮৩
দাদূর স্বকথিত সাধনার পরিচয় ৮৪
৪৪। সাধনার পরিচয় ৮৪
সহজ পথ ৮৬
৪৫। গুরু ও সাধু ৯১
৪৬। সহজ ও শূন্য কি ৯১
৪৭। সংস্কৃত নহে, ভাষাই আশ্রয় ৯৬
মিথ্যার পূজা ৯৭
মনের চঞ্চলতা ৯৮
সম্প্রদায়ের ব্যর্থতা ৯৯
বাহ্য শক্তির ব্যর্থতা ১০০
ঋদ্ধি সিদ্ধির ব্যর্থতা ১০০
ভেখের ব্যর্থতা ১০০
মতবাদের ব্যর্থতা ১০১
শাস্ত্রের ব্যর্থতা ১০২
তীর্থাদির ব্যর্থতা ১০২
পূজা নমাজের ব্যর্থতা ১০২
মিথ্যাচারের ব্যর্থতা ১০৩
হিংসা ছাড়া চাই ১০৩
ফলকামনা ছাড়া চাই ১০৪
দুর্নীতি ছাড়া চাই ১০৪
গৃহধর্ম্ম ১০৪
দীপ্ত জীবনের সহজ প্রচার ১০৫
ধর্ম্মের যোগ দৃষ্টি ১০৬
অনিরুদ্ধ যুক্তভাব ১০৮
"অহম্" ক্ষয় করা চাই ১০৮
সেবা সাধনা ১০৯
মন স্থির করা চাই ১০৯
ইন্দ্রিয়দের প্রবুদ্ধ করা চাই ১১০
নম্র হওয়া চাই ১১০
তাঁহার বিধান জানা চাই ১১১
শরণাগত হওয়া চাই ১১১
বিশ্বাস চাই ১১১
উদ্যম চাই ১১১
তাঁহার উদ্যম প্রচ্ছন্ন ১১২
সাধকের বীরত্ব ১১২
প্রার্থনা ১১২
মন্ত্র ১১৩
জাপ ১১৪
জপমালা ১১৪
ধ্যান ১১৪

ভক্তি ১১৫
ব্যাকুল প্রার্থনা ১১৬
শুদ্ধ প্রেম ১১৮
রস-সংযম ১১৮
সত্য গোপন অসাধ্য ১১৯
বিশ্ব মৈত্রী ১২০
সর্ব্বত্র পরমগুরু ১২০
অন্তরে পরম গুরু ১২১
বিশ্বলীলা ১২১
অবতার ১২২
সেবা ১২৩
অন্তঃ সঞ্চয় ১২৪
অনভব-আনন্দ ১২৫
সঙ্গীতের মূল উৎস ১২৫
আনন্দের সৃষ্টি ১২৫
পরম বিশ্রাম ১২৬
শিষ্যদের কাছে প্রাপ্ত দাদূর বর্ণনা ১২৭
৪৮। সুন্দর দাস ১২৭
৪৯। ক্ষেত্রদাস ১২৮
৫০। রজ্জবদাস ১২৮
৫১। গরীবদাস ও জাইসা ১২৯
দাদূর বর্ণিত পূর্ব্ব ভাগবতগণ ১৩১
৫২। সাধক নাম পরম্পরা ১৩২
৫৩। কবীর ১৩৩
৫৪। নামদেব ১৩৪
৫৫। মুসলমানী প্রভাব ১৩৫
৫৬। মুসা ও মহম্মদ ১৩৭
জয়দেব ১৩৮
প্রেম যোগ ১৩৮
দাদূর শিষ্য পরিচয় ১৪১
৫৭। রজ্জবজী ১৪১
৫৮। বনওয়ারীদাস ১৪২
৫৯। সুন্দরদাস ১৪৩
৬০। সুন্দরদাস (ছোট) ১৪৪
৬১। প্রয়াগদাসজী ১৪৯
৬২। গরীবদাসজী ও মস্কনদাসজী ১৫০
৬৩। মাধোদসজী ও শঙ্করদাসজী ১৫২
৬৪। জনগোপালজী ১৫২
৬৫। জগজীবন ১৫৩
৬৬। মোহনজী, জগ্গাদাসজী ও অন্যান্য ভক্তগণ ১৫৩
দাদূ সম্পর্কীয় গ্রন্থমালা ও বিশেষজ্ঞগণ ১৫৫
সাম্প্রদায়িক বর্ণ ও সাধকবর্গ ১৬০
দাদূ সংগ্রহ পরিচয় ১৬৪
৬৯। বাণীর সংখ্যা ১৬৪
৭০। বাণী বিভাগ ১৬৮
উপক্রমণিকা পরিশিষ্ট (শূন্য ও সহজ) ১৭৯
নিবেদন ১৯৯

ক

দাদূবাণী ২০১
প্রথম প্রকরণ—জাগরণ ২০১
প্রথম অঙ্গ—গুরু ২০১
প্রবেশক ২০১
গুরুর অঙ্গ ২০৩
বাণী ২০৩
কেমন গুরু মিলিলেন ২০৫
গুরু আসিয়া কি করিলেন ২০৬
আপন প্রদীপ জাল ২০৭
মধ্যেই আছে ২০৮
অন্তরের উপলব্ধির উপায় ২০৮
সাধনায় দেখিতে হইবে ২১০
প্রতি ঘটে অমৃত ২১৩
দয়ার বেদনা ২১৪
কুশিষ্য ২১৪
কুগুরু ২১৫
পণ্ডিত পথ ভুলায় ২১৬
সত্য বিস্তৃত রচনা নহে ২১৭
দ্বিতীয় অঙ্গ—সাধু ২১৭
ভাব এবং ভক্তির প্রত্যক্ষরূপ সাধু ২১৭
রূপ ও ভাবের পরস্পর পূজা ২১৮
সাধুর মাহাত্ম্য ২১৯
সঙ্গীতের ব্যথা ২১৯
সাধু সঙ্গ অপার্থিব ২২০
সাধুর সঙ্গ নাস্তি ২২০
ভক্তের মহিমা ২২১
ভক্তের শোভা ২২১
সত্য সাধু কে ? ২২২
সাধনাতে মিথ্যা আচরণ ২২২
সেবায় ও সেবকের রহস্য ২২৩
সেবাতেই স্বীকার ২২৪
সাধুই বিশ্রাম ও শান্তি ২২৪
প্রভু সেবকের সহায় ২২৫
ভক্ত ব্রহ্ম প্রদীপ ২২৫
ব্রহ্ম ঐশ্বর্য্যে সাধুর ঐশ্বর্য্যবান ২২৬
ব্রহ্ম হইতেও সাধু সরস ২২৭
তৃতীয় অঙ্গ—চেতৱনী ২২৯
দ্বিতীয় প্রকরণ—উপদেশ ২৩১
প্রথম অঙ্গ—নিন্দা ২৩১
দ্বিতীয় অঙ্গ—
সূরাতন ২৩৫
মৃত্যুকে স্বীকার ২৩৫
আমার পক্ষেও সম্ভব ২৩৫
বীরেরই লভ্য ২৩৬
অগ্রসর হও ২৩৬
বীর বাধাহীন ২৩৭
প্রভুর কাছে উৎসর্গ ২৩৮
উৎসর্গে ধন্য হও ২৩৯
মরণই ধন্য ২৪০
বীরত্ব অন্তরে ২৪১
স্বামীই আশ্রয় ২৪১
ভগবানই বল ২৪২

তুমিই বল ২৪২
তৃতীয় অঙ্গ—পারিখ ২৪৩
অন্তর পরীক্ষা ২৪৪
অন্তর পরিচয় ২৪৫
সত্য পরীক্ষণীয় ২৪৫
অভেদে ভেদবুদ্ধি ২৪৬
দুঃখের পরখ ২৪৭
চতুর্থ অঙ্গ—দয়ানির্বৈরতা ২৪৮
সারমত ২৪৯
বৈরের স্থান কোথায়? ২৫০
সবাই ভাই ২৫০
ঐক্যই সত্য ২৫১
মানব দেহ দেবমন্দির ২৫১
অহিংসা ২৫২
মানবের মধ্যেই সাধনা ২৫৩
পঞ্চম অঙ্গ—জীবিত মৃত ২৫৪
মহাভূতের সাধনা ২৫৭
অমৃতত্ব লাভ ২৫৭
অহমই বাধা ২৫৮
সহজ হও ২৫৯
মরণের পূর্ণানন্দ ২৫৯
এই মরণ কেমন? ২৬০
এই মরণের লক্ষণ ২৬০
এই মরণ হয় কখন? ২৬০
এই মরণই সাধনীয় ২৬০
কবে দুঃখ ঘুচিবে? ২৬১
সাধনার ধন ২৬২
অভয় ২৬২
তৃতীয় প্রকরণ—তত্ত্ব ২৬৪
প্রথম অঙ্গ—কাল ২৬৪
সবই অনিত্য ২৬৪
মৃত্যু সর্ব্বগ্রাসী ২৬৫
রক্ষক ভগবান ২৬৬
প্রেমে মৃত্যুঞ্জয় ২৬৭
মৃত্যু মনে ২৬৭
প্রভু কালের কাল ২৬৮
দ্বিতীয় অঙ্গ—সাচ ২৬৯
প্রণতিই সত্য ২৬২
শাস্ত্র অন্তরে ২৭২
দেহই মন্দির ২৭৩
নিত্য ভক্তি ২৭৩
সত্য মুসলমান ২৭৪
কাফের কে? ২৭৪
মিথ্যা দলাদলি ২৭৫
সেবক দলাদলির অতীত ২৭৬
দলের অধীনতা ২৭৭
দলের বহির্ভূত ২৭৮
তাঁর বাণী বল ২৭৮
সাধন চাই ২৭৯
নামেই ভক্ত ২৭৯
ব্যর্থ বাক্য ২৮০
ব্যর্থ পাণ্ডিত্য ২৮১
মিথ্যা অচল ২৮২
আত্ম দৃষ্টি চাই ২৮২
মিথ্যা পূজা ২৮৩

অন্তরবাসী ২৮৪
সত্যই সরল ২৮৫
সত্যই গ্রহণীয় ২৮৫
সেবক দলের অতীত ২৮৬
সত্য সাক্ষ্য ২৮৭
তৃতীয় অঙ্গ—বিচার ২৮৯
জীবনে ব্রহ্মরূপ ২৯২
অসীম ও অসম্পূর্ণ ২৯২
সীমা-অসীম ২৯৩
প্রেম যোগ ২৯৪
অন্তরেই প্রেমলোক ২৯৪
দেহ দুঃখ প্রতীকার ২৯৫
নিত্য অগ্রসর সাধনা ২৯৬
রহস্য ভেদ ২৯৬
চতুর্থ অঙ্গ—কস্তূরী মৃগ ২৯৮
বস্তু অন্তরে ২৯৮
জড়ত্বের বাধা ২৯৯
পঞ্চম অঙ্গ—সবদ ৩০১
ব্রহ্ম সুরের জগৎ ৩০২
ওঁকার সর্ব্বমূল ৩০৩

চতুর্থ প্রকরণ

সাধনা ৩০৬
প্রথম অঙ্গ—ভেখ ৩০৬
বস্তুই সার ৩০৮
শ্রেষ্ঠতা কিসে ? ৩১০
প্রেমের ভগবান ৩১১
মিলনের সাচ্চা সাধনা ৩১১
যোগ অন্তরে ৩১৩
উপযুক্ত ভেখ ৩১৪
দ্বিতীয় অঙ্গ—মন ৩১৫
মন বশীকরণ ৩১৮
প্রেমেই স্থিরতা ৩১৯
ব্যর্থ জনম ৩২০
সাচ্চা উপদেশ ৩২১
দারিদ্র্য ভঞ্জন ৩২২
মন শুদ্ধীকরণ ৩২৩
চঞ্চলতার স্বপ্ন ৩২৪
প্রেমই জীবন ৩২৫
পদস্খলন ৩২৬
মনের দুর্ব্বলতা ৩২৭
মনের মন ৩২৭
মন সহায় ৩২৮
তৃতীয় অঙ্গ—মায়া ৩২৯
তিনিই সত্য ৩৩৩
মায়াকে উপেক্ষা ৩৩৪
কামনার অশুচিতা ৩৩৪
কামনার ভরসা তিনি ৩৩৫
কামনার বিকার ৩৩৬
ভণ্ড সাধু ৩৩৭
অপ্রাপ্য প্রার্থনা ৩৩৭
মায়ার খেলা ৩৩৮
মায়া দেবতা ৩৩৯
মিথ্যার সাধনা ৩৪০
ভক্ত নিস্পৃহ ৩৪১
সহজ জীবন ৩৪১
চতুর্থ অঙ্গ—সূক্ষ্মজনম ৩৪৩

পঞ্চম অঙ্গ—উপজ ৩৪৫
অহমিকার ক্ষয় ৩৪৭
ভক্তির বিনয় ৩৪৮
তাঁর দয়া ৩৪৮
তাঁর আজ্ঞার অবতরণ ৩৪৮
ষষ্ঠ অঙ্গ—নির্গুণ ৩৪৯
গ্রহণের অক্ষমতা ৩৫০
অকৃতজ্ঞ ৩৫০
সপ্তম অঙ্গ—হৈরাণ ৩৫২
অবর্ণনীয় ৩৫৫
অপরিমেয় ৩৫৫
অগম্য ৩৫৬
পরিচয় ৩৫৬
ব্রহ্মানন্দ ৩৫৭
সৃষ্টির রহস্য ৩৫৮
অষ্টম অঙ্গ—বিনতী ৩৫৯
১। অনন্ত দোষে দোষী ৩৬৩
২। রক্ষা কর ৩৬৪
৩। শরণাগত ৩৬৫
৪। ভরসা ৩৬৬
৫। ভ্রষ্টের পতন ৩৬৭
৬। সৌন্দর্য্য প্যালায় প্রেমরস ৩৬৮
৭। তোমার দয়া ৩৬৯
৮। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক ৩৬৯
৯। প্রার্থনা ৩৭০
নবম অঙ্গ—বিশ্বাস ৩৭১
১। বিশ্বাস কর ৩৭৩
২। নিশ্চিন্ত ৩৭৪
৩। তোমার প্রসাদ ৩৭৫
৪। নির্ভর কর ৩৭৬
দশম অঙ্গ—মধ্য ৩৭৮
১। মধ্য ধর ৩৮২
২। সহজ ধাম ৩৮৩
৩। অপরূপ ধাম ৩৮৫
৪। ধাম অন্তরে ৩৮৫
৫। তাঁকে চাই ৩৮৬
৬। স্বামীর সঙ্গ ৩৮৭
৭। মুক্তির উপায় ৩৮৯
৮। সংসার ধারা ৩৮৯
একাদশ অঙ্গ—সারগ্রাহী ৩৯০
১। সাধক সারগ্রাহী ৩৯১
২। সাচ্চা আগমন ৩৯২
৩। একমেবাদ্বিতীয়ম্ ৩৯৩
দ্বাদশ অঙ্গ—সুমিরণ ৩৯৩
১। নাম জপের ক্রম ৪০৪
২। নাম মহিমা ৪০৫
৩। নাম সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বাশ্রয় ৪০৬
৪। নাম বিনা সবই যায় ৪০৮
৫। নামই সব ৪০৮
৬। সর্ব্বভাবে নাম কর ৪০৯
৭। অতুলন নাম ৪১০
৮। নাম সর্ব্বসিদ্ধি ৪১১
৯। বিশ্ব দীপ্ত নাম ৪১৩
১০। অন্তর ব্যথা ৪১৪
১১। নামেই সব আছে ৪১৫
১২। সহজ সুমিরণ ৪১৫

১৩। তনু-মালা ৪১৭
১৪। আত্মার সুমিরণ ৪১৭
১৫। রূপমালা ও কর্ম্মজাপ ৪১৮
ত্রয়োদশ অঙ্গ—লয় ৪১৯
১। লয়ের পরখ ৪২২
২। চেতনাই ভাবমার্গ ৪২৩
৩। পরমাত্মার লীন হইয়া লীলা দেখ ৪২৩
৪। ভাবই সুমিরণ, ভাবই সাধনা ৪২৪
৫। তাঁহাকে আত্মালয় কর ৪২৫
৬। ধৈর্য্য ধর ৪২৫
চতুর্দ্দশ অঙ্গ—সঞ্জীবন ৪২৭
১। প্রেম যোগ ৪৩০
২। মৃত্যুঞ্জয় ৪৩১
৩। তাঁহার সঙ্গই অমৃত ৪৩২
৪। মৃত্যুঞ্জয়ী ৪৩৩
৫। জীবন থাকিতেই সাধনা ৪৩৪
৬। মৃত্যুর পরে হইবার আশা নাই ৪৩৫
৭। জীবন্তেই বিশ্বসাধনা ৪৩৬
পঞ্চম প্রকরণ
পরিচয় ৪৩৭
প্রথম অঙ্গ—জরণা ৪৩৯
১। অপ্রকাশ্য জরণ ৪৪৫
২। ব্রহ্মরস জরণ ৪৪৫
৩। জরণ রস ৪৪৬
৪। ঝরিলেই বিনাশ ৪৪৭
৫। বিশ্বব্যাপী জরণ ৫৪৭
দ্বিতীয় অঙ্গ—পরচা ৪৪৯
১। অসীম প্রকাশ ৪৫৮
২। শূন্য হইয়া মূন্য ধর ৪৫৯
৩। তাঁহাকে দেখ ৪৬০
৪। যোগ সরোবর ৪৬১
৫। দৃষ্টি যোগ ৪৬১
৬। তিনি কল্প বৃক্ষ ৪৬২
৭। দরশনোৎসব ৪৬৩
৮। অনুভবই গুরু শাস্ত্র-সাধনা ৪৬৪
৯। হৃৎকমল যোগ ৪৬৪
১০। মৃণ্ময় চিণ্ময় ৪৬৫
১১। যোগ্যের যোগ উৎসব ৪৬৬
১২। অন্তরে অনন্ত আরতি ৪৬৭
১৩। অন্তরেই ভক্তি ৪৬৮
১৪। সেবা রহস্য ৪৬৯
১৫। জীব ব্রহ্ম পরস্পরের ধন্য ৪৭০
১৬। ভক্তিতে ব্রহ্মসাম্য ৪৭০
১৭। উভয়ে উভয়ের রস রসিক ৪৭১
১৮। খুঁজিলেই পাইবে ৪৭২
১৯। নিত্য প্রেম-খেলা ৪৭৩
২০। নিরন্তর খেলা ৪৭৪
২১। কমলরসে মত্ত ভ্রমর ৪৭৪
২২। বাণীমূল গীতমূল ৪৭৫
২৩। রসে মত্ত ৪৭৫
২৪। মত্তরসে মগ্ন ৪৭৬
২৫। মুক্তি ৪৭৭
তৃতীয় অঙ্গ—অবিহড় ৪৭৮

চতুর্থ অঙ্গ—সাক্ষীভূত ৪৭৯
১। তিনি কর্ত্তা জীব সাক্ষী ৪৮০
২। অন্তরের সাক্ষ্য ৪৮১
৩। পূজার খেলা ৪৮১
পঞ্চম অঙ্গ—বেলী ৪৮২
১। আত্মাবল্লী ৪৮৪
২। ব্যর্থ বর্ষণ ৪৮৫
৩। অমৃতফল বিশ্ব যোগরসে ৪৮৫
ষষ্ঠ অঙ্গ—সমর্থাই ৪৮৬
১। তাঁহার শক্তিতেই সব ৪৮৭
২। সার্ব্বভৌম শক্তি ৪৭৮
৩। তিনিই পরিচয় দাতা ৪৮৯
৪। ভরপূর দিবার খেলা ৪৯০
৫। সৃষ্টিবীণা ৪৯১
সপ্তম অঙ্গ—পীর পিছাণ ৪৯১
১। স্বামীকে বরণ ৪৯৩
২। গুরু নিত্য ৪৯৩
৩। অবতার ৪৯৪
৪। তোমার সেবা ৪৯৫

ষষ্ঠ প্রকরণ

প্রেম ৪৯৭
প্রথম অঙ্গ—বিরহ ৪৯৭
১। বিরহিণীর বেদনা ৫০৩
২। নিরবসান দুঃখ ৫০৪
৩। আকাঙ্ক্ষার ধন ৫০৫
৪। ব্যর্থ জীবন ৫০৬
৫। তোমা ছাড়া কিছুই চাই না ৫০৭
৬। প্রেমের ব্যথা ধন্য ৫০৮
৭। বিরহ দহন ৫০৯
৮। শান্তি নাই ৫১১
৯। প্রতিকার নাই ৫১২
১০। বাক্য বৃথা ৫১৩
১১। বিরহ চাই ৫১৩
১২। প্রেমের শাস্ত্র ৫১৪
১৩। বিরহের সাধনা ৫১৪
১৪। যথার্থ বিরহ ৫১৫
১৫। বিরহ যোগ পাবক ৫১৬
১৭। তিনি ভরসা ৫১৭
১৭। বিরহ স্বরূপ ৫১৭
১৮। প্রেমে স্বরূপ বদল ৫১৭
১৯। ধরিত্রীর প্রেম সজ্জা ৫১৮
দ্বিতীয় অঙ্গ—সুন্দরী ৫১৯
১। জাগ ৫২২
২। এস ৫২২
৩। তাঁর পরসেও কেন জাগি নাই ৫২৩
৪। তিনি বিনা জীবন ব্যর্থ ৫২৩
৫। প্রিয়তমকে বরণ ৫২৪
৬। অনন্তকলায় সেবা ৫২৪
৭। মুক্তির ঘোষণা ৫২৫
তৃতীয় অঙ্গ—নিহকরমী পতিব্রতা ৫২৬
১। তুমিই পরিচয় ৫৩২
২। তিনিই সর্ব্বস্ব ৫৩২
৩। তিনিই নির্ভর ৫৩৩

৪। নিষ্কাম যোগ ৫৩৪

৫। তিনি ছাড়া সব মিথ্যা ৫৩৫

৬। তিনি ব্যথার প্রতিকার ৫৩৬

৭। মূলাধার আশ্রয় ৫৩৬

৮। কৃপাতেই মুক্তি ৫৩৭

৯। সত্য যোগ নিষ্কাম ৫৩৮

১০। পাতিব্রত্য ৫৩৯

১১। সহজ সাধন ৫৪০

১২। মধুর সাধনা তাঁরই সঙ্গে ৫৪১

১৩। প্রেম রসই চাই ৫৪২

১৪। পরম পুরুষ স্তব ৫৪২

সবদ (সঙ্গীত) ৫৪৪

রাগ গৌড়ী ৫৪৫

রাগ মালীগৌড় ৫৫১

রাগ কান্‌হড়া ৫৫৩

রাগ কেদারা ৫৫৪

রাগ মারু ৫৫৬

রাগ রামকলী ৫৬১

রাগ আসাবরী ৫৬৬

রাগ গূজরী (দেবগন্ধার) ৫৬৭

রাগ ভাঁণমলী ৫৬৯

রাগ নটনারায়ণ ৫৭০

রাগ গুংড ৫৭৩

রাগ বিলাবল ৫৭৫

রাগ বসন্ত ৫৭৬

রাগ টোড়ী ৫৭৭

রাগ ধনাশ্রী ৫৭৮

সর্ব্ব-বিশ্ব-আরতি ৫৮১

সর্ব্ব-কাল আরতি ৫৮২

প্রশ্নোত্তরী ৬৮৪

মাধুকরী ৫৯৩

পথের গান ৬১০

সহজ ও শূন্য ৬১২

সীমা ও অসীম ৬৩১

দাদূ ও রহীম খানখানা ৬৪৬

তখনার সন্তমত সম্বন্ধে ভক্ত তুলসী-দাসজী ৬৫৪

ভূমিকা

অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের হিন্দী কাব্যসাহিত্য পড়তে গিয়ে দেখা গেল হিন্দুস্থানী খেয়াল-টপ্পার মতোই তার তান তার মানকে কেবলি ছাপিয়ে চলেচে। অলঙ্কারই হয়েচে লক্ষ্য, মূর্ত্তিটি হয়েচে উপলক্ষ্য।

কবি সত্যকে যখন উপলব্ধি করেন তখন বুঝতে পারেন সত্যের প্রকাশ সহজেই সুন্দর। এইজন্যে তখন তিনি সত্যের রূপটিকে নিয়েই পড়েন তার অলঙ্কারের আড়ম্বরে মন দেন না। বৈষ্ণব-পদে পড়েচি, রাধা যখন কৃষ্ণের মিলন চান, তখন গলার হারগাছির আড়ালটুকুও তাঁর সয় না। তার মানে, কৃষ্ণই তাঁর কাছে একান্ত সত্য; সেই সত্যকে পেতে গেলে অলঙ্কার শুধু যে বাহুল্য, তা নয়, তা বাধা।

সংসারে যেমন, সাহিত্যেও তেমনি, বিষয়াসক্ত লোক আছে। বিষয়ী লোকের লক্ষণই এই যে, তারা সত্যকে পায় না ব'লেই বস্তুকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করে। সাহিত্যেও রস জিনিষটার প্রতি যদি স্বাভাবিক দরদ না থাকে তাহলেই কৌশলের পরিমাণ নিয়ে তার দর যাচাই চলে। রসটা সত্যের আপন অন্তরের প্রকাশ, আর কৌশলটা বাহিরের উপসর্গ, তাই নিয়ে বাহিরের বাহনটা ভিতরের সত্যকে ছাপিয়ে আপন গুমর করে। এতে রসিক লোকেরা পীড়িত হয়, বিষয়ী লোকেরা বাহবা দিতে থাকে।

আমার অপরিচিত হিন্দীসাহিত্যের মহলে কাব্যের বিশুদ্ধ রসরূপটি যখন খুঁজছিলুম, এমন সময় একদিন ক্ষিতিমোহন সেন মশায়ের মুখ থেকে বঘেলখণ্ডের কবি জ্ঞানদাসের দুই একটি হিন্দী পদ আমার কানে এল। আমি ব'লে উঠলুম, এই ত পাওয়া গেল। খাঁটি জিনিষ, একেবারে চরম জিনিষ, এর উপরে আর তান চলে না।

অলঙ্কারের স্বভাবই এই যে, কালে-কালে তার বদল হয়। এক সময়ে বাজারে একরকম ফ্যাশানের চল্‌তি, আর-একসময়ে আর-একরকমের। সাবেক কালে অনুপ্রাসের, বক্রোক্তির খুবই আদর ছিল। এখন তার অল্প

আভাস চলে, কিন্তু বেশি সয় না। কোনো একটি কাব্যকে সাবেক কালের ব'লে চিন্‌তে পারি তার সাবেকি সাজ দেখে। যেখানে সাজের ঘটা নেই, সত্য আপন সহজ বেশে প্রকাশমান, সেখানে কালের দাগ পড়বে কিসের উপরে? সেখানে অলঙ্কারের বাজারদরের ওঠানামার খবরই পৌছয় না। কালে কালে হাটের মার্কা দাগা দেবে এমন মরা জিনিষ তার আছে কোথায়?

জ্ঞানদাসের কবিতা যখন শুন্‌লুম তখন এই কথাটি বার বার মনে এল, এ যে আধুনিক! আধুনিক বল্‌তে আমি এই কালেরই বিশেষ ছাঁদের জিনিষ বল্‌চি নে। এসব কবিতা চিরকালই আধুনিক। কোনো কালে কেউ বল্‌তে পার্‌বে না, এর ফ্যাশান বদ্‌লেচে। আমাদের পুরাতন বাংলা সাহিত্যে অল্প কবিতাই আছে যার সম্বন্ধে এমন কথা পূরোপূরি বলা যায়। মাঝে মাঝে পাওয়া যায়, এবং পুরাতনের মধ্যে চিরন্তনকে দেখে চম্‌কে উঠি। যেমন দুটো ছত্র এইমাত্র আমার মনে পড়চে :—

তোমার গরবে গরবিনী আমি
রূপসী তোমার রূপে।

"রূপসী তোমার রূপে," এ-কথাটা একেবারে বাঁধা-দস্তুরের কথা নয়। বাঁধা দস্তুর বড়ই ভীতু, নজীরের কেল্লা বেঁধে তবে সে সর্দ্দারী করে। গরবিনী গরব ভাসিয়ে দিয়ে বল্‌চে, আমার রূপ আমার নয়, এ তোমারি,—এমন কথা তার মুখেই আস্‌ত না; সে মাথায় হাত দিয়ে ভাব্‌ত, এত বড় অত্যুক্তির নজীর কোথায়? যারা নজীর সৃষ্টি করে, নজীর অনুসরণ করে না তারাই আধুনিক, চিরকালই আধুনিক।

ক্ষিতিবাবুর কল্যাণে ক্রমে হিন্দুস্থানের আরো কোনো কোনো সাধক কবির সঙ্গে আমার কিছু কিছু পরিচয় হল। আজ আমার মনে সন্দেহ নেই যে, হিন্দী ভাষায় একদা যে-গীত-সাহিত্যের আবির্ভাব হয়েচে তার গলায় অমর-সভার বরমাল্য। অনাদরের আড়ালে আজ তার অনেকটা আচ্ছন্ন; উদ্ধার করা চাই, আর এমন ব্যবস্থা হওয়া চাই যাতে ভারতবর্ষের যারা হিন্দী ভাষা জানে না তারাও যেন ভারতের এই চিরকালের সাহিত্যে আপন উত্তরাধিকার-গৌরব ভোগ কর্‌তে পারে।

এইসকল কাব্যে যে-রস এত নিবিড় হয়ে প্রকাশ পেয়েচে সে হচ্চে

ভগবানের প্রতি প্রেমের রস। য়ুরোপীয় সাহিত্যে আমরা ত ঈশ্বর-সম্বন্ধে কাব্যরচনা কিছু কিছু পড়েচি, বার বার মনে হয়েচে মেজ্‌রাপটাই কড়া হয়ে আওয়াজ করচে, তারটা তেমন বাজচে না। তাই খৃষ্টান-ধর্ম্ম-সঙ্গীতের বইগুলি সাহিত্যের অন্দরমহলে ঢুক্‌তে পারলে না, গির্জ্জাঘরেই আটকা প'ড়ে গেল। আসল কথা, শাস্ত্রের যে-ভগবান ধর্ম্মকর্ম্মের ব্যবহারে লাগেন, যিনি সনাতনপন্থী ধার্ম্মিক লোকের ভগবান, তাঁকে নিয়ে আনুষ্ঠানিক শ্লোক চলে; তাঁর জন্যে অনেক মন্ত্রতন্ত্র; আর যে-ভগবানকে নিজের আত্মার মধ্যে ভক্ত সত্য ক'রে দেখেচেন, যিনি অহৈতুক আনন্দের ভগবান, তাঁকে নিয়েই গান গাওয়া যায়। সত্যের পূজা সৌন্দর্য্যে, বিষ্ণুর পূজা নারদের বীণায়।

কবি ওয়ার্ড্‌স্বার্থ্‌ আক্ষেপ ক'রে বলেচেন জগতের সঙ্গে আমরা অত্যন্ত বেশি ক'রে লেগে আছি। আসল কথাটা জগতের সঙ্গে, আমরা বেশি ক'রে নয়, অত্যন্ত খুচরো ক'রে লেগে আছি। আজ এটুকু দরকার, কাল ওটুকু, আজ এখানে ডাক, কাল ওখানে। পূরো মন দিয়ে পূরো বিশ্বকে দেখিনে। আমাদের দরকারের সঙ্গে তার খানিকটা জোড়া, খানিকটা ছেঁড়া, খানিকটা বিরুদ্ধ। প্রতিদিনের এই দেনাপাওনার জগতে আমাদের হিসাবী বুদ্ধিটাই মনের আর সব বিভাগকে কম-বেশি-পরিমাণে দাবিয়ে রেখে মুরুব্বিআনা ক'রে বেড়ায়। যে-হিসাবী বুদ্ধিটা গুন্‌তি করে, ওজন করে, মাপ করে, ভাগ করে, তার কাছ থেকে আমরা অনেক খবর পাই, তার যোগে ছোটোবড়ো নানা বিষয়ে সিদ্ধিলাভও করি, অর্থাৎ তার মহলটা হ'ল লাভের মহল, কিন্তু বিশুদ্ধ আনন্দের মহল নয়।

পূর্ব্বে কোথাও কোথাও এ-কথা বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করেচি যে, যেখানে স্বার্থের বাইরে, প্রয়োজনের বাইরে মানুষের বিশেষ-কোনো বাস্তব লাভক্ষতির বাইরে কোনো একটি একের পূর্ণতা হৃদয়ে অনুভব কর্‌তে পারি সেখানে আমাদের বিশুদ্ধ আনন্দ। জ্ঞানের মহলেও তার পরিচয় পেয়েচি, দেখেচি টুক্‌রো টুক্‌রো তথ্য মনের পক্ষে বোঝা, যেই কোনো-একটিমাত্র তত্ত্বে সেই বিচ্ছিন্ন বহু ধরা দেয় অম্‌নি আমাদের বুদ্ধি আনন্দিত হয়, বলে, পেয়েচি সত্যকে। তাই আমরা জানি, ঐক্যই সত্যের রূপ, আর আনন্দই তার রস।

অধিকাংশ মানুষকেই আমরা বহুর ভিড়ের ভিতরে দেখি, বিপুল অনেকের

মধ্যে তারা অনির্দ্দিষ্ট। যে-মানুষকে ভালোবাসি, সাধারণ অনেকের মাঝখানে সে বিশেষ এক। এই নিবিড় ঐক্যের বোধেই বন্ধু আমার পক্ষে হাজার লক্ষ অবন্ধুর চেয়ে সত্যতর। বন্ধুকে যেমন বিশেষ একজন ক'রে দেখ্‌লুম, বিশ্বের অন্তরতম এককে যদি তেম্‌নি স্পষ্ট ক'রে দেখ্‌তে পাই তাহলে বুঝ্‌তে পারি সেই সত্য আনন্দময়। আমার আত্মার মধ্যে একের উপলব্ধি যদি তেমনি সত্য ক'রে প্রকাশ পায় তাহলে জীবনের সুখে দুঃখে লাভে ক্ষতিতে কোথাও আমার আনন্দের বিচ্ছেদ ঘটে না। যতক্ষণ সেই উপলব্ধি আমাদের না হয় ততক্ষণ আমাদের চৈতন্য বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে বিচ্ছিন্ন। যখন সেই উপলব্ধিতে এসে পৌছই আমাদের চৈতন্য তখন অখণ্ডভাবে সেই সৃষ্টিসঙ্গীতেরই অঙ্গ হয়ে ওঠে। তখন সে শুধুমাত্র জানে না, শুধুমাত্র করে না, সমস্তের সঙ্গে সুরে বেজে ওঠে।

সৃষ্টিতে অসৃষ্টিতে তফাৎ হচ্চে এই যে, সৃষ্টিতে বহু আপন এককে দেখায়, আর অসৃষ্টিতে বহু আপন বিচ্ছিন্ন বহুত্বকেই দেখায়। সমাজ হ'ল মানুষের একটি বড় সৃষ্টি, সেখানে প্রত্যেক মানুষই অন্যসকলের সঙ্গে আপন সামাজিক ঐক্যকে দেখায়; আর ভিড় হচ্চে অসৃষ্টি, সেখানে প্রত্যেক মানুষ ঠেলাঠেলি ক'রে আপনাকেই স্বতন্ত্র দেখায়; আর দাঙ্গাবাজি হচ্চে অনাসৃষ্টি; তার মধ্যে কেবল পরস্পরের অনৈক্য নয় বিরুদ্ধতা। ইমারৎ হ'ল সৃষ্টি, ইঁটের গাদা হ'ল অসৃষ্টি, আর যখন দেয়াল ভেঙে ইঁটগুলো হুড়মুড় ক'রে পড়চে সে হ'ল অনাসৃষ্টি।

এই ঐক্যটি বস্তুর একত্র হওয়ার মধ্যে নয়, এ যে একটি অনির্ব্বচনীয় অদৃশ্য সম্বন্ধের রহস্য। ফুলের মধ্যে যে-ঐক্য দেখে আমরা আনন্দ পাই, সে তার বস্তুপিণ্ডে নেই, সে তার গভীর অন্তর্নিহিত এমন একটি সত্যের মধ্যে যা সমস্ত বিশ্বভুবনে একের সঙ্গে আরকে নিগূঢ় সামঞ্জস্যে ধারণ ক'রে আছে। এই সম্বন্ধের সত্য মানুষকে আনন্দ দেয়, মানুষকেও সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত করে।

মানুষের অন্তর্ব্বর্ত্তী সেই সৃষ্টিকর্ত্তা মধ্যযুগের সাধকদের মধ্যে যে-ভগবানের স্পর্শ পেয়েছিলেন, তিনি শাস্ত্রে বর্ণিত কেউ নন, তিনি মনে প্রাণে হৃদয়ে আবিষ্কৃত অদ্বৈত পরমানন্দরূপ। সেইজন্যেই মন্ত্র প'ড়ে তাঁর পূজা হ'ল না, গান দিয়ে তাঁর আবাহন হ'ল। তিনি প্রত্যক্ষ সত্যরূপে জীবনে আবির্ভূত হয়েছিলেন ব'লে সহজ-সুন্দররূপে কাব্যে প্রকাশ পেলেন।

ইংরেজ কবি শেলি তাঁর সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মীর স্তব নামক কবিতায় বলচেন একটি অদৃশ্য শক্তির মহতী ছায়া বিশ্বে আমাদের মধ্যে ভেসে বেড়াচ্চে। সেই ছায়াটি চঞ্চল, সে মধুর, সে রহস্যময়, সে আমাদের প্রিয়। তারই আবির্ভাবে আমাদের পূর্ণতা, তারই অভাবে আমাদের অবসাদ। প্রশ্ন এই মনে জাগে যাঁর এই ছায়া তাঁর সঙ্গে ক্ষণে ক্ষণে আমাদের বিচ্ছেদ কেন? কেন জগতে সুখদুঃখ, আশা নৈরাশ্য, রাগ-দ্বেষের এই নিরন্তর দ্বন্দ্ব? কবি বলেন, শাস্ত্রে জনশ্রুতিতে দেবতা দৈত্য স্বর্গ প্রভৃতি যে সব পদার্থের কল্পনা পাওয়া যায়, তাদের নাম ধ'রে প্রশ্ন কর্‌লে জবাব মেলে কই? কবি বলেন, তিনি তো অনেক চেষ্টা করেচেন, তত্ত্বকথা জেনে নেবেন ব'লে পোড়ো বাড়ির শূন্য ঘরে, গুহায় গহ্বরে অন্ধকারে ভূতপ্রেতেরও সন্ধান ক'রে ফিরেচেন, কিন্তু না পেলেন কারো দেখা, না পেলেন কারো সাড়া। অবশেষে একদিন বসন্তে যখন দক্ষিণ হাওয়ার আন্দোলনে বনে বনে প্রাণের গোপন-বাণী জাগ্‌বে-জাগ্‌বে কর্‌চে এমন সময় হঠাৎ তাঁর অন্তরের মধ্যে এই সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মীর স্পর্শ নেমে এল, মুহূর্ত্তে তাঁর সংশয় ঘুচে গেল। শাস্ত্রের মধ্যে যাঁকে খুঁজে পাননি তিনি যখন হঠাৎ চিত্তের মধ্যে ধরা দিলেন, তখনই জগতের সমস্ত দ্বন্দ্বের মধ্যে একের আবির্ভাব প্রকাশিত হ'ল, তখন কবি দেখ্‌লেন, জগতের মুক্তি এইখানে, এই মহা সুন্দরের মধ্যে। তখনই কবির আত্মনিবেদন গানে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্‌ল।

আমাদের সাধক কবিদের অন্তর থেকে গানের উৎস এম্‌নি ক'রেই খুলেচে। তাঁরা রামকে, আনন্দস্বরূপ পরম এককে আত্মার মধ্যে পেয়েছিলেন। তাঁরা সকলেই প্রায় অন্ত্যজ, সমাজের নীচের তলাকার; পণ্ডিতদের বাঁধা মতের শাস্ত্র, ধার্ম্মিকদের বাঁধা নিয়মের আচার তাঁদের কাছে সুগম ছিল না। বাইরের পূজার মন্দির তাঁদের কাছে বন্ধ ছিল বলেই অন্তরের মিলন-মন্দিরের চাবি তাঁরা খুঁজে পেয়েছিলেন। তাঁরা কত শাস্ত্রীয় শব্দ আন্দাজে ব্যবহার করেচেন, শাস্ত্রের সঙ্গে তার অর্থ মেলে না। তাঁদের এই প্রত্যক্ষ উপলব্ধির রাম কোনো পুরাণের মধ্যে নেই। তুলসীদাসের মতো ভক্ত কবিও এদের এই বাঁধনছাড়া সাধনভজনে ভারি বিরক্ত। তিনি সমাজের বাহ্য বেড়ার ভিতর থেকে এদের দেখেছিলেন, একেবারেই চিন্‌তে পারেননি।

এঁরা হলেন এক বিশেষজাতের মানুষ। ক্ষিতিবাবুর কাছে শুনেচি, আমাদের দেশে এঁদের দলের লোককে ব'লে থাকে "মরমিয়া।" এঁদের দৃষ্টি, এঁদের স্পর্শ মর্ম্মের মধ্যে; এঁদের কাছে আসে সত্যের বাহিরের মূর্ত্তি নয়, তার মর্ম্মের স্বরূপ। বাঁধা পথে যাঁরা সাবধানে চলেন তাঁরা সহজেই সন্দেহ কর্‌তে পারেন যে, এঁদের দেখা এঁদের বলা সব বুঝি পাগলের খামখেয়ালি। অথচ সকল দেশে সকল কালেই এই দলের লোকের বোধের ও বাণীর সাদৃশ্য দেখ্‌তে পাই। সব গাছেরই দেখি কাঠের থেকে একই আগুন মেলে। সে আগুন তারা কোনো চুলো থেকে যেচে নেয়নি—চারদিক থেকে আপনিই ধ'রে নিয়েচে। গাছের পাতায় সূর্য্যের আলোর ছোঁওয়া লাগে, অম্‌নিই এক জাগ্রৎ শক্তির জোরে বাতাস থেকে তারা কার্ব্বন ছেঁকে নেয়, তেম্‌নি মানবসমাজের সর্ব্বত্রই এই মরমিয়াদের একটি সহজ শক্তি দেখা যায়, উপর থেকে তাঁদের মনে আলো পড়ে আর তাঁরা চারদিকের বাতাস থেকে আপনিই সত্যের তেজোরূপটিকে নিজের ভিতরে ধ'রে নিতে পারেন, পুঁথির ভাণ্ডারে শাস্ত্রবচনের সনাতন সঞ্চয়ের থেকে কুড়িয়ে কুড়িয়ে তাঁদের সংগ্রহ নয়। এই জন্যে এঁদের বাণী এমন নবীন, তার রস কখনো শুকোয় না।

অনন্তকে ত জ্ঞানে কুলিয়ে ওঠে না,—ঋষি তাই বলেন, তাঁকে না পেয়ে মন ফিরে আসে। সেই অনন্তের সমস্ত রহস্য বাদ দিয়ে তাঁকে সম্প্রদায়ের ঈশ্বর, শাস্ত্রবাক্যের ঈশ্বর, কবুলতিপত্রে দশে মিলে দস্তখতের দ্বারা স্বীকার ক'রে নেওয়া, হাটে বাটে গোলে-হরিবোলের ঈশ্বর ক'রে নিই। সেই বরদাতা, সেই ত্রাণকর্ত্তা, সেই সুনির্দ্দিষ্টমতের ফ্রেম-দিয়ে বাঁধানো ঈশ্বরের ধারণা একেবারে পাথরের মতো শক্ত; তাকে মুঠোয় ক'রে নিয়ে সাম্প্রদায়িক ট্যাঁকে গুঁজে রাখা চলে, পরস্পরের মাথা ভাঙাভাঙি করা সহজ হয়। আমাদের মরমিয়াদের ঈশ্বর কোনো একটি পুণ্যাভিমানী দলবিশেষের সরকারী ঈশ্বর নন, তিনি প্রাণেশ্বর।

কেননা ঋষি বলেচেন, জ্ঞানে তাঁকে পাওয়া যায় না, আনন্দেই তাঁকে পাওয়া যায়। অর্থাৎ হৃদয় যখন অনন্তকে স্পর্শ করে তখন হৃদয়মন তাঁকে অমৃত ব'লে বোধ করে, আর এই নিবিড় রসবোধেই সমস্ত সংশয় দূর হয়ে যায়। শেলি সেই বোধের গানই গেয়েচেন, মরমিয়া কবিদের কণ্ঠে সেই

বোধেরই গান। যা রহস্য, জ্ঞানের কাছে তা নিছক অন্ধকার, তা একেবারে নেই বল্‌লেই হয়। কিন্তু যা রহস্য, হৃদয়ের কাছে তারই আনন্দ গভীর। সেই আনন্দের দ্বারাই হৃদয় অসীমতার সত্যকে প্রত্যক্ষ চিন্‌তে পারে। তখন সে কোনো বাঁধা রীতি মানে না, কোনো মধ্যস্থের ঘটকালিকে কাছে ঘেঁষতে দেয় না।

অমৃতের রসবোধ যার হয়নি, সে-ই মানে ভয়কে, ক্ষুধাকে, ক্ষমতাকে। সে এমন একটি দেবতাকে মানে, যিনি বর দেন, নয় দণ্ড দেন। যাঁর দক্ষিণে স্বর্গ, বামে নরক। যিনি দূরে ব'সে কড়া হুকুমে বিশ্বশাসন করেন। যাঁকে পশুবলি দিয়ে খুসি করা চলে, যাঁর গৌরব প্রচার করবার জন্যে পৃথিবীকে রক্তে ভাসিয়ে দিতে হয়, যাঁর নাম ক'রে মানবসমাজে এত ভেদবিচ্ছেদ, পরস্পরের প্রতি এত অবজ্ঞা, এত অত্যাচার।

ভারতের মরমিয়া কবিরা শাস্ত্রনির্ম্মিত পাথরের বেড়া থেকে ভক্তের মনকে মুক্তি দিয়েছিলেন। প্রেমের অশ্রুজলে দেবমন্দিরের অঙ্গন থেকে রক্তপাতের কলঙ্করেখা মুছে দেওয়া ছিল তাঁদের কাজ। যাঁর আবির্ভাব ভিতরের থেকে আনন্দের আলোকে মানুষের সকল ভেদ মিটিয়ে দেয়, সেই রামের দূত ছিলেন তাঁরা। ভারত ইতিহাসের নিশীথরাত্রে ভেদের পিশাচ যখন বিকট নৃত্য করছিল তখন তাঁরা সেই পিশাচকে স্বীকার করেননি। ইংরেজ মরমিয়া কবি যেমন দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে বলেছিলেন যে, বিশ্বের মর্ম্মাধিষ্ঠাত্রী দেবী আনন্দলক্ষ্মীই মানুষকে সকল বন্ধন থেকে মুক্তি দেবেন, তেমনি তাঁরা নিশ্চয় জানতেন যাঁর আনন্দে তাঁরা আপনাকে অহমিকার বেষ্টন থেকে ভাসিয়ে দিতে পেরেছিলেন, তাঁরই আনন্দে মানুষের ভেদবুদ্ধি দূর হ'তে পারবে; বাইরের কোনো রফারফি থেকে নয়। তাঁরা এখনো কাজ করচেন। আজও যেখানে কোথাও হিন্দু মুসলমানের আন্তরিক প্রেমের যোগ দেখি সেখানে দেখ্‌তে পাই তাঁরাই পথ ক'রে দিয়েচেন। তাঁদের জীবন দিয়ে গান দিয়ে সেই মিলনদেবতার পূজাপ্রতিষ্ঠা হয়েচে যিনি "সেতুর্বিধরণরেষাং লোকানামসম্ভেদায়।" তাঁদেরই উত্তরসাধকেরা আজও বাংলা দেশের গ্রামে গ্রামে একতারা বাজিয়ে গান গায়; তাদের সেই একতারার তার ঐক্যেরই তার। ভেদবুদ্ধির পাণ্ডা শাস্ত্রজ্ঞের দল তাদের উপর দণ্ড উদ্যত করেচে। কিন্তু এতদিন যারা সামাজিক

অবজ্ঞায় মরেনি, তারা-যে সামাজিক শাসনের কাছে আজ হার মানবে এ-কথা বিশ্বাস করিনে।

যেহেতু ভারতীয় সমাজ ভেদবহুল, যেহেতু এখানে নানা ভাষা, নানা ধর্ম্ম, নানা জাতি, সেই জন্যেই ভারতের মর্ম্মের বাণী হচ্চে ঐক্যের বাণী। সেই জন্যেই যাঁরা যথার্থ ভারতের শ্রেষ্ঠপুরুষ তাঁরা মানুষের আত্মায় আত্মায় সেতু নির্ম্মাণ করতে চেয়েচেন। যেহেতু বাহিরের আচার ভারতে নানা আকারে ভেদকেই পাকা ক'রে রেখেচে এইজন্যেই ভারতের শ্রেষ্ঠ সাধনা হচ্চে বাহ্য আচারকে অতিক্রম ক'রে অন্তরের সত্যকে স্বীকার করা। পরম্পরাক্রমে ভারতবর্ষের মহাপুরুষদের আশ্রয় ক'রে এই সাধনার ধারা চিরদিনই চলেচে। অথচ ভারতসমাজের বাহিরের অবস্থার সঙ্গে তার অন্তরের সাধনার চিরদিনই বিরোধ, যেমন বিরোধ ঝর্‌নার সঙ্গে তার স্রোতঃপথের পাথরগুলোর। কিন্তু অচল বাধাকেই কি সত্য বল্‌ব, না সচল প্রবাহকে? সংখ্যাগণনায় বাধারই জিত, তার ভারও কম নয়, কিন্তু তাই ব'লেই তাকে প্রাধান্য দিতে পারিনে। ঝির্ ঝির্ ক'রে একটুখানি যে-জল শৈলরাজের বক্ষ-গুহা থেকে বেরিয়ে আস্‌চে, বহু আঘাতব্যাঘাতের ভিতর দিয়ে বিপুল বিস্তীর্ণ বালুকারাশির একপ্রান্তে কোনোমতে পথ ক'রে নিয়ে সমুদ্রসন্ধানে চলেচে, পর্ব্বতের বরফ-গলা বাণী তারই লহরীতে। এই শীর্ণ স্বচ্ছ প্রচ্ছন্ন ধারাটিই মহায়তন বহুবিচ্ছিন্নতার ভিতরকার ঐক্যসূত্র।

ভারতের বাণী বহন ক'রে যে-সকল একের দূত এদেশে জন্মেচেন তাঁরা যে প্রথম হ'তেই এখানে আদর পেয়েচেন তা নয়। দেশের লোক নিতান্তই যখন তাঁদের অস্বীকার করতে পারেনি তখন নানা কাল্পনিক কাহিনী দ্বারা তারা তাঁদের স্মৃতিকে চেয়েচে শোধন ক'রে নিতে, যতটা পেরেচে তাঁদের চরিতের উপর সনাতনী রঙের তুলি বুলিয়েচে। তবু ভারতের এই শ্রেষ্ঠ সন্তানেরা জনাদর পেতে বাধা পেয়েছিলেন এ-কথা মনে রাখা চাই; সে আদর না পাওয়াই স্বাভাবিক, কেননা তাঁরা ভেদ-প্রবর্ত্তক সনাতন বিধির বাহিরের লোক, যেমন খৃষ্ট ছিলেন য়িহুদী ফ্যারিসি-গণ্ডীর বাহিরে। কিন্তু বহুদিন তাঁরা অনাদরের অসাম্প্রদায়িক ছায়ায় প্রচ্ছন্ন ছিলেন ব'লে তাঁরাই যে অভারতীয় ছিলেন তা নয়। তাঁরাই ছিলেন যথার্থ ভারতীয়, কেননা তাঁরাই বাহিরের

কোনো সুবিধা থেকে নয় অন্তরের আত্মীয়তা থেকে হিন্দুকে মুসলমানকে এক ক'রে জেনেছিলেন—তাঁরাই ঋষিদের সেই বাক্যকে সাধনার মধ্যে প্রমাণ করেছিলেন যে-বাক্য বলে, সত্যকে তিনিই জানেন যিনি আপনাকেই জানেন সকলের মধ্যে।

ভারতীয় এই সাধকদেরই সাধনাধারা বর্ত্তমান কালে প্রকাশিত হয়েচে রামমোহন রায়ের জীবনে। এই যুগে তিনিই উপনিষদের ঐক্যতত্ত্বের আলোকে হিন্দুমুসলমান খৃষ্টানকে সত্যদৃষ্টিতে দেখ্‌তে পেয়েছিলেন, তিনি কাউকেই বর্জ্জন করেন নি। বুদ্ধির মহিমায় ও হৃদয়ের বিপুলতায় তিনি এই বাহ্যভেদের ভারতে আধ্যাত্মিক অভেদকে উজ্জ্বল ক'রে উপলব্ধি করেছিলেন এবং সেই অভেদকে প্রচার করতে গিয়ে দেশের লোকের কাছে আজও তিনি তিরস্কৃত। যাঁর নির্ম্মল দৃষ্টির কাছে হিন্দুমুসলমান খৃষ্টানের শাস্ত্র আপন দুরূহ বাধা সরিয়ে দিয়েছিল তাঁকে আজ তারাই অভারতীয় বল্‌তে স্পর্দ্ধা করচে পাশ্চাত্য বিদ্যা ছাড়া আর কোনো বিদ্যায় যাদের অভিনিবেশ নেই। আজকের দিনেও রামমোহন রায় আমাদের দেশে যে জন্মেচেন তাতে এই বুঝতে পারি যে, কবীর নানক দাদূ ভারতের যে সত্যসাধনাকে বহন করেছিলেন আজও সেই সাধনার প্রবাহ আমাদের প্রাণের ক্ষেত্র পরিত্যাগ করে নি। ভারতচিত্তের প্রকাশের পথ উদ্‌ঘাটিত হবেই।

মাটির নীচের তলায় জলের স্রোত বইচে, ঘোর শুষ্কতার দিনে এই আশার কথাটি মনে করিয়ে দেওয়া চাই। মরুর বেড়া লোহার বেড়ার চেয়ে দুস্তর। আমাদের দেশে সেই শুষ্কতার সেই অপ্রেমের বেড়াই সকলের চেয়ে সর্ব্বনেশে হয়ে দিকে দিকে প্রসারিত। প্রয়োজনের যোগ মশকে জল-বহে-নেওয়া সার্থবাহের যোগের মতো। তাতে ক্ষণে ক্ষণে বিশেষ কোনো একটা কাজ দেয়, কখনো বা দেয়ও না, বালির আঁধিতে সব চাপা দিয়ে ফেলে; মশকের জল তেতে উঠে, শুকিয়ে যায়, ফুটো দিয়ে ঝরে পড়ে। এই মরুতে যেখানে মাটির নীচের চিরবহমান লুকানো জল উৎসারিত হয়ে ওঠে সেইখানেই বাঁচোয়া। মরমিয়া কবিদের বাণীস্রোত বইচে সমাজের অগোচর স্তরে; শুষ্কতার বেড়া ভাঙ্‌বার সত্যকার উপায় আছে সেই প্রাণময়ী ধারার মধ্যে। তাকে আজ সাহিত্যের উপরিতলে উদ্ধার ক'রে আন্‌তে হবে। আমাদের

পুরাণে আছে যে-সগর বংশ ভস্ম হয়ে রসাতলে পড়েছিল তাদেরই বাঁচিয়ে দেবার জন্যে বিষ্ণুপাদপদ্মবিগলিত জাহ্নবীধারাকে বৈকুণ্ঠ থেকে আবাহন ক'রে আনা হয়েছিল। এর মধ্যে গভীর অর্থটি এই যে, প্রাণ যেখানে দগ্ধ হয়ে গেছে সেখানে তাকে রসপ্রবাহেই বাঁচিয়ে তোলা যায়, কেবল মাত্র কোনো একটা কর্ম্মের আবর্ত্তনে তাকে নড়ানো যায় মাত্র, বাঁচানো যায় না। মৃত্যু থেকে মানুষের চিত্তকে পরিত্রাণ করার জন্যে বৈকুণ্ঠের অমৃতরসপ্রস্রবণের উপরেই আমাদের মরমিয়া কবিরা দৃঢ় আস্থা রেখেছিলেন, কোনো একটা বাহ্য আচারের রাজিনামার উপরে নয়। তাঁরা যে-রসের ধারাকে বৈকুণ্ঠ থেকে এনেছিলেন, আমাদের দেশের সামাজিক বালুর তলায় তা অন্তর্হিত। কিন্তু তা মরে যায় নি। ক্ষিতিমোহন বাবু ভার নিয়েচেন বাংলা দেশে সেই লুপ্ত-স্রোতকে উদ্ধার ক'রে আন্‌বার। শুধু কেবল হিন্দী ভাষা থেকে নয়, আশা ক'রে আছি বাংলা ভাষার গুহার থেকে বাউলদের সেই সুবর্ণরেখার বাণী-ধারাকে প্রকাশ করবেন যার মধ্যে সোনার কণা লুকিয়ে আছে।*

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

---

* এই ভূমিকাটি ১৩৩২ সালের ভাদ্র মাসের প্রবাসী পত্রিকায় ছাপা হইয়াছিল।

উপক্রমণিকা

জীবনী-পরিচয়

১। **জন্মস্থান** : যদিও কাহারও কাহারও মতে আমেদাবাদেই দাদূর জন্মস্থান, তথাপি সেখানে দাদূর চিহ্নমাত্রও নাই। কিছুদিন পূর্ব্বে আমেদাবাদে দাদূর কিছু সন্ধান মেলে কিনা এই খোঁজ করিতে যাই। আমার সঙ্গে শ্রীযুত হরিপ্রসাদ পীতাম্বর দাস মেহতা, পণ্ডিত শ্রীযুত করুণাশঙ্কর কুবেরজী ভট্ট, ডাক্তার হরিপ্রসাদ ব্রজরায় দেশাই প্রভৃতি অনেকে অনেক খোঁজ করিলেন। কিছুই পাওয়া গেল না। শিক্ষিত ভদ্রলোক ও সাহিত্যিকরা তো দাদূর কোনো খোঁজই জানিতেন না, অনেকে তাঁর নাম এই প্রথম শুনিলেন, এবং দাদূ ধুনকার জাতীয় ছিলেন শুনিয়া কেহ কেহ এই ভাব প্রকাশ করিলেন যে, এমন নীচ বংশীয় লোকের কথা কেমন করিয়া জানা যাইতে পারে! নানা শিক্ষিত মণ্ডলীতে খোঁজ করিয়া অবশেষে কবীরপন্থী মঠগুলিতে খোঁজ করা গেল। তাঁহারাও কোনো খবর দিতে পারিলেন না। দাদূ বলিয়া যে কেহ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এমন কথাও তাঁরা জানেন না। ম্যুনিসিপল অফিস ও পুলিশ থানায় খোঁজ করিয়াও দাদূপন্থীদের কোন মঠ বা আখড়া বাহির করা গেল না। দুর্লভরাম নামে আমেদাবাদের একজন প্রত্যেক-বাড়ীর-খোঁজ-জানা লোকও অলিতে গলিতে খোঁজ করিয়া হার মানিলেন। অবশেষে একটি সাধুর কাছে খোঁজ মিলিল যে কাঁকড়িয়া হ্রদের তীরে পূর্ব্বে একটি দাদূ পন্থী সাধু ছিলেন। তিনি নির্জ্জনে সাধনা করিতেন। তিনি মারা যাওয়ার পর আমেদাবাদে দাদূর বিষয়ে কিছু জানা যায় এমন একজন লোকও নাই। দাদূপন্থী কোনো মঠ তো সেখানে নাই-ই। শেষে সন্ধান নিয়া জানিলাম এই কাঁকড়িয়ার দাদূ-পন্থী সাধু

আমার পূর্ব্বপরিচিত, তাঁর সঙ্গে কোনো কোনো তীর্থ একত্র ঘুরিয়াছি। তিনি উত্তর ভারত বা রাজপুতানা হইতে আসিয়া আমেদাবাদে বাস করিতেছিলেন।

২। **জন্মকাল ঃ** এ বিষয়ে যাঁহারা পূর্ব্বে গ্রন্থাদি লিখিয়াছেন তাঁহাদের মত সংগ্রহ করিয়া জানাইতেছি। উইলসন সাহেবের মতে দাদূ ষোড়শ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার মতে দাদূর প্রধান গ্রন্থ "দাদূকী বাণী" ও "দাদূপংথীগ্রন্থ।" তা ছাড়াও দাদূর অনেক বচন ও গান আছে। সিডন্স্ সাহেব "দাদূপংথীগ্রন্থ" হইতে ইংরাজীতে কিছু অনুবাদ করিয়াছিলেন।

অধ্যাপক উইলসনের মতে (Asiatic Researches, XVII, p. 302, এবং Religious Sects of the Hindus, p. 103) ও ফরাসী অধ্যাপক ট্যাসীর (Garcin De Tassy) মতে দাদূ রামানন্দ হইতে ছয় পীঢ়ী নীচে অর্থাৎ শিষ্যপরম্পরাক্রমে দাদূ রামানন্দ হইতে ছয় জনের পর। যথা—

(১) রামানন্দ
(২) রামানন্দের শিষ্য কবীর
(৩) কবীরের শিষ্য কমাল
(৪) কমালের শিষ্য জমাল
(৫) জমালের শিষ্য বিমল
(৬) বিমলের শিষ্য বুঢ়্ঢন
(৭) বুঢ়্ঢনের শিষ্য দাদূ

(Histoire de la Litterature Hindouie et Hinduoustanie, Vol I, 403 p.)

এই গ্রন্থের মতে দাদূ ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন· আর আকবরের রাজত্বকালে ও জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের প্রথম ভাগে দাদূ জীবিত ছিলেন।

এলাহাবাদ বেলবেডিয়র প্রেস হইতে প্রকাশিত সন্তবাণী গ্রন্থমালার দাদূ-গ্রন্থের সম্পাদকের মতে দাদূ ১৬০১ সম্বতে অর্থাৎ ১৫৪৪ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

লেফটেনাণ্ট জি, আর, সিডন্স্ সাহেব কলিকাতা হইতে প্রকাশিত

এসিয়াটিক সোসাইটির জর্নালে (June, 1837) দাদূ হইতে কিছু অংশ অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিবার সময় দাদূ সম্বন্ধে কিছু বিচারও করিয়াছেন।

দাদূর শিষ্য ভক্ত জনগোপাল লিখিয়াছেন যে ফতেপুর সিক্রীতে সম্রাট আকবর প্রায়ই দাদূর সঙ্গে বসিয়া ধর্ম্ম বিষয়ে গভীর আলাপ করিতেন। এই কথা ক্রূক সাহেবও তাঁহার গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন (Crooke, Tribes & Castes of the North-Western-Provinces and Oudh, Vol II, p. 237).

৩। **দাদূর জাতি ঃ** কেহ কেহ বলেন যে, দাদূ আমেদাবাদে জন্মগ্রহণ করেন ও তিনি জাতিতে তুলাধুনকর ছিলেন। বারো বৎসর বয়সে জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া তিনি সাম্ভরে যান, তথা হইতে চারি ক্রোশ দূরে নারায়ণা বা নিরাণাগ্রামে বাস করেন ও জীবনের শেষ ভাগ সেখানেই যাপন করেন। সাধনা করিতে করিতে তিনি তার গভীরতম সত্যের উপলব্ধি করেন ও তাহাই তাঁহার স্বাভাবিক কবিত্বশক্তি দ্বারা প্রকাশ করেন। আমেরের মঠেও মঠবাসী মহন্তরা তাঁহার সাধনার গুহা দেখাইয়া থাকেন। সেখানে যে লাঠি ও খড়ম রক্ষিত আছে এখন দাদূজীর বলিয়া তাহাও দর্শকদের দেখান হইয়া থাকে ; তবে তাহা ঠিক দাদূরই কি না তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না।

স্বর্গীয় সুধাকর দ্বিবেদী মহাশয় দাদূর বিষয়ে বিস্তর শ্রম করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, দাদূ "মোট" (কূপ হইতে জল তুলিবার চর্ম্মপাত্র) সেলাই করা মুচীর বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বলেন, দাদূর আত্মবাণীর সাক্ষ্য দ্বারাই তিনি ইহার সমর্থন পাইয়াছেন। তাঁহার মতে কাশীর কাছে জৌনপুরে দাদূর জন্মভূমি। দাদূর পূর্ব্ব নাম ছিল "মহাবলী।" ভক্ত ও বৈরাগীদের কাছে জানা যায় যে, এক সময় যখন দাদূর মন শূন্যতার ব্যথায় পূর্ণ, তখন তিনি কবীরের পুত্র ও শিষ্য ভক্তসাধক কমালের সঙ্গ লাভ করেন ও কমালের কাছেই দাদূ আধ্যাত্মিক পূর্ণতার সাধনা লাভ করেন।

৪। **সম্প্রদায় স্থাপন বিরোধী গুরু কমাল**

কমাল বড় গভীর সাধক ছিলেন ; তিনি সকল প্রকার সাম্প্রদায়িক ভাবের অতীত মরমিয়া সাধক। যে কবীর চিরদিন ধর্ম্মের সঙ্কীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিলেন সেই কবীরের মৃত্যুর পরই যখন কমালকে প্রধান করিয়া

শিষ্যদল একটি সম্প্রদায় গড়িতে গেলেন তখন কমাল কিছুতেই তাহাতে রাজী হইলেন না। তিনি বলিলেন, তাহা হইলে আমাদের আধ্যাত্মিক গুরু-হত্যার পাতক হইবে। মঠ ও সম্প্রদায় স্থাপনায় সম্মান-লোলুপ শিষ্যদল বলিলেন, কমালই কবীরের ধারা ডুবাইলেন।

"ডূবা বংশ কবীরকা জব উপজা পুত্র কমাল।"

এই কথাটির অবশ্য আরও নানাভাবে প্রয়োগ আছে ও নানাভাবে ইহার অর্থ করা হয়।

কমাল বলিলেন, "মহাপুরুষরা মানব সাধনায় 'বরিয়াত' চালাইবার জন্য আসেন। ("বরিয়াত" অর্থ বরযাত্রা। লোকলস্কর, বাদ্য ও আলোক প্রভৃতি লইয়া বরের জয়যাত্রাকে "বরিয়াত" বলে।) মহাপুরুষরা আসিয়া যদি দেখেন 'বরিয়াত'দল ঘুমাইতেছে বা অচেতন হইয়াছে তাহা হইলে তাঁহারা বজ্রের আঘাত দিয়া সকলকে জাগাইয়া সকলের হাতে বজ্রাগ্নির মশাল দেন। তাঁহাদের মন্ত্র ও বাণীই এই মশাল। সেই সব জ্বলন্ত মন্ত্র ও অগ্নিময়ী বাণী লইয়া কেহ সঞ্চয় করিয়া ভাণ্ডারে ভরিতে পারে না। কাজেই যাহারা সম্প্রদায় বা মঠ করে তাহারা তাহাদের ভাণ্ডারের মধ্যে বাণীগুলিকে ভরিতে গিয়া সেই সমস্ত বাণীর আগুনকে নিভাইয়া নিরাপদ করিয়া লয়। জ্বলন্ত আগুন সংগ্রহ করিয়া রাখিবার সাহসই বা হয় কেমন করিয়া আর তার উপায়ই বা কি? নিরাপদ ভাণ্ডার সংগ্রহের জন্য এই সব আগুন বাদ দিয়া দণ্ড ও ন্যাকড়াগুলি মাত্র সংগ্রহ করা দ্বারা আমরা মহাপুরুষদের সাধনাকে বধ করি। এমন কাজ আমার দ্বারা হইবে না। সম্প্রদায় হইল সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষদের গোর অর্থাৎ সমাধিস্থান, যেখানে চেলারা চমৎকার মর্ম্মর অট্টালিকা গড়িয়া তুলিতে পারে। গুরু যদি মরিতে নাও চাহেন তবু এই গৌরবময় গোর-অট্টালিকা রচিবার জন্য চেলারা গুরুকে ও সত্যকে বধ করিয়াও তার উপর সম্প্রদায় ও সঙ্কীর্ণ-সাধনার কবর রচে। এমন কুকর্ম্ম তোমরা করিও না, জীবনে গুরুর অগ্নি বহন কর, নিবানো মশাল ও অগ্নির উচ্ছিষ্ট সংগ্রহ করিয়া অন্ধকার ভাণ্ডারের বোঝা বাড়াইও না। গুরুকে মারিয়া ফেলিয়া সম্প্রদায়ের অট্টালিকা গড়িয়া তুলিবার গৌরব লুব্ধতা ছাড়।"

কিন্তু কমালের কথায় ফল হইল না। যদিও দীর্ঘকাল কমাল তাঁর প্রভাব দ্বারা এই দোষ ঠেকাইলেন তবুও পরে সুরতগোপাল ও ধর্ম্মদাসকে আশ্রয় করিয়া কবীরের সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিল। মহাপুরুষদের সম্প্রদায়ভুক্ত জীবনী-লেখক ও ঐতিহাসিকরাও মহাপুরুষদের জীবন্ত আগুনকে বড় ভয় করেন। কাজেই মহাপুরুষদের মহত্ত্ব বাদ দিয়া তাঁহাদিগকে অগ্নিহীন নিরাপদ করিয়া নিজেদের উপযোগী করিয়া তোলেন। এমন করিয়াই ইতিহাসকে মানুষ প্রয়োজন ও ইচ্ছামত নিজ হাতে গড়িয়া তোলে। তাই দেখি ভক্তমালে নানক দাদূ প্রভৃতি মহাপুরুষের নাম নাই। আরও বহু বহু এমন সব অগ্নিতুল্য মহাপুরুষ ভক্তমালে স্থান পান নাই যাঁহাদের বাণী এখনও বহু সাধকের জীবনের অন্ধকার দূর করিতেছে ও মানবের সর্ব্ববিধ ক্ষুদ্রতা দগ্ধ করিতেছে। দাদূ এমন তেজস্বী সাধক কমালের শিষ্য। জমাল, বিমল, বুঢ্ঢনকে অনেকে মানেন না। দাদূকে কমালেরই সাক্ষাৎ শিষ্য মনে করেন। দাদূ এই কমালকেই অনেকবার "গুরুগোবিন্দ" ও "গুরুসুন্দর" নামে অভিহিত করিয়াছেন। এসব কমালেরই মাহাত্ম্যের সূচকশব্দ।

দাদূর শিষ্য সুন্দরদাসের গুরুসম্প্রদায় মতে দাদূর গুরুর নাম বৃদ্ধানন্দ, তাঁর গুরু কুশলানন্দ, তাঁর গুরু বীরানন্দ, তাঁর গুরু ধীরানন্দ এমন করিয়া ব্রহ্ম পর্য্যন্ত ধারা গিয়াছে। ইহা শুধু আসল মানুষের ধারার স্থানে একটি ভাবধারা দ্বারা গুরুপরম্পরা নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা। তবে বৃদ্ধানন্দের মধ্যে বুঢ্ঢনের ইঙ্গিত পাই।

দ্বিবেদী মহাশয় বলেন, "এই গুরু কমালের কৃপাতেই মুচী মহাবলী সাধনা ও সত্যলাভ করেন। মহাবলী সকলকে 'দাদা' 'দাদা' বলিতেন তাই তাঁহাকেও সকলে দাদা বা আদর করিয়া 'দাদূ' বলিত। এমন করিয়াই তাঁহার নাম হইয়া গেল 'দাদূ'। লোকদত্ত এই 'দাদূ' নামে তাঁর গুরুদত্ত নাম চাপা পড়িয়া গেল। তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে ইনি আজমীরের পীরস্থান বা দর্গায় যান তথা হইতে নারায়ণা গ্রামে গিয়া বাস করেন ও শেষে সেখানেই দেহত্যাগ করেন। সেইজন্যই নরাণে গ্রামে 'দাদূদ্বারা' বিদ্যমান। ভরুচের কাছে নর্ম্মদানদীর তীরে একটি বটগাছের নীচে কবীর কিছুদিন ছিলেন। তাই সেই বৃক্ষটিকে এখনও সকলে 'কবীর

বট' বলে। গোরখপুরের জিলাতে মগহর গ্রামে কবীর দেহত্যাগ করাতে সেই গ্রাম এখনও 'কবীরদ্বার' বলিয়া প্রসিদ্ধ।"

৫। **দাদূর জন্ম ব্যাপারে অলৌকিকত্ব আরোপঃ** সূরত বেগমপুরার খাঙ্গরশেড়ীর মঠের মহন্ত রামপ্রসাদজী বলেন "দাদূর জন্মই হয় নাই। তিনি নিত্য পূর্ণব্রহ্মনারায়ণ, তাঁহার আবার জন্ম কি? তিনি আপনাকে শিশুরূপে প্রকট করিলে গুজরাতী ব্রাহ্মণ লোদিরাম তাহাকে দেখিতে পান ও ঘরে আনিয়া লালন পালন করেন। অনেক মঠাধিপতি দাদূপন্থী মহন্তদের ইহাই মত। আজমীরবাসী দাদূভক্ত পণ্ডিত চণ্ডিকাপ্রসাদ ত্রিপাঠিজী বহুদিন পূর্ব্বে তাঁর 'দাদূদয়ালকী বাণী'গ্রন্থের উপক্রমণিকায় লিখিয়াছিলেন যে"দাদূ গুজরাতী ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন।" পরে তিনি তাঁর 'দাদূপন্থীসম্প্রদায়কা হিন্দীসাহিত্য' নামক পুস্তিকায় ৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"দাদূ হিন্দু কি মুসলমান বংশে জন্মগ্রহণ করেন তাহা ঠিক বলা যায় না। কেহ বলেন তাঁর জন্ম এক নাগর ব্রাহ্মণের ঘরে। এদিকে দাদূদয়ালের নিজ শিষ্যেরাই বলেন যে তাঁর জন্ম 'ধুনিয়ার' ঘরে। 'স্বামী দাদূদয়ালের জন্মলীলা' গ্রন্থের রচয়িতা দাদূর নিজ শিষ্য জনগোপালজী, দাদূর নিজ শিষ্য রজ্জবজী, জগন্নাথজী, সুন্দরদাসজী সবাই এই কথা বলেন।"

গতবার আজমীর গিয়া দেখি তাঁর মত আরো পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। দাদূ যে মুসলমান ছিলেন এ কথা আমি সঙ্কোচের সহিত তাঁহার কাছে পাড়িতেই তিনি স্বয়ং আমাকে অনেক প্রমাণ অগ্রসর করিয়া দিলেন।

মহন্ত ও মঠধারী সাধুরা প্রায় সকলেই ইহা বলিতে চাহেন যে দাদূ গুজরাতী ব্রাহ্মণ ছিলেন। কবীরও যে জোলার সন্তান তাহাও তো কেহ কেহ মানিতে চান না। তাঁরা বলেন আসলে কবীর ব্রাহ্মণ। মুসলমান জোলা তাঁহাকে কুড়াইয়া পাইয়া পালন করেন মাত্র। আর গোঁড়া সাম্প্রদায়িকরা বলেন কবীর স্বয়ং নারায়ণ, তিনি আপনাকে লহরতলাওতে প্রকট করিলে জোলা নীমা তাঁহাকে পালন করেন।

৬। **দাদূর নানাস্থানে অবস্থিতিঃ** চন্দ্রিকাপ্রসাদ তাঁহার 'শ্রীস্বামী দাদূদয়ালকী বাণী' গ্রন্থে বলেন, দাদূ আমেদাবাদে

(নাগর ব্রাহ্মণ) লোদিরামের ঘরে ১৫৪৪ খৃঃ ফাল্গুন মাসের শুক্লাষ্টমীর বৃহস্পতি বারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮ বৎসর আমেদাবাদেই তিনি ছিলেন, তার পর ছয় বৎসর মধ্যদেশে নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়ান, তার পর আসেন জয়পুর সান্তরে। কয় বৎসর সেখানেই থাকেন, পরে আমেরে আসিয়া বাস করেন। তখন জয়পুরে রাজা মানসিংহের পিতা ভগবংতদাস ছিলেন রাজা। দাদূ ১৪ বৎসর আমেরে ছিলেন, পরে মারৰাড়, বিকানীর আদি রাজ্য ঘুরিয়া তিনি নারাণাতে আসিয়া বাস করেন। এবং সেখানেই ১৬০৩ খৃঃ জ্যৈষ্ঠমাসের কৃষ্ণাষ্টমী শনিবারে ৫৮ বৎসর আড়াই মাস আয়ু পাইয়া মারা যান। "নারাণা" ফুলেরার কাছে দাদূপন্থীদের একটী তীর্থস্থান। দাদূপন্থী সাধুদের এখানে প্রধান মন্দির ও তীর্থভূমি। এখানে প্রতিবৎসর ফাল্গুন মাসের শুক্লা চতুর্থী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত খুব বড় মেলা বসে। বহুদূর হইতে হাজার হাজার দাদূপন্থী সাধু তাহাতে আসেন।

সুরত বেগমপুরার মঠের পরলোকগত মহন্ত পণ্ডিত মতিরামেরও মতে "দাদূর জন্ম হয় নাই, তাঁহার বিবাহ বা মৃত্যুও হয় নাই। তিনি হইলেন পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ। পরমেশ্বরের আবার জন্ম মৃত্যু বিবাহ কি?" "দাদূ দেবতা হইলে তাঁর পুত্র গরীবদাস হন কেমন করিয়া?" এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন "গরীবদাসকে দাদূ শিশুকালে অনাথ দেখিয়া দয়া করিয়া নিজে পালন করেন।" অনেক সাধু মহন্তেরই এই মত। যদিও গ্রন্থাদির এবং প্রাচীন শিষ্য পরম্পরার মতে ইতিহাস অন্যরূপ।

৭। বাংলায় দাদূর পরিচয় ও দাদূর কুল নির্ণয়ঃ এখন দাদূর ইতিহাস খোঁজ করিতে করিতে একটী নূতন তথ্য গোচরে আসিতেছে। কোনো কোনো দলের বাংলাদেশের বাউলরা তাঁহাদের প্রণামে কবীর, দাদূ, নানক প্রভৃতিকে প্রণাম করেন। তার একটী প্রণতিতে দেখি—

"শ্রীগুরু দাউদ বন্দি দাদূ যাঁর নাম।"

এই প্রণতি যদি সত্য হয় তবে তো দাদূ হইয়া দাঁড়ান জন্মতঃ মুসলমান। এই প্রণতিটী দেখার পর বহু তীর্থ, সাধু ও পুঁথির খোঁজ করি। দেখিলাম দাদূ যে মুসলমান ছিলেন তাহা আরও দুই একজনের গোচরে

আসিয়াছে কিন্তু কেহই সাহস করিয়া কথাটা প্রকাশ করিতেছেন না। কথাটা আপাততঃ চাপা পড়িবার জো হইয়াছে, দাদূর সম্বন্ধে তথ্য ও পুঁথির খোঁজ করিতে করিতে গতবার যখন রাজপুতানায় যাই তখন জয়পুরের ডাক্তার রায় দলজং সিংহ খেমকা বাহাদুরের ওখানে যাই। তখন দেখি হিমালয় গড়ওয়ালের পৌড়ী নগরের দাদূঅনুরাগী শ্রীযুত তারাদত্ত গৈরালা ও সেখানে উপস্থিত আছেন। জয়পুর অঞ্চলের দুই একজন প্রাচীন তত্ত্বান্বেষীও এই বিষয়ে খোঁজ করিতেছিলেন। তাঁহারাও সেই সময় টের পান যে কতকগুলি প্রবল প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যে দাদূ ছিলেন মুসলমান আর তাঁর পূর্ব্ব নাম ছিল দাউদ। এই দাউদটাই বদলাইয়া হইল দাদূ। এই তথ্যটা জয়পুরের দাদূপন্থীর সত্য অনুসন্ধানপরায়ণ পুরোহিত হরিনারায়ণ ও পণ্ডিত শ্রীযুত লক্ষ্মীদাস বৈদ্য মহাশয় প্রভৃতিরা যে না জানেন এমন মনে হয় না তবুও এই তথ্যটা এবং প্রমাণগুলি যদি ইহারা বাহির না করেন তবে শীঘ্র বাহির হইবে না। তাই বাধ্য হইয়া এইখানে ইহা জানাইতে হইল।

তাহা হইলে দেখা যায় যে কবীরের শিষ্য কমাল, কমালের শিষ্য দাদূ, দাদূর শিষ্য রজ্জবজী—এই একটী সাধকের ধারা চলিয়া আসিতেছে যাঁহারা জন্মতঃ মুসলমান অথচ হিন্দুভাবের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। ইহাঁরা সকল সম্প্রদায়ের অতীত সত্যের ও ভাবের সাধনায় ভরপুর। এমন সব সাধককেও হিন্দুসমাজের ভক্তেরা একেবারে আপনার বানাইয়া লইয়াছেন। মহাত্মা শ্রীরামকরণজী, মহাত্মা শ্রীবলদেব দাস বিরক্ত, মহাত্মা শ্রীলালদাস জী, পণ্ডিত শ্রীহীরালাল জী, মহাত্মা শ্রীরামদাস জী, মণ্ডলীশ্বর দুবলধনিয়া; সন্ত শ্রীকেশবদাস জী, পণ্ডিত শ্রীকৃপারাম বৈদ্য সাধু প্রভৃতি সব প্রতিষ্ঠিত সন্ন্যাসীরা মিলিয়া যে রজ্জবজীর বাণী সংগ্রহ করিয়াছেন তাহাতে নাম দিয়াছেন—"শ্রীস্বামী মহর্ষি দাদূজীকে সুযোগ্য শিষ্য মহারাজ শ্রীস্বামী রজ্জবজী কী বাণী।" ঐ সংগ্রহটী তাহারা রজ্জবজীকে "যোগী রজ্জব" "শ্রীস্বামী রজ্জবজী" প্রভৃতি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ঐ সকল সাধু সন্ন্যাসী ভক্তেরা হিন্দুসম্প্রদায় ও সমাজের শ্রেষ্ঠজনগণের এবং ভক্তসাধকগণেরও পূজ্য। অথচ তাঁহারা কেমন চমৎকার ভাবে দাদূ ও রজ্জব প্রভৃতিকে হিন্দুরও পূজ্য ও নিজেদের লোক করিয়া লইয়াছেন। দাদূর শিষ্য নাগা সাধু সন্ন্যাসীদের স্থান কুম্ভমেলায় কত

দুর উচ্চে তাহা প্রত্যক্ষদর্শী মাত্রেই জানেন, কত সব উচ্চ নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যাদি কুলের গৃহস্থ ও সাধকেরা তাঁহাদের চরণে নত হইয়া ধন্য হন।

দাদূর জীবনের এ তথ্য একটু ভালরূপে জানার জন্য ১৯২৫—১৯৩০ সালের মধ্যে নানা সময় রাজপুতানার বহুস্থানে ও বহুসাধু সজ্জনের কাছে সন্ধান করিয়া বেড়াইতেছিলাম তাহাতে যে যে সন্ধান মিলিয়াছিল তাহা এইখানে লিখিতেছি। এ সমস্ত প্রমাণের জন্য বিশেষ ভাবে আমি আজমীরের পণ্ডিত চন্দ্রিকাপ্রসাদ ত্রিপাঠী মহাশয়ের কাছে ঋণী। দীর্ঘকাল তিনি রেলওয়ের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। এখন তিনি ভারতীয় রেলওয়ের সম্বন্ধে একজন প্রামাণিক ব্যক্তি। আমাদের দেশের সামাজিক ও অর্থনীতিগত শিক্ষার সংস্কারে তাঁহার মন একান্ত উৎসুক। দাদূপন্থী বংশে তাঁহার জন্ম নয়। সনাতন মতবাদী ব্রাহ্মণবংশে তাঁহার জন্ম। দাদূপন্থী সাধু ব্রহ্মনিষ্ঠ মহাত্মা যোগিরাজ গোবিন্দদাসজীর সংসর্গে আসিয়া তিনি দাদূপন্থে বিশ্বাসী হন এবং দাদূপন্থের বহু গ্রন্থ ও বাণী সংগ্রহ করেন। ইহা ছাড়া অবধূত মহাত্মা লক্ষ্মণদাসজীর ও বিরমগাম নিবাসী সাধু শঙ্কর দাসজী ও কাঠিয়াওয়াড় লাখনকা নিবাসী সাধু মোহন দাসজী প্রভৃতির কাছেও আমি অত্যন্ত ঋণী।

রাজপুতানার নানা সাধুর কাছে ও নানা স্থানে সংগৃহীত নানা পুঁথিতেই প্রমাণ মিলিতে লাগিল যে দাদূ ছিলেন মুসলমান। অতি দীন ধুনীবংশে দাদূর জন্ম। ধুনকর হিন্দু ও মুসলমান দুই-ই আছে। মুসলমান ধুনকর শাখাও এই হিন্দু ধুনকর বংশ হইতেই মুসলমান হইয়া স্বতন্ত্র শাখা হইয়া যায়। উচ্চ শ্রেণীর মুসলমান হইলে ইহাদের মধ্যে কোরাণ হদিস প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র, মুসলমান দর্শন ও সাধন শাস্ত্রাদি প্রচলিত থাকিত, ইহাদের মধ্যে তাহাও ছিল না। ইহারা নামে মুসলমান হইলেও কাজে ছিল হিন্দু মুসলমান উভয় ধর্ম্মের বাহির অতিহীন বংশীয় লোক। ইহাদের মধ্যে না ছিল হিন্দু বা মুসলমান শাস্ত্র, না ছিল শিক্ষাদীক্ষা বা কোনো উচ্চভাবের কথা। এমন বংশে যে কেমন করিয়া এমন সাধকের জন্ম হইল তাহাই আশ্চর্য্য।

ঐ সব দেশে মুসলমান ধুনকরদের বলে ধুনিয়া বা পিন্‌জারা। এই পিন্‌জারারাও অনেকেই দাদূর ভক্ত। পাঞ্জাবের পিন্‌জারারাও দাদূর ভক্ত। যদি সুধাকর দ্বিবেদীর মতানুসারে দাদূ মুচী হন তবে মুসলমান মুচী হইবেন।

কোন কোন জায়গায় পিঞ্জারারা বৎসরের এক সময় তুলা ধুনে অন্য সময় (মোটের) চর্ম্ম সেলাই করে। কোন কোন মতে তাই দাদূর দ্বিবিধ পরিচয় মিলে। কাশীর ভক্তদের কাহারও কাহারও এবং পণ্ডিত সুধাকর দ্বিবেদীর মতে তিনি কূপ হইতে জল তুলিবার মোট সেলাই করা মুচী বংশে জন্মগ্রহণ করেন।

যাহা হউক ইহা নিঃসন্দেহ যে তিনি অতি নীচকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিবাহ করিয়া গৃহী হন। বিবাহিত হইয়াই সন্ন্যাসী এবং সাধক হইতে হইবে এই উপদেশ স্বয়ং কবীর বলিয়া ও আচরণ করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন। যখন দাদূ ধর্ম্মজীবন লাভ করিয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হন তখন দুই পুত্র ও দুই কন্যাকে লইয়া নূতন জীবন আরম্ভ করেন ও তাঁহাদিগকে অধ্যাত্মিক জীবনে অগ্রসর করিয়া দেন। দাদূর পুত্র কন্যা সকলেই উত্তম কবি ও সাধক হইয়াছিলেন। গরীবদাস যে তাঁর পুত্র এই কথা কেহ কেহ গোপন করিতে চান। কিন্তু নারায়ণা গ্রামে দাদূর জ্যেষ্ঠ পুত্র গরীব দাস যে তাঁহার প্রধান শ্রাদ্ধাধিকারী রূপে দাদূর শ্রাদ্ধোৎসব করেন তাহা সকলসাধুসম্মত। কথিত আছে এইখানে সুন্দরদাস গরীবদাসের ব্যবহারে অসম্মানিত বোধ করিয়া প্রসিদ্ধ যে কয় পংক্তি কবিতা উচ্চারণ করেন, তার প্রথম শ্লোক—

“ক্যা দুনিয়া অস্‌তুত করৈগী ক্যা দুনিয়া কে রূসে সে
সাহিব সেতী রহো সুরখরু আতম বখসে উসে সে॥”

“সংসার স্তুতি করিলেই বা কি আর রুষ্ট হইলেই কি? প্রভুর সঙ্গে রাজী খুসী থাক, সেখান হইতেই আত্মার সম্পদ লাভ হয়।” এ সব কথা সকল ভক্তেরই জানা আছে। দাদূ যে, মুসলমান বংশে জাত সাধক এ কথা চাপা দিয়া তাঁর শুচিতা রক্ষা প্রয়াসী কেহ কেহ বলেন যে দাদূ স্বয়ং রজ্জবজীকে মন্ত্র দেন নাই। দূর হইতে দাদূর মুখে ভগবানের নাম শুনিয়া তিনি ধর্ম্মজীবন লাভ করেন।

ভক্ত রজ্জবজী তাঁহার “সর্ব্বাঙ্গী” গ্রন্থের ভজনপ্রতাপ অঙ্গে লিখিয়াছেন যে সকল ভক্তেরই জন্ম নীচকুলে।

রজ্জবজীকৃত সর্ব্বাঙ্গীর সাধমহিমা অঙ্গে আছে—

ধুনিগ্রভে উৎপন্নো দাদূ যোগেন্দ্রো মহামুনি:
উত্তম জোগধারনং তস্মাৎ ক্যং ন্যাতিকারণম্॥

যোগীন্দ্র মহামুনি দাদূ ধুনিগর্ভে উৎপন্ন হইয়া উত্তম যোগ ধারণ করিলেন তাই বলি জন্ম বা জাতি (খ্যাতি, জ্ঞাতি) কি, সাধনার কোনো হেতু ? আবার সেই গ্রন্থেই দেখিতে পাই—

চারনী মধ্যে উৎপন্নো চর্পটী নাথো মহামুনি ।
তুরক কুলে উৎপন্নো ভড়ঙ্গী নাথো মহামুনি ॥

আরও ঐ গ্রন্থে দেখিতে পাই ভক্ত রজ্জবের জন্ম কুলাল বা কলাল কুলে ।

"জোলাহাগর্ভে উৎপন্নো সাধ কবীর মহামুনি ।"

রইদাস চমারীকুলে, কিতাজনস্ খোরীবংশে, জোগু মহামুনি মীনীবংশে, গুরুহংস ধোপার বংশে, ধনা জটাবী (জাঠ) বংশে ও সেন নাপিতবংশে উৎপন্ন সাধক ভক্ত। রজ্জব কুলাল অর্থাৎ কুম্ভকার বংশে বা কলালকুলে অর্থাৎ মদ্য-বিক্রয়কারী বংশে, নামদেব ছিপী অর্থাৎ বস্ত্ররঞ্জকের বংশে উৎপন্ন । ইত্যাদি—

তেজানন্দ কৃত দাদূপন্থী গ্রন্থে আছে—

মুসলমান মোড়ে ভয়ে জাতিকুলকো খোয় ;
হরিকে আগে হৈঁ খড়ে কবীর দাদূ দোয় ॥

"জাতিপংক্তি হারাইয়া মুসলমান হইলেন সাধু (মোড়ে)। হরির আগে আসিয়া খাড়া হইলেন কবীর, দাদূ এই দুইজন ।"

দাদূ পীর। ভক্ত রজ্জবজী গুরু দাদুকে বহুস্থলেই পীর বলিয়া প্রণতি জানাইয়াছেন। "সিজ্‌দা পূরে পীরকূ" অর্থাৎ পূর্ণ গুরুকে নমস্কার। (রজ্জব, প্রথম স্তুতিঅঙ্গ, ২)

রজ্জব রজা খুদায়কী পারা দাদূ পীর ।
কুল মংজিল মহরম ভয়া দিল নহীঁ দিলগীর ॥

রজ্জব, গুরুদেব অঙ্গ, ঐ

হে রজ্জব, ভগবানের ইচ্ছায় পীর (গুরু) পাইলে দাদূকে, সকল পথের রহস্য হইল প্রকাশিত, চিত্তের আর অবসাদ খেদ রহিল না। তাহা ছাড়া গুরু শিষ্য নিদান নির্ণয় অঙ্গে (৩৬), গুরুমুখ্য কশৌটী অঙ্গে (৯), গুরুগত মত সত্য অংগে (১), গুণ অরিল গুরুদেব কা অংগে (৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১২ ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৯, ৩০), ও অরিল উপদেশ চিতাবনী অংগে (২) রজ্জব গুরু দাদূকে পীরই বলিয়াছেন।

ভক্ত জগন্নাথদাসজী কৃত গুনগঞ্জনামায় আছে—

ধুন্যয়ঁা ঘুজ্যু প্রকটে সুনিয়া সেস মহেস।
তুনিয়া মেঁ দাদূ কইহঁ মুনিয়া মন প্রবেস॥

জগন্নাথজী কৃত গুনগঞ্জনামা ৫৯ অংশ ১৪ সাখী

দাদূর নিজের ভৈরূঁ রাগের ৩৯৭ পদে (ত্রিপাঠীকৃত দাদূ ৫২৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) ত্রিপাঠীজীর পুঁথিতে আছে "তুনিয়া"। দ্বিবেদীজীর পুঁথিতে (১৪৭ পৃঃ ২৪ নং পদ) আছে "ধুনিয়া" তাহাতে আছে "এই ধুনকরের মর্ম্ম কেহ বুঝিল না। কেহ বলিল স্বামী, কেহ বলিল সেখ, কেহ শুনায় রাম নাম কেহ শুনায় আল্লার নাম। অথচ আল্লা বা রামের রহস্য কেহই জানে না। কেহ মনে করে হিন্দু, কেহ মনে করে মুসলমান অথচ কেহ হিন্দু মুসলমানেব খবরও জানে না। দুই শাস্ত্রের দুই পথে চলে বলিয়া এই সব পার্থক্য। যখন এই তত্ত্ব লোকে বোঝে তখনই রহস্য ধরা পড়ে। দাদূ এক আত্মাকেই দেখিয়াছেন, কহিতে শুনিতে অনন্ত অনেক।"

৮। **দাদূর পূর্ণাঙ্গ সাধনা।** কবীরের মত ছিল সাধক হইতে হইলে তাঁহাকে পূর্ণাঙ্গ জীবন যাপন করিতে হইবে। জীবনের সমস্ত সমস্যার উপযুক্ত সমাধান মেলে গৃহস্থের পূর্ণাঙ্গ জীবনে। তাই কবীর ছিলেন গৃহী। একথা এখন কবীরপন্থীরা প্রাণপণে মুছিয়া ফেলিতে চাহেন। দাদূপন্থীদেরও সেই একই অবস্থা। দাদূ ছিলেন গৃহী, অথচ এখন অনেক সাধু মহন্ত মনে করেন তিনি যদি গৃহী হন তবে তো আর মান থাকে না। তাই তাঁরা একথা মানিতেই চান না যে তিনি গৃহী হইয়া সহজ স্বাভাবিক পূর্ণাঙ্গ জীবন যাপন করিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে কেহ কেহ তাঁহাকে ভগবান মনে করিয়া বলেন যে তাঁর আবার জন্ম কি? তাঁর জন্মই হয় নাই। (সুরত থাঙ্গরশেড়ীর মঠের মহন্ত রামপ্রসাদজী ও পরলোকগত মহন্ত পণ্ডিত মোতিরামজী)।

দাদূর সময়কার গ্রন্থাদি দেখিলে দাদূ যে গৃহী ছিলেন সে বিষয়ে আর কোনো সংশয়ই থাকে না। নাভাজীকৃত ভক্তমালে যদিও নানক দাদূ প্রভৃতি ভক্তগণের কোনো নাম নাই তবু সৌভাগ্যক্রমে নাভাজী ছাড়া আরও অনেক ভক্তজনের লিখিত ভক্তমাল আছে। রাঘোজী ভক্ত (রাঘবদাসজী) কৃত

ভক্তমাল চমৎকার গ্রন্থ। তাহাতে বহু সাধুভক্ত সাধক ও ধর্ম্মসাধনার প্রবর্ত্তক গুরুগণের নাম ও জীবনী আছে। এই গ্রন্থের টীকা করেন ভক্ত চতুরদাস। তাঁহার টীকা এমন চমৎকার যে অনেকে মূল গ্রন্থ হইতে এই টীকার সমধিক আদর করেন। তাঁর গ্রন্থে দাদূর জীবনের অনেক খবর পাই। আর খবর মেলে ভক্তজগন্নাথজীকৃত ভক্তমালে—তিনি ভক্ত দাদূর পরিষ্কার পরিচয় দিয়াছেন।—

গুরু দাদূকা সেবক বখানো।
গরীবদাস মস্কীনা জানো॥
নানী মাতা দেনো বাঈ।
ইনহু কহো রম্ম ভজতাই॥
বারো লোদী মাতা বসী।
হব্বা সাধু কহো হরধসি॥

(জগন্নাথজী কৃত ভক্তমাল।)

ইহাতে দাদূর বড় পুত্র গরীবদাস ছোট পুত্র মস্কীনদাসের নাম পাইতেছি। তাঁহার পিতা লোদী ও মাতা বসীবাঈ। তাঁহার স্ত্রীর নাম যে হব্বা ইহাও পাইতেছি। এই হব্বা নামকেই ইংরাজী খ্রীষ্টপন্থীদের শাস্ত্রে 'Eve' নামে দেখি। ইহা মুসলমানদের মধ্যে চল্‌তি নারীর নাম।

৯। ভক্তজনগোপাল বিবৃত দাদূ জীবনী

দাদূর নিজ শিষ্য জনগোপাল তাঁহার 'জীবন পরচী'গ্রন্থে দাদূর জীবনী দিয়াছেন কোন্ বয়সে দাদূর কোন ঘটনা ঘটিয়াছে তাহার সুন্দর উল্লেখ এই জীবন পরচী গ্রন্থে আছে।

বারহ বরস বালপন খোয়ে।
গুরু ভেটে থৈ সম্মুখ হোয়ে।
সাংভর আয়ে সময়ে তীসা।
গরীবদাস জনমে বত্তিসা॥

মিলে বয়ালাঁ আকবর সাহী।
কল্যাণপুর পচাসাঁ জাহী॥
সমৈ গুণসঠা নগর নরাণে।
সাধে স্বামী রাম সমানে॥

গ্রন্থ জনগোপাল কৃত, ২৯ বিশ্রাম ২৬-২৭ চৌপাই।

স্বামী দাদূ জাকো ভাঈ।
বহিন্ হৱা বৈরাগণ বাঈ॥
নানী মাতা দোনো বাঈ।
জনগোপাল ইহ কীরত গাঈ॥

গ্রন্থ জনগোপাল কৃত, ৯ম বিশ্রাম ৭০ চৌপাই।

“দাদূ বাল্যের বার বৎসর কাটিবার পর গুরুর সাক্ষাৎ পান। ৩০ বৎসর বয়সে দাদূ সাম্ভরে আসেন। দাদূর বত্রিশ বৎসর বয়সে জ্যেষ্ঠ পুত্র গরীবদাসের জন্ম হয়। বেয়াল্লিশ বৎসর বয়সে সম্রাট আকবর সাহের সহিত দাদূর আলাপ পরিচয় ঘটে। পঞ্চাশ বৎসর বয়সে দাদূ কল্যাণপুরে যান। উনষাট বৎসর বয়সে দাদূ নরানে আসেন ও ষাট বৎসর বয়সে তিনি ভগবানে প্রবেশ করেন।” হিজরী ৯৯৩ সালে ১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দে আকবর শাহের সঙ্গে তাঁর চল্লিশ দিন ব্যাপী আলাপ ফতেপুর সিক্রীর নিকটবর্ত্তী স্থানে ঘটে। এই আলাপ আলোচনা চমৎকার। ভক্তজনদের মধ্যে তার ও সুন্দর বিবরণ রক্ষিত আছে। রজ্জব, জনগোপাল প্রভৃতি ভক্তগণের মতে দাদূর সঙ্গে আলাপের পরই আকবর সাম্প্রদায়িক হিজিরা সনের বদলে ভগবানের নামে ইলাহী সন নামে নূতন অব্দ প্রচলিত করেন। এবং সম্রাটের নিজ নামাঙ্কিত মুদ্রার বদলে ভগবানের নামে মুদ্রিত মুদ্রার এই সময়েই প্রবর্ত্তিত করেন। এই সময় হইতে যে মুদ্রা তার একপিঠে “অল্লাহু অকবর” অন্য পীঠে “জল্ল জলালুহু” মুদ্রিত। এই সময়ে দাদূর কতিপয় মুসলমান ধর্ম্মবন্ধুর নাম পাই। ভক্ত গাজী জী, ভক্ত রাজিন্দ খাঁ ভক্ত বখনা জী, ও ভক্ত সেখ ফরীদ তাঁর ধর্ম্মজীবনের গভীর অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। দাদূপন্থীরা তাঁদের পন্থের সঙ্গে যুক্ত যে সব সাধক জনের নাম করেন তার

মধ্যে অনেকে মুসলমান। দাদূপন্থী সম্প্রদায় ধর্ম্মসম্বন্ধে বহুভাবের বহু সাধকের বাণী সংগ্রহ করিয়া ব্যবহার করেন। সে সব কথা এই সম্প্রদায়ের গ্রন্থ পরিচয়ে বলা হইবে।

১০। **বিভিন্ন ধর্ম্মের সঙ্গতি**—সংবৎ ১৭৬৬ (১৭০৯ খ্রীঃ) লিখিত একখানি দাদূ সম্প্রদায়ী পুঁথিতে দেখি যে তাতে ১৬৭ জন ভক্তের পদ উদ্ধৃত আছে। তাহা ছাড়া আরও অনেক গ্রন্থের সংগ্রহ আছে। ইহাতে অনেক মুসলমান ভক্তের নাম আছে। অনেকের নামও ক্রমে হিন্দু ভাবাপন্ন হইয়া গিয়াছে তবে কাজী কাদমজী, সেখ ফরীদজী, কাজী মুহম্মদ জী, সেখ বহারদ জী (ইনি নিজেকে "দরবেশ" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন), বখনা জী, রজ্জবজী, প্রভৃতিকে লইয়া কোনো গোল হইবার কথাই নাই। এই সব বিষয়ে "গ্রন্থ ও শিষ্য পরিচয়ে" আরও ভাল করিয়া বলা হইবে।

তখন আমেরে তাঁর কাছে এই সব হিন্দু ও মুসলমান ভক্তগণ আসিয়া ধর্ম্মের পথে সকল মানবের মধ্যে মহা ঐক্য ও পরম সত্য সাধনার দ্বারা উপলব্ধি করিতে চাহিতে ছিলেন তখন সবাই দাদূকে বলিলেন "একি! তুমি দেখি হিন্দু-মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের বেড়া ভাঙ্গিয়া একাকার করিতে চাও? ইহার অর্থ কি?"

দাদূ কহিলেন, "যত মানুষ তত সাধনার বৈচিত্র্য থাকিবে, আর থাকাও চাই। তবে দল বাঁধিয়া সাধনার একটা "ঝুংড্" (crowd, ভীড়) করিয়া যে সম্প্রদায় গড়িয়া তোলা ইহা হইল সত্য উপলব্ধির পথে একটা মহা অন্তরায়। সত্যকে ব্যক্তিগত বৈচিত্র্য দিয়া দেখ, সত্য জনে জনে অপরূপ, নবরূপ, সুন্দর, সরস ও গভীর হইবে কিন্তু "দলবন্ধী" করিয়া সত্যকে খুঁজিলে সত্যকেই হারাই। স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কমল ফোটে বলিয়াই প্রতি কমলের শতদল চমৎকার হইয়া বিকশিত হয়। সহস্র কমলকে যদি আঁটি বাঁধিয়া এক চাপে একভাবে ফুটাইবার চেষ্টা করা যায় তবে সব পিষিয়া পচিয়া ওঠে। প্রতি মানবই অনন্ত-দল-কমল; তাদেরও আবার দল বাঁধিবে? এ কি খেলার কথা?" গুরুর এই উপদেশ রজ্জব পরে চমৎকার করিয়া তাঁহার রচনায় রাখিয়া গিয়াছেন।

দাদূ বলেন, "আমি হিন্দুও বুঝিনা মুসলমানও বুঝিনা; এক তিনিই

সকলের স্বামী, দ্বিতীয় আর তো কাহাকেও দেখি না, কীট-পতঙ্গ-সর্পাদি সর্ব্বযোনিতে, জলে, স্থলে, সর্ব্বত্র তিনিই সমাহিত। পীর, পৈগম্বর, দেব, দানব, মীর, মালিক, মুনিজন, এসব দেখিয়া মুগ্ধ হইবে কে? তিনিই কর্ত্তা তাঁহাকে চিনিয়া লও, কেহ যেন ইহাতে ক্রোধ না করে। হৃদয়ের আরসী মার্জ্জিত করিয়া রাম-রহিম প্রভৃতি সসীম স্বরূপ ধুইয়া ফেল। পাইয়াছ যে ধন তাহা কেন হারাও, স্বামীরই কর সেবা। হে দাদূ, হরিকেই তুমি জপ করিয়া লও, জনমে জনমে যে তোমার পরম পুরুষ॥"

দাদূ, রাগ ভৈরোঁ, পদ ৩৯৬।

"কেহ বলে স্বামী কেহ বলে সেখ, এই ধুনকরের মর্ম্ম কেহ বুঝিল না।"

দ্বিবেদীর দাদূ দয়াল কা সবদ, রাগ ভৈরোঁ, পদ ২৪।

ভক্ত রজ্জবের বাণীর মধ্যে পাই সকলের সঙ্গে যুক্ত হইবার জন্য ইহাঁদের কতদূর চেষ্টা ছিল। হিন্দুরা তবু একটু যদিবা বুঝিতেন, মুসলমানরা এই উদারতা মানিতেই চাহিতেন না। রজ্জবের গুরুর কাছে হাত জুড়িয়া প্রার্থনা "মুসলমানের সঙ্গে মিলাও।"—

"হাথা জোড়ী গুরুহুঁসূঁ মুসলমিনসূঁ মিলাহি।"

গুরু শিষ্য নিদান নির্ণয় অংগ, ২৪।

যখন আমরা জয়পুরে ছিলাম তখন ডাক্তার দলজঙ্গ সিংহ খেমকা মহাশয় একখানি পুরাতন হস্তলিখিত পুঁথি হিমালয় গঢ়ৱালবাসী শ্রীযুক্ত তারাদত্ত গৈরালা মহাশয়কে দেন। ডাক্তার খেমকার ও স্বদেশ গঢ়ৱাল। সেই পুঁথিতে দাদূ ও কবীর প্রভৃতি ভক্তের বহু বাণী আছে। তাহাতে কবীরের যে সব বাণী আছে তাহা প্রচলিত কবীরবাণী হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের।

দাদূর প্রণালীতেই এই কবীরবাণীগুলি সাজান এবং তাহার মর্ম্মও দাদূর বাণীর মত। গৈরালা মহাশয় গঢ়ওয়ালে গিয়া এই পুঁথির রহস্য ভেদ করিতে না পারিয়া কিছুদিন হইল আমাকে একপত্র লিখিয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা, সকলের সম্মিলিত চেষ্টায় এই সব রহস্যের মীমাংসা হউক। যাহা হউক, এই সব লইয়া আলোচনা করিলে মধ্যযুগের ভক্তদের সম্বন্ধে অনেক প্রাচীন অটল সংস্কারও টলিতে বাধ্য হইবে।

মহামহোপাধ্যায় সুধাকর দ্বিবেদী মহাশয় বলেন, "নীচকুলে জন্মিয়াছিলেন

বলিয়াই দাদূ সংস্কৃত ছাড়িয়া সর্ব্বসাধারণের জন্য ভাষাতে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছেন। সর্ব্বসাধারণের জন্য লিখিতে গিয়াই তুলসীদাসকে রামায়ণ ভাষায় লিখিতে হয়। হীনবংশে জন্মিলে দোষ কি? ভক্তদের জীবনী আলোচনায় দেখা যায় অনেকেই নীচকুলের। সাধনাতে জাতিবিচারে লাভ কি? সাধনার বলে সত্যকে লাভ করিয়া নীচকুলজাত ভক্তও সকল জগতের পূজ্য হন। ডোমের ঘরে জন্ম হইলেও ভক্ত শঠকোপ রামানুজ মতের সাধনায় সকলের শিরোমণি হইয়াছিলেন। সাধকের জাতি বা কুল যাহাই হোক না কেন শুধু নিজ সাধনার বলেই তিনি সর্ব্বজনের পূজনীয় হন।"

সুধাকর দ্বিবেদী, দাদূ দয়াল কা সবদ, ভূমিকা, ২ পৃষ্ঠা।

১১। **বিপক্ষদের কূট আঘাত ঃ** দাদূ যে নীচজাতির লোক ছিলেন তাহা লিখিতে গিয়া মহামহোপাধ্যায় দ্বিবেদী মহাশয় সেইযুগের একটা সুন্দর চিত্র প্রকাশ করিয়াছেন। কথাটা জানিবার মত বলিয়া এখানে উল্লেখ করা গেল। দাদূকে কেন সবাই দয়াল বলিত তারও একটি হেতু ইহাতে জানা যায়।

"তুলসীদাস, কমাল ও দাদূ ইহাঁরা ছিলেন আকবরের সময়ের লোক। ইহাঁদের মধ্যে তুলসীদাস ছিলেন ব্রাহ্মণ; আর কমাল, দাদূ নীচকুলে উৎপন্ন সাধক। ব্রাহ্মণ তুলসীদাস ছিলেন সগুণ রামের উপাসক, আর এই নীচজাতীয় সাধকেরা ছিলেন নির্গুণ বিশিষ্ট পরব্রহ্মবাদী।" কাজেই ইহাঁদের মধ্যে একেবারে মূলগত প্রভেদ ছিল। "ইহাঁরা নীচজাতীয় বলিয়া তুলসীদাস মনে মনে ইহাঁদিগকে ঘৃণা করিতেন, কিন্তু যোগসাধনাদির বলে ইহাঁরা লোকের এমন সম্মানভাজন ছিলেন যে তুলসীদাস প্রত্যক্ষরূপে ইহাঁদের নিন্দা করিতে সাহস করেন নাই। তাই তাঁহার রচিত রামচরিতমানসে (রামায়ণে) গ্রন্থারম্ভে খলের বন্দনা উপলক্ষ্যে বক্রোক্তিতে ইহাঁদের নিন্দা করিয়াছেন।

বহুরি বন্দি খলগণ সতি ভাএ।
জে বিনু কাজ দাহিনে বাঁএ ॥১
হরি হর যশ রাকেশ রাহুসে।
পর অকাজ ভট সহস বাহুসে ॥৩

তুলসীদাস কৃত রামায়ণ, বালকাণ্ড, ৪র্থ দোহা।

"এখন আমি দুষ্টলোকসমাজের বন্দনা করি, যাঁরা বিনা প্রয়োজনে ডাহিনে বাঁয়ে থাকেন। যাহাঁরা হরি ও হরের যশোরূপ পূর্ণচন্দ্রের পক্ষে রাহুর মত ও পরের কার্য্য নষ্ট করিতে যাঁহারা সহস্রবাহুর মত।"

ভলেউ পোচ সব বিধি উপজাএ।
গণি গুণ দোষ বেদ বিলগাএ॥
সুখদুখ পাপপুণ্য দিনরাতী।
সাধু অসাধু সুজাতি কুজাতী॥
দানব দেব ঊঁচ অরু নীচু।
অমিয় সজীবন মাহুর মীচু॥
কাশী মগ সুরসরি কর্মনাসা।
মরু মালব মহীদেব গরাশা॥

তুলসী, রামায়ণ বালকাণ্ড দোহা ৬।

"ভালমন্দ দুই-ই বিধি সৃষ্টি করিলেন, গুণ ও দোষ অনুসারে বেদ সব ভাগ করিয়া দিলেন—সুখ আর দুখ, পাপ ও পুণ্য, দিন ও রাত্রি, সাধু ও অসাধু, সুজাতি ও কুজাতি, দেব ও দানব, উচ্চ ও নীচ, জীবনপ্রদ অমৃত ও প্রাণহন্তা বিষ, কাশী ও মগধ, গঙ্গা ও কর্ণনাশা, মরুভূমি ও মালব, ব্রাহ্মণ আর কসাই।"

কর সুবেষ জগ বংচক জেউ।
বেষ প্রতাপ পূজিয়ত তেউ॥
উঘরহিঁ অংত ন হোয় নিবাহূ।
কালনেমি জিমি রাবণ রাহূ॥

"সাধুর বেশ ধরিয়া যে খল জগতকে বঞ্চনা করে সে বেশের প্রতাপে পূজিত হয় বটে কিন্তু শেষ কালে সবই ধরা পড়িয়া যায় ও তখন কালনেমি রাবণ ও রাহুর মত তাহার বঞ্চনা ও টেকে না।"

১২। **দাদূর ক্ষমা** ঃ "তুলসীর এই সুচতুর বক্রোক্তি-নিন্দার কথা লোকে আসিয়া দাদূকে বলিত। কিন্তু দাদূ ছিলেন মহাপ্রেমিক, প্রত্যুত্তরে তিনি কোন নিন্দাই করিতেন না। দাদূ বুঝিতেন, তাঁর উপদেশ প্রাচীন সংস্কার প্রচলিত ধর্ম্মমত বর্ণাশ্রম প্রভৃতিতে আঘাত করিতে পারে

তাই তুলসীদাস অসহিষ্ণু হইয়াছেন। বিশ্বজগতের সকলের উপরেই ছিল দাদূর অপরিমেয় প্রেম, শত আঘাত পাইলেও প্রতি-আঘাত করা ছিল তাঁহার পক্ষে অসম্ভব।

এইরূপ নিন্দায় সাময়িকভাবে লোকে খুবই বিচলিত হইয়াছিল কিন্তু অনেক পরে লোকে যখন তাঁহার মহত্ত্ব বুঝিল তখন তাহাদের শ্রদ্ধা আরও গভীর হইল। সর্ব্ব-আঘাত-সহিষ্ণু-প্রেম ও সর্ব্ব-অপমান-জয়ী-মহত্ত্বের জন্য তাঁহাকে নাম দিল "দাদূ-দয়াল"।"

দ্রষ্টব্য—দাদূদয়াল কা সবদে মহামহোপাধ্যায় ৺সুধাকর দ্বিবেদীর
ভূমিকা ২—৩ পৃষ্ঠা।

নিন্দ্যা নাম ন লীজিয়ে সুপিনৈহীঁ জিনি হোই।
না হম কহৈঁ ন তুম সুনৌঁ হম জিনি ভাষৈঁ কোই॥

দাদূ, নিন্দ্যা অঙ্গ, ৫।

দাদূ কহিলেন, "স্বপনেও কেহ নিন্দার নাম নিওনা। আমি যেন কোনো নিন্দাই না করি। তুমিও যেন কোনো নিন্দাই না শোনো ইত্যাদি।"

দাদূ তাঁর জরণা অঙ্গে একটি চমৎকার কথা বলিতেছেন। দাদূ ভগবানকে প্রশ্ন করিতেছেন, "হে অপার পরমেশ্বর, তুমি যে জীবের সব অপরাধ নিঃশব্দে উপেক্ষা কর, ইহার হেতু কি?" ভগবান উত্তর করিলেন, "যেন আমার এই ক্ষমা দেখিয়া সকল সাধকজন এই ক্ষমা-মতি শিক্ষা করিতে পারেন, এইজন্য।"

দাদূ তুম্হ জীরোঁ কো অরগুণ তজে, সু কারণ কৌঁণ অগাধ।
মেরী জরণা দেখি করি, মতি কো সীখৈ সাধ॥

দাদূ, জরণা অঙ্গ, ৩১।

১৩। **দাদূর সঙ্গে সুন্দরের যোগ ঃ** দাদূর প্রতি লোকের শ্রদ্ধা কত গভীর হইয়াছিল তাহা তাঁহার ভক্ত ও শিষ্যদের লেখায় বুঝিতে পারি। ১৬০২ খ্রীষ্টাব্দে দাদূ যখন দ্যৌসা নগরীতে যান তখন বূসর গোত্রীয় ভক্ত পরমানন্দ সাহ আপন সাত বছরের পুত্রকে তাঁহার চরণে সমর্পণ করিলেন। মিশ্রবন্ধুবিনোদগ্রন্থে ভুলক্রমে বূসরকে ঢূসর লেখা হইয়াছে

(দ্রঃ সুন্দরসার-নাগরী প্রচারিণী সভা, ১০ পৃঃ।) দাদূ অতিশয় প্রীতিভরে বালকের মাথায় হাত দিয়া স্নেহের সহিত বলিলেন, "হে সুন্দর, তুমি আসিয়াছ।" এই হেতুতেই পরিশেষে এই বালকের নাম সুন্দরদাস নামে খ্যাত হইয়া গেল। ইনি পরে একজন খুব বড় পণ্ডিত ও বেদান্তবেত্তা হন। স্বকীয় "গুরুসম্প্রদায়" গ্রন্থে সুন্দরদাস দাদূর সহিত তাঁহার প্রথম সমাগমটি অতি সুন্দররূপে বর্ণনা করিয়াছেন। পর বৎসর নারায়ণা গ্রামে দাদূ পরলোক গমন করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র ও শিষ্য গরীবদাস পিতার শ্রাদ্ধমহোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন করেন অন্যান্য শিষ্যগণের সঙ্গে বালক শিষ্য সুন্দরদাসও সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

দাদূর সম্প্রদায়কে ব্রহ্মসম্প্রদায় বলে, যেহেতু দাদূ পরব্রহ্মের উপাসক ছিলেন। ইহাঁরা বাহ্য মূর্ত্তি প্রভৃতি পূজার বিরোধী বলিয়াও ইহাদিগের দলকে সকলে ব্রহ্মসম্প্রদায় বলিত (পুরোহিত হরিনারায়ণ, সুন্দরসার ১৩ ও ৯৫ পৃষ্ঠা।) পরে মাধ্বদের ব্রহ্মসম্প্রদায়ের সঙ্গে নামের গোলমাল হয় বলিয়া ইহার নাম রাখা হইল পরব্রহ্ম-সম্প্রদায়।

দাদূর জন্মস্থান সম্বন্ধে শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রসাদ প্রভৃতির মতভেদ থাকিলেও মহামহোপাধ্যায় দ্বিবেদী মহাশয় দাদূর জন্মকাল সম্বন্ধে অন্য সকলের সঙ্গে একমত। তাঁহার মতে ১৫৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ফাল্গুন মাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে বৃহস্পতিবারে দাদূর জন্ম হয় ও ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দে দাদূ মারা যান।

১৪। **জীবনীর সার নিষ্কর্ষ ;** মোটমাট দাদূর জীবনী সম্বন্ধে যাহা পাওয়া যায় তাহা এই :—

১৫৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ফাল্গুন মাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে বৃহস্পতিবারে দাদূর জন্ম। কেহ কেহ বলেন তাঁর জন্ম আহমদাবাদে, কেহ কেহ বলেন, তাঁর জন্ম কোথায় তাহা জানা যায় না, কেহ বলেন তাঁর জন্মই হয় নাই, আবার সুধাকর দ্বিবেদী ও কাশীর অনেক ভক্তের মতে তাঁর জন্ম কাশীর নিকটস্থ জৌনপুরে।

জনগোপালের মতে ১২ বৎসর বয়সেই তিনি গুরু পান। সুরতের মহন্ত মোতিরাম বলেন দাদূর আবার গুরু কি, তিনিই তো স্বয়ং ঈশ্বর। অনেক সাধু মহন্তের এই মত, তবু বলেন লীলা হেতু তাঁর গুরু স্বীকার করা।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে কোনো কোনো মতে কবীরের শিষ্য কমালের পর জমাল, বিমল, বুঢ্ঢন (সুন্দরদাসের "বৃদ্ধানন্দ।")। এই বুঢ্ঢনের শিষ্য দাদূ। কথাই আছে—

সাংভরমেঁ সদগুরু মিল্যা দী পানকী পীক।
বুঢ্ঢন বাবা যূঁ কহী জ্যূঁ কবীরকী সীখ॥

Garcin De Tassy তাঁর হিন্দী ও হিন্দুস্থানী সাহিত্যের গ্রন্থে এই প্রবাদ অনুসারে ধারা মানিয়াছেন, কিন্তু অনেকেই ইহা মানেন না।

দাদূ যে নীচ জাতিতে জন্মগ্রহণ করেন তাহাতে কোনো সংশয়-ই নাই। যদিও তাঁর সম্প্রদায়ের সাধু-মহান্তরা অনেকে প্রমাণ করিতে চান যে তিনি নাগর ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। অধিকাংশ মতেই তিনি মুসলমান ধুনকরের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। সে সব প্রমাণ পূর্ব্বেই দিয়াছি। দ্বিবেদীজীর মতে তিনি যে কূপ হইতে জল-তুলিবার-মোট-সেলাই-করা মুচী-বংশে জন্মগ্রহণ করেন ইহাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। বিশেষ করিয়া রবিদাসী সম্প্রদায়ের সাধুদের অনেকে ইহাই বলিতে চান। এ বিষয়ে তাঁদের সম্প্রদায়ে একটী চমৎকার গল্প আছে—যদিও দাদূপন্থী সাধুদের মধ্যে এ গল্পটি পাই নাই। গল্পটি হইল দাদূ কেমন করিয়া তাঁহার গুরুকে পাইলেন।

১৫। **কমাল-দাদূ যোগ।** একদিন অপরাহ্নকাল, বৃষ্টি হইতেছে, দাদূর মন কি জানি কেন বিষণ্ণ। দাদূ মাথা নীচু করিয়া মোটের চামড়া সেলাই করিতেছিলেন। এমন সময় কবীরের পুত্র ভক্তশ্রেষ্ঠ কমাল আসিয়া ঐ কুটীরের একপাশে ছাঁচের নীচে আশ্রয় নিলেন। কুটীরের বারান্দায় উঠিতে তিনি চাহেন না, কারণ সেখানে দাদূ বসিয়া সেলাই করিতেছিলেন; কমাল গেলে যদি তাঁর কাজে বাধা হয়, গরীব লোকের অন্নে যদি বিঘ্ন ঘটে। কমাল অতিশয় নিঃশব্দে একপাশে ছাঁচের নীচে দাঁড়াইলেও দাদূর কেমন মনে হইল কেহ কোথাও দাঁড়াইয়া আছে। তিনি কাজ ছাড়িয়া উঠিয়া বাহিরে আসিয়া ছাঁচের নীচে অবস্থিত ভক্তশ্রেষ্ঠ কমালকে বলিলেন—"বাবা! মুচীর ঘর বলিয়া কি আপনার আশ্রয় নিতে আপত্তি?" কমাল বলিলেন, "আমি হরির দাস, আমার কি আর বাবা উচ্চ নীচ জাতি বিচার থাকিতে পারে?" দাদূ বলিলেন, "তবে আপনি বারান্দায় উঠিয়া আসুন।" কমাল

বারান্দায় উঠিতেই দাদূ তাঁহাকে মোট সেলাই করার জন্য রাখা চামড়া পাতিয়া বসিতে দিলেন। কমাল বসিলে হঠাৎ দাদূ চাহিয়া দেখেন কমালের চক্ষু বাহিয়া জলধারা পড়িতেছে। দাদূ ইহা দেখিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া মনে করিলেন যে হয়তো চামড়াতে বসিতে দেওয়ায় সাধুজনের মনে আঘাত লাগিয়াছে। তিনি বলিলেন, "বাবা, ইচ্ছা করিয়া আপনার মনে আঘাত দিই নাই। আমি অতিশয় গরীব মুচী, বসিতে দিবার আমার আরতো কিছুই নাই।" ইহা শুনিয়া কমাল বলিলেন, "এই চামড়া পাতিয়া বসিতে দিয়াছ বলিয়া যে আমার নয়নে ধারা বহিয়াছে তা নয়। চামড়া ছাড়া তো তোমার বসিতে দিবার আর কিছুই নাই। এই যাহা তোমার আছে তাই যে অকৃত্রিম প্রেমে সহজে নম্রভাবে আমাকে বসিবার জন্য দিয়াছ তাহা দেখিয়া আমার নিজের অন্তরের একটি কথা মনে হইল। আমার জীবন তো এখনো এমন সহজ হয় নাই। কতক্ষণ বা তোমার ছাঁচতলায় আমি দাঁড়াইয়া আছি? আমার প্রভু আমার জীবনের দ্বারপ্রান্তে কত যুগযুগান্তর ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। যাহা আছে তাহাই পাতিয়া দিয়া যে তাঁহাকে বসিতে বলিব এমন সহজ নম্রতা এখনো জীবনে আসে নাই। অহঙ্কারের গাঁঠ আছে কি না বাবা! তাই মন সহজ হয় না। তোমার এই সহজ ভাব দেখিয়া আমার মনে হইতেছিল, হায় আমারও যদি জীবন এমন নিরহঙ্কার, এমন নম্র, এমন সহজ হইত, তবে কি আজও আমার প্রভুকে বাহিরেই দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়? কবে বা বসিবার মত আসন তাঁকে দিতে পারিব, কবে বা সাধনা তেমন পূর্ণ হইবে? সাধনার জোর নাই অথচ অহঙ্কারের বাঁক আছে, গাঁঠ আছে! কবে অহঙ্কার দূর হইবে, বাঁক-গাঁঠ সব ঘুচিবে, প্রভুকে আমার বসিতে দিতে পারিব? একথা মনে হওয়ায় মনে বড় ব্যথা লাগিতেছিল।"

দাদূ ছিলেন নিরক্ষর দরিদ্র মুচী, তবু হৃদয় ছিল সরস ও সহজ। তিনি কমালের কথা সম্পূর্ণ না বুঝিলেও একেবারে কিছুই যে বুঝিলেন না তা নয়। দাদূ বলিলেন, "তোমার প্রভু কে?" কমাল বলিলেন, "সবার প্রভু যিনি তিনিই আমারও প্রভু।" দাদূ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি কি আমারও প্রভু? আমার জীবনের বাহিরেও তিনি দাঁড়াইয়া আছেন?" কমাল বলিলেন, "সবারই তিনি স্বামী, সকলের জীবনের বাহিরে তিনি দাঁড়াইয়া; শুদ্ধ হইয়া

তাঁহাকে দেখিতে হইবে, প্রেমে সহজ হইয়া তাঁকে বরণ করিয়া বসাইতে হইবে—এই হইল মানব জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ও সাধনা।”

বৃষ্টি থামিয়া গেল, সন্ধ্যা আসিতেছিল, দাদূকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কমাল আপন পথে বাহির হইয়া গেলেন। দাদূ আবার কাজে বসিলেন, তাঁর আর তেমন করিয়া কাজে মন বসিল না। মনে হইতে লাগিল—“জনমমরণের তাঁর প্রভু তাঁর জীবনের বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন, শুদ্ধ হইয়া তাঁকে দেখিতে হইবে, প্রেমে সহজ হইয়া তাঁকে বসাইতে হইবে।”

দাদূ দিনের পর দিন কাজে বসেন। কাজ আর অগ্রসর হয় না, কেবল কমালের সেই বাণীই মনের মধ্যে উজ্জ্বল হইতে হইতে সহজ হইয়া আসিল। দাদূ তখন কমালকে খুঁজিতে বাহির হইলেন। কমালের দেখা পাইলে দাদূ বলিলেন, “বাবা, মন ব্যাকুল করিয়াছ, এখন পথ দেখাইয়া দাও, কাজে তো আর মন বসিতে চায় না।” কমাল বলিলেন, “যখন তাঁর দেখা পাইবে তখন কাজে আনন্দ পাইবে, তখন বিশ্রাম মধুময় হইবে, কর্ম্ম অমৃতময় হইবে, তাঁর সঙ্গের দ্বারা সর্ব্বত্র সব শূন্যতা পূর্ণ হইবে।” দাদূ বলিলেন, “বাবা, মন বড় ব্যাকুল হইয়াছে, সেই পথ দেখাইয়া দাও।”

কমাল তাঁহাকে কিছু গভীর উপদেশ দিয়া সকল সংশয় দূর করিয়া সব সঙ্কট সহজ করিয়া বলিলেন, “তিনিই প্রভু, তিনিই গুরু, আজ যে সব কথা শুনিলে তাহাতে তোমার নিজেরই মন একটু অগ্রসর হইয়াছে। যতই ব্যাকুলতা বাড়িবে ক্রমে ক্রমে উপায়ও ততই ফুটিয়া উঠিবে। এখন যে অন্ধকার দেখিতেছ তাহার মধ্য দিয়াই গুরু দেখা দিবেন, তাঁর স্পর্শে সকল বাধা সহজ হইবে।” কমালের এই উপদেশ ভক্ত গভীর সাধক-জনের মধ্যে কোথাও কোথাও গান করা হয়। এই উপদেশকে তাঁরা বলেন “মরমগহরা।” এই আলাপের ঐতিহাসিক ভিত্তি কতটা আছে বলা কঠিন তবু এখানে উল্লেখ করা গেল। দাদু এই ভাবে সাধনার জন্য ব্যাকুল হইলে সেই পরমগুরুকে পাইলেন। তাঁহার কথাই দাদুর সকল বাণীর প্রথমবাণী—

“গুরুঅঙ্গের” প্রথম শ্লোক—

“গৈব মাঁহি গুরুদেব মিলা পায়া হম পরসাদ।
মস্তক মেরা কর ধরা দক্ষ্যা হম অগাধ॥”

"প্রকাশ হীন তিমিরের মধ্যে গুরু মিলিলেন, তাঁর প্রসাদ আমি পাইলাম। আমার মাথায় তিনি হাত রাখিলেন, আমি অগাধ দীক্ষা পাইলাম।"

এই "দক্ষ্যা" কথাটি দ্বিবেদী মহাশয় "দেখা" লিখিয়াছেন। রাজপুতানার অধিকাংশ পুস্তকেই "দক্ষ্যা" আছে, ত্রিপাঠী মহাশয় ও "দক্ষ্যা" পাঠই গ্রহণ করিয়াছেন। "দক্ষ্যা"র বানান তাঁর "দষ্যা"; পুঁথিতে "খ" ও "ক্ষ" স্থানে "ষ" প্রায়ই আছে। তিনিও দীক্ষা অর্থ ই গ্রহণ করিয়াছেন।

১৬। **নব ভক্তি ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক রামানন্দ ঃ** সন্তসম্প্রদায় মতে কথা আছে যে রামানন্দের পূর্ব্বে উত্তর ভারতে জ্ঞান ছিল কিন্তু ভক্তি নিষ্প্রভ হইয়া আসিয়াছিল। দক্ষিণ দ্রাবিড়দেশে তখন ভক্তি ছিল কিন্তু সেই ভক্তি ছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম্যদেবতা ও জনপদ-'অম্মা' বা গ্রাম-দেবীদের আশ্রয় করিয়া; বড় জোর তাহা সর্ব্বশ্রেণীর পূজিত কোনো দেবদেবীর আশ্রয় করিত। এই দুঃখ ঘুচিল যখন দক্ষিণ হইতে গুরু রামানন্দ আসিয়া দক্ষিণের ভক্তির সঙ্গে উত্তর ভারতে জ্ঞানের গভীরতা ও বিশালতার যোগসাধন করিলেন। তিনি দক্ষিণের ভক্তি উত্তরে আনিলেন কিন্তু ক্ষুদ্র আচার বিচার ও পরিমিত দেবদেবীবাদ আনিলেন না। আর তার পর উত্তর ভারতে যত জ্ঞান ও ভক্তির যোগসাধনা আসিল সবই কোনো না কোনো মতে এই ধারার সহিত সংস্পৃষ্ট। সন্তদের মধ্যে কথা আছে :—

"ভক্তি দ্রাবিড় উপজী লায়ে রামানন্দ
প্রগট কিয়ো কবীরনে সপ্তদ্বীপ নৌখংড।"

পরমানন্দ রচিত কবীর মনস্থরে উদ্ধৃত।

অর্থাৎ ভক্তি জন্মিয়াছিল দ্রাবিড়দেশে, এদেশে আনিলেন তাহাকে রামানন্দ, কবীর তাহা সকলের সম্মুখে ধরিলেন, এমন করিয়াই ভক্তি সপ্তদ্বীপ নবখণ্ড পৃথিবীতে প্রচারিত হইয়া গেল।

১৭। **বৃদ্ধানন্দ-কথা ঃ** পরমানন্দ ধৃত গোপালদাস দাদূপন্থী (ভক্তজনগোপাল), ২য় বিনয় বচনে দেখি "দাদূর যখন এগারো বৎসর বয়স অতীত হইতেছে, তখন একদিন বেলা তৃতীয় প্রহর অতীত, সন্ধ্যা নিকটবর্ত্তী, ছেলেদের মধ্যে তখন তিনি খেলিতেছিলেন। এমন সময় ভগবান বৃদ্ধ (বুঢ্ঢা) রূপ হইয়া দর্শন দিলেন।"

তীজে পহর নিকট ভঈ সাঁঝা।
খেলত রহে সো লড়কন মাঁঝা॥
বীতে জবহি একাদশ বয়স্থূ।
বুঢ়ারূপ দিয়ো হরি দরস্থূ॥

ঐ পৃঃ ৬৩০।

তিনি আসিয়া ভিক্ষা চাহিলে দাদূ তাঁহাকে পয়সা আনিয়া ভিক্ষা দিলেন। সেই বৃদ্ধ পান খাইয়া দাদূর মুখে পিক ফেলিয়া অন্তর্হিত হইয়া গেলেন।

সাংভরমেঁ সদগুর মিলা দী পানকী পীক।
বুঢ়ঢন বাবা য়ূঁ কহী জ্যুঁ কবীরকী শীখ॥

"সাম্ভরে সদগুরু মিলিল তিনি পানের পীক মুখে দিলেন কবীরের যেমন ধর্ম্মমত সেইভাবে বুঢ়্ঢন বাবা তাঁহাকে শিক্ষা দিয়া গেলেন।" তখন দাদূ ছোট, তাই গুরু তাঁকে সব কথা বলিলেন না। অনেক পরে যখন দাদূর আঠারো বৎসর বয়স, তখন আবার আসিয়া বুঢ়্ঢন দাদূকে পূর্ণ দীক্ষা দেন ও তার পরই দাদূ নানাদেশ ভ্রমিতে বাহির হ'ন।

কিন্তু প্রথম যখন তাঁহার গুরুর সঙ্গে দেখা তখন দাদূ ছেলে মানুষ। তিনি বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "হে দেব, তুমি যে মুখামৃত দিয়া আমার জাতি মারিলে, লোকের মধ্যে তোমার জাতি কি বলিয়া খ্যাত?" বুঢ়্ঢন বলিলেন, "আমার না আছে জাতি না আছে পাঁতি, আমাকে পাইতে হইলে প্রেম ছাড়া কোনো পথ নাই। যদি সাধনে কেহ পায় তো পায়।"

দাদূ পুছে দেব তুম কৈনসা জাত কহায়।
বুঢ়া জাতি ন পাঁতি হৈ প্রীতিসে কোই পায়॥

(কবীর মনস্থুর পৃঃ ৬৩০)।

১৮। **দাদূর পর্য্যটন ও ধর্ম্মের নানা স্তর অতিক্রম :** পরম পুরাতন বুঢ়্ঢন যিনি আসলে নিরঞ্জন রায়, তিনি সাত বৎসর পরে আবার দাদূকে দরশন দিলেন। এই সাত বৎসর দাদূ ঘরেই ছিলেন, গুরু নিরঞ্জন তাঁহাকে উপদেশ দিয়া অন্তর্হিত হইলে দাদূ আত্মজ্যোতিতে সূর্য্যের ন্যায় দীপ্ত হইয়া বিশ্বজগতে বাহির হইলেন।

রহে জো সাত বরস ঘর মাঁহী।
ফির দিয়ো দরশ নিরঞ্জন রাই॥
কর উপদেশ ভয়ে অন্তরধানা।
তব স্বামী প্রগটে জ্যোঁ ভানা॥

(কবীর মনস্থর পৃষ্ঠা ৬৩০)।

তারপর দাদূ নানাস্থান ঘুরিয়া সাম্ভরে আসিলেন। তাঁর প্রেম দিনে দিনে বাড়িতে লাগিল ও প্রীতি-বিরহ বাড়িয়াই চলিল।

পুনী সামেরকো কিয়া পয়ানা।
বাঢ়ী প্রীত বিরহ অধিকানা॥

(মনস্থর ধৃত জীবন পরচী)।

তার পর তাঁর সাধন বলে পরব্রহ্মের সঙ্গে তাঁর ধ্যান যুক্ত হইয়া গেল ও প্রচ্ছন্ন-জ্যোতি তাঁর অন্তরে লাগিয়া গেল।

পরব্রহ্মমেঁ তাড়ী লাগী।
গুপ্ত জ্যোতি উর অংতর লাগী॥

(মনস্থরধৃত জীবন পরচী পৃঃ ৬৩০)।

তখন হইতে তিনি ব্রহ্মের সমাধির পথেই চলিলেন, তখন হইতেই তিনি সাধু কবীরের প্রবর্ত্তিত পথেই চলিতে লাগিলেন। মুসলমান সব পদ্ধতি ও সেইভাবে সব অন্বেষণ তিনি ছাড়িয়া দিলেন আর হিন্দুদের আচার হইতেও দূরে রহিলেন।

নির্গুণ ব্রহ্মকী কিয়ো সমাধূ।
তবহী চলে কবীরা সাধূ॥
তুর্ককী রাহ খোজ সব ছাড়ী।
হিন্দুকে করণীতেঁ পুনি ন্যারী॥

(মনস্থরধৃত জীবন পরচী পৃঃ ৬৩০)।

দাদূ "ষট্দর্শনের" মধ্যে সত্যের সাক্ষাৎ পাইবার আশা ছাড়িলেন, তাই ষড়্দর্শনেব সঙ্গ ত্যাগ করিলেন। দিবানিশি তিনি ভগবানের রঙ্গে রহিলেন রঙ্গিয়া। তিনি স্বাংগ, (বাহিরের সাজ সজ্জা) ভেখ, সম্প্রদায়, বুদ্ধি ও

সাম্প্রদায়িক পংথ মানিলেন না, গ্রহণ করিলেন না। এক পূর্ণব্রহ্মকেই সত্য বলিয়া জানিলেন। দেব, দেবী, পুজাপাঁতি, তীর্থ ব্রতাদির সেবা ও জাতি প্রভৃতির বিচার মানিলেন না। হিন্দু মুসলমান মত লইয়াও কোনো বাদ বিবাদ করিলেন না। (অথচ নিজের জীবন ও সাধনার দ্বারাই) সবার সকল প্রশ্নের উত্তর সহজেই তিনি দিয়া গেলেন—

ষট দর্শনমেঁ নাহিঁ সংগা।
নিসদিন রহে রামকে রংগা॥
স্বাংগ ভেখ পছ পংথ ন মানী।
পূরণ ব্রহ্ম সত্য করি জানী॥
দেবী দেব ন পূজা পাতী।
তীরথ বরত ন সেৱা জাতী॥
হিন্দু তুরক ন ঝগড়া কীন্হো।
সব কাহুকো উত্তর দীন্হো॥

(মনস্থরধৃত জীবন পরচী পৃঃ ৬৩০)।

চন্দ্রিকাপ্রসাদ প্রভৃতি মানেন তাঁহার "অগাধ" গুরুকে। দ্বিবেদীজী মানেন কমালকে। প্রাচীন মরমী সন্তরা মানেন তাঁর গুরু ব্রহ্ম নিরঞ্জন রায়।

১৮ বৎসর বয়সের পর দাদূ নানা দেশে ভ্রমণ করিতে বাহির হ'ন। সেই সময় তিনি কাশী, বিহার, বাংলাদেশ পর্য্যন্ত আসিয়া সেই সব স্থানের সহজ মত, শূন্যবাদ, নিরঞ্জনবাদ, ধর্ম্মবাদ প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত হ'ন। এমন কি কথিত আছে তিনি পূর্ব্বদেশের নাথপংথের সম্প্রদায়েও নাকি প্রবেশ করিয়াছিলেন। চন্দ্রিকাপ্রসাদ ত্রিপাঠী মহাশয়ের সঙ্গে যে আমার আলাপ হয় তাহাতেও দাদূর নাথ-ধর্ম্মে প্রবেশের কথা তিনি বলেন। ত্রিপাঠীজী বলেন, দাদূর সেই সময় নাম হয় "কুম্ভারী পাৱ।" 'কুম্ভারী পাৱ' নাথযোগীদের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ পুরাতন নাম। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় যে বৌদ্ধগান ও দোঁহার ভূমিকায় ৭৬টি সিদ্ধের নাম দিয়াছেন তাহাতেও প্রাচীনকালের এক কুম্ভারী পাদের নাম আছে। সেই কুম্ভারী (পাদ) তাহাতে ৫১ নম্বরের।

শ্রীকুম্ভারী পাৱ রূপে দাদূ সহজ তান্ত্রিকমত, দেহতত্ত্ব, যোগমত প্রভৃতির

সঙ্গে পরিচিত হ'ন। এখনও কুম্ভারী পারের রচিত (১) অজপা গায়ত্রী-গ্রন্থ, (২) বিরাটপুরাণ যোগশাস্ত্র (৩) অজপাগ্রন্থ ঔর অজপাশ্বাস প্রভৃতি গ্রন্থ, দাদূপন্থী মতের যোগীদের কাছে পাওয়া যায়। অজপা গায়ত্রীগ্রন্থে ১৮টি সুন্দর বর্ণযুক্ত চক্র অঙ্কিত পাওয়া যায়। বিরাট পুরাণ যোগশাস্ত্রে ১৩টি রঙীন চক্র মেলে। এই সব খবর জানিতে হইলে ভক্ত মোহনদাস মেৱাড়ের রচিত "স্বামী দাদূজীকো আদিবোধ সিদ্ধান্ত গ্রন্থ" দেখা দরকার। দাদূপন্থী যোগীদের কাছে এই পুঁথিখানি অতিশয় মূল্যবান সাধুজনমান্য ও যোগশাস্ত্রের গভীর কথায় পূর্ণ। জগন্নাথজীও যোগশাস্ত্র সম্বন্ধে "অধ্যাত্ম যোগগ্রন্থ" লিখিয়াছেন।

কথিত আছে,—যখন পূর্ব্বদেশে ঘুরিতে ছিলেন,—তখন ভক্তসম্প্রদায় মাধোকানীর পদের সঙ্গে দাদূ পরিচিত হ'ন। এই সব পদের সুরও একটু বিশিষ্ট রকমের, সন্ত রাঘবদাসজী তাঁর ভক্তমালের দ্বাদশপন্থের মধ্যে চতুঃপন্থীর নিরঞ্জনপন্থের পরই মাধোকানীর বিবরণ দিয়াছেন। (চন্দ্রিকাপ্রসাদ ত্রিপাঠী, দাদূপন্থীসম্প্রদায়কা হিন্দীসাহিত্য পৃঃ ২)।

নাথ সম্প্রদায়ের নৱনাথের যে সব বাণী দাদূপন্থীরা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন এখনও তার মধ্যে বাংলা ভাবের পদ দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। সংবৎ ১৭৬৬ (১৭০৭ খ্রীঃ) বৈশাখ মাসের কৃষ্ণা একাদশীতে লেখা সমাপ্ত একখানা পুঁথি আমি জয়পুরে বিরঙ্গমনিবাসী ভক্ত শঙ্করদাসজী ও একজন অবধূতের কাছে দেখি। তাহাতে দাদূপন্থে সমাদৃত সকল শ্রেণীর ভক্তদের পদ আছে। নবনাথের পদের মধ্যে অনেক এমন ধরণের পদ পাই যাহা বাংলার যোগীদের ও নাথদের মধ্যেও প্রচলিত আছে।

প্রয়োজন না থাকিলেও এখানে তার একটু নমুনা মাত্র দিব।

"অদেখ দেখিবা দেখি বিচারিবা আকৃষ্ট রাখিবা" ইত্যাদি
"পাতাল গঙ্গা স্বর্গে চঢ়াইবা" ইত্যাদি

এই ভাবের রচনা দাদূর মধ্যেও প্রবেশ করে যথা—

"দাদূ হিন্দু তুরুক ন হোইবা সাহেব সেতী কাম।
ষড়দর্শন কে সংগি ন জাইবা নিরপখ কহিবা রাম॥"

(মধি কৌ অঙ্গ ৪৪)।

দাদূর বাণীর মধ্যে এমন বাণী আছে যেগুলি বরং ঐ দেশে প্রচলিত ভাষার পক্ষে

একটু অদ্ভুত কিন্তু পূর্ব্ববাংলায় প্রচলিত প্রাচীন যোগীর গানের সহিত যাহার আশ্চর্য্য মিল। দাদূ মায়া অংগে দেখি—

উভা সারং, বৈঠ বিচারং, সংভারং জাগত সূতা।
তীন লোক তত জাল বিডারণ, কহাঁ জাইগা পূতা॥
(মায়াঅংগবাণী, ১৩৬)।

আর পূর্ব্ববাংলায় নাথযোগীদের প্রাচীন পদে পাই—

উঠ্যা সারন বৈঠ্যা সারন, সামাল জাগত সূতা।
তিন ভুবনে বিছাইনা জাল, কই যাবিরে পূতা?

শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রসাদধৃত উহার পাদটীকায় উদ্ধৃত মায়ার বাক্য—

উভা মারূঁ, বৈঠা মারূঁ, মারূঁ জাগত সূতা।
তীন ভবন ভগজাল পসারূঁ, কহাঁ জায়গা পূতা?

বাংলার যোগীদের পদ দেখি—

উঠ্যা মারুম বৈঠ্যা মারুম মারুম জাগা সূতা।
তীন ধামে কাম জাল বিছাইমু কই যাবিরে পূতা?

("তিন ভবে ভগজাল বিছাইমু" পাঠও আছে)।

গোরখ বাক্য—

উভা খংডূঁ, বৈঠা খংডূঁ, খংডূঁ, জাগত সূতা।
তীন ভৱনতে ভিন হ্‌ৱৈ খেলূঁ, তৌ গোরখ অবধূতা॥

ইহার সঙ্গে তুলনীয় বাংলার যোগীর পদ—

উঠ্যা খণ্ডুম বৈঠ্যা খণ্ডুম খণ্ডুম জাগত সূতা।
তিন ভুবনে খেলুম আলগ তয়তো অবধূতা॥

দাদূর পদের মধ্যে গুজরাতী ধরণের গানও আছে। "গোবিংদা গাইবা দেরে," 'গোবিন্দা জোইবা দেরে'—রাগ মারু ১৫২, ১৫৩ নং গান।

অবশ্য গুজরাতী,কাঠিয়াবাড়ীতেও ক্রিয়ার শেষে 'বা' থাকিলে তাহার অর্থ 'তে' হয়।

এই সময়েই হয়ত বাংলার সহজ মতের সাধক ও বাউলদের সঙ্গে দাদূর পরিচয় ঘটে। পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে যে বাউলদের মধ্যে কোথাও কোথাও

অন্যান্য বহু মহাজনদের প্রণতির সঙ্গে দাদূর প্রতি ও প্রণতি আছে। সেই প্রণতিপদ দেখিয়াই আমার প্রথম সন্দেহ হয় দাদূ ছিলেন মুসলমান আর তখন তাঁর নাম ছিল দাউদ।

এই দেশ ভ্রমণ করার সময়েই দাদূ সর্ব্বপ্রকার সাধনার মধ্যে সামঞ্জস্য ও ঐক্য দেখিতে পান ও সাম্প্রদায়িকতা যে এই বিরাট সত্যকে উপলব্ধি করার বাধা তাহা অনুভব করেন। কবীর প্রভৃতিও ইহা অনুভব করিয়াছিলেন কিন্তু দাদূ তাঁর সত্যের অনুভূতিকে আরও প্রকৃষ্ট রূপ ও আকার দান করেন।

১৯। **ধর্ম্মের ঐক্য একাকারের পার্থক্য ঃ**

সর্ব্বধর্ম্মকে তাল পাকাইয়া এই ঐক্য নয়, সকলদলের সুসমাবেশে সাধনার একটি শতদল কমল ফুটাইয়া তোলাই হইল কবীর, দাদূ প্রভৃতির উদ্দেশ্য। যে সব কথা তাঁরা অতি সুন্দরভাবে বুঝাইয়া গিয়াছেন। তখন প্রধান সমস্যাই ছিল হিন্দুমুসলমানকে লইয়া। সে সম্বন্ধে তাঁর অনেক চমৎকার বাণী পাওয়া যায়।

"সব আমি সন্ধান করিয়া দেখিলাম, পর কাহাকেও পাইলাম না। সকল ঘটে একই আত্মা, কি হিন্দু কি মুসলমান।"

সব হম দেখা সোধি করি দুজা নাহীঁ আন।
সব ঘঠ একৈ আতমা ক্যা হিন্দু মুসলমান॥

(দাদূ দয়া নির্বৈরতা অঙ্গ ৫)।

"হে ভাই, দাদূ হিন্দু মুসলমান এই দুয়েই একই কান, দুয়েরই একই নয়ন।" (ঐ—৭)। এইরূপ বহু বহু বাণী দাদূর আছে।

জনগোপালজী, রজ্জবজী, জগন্নাথজী, সুন্দরদাসজী প্রভৃতির মতে দাদূ ধুনিয়ার বংশে জাত। তথাপি স্বামী দাদূ দয়ালের উপদেশ সকল মানবের জন্যই সমান। তিনি কাহারও প্রতি পক্ষপাত করেন নাই।

২০। **কথিত ভাষার প্রতি অনুরাগ ঃ** "তাঁর শিষ্যের মধ্যে হিন্দু তো আছেনই মুসলমানও অনেক আছেন। মুসলমানদের মধ্যে রজ্জবজী, বখনাজী ও রাজিন্দ্‌ খাঁ প্রধান" (ত্রিপাঠী দাদূপন্থী সাহিত্য… ৩ পৃষ্ঠা)। দ্বিবেদী মহাশয় বলেন ভাগ্যে দাদূ নীচবংশে জন্মিয়াছিলেন তাই তিনি হিন্দীভাষাতে তাঁর গভীর ভাব সব প্রকাশ করিয়া সমৃদ্ধি ও নবশ্রী দান

করেন। উচ্চবংশের লোক হইলে তিনি কখনও সংস্কৃত ছাড়িয়া বাহিরে আসিতে চাহিতেন না এ কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। দাদূর শিষ্যগণের মধ্যেও অনেকে চমৎকার হিন্দী রচনা করিয়াছেন।

ত্রিপাঠীজী বলেন দাদূপন্থীদের মধ্যে কেহ কেহ ভাল সংস্কৃতজ্ঞ হইয়াও হিন্দীতে লিখিয়াছেন এবং লোকের বোধগম্য হইতে পারে মনে করিয়া বহুসংস্কৃত গ্রন্থের চমৎকার অনুবাদ করিয়াছেন। এসব বিষয় পরে বিশদরূপে বলা হইবে। পণ্ডিত নিশ্চলদাসজী দীর্ঘকাল কাশীতে শিক্ষাদান ও পাণ্ডিত্যের জন্য সর্ব্বজনমান্য হন; তাঁর রচিত "বিচারসাগর" ও "বৃত্তিপ্রভাকর" অত্যন্ত সমাদৃত ও প্রামাণ্য গ্রন্থ। ইহাতে শত শত সংস্কৃত গ্রন্থের সার সংগৃহীত। লোকভাষাতে গ্রন্থরচনা করায় পণ্ডিতেরা নিশ্চলদাসকে বলেন "আপনার মত পণ্ডিত লোকের কি উচিত লোকভাষাতে গ্রন্থলেখা ?" আরও নানাপ্রকার কটূক্তি তাঁরা নিশ্চলদাসকে করেন, দাদূর মহান্ আদর্শের খবর তো তাঁরা রাখিতেন না। একজন পণ্ডিত নিন্দা করিয়া বলেন যে, "বিচার সাগর এত সহজ যে মূর্খও ইহা বুঝিতে পারে! বিদ্বানের পক্ষে গভীর (ক্লিষ্ট) রচনাপূর্ণ লেখাই উচিত!" তখন নিশ্চলদাস উত্তর করিলেন "যে ব্রহ্মবিৎ, তাঁর বাণী সংস্কৃতই হউক বা যে ভাষাই হউক তাহাই বেদ এবং তাহা সর্ব্ব ভেদ এবং ভ্রম ছেদন করে।" অর্থাৎ তাহা সংশয় এবং ক্লেশ বৃদ্ধি না করিয়া আপন সরলতায় সব ভ্রমসংশয় দূর করে।

ব্রহ্মরূপ অহি ব্রহ্মবিৎ, তাকী বাণী বেদ।
ভাষা অথবা সংস্কৃত করত ভেদভ্রমছেদ॥

(ত্রিপাঠীজীর দাদূ সাহিত্য পৃঃ ৩)।

দাদূর মৃত্যুর কিছুকাল পরেই প্রায় ১৬৫০ ঈশাব্দের কাছাকাছি আরও অনেক দাদূপন্থী অনুবাদক সংস্কৃত হইতে ভাষাতে অনুবাদকর্ম্মে প্রবৃত্ত হন। তাঁহাদের মধ্যে ভক্ত দামোদর দাসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইনি গদ্যে অনুবাদ করিয়াছেন। ইহাঁর মার্কণ্ডেয় পুরাণের অনুবাদ ভক্তদের কাছে অতিশয় আদরণীয়। ঐ গ্রন্থখানি সেই সময়কার রাজস্থানী গদ্যে অনুবাদ করা হইয়াছিল। সেই যুগের গদ্যের নমুনা হিসাবে ইহা ভাষাবিদ্‌গণের আদরণীয় হইতে পারে।

নানাদেশে ভ্রমণ সমাপ্ত করিয়া দাদূ ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ হইয়া পরিপূর্ণ জীবন যাপন করিতে ও পরিপূর্ণ জীবনের আদর্শ স্থাপন করিতে ইচ্ছা করিলেন। মহাত্মা কবীরেরও মত ছিল যে সাধক হইতে হইলে গৃহী হওয়া উচিত। জীবনের সর্ব্ববিধ সমস্যার প্রকৃত সমাধান হইল পূর্ণাঙ্গ জীবনযাপন। সকল সমস্যায় উত্তর মেলে সাধকের জীবন দেখিয়া। পূর্ণাঙ্গ জীবন যার নাই সে জীবনসমস্যার উত্তর না দিয়া ফাঁকি দিয়া গেল। আর বিশ্বকর্ত্তার পরিপূর্ণ মহিমা, পরিপূর্ণরস, সর্ব্ববিধ মাধুর্য্য, পরিপূর্ণ জীবনের দ্বারাই উপলব্ধি করা সম্ভব। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে দাদূর স্ত্রীর নাম ছিল হবা—ইহা মুসলমানী ও ইহুদীয় নাম, ইংরাজী ভাষায় খৃষ্টানরা যাঁহাকে বলেন ইভ (Eve)। পরিবার পোষণের জন্য কবীরের মত তিনিও নিজে পরিশ্রম করিতেন—মনে করিতেন ভগবানই তাঁহার সাধকের নিজ কর্ম্মের পরদার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া তাঁহাকে পোষণ করেন, যাহাতে তাহার আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ থাকে।

দাদূ রোজী রাম হৈ রাজিক রিজক হমার।
দাদূ উস পরসাদ সৌঁ পোষ্যা সব পরিবার॥

(দাদূ, বেসাস কৌ অঙ্গ ৫৪)।

"হে দাদূ, রামই আমার দৈনিক অন্ন, তিনিই বৃত্তি, তিনিই জীবিকা। হে দাদূ, তাঁর প্রসাদেই আমি সব পরিবার পোষণ করিয়াছি।" সাধুদের শিষ্য ও আশ্রিতরাও তাঁদের পরিবার।

২১। **দাদূর ব্রহ্মসম্প্রদায়ঃ** দাদূর বয়স যখন ২৯ কি ৩০ বৎসর তখন দাদূ ব্রহ্মসম্প্রদায় স্থাপন করেন। এই সময়েই তাঁর বাণী রচিত হইতে আরম্ভ হয় (ত্রিপাঠী-দাদূ-সাহিত্য—৪ পৃঃ)। ত্রিপাঠীজী বলেন—"যাহাতে জ্ঞানী অজ্ঞান, উচ্চ নীচ সকলের অনুকূল সরল একটি ধর্ম্মের আদর্শ সকলের কাছে স্থাপিত হয় ইহাই ছিল দাদূর অন্তরের আকাঙ্ক্ষা। জীবনে যাহাতে কুরীতি ত্যাগ করিয়া সুরীতি সকলে গ্রহণ করে, সকল মানব যাহাতে সমানভাবে সকল জ্ঞানের অধিকারী বিবেচিত হয়, উচ্চ নীচ বলিয়া কৃত্রিম ভেদ যাহাতে দূর হয়, অপেক্ষাকৃত শক্তিহীনদের বঞ্চনা করিয়া লুব্ধ

হইয়া যাহাতে কেহ প্রয়োজনের অধিক ধনসঞ্চয় না করে এই ছিল তাঁর মনের ভাব। এই রকম অনেক আদর্শ তাঁর মনে ছিল।"

(ত্রিপাঠী-দাদূ-সাহিত্য পৃঃ ৪)।

এই সব আদর্শের পরিপূর্ণতার জন্যই দাদূ তাঁর ব্রহ্ম-সম্প্রদায় স্থাপন করিলেন। তাহাতে উপাসনার রীতি এমনভাবে প্রবর্ত্তিত হইল যাহা অতি সরল অথচ অতিশয় উচ্চধরণের যেন মানুষ সেই সাধনায় পরমানন্দকে অতি সহজে পাইতে পারে। প্রত্যেক স্ত্রী ও পুরুষের পক্ষে সাধনার দ্বারা ভগবদ্-জ্ঞান লাভ করা আবশ্যক।

(দাদূ-সাহিত্য পৃঃ ৪)।

সহজ ভাষাতে দাদূ বলিলেন,—"অহমিকা ত্যাগ করিয়া হরিকে ভজনা, ও তনু মনের বিকার ত্যাগ, এবং সকল জীবের সঙ্গে মৈত্রী (নির্বৈর), এই হইল সার মত।"

আপা মেটৈ হরি ভজৈ তন মন তজৈ বিকার।
নির্বৈরী সব জীবসৌঁ দাদূ য়হ মত সার॥

(দাদূ, দয়া নির্বৈরতাকো অঙ্গ ২)।

এই ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ে দাদূ কোনো সাম্প্রদায়িক মতের বা সংস্কারের প্রতি পক্ষপাত করেন নাই। তিনি নির্ভয়ে সকল মানবের কল্যাণের জন্য সকল কুরীতি ত্যাগ করার উদ্যোগ করিলেন। পরমাত্মায় তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। তাঁর পরম শক্তির উপর ভরসা করিয়াই দাদূ আপন কর্ত্তব্য করিয়াছেন। দাদূ বলিলেন—

"যেদিন হইতে আমি সম্প্রদায় ছাড়িয়া অসাম্প্রদায়িক হইলাম, সকল লোকেই আমার উপর ক্রোধ করিতে লাগিলেন। সদ্গুরুর প্রসাদে আমার না হইল হর্ষ, না হইল শোক।"

দাদূ জব থৈঁ হম নির্পষ ভয়ে সবৈ রিসানে লোক।
সদগুরুকে পরসাদ থৈঁ মেরে হরখ ন শোক॥

(দাদূ মধিকে অঙ্গ ৫৯)।

লোকেরা দাদূকে বলিল জগতে সেবা বা কাজ করিতে হইলেই কোনো না কোনো দলে থাকিয়া কাজ করা দরকার; তুমি কোন্ সম্প্রদায়ে থাকিয়া কাজ করিবে?

দাদূ উত্তর করিলেন—

দাদূ য়হ সব কিস্কে পংথমেঁ ধরতী অরু অসমান।
পানী পবন দিন রাতকা চন্দ্র সূর, রহিমান॥ ·····ইত্যাদি।
(দাদূ সাচকে অঙ্গ ১১৩)।

"এই যে ধরিত্রী আকাশ, জল, পবন, দিন, রাত্রি, চন্দ্র, সূর্য্য, (ইহারা তো অহর্নিশ সদাই সবার সেবা করিয়া চলিয়াছে)। ইহারা আছে কোন্ পন্থে, কোন্ সম্প্রদায়ে?"

"দাদূ যে সব কিসকে হ্বৈ রহে য়হ মেরে মন মাঁহি।"
(দাদূ সাচকে অঙ্গ ১১৬)।

"হে দাদূ, ইহারা সব কার অনুবর্ত্তী হইয়া (কোন সম্প্রদায়ে) রহিয়াছে, এই প্রশ্নই আমার মনে।"

তখন নিজেই দাদূ তাহার উত্তর দিতেছেন—

"অলখ ইলাহী জগতগুর দূজা কোঈ নাঁহি॥"
(দাদূ, সাচকো অঙ্গ, ১১৬)।

"সেই অলখ ঈশ্বরই জগদ্গুরু, তিনি ছাড়া আর কেহ এই জগতে নাই (যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া থাকা চলে)।" কাজেই ইহারা কোনো সম্প্রদায়ে না থাকিয়াও তাঁহারই সেবক হইয়া আছে। এই সব কথা দাদূর ব্রহ্মসম্প্রদায় প্রকরণে ভাল করিয়া বলা যাইবে। তাঁহার এই ব্রহ্মসম্প্রদায়ের সত্যগুলি হিন্দু মুসলমান দুই মতের ভাল ভাল সাধকদের মধ্যেই স্বীকৃত হইয়াছে।

যদিও তিনি আত্মঘোষণা ও কর্ম্মঘোষণার বিরোধী ছিলেন তবু এই সব উপলব্ধিতে যখন তাঁহার মন ভরিয়া উঠিল তখন দাদূ কোথাও স্থির হইয়া বসিয়া সাধনা ও জীবনের দ্বারা এই সত্যকে সর্ব্বজনের গ্রহণের উপযোগী করিতে চাহিলেন। তখনই তিনি রাজপুতানার অন্তর্গত সাংভরে আসিয়া সপরিবারে স্থির হইয়া বসিয়া কাজ করিতে লাগিলেন। এইখানে বসিয়া

ব্রহ্মসাধনার বিষয় দাদূ নির্ভয়ে প্রচার করিতে লাগিলেন। বন্ধুজনেরা বলিলেন, "দাদূ সত্য প্রচার করিতে হয় কর, কিন্তু সকলকে সব কথা বলা উচিত নয়। সমাজের মতি গতি বুঝিয়া চারিদিকের ভাব ভঙ্গী বিচার করিয়া যাহাকে যতটুকু বলা উচিত তাহাকে ততটুকুই বল। অনেকস্থলে সম্পূর্ণ মৌনই থাকা উচিত।" কিন্তু দাদূ বলিয়া উঠিলেন—"সাচ্চা পথে যাইয়া সত্যেই স্বামীকে পাইবে।"

সাচে সাহিবকৌঁ মেলৈ সাচে মারগি জাই ॥

(সাচ কৌ অংগ ১৫৬)।

বন্ধুরা ভয় দেখাইলেন, "হে দাদূ, মুল্লা মৌলবী আছেন, গুরু ব্রাহ্মণ আছেন, পাণ্ডা মোহন্ত ও দর্গার পীরেরা আছেন, দিন দিন তুমি ইহাঁদের স্বার্থে আঘাত করিতেছ। ইহাঁরা কি তোমাকে ক্ষমা করিবেন? রাজা, রাণা, দেশের মীর মালিক সবাই দিন দিন তোমার উপর বিরক্ত হইতেছেন। সাধারণের মধ্যে তোমার এই সব সত্য প্রচারের অর্থই হইল দিন দিন তাহাঁদের শক্তি ক্ষয় হওয়া। এ সব কথা ভাবিয়া দেখা উচিত।"

যে দাদূ একদিন আমেরের রাজা ভগবংত দাসের সঙ্গে মতভেদ হওয়ায় ভগবানকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—

"দাদূ বলি তুম্হারে বাপজী, গিনত ন রাণা রাব :
মীর মালিক পরধান পতি, তুম বিন সবহী বাব ॥

(সুরাতন অঙ্গ ৭৩)।

"হে পিতা, তোমার বলে, দাদূ না গণে কোনো রাণা, না মানে কোনো "রাব" ; তুমিই আমার মীর, তুমিই মালিক, তুমিই প্রধান, তুমিই পতি, তুমি বিনা সবই বায়ুভূত (মিথ্যা)", সে দাদূ কি ভয় পাইবার পাত্র ?

যে দাদূ ভগবানকে শুনাইলেন—

"সব জগ ছাড়ে হাতথৈঁ তৌ তুম জিনি ছাড়হু রাম ॥"

(দাদূ, সুরাতন অঙ্গ ৭৬)।

"সব জগত যদি আমাকে পরিত্যাগ করে তবু তুমি যেন আমায় ছাড়িও না", সে দাদূ কি মানুষের ভয়ে সঙ্কুচিত হইতে পারেন ?

সত্য প্রচারে যদিও দাদূ নির্ভয় ছিলেন ও কাহাকেও রেয়াৎ করিয়া কথা কহিতেন না তবু মানুষের প্রতি তাঁর ব্যবহার ক্ষমা ও প্রেমে পূর্ণ ছিল। দাদূকে যদি কেহ আঘাত বা নিন্দা করিত তাহাতে দাদূ ক্রুদ্ধ হইতেন না। সত্যের ও ভগবানের নামে মিথ্যা দেখিলে তিনি দুঃখ পাইতেন। একদিন একজন লোক সাম্ভরে আসিয়া তাঁহাকে গালি দিল—

সাংভরিমেঁ গালি দঈ গুর দাদূ কোঁ আই।
তবহী সবদ য়ে উচ্চর্‌য়ৌ ধরী মিঠাঈ পাই॥

(পৃঃ ৪৯৯)।

দাদূ তাহাতে ক্রোধ না করিয়া তাহাকে যত্নপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া মিষ্টান্নাদি খাওয়াইলেন। লোকেরা বলিল—"এ কি রকম তোমার ব্যবহার?" দাদূ বলিলেন—

"যে আমার নিন্দা করে সে আমায় ভাই।"……"হে আমার নিন্দুক তুমি যুগ যুগ বাঁচিয়া থাক, ভগবান তোমাকে প্রসন্ন করুন।"………

(রাগ গুণ্ড, ৩৩১ পদ)।

একদিন সাংভরে এক মুসলমান হাকিম আসিয়া তাঁহার সঙ্গে তর্ক করিল, তিনি ধীরভাবে বুঝাইলেন—"বিশ্বাসের পথেরযাত্রী হও, অন্তরের শুচিতা রক্ষা কর, পূর্ণ প্রেমময়ের আজ্ঞায় নিত্যই হাজির থাক, অভিমান ত্যাগ করিয়া পশুভাব ও ক্রোধ দূর করিয়া সত্য চিনিয়া লও। দ্বৈতবুদ্ধি মিথ্যা সেখানে চলিবে না, জ্ঞান দিয়া সন্ধান করিয়া লও!

(দাদূ, রাগ টোড়ী, পদ ২৮১)।

সাংভরি হাকমসোঁ কহ্যৌ পদ য়হ দাদূ দেব।
মানি বচন গহি নীতিকোঁ করী গুরুকী সেব॥

(ত্রিপাঠী, স্বামী দাদূদয়ালকে সবদ পৃঃ ৪৭৮)।

সাম্ভরে যখন দাদূ হাকিমকে এই পদ কহিলেন তখন তাঁহার বচন মানিয়া তাঁর যুক্তি সে গ্রহণ করিয়া দাদূর সেবায় আসিয়া যোগ দিল।

গল্‌তা হইতে একদিন একজন লোক আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল "হে দাদূ, তুমি যে সদ্‌গুরুর কথা বল তিনি কে? কোথায় তাঁর বাস, কি করিয়া তাঁকে পাওয়া যায়? কেমন করিয়া জীবনের দুঃখ দূর হয়?"

দাদূ বলিলেন—"হে সাধকগণ, বল, আর কি বলিবার আছে? ভগবানই সেই সদ্‌গুরু, আমরা তোমরা সবাই তাঁর শিষ্য। তাঁর কাছেই নিত্য থাক। আমার মাঝে তোমার মাঝে সেই স্বামীই বিরাজমান, আপন সত্য দ্বারা সেই পরম সত্যকে লাভ কর। তিনি আমার তোমার সঙ্গেই আছেন, নিকটেই আছেন—কেবল তাঁর হাতখানি ধর, তাঁর এমন চরণ-কমল ছাড়িয়া কেন ভবে ভাসিয়া বেড়াও?"

(দাদূ, রাগ রামকলী পদ ১৮৪)।

গলতাথৈ জো আইয়া সাংভরি স্বামী পাস।
যা পদথৈ উত্তর দিয়ো উঠি গয়ে হোই উদাস॥

(ত্রিপাঠী, স্বামী দাদূদয়ালকে সবদ পৃঃ ৪৩৫)।

গলতা হইতে সাংভরে আসিয়া যে দাদূকে এই প্রশ্ন করিয়াছিল সে এই পদ শুনিয়া বৈরাগ্য লাভ করিয়া উঠিয়া গেল।

এখনকার মত তখনও লোকে নানা বুজরুকীতে মানুষ ভুলাইত। মিথ্যা সাধুরা আসনের তলে কলসী পুতিয়া রাখিয়া তাহাতে প্রদীপ লুকাইয়া রাখিয়া রাত্রিকালে তাহারা লোককে সেই প্রচ্ছন্ন আলো দেখাইয়া বলিত যে ইহাই ব্রহ্মজ্যোতি—

কুংভ গাড়ী আসনতলে দীপক ধরি ঢকি মাহিঁ।
লোকনকূঁ কহি রাতিকূঁ ব্রহ্মজ্যোতি দরসাহিঁ॥

(ত্রিপাঠী, স্বামী দাদূদয়ালকে সবদ পৃঃ ৪৭৮)।

"নানা ভেদ বানাইয়া লোকে প্রচার করে 'পাইয়াছি' 'পাইয়াছি।' অন্তরে তত্ত্ব না জানিয়াই যদি বলে তিনি আমাকে স্বীকার করিয়াছেন, অন্তরে প্রিয়তমের সঙ্গে পরিচয় বিনাই যদি লোকের মধ্যে নিজেকে প্রচার করিয়া বেড়ায় তবে লাভ কি? এই কথাই আশ্চর্য্য হইয়া ভাবি যে ভণ্ডামী করিয়া কেমনে প্রিয়তমকে পাওয়া যায়? দাদূ বলেন,'যে আপনার "অহং"কে মিটাইয়া ভগবানে রত হইয়াছে সে-ই তাঁহাকে পাইয়াছে'।"

(দাদূ রাগ টোড়ী, পদ ২৮৩)।

২২। করামাত বা অতিপ্রাকৃতে অনাস্থা।

একবার দাদূ ত্রিলোকসাহের সঙ্গে শাহপুরে গিয়াছিলেন। তখন তাঁহার

সঙ্গের অনেকের মনে মনে ইচ্ছা ছিল যে দাদূ যদি কিছু অসম্ভব কাজ (করামাত্) দেখাইয়া নিজের অতিপ্রাকৃত শক্তি প্রত্যক্ষ করান তবে বেশ হয়। দাদূ ইহা বুঝিতে পারিয়া তাহাতে কি দোষ হইতে পারে তাহা দেখাইয়া দিলেন।

শাহপুরে দাদূ গয়ে লে গয়া সাহ তিলোক।
পরচাকী মনমৈঁ রহী, চলত দিখায়ে দোক।

(ত্রিপাঠী, স্বামী দাদূদয়ালকী বাণী, পৃঃ ২৭২)।

দাদূ কহিলেন—

পর্চা মাঁগৈঁ লোগ সব কহৈঁ হমকোঁ কুছ দিখলাই।
সম্রথ মেরা সাঁইয়াঁ, জ্যুঁ সমঝেঁ ত্যুঁ সমঝাই॥

(দাদূ, সমর্থাঙ্গ অঙ্গ ২৭)।

"লোকেরা সব চায় পরিচয়, সবাই বলে 'আমাকে কিছু (অতিপ্রাকৃত শক্তি) দেখাও" আমার প্রভু পরম শক্তিমান্, যেমন করিয়া বুঝাইলে ভাল হয়, তেমন করিয়াই তিনি বুঝান।"

দাদূর মত ছিল অধ্যাত্ম জীবনের জন্য এ সব জিনিষ অন্তরায়। মূলাধার ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া এ সব বাজে জিনিষ মন হইতে দূর করিয়া ফেলিতে হয়। (দাদূ নিহকর্ম্মী পতিব্রতা কৌ অংগ, ৫৯)। তবুও শিষ্যেরা অনেকে, পরে তাঁর যোগবল প্রমাণ করিতে কসুর করেন নাই। ব্যক্তিত্বের সাধনায় ও চরিত্রের বলে তিনি যে অন্যের হৃদয় অধিকার করিতে পারিতেন তাহা বলাই বাহুল্য। কেহ বলেন রজ্জবজী বিবাহ করিবার জন্য ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেছিলেন। এমন সময় ভক্ত দাদূকে দেখিয়া তিনি ঘোড়া হইতে নামিয়া তাঁর বিবাহ বেশ ত্যাগ করিয়া আপন ছোট ভাইকে সে বেশ পরাইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিতে পাঠাইলেন। সেই দিন হইতে রজ্জব যতিব্রত গ্রহণ করিলেন। এই আখ্যায়িকার সত্যতায় সন্দেহ আছে। কারণ দাদূর ধর্ম্মসাধনার আদর্শ অবিবাহিত যতির আদর্শ নয়। সেই ভাবের আদর্শ পরবর্ত্তী শিষ্যদের আমলেই প্রচলিত হয়। দাদূভক্তদের মধ্যে প্রথিত আছে যে ধর্ম্মসাধনায় দীক্ষা নির্জীব নীরস, দীনহীন শুষ্ক পথ নহে। এ পথে যে আসিবে সে বিবাহের বরের মত প্রেমে, রসে, শোভায়, ঐশ্বর্য্যে পূর্ণ হইয়া আসিবে।

রজ্জব এই সত্য জীবনে উপলব্ধি করিয়াছেন।" এই কথা হইতেই রজ্জবজী সম্বন্ধে এই গল্পটি ধীরে ধীরে রচিত হইয়া থাকিবে যে রজ্জব সদাই বিবাহবেশে সজ্জিত থাকিতেন। কেহ যদি বলিত "রজ্জব, এত মাৰ্জ্জিত শুচি বেশভূষা কেন?" তবে রজ্জব বলিতেন, "আমার প্রিয়তমের সঙ্গে কি হীন অশুচি-বেশে মিলিত হওয়া শোভা পায়?" দাদূজী চিরদিনই সহজ প্রেম ভক্তির পথেই সাধনা করিয়াছেন। অতিপ্রাকৃত বুজরুকীতে তাঁর আস্থার হেতু নাই। অথচ শেষে দেখি দাদূজীর নামেই তাঁহার পরবর্ত্তী শিষ্যগণ নানা বুজরুকীর অবতারণা করিয়া গুরুর মহিমা বাড়াইতে চাহিয়াছেন। তাই দাদূর কোনো কোনো বাণীর সঙ্গে এক একটি "করামাতের" (বুজরুকীর) সম্বন্ধ শিষ্যরা স্থাপন করিয়া লইয়াছেন।

একবার নাকি চাতুর্মাস্য যাপন উপলক্ষ্যে বর্ষাকালে দাদূজী আঁধীগ্রামে ছিলেন। সেবার বর্ষা আর আসেই না, লোকেরা তাঁহাকে বহু অনুনয় করায় বর্ষা আসিল।

আঁধী গাঁৱ হি মাহিঁ রহে জো দাদূ দাসজী।
বর্ষা বর্ষী নাঁহি, করি বিনতী বর্ষাইয়ো॥

(ত্রিপাঠীকৃত দাদূদয়ালজী বাণী পৃ ৬২)।

সেই উপলক্ষ্যেই নাকি দাদূজী এই প্রার্থনাটি করেন—

আজ্ঞা অপরংপারকী, বসি অংবর ভরতার।
হরে পটংবর পহিরি করি, ধরতী করৈ সিংগার॥
বসুধা সব ফূলৈ ফলৈ, পিরথী অনংত অপার।
গগন গরজি জল থল ভরৈ, দাদূ জৈ জৈ কার॥
কালা মুহঁ করি কালকা, সাঈঁ সদা সুকাল।
মেঘ তুম্হারে ঘরি ঘণাঁ, বরসহু দীন দয়াল॥

(বিরহ অঙ্গ, ১৫৭—১৫৯)।

"অপার অসীমের আজ্ঞা। আকাশ ভরিয়া বিরাজমান স্বামী, তাই হরিত পট্টাম্বর পরিধান করিয়া ধরিত্রী করে শৃঙ্গার (সাজসজ্জা)। সকল বসুধা ফলে ফুলে শোভিত, অনন্ত অপার পৃথিবী; গগন গরজি জল স্থল উঠিল ভরিয়া, হে

দাদূ জয়জয়কার। কালের মুখে কালী দিয়া স্বামী আমার সদাই সুকাল; তোমার ঘরে তো পুঞ্জীভূত মেঘের রাশি, হে দীনদয়াল বর্ষণ কর।”

ইহা একটি চমৎকার প্রার্থনা। বুজরুকীর সঙ্গে ইহাকে জুড়িবার কোনো প্রয়োজন নাই। ইহা বিরহ অঙ্গের বাণী, ইহাতে দেখি অন্তরের প্রেমহীন নিরসতার প্রতিকার প্রেমধারার ব্যাকুল প্রার্থনায়। সকল চরাচর ভাসিল যাঁহার করুণা ধারায়, তাঁর প্রেম আশা করিয়া তাঁহার ভক্ত কেন মরিবে অন্তরাত্মার মধ্যে শুকাইয়া?

টৌক জনপদে নাকি মহোৎসব ছিল। দাদূজীও আছেন সেখানে, বহু ভক্ত সাধু সন্ন্যাসী উপস্থিত, ভোজন সামগ্রী কম পড়িয়া গেল। তখন সবাই ধরিল দাদূজীকে। তিনি ভোগ লাগাইতেই সব ভাণ্ডার অক্ষয় হইয়া গেল। দাদূর শিষ্য টীলাজী নাকি এই রহস্য কেমন করিয়া হয় বুঝিতে চাহিলেন—

টোঁকি পধারে মহোচ্ছয় আপ লগায়ে ভোগ।
তব সিখ পূছী জব কহী, য়া সাখী যহ জোগ॥

প্রশ্নের উভয়ে দাদূজী নাকি বলিলেন—

দাদূ লীলা রাজা রামকী খেলৈঁ সবহী সংত।
আপা পর একৈ ভয়া ছুটী সবৈ ভরংত॥

(সাধ কৌ অংগ, ৭৭)।

“অর্থাৎ প্রভু ভগবানের লীলা, সকল সন্তজন করিতেছেন বিহার; আত্ম পর সব হইয়া গেল এক, বিনা-কিছুই সব অপূর্ণতা উঠিল ভরিয়া।”

এই বাণীটি বুঝিতে এইরূপ বুজরুকীর তো কোনো প্রয়োজন দেখি না।

একবার তিনি জলের তীরে বসিয়া দৃঢ় বিশ্বাসে প্রার্থনা করিতেছিলেন। তাহাতে ভগবান তাঁহার দাসের বিশ্বাস দেখিয়া তাঁহার কোলে নাকি একটি তরমুজ প্রেরণ করেন।

বংদৈঁ জল তট বৈঠি কৈ, কীন গাঢ় বিশ্বাস।
লহুঁ মতীরা গোদমেঁ, প্রভু ভেজে লখি দাস॥

এই উপলক্ষ্যেই নাকি দাদূর বাণী—“হে দাদূ পুরণকর্ত্তাই করিবেন পূর্ণ, যদি

চিত্ত থাকে যথাস্থানে। অন্তর হইতেই শ্রীহরি আনন্দে করিবেন সব উদ্বেল, সর্ব্বত্র নিরন্তর বিরাজমান ভগবান।"

(দাদু, বেসাস অংগ, ১১)।

এই বাণীর সঙ্গে তরমুজের কোনো সম্বন্ধ না থাকিলে কি কোনো ক্ষতি আছে?

এক সময়ে নাকি দাদূজী এমন সুরতি চালাইলেন যে তিনি অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড সকলকে দেখাইলেন—

এক সমৈ কহুঁ সুরতি চলাঈ।
অনংত কোটি ব্রহ্মংড দিখাঈ॥

(জনগোপালকৃত জীবন চরিত্র, ৭,৪২)।

সেই উপলক্ষ্যেই নাকি দাদূজীর বাণী—

আদি অংতি আগৈ রহৈ, এক অনূপ দেৱ।
নিরাকার নিজ নির্মলা, কোঈ ন জাণৈ ভেৱ॥
অবিনাসী অপরংপরা, বার পার নহিঁ ছেৱ।
সো তূঁ দাদূ দেখিলে, উর অংতরি করি সেৱ॥

(পরচা অংগ, ২৫৪, ২৫৫)।

অর্থাৎ, "আদি অন্ত সম্মুখে বিরাজিত এক অনুপম দেবতা, তিনি নিরাকার, নির্ম্মল আত্মস্বরূপ, কেহই জানে না তাঁহার রহস্য; তিনি অবিনাশী অসীম অপার, সীমা পরিসীমা আদি অন্ত তাঁহার নাই, হে দাদু, তাঁহাকে তুমি লও দেখিয়া, হৃদয়ের মধ্যে কর সেবা।"

ইহাতেই বা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড দেখাইবার কি দায় ছিল?

"একবার দাদুর কাছে নাকি দুই সিদ্ধপুরুষ লঘু দেহে আকাশে ভাসিয়া আসিলেন। তাহাতে দাদূ উপদেশ দিয়া কহিলেন—"ইহাতে আর কি সিদ্ধাই?"

গুর দাদূ পৈ সিদ্ধ দ্বৈ, আযে লঘু করি দেহ।
উপদেশত ভয়ে তিন্‌হকো কহা সিধাঈ এহ॥

(দৃষ্টান্ত সংগ্রহ, চম্পারাম কৃত)।

তাহাতে নাকি দাদূ বুঝাইলেন,—"এমন দীপ্তি অন্তরে সঞ্চয় কর যাহা প্রত্যক্ষ

হয় না।" পরে মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে দাদূজী নাকি আপন শরীর দীপ্যমান করিয়া শিষ্যদের দেখাইলেন! তাই নাকি দাদূর বাণী—

প্রাণ পৱন জ্যৌঁ পতলা কায়া করৈ কমাই।
দাদূ সব সংসার মৈঁ, ক্যৌঁ হি গহা ন জাই॥

(পরচা অঙ্গ, ১৯৯)।

নূর তেজ জ্যৌঁ জ্যোতি হৈ, প্রাণ প্যংড য়ৌঁ হোই।
দৃষ্টি মুষ্টি আৱৈ নহীঁ সাহিব কে বসি সোই॥

(পরচা অঙ্গ, ২০০)।

অর্থাৎ কায়াকে যদি পবনের মত লঘু ও জ্যোতিতে দীপ্যমান করা যায় তবেই বুঝি সিদ্ধাই!

ইহা কি বুজরুকীর কথা?

মধি কৌ অঙ্গে একটি বাণী আছে তাহা দেখিয়া কেহ কেহ বলেন যে দাদূজী নাকি একবার তাঁহার দেহকে মসজিদ করিয়া ও একবার মন্দির করিয়া দেখাইয়াছিলেন। মুসলমান বলিয়া তিনি দুইখানি হাত উঁচু করিয়া বলিলেন, "দেখ মসজিদ!" ও দুইখানি হাতে দুইদিকে ভূস্পর্শ করিয়া বলিলেন, "দেখ মন্দির!" বাণীটী হইল এই—

যহু মসীতি যহু দেহুরা সতগুর দিয়া দিখাই।
ভীতরি সেবা বংদিগী, বাহরি কাহে জাই॥

(মধি অঙ্গ, ৫৪)।

"এই দেহই মসজিদ ইহাই দেবালয়, সদ্‌গুরু দিলেন দেখাইয়া। ভিতরেই চলিয়াছে সেবা প্রণতি, বাহিরে তবে আর কেন যাওয়া?"

এ তো আধ্যাত্মিক একটি গভীর সত্য। ইহার সঙ্গে বুজরুকীর যোগ কি?

যথার্থ ধর্ম্ম জীবন এক কথা, বুজরুকী আর এক কথা। তাই যুগে যুগে যথার্থ সাধকরা ধর্ম্মকে এই সব জঞ্জাল হইতে মুক্ত করিতে প্রাণপণ প্রয়াস করিয়াছেন। দাদূ ও অন্যান্য ভক্তদের কথা হইতেই তাহা দেখান যাইতে পারে। "সুলতান মহমুদ যখন দেবালয় সব ধ্বংস করিতেছিলেন তখন নাকি জৈনরা

এক বুজরুকী করিলেন। তাঁহারা চৌদিকে চুম্বক রাখিয়া শূন্যে নিরবলম্ব করিয়া মূর্ত্তি রক্ষা করিলেন।"

মহমূদ ঢাহে দেহুরা, জৈন রচ্যো পরপংচ।
চংবক চহুঁ দিসি গাড়ি কৈ, মুরতি অধর ধরি সংচ॥

ইহাতে দাদূ নাকি এই বাণী বলেন—

ধর্য্যা দিখাবৈ অধর করি কৈসৈঁ মন মানৈ ?

(মায়া কৌ অংগ, ১৪৩)।

অর্থাৎ "প্রতিষ্ঠিত বস্তুকে দেখায় যেন অপ্রতিষ্ঠিত নিরবলম্ব, তাহাতে মন কেমনে মানে ?" ইহাতে তো বেশ বুঝা যায় তাঁর এ সব বিষয়ে বস্তুতঃ আস্থা ছিল না। তাঁহার বুজরুকার সম্বন্ধে যে দুই একটি গল্প আছে তাহাতে আমরা বরং তাঁহার তীক্ষ্ণ সহজ বুদ্ধিরই পরিচয় পাই।

লোহরবাড়া নামে একটি গ্রামে ছিল দস্যুদেরই বসতি। তাহারা একবার মতলব করিল দাদূজী ও ভক্তগণকে নিমন্ত্রণ করিবে, সঙ্গে যে সব গৃহস্থ ও সজ্জন সাধুসঙ্গলোভে আসিবে তাহাদের তাহারা লুটিয়া লইবে। দাদূ ইহা বুঝিতে পারিয়া সেখানে নিমন্ত্রণই স্বীকার করিলেন না। এ বিষয়ে তাঁহার নাকি এই বাণী—

খাড়া বুজী ভগতি হৈ, লোহরবাড়া মাঁহি।
পরগট পেড়াইত বসৈঁ তহঁ সংত কাহে কৌঁ জাহিঁ॥

(মায়া কৌ অংগ, ৬৮)।

অর্থাৎ—"লোহরবাড়াতে যত কপট ভক্তি। প্রত্যক্ষ সব দুর্বৃত্ত দস্যুর যেখানে বাস, সেখানে সন্তজনেরা কেন বা যাইবেন ?"

এই ঘটনাটি শিষ্যেরা একটা দাদূর অলৌকিকতার প্রমাণরূপে ধরেন। কিন্তু ইহা তো সহজ সুবিবেচনার কথা।

এই সব অলৌকিকপনার উপর যে তাঁহার আস্থা ছিল না, তাহা তাঁহার বহু বাণীতেই বুঝা যায়। মিথ্যাভেখ মিথ্যা ভণ্ডামি এ সব তাঁহার অসহ্য ছিল।

একবার দাদূ ভ্রমণ করিতে করৌলীতে গিয়াছিলেন—

করৌলীকে দেস মধি, রামত করণ কাজ।
স্বামীজী পধারে তহাঁ, নিকংদন কাল কে॥

ভ্রমণকরার সময় চারিদিকে সবাই শুধু তাঁহার নাম উচ্চৈঃস্বরে ভক্তিভরে ঘোষণা করিতেন। এমন কি বালকেরাও "দাদূ, দাদূ" করিত।

রামতি করতাঁ বালকাঁ দাদূ দাদূ ভাখি।

দাদূ বলিলেন "সকলে কেন যে শুধু দাদূ দাদূ বলে, সকল ঘটের মধ্যে তো তাঁরই কীর্ত্তি! আপন খুসিতে আপনি তারা এরূপ বলে, কিন্তু দাদূর কাছে কিছুই নাই।"

দাদূ দাদূ কহত হৈ, আপৈ সব ঘট মাঁহিঁ।
অপণী রুচি আপৈ কহৈ দাদূ থৈঁ কুছ নাঁহিঁ॥

(সমর্থাই অংগ, ২১)।

একবার একজন সাধনার্থী আসিয়া দাদূকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা নাকি যোগবলে সহস্রার হইতে অমৃতরস নিস্যন্দিত করাইয়া পান করেন?"

দাদূ কহিলেন, "অমৃত রস পাইয়াছি বটে, কিন্তু তাহা সাধুসঙ্গতির মধ্যে। লোকেরা সব কত কত স্থানেই ঘুরিয়া ঘুরিয়া এই রস করে অন্বেষণ, কিন্তু আর কোথাও তো মিলিবে না এই রস।"

দাদূ পায়া প্রেমরস, সাধূ সংগতি মাঁহি।
ফিরি ফিরি দেখৈ লোক সব, যহু রস কতহূঁ নাঁহিঁ॥

(সাধ কৌ অংগ, ৩৩)।

এই কথাই ভক্ত জয়মল পরে কহিলেন—"এই অমৃত না পাইবে পাতালে, না শশিসঙ্গে পাইবে আকাশে। প্রত্যক্ষ অমৃত যদি পাইতেই হয়, তবে জয়মল কহেন, তাহা পাইবে সাধুজনের সঙ্গতিতে।"

অমী পতাল ন পাইয়ে, না সসি সংগ অকাস।
প্রত্যখি অমী জু পাইয়ে, জৈমল সাধূ পাস॥

সাধু সঙ্গতিতে তাঁহাদের কীর্ত্তন চমৎকার জমিয়া উঠিত। তাহাতে এক এক সময় সুন্দর নৃত্যও চলিত। গুজরাতে কাঠিয়াওয়াড়ে ভজনী সাধুদের মধ্যে এইরূপ মন্দিরার তালে অতি মনোহর নৃত্য ও মন্দিরার বাদনকলা আছে।

না দেখিলে তার চমৎকারিত্ব বুঝান অসম্ভব। দাদূ এইজন্য একবার গুজরাতে একজন শিষ্য সাধুকে একটু ভঙ্গী করিয়া লিখিয়া পাঠান কিছু মন্দিরা পাঠাইতে। "গুরু দাদূ গুজরাত হইতে মন্দিরা আনাইলেন। তখন এই সাখীটি লিখিয়া দিয়াছিলেন, শুনিয়া ধীর শিষ্য তাহা আনিয়াছিলেন।"

গুর দাদূ গুজরাত থৈঁ মঁগৱায়ে মংজীর।
তব য়হ সাখী লিখ দঈ, সুনি লায়ে শিখ ধীর।

সাখীটি এই—"ভগবদ্ভক্ত সাধুর হাতে সুরকে বাঁধিয়া উত্তম বাজে এমন যে বস্তু তাহা খুঁজিয়া লইও, ও শীঘ্র এখানে পাঠাইয়া দিও।"

দাদূ বাংধে সুর নৱায়ে বাজেঁ এহ্ৱা সোধি রু লীজ্যো।
রাম সনেহী সাধ্ হাথে, বেগা মোকলি দীজ্যো॥

(পারিখ অংগ, ২৩)।

একবার নারায়ণা গ্রামে সেখ বখ্নাজী হোলির উৎসবে বসন্তের গান গাহিতেছিলেন। তখন দাদূ তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে "সকল বসন্ত উৎসবই ব্যর্থ যদি স্বামীর সঙ্গ প্রিয়তমের সঙ্গ না মেলে। এমন শোভা সৌন্দর্য্য সবই তবে বৃথা।" "এমন দেহ যাঁর রচনা, তাঁর গুণগান কর।"

"ঐসী দেহ রচী রে ভাই। রাম নিরঞ্জন গারো আঈ॥"

ইহা শুনিয়াই বখনার মন পরব্রহ্মের প্রতি ফিরিল।

(দাদূপন্থী সম্প্রদায় কথা হিন্দী সাহিত্য—২য় পৃষ্ঠা)।

২৩। **স্বাধীন সাধনা ও পরিচয়ঃ** এমন কি ধর্ম্মসাধনাতে ও তিনি বাহিরের কোনো বাঁধা রীতি বা পদ্ধতির ধার ধারিতেন না। নিত্য নিয়মিত ধর্ম্ম মন্দিরে যাওয়া, নিয়মিত উপাসনা বা নামাজ করা এসব তাঁর ছিল না। তাই অনেকে এই সব নিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতেন। জনগোপালজীর লেখাতে জানা যায় যে হিন্দু মুসলমানেরা মিলিত হইয়া দাদূজীকে অনুযোগ করেন যে না তিনি রোজা নেমাজ করেন, না দেব দেবীর পূজা করেন।

তাই দাদূ বলিয়াছেন—

"জো হম নহীঁ গুজারতে তুম্হকোঁ ক্যা ভাঈ ॥"
"অপনে অমলোঁ ছুটিয়ে কাহূকে নাঁহীঁ ॥"

(সাচ কৌ অঙ্গ, ৩১, ৩২)।

"আমি যদি রীতিমত নামাজ না করি তবে তোমার তাতে কি (ক্ষতি) ভাই ?" "অনুরাগের নেশার ব্যাকুলতায় আপন সাধনার পথে চলিতে হইবে, আর কারও সাধনার পথে ত নয় !"

লোকেরা যখন তাঁর জাতি কুল পরিবার ও সম্প্রদায়ের পরিচয় চাহিত তখন তাঁর একমাত্র পরিচয় ছিল ভগবান। জগতের পরিচয় দিবার মত কুল তো তাঁহার ছিল না। তাই দাদূ বলিয়াছেন—"পতিব্রতা পত্নীর পরিচয় তার সেবার উৎকর্ষে, কুলের উৎকর্ষে তো নহে।"

(নিহকরমী পতিব্রতা অঙ্গ, ৩৬)।

সদনভক্তের জন্ম কসাইকুলে, রৈদাস ছিলেন মুচী। তাঁদের কুলের গৌরব কি আছে ? তাই তো কথা আছে—

সদনা অরু রৈদাস কো, কুলকারণ নহিঁ কোই।
প্রভু আয়ে সব ছাড়ি কৈ, বিপ্র বৈষ্ণব রোই ॥

বিপ্র বৈষ্ণব সবাইকে কাঁদাইয়া প্রভু তাদেরই কাছে আসিলেন চলিয়া। তাই নিজের কথায়ও দাদূ বলিলেন—

"ভগবানই (কেশবই) আমার কুল, সৃজনকর্ত্তাই আমার আপন জন। জগদ্গুরুই আমার জাতি, পরমেশ্বরই আমার আত্মীয়।"

দাদূ কুল হমারে কেসবা সগা ত সিরজনহার।
জাতি হমারী জগতগুর পরমেস্সুর পরিবার ॥

(নিহকরমী পতিব্রতা অঙ্গ, ১৫)।

ভক্তদের মধ্যে কথা আছে পংঢরপুরের হরি বিঠ্ঠল নাকি চামার চোখোর সঙ্গে এক সঙ্গে আহার করিয়াছেন—

চোখো এক চমার, পংঢরপুর বিঠ্ঠল হরী।
দোনৌঁ জীমত লার মূঢ় ন জানত তাস গতি ॥

তাই দাদূ বলিলেন, "আমার তনু মন প্রিয়তমের সঙ্গে যোগযুক্ত।"

তন মন মেরা পীর সৌঁ।

(নিহকরমী পতিব্রতা, ২৩)।

দাদূ তীর্থ প্রভৃতিতে সাধনার্থ ভ্রমণ করা কি তীর্থ-দর্শনাদি ছাড়িয়া আপনার অন্তরের নামের মধ্যে ডুবিলেন এবং যে তখন তাঁর কাছে যাইত তাহাকে এই উপদেশই দিতেন। যখন আঁমেরে ভক্ত জগজ্জীবন আসিয়া তাঁহাকে কহিলেন —"এখানে মানুষের মধ্যে থাকিয়া ভজনে আমার অন্তর ভরপূর হইতেছে না, আমি সাধন করিতে ভূঁরকুরা যাইব," তখন দাদূ তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন,— "সাধন করিবার জন্য বশিষ্ঠজী এই সংসার ছাড়িয়া দূরে পলাইলেন কিন্তু তাঁর মনের মধ্যে কামনা ছিল বলিয়া সেই নির্জ্জন অরণ্যে সঙ্কল্প দ্বারা অন্তরের মধ্য হইতে আবার নূতন সৃষ্টি ফাঁদিয়া বসিলেন। (বিশ্বামিত্রের নূতন সৃষ্টি বোধ হয় এই স্থানে বশিষ্ঠের সৃষ্টি বলিয়া প্রথিত হইয়াছে)।

জগজীবন আঁবের মেঁ ভূঁরকূরে জায়।
ভজন করত ভরিয়ো নহীঁ, গুর দাদূ সমঝায়॥
গয়ে ভাজি বশিষ্ঠজী ছোড়ি য়হৈ ব্রহমাংড।
রচী কুটী সংকল্পকী, অংতর হিরদে মাংডি॥

(ত্রিপাঠী, স্বামী দাদূদয়ালকী বাণী, পৃষ্ঠা ৩৪)।

তাই দাদূ তাহাকে বুঝাইয়া বলিলেন "রাম নামের মধ্যে প্রবেশ করিয়া রাম নামেই প্রীতি ও ধ্যান স্থির রাখ। ত্রিলোকের মধ্যে সর্ব্বলোকের মধ্যে ইহাই একান্ত নির্জ্জন, কেন আর বৃথা অন্যত্র যাও?"—

(সুমিরণকে অঙ্গ, ৭৭)।

২৪। **'অলখ দরীবা'।** দাদূ প্রভৃতি ভক্তগণ আমেরে দিনে আপন কার্য্য করিতেন, সন্ধ্যার সময় সকলে একত্র হইয়া পরস্পর মিলিত হইতেন। রাত্রিতে, প্রভাতে আবার প্রত্যেকের নিজ নিজ স্থানে ভজন সাধন বিশ্রামাদি করিতেন। তাঁহাদের এই সন্ধ্যার মিলনসভায় নানা ভাবের নানা ধর্ম্মের ও নানা সাধনার সাধকেরা একত্র হইতেন। আপন আপন কর্ম্ম ও সাধনার ক্ষেত্রে একা একা বিচরণের পর এই মিলনে তাঁরা

পরস্পরের সঙ্গের মধ্যে একটি গভীর আশ্রয় উপলব্ধি করিতেন। তাই তাঁহারা তাঁহাদের মিলন স্থানকে "অলখ দরবা" বা "অলখ দরীবা" বলিতেন।

"দরীবার" অর্থ বাজার, ক্ষেত্র। যেখানে তাঁহারা পরস্পর পরস্পারের সঙ্গে এই আনন্দের লেন-দেন করিতেন তাহাই হইল "অলখ দরীবা"। বাংলায়ও দেখি নিত্যানন্দ প্রেমের বাজার খুলিয়া ছিলেন।

আসিক অমলী সাধ সব অলখ দরীবে জাই।
সাহেব দর দীদার মৈঁ সব মিলি বৈঠে আই॥

(দাদূ, পরচা কৌ অঙ্গ, ২৪২)।

প্রেমে নিরত সাধুরা অলখ দরীবায় গিয়া প্রভু পরমেশ্বরের প্রসন্ন দৃষ্টির সমক্ষে আসিয়া সবাই মিলিয়া বসিতেন।

এই দরীবায় শ্রদ্ধাপূর্ব্বক কখনও কখনও কেহ কেহ কোনো খাদ্যদ্রব্য পাঠাইয়া দিতেন। গরীব দুঃখী ও সাধু ভক্তেরা তাঁহাদের সামর্থ্যমত নিতান্ত সামান্য বস্তু পাঠাইয়া দিলেও সাধুরা আদর করিয়া সকলে মিলিয়া তাহা গ্রহণ করিতেন।

গুর দাদূ আঁবের মৈঁ ঠহরে মাধৱদাস।
ভেজী ভেট জুৱারকী অলখদরীবে পাস॥

(ত্রিপাঠী, স্বামী দাদূদয়ালকী বাণী, পৃঃ ৯৬)।

"গুরু দাদূ যখন আঁবেরে তখন মাধবদাস একদিন অলখ দরীবার নিকট "জুৱার" উপহার পাঠাইয়া দিলেন।" দীন দুঃখী দরিদ্রের খাদ্য সেই সুলভ জুৱার শস্যই ভক্তগণ আদরের সহিত গ্রহণ করিলেন।

গুরু দাদূ যখন আমেরে আছেন তখন একদিন ভক্ত ৱাজিন্দ খাঁ আসিয়া উপস্থিত—

গুরু দাদূ আঁবের মৈঁ তহাঁ গয়া ৱাজিন্দ।

২৫। **ভগবানের মধ্য দিয়া সর্ব্ব-মানবের সঙ্গে যোগ ঃ** ৱাজিন্দ দাদূকে বলিলেন "তুমি আগে মানুষের সঙ্গে খুব মেলা মেশা করিতে। এখন সে সব ছাড়িয়া দিয়া এক ভগবানকে লইয়াই দিনরাত আছ। মানুষ কি হেলার জিনিষ? দাদু

কহিলেন, "মানুষকে যে যথার্থভাবে চায়, সর্ব্বমানবের সঙ্গে যে সত্যভাবে মিলিতে চায়, তাহাকে ভগবানের মধ্যেই সকল মানুষকে পাইতে হইবে। প্রভুকে পাইলেই সকলকে পাইবে কারণ তাঁহাতেই সবাই মিলিতে পারে। তাঁহার মধ্যে সকলকে দেখিতে পাইলেই যথার্থভাবে সকলকে দেখা হয়, তিনি যদি (কেন্দ্র স্বরূপ) রহেন তবে সবাই (মিলিত হইয়া) রহে, নহিলে কেহই নাই।" "সর্ব্বসুখ আমার স্বামী, সর্ব্বমঙ্গল ও সর্ব্বআনন্দ; আমার স্বামী সেই পরমানন্দকে ভেটিলেই, হে দাদূ সব স্বজন মিলিবে। আর কোথাও যাঁহার মন না মজিয়া এক এই ভগবানেই মজিল সেই এক-রসের মাধুর্য্যেই যাঁহার মন হইল পরিতৃপ্ত, হে দাদূ, তিনিই তো মানুষ।"

(নিহকরমী পতিব্রতা অঙ্গ, ১-২০)।

দাদূ যখন আমেরে ছিলেন তখন অদূরে এক যোগীর স্থান ছিল। তিনি দিনে বাহির হইতেন না, মাঝে মাঝে গুহার মধ্যে থাকিয়া সিঙ্গা বাজাইতেন। একদিন গুহার মধ্য হইতে সিঙ্গা আর বাজিল না, সবাই বুঝিল যোগী মরিয়া গিয়াছেন—

গুরু দাদূ আঁবের থে ঢিগ জোগীকে থান।
ইক দিন সীংগী না বজী মরিগৌ জোগী জান॥

তখন দাদূ কহিলেন—শৃঙ্গের নাদ যে বাজিতেছে না, সে যোগী গেলেন কোথায়? যিনি মঢ়ীতে (মঠ কুটীরে) থাকিতেন এবং রসভোগ করিতেন তিনি আজ গেলেন কোথায়?

(দাদূ কালকৌ অঙ্গ, ২১)।

দেহ গুহার মধ্যে দেহী যোগীরও কথা ইহাতে সূচিত করা হইয়াছে।

একদিন আমেরে সেখ ফরীদজীর সঙ্গে দাদূর ধর্ম্ম-প্রসঙ্গ চলিতেছিল, তখন দাদূ এই প্রার্থনা ভগবানের উদ্দেশে উচ্চারণ করিলেন—

"তুমি বিনা সকল সংসার রসাতলে ডুবিয়া যাইতেছে। হে প্রভু, হাতে ধরিয়া বিশ্বজনকে উদ্ধার কর, আশ্রয় ও অবলম্বন দাও; দাহ জ্বালা লাগিয়া জগৎ জ্বলিতেছে। সংসার ভরিয়া ঘটে ঘটে এই জ্বালা, আমার চেষ্টায় কোনো প্রতিকারই হয় না, তুমি প্রেমরস বর্ষণ করিয়া এই জ্বালা জুড়াও। হে মন,

প্রভু বিনা জীব সব অনাথ, প্রভুই উদ্ধার করিতে পারেন, সবাই যেন প্রভুর শরণাপন্ন হয়। হে ভগবান, মরণের পথে কাহাকেও যাইতে দিও না।"

গরক রসাতল জাতহৈ, তুম বিন সব সংসার।
কর গহি কর্ত্তা কাঢ়িলে, দে অবলংবন অধার॥
দাদূ দোঁ লাগি জগ পরজলৈ ঘটি ঘটি সব সংসার।
হম থৈঁ কছূ ন হোত হৈ, তুম বরসি বুঝারণহার॥
দাদূ আত্মজীব অনাথ সব, করতার উবারৈ।
রাম নিহোরা কীজিয়ে জিনি কাহূ মারৈ॥

(বিনতী অংগ, ৫৮-৬০)।

২৬। **গুরু অন্তরে ঃ** দাদূশাস্ত্র, বেদ, কোরাণের ধার ধারিতেন না। লোকেরা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিত "কার কাছে তিনি সত্য পাইয়া থাকেন ?" দাদূ বলিতেন, "আমার গুরু আমাকে সদাই জ্ঞান দেন।" কত লোক দাদূর কাছে তাঁর গুরুকে দেখিতে চাহিতেন। দাদূ কহিতেন "গুরু কি বাহিরে থাকেন, গুরু থাকেন অন্তরে।"

তাই তিনি তাঁর প্রথম বাণীই কহিলেন—"প্রত্যক্ষ জগতের অতীত ধামে গুরুদেবের দেখা পাইলাম, তাঁর প্রসাদ পাইলাম, আমার মস্তকে তিনি হাত দিলেন, তাঁর দীক্ষা অগম অগাধ।"

(দাদূ গুরুদেব অঙ্গ, ৩)।

আবার দাদূ কহিলেন,

"হে দাদূ ;অন্তরের মধ্যে আরতি কর, অন্তরেই পূজা হইবে, অন্তরেতেই সদগুরুকে সেবা কর। একথা ক্বচিৎই কেহ বোঝে।"

(দাদূ, পরচা অঙ্গ, ২৬৫)।

"পরম গুরু আমার প্রাণ, তিনিই পূর্ণ নিখিল আনন্দদাতা, তিনি অনন্ত অপার খেলা খেলিতেছেন, তিনিই আমার অসীম পূর্ণতা।"

(দাদূ, রাগ আসাবরী, পদ ২৪৩)।

"অন্তর হইতেই তিনি আমার সঙ্গে কথা বলেন, তিনিই অন্তর্য্যামী পরমাত্মা।"

(দাদূ, সাথীভূত অঙ্গ, ৩)।

"অবিচল অমর অভয় পদদাতা, সেখানে (সেই অন্তর ধামে) নিরঞ্জনের রং লাগিয়াছে। সেই গুরুর জ্ঞান লইয়া দাদূ মাতিয়াছে, সেই মত্ততায় মাতিয়া সেই রঙ্গে রাঙ্গিয়া আপনাকে চায় বিলাইয়া দিতে।"

(দাদূ, রাগ আসাবরী পদ ২৪২)।

"যিনি আল্লা বা রামের সম্প্রদায় সীমার অতীত, যিনি গুণ আকার রহিত তিনিই আমার গুরু।"

(দাদূ, মধি কো অঙ্গ, ৪৮)।

"হে দাদূ, সকলই গুরুর সৃষ্টি, পশুপক্ষী বনরাজী।"

(দাদূ, গুরুদেব কৌ অঙ্গ ১৫৬)।

"যিনি জগদ্গুরু তিনি একরস, তাঁর উঠা বসা শয়ন জাগরণ দুঃখ মরণ নাই। তাঁহাতেই সব উৎপন্ন হইয়া তাঁহাতেই সব বিলীন হয়।"

(দাদূ, পীর পিছানন কো অঙ্গ ১৬)।

২৭। **শিষ্যদের সঙ্গে যোগ।** শিষ্য ভক্তেরা নানা জনে তাঁহাদের শক্তি অনুসারে নানা ভাবে তাঁর উপদেশ বুঝিতেন।

রজ্জব বখনো আদি জে
নেড়ে লাগে বান।
সাধু তেজানন্দজী
মাতা দূরিঁহি জান॥

(স্বামী দাদূয়ালকী বাণী, পৃঃ ৪)।

"রজ্জবজী, বখনাজী প্রভৃতি দাদূর নিকটে থাকিলে তবে তাঁর সত্য দ্বারা বিদ্ধ হইতেন, সাধু তেজানন্দজী দাদূ হইতে দূরে থাকিয়াই তাঁর রসে মাতিয়া উঠিতেন।"

মনকী জগজীৱন লহী নৈন সৈন গোপাল।
বচন রজ্জব বখনৈঁ লহে গুর দাদূ প্রতিপাল॥

(ত্রিপাঠী, স্বামী দাদূ দয়ালকী বাণী, পৃঃ ১৬)।

"বিনা সঙ্কেতেই ভক্ত জগজীবন তাঁর মনের কথা বুঝিয়া লইতেন। নয়ন ও ইঙ্গিত দেখিয়া ভক্ত গোপাল বুঝিতে পারিতেন। রজ্জবজী বখনাজী তাঁর

বচন শুনিয়া বুঝিতেন, গুরু দাদূ এইরূপ নানা ভাবে নানা জনের সাধনাকে প্রতিপালন করিতেন।”

দূর হইতেও ভক্তরা তাঁহার কাছে তাঁহাদের অন্তরের সব বাধা জানাইয়া সাধনার সহায়তা প্রার্থনা করিতেন। তিনি দূর হইতেও তাঁহাদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন। ভক্ত জগজ্জীবন দ্যৌসার নিকট টহলড়ী পাহাড়ে ছিলেন, দাদূ ছিলেন আঁধীতে, তিনি দাদূর কাছে কিছু সাধনার উপদেশ চাহিয়া পাঠাইলেন।

“জগজীৱনজী টহলড়ী আঁধী থে গুরুদেৱ।
তাহি সমৈ সাখী লিখী জগজীৱন প্রতি ভেৱ॥”

দাদূ লিখিলেন—“সহজেই তাঁর সঙ্গে মিলন হইবে, আমি তুমি সবাই হরির দাস। অন্তরে অন্তরে যদি যুক্ত থাকা যায় তবে এক সময় সে যোগ প্রত্যক্ষ প্রকাশ হইবেই।”

দাদূ সহজৈঁ মেলা হোইগা হম তুম হরিকে দাস।
অংতর গতি তৌ মিলি রহে ফুনি পরগট পরকাশ॥

(দাদূ সাধকৌ অঙ্গ, ১১৮)।

২৮। **জগজীবনের সঙ্গে পরিচয়।** বলদে পণ্য চাপাইয়া কেনা বেচা করিতে করিতে একদিন ধর্ম্মচর্চ্চা করার অভিপ্রায়ে জগজীবন তাঁর কাছে আসিলেন। গুরু দাদূ তাঁকে নিম্নলিখিত পদটী কহিলেন, তিনি সব ছাড়িয়া তাঁর শিষ্যদের মধ্যে প্রমুখ শিষ্য হইলেন।

জগজীৱনজী বৈল লদি, আয়ে চরচা কাজ।
গুর দাদূ য়হু পদকহ্যৌ, সব তজি সিষ সিরতাজ॥

“হে পণ্ডিত, যাতে রামকে পাও তাই কর। বেদ পুরাণ পড়িয়া পড়িয়া কি মিছে ব্যাখ্যা কর? সেই তত্ত্বটি দাও কহিয়া। আত্মগত রোগ বিষম ব্যাধি যে ঔষধে আরোগ্য হয় তাই কর। তিনি যেই প্রাণে পরশ করেন, অমনি পরম সুখ হয়, সকল সংসার বন্ধন যায় ছুটিয়া। এই গুণ ইন্দ্রিয়ের অপার অগ্নি, তাতে শরীর জ্বলিতেছে, যে সদানন্দে তনুমন শীতল হয় সেই জলে ডুবিতে চাই। সে পথ আমাকে বল যে পথে পারে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। ভুলে যেন

অপথে না যাই, ব্যর্থ যেন না ফিরিতে হয়, সেই বিচার কর। গুরু উপদেশের প্রদীপ হাতে দাও যাতে অন্ধকার দূর হয় ও সব দেখা যায়। হে দাদূ, সেই হইল পণ্ডিত, সেই হইল জ্ঞাতা যে বুঝিয়াছে কিসে রাম মিলিবে।"

(দাদূ, রাগ রামকলী, পদ ১৯৪)।

২৯। **সৃষ্টি সম্বন্ধে প্রশ্ন।** একদিন একজন আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "বল কেমন করিয়া হইল আর কেনই বা হইল সৃষ্টি ?"

"ইক বাদী সংসারকী উৎপতি পূছী আয়।"

তখন তাহাকে বুঝাইবার জন্য দাদূ তাহাকে বলিলেন—"যিনি এই মোহন খেলা রচনা করিয়াছেন তাঁহাকেই গিয়া তুমি জিজ্ঞাসা কর, 'কেন এক হইতে অনেক রচিলে, স্বামী সে রহস্য বল বুঝাইয়া'।"

(দাদূ, হৈরানকৌ অঙ্গ, ২৭)।

এই কথাটিই দাদূর এই একটি গানে ফুটিয়া উঠিয়াছে—

"হে প্রভু কেন করিলে এই বিশ্ব রচনা? কোন বিনোদ ভরিয়া উঠিল তোমার মনে? তুমি কি আপনাকেই চাও প্রকাশ করিতে?……না, মন মজিল, তাই কি করিলে রচনা?……না, এই লীলার খেলাই কি দেখাইতে চাও? না, শুধু এই খেলাই কি তোমার প্রিয়? এ সব যে হইল অবর্ণনীয় কথা।"

(দাদূ, রাগ আসাবরী, পদ ২৩৫)।

একবার এক ঔলিয়া সাধনায় গূঢ়রহস্য জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। দাদূ বলিয়া পাঠাইলেন "যে সাধক 'বেখুদখবর', অর্থাৎ আপনার সম্বন্ধে অতিশয় চেতন নহেন (Self-conscious নন) তিনি বুদ্ধিমান, যিনি 'খুদখবর' (অর্থাৎ নিজের সম্বন্ধে অতি-চেতন, Self conscious) তিনি হন পয়মাল (পদদলিত, বিধ্বস্ত), আপন খেয়ালের পিয়ালার প্রকাশ যে আনন্দের মত্ত আন্দোলিত বিহার দেয় তাহার মূল্য নাই।"

বেখুদখবর হোশিয়ার বাশদ, খুদখবর পামাল।
বে কীমতী মস্তানঃ গলতাঁ, নূরে প্যালয়ে খ্যাল॥

(পরচা কৌ অঙ্গ, ৩১৪)।

সাধনার জগতে দাদূর এই সাখী শুনিয়া সেই ঔলিয়া আমেরে দাদূর কাছে আসিলেন চলিয়া।

যা সাখী সুনি ঔলিয়া, চলি আয়ো আঁমেরি।

এক রাজপুত যুবক মনে করিল যদি সেবা করি তবে যিনি সবার উপরে তাঁহারই করিব সেবা। তাই সে রাজার কাছে গিয়া তার মনের কথা কহিল। রাজা বলিলেন তবে "তুমি বাদশাহের কাছে যাও।" রাজাকে ত্যাগ করিয়া তাই গেল সে বাদশাহের কাছে। বাদশাহ আকবর তার মানস জানিয়া বলিলেন "আমি তো সামান্য জগতের শাসকমাত্র, তুমি সাধক দাদূর কাছে যাও।" তখন বাদশাহকেও ত্যাগ করিয়া দাদূর কাছে আসিয়া তাঁহারই সে করিতে চাহিল সেবা—

নেম লিয়ো রজপুত ইক সব সির হো তেহিঁ সেউঁ॥
নৃপ ত্যজি, ত্যাগ্যো বাদশাহ, সাহিব সেৱহি লেউঁ॥

তখন দাদূ তাহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, "সকলের যিনি শ্রেষ্ঠ, তাঁহারই যদি করিতে চাও সেবা, তবে সেবক হও ভগবানের।" সকল সারের সার শিরোমণি যিনি, তাঁহাকে দেখ। তাঁহার উপর আর তো কেহ নাই।"

সারোঁ কে সিরি দেখিয়ে, উস পরি কোই নাঁহিঁ।
(পীৱ পিছান কৌ অংগ, ২)।

"সকল প্রিয়ের মধ্যে তিনি পরম প্রিয়, সকল মনোহরের মধ্যে তিনি পরম মনোহর, সকল পাবনের তিনি পাবন, তিনিই দাদূর প্রিয়তম।"

সব লালোঁ সিরি লাল হৈ, সব খূবোঁ সিরি খূব।
সব পাকোঁ সিরি পাক হৈ, দাদূকা মহবূব॥
(পীৱ পিছান কৌ অংগ, ৩)।

দাদূ শুষ্ক নীরস ধর্ম্মব্যবসায়ী রকমের মানুষ ছিলেন না। ভগবদ্রসে মজিয়া গানে নৃত্যে সকলকে ভরপুর দেখিতে চাহিতেন। কাঠিয়াওয়ারের ভজনীয়া দলকে মন্দিরা সহযোগে চমৎকার নৃত্য গীত করিতে দেখিয়া কতগুলি মন্দিরা গুজরাত হইতে তিনি যে আনাইয়াছিলেন সে কথা ২২নং প্রকরণে পূর্ব্বেই লেখা হইয়াছে।

দাদূর বেশ একটু সুকুমার রস ছিল। একবার এক কালোয়াত আসিয়া

তাঁর কাছে খুব তান দিতে লাগিলেন। দাদূ তাহাতে তাঁহাকে বলিলেন, "এমনভাবে গান করিবে যেন তোমাকে না প্রকাশ করিয়া ভগবানকে প্রকাশ করা হয়। নহিলে এই গান এই কলা সবই ব্যর্থ।"

(গুরুদেব অংগ, ৯৯ বাণীর তাৎপর্য্য)।

৩০। **মুসলমান তার্কিকের সঙ্গে আলাপ** ঃ দাদূজী যখন আমেরে ছিলেন তখন একদিন এক মুসলমান তার্কিক আসিয়া একটু সাম্প্রদায়িকভাবে তর্ক করিয়া তাঁহাকে বিপদে ফেলিতে চাহিলেন।

দাদূজী আঁবের থে, তুর্ক সঙ্গোতী ল্যায়।
তাসন যা সাখী কহী, লজ্জিত হ্বৈ উঠি জায়॥

দাদূ যখন তাহাকে আপন মনের কথা বুঝাইয়া বলিলেন তখন তিনি লজ্জিত হইয়া উঠিয়া গেলেন।

"দাদূ কহিলেন—"আমি দেখিতেছি সকল বিশ্বই সেই এক, সকল মানবই আমার আত্মীয়। অনৈক্য বুদ্ধিতেই যত মিথ্যা কর্ম্ম ও ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ সাধনার জন্ম। সেখানেই সেই পবিত্রস্বরূপ ভগবানের অধিষ্ঠান যেখানে আমাদের প্রেম ও মৈত্রী। পৃথিবী হইতে ভাব নির্ব্বাসিত, দেশ হইতে দয়া বিতাড়িত, কাজেই ভগবানেও নাই ভক্তি, তাই কেমন করিয়া সেইখানে সেই ভাবস্বরূপের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিবে?"

(দাদূ, দয়ানির্বৈরতা অঙ্গ, ৩৮-৪০)।

৩১। **বশীকরণ প্রার্থিনী তরুণী** ঃ * একদিন এক দেশপতির অন্তঃপুরিকা তাঁহার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইয়া কহিলেন, —"হে ফকীর, আমাকে একটি মন্ত্রপূত কবচ দিতে হইবে। আমার স্বামী পাদশা যেন আমার বশ হন।" তখন দাদূ তাহাকে এই উপদেশটি লিখিয়া দিলেন—

হুরম জু গঈ ফকীর পৈ, মোকৌঁ জংতর দেহু।
হোই পাতসা মোর বস, সাখী লিখি দঈ লেহু॥

---

* এইরূপ একটি গল্প পরবর্ত্তী জৈন ভক্ত আনন্দঘনজীর সম্বন্ধেও প্রচলিত আছে।

"হে সখি, ভুলেও কেহ কখনও এই সব যাদু টোনা করিও না। প্রেম যাহা চায় ও প্রেমিকের যাহা অভিপ্রায় তাহাই কর, আপনিই সে তোমার বশ হইবে।"

টামণ টূমণ হে সখী, ভূলি করৌ মতি কোই।
পীর কহৈ ত্যোঁ কীজিয়ে, আপৈহী বসি হোই॥

দাদূ কহিলেন, "যে নারী প্রিয়তমের সেবা না করে, যন্ত্র মন্ত্র মোহনবিদ্যা সেই নারীরই চাই।"

পীরকী সেৱা না করৈ, কামণিগারী সোই।
দাদূ, নিঃকরমী পতিব্রতা অংগ, ৫২।

৩২। **শক্তির শুচিতা** : দাদূ একদিন বলিতেছিলেন "শক্তি ভাল কিন্তু শক্তিদ্বারা কাহাকেও যেন না মারি। উচ্চতা ভাল, তাহা দ্বারা কাহাকেও যেন পাতিত না করি।" একজন তাহাতে কহিল, "শক্তির অর্থই তো হইল সকলকে নিষ্পেষিত করিয়া তাহাদের পুঞ্জীভূত অসহায় শক্তিদ্বারা নিজশক্তি বাড়ান। সামাজিক ও সাংসারিক উচ্চতা অর্থই হইল বহু বহু লোককে পদতলে পাতিত করিয়া সেই সেই স্তূপের উপর দাঁড়ান।" দাদূ বলিলেন, "যাহাকে আজকার সুবিধার জন্য তুমি মারিতে চাও, একদিন সেই ফিরিয়া তোমাকে মারে, যাহাকে আজ তুমি তারণ কর সেই একদিন তোমাকে তরায়।"

জাকোঁ মারণ জাইয়ে, সোঈ ফিরি মারৈ।
জাকোঁ তারণ জাইয়ে, সোঈ ফিরি তারৈ॥
(দাদূ, সাচ কৌ অঙ্গ, ২৬)।

আজিকার সুবিধার জন্য যদি কাহাকেও আমরা পাতিত বা অশক্ত করি তাদের পাতিত্য ও অশক্তিই একদিন পুঞ্জীভূত হইয়া আমাদিগকে টানিয়া নাবাইয়া মৃত্যুর মধ্যে ডুবাইয়া সমূলে মারিবে। কোন জিনিষকেই আজিকার সুবিধামাত্র দিয়া দেখা উচিত নয়।

৩৩। **কাল ও ভাবের প্রতি অপক্ষপাত** : দাদূ বলিলেন, যিনি জ্ঞানী তিনি এক কালের কাছে অন্য কালকে বলি দেন না। যে ভূত কালের কাছে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎকে বলি দেয় সে "ভৌতিক"।

শাস্ত্র-নিয়ম-পুরাণ-কোরাণ-শাসিত কাজী-পণ্ডিতেরা এই দলে। বর্ত্তমানের সুখ সম্ভোগের কাছে যাহারা পুরাতন কালের সকল মহত্ত্ব ও সকল নির্দ্দেশকে ও ভবিষ্যতের সকল সম্ভাবনাকে বলি দেয় তাহারা অজ্ঞান, অসংযত, ভোগ-লুব্ধ, পশুবৃত্ত, উপস্থিত মুহূর্ত্তের উপাসক ("মহোর্তিয়া")। আর যারা ভবিষ্যতের পরলোক-প্রাপ্য সুখ সুবিধার জন্য পুরাতন সত্য সিদ্ধান্ত ও বর্ত্তমানের সহজ আনন্দকে বলি দেয় তারা নিষ্ঠুর অতিলোভী "ঝূঠ পরমারথী" অতি-বিষয়ী। তাহারা কি নিজকে কি অপরকে দারুণ নিপীড়নে নিপীড়িত করিতে একটুও দ্বিধা বোধ করে না। তাহারা সব হৃদয়হীন অতি-লোভী "সূদ্র" বৈষয়িকের দল। যিনি যোগী তিনি তিন কালকে সত্য ধর্ম্মের ও যোগ-সাধনার দ্বারা সুসঙ্গত করিয়া চলেন, তিনি এক কালের নিমিত্ত অন্য কালকে মারেন না।" দাদূর প্রিয় শিষ্য রজ্জবজী এই সত্যটিই বুঝাইয়া বলিয়াছেন, —"এক কালের প্রতি পক্ষপাত করিয়া যাহারা অন্য কালকে আঘাত করে, মনুষ্যত্বের সাধনায় এক অঙ্গকে পুষ্ট করিতে অন্য অঙ্গকে নষ্ট করে, এক ভাবকে পোষণ করিতে অন্য ভাবকে হত্যা করে তারা বাঘ বা বিড়ালের মত। বাঘ, বিড়াল যেমন একটি বাচ্চাকে খাওয়াইতে অন্য বাচ্চা বধ করে, এও তেমন।" "এক বাচ্চা মারিয়া যেমন বাঘ বিড়াল অন্য বাচ্চাকে খাওয়ায় ও পোষে, তেমনি এক ভাব মারিয়া যারা অন্য ভাবকে সাধনা করে—তাদের সাধনাকে বলিহারী!"

বচ্চ মারি বচ্চ খিলাবৈ জৈসে বাঘ বিলাড়ী।
ভাব্ব মারি ভাব্বকূঁ সাধৈ সাধনকী বলিহারী॥

(রজ্জবজী, দুষ্টদয়াকো অঙ্গ)।

"কোন ভাববিশেষের প্রতি দয়া বশত সাধক যদি অন্য কোনো প্রকারের সামর্থ্যকে নষ্ট করিয়া আপনাকে কোনো দিকে ক্লীব করে তবে সেই দয়াকে দোষ বলিয়া জানা উচিত।"

"সমরথ মারি হিজড়া বনে দোষ দয়ামেঁ জান।"

(রজ্জবজী, দুষ্টদয়াকো অঙ্গ)।

"এক ভাইকে হত্যা করিয়া অন্য ভাইকে পোষা হইতেছে ইহা বুঝিতে পারিলে সবারই খুবই দুঃখ অনুভব করিবার কথা।"

ভাইকো হতি ভাইকো পোষৈ সমঝে বহু দুখ হোয়।

(রজ্জবজী দুষ্টদয়াকো অঙ্গ)।

৩৪। **দাদূর পুত্র কন্যা ঃ** পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে দাদূর ৩২ বৎসর বয়সে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র গরীবদাসের জন্ম হয়।

সাঁভর আয়ে সময়ে তীসা।
গরীবদাস জনমে বত্তীসা॥

(জনগোপাল, ২৯ বিশ্রাম, ২৬ চৌপাঈ)।

দাদূর কনিষ্ঠপুত্রের নাম মসকীনদাস। গরীব ও মসকীন নাম পারসী। যদিও হিন্দুর মধ্যে গরীব নাম না আছে তা নয়। তবে মসকীন নামটি খাঁটি মুসলমানী। এই দুইটি পুত্র ছাড়া দাদূর দুইটি কন্যাও জন্মে। তাঁহাদের নাম নানীবাঈ ও মাতাবাঈ; কাঁহারও কাঁহারও মতে তাঁহাদের নাম অব্বা ও সব্বা।

গরীব গরীবী গহি রহ্যা, মসকীনী মসকীন॥

(জীবিত মৃতক কৌ অংগ, ৩১)।

দাদূর এই বাণীর মধ্যে কৌশলে তাঁহার পুত্রদের দুইটি নামই রহিয়া গেছে।

৩৫। **খ্যাতি ও লোকের ভিড় ঃ** দাদূ তাঁর নিজ সাধনায় দিন দিন অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং তাঁর চারি দিকে একটি সাধনার আবহাওয়া আপনিই গড়িয়া উঠিতে লাগিল, এমনভাবে ১৪ বৎসর দাদূ আমেরে কাটাইলেন। হয়তো আমেরেই দাদূ জীবনের শেষভাগ পর্য্যন্ত কাটাইতেন কিন্তু খুব সম্ভবতঃ দুইটি কারণে তার আমের পরিত্যাগ করিতে হইল। প্রথম তাঁর সাধনার খ্যাতি যখন চারিদিকে লোকমুখে ছড়াইয়া পড়িল তখন নানা রকমের ভীড় তাঁর কাছে প্রতিদিন বৃথা জমিয়া উঠিতে লাগিল। যতদিন একজন ধ্যানী ভাবরসিক সাধকের কাছে ভাবের প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ সত্যপিপাসুদল যাতায়াত করে ততদিন সাধকেরা প্রসন্নমনেই সকলের সঙ্গে মেলামেশা করেন। সকলেই যে তাঁদের মতের সহিত একমত হইবেন তাহা নাও হইতে পারে—বরং মতামতের বৈচিত্র্যের সঙ্ঘাতে সাধকদের অন্তর্নিহিত সত্যের নানা বিচিত্র পরিচয় তাঁদের নিজের কাছেও দিন দিন উদ্ভাসিত হইতে থাকে। মতামতের

ভাবের ও রুচির পার্থক্য থাকেতো থাকুক, কিন্তু সত্যের প্রতি নিষ্ঠা, ভাবের প্রতি অনুরাগ থাকা চাইই চাই। কিন্তু সাধকের নাম যখন প্রখ্যাত হইয়া পড়ে তখন নানা রকমের কুতূহলী গায়েপড়া বাজে রকমের লোকের ভীড়ই দিন দিন বাড়িয়া চলে। এই সব লোকেরা কেহবা নিজের বিদ্যা বুদ্ধি ফলাইবার জন্য এমন সব বাজে ব্যর্থ আলাপ জুড়িয়া দেন বা অর্থহীন এমন সব প্রশ্ন করেন বা এমন সব বাজে ও খুচরা কাজের জন্য সাধকদের ধরেন যে তাতেই তাঁরা যান হয়রান হইয়া।

মরমিয়ারা বলেন "আকাশের চন্দ্র সূর্য্যের কাছে সকল চরাচর আলোক পায়, এই সেবায় তাদের ক্লান্তি নাই। কিন্তু চন্দ্রের উপর সূর্য্য রাখিয়া জাঁতার মত করিয়া যখন লোকে যব গম ভাঙ্গিয়া আটা ময়দা করিতে চায় তখনই হয় তাদের দুর্গতি। স্বর্গলোকবিহারী পক্ষিরাজ ঘোড়ার পিঠে ধোপার ভাটির কাপড় যদি চাপায়, পরশমণি দিয়া যদি সরিষা পেষে, শালগ্রাম দিয়া যদি বাটনা বাটে, দুর্গতি বলি তাকে।"

(পদ্মলোচন, সাধনদুর্গতি পদ)।

এই রকম বাজে লোকের ভিড় দিন দিন আমেরে জমিয়া উঠিতে লাগিল; তার উপর জয়পুরের রাজা ভগবংতদাসের সঙ্গেও একটু খিট্‌মিটি বাধিল। এই ভগবংতদাস হইলেন ইতিহাসবিখ্যাত রাজা মানসিংহের পিতা। ইহাঁর বিষয়ে পরে বলা হইবে।

৩৬। **সম্রাট্ মিলনপ্রার্থী ঃ** যখন দাদূ আমেরে আছেন তখন তাঁর খ্যাতি বিস্তৃত হইতে হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত গিয়া পৌঁছিল। আকবর অনেকবার অনেক লোক দাদূর কাছে পাঠাইয়া ছিলেন। প্রথমে দূত আসিয়া দাদূকে জানান যে দিল্লীর বাদশাহ তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে চাহেন। দাদূ বলিলেন "দিল্লীর বাদশাহের সঙ্গে আমার সাক্ষাতের কি হেতু থাকিতে পারে?" দূত আসিয়া দাদূর এই উত্তর জানাইলে আকবর বলিলেন "তুমি কেন এই কথা বলিলে? তুমি গিয়া বল যে 'ভগবৎ-প্রসঙ্গ-পিয়াসী আকবর' আপনার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন।" দাদূ রাজী হইলেন। তখন দুর হইতে কিছুকাল কথাবার্ত্তার পর আকবর জানিতে চাহিলেন কেমন করিয়া তাঁহাদের মিলন হয়। দাদূ জানাইলেন, "আপনি বলিতেছেন,

আমার পরিচয় লাভ করিতে চান আর আমার পরিচয়ের মধ্য দিয়া আমার সত্যের ও সাধনার পরিচয় লাভ করিতে চান। আমি নির্জ্জন বনের জীব, আপনার ঐশ্বর্য্য-নগরে গেলে আপনি আমাকে চিনিতে পারা দূরে থাকুক আমিই নিজেকে সেখানে চিনিতে পারিব না। তাই আমাকে বুঝিতে হইলে আমাকে আমার সহজ লোকের মধ্যেই দেখিতে হইবে।" আকবর কহিয়া পাঠাইলেন "আপনি কি মনে করেন আমি কখনও আমার এই রাজধানীর মিথ্যা জগতে আপনাকে আনিয়া দেখিতে চাহিব? আমাকে এমন মূঢ় মনে করিবেন না। সাগর হইতে একপাত্র জল দিল্লীতে আনিয়া সাগরের অপার রূপ দেখার দুবুর্দ্ধি আমার নাই, হিমালয়ের একখানি শিলা দিল্লীতে পৌছিয়া আমাকে কোন্ গম্ভীর মহিমার পরিচয় দিতে পারে? এই বুদ্ধি আমার আছে। সাধককে চেনাই কঠিন, আরও কঠিন হয় তাঁহাকে তাঁহার সহজ সাধনলোকের মধ্য হইতে বাহিরে টানিয়া আনিলে। কিন্তু আমারও যে দুর্ভাগ্য আমি সম্রাট্। আপনার ওখানে যদি আমি যাই তবে আপনার পক্ষে কোন মুস্কিল নাই কিন্তু চারিদিকের রাজা ও রাজপুরুষেরা আপনার ওই স্থানটুকুকে একেবারে মিথ্যা বানাইয়া তুলিবে—আর সে দুঃখ সহিতে হইবে চারিদিকের সকলকে এবং আমাদিগকেও।"

অবশেষে স্থির হইল আকবর যখন "ধনপুরী" দিল্লী ছাড়িয়া "সাধনপুরী" ফতেহপুর সিকরী আসিবেন তখন নগরের বাহিরে মরুভূমির নির্জ্জনতায় তাঁহাদের দেখাশোনা হইবে। ছৌসা ছাড়িয়া মথুরা, আগরা প্রভৃতি স্থানে যাইবার উপলক্ষ্যে ওদিকে দাদূ মাঝে মাঝে যাইতেন, কাজেই তাঁহার পক্ষেও বিশেষ অসুবিধাজনক হইল না। উভয়েরই সুবিধা হইবে আর কাহারও অসুবিধা হইবার সম্ভাবনা নাই এবং নির্জ্জনে গভীরভাবে আলাপাদি হইতে পারিবে মনে করিয়া ফতেহপুর সিকরীর কাছেই স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল।

আকবর অতিশয় সুখী হইলেন ইহা ভাবিয়া যে ইহাতে ফতেহপুর সিকরী ধন্য হইবে। তখনকার দিনের সাধকরা মনে করিতেন, "যে রাজধানী সকল মানুষের দুঃখে-পাওয়া ও কষ্টে-দেওয়া কৃত্রিম সম্পদে সৃষ্ট, সে রাজধানীতে কখনও সকল মানবের মিলন হইতে পারে না। রাজধানীতে বহু লোক একত্র হয় বটে, কিন্তু তারা কি মানুষ? তারা সব প্রচ্ছন্ন "লুটেরা" (লুণ্ঠক),

ভদ্রবেশী "ধা'ড়" (ডাকাত)." রজ্জব ও বলিয়াছেন—"যে তৃষার্ত্ত সে কূপ হইতে ঘটি কি কলস প্রমাণ জল তুলিয়া লয়, কিন্তু সূর্য্য দিবা রাত্রি অদৃশ্যভাবে অপরিমিত জল শুষিতেছে কেহ তার সন্ধানও রাখে না।" তবু তো সূর্য্য বৃষ্টিধারারূপে, কল্যাণরূপে তার শোষণ পোষণ করিয়া দেয়। "এই সব লোক মুখে বলে শাস্ত্র ও ধর্ম্মবাণী কিন্তু "চলৈ আপনা দাঁব "অর্থাৎ চলে আপন দাঁও বুঝিয়া।"

আকবর তাই ভাল জায়গাতেই সাধকের সঙ্গে মিলনের ব্যবস্থা করিলেন। তাঁর স্বপ্ন ছিল তাঁর এই সিকরী নগর "সাঁকড়ী নগর" অর্থাৎ শৃঙ্খল নগর হইবে না। ইহা হইবে সকল স্থানের সকল রকম সাধনার সত্য ইন্ধনে সমিদ্ধ এক সাধনার মহাবেদী। "সিকরী হয় "যোগধানী" হউক নয় মিলাইয়া যাউক তবু যেন সে শুধু "রাজধানী" না হয়"—দাদূর ও ছিল এই আশীর্ব্বাদ, আকবরের ও ছিল এই আকাঙ্ক্ষা। তাই কি সাধক সেলিম চিশ্‌তীর সাধনাটুকু বুকে লইয়াই সিকরী মিলাইয়া গেল?

শিষ্যদের মধ্যে কেহ কেহ ভয় করিতেছিলেন যে বাদশাহের সঙ্গে আলাপে মতামতের পার্থক্য ঘটিলে কোনো অনর্থও হইতে পারে। তখন দাদূ বলিলেন, সেরূপ ভয় করিলে চলিবে না। ভগবানের নামে জীবন যে উৎসর্গ করিয়াছে তার "জীবন মরণ সবই হইবে ভগবানের জন্য। স্বামীর সঙ্গে জীবনে মরণে সাথী হইলেই যেমন হয় সতী, সাধনাও সত্য হয় ঠিক তেমন হইলে।"

জীবন মরণা রায়সৌঁ, সোঈ সতী করি জাণ।
(সূরাতন কৌ অংগ, ৬)।

৩৭। **বাহ্য সহায়তায় উপেক্ষা।** সংবৎ ১৬৬২ অব্দে, ৯৯৩ হিজরীতে, ১৫৮৬ ঈশাব্দে এই দুই মহাপুরুষের মিলন হইবার সব কথাবার্ত্তা ঠিক হইল। দাদূর সঙ্গে তাঁর প্রিয় শিষ্যরা কেহ কেহ চলিলেন। একদিন পথে চলিতে চলিতে শিষ্যদের মধ্যে একজন বলিলেন, আচ্ছা আপনার ব্রহ্ম-সম্প্রদায় স্থাপনে যদি আপনি আকবরকে আপনার পক্ষে নেন ও তাঁর সহায়তায় কাজ চালান তবে আপনার যে কাজ অতি ধীরে অগ্রসর হইতেছে তাহা কি খুব দ্রুত অগ্রসর হইবে না?" দাদূ বলিলেন "যাঁকে

প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য আমাদের এই চেষ্টা, তাঁহাকেই বাদ দিয়া যদি অন্যের উপর নির্ভর করি তবে সে চেষ্টা মিথ্যা হইবেই। সত্য বড় ধীরে অগ্রসর হয়, ভগবানের নামে কাজ ধীরে ধীরে হয়, তাই অধীর হইয়া আমরাই যদি তাঁর উপর নির্ভর ছাড়িয়া অন্য পথ ধরি তবে তাঁর উপর নির্ভর করিয়া চলিবে কে?"

গুরু দাদূ আমের থৈঁ চলে সীকরী জাঁই।
মার্গ চলত কহেঁ সিখন সোঁ তব য়হ সাখী সুনাই ॥

"গুরু দাদূ আমের হইতে যখন সিকরী যাইতেছেন, তখন পথে চলিতে চলিতে কথাপ্রসঙ্গে শিষ্যদের এই কবিতাটি বলিলেন।"

জে হম ছাড়ৈঁ ৱাম কোঁ তৌ কৌন গহৈগা।
দাদূ হম নহিঁ উচ্চরৈঁ তৌ কৌন কহৈগা ॥

(দাদূ সাচ কৌ অঙ্গ, ১৮৩)।

"আমিই যদি ভগবানকে ছাড়ি তবে তাঁহাকে গ্রহণ করিবে কে? আমিই যদি তাঁর নাম ঘোষণা না করিলাম তবে কে আর তাঁর নাম ঘোষণা করিবে?"

৩৮। **সীকরীতে শিষ্যদের সঙ্গে প্রশ্নোত্তর:** তারপর যখন তাঁহারা সীকরী পৌঁছিলেন তখন নিজেদের মধ্যে বসিয়াই দাদূ একটি প্রশ্ন করিলেন। কেহই যখন সে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলেন না তখন ভক্ত সেখ বখনাজীই তাহার উত্তর দিলেন।

গুরু দাদূ গয়ে সীকরী তহঁ য়হু সাখী ভাখি।
উত্তর ভয়ো ন কীসীতৈঁ, বখনৌ উত্তর আখি ॥

প্রশ্নটি হইল এই—"দাদূ বলেন, এই সব বিশ্বসংসার সৃষ্ট হইল যে সময়টিতে, সেই সময়টি একবার 'বিচার' করিয়া লও বুঝিয়া। নহিলে পাগল কাজীর দল ও পণ্ডিতের দল মিছা কি সব লিখিয়া বৃথা বাঁধিতেছে শাস্ত্রের ভার?

দাদূ জিহি বিরিয়াঁ যহু সব কুছ ভয়া, সো কুছ করৌ বিচার।
কাজী পণ্ডিত বাৱরে, ক্যা লিখি বংধে ভার ॥

(দাদূ, বিচার কৌ অঙ্গ, ৩৮)।

কাজী পণ্ডিতেরা প্রশ্নটি বুঝিয়া লইলেন কিন্তু কোনো উত্তর দিলেন না। তখন দাদূ বিশেষ করিয়া বখনাকেই এই প্রশ্ন করিলেন "বল তো ভাই সেটা কোন সময়, যখন সব কিছু সৃষ্ট হইল ?"

কাজী পংডিত বুঝিয়া, কিন জ্বাব ন দীয়া।
বখনা বরিয়াঁ কৌন থী, জব সব কছু কীয়া ॥

তখন বখনা বলিলেন যে সময়টাতে সৃষ্টির উৎস তাহা আমি বুঝিয়া লইয়াছি। আনন্দের মুহূর্ত্তই হইল সৃষ্টির উৎস। আনন্দেই তিনি কর্ত্তা ও স্রষ্টা।

জিহিঁ বরিয়াঁ সব কুছ ভয়া সো হম কিয়া বিচার।
বখনা বরিয়াঁ খুসী কী কর্ত্তা সিরজনহার ॥

৩। **দাদূ-আকবর সংবাদ ঃ** এই সৃষ্টির বিষয় কথা চলিতেছে, এমন সময় আকবর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন তিনি প্রশ্ন করিলেন "এই সৃষ্টির ক্রম কি? প্রথমে কি উৎপন্ন হইল? বায়ু কি জল, ভূমি কি আকাশ, পুরুষ কি নারী?"

দাদূ উত্তর করিলেন, তাঁর এমন কি শক্তির অভাব যে কোনোটা আগে, কোনোটা পিছে তিনি সৃষ্টি করিবেন। "তাঁর একটি শব্দেই (সঙ্গীতেই) সব কিছু যুগপদ্‌ভাবে সৃষ্ট, এমনি সমর্থ তিনি। আগে পিছে তাহারাই করে যাহাদের সব একই সঙ্গে বিকসিত করিয়া তুলিবার মত বল নাই। তিনিও সেইরূপ করিতেন যদি তিনিও হইতেন বলহীন।"

এক সবদ সব কুছ কিয়া ঐসা সম্রথ সোই।
আগৈঁ পীছেঁ তৌ করৈ জৈ বলহীনা হোই ॥

(দাদূ, সবদ কৌ অঙ্গ, ১০)।

দাদূর সঙ্গে তাঁর এই রকম ৪০ দিন ধর্ম্ম আলাপ হয়। একদিন দাদূর সঙ্গে দেখা করিয়া আকবর এক প্রসঙ্গ তুলিলেন। কবীরের একটি সাখী শুনাইয়া অগম অগাধ ব্রহ্মের প্রসঙ্গ আনিয়া ফেলিলেন।

গুরু দাদূ কো দরস করি অকবর কিয়ো সংবাদ।
সাষী সুনায় কবীরকী ব্রহ্ম সো অগম অগাধ ॥

আকবর বলিলেন সাধকদের মধ্যে এইকথাটি চলিত আছে যে সাধনার পক্ষে “তনু হইল মন্থনের ঘট, মন হইল মন্থনদণ্ড, মন্থনকর্ত্তা হইল প্রাণ। মন্থন করিয়া যে ব্রহ্মতত্ত্বরস-নবনী হইল লাভ তাহাতো কবীরই গেছেন লইয়া, এখন সকল সংসার খাইতেছে শুধু ঘোল।”

তন মটকী মন মহী প্রাণ বিলোৱনহার।
তত্ত কবীরা লে গয়া ছাছ পিয়ে সংসার॥

কবীরের প্রতি দাদূর গভীর শ্রদ্ধা ছিল, কবীরকে তিনি যত শ্রদ্ধা করিতেন তত শ্রদ্ধা তিনি বোধ হয় কাহাকেও করেন নাই। কারণ কবীরের সাধনার পথেই তাঁর সাধনা, আর তাঁর কাছে তিনি অশেষভাবে ঋণী। কিন্তু তবু যখন তিনি শুনিলেন যে সাধন যাহা করিবার, উপলব্ধি যাহা করিবার, সবই কবীরের সময়েই হইয়া গিয়াছে, এখন সংসার আছে শুধু ঘোল খাইতে; তখন তিনি এই মতকে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণও হেয় মনে করিলেন। ইহাতে কেবল যে প্রাচীন সাধকের দোহাই দিয়া পরবর্ত্তী সব কালের সাধক ও সাধনার অপমান করা হয় শুধু তাহাই নয়, ইহা যেন এক কালের বিরুদ্ধে অন্য কালকে “লড়াইয়া” দিয়া এক রকম প্রচ্ছন্ন যুদ্ধ পিপাসা মিটান; মানুষ যেমন চিতাবাঘ, মুরগী, মহিষাদি “লড়াইয়া” নিজেদের প্রচ্ছন্ন হিংসাবৃত্তি (Vicarious) বিকৃতভাবে উপভোগ করে। তাহাতে ব্রহ্মতত্ত্বেরই অবমাননা। কারণ ব্রহ্মরসের কি এতই দৈন্য যে কেহ তাহা নিজ জীবনে পাইলেই পরবর্ত্তী কালের জন্য তাহা ফুরাইয়া গেল? ব্রহ্মরস হইল রসের সাগর; যে যত বড় পিপাসুই হউক না কেন তাহার সকল পিপাসা মিটাইয়া ও সে সাগর সাগরই থাকিবে। তাই এই রস সকল যুগে সকল দেশে সমানভাবে সেব্য। যত বড় সাধকই হউক না কেন সেই রস-সিন্ধুর রস-সম্ভোগ করিয়া কি কেহ তাহার একবিন্দুও কমাইতে পারে?

“পক্ষী যদি সেই সাগরের নীর চঞ্চু ভরিয়া লইয়া যায় তবে সেই নীর কিছু কমিয়া যায় না। এমন কোন ভাণ্ডই সৃষ্ট হয় নাই যাহার মধ্যে এই পূর্ণ সাগর ধরে।”

চিড়ী চংচ ভরি লে গঙ্গ নীর নিঘটি নহি জাই।
ঐসা বাসন নাঁ কিয়া সব দরিয়া মাহিঁ সমাই॥

(দাদূ, পরচা কৌ অঙ্গ, ৩৩৩)।

দাদূর কথা শুনিয়া আকবর নিজের ভুল বুঝিলেন। দাদূ বলিলেন, "মানুষের মনের সঙ্কীর্ণতা, বৈষয়িকতা, স্বার্থপরতা নানা আকার ধরিয়া ধর্ম্মের ক্ষেত্রেও ঢুকিতে চায়। ইহাই সাম্প্রদায়িকতার রূপ ধরিয়া বিশেষ দেশ কাল ও বিশেষ সাধকদের পক্ষ হইয়া অন্য সকল সাধনাকে অপমান করিতে প্রবৃত্ত হয়। সাধনায় দেখিতে হইবে সাধকের কোন্ উপলব্ধি কোন্ ক্ষেত্রে কি পরিমাণে সত্য, ও কিসে কি পরিমাণে সার্থকতা ও পরিপূর্ণতার সম্ভাবনা। অন্য সব বৈষয়িক সঙ্কীর্ণতা যদি এ ক্ষেত্রে আসে তবে তাহা বলপূর্ব্বক দূর করিয়া দেওয়া উচিত। যদিও কবীর আমার গুরু, তবু আমি গুরুর নাম করিয়াও এমন অন্যায় করিতে পারি না। এবং আমার গুরুকে যদি লাঠীর মত ব্যবহার করিয়া অন্যের মাথা ভাঙ্গিতে উদ্যত হইতে হয় তবে তাহাতে আমার গুরুরই সব চেয়ে বড় অপমান।" আকবর ছিলেন মহাপ্রাণ, তিনি কথাটি বুঝিলেন।

একদিন প্রসঙ্গক্রমে নানাজনে কহিতে লাগিলেন, "মৃত্যুর অলঙ্ঘ্য শাসনের কাছে সব সম্পদই ব্যর্থ।" একজন কহিলেন "বাদশাহেরও যখন মরণ সময় উপস্থিত হয়, তখন যত বৈদ্য,যত যোদ্ধা, যত ধন সম্পদ, যত লোক লস্কর এ সবও যদি সম্মুখে খাড়া করা হয় তবু এ সবই দেখিতে দেখিতে তাঁহাকে চলিয়া যাইতে হয়।"

বাদশাহ মরতী সময়, সব ঠাড়ে কিয় লায়।
বৈদ শূর ধন লোগ কুল, সবহি দেখতে জায়॥

দাদূ বলিলেন, "তোমরা মিথ্যাকে যদি আশ্রয় কর তবে ব্যর্থ ও নিরাশ হইতে হইবেই। জীবনের যিনি আধার জীবন তাঁহাতে রাখ, তবে জন্ম মৃত্যুতে কোনো দুঃখই থাকিবে না।"

"ঔষধ ও মূলের যে ভরসা কর, সে সব কিছু নয়, সে সব মিছা কথা। তাতেই যদি মানুষ বাঁচিত তবে আর কেহ মরে কেন?"

(নিহকরমী পতিব্রতা অঙ্গ, ৬৬)

"মরণকে ভয় করিবেই বা কেন? সমস্ত জীবনের অন্তিম পরিণতিই হইল মরণ।"

(দাদূ, সূরাতন অঙ্গ, ৪৭)

"হে দাদূ, মরণই তো চমৎকার, মরিয়া তাঁহার মধ্যে মিলিয়া যাও।"

(দাদূ সূরাতন অঙ্গ, ৫২)

"বাঁচিতে ও স্বামীর সম্মুখে মরিতে ও তাঁর সম্মুখে। হে দাদূ, জীবন মরণের জন্ত যেন কেহ দুশ্চিন্তা না করে।"

(দাদূ, নিহকরমী পতিব্রতা অঙ্গ, ১৭)

"হে দাদূ ব্রহ্মের বাণী শোন, এই ঘটেই উপলব্ধির প্রকাশ হইবে।"

(দাদূ, পরচা কৌ অঙ্গ, ২০৮)

"এই উপলব্ধিতেই পরমানন্দ, যদি সকল ভয়ের অতীত সেই নাম উপলব্ধি হয়। তখন অগম্য অগোচরের মধ্যে নির্ম্মল, নিশ্চল নির্ব্বাণ পদ লাভ হয়।"

(দাদূ, পরচা কৌ অঙ্গ, ২০৩)

"নিত্য জীবনের সঙ্গে যে যুক্ত সে-ই জীবন্ত, যে মৃত বস্তুর সঙ্গে যুক্ত হইয়া চলে সে মৃত্যুই লাভ করে।"

(দাদূ, সজীবন কৌ অঙ্গ, ১৭)

"হে দাদূ, ভাবিয়া দেখ ধরিত্রী কি সাধন করিয়াছে, আকাশ কোন যোগাভ্যাস করিয়াছে, রবি শশী কোন দীক্ষার ও সাধনার বলে অমৃতত্ব লাভ করিল?"

(দাদূ, সজীবন কৌ অঙ্গ, ৪৯)

"যে জন ভগবানের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করিয়া রাখিল, হে দাদূ, কোটি মৃত্যু যদি তার কাছে চীৎকার করিয়া যায় তবু তাতে তার কিছুই আসে যায় না।"

(দাদূ, সজীবন কৌ অঙ্গ, ৫১)

(৪০) **তাত্ত্বিক ও শুকপাখী**—এক জন তাত্ত্বিক (Theologion) আকবরের সঙ্গে দিল্লী হইতে আসিয়াছিলেন। তিনি শুনিয়া শুনিয়া একদিন বলিলেন, "তোমাদের নিত্য নূতন কথা। বেশ একটা স্থির মত হয় তবে বুঝি। এই রকম যদি কোনো শিক্ষাদাতা দিতে পার যিনি সব

স্থির অচল মত শিক্ষা দেন তবেই ভাল হয়।” নানা কথার পর দাদূ আকবরকে বলিলেন, “তবে তুমি না হয় একটী শুকপাখী লইয়া যাও। শুন হে আকবর শাহ, আমার সঙ্গে কেবল তুমিই আছ।” (অর্থাৎ তোমার কথা বুঝি আমি, আর আমার কথা বোঝ তুমি, আর ইঁহারা যে এখানে ভীড় করিয়া আছেন তাঁহারা আমাদের এই সব মর্ম্মসত্যের কিছুই বোঝেন না।)

গুর দাদূ আকবর মিলে কহী সুব্বৌ লে জাহ।
হমরে সংগ তো আপ হৈ সুনো অকব্বর শাহ॥

সেই সময়ে এক মৌলবী দাদূকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন “তুমি তো কোরাণ পড়িয়া হাফিজ (যে কোরাণ কণ্ঠস্থ করিয়াছে) হও নাই, তুমি আবার ধর্ম্মের কি বোঝ?” দাদূ উত্তর করিলেন “সাধারণ শুকপাখী অতো বোঝে না, তার একমাত্র ভরসা মুখস্থ কথা। তাই কেবল এক মুখস্থ কথাই সে বার বার উচ্চারণ করে, তাকে কোন কথা বলিলে বার বার উচ্চারণে সে তাহাকে আরও মিথ্যা করিয়া তোলে।” “আমার এই দেহ পিঞ্জরের মধ্যে যে মন শুকপাখী আছে, সে এক আল্লার নাম পড়িয়াই হাফিজ হইয়া গিয়াছে।”

দাদূ য়হ তন পিঁজরা মাহীঁ মন সুব্বা।
একৈ নাম অলাহ কা, পঢ়ি হাফিজ হুব্বা॥

(দাদূ, সুমিরণ কৌ অংগ, ৯০)

একদিন আলোচনার সময় আকবর দাদূকে কহিলেন “প্রভুর বিষয়ে চারটি জ্ঞাতব্য আছে, তাহা আমাকে বুঝাইয়া বলুন। তাঁর কি জাতি, কি অঙ্গ, কি সত্তা, ও কি রঙ্গ (প্রকাশ), তাহা বুঝাইয়া দিন।”

গুর দাদূ সৌঁ বাদশাহ বুঝী চারি কো বাত।
জাতি অংগ ঔজূদ রংগ সাহেবকে বিখ্যাত॥

দাদূ ইহার উত্তরে কহিলেন “প্রেমই ভগবানের জাতি, প্রেমই ভগবানের অঙ্গ, প্রেমই তাঁহার সত্তা, প্রেমই তাঁহার রঙ্গ (প্রকাশ)”

দাদূ ইশ্‌ক অলহকী জাতি হৈ ইশ্‌ক অলহকা অংগ।
ইশ্‌ক অলহ ঔজূদ হৈ ইশ্‌ক অলহ কা রংগ॥

(দাদূ, বিরহ কৌ অঙ্গ, ১৫২)

আকবর তখন প্রশ্ন করিলেন,"এমনই যদি হয় তবে সাধনার চেহারা হইবে কিরূপ? ঈশ্বর যদি কেবল সত্য স্বরূপই হইতেন তবে জ্ঞানই হইত বড় কথা। ঈশ্বর যখন প্রেমস্বরূপ তখন সাধনাও তদনুরূপ হওয়া চাই।" দাদূ তাহার উত্তরে বলিলেন "ঠিক কথা, তাই সেই প্রেমরসে মন মত্ত থাকা চাই। তাঁকে পাইবার, প্রেম দিয়া প্রত্যক্ষ করিবার ব্যাকুলতা, সদা জাগ্রত থাকা চাই; সেই প্রিয়তম বন্ধুর কাছে হৃদয় সদা হাজির থাকা চাই, তাঁর স্মৃতিরসে সদা সচেতন থাকা চাই।"

ইশ্‌ক মহব্বতি মস্‌ত মন তালিব দর দীদার।
দোস্ত দিল হরদম হুজুর য়াদিগার হুসিয়ার॥

(দাদূ বিরহ কৌ অংগ, ৬৪)

আকবর জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি যে এইরূপ অসাম্প্রদায়িক উদার মতবাদ পোষণ করিলে তাহাতে চারিদিকে নানাবিধ বিরুদ্ধতা অনুভব কর নাই?" দাদূ কহিলেন, "যে দিন হইতে আমি সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি ছাড়িয়া দিলাম সেদিন হইতেই সবাই হইলেন রুষ্ট, কিন্তু সদ্‌গুরুর প্রসাদে আমার না হইল হরষ না হইল শোক।"

দাদূ জবথৈঁ হম নির্পখ ভয়ে সবৈ রিসানে লোক।
সতগুরকে পরসাদথৈঁ মেরে হরষ ন সোক॥

(মধি কৌ অংগ, ৫৯)

চল্লিশ দিন ব্যাপী তাঁহাদের এই মিলনে কত রকম আলোচনা, কত রকম আলাপ, কত ইঙ্গিত, কত সমাধান কত রস ও আনন্দের কথাই হইল। ভক্তেরা সে সব কথা নানা ভাবে ধরিয়া রাখিয়াছেন। কেবল তাহা লইয়াই একখানি গ্রন্থ রচিত হইতে পারে। তাঁহাদের এই উৎসবময় দিনগুলি শেষ হইয়া আসিল। পাতশাহের সঙ্গীয় পণ্ডিতেরা তাঁহাদের এই আলাপ শুনিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা ঠিক ধরিতে পারুন বা না পারুন ইহা তাঁহারা বুঝিলেন যে দাদূ একজন অসাধারণ সাধক ও জ্ঞানী। এ সব জ্ঞান তিনি পাইলেন কোথায়? তাই পণ্ডিতেরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি তোমার শাস্ত্র, কে তাহার লেখক, কোন্ পণ্ডিত তাহা তোমাকে

দিলেন বুঝাইয়া ?" ধর্ম্ম তাত্ত্বিকেরা (theologian) প্রশ্ন করিলেন "কোথায় তুমি নেমাজ রোজা করিলে, কে তোমার সাধনার সাক্ষী, কেমন তোমার জাপ, কেমন তোমার "গোসল" (স্নান) ও "ৱজূ" (উপাসনার পূর্ব্বের অঙ্গ প্রক্ষালন, আপোমার্জন বা উপস্পর্শ) ?"

দাদূ উত্তর করিলেন "এই কায়া মন্দিরের মধ্যেই নেমাজ করি, যেখানে বাহিরের আর কেহ আসিতে পারে না। মন মালারই সেখানে জাপ করি, তবে তো স্বামীর মন হয় প্রসন্ন। চিত্তসমুদ্রে আমার স্নান, সেখানে ধৌত ('ৱজূ') করিয়া আমি আমার নির্ম্মল চিত্ত তাঁর চরণে আনি ; তখন আমার প্রভুর আগে আমি প্রণতি করি ; বার বার আমি তাঁহার মধ্যে আত্মসমর্পণ করি।" (দাদূ, সাচ কৌ অঙ্গ, ৪২, ৪৩,)

দাদূ কায়া মহলমেঁ নিমাজ গুজারূঁ তঁহ ঔর ন আৱন পাৱৈ।
মন মণকে করি তসবী ফেরূঁ তব সাহিব কে মন ভাৱৈ॥ ৪২
দিল দরিয়া মৈঁ গুসল হমারা ঊজূ করি চিত লাঊ।
সাহিব আগৈ করূঁ বন্দগী বের বের বলি জাউঁ॥

(দাদূ সাচ কৌ অঙ্গ, ৪৩)

"লোকেরা যে দেখাইবার জন্য শোভার জন্য রোজা করে, নেমাজ করে, উপাসনায় আসিবার জন্য জোরে আজান দেয় সে পথ আমার নয়। আমার সবই হইল প্রিয়তমের জন্য, কাজেই আমার সবই অন্তরের মধ্যে।"

"সোভা কারণ সব করৈ, রোজা বাংগ নেমাজ।"

(দাদূ সাচ কৌ অঙ্গ, ৪৫)

দাদূ বলিলেন, "সংস্কার ও জরাজীর্ণ মতবাদে মলিন না করিয়া নির্ম্মল পটের মত দেহমনপ্রাণ তাঁর হাতে সঁপিয়া দেও, যেন তিনি নিজে ইহাকে লিখিয়া পুঁথী করিয়া দেন। নিজের প্রাণকেই কর পণ্ডিত, সে-ই তাহা দিবে পড়িয়া। দাদূ বলেন, এমন করিয়াই সেই অলেখের কথা পারিবে বলিতে।"

পোথী অপনা প্যণ্ড করি হুরি জস মাঁহৈঁ লেখ।
পংডিত অপণা প্রাণ করি, দাদূ কথহু অলেখ॥

(দাদূ, সাচকে অংগ, ৪০)

“কায়াকেই বল কোরাণ, পরম দয়াল তাহাতে লেখেন, মনকেই বল মোল্লা, সেই পবিত্র স্বরূপ পরমেশ্বরই তাহা শোনেন।”

কায়া কতেব বোলিয়ে লিখীঁ রাখুঁ রহিমান।
মনহাঁ মুল্লা বোলিয়ে সুরতা হ্যায় সুবহান॥

(দাদূ সাচকৌ অংগ, ৪১)

দাদূর সমাগমের সেই বৎসর হইতেই আকবর নিজ মুদ্রায় ও অন্যত্র সাম্প্রদায়িক মুসলমান সনের বদলে নূতন প্রবর্ত্তিত ইলাহী কলমা চালাইতে লাগিলেন। এখনো তাঁর সেই মুদ্রা পাওয়া যায়, তার এক পীঠে “অল্লাহু অকবর” ও অন্য পীঠে “জল্ল জলালুহু” বাক্য অঙ্কিত।

জনগোপাল বলেন বড় দুঃখে এই দুই মহাপুরুষ পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেন কিন্তু দূর হইতেও ইহারা ভাবের আদান প্রদান চালাইতে থাকিলেন।

কথিত আছে বাদশাহের ক্রমে এমন বৈরাগ্য হইল যে তিনি একদিন দুঃখ করিয়া বীরবলকে বলিলেন “হায় মৃত্যুর কথা সব সময় মনে থাকে না।” তখন বীরবল অনেক কবর-খনক আনিয়া কবরের কাছে খাড়া করিয়া দেখাইলেন।

কহী বাদশাহ মোঁহি কোঁ মীচ ন য়াদ রহায়।
লায় বীরবল বোড় বহু খড়ে দিখায়ে আয়॥

দাদূ এই প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, সর্ব্বত্রই তো মৃত্যু ও তাহার আনুষঙ্গিক আয়োজন চলিয়াছে। অতএব,“সকলে জাগ, বৃথা ঘুমাইও না, কাল উপস্থিত। তাঁহার শরণ ত্যাগ করিলে কালের আঘাতে বাঁচিবে কিসে?”

(দাদূ, কালকৌ অংগ, ৬৬-৬৭)

(৪১) **দাদূ ও রাজা ভগবংত দাস ঃ** যাহা হউক আকবরের সঙ্গে আলাপ আলোচনার পর দাদূ আমেরে ফিরিয়া আসিলেন। আমেরেও তাঁর থাকার পক্ষে একটী বিঘ্ন সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছিল। সে সময় জয়পুরে রাজা ছিলেন মহারাজা ভগবংত দাস। ইহার পুত্র মানসিংহের নাম সবাই জানেন। এই ভগবংতদাসের অভিষেকের সময় রাজ্যের ছোট বড় অনেকেই রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। দাদূ তাঁরই রাজ্যে আমেরে থাকিয়াও রাজার সঙ্গে দেখা করেন নাই। যিনি দিল্লীপতির

নিমন্ত্রণকেও অগ্রাহ্য করিতে পারেন তাঁহার পক্ষে যে এ সব রাজার প্রতাপকে হিসাব করিয়া চলা সম্ভব নয় তাহা বলাই বাহুল্য। তবে এ ভাবটা তাঁহার অহঙ্কারপ্রসূত নয়। তিনি তাঁর আপন সত্য ও সাধনা লইয়াই ভরপূর ; এ সব লৌকিকতার কথা তাঁর মনেই আসে নাই। ভগবানের ভাবে ডুবিয়া দাদূ এ সব শক্তিকে গ্রাহ্যই করেন নাই। তিনিই তো বলিয়াছিলেন "হে ভগবান, দাদূ রাণা রাও কাহাকেও গণ্য করে না, সে জানে শুধু তোমাকে। তুমি ছাড়া সবই ভূয়া"।

(সুরাতন অংগ, ৭৩)

অবশেষে একদিন মহারাজা ভগবংত দাস দাদূর আশ্রমে দেখা করিতে গিয়া কিছু কথাবার্ত্তার পর জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কতদিন এখানে আছেন ?" দাদূ বলিলেন,"অনেকদিন হইতেই তো এইখানে আছি।" রাজা কহিলেন, "কৈ, কখনও তো আপনাকে দেখি নাই।"

দাদূ বুদ্ধিমান ছিলেন, রাজার কথার ইঙ্গিত বুঝিলেন কিন্তু কিছু বলিলেন না। রাজা যখন আশ্রম হইতে বিদায় নেন—তখন দাদূর দুই কন্যা বাহিরে বসিয়াছিলেন। তাঁহারা তখন যুবতী, অথচ বিবাহে অসম্মত থাকায় দাদূ তাঁহাদিগকে বিবাহ করিতে বাধ্য করেন নাই। তাঁহারা জ্ঞান ও ভগবৎ-সাধন লইয়াই জীবনে অগ্রসর হইতেছিলেন। ভগবংত দাস এই কন্যা দুইটিকে দেখিয়া সঙ্গীদের জিজ্ঞাসা করিলেন "এই কন্যা দুইটি কার ?" শুনিলেন তাঁহারা দাদূর কন্যা। জিজ্ঞাসা করিলেন "বিবাহ হইয়াছে ?" জানিলেন বিবাহ হয় নাই। তখন বলিলেন, "বয়স হইয়াছে তবু বিবাহ হয় নাই কেন ?" দাদূর কোনো অনুরাগী সাধক রাজার সঙ্গে ছিলেন। তাঁহাকে আমেরের রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন "এই মেয়েদের এখন বিবাহ দেওয়া উচিত নয় কি ?" রাজা উত্তর পাইলেন, "কবীর যাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন, ইহাঁরাও তাঁহাকেই পতিত্বে বরণ করিবেন।"

নৃপ পূছী আংবের কে বায়াঁ কো ত্যো ব্যাহি।
জো পতি বর্‍্যো কবীরজী সো করি বর্‍্যো নিচাহি॥

ইহাদের ভাবেই দাদূ পরে লিখিয়াছিলেন, "জীবনে বরণ করিব ভগবানকেই। সেই পরম পুরুষই আমার স্বামী অন্য সব পুরুষের আমি বহিন।"

আন পুরিষ হূঁ বহনড়ী পরম পুরিষ ভর্ত্তার ॥

(নিহকরমী পতিব্রতা কৌ অংগ, ৩৯)

দাদূ ইহাদের কথাই পরে প্রতিধ্বনিত করিয়া বলিয়াছেন—"যিনি ছিলেন কবীরের কান্ত সেই বরকেই করিব বরণ।"

(দাদূ, পীব পিছাঁন কৌ অঙ্গ, ১১)

তবু রাজার এই প্রশ্নের কথাটা শুনিয়া দাদূ ভাবিয়া দেখিলেন। তিনি বুঝিলেন নানা কারণে এখানে খিটিমিটি বাধিতেছে। এ স্থান ত্যাগ করাই ভাল। রাজা ভগবংত দাস যে কন্যাদের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন, এ কেবল তাঁর সামাজিক সংস্কার সেরূপই ছিল বলিয়া। আসলে ভগবংত দাস একটু অভিমানী হইলেও খুব সচ্চরিত্র মানুষ ছিলেন।

দাদূ নিজেও একবার কন্যাদের বিবাহের কথা নিয়া তাঁদের সঙ্গে আলাপ করেন। তাহাতে কন্যারা বুঝাইয়া বলেন যে তাঁহারা সাধনার জীবনই চালাইতে চাহেন। দাদূ গৃহস্থ জীবনের সাধনা পছন্দ করিলেও জোর করিয়া কন্যাদের বিবাহ দেন নাই। এই কন্যাদের বাণী এখন দুষ্প্রাপ্য। এক আধটুকু যে নমুনা সাধু ভক্তদের মুখে মুখে মেলে তাহা চমৎকার। ইহাঁদের সাধনার মন্দিরে এখনও বহুনারী দর্শন ধ্যান ও সাধনাদি করিতে যান। ইহাঁদের বাণী যদি কখনও পাওয়া যায় তবে এক অমূল্য সম্পদ বাহির হইবে। দাদূর আরও কয়েক জন নারী ভক্তের কথা ভক্তেরা বলেন।

ইহার পর দাদূ কিছুদিন মারবাড়, বিকানীর প্রভৃতি নানা স্থানে অস্থায়িভাবে বাস করিলেন। কল্যাণপুরে যখন দাদূ যান তখন তাঁর বয়স পঞ্চাশ।

"কল্যাণপুর পঁচাশা জাহী।"

(জন গোপাল, ২৯ বিশ্রাম, ২৭ চৌপাঈ)

কাহারও কাহারও মতে দাদূ কল্যাণপুর হইতে ৩৭ বৎসর বয়সে নরাণায় যান। সেখানে তিনি নির্জ্জন বাসের জন্য প্রত্যাদেশ পাইয়া ভরাণাতে যান ও ভগবানে সমাহিত হইয়া যান.।

৪২। **জীবনের শেষকাল।** ১৬০২ ঈশাব্দে ৫৯ বৎসর বয়সে দাদূ দ্বিতীয়বার আম্বোসাতে যান। দাদূর সাথে ছিলেন ভক্ত ক্ষেমদাস ও ভক্ত জায়সা। তখন সুন্দরদাসের বয়স ৭ বৎসর। ১৫৯৪ সালে

দাদূ পূর্ব্বে দ্যৌসা গিয়াছিলেন। তখন তাঁহারই আশীর্ব্বাদে ১৫৯৫ সালে সুন্দরদাসের জন্ম হয়। তাই পিতামাতা সুন্দরদাসকে সাধুর চরণমূলে দীক্ষার নিমিত্ত উপস্থিত করিলেন। বালকের নাম কেমন করিয়া সুন্দরদাস হইল তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। * পরে ইনি একজন মহাকবি হইলেন। দাদূ ইহার পর নরাণা যাইয়া বাস করিলেন। এই নরাণাতে মাত্র তিনি এক বৎসর ছিলেন। এইখানেও সাধু সজ্জনে তাঁহার আশ্রমটি সদা ভরপূর থাকিত।

একদা দাদূ নরাণায় ছিলেন, অনেক সাধক আসিয়া সেখানে দর্শন দিলেন।

আপ নিরাণে গুহামেঁ সংতন দিয়ো দিদার।
তব য়া সাখীপদ কহ্যৌ রামকলী মধসার ॥

দাদূ আনন্দে কহিলেন, "কি সৌভাগ্য আমার যে সাধুদের দর্শন পাইলাম। রাম রসায়ণ পান করিলাম, কাল মৃত্যু এখন আমার করিবে কি ?"

দাদূ মম সির মোটে ভাগ সাধূঁ কা দর্শন কিয়া।
কহা করৈ জম কাল রাম রসাইণ ভরি পিয়া ॥

(দাদূ, সাধকৌ অঙ্গ, ১২১)।

৪৩। **দেহত্যাগ ঃ** ১৬০৩ ঈশাব্দে জ্যৈষ্ঠমাসের কৃষ্ণাঅষ্টমী শনিবারে দাদূ দেহত্যাগ করিলেন।

সমৈ গুণসঠা নগর নরাণে।
সাঠে স্বামী রাম সমাণেঁ ॥

(জনগোপাল ২৯, ২৭ চৌপাই)।

জনগোপাল মতে উনষাট বৎসর বয়সে দাদূ নরাণে যান ও ষাট বৎসর বয়সে ভগবানে প্রবেশ করেন। কাহারও কাহারও মতে তখন দাদূর বয়স হইয়াছিল ৫৮ বৎসর ২ মাস ১৫ দিন।

এই নরাণা এখন দাদূপন্থী সাধুদের প্রধান মন্দির ও মুখ্যস্থান। এখানে দাদূর গাদী আছে, মন্দিরের মধ্যে তাঁহার গ্রন্থ প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রতি বৎসর ফাল্গুন শুক্লা চতুর্থী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত এখানে খুব বিরাট মেলা

---

* প্রকরণ (১৪ ও ৬০) দ্রষ্টব্য।

হয় ও বহু বহু সাধু সজ্জনের সমাগম হয়। হাজার হাজার সাধু সে সময়ে একত্র হন।

তাঁর মৃত্যুর সময় তাঁর অনুরাগী ভক্ত ও সাধকজনে স্থানটি ভরপূর ছিল। মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র গরীবদাসজী তাঁর অন্ত্যেষ্টি ও শ্রাদ্ধক্রিয়া করেন। সকলে গরীবদাসকেই চালকরূপে মানিয়া লইলেন। গরীবদাস চালক হইলেও সকলেরই স্বাধীনতা ভালবাসিতেন। কোন কারণে সুন্দরদাস গরীবদাসের উপর বিরক্ত হইয়া কিছু কটূক্তি করেন। তাহা সত্ত্বেও গরীবদাস বলেন "এতটুকু বালকও যে সত্যের জন্য আমাদের বিরুদ্ধে নির্ভয়ে দাঁড়াইতে পারেন, তাহাতে আমার অনেকটা ভরসা হইল। আমাদের আশা আছে।" এই সব কথা অন্য প্রকরণে বলা হইবে।

দাদূর স্বকথিত সাধনার পরিচয়

৪৪। **নিজের ও নিজের সাধনার পরিচয়।** সুধাকর দ্বিবেদী মহাশয়ের মতে দাদূ আসাবরী রাগের ১৪ সংখ্যক গানে (২২৭ সংখ্যকপদ) আপন নাম যে "মহাবলি" ছিল তাহা জানাইয়াছেন। সুরাতন অঙ্গের ৩৩ বাণীতে ও তিনি আপনার নাম যে "মহাবলি" ছিল তাহা জানাইয়াছেন।

গুংড রাগের ১৯ সংখ্যক গানে বুঝিতে পারি তিনি সদাই নিন্দুকদের কি প্রকার আঘাত সহ্য করিয়াছেন। এ সব সহিয়াও ভগবানের কাছে তাহাদের কল্যাণ প্রার্থনাই করিয়াছেন।

"রামদেব তুম্হ করউ নিহোরা।"

নিন্দুকদের কাছে দুঃখ পাইবার কথা আগে ও বলা হইয়াছে (৩৩১ পদ)। ভৈরোঁ রাগের ২৪ সংখ্যক (আসলে হওয়া উচিত ৪৬) পদে (ত্রিপাঠী ৩৯৭ পদ) তিনি আপনাকে ধুনিয়া বলিয়া জানাইয়াছেন। দ্বিবেদী মহাশয় বলেন ইহা দ্বারা তিনি যে জাতিতে ধুনকর ছিলেন তাহা বুঝায় না। তিনি সাধনার দ্বারা সত্য হইতে মিথ্যাকে ধুনিয়া পৃথক করিয়াছিলেন, জীবনকে

কোমল ও পবিত্র করিয়াছিলেন। ত্রিপাঠী মহাশয় এখানে "তুনিয়া" পাঠ ধরিয়াছেন।

তিনি যে ধর্ম্ম কর্ম্ম সংসার সবই করিয়াছেন তাহা শিষ্যরা চাপিয়া যাইতে চাহিলে ও তিনি পরিষ্কারভাবে বলিয়াছেন—

"পহিলে হম সব কুছ কিয়া ধরম করম সংসার।"

(দ্বিবেদীর পাঠ "ভরম করম" দাদূ, উপজঅংগ, ১৬)।

অর্থাৎ "ধরম করম সংসার সবই আমি আগে করিয়াছি।" শিষ্যেরা বুঝাইতে চান দাদূ ইহাতে পূর্ব্বজনমের সব ব্যর্থ সংসারধর্ম্মের কথা বলিয়াছেন।

তিনি পণ্ডিত বা জ্ঞানী ছিলেন না, কৃচ্ছ্র, কৃত্রিম তপস্যা ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও তীর্থভ্রমণ তাঁর ছিল না, মূর্ত্তিপূজা ও যোগসাধনা তাঁর ছিল না, ঔষধ মূল তিনি দিতেন না, নানা দেশের বর্ণনা দিয়া ও লোককে চমৎকৃত করিতে পারিতেন না, তাঁর নিজের বেশভূষায় চেহারার ও বিশেষ কোনো অসাধারণত্ব ছিল না, তাঁহার ভরসা ছিল এক ভগবানের এবং তাঁর মাধুর্য্যই তিনি যে চিনিয়াছিলেন তাহা তাঁর আসাবরী রাগের ৩ সংখ্যক সবদে জানাইয়াছেন।

আপন জাতির ও আপন সম্প্রদায়ের (জাতি পংক্তির) লোকের সঙ্গে বসিয়া তাঁর মন কখনও তৃপ্তিমানে নাই। সেরূপ সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক ভ্রান্তি তাঁর ছিল না।

(দাদূ, সাচ অঙ্গ, ১২৩, ১২৪)।

পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে (২০ প্রকরণ দ্রষ্টব্য) তিনি আপনার উদ্যমে ও ভগবানের প্রসাদে সকল পরিবার পোষণ করিয়াছেন (দাদূ, বিশ্বাস অঙ্গ, ৫৪)। যাহা করিবার তাহা ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া নির্ভয়ে থাকাই তাঁর মত ছিল (দাদূ, বিশ্বাস অঙ্গ, ১৪)। ভগবানের পুত্র কন্যা সকলকে লইয়া যে বিরাট ভাগবত পরিবার তাহাও তিনি বিস্মৃত হন নাই। বিশ্বজগতের সবাই ভাই ভগ্নী, সবাই এক পরম পিতার সন্তান (দাদূ, মায়া অঙ্গ, ১২০)।

সংসার ছাড়িয়া বনে গিয়া বৈরাগ্যে আপনাকে শুষ্ক করিয়া মারাও দাদূ পছন্দ করেন নাই। লোকে মনের চাঞ্চল্য দূর করিতে না পারিয়া সংসারের

উপর বৃথা বিরক্ত হইয়া উদাসীন হইয়া সংসার ছাড়িয়া বনে যে বাস করে, দাদূর মতে তাহা বৃথা। সেখানে রাত্রি দিন ভয়ানক ভীতি; নিশ্চল বাস হইবে কি করিয়া? মনের চঞ্চলতা যাইবে কোথায়?

(দাদূ, দয়ানির্বৈরতা অঙ্গ, ৩৩)।

দাদূর মতে জীবন যাত্রা হওয়া চাই নদীর মত সহজ। নদী নিরন্তর তাহার চরম লক্ষ্য অসীম সমুদ্রের দিকে চলিতেছে এবং সেই চলার সঙ্গে সঙ্গে দুই তীরের "বন ও জীবন", ওষধি বনস্পতি জীবজন্তু ও মানব সকলকেই তৃপ্ত করিয়া সেবা করিয়া দিনের পর দিনগুলি সেবাব্রতে পূর্ণ করিয়া চলিয়াছে। দাদূ নানা ভাবে ইহা কহিয়াছেন যে "সে-ই তো সত্য সাধক নদীর মত যার সাংসারিক জীবনযাত্রা।" "সে কিছু রুদ্ধ করিয়াও রাখে না মিথ্যা ও আচরে না। (আপনাকে) ব্যয় করিয়াও চলে আপনিও সম্ভোগ করে। নদীর পূর্ণ প্রবাহ যেমন সহজভাবে চলে তেমন যদি এই সাংসারিক জীবন চলে তবে সবই সহজ। মায়াকে রুদ্ধ করিয়া রাখিতে গেলেই বিপদ। মায়া যদি প্রবাহের মত আসে ও যায় তবে সেও বিকৃত হইবার অবসর পায় না।"

রোক ন রাখৈ ঝূঠ ন ভাখৈ দাদূ খরচৈ খাই।
নদী পূর প্রবাহ জ্যোঁ মায়া আবৈ জাই॥

(দাদূ, মায়া অংগ, ১০৫)।

এখানে বলা উচিত তখনকার সাধকেরা আধ্যাত্মিক জীবনে স্থির শান্তি চাহিয়াছেন, সেখানে চপলতা মারাত্মক। আবার সাংসারিক জীবনে স্থিরতাই সর্ব্বনাশের কথা। আধ্যাত্মিক জীবনের কথাতে কবীর বলিয়াছেন, "চাহিয়া দেখ সেই পরমানন্দের মধ্যে অপূর্ব্ব বিশ্রাম—

দেখ রোজ়্‌দমেঁ অজব বিসরাম হৈ।

(কবীর, ২য়, ঝুলন)

এখানে যে দাদূ নদীর মত জীবন যাত্রার কথা বলিলেন তাহা হইল সাধকের সাংসারিক জীবনে। কিন্তু কি আধ্যাত্মিক সাধনার অচঞ্চল শান্তিতে কি সাংসারিক জীবনের সহজগতিতে, সর্ব্বত্রই সহজ হওয়া চাই।

সহজপথ। কবীর দাদূ প্রভৃতির মতে সাধনা হইতে হইবে সহজ। প্রতিদিনের জীবনের সঙ্গে চরম সাধনার কোনো বিরোধ থাকিবে

না। এখনকার বৈজ্ঞানিক ভাষায় বলিতে হইলে বলিতে হয় পৃথিবী যেমন তার কেন্দ্রের চারিদিকে ঘুরিয়া তাহার দৈনিক গতি সম্পন্ন করিতেছে ও সেই গতিই তাহাকে সূর্য্যের চারিদিকে বৃহৎ বার্ষিক গতির পথে দিনের পর দিন অগ্রসর করিয়া দিতেছে তেমনি দৈনিক জীবন শাশ্বত জীবনকে সহজে অগ্রসর করিয়া দিবে। সূর্য্যের চারিদিকে বার্ষিক গতির পথে ভাল করিয়া চলিতে হইবে বলিয়া পৃথিবী তাহার দৈনিক গতি যদি বন্ধ করে তবে তার সব গতিই সমূলে যায় নষ্ট হইয়া।

এই যে দৈনিক গতির সঙ্গে শাশ্বত জীবনগতির সহজ যোগ, ইহাই হইল "সহজ-পংথ।" নদীর মধ্যে এই দুই জীবনের ভরপূর সামঞ্জস্য আছে। নদী দণ্ডের পর দণ্ড দুই তীরের অগণিত কাজ করিয়া চলিয়াছে সঙ্গে সঙ্গে অসীম সমুদ্রের মধ্যে সে আপনাকে নিরন্তর ডুবাইতেছে। তাহার দণ্ড-পল-গত জীবন তাহার শাশ্বতজীবনের সঙ্গে সহজ যোগে যুক্ত। ইহার একটাকে ছাড়িলে অন্যটা নিরাশ্রয় হইয়া পড়ে। তাই ভক্ত কবীর বলিয়াছেন "সংসার ও গৃহস্থজীবন ছাড়িয়া সাধনা নাই। সাধনায় কোনো "ঐঁচাতানী" অর্থাৎ কষাকষি টানাটানি নাই। সাধনাতে দৈনিক ও নিত্য লক্ষ্যের মধ্যে কোনো বিরোধ নাই।"

কবীর এই সত্যটি বুঝিয়া ছিলেন বলিয়াই সন্ন্যাসীর শিরোমণি হইয়াও ছিলেন গৃহস্থ। দাদূও ছিলেন তাই। কবীরের বাণীর মধ্যে সহজ ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। তাঁহাদের মতে সহজ পথই হইল সত্য পথ। ভক্ত সুন্দরদাস তাহার "সহজ-আনন্দ" গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"সহজ নিরংজন সব মৈঁ সোঈ।
সহজৈ সংত মিলৈ সব কোঈ॥
সহজৈ শংকর লাগৈ সেৱা।
সহজৈ সনকাদিক শুকদেৱা॥ ১৯

সোজা পীপা সহজি সমানা।
সেনা ধনা সহজৈ রস পানা॥
জন রৈদাস সহজ কোঁ বংদা
গুরু দাদূ সহজৈ আনন্দা॥" ২৩

"সেই নিরঞ্জন সহজ ভাবেই সব কিছুর মধ্যে আছেন, সেই সহজ ভাবেই সব সাধকরা মিলেন। এই সহজ ভাবেই শঙ্কর তাঁহার সাধনায় লাগিয়াছেন, সহজ মতেই শুকদেব সনকাদি সাধনা করেন। ভক্ত সোজা, ভক্ত পীপা, ভক্ত সেনা, ভক্ত ধন্না সহজ পথেই সহজ আনন্দ রস পান করিয়াছেন। রৈদাস ও সহজ মতেরই সাধক, গুরু দাদূরও আনন্দ ছিল এই সহজ মতে।"

এই মতে হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি সম্প্রদায়প্রসিদ্ধ বাহ্য আচার ও নিয়ম বৃথা আড়ম্বর মাত্র। এই সব বাহ্য প্রক্রিয়া ছাড়িয়া আত্মার ও পরমাত্মার নিত্য সহজ যোগেই নিত্য সহজ জ্ঞান ও সহজ আনন্দ। নারদ প্রভৃতি ঋষি হইতে আরম্ভ করিয়া কবীর রইদাস দাদূ প্রভৃতি সাধকেরা সহজ পথেরই সাধক ছিলেন (সুন্দরসার, হরিনারায়ণ কৃত, ১১১ পৃষ্ঠা)। তাই দাদূ বলেন নদীর মত আপনাকে একই সঙ্গে দৈনিক ও শাশ্বত সাধনাতে সহজে ছাড়িয়া দেও। সাধনার জন্য সংসারের কৃত্যকে বাধা দিয়া ঠেকাইয়া শক্তি সঞ্চয় করিতে যাইও না। কারণ তাহাই হইবে কৃত্রিম ও মিথ্যা। নদীর মত সকলকে তৃপ্ত করার দ্বারাই নিত্য সহজ যোগের আনন্দে অন্তরে অন্তরে ভরপূর হইয়া উঠিবে ও পরমানন্দ লাভ করিবে।

(দাদূ, মায়া অঙ্গ, ১০৫-১০৬ সাখীর সারমর্ম)।

নানাবিধ কৃত্রিম ভেখ বানাইয়া মানুষেরা নিজেদের তপস্যা দেখাইতে চায়। ইহার মধ্যে এক রকম নিজেদের দৈন্য বৈরাগ্য ও তপস্যা জাহির করিবার ভাব আছে। ইহা সাধারণ বিলাসিতা অপেক্ষাও প্রচণ্ড বিলাসিতা। কারণ, ইহাতে লোকে মনে করে যে দৈন্য, বৈরাগ্য ও সাধনাই চলিয়াছে। কিন্তু আসলে চলিয়াছে দৈন্য বৈরাগ্য ও তপস্যার প্রাণহীন মোহভরা আড়ম্বর। বিলাসিতার আনন্দ অপেক্ষাও তাহা সাধককে বৃথা জাঁকে জাকাইয়া তোলে, তাহাকে দিনে দিনে ব্যর্থ করে, তাই তাহা আরও ভয়ঙ্কর। তাই দাদূ বলেন "নানাবিধ ভেখ বানাইয়া সবাই চায় আপনাকে দেখাইতে, আপনাকে মিটাইয়া ফেলিয়া যে সাধনা সেই দিক দিয়াও কেহ যায় না।"

(দাদূ, ভেষ অঙ্গ, ১১ সাখী)।

এই বিষয়ে দাদূর শিষ্য রজ্জবজী চমৎকার বলিয়াছেন। "যোগের মধ্যেও এক রকম ভোগ থাকে, ভোগের মধ্যেও যোগ থাকিতে পারে।

তাই অনেক সময় মানুষ বৈরাগ্যে ডুবিয়া মরে, আর গার্হস্থ্য জীবন নিয়া মানুষ যায় তরিয়া।"

এক জোগমেঁ ভোগ হৈ এক ভোগমেঁ জোগ।
এক বুড়হিঁ বৈরাগমেঁ ইক তিরহিঁ সো গৃহী লোগ ॥
(মায়ামধি মুক্তি অঙ্গ, ৪৯)।

ভগবান্ নিত্য নিরন্তর বিশ্বচরাচরের সেবায় নিরত। তাঁর উদ্যমের আর অন্ত নাই। মানুষের বিপদ এই যে উদ্যম করিতে গিয়া সে যন্ত্রের মত চলিতে যায়, জড়ের মত নিজেকে অভ্যাসের অচেতন পথে ছাড়িয়া দেয়। যদি এই জড়তা হইতে জাগ্রত থাকিয়া মানুষ নিত্য সেবারত ভগবানের সঙ্গে থাকিয়া উদ্যম করে তবে উদ্যমই ধন্য। এই উপলক্ষেই তাঁর সঙ্গ লাভ করা যায়; তাঁর সঙ্গ যাহাতে মিলে তাহাই পরম সাধনা। দাদূ বলেন, "উদ্যম যদি সত্যই কেহ করিতে জানে তবে উদ্যমের কোনোই দোষ নাই। স্বামীর সঙ্গে থাকিয়া যদি উদ্যম করা চলে তবে সেই উদ্যমেই তো আনন্দ।"
(দাদূ, বেসাস অঙ্গ, ১০ সাখী)।

সব রকম জাগরণই সহজ ভাবে সত্য ভাবে হওয়া চাই। অনেক সময় ফললোভী মানুষের মন আপনাদের স্বরূপ ভাল করিয়া না জানিয়াই অপর সকলকে জাগাইবার লোভে কেবল উপদেশ শুনাইয়া বিশ্বসংসারকে অবিলম্বে জাগাইয়া তুলিতে চায়। আত্মোপলব্ধি করিবার মত অপেক্ষা করিবার বিলম্ব এই সব মানুষের সয় না। সাধকেরা ইহাঁদিগকে "কালরূপণ" বলিয়াছেন। দাদূ বলেন, "এক আশ্চর্য্য দেখিলাম, লোকে আত্মতত্ত্ব ভাল করিয়া বুঝিল না, গেল কি না অন্যকে উপদেশ দিয়া জাগাইতে! এমন করিয়া ইহাঁরা চলিয়াছেন কোন দিশায়?"
(দাদূ, গুরুঅঙ্গ, ১১৮ সাখী)।

"আত্ম-উপলব্ধি হইল না অথচ কথা রচনা করার শক্তি জন্মিল, দুই চারিটা পদ বা সাখী রচনা করা গেল, আর অমনি এই অনুভব মনে জন্মিল যে সংসারের মধ্যে আমি একজন জ্ঞানী লোক" (দাদূ, সাচ অঙ্গ, ৬৪ সাখী)। অনেকের পক্ষেই এই পথ হইল মরিবার পথ, কারণ আপনার সম্বন্ধে অতি মাত্রায় সচেতনতা সাধককে সমূলে বিনাশ করে।

১২

যে সাধক সহজ পথে আছে সে নিজেই ভাল বুঝিতে পারে না যে সে কতদূর অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। পরমাত্মার মধ্যে ডুবিয়া গিয়া সে আপনার কথা ভাল করিয়া বুঝিবার অবসর পায় না। আপনার সম্বন্ধে "অতি-চেত" (over conscious) হওয়াই হইল না-হওয়ার লক্ষণ। সহজ পথের পথিকের লক্ষণ হইল আপনার সম্বন্ধে অচেতন থাকা। এখনকার বৈজ্ঞানিক যুগে মানুষ খুবই জানে যে পৃথিবীতে বসিয়া মানুষ বুঝিতেও পারে না যে কত প্রচণ্ড বেগে সে প্রতি দণ্ডে অগ্রসর হইতেছে, অথচ গরুর গাড়ীর আরোহীকে পদে পদে যে তাহার গতি সম্বন্ধে সদাই সচেতন থাকিতে হয়! সেই যুগের সাধনার মর্ম্মজ্ঞরা ইহা জানিতেন, "যে মানুষ তাহার পথে উড়িয়া চলিয়াছে সে বলে এখনও পথেই পড়িয়া আছি। যে বলে 'আমি পৌঁছিয়াছি, চল চল তোমরা সবাই সেই পথে চল'; তাহার পথ পথই নয়, সে পথের কিছুই জানে না," (দাদূ উপজ অঙ্গ,১৫ সাখী) দ্বিবেদী সংস্করণ। ত্রিপাঠী সংস্করণের পাঠান্তরে দেখি "উজাড় পথে যে চলিয়াছে সে মনে করে ঠিক পথেই আছি। হে দাদূ যে পথ চলিয়াছে ও পৌঁছিয়াছে সে-ই জানে যে ওসব পথ পথই নহে।"

জ্ঞান হইতে অনুভব (realisation) অনেক বেশী গভীর কথা। যখন কোনো বস্তুকে দূরে রাখিয়া স্বাতন্ত্র্য না ঘুচাইয়াই দেখা যায় তখন হয় "জ্ঞান", আর আপনাকে কোনো ভাবের মধ্যে ডুবাইয়া দিয়া আনন্দরসে মজিয়া যাওয়া হইল "অনুভব"। "জ্ঞান" খুব সুনির্দ্দিষ্ট সীমাবদ্ধ বলিয়া কথায় আপনাকে প্রকাশ করিতে পারে। কিন্তু "অনুভব" আপনার আনন্দরসে আপন সীমা হারাইয়া ফেলে বলিয়া কথায় কিছুই প্রকাশ করিতে পারেনা। অনুভবের অনির্ব্বচনীয় ভাব হইতে অনির্ব্বচনীয় সঙ্গীতের সৃষ্টি, ভাষা সেখানে হার মানে। তাই দাদূ বলেন "জ্ঞান লহরী যেথান হইতে উঠিতেছে, সেখানে হইল বাণীর প্রকাশ। অনুভব যেখানে নিত্য উৎপদ্যমান (তার হওয়ার আর যেখানে বিরাম নাই, বীজ হইতে বৃক্ষের ন্যায় তার জীবন্ত বিস্তার যেখানে নিরন্তর চলিয়াছে) সেখানে সঙ্গীত করিল বাস" (দাদূ, পরচা অঙ্গ, ২৯ সাখী)।

তাঁহার মধ্যে ডুবিয়া সহজ হইতে হইবে। আমরা নিজে বুঝিয়া যাহা বলিতে যাইব তাঁহাই হইবে কৃত্রিম। তাঁহার কাছে নিজেকে মিটাইয়া ফেলিলে, আমাদের মধ্য দিয়া যখন তিনি অন্তরের ভাব ঢালিয়া দেন তখনই হয় যথার্থ

সঙ্গীত। বাঁশী যেমন আপনাকে শূন্য করিয়াই তাঁহার নিশ্বাসকে বাজাইয়া তুলিবার অবসর দেয় তেমন করিয়া সাধক আপনার ভিতরের অহমিকাকে লোপ করিলেই নিজেকে তাঁহার সঙ্গীত প্রকাশের যোগ্য আধার করিয়া তোলে। দাদূ বলেন, "তুমি কিছু রচনা করিওনা, তোমার মধ্য দিয়া তাঁহার রচনাই চলুক। তবেই হইবে সত্য সাখী ও সত্য সঙ্গীত।"

তাঁহার অসীম আনন্দের মধ্যে ডুবিলে তাঁহাকে স্বতন্ত্র করিয়া **জানার** সুযোগ হারাইতে হয়, তখন অপার আনন্দের **অনুভব** মেলে। আনন্দের সেই অনুভবের প্রকাশ তো বাক্যে হয় না।

প্রকাশহীন সেই ভাব দিবারাত্রি তখন মনকে রাখে ভারাক্রান্ত করিয়া। অন্তরের মধ্যের সেই প্রকাশাতীত অপার পূর্ণতাই বেদনার মত নিরন্তর মনকে থাকে ব্যথিত করিতে।

পার ন দেৱই অপনা গোপ গুংজ মন মাহিঁ ॥

(দাদূ, হৈরান অংগ, ১৩ সাখী)

এই ব্যথার মধ্যেই হইল সঙ্গীতের নিত্য-উৎস।

৪৫। **গুরু ও সাধু**: সাধনা সাধকের বর্ত্তমান জীবনে হইলেও প্রাচীন অভিজ্ঞতার প্রয়োজন আছে। বিদ্বান শাস্ত্রপন্থীরা জ্ঞানের প্রাচীন সঞ্চয় পান শাস্ত্রে। যাঁহাদের সাধনা জীবনের ও মানবের মধ্য দিয়া চলে, তাঁরা প্রাচীন অভিজ্ঞতা পান গুরুর ধারাতে ও গুরুতে। গুরু বড় আশ্রয়। আসলে ভগবানই সদ্‌গুরু। "অন্তরের মধ্যেই অন্তরের আশ্রয়কে পাইলাম। সহজের মধ্যেই তিনি ছিলেন সমাহিত হইয়া, সদ্‌গুরু নিজেই সে সন্ধান দিয়াছেন।" "অন্তরের মধ্যেই সেই স্থির ধাম বিরাজিত, মহলের দ্বার খুলিয়া তিনি তাহা দেখাইয়াছেন" (দাদূ, রাগ গৌড়ী, ৬৮ গান ;

"সেই গুরু সকল সম্প্রদায় ও দল, গুণ ও আকারের অতীত। তিনিই দাদূর গুরু।" (দাদূ মধি অঙ্গ, ৪৮)।

"সেই সদ্‌গুরু অন্তরের মধ্যেই বিরাজমান, সেখানেই তাঁহার আরতি ও পূজা করা চাই, এই কথা ক্বচিতই কেহ বোঝে।" (দাদূ, পরচা অঙ্গ ২৬৫)।

৪৬। **সহজ ও শূন্য কি?** ভক্ত ও সাধকরা তখন গুরুকে অনেক সময়ই শূন্যের সঙ্গে তুলনা দিয়াছেন। জীবনের সহজ বিকাশের

জন্য শূন্য একটি মুক্ত অবকাশ চাই, গুরু ও হওয়া চাই ঠিক সেইরূপ। তাই তো রজ্জবজী বলিয়াছেন "সতগুরু শূন্য সমান হৈ" (রজ্জব, গুরুদেব অঙ্গ, ৫৬) অর্থাৎ "সদ্‌গুরু হইবেন শূন্যের সমান"।

এই শূন্য ও সহজ কথাটা বৌদ্ধদের মধ্যে, নিরঞ্জন নাথ যোগী প্রভৃতি পন্থের মধ্যে, সহজিয়াদের মধ্যে, বাউল প্রভৃতিদের মধ্যে আছে। মধ্যযুগেও বহু সাধক নিজেকে সহজ-পন্থী বলিয়াছেন। দাদূর মত বুঝিতে হইলে তাঁর শূন্য সহজ প্রভৃতি কথার তাৎপর্য্য দেখা চাই। শূন্য বলিতে কি বুঝায় তাহা ইহাঁদের বাণী হইতে পরে বলিবার চেষ্টা করা যাইবে।

ধর্ম্ম সহজ হইতে হইলেই সকলবাধাহীন সেই সহজ অনন্তআধারকে চায়—তাহাই শূন্য। তাই সহজমতবাদীরা সবাই কোন না কোন আকারে শূন্যকে মানিয়াছেন। "শূন্য"র ভাবাত্মক জীবনাধার মহা-অবকাশ না পাইলে কোন জীবন বীজই অঙ্কুরিত হয় না। তাই সহজ মতে শিষ্যের পক্ষে গুরু হইলেন "শূন্য।" গুরু যদি নিজের ব্যক্তিত্ব দিয়া শিষ্যকে চাপিয়া মারেন তবে ধর্ম্মজীবন অঙ্কুরিত না হইয়া পিষিয়া যায়। তাই শূন্যই গুরু এবং গুরুই শূন্য। সহজ ধর্ম্মের সাধনা শিক্ষার প্রকরণ আলোচনা করিলে এ সব কথা বিস্তৃতভাবে বোঝা যাইবে।

প্রত্যেকটী অঙ্কুরই জীবন্ত হইয়া উঠিবার সময় একটী শূন্য অবকাশের অভিমুখে আপনার প্রাণকে প্রকাশ করে। অতি ক্ষুদ্র যে অঙ্কুর, ক্ষুদ্রতম যে ফুল সেও যদি মাথার উপরে একটী অনন্ত অপার আকাশকে না পায় তবে তার জীবনটুকু বিকাশ করিতে পারে না। আকাশ যদি শূন্য না হইয়া নীরেট হয় তবে ছোট বড় সব জীবন চাপা পড়িয়া যায়। সকল রকমের জীবন প্রকাশের জন্যই জীবনের অনুকূল একটী শূন্যতার প্রয়োজন। যেখানে প্রাণের বিকাশ নাই সেখানে এই শূন্যতার প্রয়োজন না ও থাকিতে পারে কিন্তু প্রাণ সদাই তাহার বিকাশের জন্য একটি শূন্য আশ্রয় চায়। ধর্ম্ম এবং ভাব তো জীবন্ত জিনিষ, তাই তাহার বিকাশের জন্য শূন্যতার একটী অনুকূল অবকাশের এত প্রয়োজন। এই শূন্যতা একটা নাস্তিধর্ম্মাত্মক বস্তু নয়।

রামানন্দ ধারাতে একটী গুরু পরম্পরায় প্রচলিত নমস্কার আছে—

নমো নমো নিরঞ্জন নমস্কার গুরুদেবতঃ।
বন্দনং সর্ব্ব সাধবা পরনামং পারংগতঃ॥

এই না-ভাষা না-সংস্কৃত প্রণামটি অতি পুরাতন। দাদূ নিজের নাম দিয়া ইহাকে করিয়াছেন :—

"দাদূ নমো নিরঞ্জনং নমস্কার গুরুদেবতঃ" ইত্যাদি।

অর্থাৎ নিরঞ্জনকে প্রণাম, তাঁহাকে বুঝিবার জন্য প্রণাম করি গুরুদেবতাকে। গুরু হইলেন সেই অনাদি অনন্ত অসীম নিরঞ্জনকে বুঝিবার ও পাইবার সুযোগ ও পন্থা। কিন্তু পন্থাই যদি আমাদিগকে সীমাবদ্ধ করিয়া, লক্ষ্যভ্রষ্ট করিয়া, পাইয়া বসে? তাই মুক্তির পথ রহিল, "বংদনং সর্ব্বসাধবা"; যত সাধক যে ভাবে নিরঞ্জনকে সাধনা করিয়াছেন সেই সকল সাধুকে প্রণাম। তবেই প্রণাম সীমাবদ্ধ হইবে না, প্রণাম সব সংকীর্ণতা সব সাম্প্রদায়িকতার বাধা পার হইয়া যাইবে। প্রণাম হইবে তবে "পারংগতঃ।" অর্থাৎ সকল-সীমা-পার-হওয়া অসীম প্রণতি।

তাই গুরু যদি শূন্য হন তবে কোনো বিপদ আর থাকে না। এই শূন্যতাই হইল আত্মার বিহারের সহজভূমি, এই সহজের মধ্যেই আত্মার নিত্য কেলি ও আনন্দ কল্লোলের স্থান। এই খানেই সঙ্গীতের ও সর্ব্বপ্রকার সৌন্দর্য্য-কলার উৎপত্তি, কারণ কলামাত্রই অনন্তের মধ্যে আত্মাহংসের সহজ সঙ্গীত কল্লোল। (দাদূ, পরচা অঙ্গ, ৬১)

সকল জীবনের বিকাশের জন্য অনন্ত স্বরূপ আপনিই আপনাকে সহজ করিয়া শূন্য করিয়া পরম অবকাশ রচনা করিয়া দিয়াছেন। জীবনের বিকাশের পক্ষে আকারবিশিষ্ট স্থূলবস্তু বাধা স্বরূপ, তাই তিনি আপনাকে "সূক্ষ্ম" সহজ নিরাকার নিরাধার করিয়াছেন, অথচ সেই কারণেই রূপে আকারে অভ্যস্ত মানুষ সেই সহজকে ধরিতে অক্ষম। (দাদূ, ভেখ অঙ্গ ৩৬)

দাদূর অনেক বাণী শূন্য ও সহজ সম্বন্ধে আছে, স্বতন্ত্র "সহজ শূন্য" প্রকরণে তাহা খোলসা করিবার চেষ্টা করা যাইবে।

ভক্ত সুন্দর দাসের "সহজানন্দ" গ্রন্থখানি প্রায় ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে রচিত। এই গ্রন্থে সুন্দর দাস বলেন যে, হিন্দুই হউক বা মুসলমানই হউক যদি সাধক বাহ্য আচার অনুষ্ঠান না মানিয়া, কৃত্রিম কর্ম্মকাণ্ড অনুষ্ঠান না করিয়া, বাহ্য

ভেখ ও চিহ্ন ধারণ না করিয়া, অন্তরেতে সহজ অগ্নিশিখা জ্বালাইয়া রাখেন, সহজ ধ্যানে মগ্ন থাকেন, সহজের মধ্যে ডুবিয়া সহজভাবে থাকেন, তবে তাঁর জীবন ভরিয়া সহজেই ভগবানের নাম আপনি নিঃশব্দে ধ্বনিত হইতে থাকে, কৃত্রিম জপ তপের প্রয়োজন হয় না। এমন সাধকই সহজ পথের আনন্দে আনন্দিত (সুন্দরদাস, সহজানন্দ গ্রন্থ ২-৪)। স্মরণের ধ্যানের যোগের জন্য তাঁহারা কালাকাল মানেন না। সহজের মধ্যে ডুবিয়া এ সব কৃত্রিম বিচার তাঁহারা হারাইয়া ফেলেন। সহজ সর্ব্বব্যাপী নিরঞ্জনের মধ্যে ডুবিয়া তখন সাধক বিশ্বজগতে সব সাধনার ও সব সাধকের সঙ্গে যোগযুক্ত হন। (সুন্দরদাস, সহজানন্দ গ্রন্থ, ২৯)।

মধ্যযুগের মরমিয়াদের মতে রামানন্দ এই সহজ মত পাইয়াই তাঁর ব্রাহ্মণত্ব, গুরুত্ব ও সম্প্রদায়নেতৃত্বের সব সম্মান ঠেলিয়া ফেলিয়া সব আচার নিয়ম বিসর্জ্জন দিয়া রামানুজ সম্প্রদায়ের অতি সম্মানিত পদ বিসর্জ্জন করিতে পারিলেন। রামানন্দ অনেক অনেক অস্পৃশ্য, অন্ত্যজ ও নীচ জাতির ভক্তদের লইয়া নূতন সাধকমণ্ডল গড়িলেন এবং সমাজের উচ্চ স্থান হইতে নামিয়া নীচ হইতে নীচের পংক্তিতে বসিয়া গেলেন। ভক্তমাল বহু প্রকারে রামানন্দকে নীচ জাতির সংস্পর্শ হইতে বাঁচাইতে চাহিলেন বটে, কিন্তু এত জন নীচজাতীয় শিষ্যের কথা কি দিয়া চাপা দেওয়া যায়?

কবীর ও সহজ পথের সাধক ছিলেন। তাঁহার কাছে লোকে যদি প্রশ্ন করিত "ব্রহ্মকে পাইবার পথ কি?" তবে তিনি বলিতেন—"দূরে যদি তিনি থাকিতেন, আর তাঁহাকে দূরে রাখিয়া যদি জীবন ধারণ সম্ভব হইত তবেই কোন পথ থাকা সম্ভব হইত। পথ অর্থই দূরত্ব আছে ইহা স্বীকার করা।"

"ভিতরে ও তিনি বাহিরেও তিনি, যেন জলে-ভরা কুম্ভ জলেই নিমজ্জিত,"

(কবীর—মৎসম্পাদিত, ১ম ভাগ, ৯৯ পৃঃ)।

"তিনি অন্তরে আছেন বলিলে বাহিরের জগৎ লজ্জিত হয়, তিনি বাহিরে আছেন বলিলেও কথাটা মিথ্যা হয়।"

(কবীর—১ম ভাগ, ১০৪)।

"জলে থাকিয়া যদি মীন বলে—আমি তৃষিত, তবে হাসি পায়।"

(কবীর—১, ৮২)।

উপযোগিতাবাদী মনে করে, এই সংসার তার কাজের ক্ষেত্র ; এখানেই যে আত্মারও তৃপ্তি তা সে জানে না, তাই মরে শুকাইয়া। "ধোপা বেচারা নির্ম্মল জলে দাঁড়াইয়া পিপাসায় মরে, এমন জল থাকিতেও কাঁদিয়া মরে।" মনে করে তার মলিন বস্ত্র ধুইবার জন্যই বুঝি এই জল ধারা।

(কবীর—২য় ভাগ, ৩১)।

"মানুষ অনাদিকাল হইতে সাধক, ব্রহ্মের সঙ্গে তার সেই অনাদিকাল হইতে সহজ যোগ, তাই সাধনা তার সহজাত।"

(কবীর—২য় ভাগ, ৮৭)।

"কৃত্রিম কোন আচার অনুষ্ঠান ক্রিয়া বিনাই সে তাঁর সঙ্গে সদাযুক্ত।"

(কবীর—১ম ভাগ, ৬৮ ; ১৩ ; ৬৫ ; ২২ ; ৭২ ; ৩৪)।

"সেই সহজ সমাধিই ভাল, যখন জীবনের সকল সহজ ক্রিয়াতেই তাঁর সঙ্গে যোগ দৃঢ় হইয়া চলে।"

(কবীর—১ম ভাগ, ৭৬)।

"স্বর্গ নরক জানি না, সদাই তাঁর মধ্যে নির্ভয় আনন্দে আছি।"

(কবীর—২য় ভাগ, ১১)।

"প্রত্যেক জীবনে ব্রহ্মদীপশিখা জ্বলিতেছে।"

(কবীর—২য় ভাগ, ৩৩)।

"এই রহস্য প্রেমের চাবিতে ধরা পড়ে।"

(কবীর—১ম ভাগ, ১০৭)।

সুন্দরদাস বলেন, ভক্ত সোজাজী, ভক্ত পীপা, ভক্ত সেনা, ভক্ত ধন্না প্রভৃতি রামানন্দ-শিষ্যেরা সবাই সহজ পথের রসের রসিক ছিলেন। ভক্ত-রবিদাস, গুরুদাদু এঁরা সহজেরই সেবক, সেই আনন্দেই মগ্ন।

(সহজানন্দ গ্রন্থ, ২২, ২৩)।

"কবীর প্রভৃতি প্রাচীন সাধকেরা এই সহজ নিরঞ্জন পথেরই পথিক।"

(সুন্দর সার ১১১ পৃঃ)।

এই শূন্য যে "নাস্তিবস্তু" নয় তাহা বুঝি যখন দেখি শূন্যবাদী দাদু ও ধর্ম্মের আস্তিক ভিত্তিই চাহেন।

দাদু বলেন, লোকেরা যে সব আচার অনুষ্ঠানের রাশি জমাইয়া তুলিয়াছে,

তাহা "কিছু-না"র উপরই প্রতিষ্ঠিত। তাই অন্তরের দেবতা ছাড়িয়া বৃথা বাহিরে সকল সংসার ঘুরিয়া মরিতেছে।

কুছ নাহীঁ কা নাম ধরি ভরম্যা সব সংসার ॥
পূজনহারে পাসি হৈ দেহী মাঁহৈঁ দেব।
দাদূ তাকৌঁ ছাড়ি করি, বাহরি মাঁড়ি সেব ॥

(দাদূ, সাচ অঙ্গ, ১৪৬, ১৪৮)।

"কেহ বা মনে করে তিনি বিশ্বসংসারের উপরে, কেহ বা ভাবে তিনি দেহের মধ্যে বিরাজমান; দাদূ বলেন, তাঁর সঙ্গে এতখানি ব্যবধান থাকিলে চলে কেমন করিয়া?"

উপরি আলম সব করৈ, সাধূ জন ঘটমাঁহিঁ।
দাদূ এতা অংতরা তাথৈঁ বনতী নাঁহিঁ ॥

(দাদূ, সাচ অঙ্গ, ১৪৯)।

ভগবানকে ভিতরে বা বাহিরে এতটুকু ব্যবধানেও এই সহজ সাধকরা রাখিতে অসম্মত। তাঁহাকে কোন আচার অনুষ্ঠান প্রথা বা শাস্ত্রের ব্যবধানে অথবা তীর্থ মন্দির সম্প্রদায় প্রভৃতির ব্যবধানে রাখিয়া দাদূ সেই সম্বন্ধকে কৃত্রিম করিতে চাহেন না।

৪৭। সংস্কৃত নহে, ভাষাই আশ্রয়।

রামানন্দ এই সহজ পথে আসিয়া কৃত্রিম ভাষা সংস্কৃত ছাড়িলেন ও সহজ কথিত ভাষায় আপনার ভাব প্রকাশ করিলেন। আচার, অনুষ্ঠান, প্রথা, সাম্প্রদায়িকতা, শাস্ত্র প্রভৃতি কৃত্রিম বস্তু ছাড়িয়া সহজ প্রেমের যোগকে ধর্ম্ম-জীবনের অবলম্বন করিলেন।

রামানন্দের পর কবীর প্রভৃতি অনেকেই নিরক্ষর ছিলেন, তাই বাধ্য হইয়াই ভাষায় লিখিতেন; কিন্তু তবুও কবীর যে সংস্কৃত ও কথিত ভাষা সম্বন্ধে তাঁর মত জানাইয়াছেন তাহা এখানে স্মরণ করা উচিত।

"সংস্কৃত কূপজল কবীরা ভাষা বহতা নীর।
জব চাহৌঁ তবহি ডূবৌঁ শান্ত হোয় শরীর ॥"

হে কবীর, সংস্কৃত হইল কূপজল, ভাষা হইল বহতা-নীরধারা, যখন চাহি তখনই তার মধ্যে ঝাঁপ দিয়া ডুবিতে পারি, সকল দেহ জুড়াইয়া যায়।

দিনের পর দিন খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া কূপের জল মেলে, সে জলও একটু পাত্রে করিয়া কষ্টে উঠাইয়া ব্যবহার করিতে হয়। সংস্কৃত ও তাই। বহতা-ধারায় দেহ মন প্রাণ সহজে ডুবাইয়া ভাসাইয়া দেওয়া যায়, ভাষাতেও তাই। বহতা ধারায় পথে যে সহজ গীত আছে কূপজলে তাহা কৈ? বহতা ধারার পথে নৌকাদি যোগে চলাফেরা ও পরিচয় চলে, সর্ব্বলোক ও সর্ব্বস্থানের সঙ্গে যোগ স্থাপন চলে, তীরে গ্রাম জনপদ সহজে বসান যায়, কূপে সে সম্ভাবনা কৈ? ভাষারই এই শক্তি, ইহা পরস্পরকে নিকটে আনে, ইহার তীরে নূতন সমৃদ্ধি নূতন সমাগম নূতন মানব সমাজ সহজে গড়িয়া ওঠে।

সহজ পন্থের কথা এই উপক্রমণিকাতেই দাদূর স্ববিবৃত সাধন পরিচয় অংশের শেষ ভাগে একবার বলা হইয়াছে।*

তবু এখানে আর একবার বলিতে হইল, কারণ তাহা না হইলে সহজ ও শূন্য ঠিক বুঝা কঠিন হইবে।†

মিথ্যার পূজা ঃ দাদূ বলেন, "জগৎ অন্ধ, নয়নে দেখিতে পায়না, যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহাকে বুঝেনা, আত্মাকে বধ করিয়া পাষাণের পূজা করে, নির্ম্মল স্বরূপ ইহাদের নয়নে ধরা পড়েনা তাই ইহারা অধঃপাতে চলিয়াছে। ইহারা দেব দেহরা পূজা করে, মহামায়াকে মানে; প্রত্যক্ষ দেব নিরঞ্জন, তাঁহার সেবা জানেনা। ভ্রান্তিবশে ভূতের ভৈরবের জন্তু-জানোয়ারের পূজা করে, সকলের যিনি স্রষ্টা তাঁহাকে পায় না। এই সংসার হইল নিজ স্বার্থের বশ, তাই না করিতে পারে বা কি? দাদূ বলেন, সত্য ভগবানকে বিনা ইহারা দিনে দিনে মরিতেছে, দিনে দিনে দুঃখে ভরিয়া উঠিতেছে" (রাগ রামকলী, ১৯৬ পদ)। দাদূর বাণীর মধ্যে "মায়া অঙ্গ" দেখিলে মিথ্যা দেবতা পূজার সম্বন্ধে দাদূর মতামত বিস্তৃত ভাবে বুঝা যাইবে। কপট ভক্তি,

---

* উপক্রমণিকা (খ) দ্রষ্টব্য।

† কবীর দাদূ রজ্জবের সহজ ও শূন্য সম্বন্ধে মতামত ভূমিকা-পরিশিষ্টে দর্শনীয়।

মিথ্যার সেবা, সত্য-বিযুক্ত বাক্যের উপাসনায় বিড়ম্বনা। দাদূ "সাচ অঙ্গে" বলিয়াছেন।

তাই দাদূ বলেন, "ব্রহ্মকে খণ্ড খণ্ড করিয়া নানা সম্প্রদায়ে লইল ভাগ-জোগ করিয়া বাঁটিয়া; পূরণ ব্রহ্মকে ত্যাগ করিল বলিয়া ভ্রমের গাঁঠে হইল সবাই বদ্ধ।"

খণ্ড খণ্ড করি ব্রহ্মকোঁ পখি পখি লিয়া বাঁটি।
দাদূ পূরণ ব্রহ্ম তজি, বংধে ভরম কী গাঁঠি॥

(সাচ কৌ অংগ, ৫০)।

মনের চঞ্চলতা ঃ মন সদাই চঞ্চল, ধর্ম্মের জগত হইল সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। সত্যকে বুঝিতে হইলে চাই শান্তি ও স্থিরতা। মনকে সংযত করাই সাধনার প্রধান কথা। কাজেই সাধনার ক্ষেত্রে মনকে স্বাধীনতা দিলেই নানা অনর্থ ঘটাইয়া তোলে। তাই কবীর বলিয়াছেন—এখান হইতে "মনকে মারিয়া হঠাইতে হইবে।"

মনকো মার হঠায়ে।

দাদূ ও তাই বলেন, "মন সদা চঞ্চল, চলিতেই চায়, বিনা অবলম্বনে তাহাকে রাখা যদি না চলে তবে দেও তাহাকে নিরন্তর জপের মধ্যে জুড়িয়া, তবেই অস্থির মন তাহাতেই রহিবে লাগিয়া।"

দাদূ বিন অবলংবন কঁ্যু রহৈ মন চংচল চলি জাই।
অস্থির মনৱাঁ তৌ রহৈ, সুমিরণ সেতী লাই॥

(মন কৌ অংগ, ১৪)।

এ বিষয়ে একটি গল্প আছে। এক শ্রেষ্ঠী একবার এক সাধুর কাছে সদা-কর্ম্মপরায়ণ এক ভৃত্য বর চাহেন। সাধু তাহাকে দিলেন এক ভূত। শেষে শ্রেষ্ঠী তাহাকে যত কাজ দেন তখনি করে সে নিঃশেষ। মহাবিপদ, কাজের অভাবে সে তাঁর মাথা ছিঁড়িতে চায়! তখন সাধুর পরামর্শে তাহাকে এক বাঁশ পুঁতিয়া দিয়া কহিলেন, "এইটাতে একবার ওঠ একবার নাম।" অবসর সময় সে নিরন্তর তাহাই করিতে লাগিল। মনকেও তেমনি অবসর মত নিরন্তর কোনো না কোনো রকম জপে প্রবৃত্ত রাখা দরকার।

সাধ ভূত দিয়ো শেঠকো, টহল করণ কে কাজ।
বাঁস মংগায় গড়ায় করি, বড়ো কাজ যহ আজ॥

"কাক যেমন জাহাজের উপর বসিয়া সাগরে যায়। একএকবার এদিক ওদিক উড়িয়া যখন ক্লান্ত হয় তখন আবার অপার সাগরে জাহাজেই আসিয়া বসে। মনও তেমনি অপার সাগরে ভাসিয়া নানাদিকে উড়িয়া হয়রান হইয়া সেই পরমাশ্রয়কেই করে আশ্রয়।"

দাদূ কউৱা বোহিথ বৈসি করি, মংঝি সমংদাঁ জাই।
উড়ি উড়ি থাকা দেখি তব নিহচল বৈঠা আই॥

(মন অংগ, ১৮)।

একবার ধর্ম্মালোচনার সময় ভক্ত ঢূংঢ্যার প্রতি দাদূ উপদেশ দিলেন—"দিবানিশি চলিতেছে এই মন, তাই তো চলিয়াছে সূক্ষ্ম জীবনের অখণ্ডিত পরম্পরা। হে দাদূ মন স্থির কর, আপনি আপনাকে উদ্ধার কর।"

নিসবাসুরি যহু মন চলৈ, সূষিম জীৱ সংঘার।
দাদূ মন থির কীজিয়ে, আতম লেহু উবারি॥

(সুখিম জনম কৌ অংগ, ৭)।

সম্প্রদায়ের ব্যর্থতা ঃ দাদূ বলেন সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা ধর্ম্মসাধনায় একটি প্রধান বাধা। তাই তিনি বলেন—"হিন্দু লাগিয়া রহিল তাহার মন্দিরেই, মুসলমান লাগিয়া রহিল তাহার মসজিদে। আমি লাগিয়া রহিলাম এক অলেখের সঙ্গে, সেখানে সদাই নিরন্তর-প্রীতি।" সেখানে না আছে হিন্দুর দেহরা (দেবঘর), না আছে তুরুকের (মুসলমানের) মসজিদ, সেখানে আত্মস্বরূপ আপনি বিরাজিত, সেখানে নাই কোনো প্রথা নাই কোনো বাঁধা রীতি।"

দাদূ হিংদূ লাগে দেহুরৈ, মুসলমান মসীতি।
হম লাগে এক অলেখ সৌঁ, সদা নিরংতর প্রীতি॥
ন তঁহা হিংদূ দেহুরা, ন তঁহা তুরক মসীতি।
দাদূ আপৈ আপ হৈ, নহীঁ তঁহা রহ রীতি॥

মধি অংগ, ৫২, ৫৩।

বাহ্যশক্তির ব্যর্থতা ঃ ভূতজগতগত বাহ্য সাধনায় সিদ্ধ ঐশ্বর্য্যে বা শক্তিতে এই পথে কিছু হইবার নয়। আশু সুলভ বাহ্যসিদ্ধির প্রলোভনে যাঁহারা সেই পথে গিয়াছেন তাঁহারা আজ কোথায়? সবাই আজ কালের কবলিত। কালের অতীত আনন্দলোকের অধ্যাত্ম অমৃতের অধিকার কি এমন করিয়া মেলে? দাদূ কহেন, "কত বড় বড় বলবন্ত মরিয়া হইয়া গেলেন মাটি, কত অনন্ত দেব দানব হইয়া বহিয়া গেলেন চুকিয়া! যাঁহারা এক পদক্ষেপে পৃথিবী অতিক্রম করিতেন, সাগর লঙ্ঘন করিতেন, হুঙ্কারে পর্ব্বত বিদীর্ণ করিতেন, তাঁহাদেরও খাইল কালে।"

কেতে মরি মাটী ভয়ে বহুত বড়ে বলবংত।
দাদূ কেতে হ্ৱৈ গয়ে দানাঁ দেৱ অনংত ॥ ৮৪
দাদূ ধরতী করতে এক ডগ দরিয়া করতে ফাল।
হাকোঁ পর্ৱত ফাড়তে, সো ভী খায়ে কাল ॥ ৮৫

কাল অংগ।

ঋদ্ধি সিদ্ধির ব্যর্থতা ঃ এমন কি এই সাধনার পথে যিনি চলিবেন তাঁর পক্ষে ঋদ্ধি সিদ্ধি প্রভৃতি বিভূতিও মহাবাধা। তাই দাদূ বলেন, "যাহার হৃদয়ে সেই এক পরমেশ্বর বিরাজিত তাহার পক্ষে কেরামতের (দৈবশক্তিলব্ধ বিভূতি) অধিকারী হওয়া কলঙ্ক স্বরূপ।"

করামাতি কলংক হৈ জাকৈ হিরদৈ এক।

নিহকরমী পতিব্রতা অংগ, ৫৪।

ভেখের ব্যর্থতা ঃ বৃথা বাহ্য ভেখ ধারণ করিয়াও এই সাধনায় কিছু হইবার নহে। দাদূ বলেন "অন্তরে তো প্রিয়তমের সঙ্গে হইল না পরিচয়, লোকের কাছে সাজিল (প্রিয়তমের প্রেমে) সোহাগিনী! এই কথাতেই আমার আশ্চর্য্য লাগে, বাহিরের সাজসজ্জায় ঢংগ করিয়া কেমন করিয়া পাইবে প্রিয়তমকে?"

অংতরি পীৱসৌঁ পর্চা নাঁহীঁ।
ভঈ সুহাগনি লোগন মাঁহীঁ ॥
ইন বাতনি মোহি অচিরজ আৱৈ।
পটম কিয়েঁ কৈস পিৱ পাৱৈ ॥

রাগ টোড়ী, পদ ২৮৩।

মতবাদের ব্যর্থতা : সাধনার সত্য যে জন চায় তাহার পক্ষে বিশেষ বিশেষ মতবাদের পিছে ঘুরিয়া কোনো লাভ নাই। দাদূ বলেন, আমি এক অসীমের পথের পথিক, আমার মনে আর কিছুই ধরে না। প্রিয়তমের পথ সে জনই পায় যাহাকে তিনি আপনি দেখান। কেহ বা হিন্দু পথের কেহ বা তুরুক (মুসলমান) পথের পথিক, কেহ বা কোনো পন্থে অনুরক্ত। কেহ বা সূফী পন্থে কেহ জৈন সন্ন্যাসীদের পন্থে কেহ বা সন্ন্যাসীদের পন্থেই মত্ত। কেহ বা জোগীর পন্থে কেহ জঙ্গমের পন্থে রহিয়াছেন। কেহ বা শক্তি-পন্থে করে ধ্যান, বস্ত্র-কম্বলাদি-ভেখের পন্থই বা কাহারও বহুসম্মত। কাহার পন্থেই বা কে চলিল! আমি তো আর কিছুই জানি না। দাদূ বলেন, যিনি জগৎ করিলেন সৃষ্টি, শুধু তাঁহাকেই মানি।"

মৈঁ পংথি য়েক অপারকে, মনি ঔর ন ভাবৈ।
সোঈ পংথ পাবৈ পীবকা, জিসৈঁ আপ লখাবৈ॥
কো পংথি হিংদূ তুরককে, কো কাহূঁ রাতা।
কো পংথি সোফী সেবড়ে, কো সিংন্যাসী মাতা॥
কো পংথি জোগী জংগমা, কো সকতি পংথ ধ্যাবৈ।
কো পংথি কমড়ে কাপড়ী, কো বহুত মনাবৈ॥
কো পংথি কাহূঁকে চলৈ, মৈঁ ঔর ন জাঁনোঁ।
দাদূ জিন জগ সিরজিয়া, তাহী কৌঁ মাঁনোঁ॥

(রাগ রামকলী, পদ ১৯৮)।

এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন পথে ধাবমান লোকের কথা দাদূ তাঁহার সোরঠ রাগের ৩০৮ পদেও বলিয়াছেন। আসাবরী, ২৩৩ পদে দাদূ বলিলেন, "বাবা দ্বিতীয় আর কেহ নাই, অলখ ইলাহী এক তুমিই, তুমিই রাম রহিম ইত্যাদি।"

বাবা নাঁহীঁ দূজা কোঈ।... .. . .
অলখ ইলাহী এক তূঁ, তূঁহীঁ রাঁম রহীম।

আসাবরী, ২৩৩।

এই কারণেও দাদূ আপনার জাতি পংক্তির কথা উল্লেখ না করিয়া ভগবানের নামেই আপনার জাতি কুল পরিবারের পরিচয় দিয়াছেন (নিহকরমী পতিব্রতা

অংগ, ১৫)। তিনি সহজ ধামের লোক, সহজের মধ্যেই তিনি সহজস্বরূপের সাক্ষাৎ পাইয়াছেন। এই রহস্য সাম্প্রদায়িক-সঙ্কীর্ণতায়-আবদ্ধ বেদ কোরাণের ধারণার অতীত। (মধি কা অংগ, ৬২)

শাস্ত্রের ব্যর্থতা ঃ সেই মূলাধারকে যে পাইল সে আনন্দে সমাহিত হইয়া নিশ্চল হইয়া বসিল, যারা বেদাদি আশ্রয় করিল তাহারা বৃথা ডালে পাতায় ফিরিতেছে ভ্রমিয়া (নিহকরমী পতিব্রতা অংগ,৬৭)। তাঁহার কাছ হইতে নিরন্তর প্রেমের পত্র আসিতেছে। দাদূ বলেন, “সেই প্রেমের পত্র ক্বচিতই কেহ পড়ে, বেদ পুরাণ পুস্তক পড়ে সবাই, তবে প্রেম বিনা কী হইবে?”

দাদূ পাতী প্রেমকী, বিরলা বাঁচৈ কোই।
বেদ পুরাণ পুস্তক পঢ়ে, প্রেম বিনা ক্যা হোই॥

সাচ অংগ, ১০৪।

তীর্থাদির ব্যর্থতা ঃ না বেদ পুরাণাদি শাস্ত্রে না তীর্থে ধামে মেলে সেই সাধনার ঠিকানা। দাদূ বলেন, “কত লোক দৌড়ায় দ্বারকায়, কত লোক যায় কাশীতে, কত লোক চলে মথুরায়, অথচ স্বামী রহিলেন অন্তরেরই মধ্যে।”

কেঈ দৌড়ৈ দ্বারিকা, কেঈ কাসী জাঁহিঁ।
কেঈ মথুরা কোঁ চলে, সাহিব ঘটহী মাঁহিঁ॥

কস্তূরিয়া মৃগ অংগ, ৮।

নানাস্থানে সঞ্চিত মলিনতা লোকে তীর্থে আসিয়া ধুইতে চায়। তীর্থের মধ্যেই যে পাপ কর, তাহা যাইবে কেমনে?” (সাধ অংগ, ১২৭)

পূজা নমাজের ব্যর্থতা ঃ এই সব নমাজে বা বাহ্য পূজা অর্চ্চনায় সাধকের চলে না। তার নমাজ নিজেরই ভিতরে, “সেখানে অলখ ইলাহী পরমেশ্বর স্বয়ং বিরাজমান, তাঁর সম্মুখে সে করে সেলাম, সেখানেই তার উপাসনা।”

আপ অলেখ ইলাহী আগৈ, তহঁ সিজদা করৈ সলাম।

পরচা অংগ, ২২৯।

এই মালা ফেলিয়া দিয়া সকল তনুকে করিতে হইবে মালা। দাদূ বলেন, "এমন জপ করিয়া লও জাপ যেন সকল তনুমালা কহিতে থাকে—দয়াময় পরমেশ্বর,"

সব তন তসবী কহৈ করীম, ঐসা করলে জাপ।

পরচা অংগ, ২৩০।

দিনে পাঁচবার একটু একটু নমাজ করিলে তার চলে না। "সেখানে জীবন মরণ পূর্ণ করিয়া অষ্ট প্রহর চলিবে পূজা।"

অঠে পহর ইবাদতী জীবন মরণ নেবাহি।

পরচা অংগ, ২৩২

বাহ্য নমাজ যেমন ব্যর্থ বাহ্য পূজাও তেমনি নিস্ফল। (রাগ রামকলী, ১৯৬ পদ)।

মিথ্যাচারের ব্যর্থতা। আসল কথা সর্ব্ব প্রকারে মিথ্যাকে পরিবর্জ্জন করিতে হইবে। অন্য মিথ্যা ত্যাগ করা সহজ কিন্তু সাধনার নামে আসে যে মিথ্যা তাহাকে সরান বড়ই কঠিন। "ঝুঠা দেবতা, ঝুঠা তার সেবা, ঝুঠাই করে পসার; ঝুঠা তার পূজা পাতি, ঝুঠা তার পূজক।"

ঝূঠে দেৱা ঝূঠী সেৱা ঝূঠা করৈ পসারা।
ঝূঠী পূজা ঝূঠী পাতী ঝূঠা পূজণহারা॥

(রাগ রামকলী, ১৯৭)।

"আত্মঘাত করিয়া লোকে আবার এই ঝুঠা পাষাণেরই করে পূজা!"

পাহণ কী পূজা করৈ করি আতম ঘাতা।

(রাগ রামকলী, ১৯৬)।

হিংসা ছাড়া চাই। কাজেই সকল ভাবে হিংসা ত্যাগ করিতে হইবে, এমন কি "গাছপালাও শুষ্ক হইলে সহজেই ব্যবহার করিতে পার, গাছপালাও হরিত জীবন্ত থাকিলে ভাঙ্গিবে না। কেন বৃথা কাহাকেও দুঃখ দেও? স্বামী যে আছেন সবারই মধ্যে।"

দাদূ সূকা সহজৈঁ কীজিয়ে নীলা ভানৈ নাঁহিঁ।
কাহে কোঁ দুখ দীজিয়ে, সাহিব হৈ সব মাঁহিঁ॥

(দয়া নির্বৈরতা অংগ, ২২)।

ফলকামনা ছাড়া চাই ঃ সাধনার মধ্যে কোথাও যেন স্বার্থ বুদ্ধি না থাকে। "ফলকামনা লইয়া সাধনা করা হইল যেন ঊষরে বপন করা।"

(নিহকরমী পতিব্রতা অংগ, ৯০)।

"ফলের জন্য যে করে ভগবানের সেবা সে তো সেবক নয়, সে দাঁও খুঁজিয়া খেলিতেছে মাত্র।"

(নিহকরমী প্রতিব্রতা অংগ, ৯২)

দুর্নীতি ছাড়া চাই ঃ দুর্নীতি ত্যাগ না করিলে সাধনায় অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। দাদূ বলেন, "যেখানে তাঁর সাধনা সেখানে নীতি থাকাই চাই, সদাই যেন সেখানে ভগবান বিরাজিত থাকিতে পারেন। তনু মন যদি নির্ম্মল নির্ব্বিকার হয় তবেই সাধনা হয় সিদ্ধ।"

জহাঁ নাঁৱ তহঁ নীতি চাহিয়ে, সদা রাম কা রাজ।
নির্বিকার তন মন ভয়া, দাদূ সীঝে কাজ॥

(নিহকরমী পতিব্রতা অংগ, ২৮)।

গৃহধর্ম্ম ঃ নীতিপরায়ণ নির্ম্মল হইয়া যে গৃহধর্ম্ম তাহা সাধনার বাধা নহে। দুর্নীতি, ঝুটা, হিংসা প্রভৃতি আসিয়া জুটিলে কি গার্হস্থ্য কি সন্ন্যাস সবই সাধনার পক্ষে মহা অন্তরায় হইয়া ওঠে। দাদূ বলেন, "কায়মনোবাক্যে যেখানে ভগবানের নাম করা যায় এমন গৃহে কেন থাকিবে না?"

(রাগ সারংগ, পদ ২৬৮)।

"যেখানে সাচ্চা নাম নাই তাহা ঘরই হউক বনই হউক তাহা ভাল নয়। যেখানে মন রহে উনমনী দাদূ কহেন সেই তো ভাল ঠাঁই।"

না ঘর ভলা না বন ভলা জহাঁ নহীঁ নিজ নাঁৱ।
দাদূ উনমনী মন রহে ভলা ত সোঈ ঠাঁৱ॥

(মধি অংগ, ৩৮; সুমিরণ অংগ, ৭৮)।

দাদূ বলেন, "কাজেই আমি ঘরেও রহি নাই বনেও যাই নাই কিছু কায়াক্লেশও সাধন করি নাই। সদ্‌গুরুর উপদেশমত মনের সঙ্গে মন মিলাইয়াছি।"

না ঘরি রহ্যা ন বন গয়া না কুছ কিয়া কলেস।
দাদূ মনহীঁ মন মিল্যা সতগুরকে উপদেশ॥

(মধি অংগ, ৩৩; গুরু অংগ, ৭৪)।

সংসার ও সাধনার দ্বন্দ্ব দাদূ সহজেই দিলেন মিটাইয়া। তিনি বলিলেন আমার মধ্যেও তো দেহ আত্মা এই দ্বন্দ্ব আছে। তাই বলিলেন, "দেহ যদি থাকে সংসারে আর আত্মা যদি থাকে ভগবানের কাছে; দাদূ কহেন, তবে কালের জ্বালা দুঃখ ত্রাস কিছুতেই কিছু করিতে পারে না।"

দেহ রহৈ সংসার মৈঁ জীব রামকে পাস।
দাদূ কুছ ব্যাপৈ নহীঁ কাল ঝাল দুঃখ ত্রাস॥

(বিচার অংগ, ২৭)।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে দাদূর মত ছিল "জীবন হইবে নদীর মত। তাহাতে স্বার্থের জন্য কোনো সঞ্চয় অবরুদ্ধ করিয়া রাখা ভাল নয়; নিজে সম্ভোগ করিয়া নিজেকে বিলাইয়া দিয়া সদাই হইতে হইবে অগ্রসর। সঞ্চয়ই হইল মায়া, তাহা যদি প্রবাহের মত সদা আসা যাওয়া করিতে পারে তবে বিকৃতির ভয় থাকে না।"

(মায়া অংগ, ১০৫)।

দীপ্তজীবনের সহজ প্রচার। কেহ কেহ বলেন যে, "সাধক যদি গৃহস্থ হইয়া, ঘরেই থাকেন তবে সত্য প্রচার হইবে কেমন করিয়া?" দাদূ বলেন, "সাধকের দেহই যে ব্রহ্মজ্যোতিতে দীপ্ত।"

য়হু ঘট দীপক সাধকা ব্রহ্মজ্যোতি পরকাস॥

(সাধ অংগ, ৭২)।

"প্রদীপকে দীপ্ত করিয়া ঘরেই রাখ আর বনেই রাখ, দাদূ বলেন, পতঙ্গের মত সব প্রাণ যেখানে প্রদীপ সেখানেই ছুটিয়া যাইবে।

ঘর বন মাঁহৈঁ রাখিয়ে, দীপক জোতি জগাই।
দাদূ প্রাণ পতংগ সব, জহঁ দীপক তহঁ জাই॥

(সাধ অংগ, ৮০)।

সাধ অংগ ৭৯ হইতে ৮৫ পর্য্যন্ত দাদূ এই কথাই নানাভাবে জোর দিয়া কহিয়াছেন।

ধর্ম্মের যোগদৃষ্টি: সংসার ও সাধনাকে যেমন দাদূ অখণ্ডভাবেই দেখিয়াছেন সকল ধর্ম্মকেও তিনি কেমন একটি অখণ্ড ঐক্যের দৃষ্টিতেই দেখিয়াছেন এই দৃষ্টি না থাকাতেই ধর্ম্মে ধর্ম্মে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে এত ঘাত-প্রতিঘাত ঝগড়া-ঝাঁটি। যে ভগবানের নামে সব ভেদ যাইবে ঘুচিয়া, তাঁহাকেই লইয়া ভাগাভাগি! "যাঁহাকে তরণী করিয়া আমরা এই ভবসাগর পার হইতে চাই, তাঁহাকেই যদি সঙ্কীর্ণ স্বার্থ-বুদ্ধি বশে লই ভাগ করিয়া তবে সবাই ডুবিয়া মরিব দুর্গতির রসাতলে!" এই উপমাটি দাদূর খুবই প্রিয় ছিল।

"ব্রহ্মকেই খণ্ড খণ্ড করিয়া দলে দলে লইল বাঁটিয়া! দাদূ বলেন, পূরণ ব্রহ্মকে ত্যাগ করিয়া ভ্রমের গাঁঠিতেই হইল বদ্ধ!"

খংড খংড করি ব্রহ্ম কোঁ, পখি পখি লিয়া বাঁটি।
দাদূ পূরণ ব্রহ্ম তজি, বংধে ভরম কী গাঁঠি॥

(সাচ অংগ, ৫০)।

বিষয়ী লোককে অবশ্য আপন আপন অংশ ঠিকঠাক বুঝিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়া ভাগ করিয়া লইতে হয়। অধ্যাত্মজীবনেও লোকে বৈষয়িকতার এই অভ্যাসটি চালাইতে চায়। বিষয়ের ক্ষেত্রে এই অভ্যাসটি সুবিধাজনক হইলেও হইতে পারে কিন্তু সাধনার ক্ষেত্রে ইহা আত্মঘাতের পথ।

"আমি হিন্দুমুসলমানকে দুই (বিরুদ্ধ) বলিয়া জানি না, সকলের তো তিনিই স্বামী, কাহাকেও আমি বিভিন্ন দেখি না।" ইত্যাদি

হিংদূ তুরক ন জাঁণৌঁ দোই।
সাঈঁ সবনি কা সোঈ হৈ রে, ঔর ন দূজা দেখৌঁ কোই॥

(রাগ ভৈরূঁ, ৩৯৬)।

"না হইবে হিন্দু না হইবে মুসলমান, স্বামীর সঙ্গেই তো প্রয়োজন। ষড় দর্শনের পথেও যাইবে না, নির্পক্ষ হইয়া বলিবে ভগবানের নাম।"

হিংদূ তুরক ন হোইবা, সাহিব সেতী কাম।
ষট দর্শনকে সংগি ন জাইবা, নির্পখ কহিবা রাম॥

(মধি অংগ, ৪৪)।

"সকলই আমি দেখিলাম খুঁজিয়া, ভিন্ন পর তো কেহই নাই, সকল ঘটে একই আত্মা, কি হিন্দু কি মুসলমান।"

"সব হম দেখ্যা সোধি করি, দূজা নাঁহী আন।
সব ঘট এঁকৈ আতমা, ক্যা হিন্দূ মুসলমান॥"

(দয়া নির্বৈরতা অংগ, ৫)।

"হে আল্লা-রাম, আল্লা ও রামের ভ্রম আমার ছুটিয়াছে; হিন্দু মুসলমান ভেদ আমার কিছুই নাই, সর্ব্বত্র দেখিতেছি তোমারই স্বরূপ।" ইত্যাদি

অলহ রাঁম ছূটা ভ্রম মোরা।
হিংদূ তুরক ভেদ কুছ নাঁহী, দেখৌঁ দর্শন তোরা॥ ইত্যাদি

(রাগ গৌড়ী, ৬৫)।

"বাবা, দ্বিতীয় আর কেহ নাই। এক অনেক তোমারই নাম" ইত্যাদি।

(রাগ আসাব্বরী, ২৩৩)।

"চাই আল্লাই বল, চাই রামই বল, ডাল ত্যজিয়া সবাই মূল কর গ্রহণ।"

অলহ কহৌ ভাবৈঁ রাঁম কহৌ।
ডাল তজৌ সব মূল গহৌ॥

(রাগ ভৈরূঁ, ৩২৫)।

জৈন সাধক আনন্দঘন ঠিক এইভাবেই তাঁর বিখ্যাত পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন—

রাম কহো রহিমান কহো কোউ
কান কহো মহাদেব রী।
পারসনাথ কহো কোউ ব্রহ্মা
সকল ব্রহ্ম স্বয়মেব রী॥ ইত্যাদি

(আনন্দঘন পদ ৬৭, রাগ আসাব্বরী)।

আনন্দঘন দাদূর পরবর্ত্তী কালের লোক।

অবিরুদ্ধ যুক্তভাব ঃ শুধু সম্প্রদায় লইয়া নয়, সকল বিষয়েই দাদূ সকল-ভেদ-সমন্বয়-করা একটি অবিরুদ্ধ যুক্ত ঐক্যদৃষ্টি জীবনে প্রার্থনা করেন। এই ভাবই হইল সাধনার সহজ ভাব। এই ভাব প্রাপ্ত হইলে সুখ দুঃখ আত্ম-পর গ্রহণ-বর্জ্জন সব সহজ হইয়া এক হইয়া যায়।

(মধি অংগ, ৭, ৮)।

জীবন-মৃত্যু, আসা-যাওয়া, নিদ্রা-জাগরণ, আকাঙ্ক্ষাও পূরণের দ্বন্দ্ব তখন থাকে না।

(মধি অংগ ১১)।

আকার-নিরাকারের অতীত আছে এক ধাম, হর্ষ-শোকের দ্বন্দ্ব সেখানে নাই।

(মধি অংগ, ১২)।

দাদূর সমস্ত মধ্য অংগ এই ভাবের রসে ভরপূর। তাঁহার মধ্য অংগে ২৩—৩২ বাণীতে তিনি এই সহজ ধামের বর্ণনাই দিয়াছেন। আগাগোড়া মধ্য অংগে নানা ভাবে এই যোগদৃষ্টিরই কথা।

দাদূর এই সহজ ভাবের কথা অন্যত্র আলোচনা করা গিয়াছে। তাঁহার জাতি পংক্তির ভেদ স্বীকার না করার কথাও বলা হইয়াছে। কাজেই এখানে আর তাহা বলা হইল না।

"অহম্" ক্ষয় করা চাই ঃ সাধনার প্রধান বাধা হইল "অহম্"। এই ক্ষুদ্র অহমই অসীম সত্য স্বরূপকে আচ্ছাদন করিয়া রাখে। তাই দাদূ বলিতেছেন, "আমার সম্মুখে "আমি" আছে খাড়া হইয়া, তাতেই তিনি আছেন লুকাইয়া। যদি এই "অহম্" যায় তবে প্রিয়তম তো প্রত্যক্ষ বিরাজমান।"

মেরে আগে মৈঁ খড়া তাথৈঁ রহ্যা লুকাই।
দাদূ পরগট পীব হৈ জে যহু আপা জাই॥

(জীবত মৃতক অংগ, ১৯)।

"যেখানে ভগবান বিরাজমান সেখানে "আমি" নাই, যেখানে "আমি" সেখানে ভগবান নাই। হে দাদূ, বড় সূক্ষ্ম সেই মহল, "দুইয়ের" সেখানে নাই ঠাঁই।"

জহঁা রাম তহঁ মৈঁ নহীঁ মৈঁ তহঁ নাহীঁ রাম।
দাদূ মহল বারীক হৈ দ্বৈ কূঁ নাহীঁ ঠাম॥

(জীবত মৃতক অংগ, ৫৫)।

"আমার "আমি"টি সম্পূর্ণ খোয়াইলে তবে পাইবি দাদূ প্রিয়তমকে। আমার "আমি"টি যখন গেল সহজে তখন হইল নির্ম্মল দর্শন।"

দাদূ তৌ তূঁ পাৱৈ পীৱকোঁ, মৈঁ মেরা সব খোই।
মৈঁ মেরা সহজৈঁ গয়া, তব নির্ম্মল দর্সন হোই॥

(জীবত মৃতক অংগ, ১৭)।

সমস্ত জীবত মৃতক অংগই এই ভাবে ভরপূর। "হে দাদূ, আমার বৈরি সেই "আমি" মরিয়াছে, এখন আমাকে কেহই পারে না মারিতে।"

দাদূ মেরা বৈরী মৈঁ মুৱা মুঝে ন মারৈ কোই॥

(জীবত মৃতক অংগ, ১২)।

সেবা সাধনা ঃ সেবাধর্ম্মে যে "আমি"কে ক্ষয় না করিতে পারিল তার সেবা সেবাই নয়। ভগবান আদর্শ সেবক, কারণ বিশ্ব চরাচরে তাঁর আপন সেবায় তিনি আপনাকে রাখিয়াছেন একেবারে প্রচ্ছন্ন করিয়া। তাঁরই নিত্য সেবার মধ্যে থাকিয়া যে তাঁকে একেবারে অস্বীকার করিতে পারি ইহাই তাঁহার সেবার চরম সার্থকতা। ভগবানের কাছে দাদূ এখন সেবকই হইতে চাহেন। "আপনাকে মুছিয়া ফেলিয়া তিনি যে সেবকরূপে এক মুহূর্ত্ত তাঁর সেবাটি ভুলেন না, দাদূ ভগবানের কাছে তাঁর সেই সেবা-রহস্যটি বুঝাইয়া বলিতে অনুরোধ করিতেছেন।"

সেৱগ বিসরৈ আপকোঁ সেৱা বিসরি ন জাই।
দাদূ পূছৈ রামকোঁ সো তত কহি সমঝাই॥

(পরচা অংগ, ২৭০)।

মন স্থির করা চাই ঃ সাধনার প্রধান বাধা চঞ্চল মন। এই মনকে স্থির করার কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। দাদূর মন অঙ্গে সর্ব্বত্রই এই কথা। সেখানে ১৫নং বাণীতে দাদূ বলেন মন স্থির করিয়া তবে লও নাম।

মন অস্থির করি লীজৈ নাম।

(মন অংগ, ১৫)।

মন স্থির না হইলে অন্তরের কোনো ঐশ্বর্য্য আমাদের কাছে ধরা পড়ে না। যদি মন স্থির হয় তখন তার সব দৈন্য যায় ঘুচিয়া। তাই দাদূ কহিলেন—"যে ইন্দ্রিয়কে করিল আপন বশ সে কেন আর ফিরিবে ভিক্ষা করিয়া ?"

ইংদ্রী অপণৈ বসি করৈ সো কাহে জাচণ জাই॥

(মন অংগ, ৬১)।

ইন্দ্রিয়দের প্রবুদ্ধ করা চাই। বশ করার অর্থ ইহা নয় যে ইন্দ্রিয়গুলিকে বধ করিতে হইবে। তাই দাদূ বলেন—"এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে লও প্রবুদ্ধ করিয়া, ইহাদের দাও উপদেশ, এই মন কর আপন হস্তগত, তবে সকল দেশ হইবে তোমার অনুগত।"

দাদূ পংচৌঁ যে পরমোধি লে, ইনহীঁ কৌঁ উপদেস।
যহু মন অপণা হাথি কর, তৌ চেলা সব দেস॥

গুরুদেব অংগ, ১৪৯।

নম্র হওয়া চাই। সাধনার্থীর পক্ষে দীনতার অভাব একটা প্রচণ্ড বাধা। সাধনার জন্য "অহম্‌কে" মিটাইতে পারিলে দীনতা নম্রতা আপনি আসে। দীনতা আসিলে সাধনা সহজ হইয়া যায়। "অহম্-ভাব গর্ব্ব-গুমান ত্যাগ করিয়া, মদ মাৎসর্য্য অহঙ্কার ছাড়িয়া, সাধক গ্রহণ করে দীনতা প্রণতি ও সৃষ্টিকর্ত্তার সেবা।"

আপা গর্ব গুমান তজি, মদ মংছর হংকার।
গহৈ গরীবী বংদগী, সেবা সিরজনহার॥

(জীবতমৃতক অংগ, ৫)।

"ঝুঠা গর্ব্ব-গুমান ত্যজিয়া, অহংভাব অভিমান ত্যাগ করিয়া, দাদূ কহেন, দীন গরীব (বিনম্র) হইয়া তবে মেলে নির্ব্বাণ পদ।

ঝূঠা গর্ব গুমান তজি, তজি আপা অভিমান।
দাদূ দীন গরীব হ্বৈ, পায়া পদ নির্বাণ॥

(ঐ ৭)।

তাঁহার বিধান অবগত হওয়া চাইঃ আপনার ক্ষুদ্র অহমিকা ত্যাগ করিয়া আপনাকে ভগবানেরই ইচ্ছার অধীন করিতে হইবে। সাধকের তখন উঠা-বসা, আসা-যাওয়া, গ্রহণ-বর্জ্জন, খাওয়া-পরা প্রভৃতি সব তুচ্ছ বস্তু ও ভগবানেরই বিধানের অনুগত হইয়া যায় (নিহকরমী পতিব্রতা অংগ, ৩৩)। তখন তাঁর আজ্ঞাতেই থাকে সাধক সমাহিত হইয়া, তাঁর ইচ্ছাই তাহার ভিতরে-বাহিরে, তাহাতেই তাহার তনু-মন প্রতিষ্ঠিত, তাঁহার বিধানেই তাহার ধ্যান রহে ভরপূর (নিহকরমী পতিব্রতা অংগ, ৩৪)।

শরণাগত হওয়া চাইঃ তাঁহার বিশ্ব বিধান হইতে বিযুক্ত হইয়া অহমিকায় পূর্ণ হইয়া মানুষ বৃথা শ্রান্ত হইয়া মরে ঘুরিয়া। এক দিন অভিমান চূর্ণ করিয়া প্রণত হইয়া তাহাকে বলিতেই হয়—"এখন তোমারই শরণে পড়িলাম আসিয়া, যেখানে-সেখানে সর্ব্বত্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া ব্যর্থ আসিলাম ফিরিয়া" ইত্যাদি।

"সরণি তুম্হারী আই পরে,
জহাঁ তহাঁ হম সব ফিরি আয়ে"—ইত্যাদি
(রাগ গূজরী, ২৫৫ পদ।)

বিশ্বাস চাইঃ সাধনার ক্ষেত্রে বিশ্বাস অতুলনীয় শক্তি। দাদূর বেসাস অংগটি আগাগোড়া এই বিশ্বাসের কথাতেই পরিপূর্ণ।

উদ্যম চাইঃ বিশ্বাসের কথা বলিতে গিয়া দাদূ উদ্যমকে উপেক্ষা করেন নাই। এই বেসাস অংগেই দাদূ উদ্যমের পন্থা প্রশংসা করিয়া কহিলেন—"উদ্যমে কোনো দোষ নাই যদি কেহ উদ্যম করিতে জানে। যদি স্বামীর সঙ্গে সাধক উদ্যমের সাধনা করিতে পারে, তবে উদ্যমেই তো আনন্দ।" এই কথাটি অল্প আগেও বলা হইয়াছে। এখানে মূলটা উদ্ধৃত করা যাউক।

দাদূ উদিম ঔগুণকো নহীঁ, জে করি জাণৈ কোই।
উদিম মৈঁ আনংদ হৈ, জে সাঁঈঁ সেতী হোই॥
(বেসাস অংগ, ১০)।

তাঁহার উদ্যম প্রচ্ছন্ন ঃ উদ্যমে আমার প্রয়োজন থাকিতে পারে কিন্তু তাঁহার তো আপন উদ্যমের পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই? কিন্তু সর্ব্ব শক্তিতে শক্তিমান হইয়াও এই তাঁর অনুপম লীলা যে তিনি বুঝাইতে চান কিছুর মধ্যেই তিনি নাই, সবই যেন করিতেছি আমি। অথচ তাঁরই শক্তিটুকু তিনি আমার মধ্যে সার্থক করিয়া আমার পৌরুষকেই চান ধন্য কৃতার্থ করিতে। তাই দাদূ বলেন, "ধন্য ধন্য স্বামী, মহান্ তুমি; এ কী অনুপম তোমার রীতি, সকল লোকের শিরোমণি স্বামী হইয়াও, তুমি রহিলে সবারই অতীত।"

ধনি ধনি সাহিব তূ বড়া, কৌন অনূপম রীতি।
সকল লোক সির সাঁঈয়াঁ, হ্‌বৈ করি রহ্যা অতীত॥

(বেসাস অংগ, ২৪)।

"বিশ্ব নিখিলের তুমি সৃজনকর্ত্তা, এমন তোমার সামর্থ্য! সে-ই তুমি রহিলে সবার সেবক হইয়া, সকল হাতই যেন দেখিতেছি প্রসারিত!"

দাদূ সিরজনহারা সবনকা, ঐসা হৈ সামর্থ।
সোই সেবগ হ্‌বৈ রহ্যা, সকল পসারৈ হথ॥

(দ্বিবেদী সংস্করণ, বিশ্বাস অংগ, ২৩)।

প্রার্থনা ঃ কাজেই উদ্যমী সাধক হইয়াও দাদূ আপন পৌরুষের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই প্রার্থনা করিলেন—"সত্য দাও, সন্তোষ দাও, হে স্বামী, ভাব ভক্তি বিশ্বাস দাও; ধৈর্য্য দাও, সাচ্চা ভাব দাও, শুদ্ধ চিত্ত দাও, দাস দাদূ ইহাই করিতেছে প্রার্থনা।"

সাঁঈঁ সত সন্তোষ দে, ভাব ভগতি বেসাস।
সিদক সবূরী সাচ দে, মাংগৈ দাদূ দাস॥

(বেসাস অংগ, ৫৭)।

সাধকের বীরত্ব ঃ শরণাগত হইয়া বিশ্বাসী হইয়া ভগবৎসাধনা করিতে হইবে। তবে কি দুর্ব্বল শক্তিহীনদের জন্যই এই সাধনা? তান্ত্রিকরা তো বলেন হীনাধিকারীদেরই সাধনা বীর্য্যহীন, তাহা পশুর আচার, আর শ্রেষ্ঠাধিকারীদের সাধনা বীরাচার। দাদূও বলেন বীর না

হইলে সাধনার ক্ষেত্রে কেহ যেন না আসে। তাঁর সূরাতন অংগটি আগাগোড়াই এই বীর-সাধনা লইয়া। তার দুই একটি বাণী দেখিলেই দাদূর অন্তরের কথা বুঝা যাইবে। তবে এ কথাও বলা উচিত যে তাঁর বীরের আদর্শ ঠিক ভাবে বুঝিতে না পারিয়াই তাঁর অনুবর্ত্তী নাগা সাধুরা পরে শুধু প্রচণ্ড যোদ্ধাই হইয়া উঠিয়াছিলেন, এমন কি অবশেষে তাঁহারা অন্যের ভাড়াটিয়া হইয়া সাধকের সাত্ত্বিক বীর-সাধনার অবমাননাও করিয়াছেন সে কথা প্রসঙ্গান্তরে বলা হইয়াছে। সাধনার ক্ষেত্রের কথা বলিতে গিয়া দাদূ বলেন, "ভীরু কাপুরুষের দল এখানে কোনো কাজে লাগিবে না। ইহা যে বীরেরই ক্ষেত্র।"

কাইর কামি ন আৱঈ, যহু সূরে কা খেত ॥

(সূরাতন অংগ, ১৫)।

"হে দাদূ, মরণ হইতে তুই ভয় যেন না পাস্, মরণ তো অন্তে নিদানে আছেই।"

মরণে থীঁ তূঁ মতি ডরৈ, মরণাঁ অংতি নিদান।"

(ঐ, ৪৭)।

"পিছনের দিকে যেন কেহ না সরে, সম্মুখের দিকে এস সরিয়া। সম্মুখে অগ্রসর হইয়া দেখ অনুপম সেই এক। পিছের দিকে, আবার কিসের টান ?"

কোই পীছৈঁ হেলা জিনি করৈ আগৈঁ হেলা আৱ।
আগৈঁ এক অনূপ হৈ, নহি পীছৈ কা ভাৱ॥

(ঐ, ২৭)।

পূর্ব্বেই দেখা গিয়াছে দাদূ রাণা রাৱ কাহাকেও গ্রাহ্য করেন না (প্রকরণ ২১), ভগবান ছাড়া তাঁর কাছে সবই ভূয়া।"

মন্ত্র ঃ বৃহৎ ও বড় গভীর দৃষ্টি দিয়া দেখিয়াছেন বলিয়া দাদূর সব সাধনাই বৃহৎ ও গভীর হইয়া গিয়াছিল। মন্ত্র, জপ, ধ্যান, সবই তিনি দেখিয়াছেন বড করিয়া। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, যে মন্ত্র তিনি পাইলেন তাহা—

অবিচল মন্ত্র, অমর মন্ত্র, অখৈ মন্ত্র।
অভৈ মন্ত্র, রাম মন্ত্র, নিজ সার।

সজীবন মন্ত্র, সবীরজ মন্ত্র, সুন্দর মন্ত্র
শিরোমণি মন্ত্র, নির্ম্মল মন্ত্র, নিরাকার ॥
অলখ মন্ত্র, অকল মন্ত্র, অগাধ মন্ত্র
অপার মন্ত্র, অনন্ত মন্ত্র রায়া।
নূর মন্ত্র তেজ মন্ত্র জোতি মন্ত্র
প্রকাস মন্ত্র পরম মন্ত্র পায়া ॥

(গুরুদেব অংগ, ১৫৫)।

জাপঃ আপাদমস্তক সকল দেহে যদি চলিতে থাকে জপ তবে বুঝিব হইতেছে জাপ। তবেই তো অন্তরে অন্তরে আত্মা হয় বিকশিত, তিনি আপনিই হন প্রকটিত।"

নখসিখ সব সুমিরণ করৈ ঐসা কহিয়ে জাপ।
অংতরি বিগসৈ আতমা, তব দাদূ প্রগটৈ আপ ॥

(পরচা অংগ, ১০৭)।

"নখ হইতে শিখা পর্য্যন্ত সকল শরীরে সেই অনাহত শব্দের জপ চলিতেছে আমি শুনিয়াছি। সকল ঘট ভরিয়া হরি হরি মন্ত্র হইতেছে ধ্বনিত, সহজেই মন হইয়াছে স্থির।"

সবদ অনাহদ হমসুন্যা, নখসিখ সকল সরীর।
সব ঘটি হরি হরি হোত হৈ, সহজৈঁ হী মন থীর ॥

(পরচা অংগ ১৭৪)।

জপমালাঃ নিখিল চরাচর ভরিয়া যে বিশ্বের সকল আকারের মালা নিরন্তর আবর্ত্তিত হইতেছে সেই বিশ্বমালাই এই জপের উপযুক্ত "সহায়মালা।" "হে দাদূ, সকল আকারের সেই মালা, ক্বচিতই কোনো সাধক তাহাতে জপে ভগবানের নাম।"

দাদূ মালা সব আকার কী কোই সাধূ সুমিরৈ রাম ॥

(পরচা অংগ, ১৭৬)।

ধ্যানঃ এই মন্ত্র ও মালার উপযুক্ত হইতে হইলে ধ্যানকেও হইতে হইবে অপার ও গভীর। তাই ধ্যানের কথায় দাদূ বলিতেছেন, "পরমাত্মার

সঙ্গে তোর প্রাণ নে সমাহিত করিয়া, তাঁর শব্দের (সঙ্গীতের) সঙ্গে নে তোর শব্দ সমাহিত করিয়া, সেই প্রিয়তমের চিত্তের সঙ্গে চিত্ত মনের সঙ্গে মন এক সুরে নে বাঁধিয়া।"

সবদৈঁ সবদ সমাই লে, পরমাতম সৌঁ প্রাণ।
যহু মন মন সৌঁ বংধি লে, চিত্তৈঁ চিত্ত সুজাণ॥

(পরচা অংগ, ২৮৮)।

"সেই সহজে তোর সহজ নে সমাহিত করিয়া, সেই জ্ঞানে বান্ধিয়া নে জ্ঞান, সেই সূত্রে সূত্র নে সমাহিত করিয়া, সেই ধ্যানে বাঁধিয়া নে তোর ধ্যান।"

সহজৈঁ সহজ সমাই লে জ্ঞানৈঁ বন্ধ্যা জ্ঞান।
সূত্রৈঁ সূত্র সমাই লে, ধ্যানৈ বন্ধ্যা ধ্যান॥

(পরচা অংগ, ২৮৯)।

"সেই দৃষ্টিতে দৃষ্টি নে তোর সমাহিত করিয়া, প্রেম-ধ্যানে সমাহিত কর প্রেম-ধ্যান, সেই বোধে বোধ নে তোর সমাহিত করিয়া, লয়ের সঙ্গে লয় নে তোর মিলাইয়া।" ইত্যাদি

দৃষ্টৈঁ দৃষ্টি সমাই লে, সুরতৈঁ সুরতি সমাই।
সমঝৈঁ সমঝ সমাই লে, লৈ সৌঁ লৈ লে লাই॥ ইত্যাদি

(পরচা অংগ, ২৯০)।

ভক্তি ঃ ভক্তির সম্বন্ধেও সেই একই কথা। তিনি বিরাট্, মহান্, অসীম; তাঁহাকে পাইতে হইলে ভক্তি প্রেমও তদনুরূপ হওয়া চাই। তাই দাদূ বলিতেছেন, "তুমি যেমন, তেমনই দাও তুমি ভক্তি; তুমি যেমন, তেমনি দাও তুমি প্রেম; তুমি যেমন, তেমনি দাও তুমি প্রেম-ধ্যান; তুমি যেমন, তেমনি দাও তুমি ক্ষেম।

তূঁ হৈ তৈসী ভগতি দে, তূঁ হৈ তৈসা প্রেম।
তূঁ হৈ তৈসী সুরতি দে, তূঁ হৈ তৈসা খেম॥

(বিরহ অংগ, ৪৪)।

দাদূ বিনয় ও নম্রতার মূর্তিমান আদর্শ ছিলেন। তবু যদি কেহ বলিত, "কেমন করিয়া তুমি অসীম ভগবানকে লাভ করিবে?" তখন দাদূ বলিতেন, "আমি

যেমনই হইনা কেন,আমার ভক্তি আমার ব্যাকুলতা তো অল্পে তৃপ্ত নয় ; অসীম তাহার ক্ষুধা, সেই তো আমার ভরসা।" তাই দাদূ বলিতেছেন, "যেমন অপার আমার ভগবান, তেমনি অগাধ আমার ভক্তি। এই দুয়ের কোথাও সীমা পরিসীমা নাই, সকল সাধক উচ্চকণ্ঠে ইহা ঘোষণা করিবেন।"

জৈসা রাম অপার হৈ তৈসী ভগতি অগাধ।
ইন দূনূঁ্যকী মিত নহীঁ সকল পুকারৈঁ সাধ॥
(পরচা অংগ, ২৪৫)।

"যেমন অনির্বচনীয় আমার রাম, তেমনি অলেখ (লেখা-জোখার অতীত) আমার ভক্তি। এই দুয়ের মধ্যে কোথাও নাই টানাটানি, সহস্র মুখে শেষ (অনন্ত) কহেন এই কথা।" ইত্যাদি

জৈসা অবিগত রাম হৈ, তৈসী ভগতি অলেষ।
ইন দূন্যঁকী মিত নহীঁ, সহস মুখাঁ কহৈ শেষ॥" ইত্যাদি
(পরচা অংগ, ২৪৬)।

ব্যাকুল প্রার্থনা। দাদূর চমৎকার সব প্রার্থনা আছে। সাধকদের মধ্যে দাদূর প্রার্থনা অতিশয় সমাদৃত। তাঁহার সকল প্রার্থনায় সেই এক মূল কথা—"আর কিছুই চাহি না, চাহি শুধু তোমাকে।" দাদূ গাহিতেছেন, "দরশন দাও, দরশন দাও, আমি তোমার কাছে মুক্তি চাই না। ঋদ্ধিও চাই না সিদ্ধিও চাই না, তোমাকেই চাই, হে গোবিন্দ,............... ঘরও চাহি না বনও চাহি না, তোমাকেই চাই, হে আমার দেবতা।" ইত্যাদি

দর্সন দে দর্সন দে, হৌঁ তৌ তেরী মুকতি ন মাঁগৌঁ।
সিধি ন মাঁগৌঁ, রিধি ন মাঁগৌঁ, তুম্হহীঁ মাঁগৌঁ গোবিন্দা।
... ...
ঘর নহিঁ মাঁগৌঁ, বন নহিঁ মাঁগৌঁ, তুম্হহী মাঁগৌঁ দেৱজী॥ ইত্যাদি
(রাগ গুংড, ৩১৩)।

"এই প্রেম-ভক্তি বিনা যায় না যে থাকা, আমার সকল-ব্যাকুলতা-পূর্ণ-করা প্রকট দরশন দাও।".........ইত্যাদি।

যে প্রেম ভগতি বিন রহ্যৌ ন জাঈ।
পরগট দরসন দেহু অঘাঈ॥ ইত্যাদি

(রাগ ধনাশ্রী, ৪৩৬)।

"তোমাব আমার মধ্যে যেন বিচ্ছেদ না ঘটে, হে মাধব, চাও তো আমার তন (তনু) ধন সব তুমি যাও লইয়া। ইচ্ছা হয় আমায় স্বর্গ দাও, ইচ্ছা হয় নরক রসাতল দাও, ইচ্ছা হয় আমাকে করপত্রে কর দ্বিখণ্ডিত।……… ইচ্ছা হয় আমায় বদ্ধ কর, ইচ্ছা হয় মুক্ত কর,…… ………কিন্তু হে মাধব, তুমি যেন রহিও না দূরে।"

তুম্হ বিচি অংতর জিনি পরৈ মাধব
ভাবৈ তন ধন লেহু।
ভাবৈ সরগ নরক রসাতল
ভাবৈ করবত দেহু॥

… … … …

ভাবৈ বংধ মুকত করি মাধব………
………তূ জিনি হোবৈ দূর, মাধবে॥

(রাগ সূহৌ, ৩৫৫)।

"অমৃতধারা বর্ষণ কর, হে রাম,…………লতা বনরাজি সকলই যাইতেছে শুকাইয়া। হে রামদেব, তুমি আসিয়া জল বর্ষণ কর। আত্মাবল্লী মরে পিপাসায়, দাদূ দাস যে পাইল না নীর।"

বরিষহু রাঁম অমৃত ধারা।

… … … …

সূকৈ বেলি সকল বনরাই।
রাঁমদেব জল বরিষহু আই॥
আত্ম বেলী মরৈ পিয়াস।
নীর ন পাবৈ দাদূ দাস॥

(রাগ গুংড, ৩৩৩)।

যেমনই হইনা কেন, আমার ভক্তি আমার ব্যাকুলতা তো অল্পে তৃপ্ত নয় ; অসীম তাহার ক্ষুধা, সেই তো আমার ভরসা।" তাই দাদূ বলিতেছেন, "যেমন অপার আমার ভগবান, তেমনি অগাধ আমার ভক্তি। এই দুয়ের কোথাও সীমা পরিসীমা নাই, সকল সাধক উচ্চকণ্ঠে ইহা ঘোষণা করিবেন।"

জৈসা রাম অপার হৈ তৈসী ভগতি অগাধ।
ইন দূনূঁ্যকী মিত নহীঁ সকল পুকারৈঁ সাধ॥
(পরচা অংগ, ২৪৫)।

"যেমন অনির্বচনীয় আমার রাম, তেমনি অলেখ (লেখা-জোখার অতীত) আমার ভক্তি। এই দুয়ের মধ্যে কোথাও নাই টানাটানি, সহস্র মুখে শেষ (অনন্ত) কহেন এই কথা।" ইত্যাদি

জৈসা অবিগত রাম হৈ, তৈসী ভগতি অলেষ।
ইন দূনূ্যঁকী মিত নহীঁ, সহস মুখাঁ কহৈ শেষ॥" ইত্যাদি
(পরচা অংগ, ২৪৬)।

ব্যাকুল প্রার্থনা। দাদূর চমৎকার সব প্রার্থনা আছে। সাধকদের মধ্যে দাদূর প্রার্থনা অতিশয় সমাদৃত। তাঁহার সকল প্রার্থনায় সেই এক মূল কথা—"আর কিছুই চাহি না, চাহি শুধু তোমাকে।" দাদূ গাহিতেছেন, "দরশন দাও, দরশন দাও, আমি তোমার কাছে মুক্তি চাই না। ঋদ্ধিও চাই না সিদ্ধিও চাই না, তোমাকেই চাই, হে গোবিন্দ,............... ঘরও চাহি না বনও চাহি না, তোমাকেই চাই, হে আমার দেবতা।" ইত্যাদি

দর্সন দে দর্সন দে, হৌঁ তৌ তেরী মুকতি ন মাঁগৌঁ।
সিধি ন মাঁগৌঁ, রিধি ন মাঁগৌঁ, তুম্হহীঁ মাঁগৌঁ গোবিন্দা।
... ...
ঘর নহিঁ মাঁগৌঁ, বন নহিঁ মাঁগৌঁ, তুম্হহী মাঁগৌঁ দেৱজী॥ ইত্যাদি
(রাগ গুংড, ৩১৩)।

"এই প্রেম-ভক্তি বিনা যায় না যে থাকা, আমার সকল-ব্যাকুলতা-পূর্ণ-করা প্রকট দরশন দাও।".........ইত্যাদি।

যে প্রেম ভগতি বিন রহ্যৌ ন জাঈ।
পরগট দরসন দেহু অঘাঈ॥ ইত্যাদি

(রাগ ধনাশ্রী, ৪৩৬)।

"তোমার আমার মধ্যে যেন বিচ্ছেদ না ঘটে, হে মাধব, চাও তো আমার তন (তনু) ধন সব তুমি যাও লইয়া। ইচ্ছা হয় আমায় স্বর্গ দাও, ইচ্ছা হয় নরক রসাতল দাও, ইচ্ছা হয় আমাকে করপত্রে কর দ্বিখণ্ডিত।……… ইচ্ছা হয় আমায় বদ্ধ কর, ইচ্ছা হয় মুক্ত কর,…… ………কিন্তু হে মাধব, তুমি যেন রহিও না দূরে।"

তুম্হ বিচি অংতর জিনি পরৈ মাধৱ
ভাৱৈ তন ধন লেহু।
ভাৱৈ সরগ নরক রসাতল
ভাৱৈ করৱত দেহু॥

… … … …

ভাৱৈ বংধ মুকত করি মাধৱ………
………তূ জিনি হোৱৈ দূর, মাধৱে॥

(রাগ সূহৌ, ৩৫৫)।

"অমৃতধারা বর্ষণ কর, হে রাম,…………লতা বনরাজি সকলই যাইতেছে শুকাইয়া। হে রামদেব, তুমি আসিয়া জল বর্ষণ কর। আত্মাবল্লী মরে পিপাসায়, দাদূ দাস যে পাইল না নীর।"

বরিষহু রাঁম অমৃত ধারা।

… … … …

সূকৈ বেলি সকল বনরাই।
রাঁমদেৱ জল বরিষহু আই॥
আত্ম বেলী মরৈ পিয়াস।
নীর ন পাৱৈ দাদূ দাস॥

(রাগ গুংড, ৩৩৩)।

শুদ্ধ প্রেম ঃ দাদূর প্রেমের ভাব বুঝিতে হইলে তাঁহার বিরহ অংগ, নিহকরমী পতিব্রতা অংগ, সুন্দরী অংগ আগাগোড়া উদ্ধৃত করিয়া দিতে হয়। বিরহ অংগ হইতে একটিমাত্র বাণী দেখা যাউক। "মনের মধ্যেই মরিস্ ঝুরিয়া, মনের মধ্যেই চলুক রোদন, মনের মধ্যেই কর আর্ত্তনাদ; দাদূ বলেন, বাহিরে যেন এ সব কিছু যেন প্রকাশ না হয়।"

মনহীঁ মাঁহৈঁ ঝূরণাঁ, রোবৈ মনহীঁ মাঁহি।
মনহীঁ মাঁহৈ ধাহ দে, দাদূ বাহরি নাঁহি॥

(বিরহ অংগ, ১০৮)।

নিহকরমী পতিব্রতা অংগে একটি বাণী দেখিতেছি—"ভগবদ্রসে ভরা প্রেম-পেয়ালার জন্যই আমার ব্যাকুলতা। ঋদ্ধি সিদ্ধি মুক্তি ফল না হয় তাহাদেরই দাও যাহারা তাহার ভিখারী।"

প্রেম পিয়ালা রাম রস, হমকৌঁ ভাবৈ য়েহ।
রিধি সিধি মাঁগৈঁ মুকতি ফল, চাহৈঁ তিনকৌঁ দেহ॥

(নিহকরমী পতিব্রতা অংগ, ৮৩)।

সুন্দরী অংগে দাদূর একটি বাণী দেখি—"আমার অন্তরাত্মার মধ্যে তুমি এস, এই তো তোমার যথার্থ স্থান।

আতম অংতরি আৱ তূঁ য়া হৈ তেরী ঠৌর॥

(সুন্দরী অংগ, ৫)।

"আমি যখন নিদ্রাভরে সুখসুপ্তিতে ছিলাম অচেতন তখন আমার প্রিয়তম ছিলেন জাগিয়া। অন্তরাত্মাই যদি আমার না জাগিল তবে কেমন করিয়া হইবে আমাদের মিলন?"

হূঁ সুখ সূতী নীংদ ভরি, জাগৈ মেরা পীৱ।
ক্যোঁ করি মেলা হোইগা, জাগৈ নাঁহী জীৱ॥

(সুন্দরী অংগ, ১২)।

রস-সংযম ঃ রসোচ্ছ্বাসে বিহ্বলতায় সাধক যেন কখনও আপনার ধারণা ও সংযম না হারান। সাধক যে প্রেমরস অন্তরে উপলব্ধি করিবেন তাহা অন্তরেই যেন ধারণ করেন, নহিলে সাধনা "স্থিররস" না হইয়া

নেশায় হইয়া উঠে উচ্ছৃঙ্খল। দাদূর "জরণা অংগে" আগাগোড়া এই কথা। দাদূ বলেন যে প্রেমরস—"মনের মধ্যেই উৎপদ্যমান, মনের মধ্যেই রাখিবে তাহাকে সমাহিত করিয়া। মনের মধ্যেই তাহা দিবে রাখিয়া, বাহিরে তাহা কহিয়া জানাইবে না।"

মনহী মাঁহৈঁ উপজৈ, মনহী মাঁহি সমাই।
মনহী মাঁ হৈঁ রাখিয়ে, বাহরি কহি ন জণাই॥

(জরণা কৌ অংগ, ৫)।

"যে সব সেবক তাঁর প্রেমরসের খেলা খেলিয়াছেন সবাই তাঁহারা সেই রস অন্তরে করিয়া রাখিয়াছেন নিরুদ্ধ। হে দাদূ, সে আনন্দ বলা যায় কাহাকে, যেখানে তিনি আপনি একেলা?"

সোই সেৱগ সব জরৈ, প্রেমরস খেলা।
দাদূ সো সুখ কস কহৈ, জহঁ আপ অকেলা॥"

(জরণা অংগ, ১১)।

"জরৈ" অর্থ জীর্ণ করে, অর্থাৎ অন্তরে শান্ত সংযত করিয়া এই রস অন্তরেই ধারণ করে, বাহিরে ঝরিয়া যাইতে দেয় না। প্রাণ-রস যেমন দেহ হইতে বাহির হইলেই ক্ষয়, এই অধ্যাত্ম প্রেমরসও তেমনি বাহির হইতে দিলে প্রেম-সাধনায় ঘটে বিকার কলুষ ও ক্ষয়। "যাঁহারা যাঁহারা এই রস করিয়াছেন পান, তাঁহারা সবাই সেই অমৃত রসকে অন্তরে রাখেন শান্ত সংযত করিয়া। হে দাদূ, সেই সেবকই তো ভাল, যে রস অন্তরেই করে ধারণ আর জীবনে রহে জীবন্ত হইয়া।"

অজর জরৈ রস না ঝরৈ, জেতা সব পীরৈ।
দাদূ সেৱগ সো ভলা, রাখৈ রস, জীরৈ॥

(জরণা অংগ, ১৫)।

সত্য গোপন অসাধ্য ? লোকে বলিতে পারে সকল ভাবরসকে যদি অন্তরেই রাখা হয় রুদ্ধ করিয়া, তবে সাধনার সত্য ও আনন্দ লোকে জানিবে কেমন করিয়া? দাদূ বলেন, ভাব-রসকে সংযত করিয়া সাধক আগে নিজে হউন সত্য; তখন তাঁহার অন্তর বাহির এমন অপার্থিব

এক দীপ্তিকে হইবে দীপ্যমান যে কিছুতেই জীবনের সেই দীপ্ত সত্য গোপন করা সম্ভব হইবে না। "যেখানে খুসী রাখ লুকাইয়া, সত্যকে যায় না গোপন করিয়া রাখা। রসাতলের অনন্ত হইতে গগনের ধ্রুবতারা পর্য্যন্ত সবাই তাহাকে কহিবে প্রকট করিয়া।"

ভাবৈঁ তহাঁ ছিপাইয়ে, সাচ ন ছানা হোই।
সেস রসাতলি গগন ধূ, প্রগট কহিয়ে সোই॥

(সুমিরণ অংগ, ১১০)।

"কোটি যতন করিয়া করিয়া রাখ তাহাকে অগম অগোচরে, তবু যেই ঘটে দীপ্যমান সেই রামরতন কেমন করিয়া তাহা রহে প্রচ্ছন্ন?"

অগম অগোচর রাখিয়ে করি করি কোটি জতন।
দাদূ ছানা ক্যোঁ রহৈ, জিস ঘটি রাম রতন॥

(সুমিরণ অংগ, ১১৫)।

বিশ্বমৈত্রী: সাধকের যখন এই অবস্থা তখন সর্ব্বত্র তাঁর মৈত্রী। সর্ব্ব চরাচরে তিনি দেখেন পরমাত্মাকে, তখন পর তাঁহার আর কেহ থাকে না। সর্ব্বত্র তখন তাঁহার প্রেম ও মৈত্রী। এই অবস্থার কথা দাদূর দয়া নির্বৈরিতা অংগে সর্ব্বত্রই পরিস্ফুট। "তখন বৃক্ষলতা হইতেও একটি জীবন্ত পাতা ছিঁড়িতে কষ্ট হয়, কারণ মনে হয় তাহার দুঃখ হইবে, প্রাণস্বরূপ তো তাহাতেও বিরাজমান।"

(দয়া নির্বৈরিতা অংগ, ২২)।

এই কথা অনতিপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

সর্ব্বত্র পরম গুরু: সাধক তখন সকল চরাচরে দেখেন তাঁহার গুরু পরব্রহ্ম বিরাজমান। সৃষ্টির সর্ব্বত্র সেই সৃষ্টিকর্ত্তা, সর্ব্বত্রই চলিয়াছে তাঁর দীক্ষা। "দাদূ বলেন, পশুপক্ষী বনরাজি সবই গুরু করিয়াছেন সৃষ্টি। তিনলোকে, পঞ্চগুণে, সকলের মধ্যেই ভগবান বিরাজিত।

দাদূ সবহী গুর কিয়ে, পসু পংখী বনরাই।
তীনি লোক গুণ পংচসৌঁ, সবহী মাঁহিঁ খুদাই॥

(গুরুদেব অংগ, ১৫৬)।

অন্তরে পরম গুরু ঃ যখন বিশ্বচরাচরে পরমগুরু পরব্রহ্মকে উপলব্ধি করা যায় তখন বাহিরে আর সদ্‌গুরু খুঁজিয়া বেড়াইতে হয় না, অন্তরেই নিভৃতে নিরন্তর তাঁর সঙ্গ তাঁর শান্ত উপদেশ মিলে। "অন্তরের মধ্যেই কর আরতি, অন্তরেই হইবে তাঁর পূজা, অন্তরেই সদ্‌গুরুর কর সেবা, ক্বচিতই কেহ এই রহস্য বুঝে।"

মাঁহৈ কীজৈ আরতী, মাঁহৈ পূজা হোই।
মাঁহৈ সদগুর সেৱিয়ে, বূঝৈ বিরলা কোই॥

(পরচা অংগ, ২৬৫)।

"পরমগুরু আমার প্রাণ, তিনি দেন পরিপূর্ণ সকল আনন্দ। দাদূ বলেন অনন্ত অপার খেলা তিনি খেলেন, অপার আমার সর্ব্বস্ব ও সর্ব্বপরিপূর্ণতা।"

পরমগুরু সো প্রাঁণ হমারা, সব সুখ দেৱৈ সারা।
দাদূ খেলৈ অনত অপারা, অপারা সারা হমারা॥

(আসাৱরী, ২৪৩)।

বিশ্বলীলা ঃ সকল চরাচর ভরিয়া পরব্রহ্মের লীলা। "দাদূ, চাহিয়া দেখ্ দয়ালকে, সকল ঠাই রহিয়াছেন ঠাসিয়া পূর্ণ করিয়া! ঘটে ঘটে আমার স্বামী, তুই অন্য কিছুই যেন কল্পনা না করিস্।"

দাদূ দেখু দয়াল কৌঁ রোকি রহ্যা সব ঠৌর।
ঘটি ঘটি মেরা সাঁইয়া, তূঁ জিনি জাণৈ ঔর॥

(পরচা অংগ, ৮১)।

ভিতরে বাহিরে সর্ব্বত্রই তিনি। "দাদূ, দেখ্ দয়ালকে; বাহিরে ভিতরে তিনিই বিরাজিত, সব দিশি দেখিতেছি প্রিয়তমকে; অন্য আর তো কেহই নাই।"

দাদূ দেখু দয়াল কৌঁ, বাহরি ভীতরি সোই।
সব দিসি দেখৌঁ পীৱ কৌঁ, দূসর নাঁহীঁ কোই॥

(পরচা অংগ, ৭৯)।

"তাঁহাকেই কর তোমার সঙ্গের সঙ্গী যিনি সুখ দুঃখের সাথী, জীবনে মরণে তিনিই নিত্য সহচর।"

এক দীপ্তিকে হইবে দীপ্যমান যে কিছুতেই জীবনের সেই দীপ্ত সত্য গোপন করা সম্ভব হইবে না। "যেখানে খুসী রাখ লুকাইয়া, সত্যকে যায় না গোপন করিয়া রাখা। রসাতলের অনন্ত হইতে গগনের ধ্রুবতারা পর্য্যন্ত সবাই তাহাকে কহিবে প্রকট করিয়া।"

ভাবৈ তহাঁ ছিপাইয়ে, সাচ ন ছানা হোই।
সেস রসাতলি গগন ধূ, প্রগট কহিয়ে সোই॥

(সুমিরণ অংগ, ১১০)।

"কোটি যতন করিয়া করিয়া রাখ তাহাকে অগম অগোচরে, তবু যেই ঘটে দীপ্যমান সেই রামরতন কেমন করিয়া তাহা রহে প্রচ্ছন্ন?"

অগম অগোচর রাখিয়ে করি করি কোটি জতন।
দাদূ ছানা ক্যোঁ রহৈ, জিস ঘটি রাম রতন॥

(সুমিরণ অংগ, ১১৫)।

বিশ্বমৈত্রী: সাধকের যখন এই অবস্থা তখন সর্ব্বত্র তাঁর মৈত্রী। সর্ব্ব চরাচরে তিনি দেখেন পরমাত্মাকে, তখন পর তাঁহার আর কেহ থাকে না। সর্ব্বত্র তখন তাঁহার প্রেম ও মৈত্রী। এই অবস্থার কথা দাদূর দয়া নির্বৈরিতা অংগে সর্ব্বত্রই পরিস্ফুট। "তখন বৃক্ষলতা হইতেও একটি জীবন্ত পাতা ছিঁড়িতে কষ্ট হয়, কারণ মনে হয় তাহার দুঃখ হইবে, প্রাণস্বরূপ তো তাহাতেও বিরাজমান।"

(দয়া নির্বৈরিতা অংগ, ২২)।

এই কথা অনতিপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

সর্ব্বত্র পরম গুরু: সাধক তখন সকল চরাচরে দেখেন তাঁহার গুরু পরব্রহ্ম বিরাজমান। সৃষ্টির সর্ব্বত্র সেই সৃষ্টিকর্ত্তা, সর্ব্বত্রই চলিয়াছে তাঁর দীক্ষা। "দাদূ বলেন, পশুপক্ষী বনরাজি সবই গুরু করিয়াছেন সৃষ্টি। তিনলোকে, পঞ্চগুণে, সকলের মধ্যেই ভগবান বিরাজিত।

দাদূ সবহী গুর কিয়ে, পসু পংখী বনরাই।
তীনি লোক গুণ পংচসৌঁ, সবহী মাঁহিঁ খুদাই॥

(গুরুদেব অংগ, ১৫৬)।

অন্তরে পরম গুরু : যখন বিশ্বচরাচরে পরমগুরু পরব্রহ্মকে উপলব্ধি করা যায় তখন বাহিরে আর সদ্‌গুরু খুঁজিয়া বেড়াইতে হয় না, অন্তরেই নিভৃতে নিরন্তর তাঁর সঙ্গ তাঁর শান্ত উপদেশ মিলে। "অন্তরের মধ্যেই কর আরতি, অন্তরেই হইবে তাঁর পূজা, অন্তরেই সদ্‌গুরুর কর সেবা, ক্বচিতই কেহ এই রহস্য বুঝে।"

মাঁহৈ কীজৈ আরতী, মাঁহৈ পূজা হোই।
মাঁহৈ সদগুর সেৱিয়ে, বূঝৈ বিরলা কোই॥

(পরচা অংগ, ২৬৫)।

"পরমগুরু আমার প্রাণ, তিনি দেন পরিপূর্ণ সকল আনন্দ। দাদূ বলেন অনন্ত অপার খেলা তিনি খেলেন, অপার আমার সর্ব্বস্ব ও সর্ব্বপরিপূর্ণতা।"

পরমগুরূ সো প্রাঁণ হমারা, সব সুখ দেৱৈ সারা।
দাদূ খেলৈ অনত অপারা, অপারা সারা হমারা॥

(আসাৱরী, ২৪৩)।

বিশ্বলীলা : সকল চরাচর ভরিয়া পরব্রহ্মের লীলা। "দাদূ, চাহিয়া দেখ্ দয়ালকে, সকল ঠাঁই রহিয়াছেন ঠাসিয়া পূর্ণ করিয়া! ঘটে ঘটে আমার স্বামী, তুই অন্য কিছুই যেন কল্পনা না করিস্।"

দাদূ দেখু দয়াল কৌঁ রোকি রহ্যা সব ঠৌর।
ঘটি ঘটি মেরা সাঁইয়া, তূঁ জিনি জাণৈ ঔর॥

(পরচা অংগ, ৮১)।

ভিতরে বাহিরে সর্ব্বত্রই তিনি। "দাদূ, দেখ্ দয়ালকে; বাহিরে ভিতরে তিনিই বিরাজিত, সব দিশি দেখিতেছি প্রিয়তমকে; অন্য আর তো কেহই নাই।"

দাদূ দেখু দয়াল কৌঁ, বাহরি ভীতরি সোই।
সব দিসি দেখৌঁ পীর কৌঁ, দূসর নাঁহীঁ কোই॥

(পরচা অংগ, ৭৯)।

"তাঁহাকেই কর তোমার সঙ্গের সঙ্গী যিনি সুখ দুঃখের সাথী, জীবনে মরণে তিনিই নিত্য সহচর।"

সংগী সোঈ কীজিয়ে, সুখ দুখকা সাথী।
দাদূ জীবণ মরণকা, সো সদা সংগাতী ॥

(অবিহড় অংগ, ৪)।

তিনিই "সকল ভুবন ভরিয়া!"………"সকল ভুবন শোভায় আচ্ছাদিত করিয়া সকল ভুবনে বিরাজিত!"

সকল ভুৱন ভরে… ‥
সকল ভুৱন ছাজৈ, সকল ভুৱন রাজৈ ॥"……

(রাগ আসাৱরী ২৩৬)।

অবতার : বিশ্বচরাচর ভরিয়া চলিয়াছে যাঁর নিত্যলীলা তাঁহাকে অবতারভাবে দেখিতে হইলে তাঁহাকে সঙ্কীর্ণ করিয়া দেখিতে হয়। "সেই জগদ্গুরুর না আছে জন্ম না আছে মরণ; সব তাঁহাতেই উৎপন্ন হইয়া তাঁহাতেই হয় সমাহিত।"

মরৈ ন জীৱৈ জগত গুর, সব উপজি খপৈ উস মাঁহিঁ ॥

(পীৱ পিছাণ অংগ, ১৬)।

"তিনি পূরণ নিশ্চল একরস, জগতে আসিয়া তিনি নাচিয়া বেড়ান না।"

পূরণ নিহচল্ একরস, জগতি ন নাচৈ আই ॥

(পীৱ পিছাণ অংগ, ১৮)।

তাঁহাকে বিশেষ এক বিগ্রহে সঙ্কীর্ণ করিয়া লাভ কি? "ঘটে ঘটেই গোপী, ঘটে ঘটেই কৃষ্ণ,………সেখানেই কুঞ্জ কেলি পরমবিলাস, সকল সংগী মিলিয়া খেলেন সেখানে রাস। বেণু বিনাই সেখানে বাজে বংশী, কমল হয় বিকশিত, চন্দ্র সূর্য্য হয় প্রকাশিত; পূরণব্রহ্মের সেখানে পরমপ্রকাশ; আত্মায় এই লীলা দেখে দাদূদাস।"

ঘটি ঘটি গোপী ঘটি ঘটি কাঁন্হ………
কুংজ কেলি তহঁ পরম বিলাস।
সব সংগী মিলি খেলৈঁ রাস ॥
তহঁ বিন বৈঁনাঁ বাঁজেঁ তূর।
বিগসৈ কমল চংদ অরু সূর ॥

পূরণ ব্রহ্ম পরম পরকাস।
তহঁ নিজ দেখে দাদূ দাস॥

(রাগ ভৈরুঁ, ৪০৭)।

এই অন্তরের মধ্যেই তো "ব্রহ্মও জীব, হরিও আত্মা, খেলিতেছেন গোপী কৃষ্ণের লীলা।"

ব্রহ্ম জীৱ হরি আতমা খেলৈঁ গোপী কান্হ॥

(সাখীভূত অংগ, ৮)।

"পূর্ণস্বরূপের সঙ্গে হইল পরিচয়, পূর্ণ মতি উঠিল জাগিয়া, জীবনের মধ্যেই মিলিল জীব ও জীবিতনাথ, এমনই আমার মহাসৌভাগ্য !"

পূরেসৌঁ পর্চা ভয়া পূরী মতি জাগী।
জীৱ জাঁনি জীবনি মিল্যা, ঐসেঁ বড় ভাগী॥

(রাগ রামকলী, ২০৬)।

যে দেখিল এই লীলা সে-ই বুঝিল, "নর-নারায়ণ এই দেহ।"

(চিতাৱনী অংগ, ১১; রাগ টোড়ি, ২৭৯)।

সেবা: এই লীলারস যে অন্তরে দেখিল সে তো বাহিরে তাহা প্রকাশ করিতে পারে না। তবে এই আনন্দের ঋণ শোধ করিতে হয় সেবায়। পতিপ্রাণা সতী কি তার প্রেম-সৌভাগ্যের অনুভবগুলি সকলকে কহিয়া বেড়াইতে পারে? সে তার সৌভাগ্যের পরিচয় দেয় প্রিয়জনের সেবায়। আর এই সেবার উপলক্ষ্যেই গভীরতর মেলে তাঁর সঙ্গ। তাই দাদূ বলেন, যদি বিধাতার কাছে ক্ষুদ্র কিছু প্রার্থনা কর তবে ভিক্ষুকের মত তৎকালোপযোগী কিছু ভিখ পাইতে পার বটে কিন্তু তাঁর নিত্য আনন্দময় সঙ্গ তো পাইবে না। বরং সেই সেবাময়ের সহিত যদি সেবা কর তবেই নিত্য পাইবে তাঁর সঙ্গ। কারণ, "যে পর্য্যন্ত তিনি রাম সে পর্য্যন্ত তিনি সেবক। অখণ্ডিত সেবা তাঁর এক রস, হে দাদূ, তাই তিনি সেবক।"

দাদূ জবলগ রাম হৈ তবলগ সেৱগ হোই।
অখংডিত সেৱা এক রস, দাদূ সেৱগ সোই॥

(পরচা অংগ, ২৪৯,)।

তাই, "নারী ততক্ষণই সেবা-পরায়ণা যতক্ষণ স্বামী পাশে পাশে।"

নারী সেৱগ তব লগৈঁ জব লগ সাঁঈ পাস ॥

(নিহকরমী পতিব্রতা অংগ, ৫১)।

"স্বামীর সঙ্গে সমানে করে যদি সেবা তবেই সেবক পায় আনন্দ।"

সাঁঈ সরীখী সেৱা কীজৈ তব সেৱগ সুখ পাৱৈ ॥

(পরচা অংগ, ২৫১)।

অতি-বিনয়বশতঃ সেবায় সঙ্কুচিত হওয়া কোন কাজের কথা নয়। "সেবক সেবা করিতে পাইতেছিস্ ভয়? আমাহইতে কিছুই হইবে না? তুই যেমনটি আছিস্ তেমনি প্রণতিটিই নে করিয়া, আর কেহ না-ই বা জানিল।"

সেৱগ সেৱা করি ডৱৈ হম থৈঁ কছূ ন হোই।
তূঁ হৈ তৈসী বংদগী করি নহিঁ জাণৈ কোই ॥

(পরচা অংগ, ২৫২)।

অন্তঃসঞ্চয়ঃ বৃষ্টি হইলে অধিকাংশ জল নাবিয়া যায় ধরণীর গভীর অন্তরে। তার পরে কূপ-ডোবা-নদী-নির্ঝরে ধরণী সেই জল ফিরাইয়া দিয়া করে সবার সেবা। বৃক্ষলতা সবার মূলে এই সঞ্চিত রসই করে সে বিতরণ। ধরণীর এই রসের ভাণ্ডার কখনো তো নিঃশেষ হয় না। যেমন যেমন হয় এই রস বিতরিত, তেমন তেমন পায় সে নূতন ধারা। নিত্য সেবা করিতে হইলে নিত্যই রসময়ের কাছে নব নব রস চাই। তাই দাদূ বলেন, অমৃতরূপী নামরস নিত্য কর গ্রহণ. "সহজে সহজ-সমাহিত হইয়া ধরণী যেমন ধীরে ধীরে জল করে শোষণ।"

সহজৈঁ সহজ সমাধি মৈঁ ধরণী জল সোখৈ ॥

(বেলী অংগ, ২)।

"চাহিয়া দেখ, অমৃতময়ের অমৃতধারা! পরব্রহ্মই করিতেছেন বর্ষণ!"

অমৃত ধারা দেখিয়ে পার ব্রহ্ম বরিষংত ॥

(পরচা অংগ, ১১১)।

সেই রস পাইতে হইলে তোমাকেও রসে রসময় থাকিতে হইবে, সাধনার এ এক মহা রহস্য। সরস হও, প্রেমে সিক্ত থাক, রস ও প্রেমধারা গ্রহণ কর।

"রসের মধ্যেই অনন্ত কোটি ধারায় রসের হয় বর্ষণ। সেখানে মন রাখ নিশ্চল, হে দাদূ তবে সদাই তোমার বসন্ত।"

রসহী মৈঁ রস বরষিহৈ, ধারা কোটি অনংত।
তহঁ মন নিহচল রাখিয়ে, দাদূ সদা বসংত ॥

(পরচা অংগ, ১১২)।

"রসের মধ্যেই রসে হইলাম রঞ্জিত, রসের মধ্যেই রসে হইলাম মত্ত, অমৃত করিলাম পান।"

রস মাঁহেঁ রস রাতা,
রস মাহেঁ রস মাতা,
অমৃতপীয়া ॥

(রাগ আসাবরী, ২৩৬)।

রসের এই বর্ষণ ও গ্রহণের কথা কায়ার মধ্যে ষট্‌চক্রবেধ ও সহস্রার হইতে ক্ষরিত রসেরই বিষয়ে, ইহাও অনেকের মত।

অনুভব-আনন্দ ঃ রসানুভবই পরমানন্দ। এই আনন্দেই বিধাতা নিত্য-সেবক, নিত্য-সৃষ্টিপরায়ণ। দাদূ বলেন, "এই অনুভব হইতেই হইল আনন্দ, পাইলাম নির্ভয় নাম। অগম্য অগোচর ধামে নিশ্চল নির্মল পাইলাম নির্ব্বাণ পদ।"

অনভৈ থৈঁ আনংদ ভয়া, পায়া নির্ভয় নাঁব।
নিহচল নির্মল নির্বাণপদ, অগম অগোচর ঠাঁব ॥

(পরচা অংগ, ২০৩)।

সঙ্গীতের মূল উৎস ঃ পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে জ্ঞানের উৎসে পাই বাণী, আর অনুভবের উৎসে পাই সঙ্গীত। "অনুভব যেথা হইতে উৎপদ্যমান সেখানে সঙ্গীত করিল নিবাস।"

অনভৈ জহাঁ থৈঁ উপজে, সবদৈঁ কিয়া নিবাস ॥

(পরচা অংগ, ২৯)।

আনন্দের সৃষ্টি ঃ অনুভবের এই আনন্দই হইল সৃষ্টির মূল। সাধক যদি সৃজনকর্ত্তার সঙ্গে সঙ্গে সাধনায় যুক্ত থাকিতে চান তবে তাঁহাকেও এই

আনন্দরসে নিত্য থাকিতে হইবে "রাতা মাতা"। এই আনন্দই সৃষ্টির মূলে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে সীকরীতে যখন গুরু দাদূ সকলকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "কোন শুভক্ষণে হইল সৃষ্টি?" (বিচার অংগ, ৩৮)। তখন বখনা উত্তর দিয়াছিলেন, "সে হইল আনন্দের শুভক্ষণ তাই কর্ত্তা হইলেন সৃজন-স্রষ্টা।"

বখনাঁ বরিয়াঁ খুসী কী কর্তা সিরজনহার।

পরম বিশ্রাম ঃ বিশ্ব-রচয়িতা বিশ্ব সেবকের সঙ্গে প্রেমানন্দে এমন নিত্যযোগই হইল সাধকের পরম সার্থকতা। তখন তাঁহার আর কিছুই অভাব নাই, প্রার্থনীয়ও নাই। এই "ব্রহ্মপূর্ণতায়" ভরপূর হইলে নিত্যপ্রেম নিত্যসৃষ্টি, নিত্যসঙ্গীত, নিত্যআনন্দ সবই সাধকের চারিদিকে আপনি উঠে উচ্ছ্বসিত হইয়া; সে জন্য তাঁহার আর প্রয়াসের প্রয়োজন থাকে না। তখন সবই তাঁর সহজ, এই সহজেই তাঁর সকল সার্থকতা—"পরম বিশ্রাম।"

শিষ্যদের কাছে প্রাপ্ত দাদূর বর্ণনা

৪৮। **সুন্দরদাস।** দাদূর শিষ্য সুন্দরদাস বেদান্তে ভরপূর হইয়া সব কিছুই বৈদান্তিক ভাবেই দেখিয়াছেন। তাহা হইলেও দাদূর ধ্যানের গভীরতা, শুদ্ধতা ও সত্যতা তিনি চমৎকার বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন "হিন্দু ও মুসলমান দুই পক্ষ যখন বৃথা ঝগড়া করিয়া মরিতেছিল তখন সম্প্রদায় পক্ষ প্রভৃতির অতীত দাদূর সাধনা দশদিক উজ্জ্বল করিয়া প্রকাশিত হইতেছিল। তিনি নিজের সঙ্কীর্ণ পন্থ প্রবর্ত্তিত না করিয়া পরব্রহ্মের সম্প্রদায় ও প্রসিদ্ধ সুন্দর পথ প্রবর্ত্তিত করিলেন।"

"দাদূ দয়াল দহ দিশি প্রগট ঝগরি ঝগরি দ্বৈ পষ থকী।
কহি সুংদর পংথ প্রসিদ্ধ য়হ সম্প্রদায় পরব্রহ্ম কী॥"

(সুন্দরদাস, গুরুকৃপা অষ্টক)।

দাদূর সম্প্রদায়কে সাধু ভক্তেরা ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ও বলেন (সুন্দরসার, ২৫ পৃষ্ঠা)। সুন্দরদাস বলেন—"দাদূ ছিলেন নিষ্কাম, নির্লোভ, ধীর, সংযমী, মহাজ্ঞানী, নম্র, ক্ষমাশীল ও সদাসন্তুষ্ট। তাঁহার উপাস্য ব্রহ্মেরই মত তিনি ছিলেন সর্ব্ব-বন্ধন-বিমুক্ত। তিনি ছিলেন না-যোগী, না জঙ্গম, না সন্ন্যাসী, না-বৌদ্ধ, না-জৈন; এবং সেইজন্যই তিনি ছিলেন সম্প্রদায়াতীত ও সকল বেদ বেদান্ত স্মৃতিপুরাণের যথার্থ মর্ম্মজ্ঞ।"

সুন্দর বলেন, "তোমরা যাহাকে দেখিতে পাও শুনিতে পাও বলিয়া সত্য মনে কর, গুরুর কৃপায় আমি তাহাকে স্বপ্ন বলিয়া দেখিয়াছি। তিনি যে সত্য দেখাইয়াছেন, (তোমরা স্বপ্ন মনে করিলেও) তাহাকেই আমি নিশ্চয় বলিয়া মানিয়াছি।"

"সুংদর সদ্‌গুরু যোঁ কহৈ য়াহী নিশ্চয় মানি
জ্যোঁ কছু সুনিয়ে দেখিয়ে সর্ব সুপ্ন করি জানি॥"

(সুন্দর, গুরু উপদেশ অষ্টক)।

"জাতি কুল বর্ণ আশ্রম প্রভৃতিকে (মানুষের সৃষ্ট সব মিথ্যা ভেদবুদ্ধি ও

মিথ্যা প্রতিষ্ঠানকে) যিনি মিথ্যা বলিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন, সেই দাদূ দয়ালই প্রসিদ্ধ সদ্‌গুরু ; তাঁহাকেই আমার নমস্কার।”

“জিনি জাতি কুল অরু বর্ণ আশ্রম কহে মিথ্যা নাম হৈঁ ।
দাদূ দয়াল প্রসিদ্ধ সদ্‌গুরু তাহি মোর প্রণাম হৈঁ ॥”

(সুন্দর, গুরু উপদেশ অষ্টক)।

৪৯। **ক্ষেত্রদাস ঃ** ভক্ত ক্ষেত্রদাস বলেন “দাদূ সকল সম্প্রদায় সকল জাতির সঙ্গে সমানভাবে মিলিয়া ধর্ম্মকে সব দিক হইতে গ্রহণ করিয়া সত্যধর্ম্মকে যথার্থভাবে পাইয়াছেন।”

৫০। **রজ্জবদাস ঃ** ভক্ত রজ্জবজী বলেন, “দাদূর কোনো ভেখ বা সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার বালাই ছিল না। মালা, তিলক, গেরুয়াবসনের ধার তিনি ধারিতেন না। ভণ্ডামি ও বাঁধাবুলি তিনি কোনো ক্রমেই স্বীকার করেন নাই। জৈন মত বা ভেখও মানেন নাই, ধর্ম্ম লইয়া সাংসারিকতাও করেন নাই, (যোগীদের মত) শৃঙ্গ ও মুদ্রাও সেবা করেন নাই, বৌদ্ধ মতও নেন নাই, কোন প্রকার মিথ্যাও হৃদয়ে স্থান দেন নাই। মুসলমান সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিও তিনি ত্যাগ করিয়া ছিলেন, হিন্দুর সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতাও তিনি স্বীকার করেন নাই। তিনি ছিলেন উদার ও প্রবীণ-বিজ্ঞান।”

“ভগৱাঁ জী ভাৱৈ নাহিঁ, বিভূতি লগাৱৈ নাহিঁ,
পাখণ্ড সুহাৱৈ নাহিঁ, এসী কছু চাল হৈ।
টীকা মালা মানৈঁ নাহিঁ, জৈন স্বাংগ জানৈ নাহি,
প্রপংচ পরৱানৈ নাহিঁ, ঐসা কছু হাল হৈ।
সীংগী মুদ্রা সেৱৈ নাহিঁ, বোধ বিধি লেৱৈ নাহিঁ,
ভরম দিল দেৱৈ নাহিঁ, ঐসা কছু খ্যাল হৈ।
তুরকোঁ তো খোদি গাড়ী, হিংদুনকী হদ্দছাড়ী,
অংতর অজর মাঁড়ী, ঐসো দাদূ লাল হৈ ॥”
“মিলৈ ন কাহূ কৈ সংগ” “চালি সব হদসূ আয়ে বেহদ”
“পরৱীন বিন্নান্ হৈ ॥”

(রজ্জবজী, শ্রীস্বামী দাদু দয়ালজীকা ভেটকা সবৈয়া)।

"সুমহৎ গুরু মিলিয়াছেন দাদূ। প্রশস্ত তাঁর মন সাগরবৎ উদার কল্যাণময়। তিনি প্রসন্ন হইতেই মঙ্গল ভজন-রসে মন উঠিল ভরিয়া।"

গুরু গরৱা দাদূ মিল্যা দীরঘ দিল দরিয়া।
হসন প্রসন্ন হোতহী ভজন ভল ভরিয়া॥"

(রজ্জব, রাগগুংড, ১,১)।

"আসিলেন (আমার গুরু) পরব্রহ্মের প্রিয়, ত্রিগুণরহিত, বন্ধনাতীত, ব্রহ্মরসরত, সাম্প্রদায়িক সকল ভেখ চিহ্নাদি যিনি দিলেন ফেলিয়া। কণ্ঠীও তিনি ধরেন না, তিলকও কখনো ধরেন না, সকল ভণ্ডামি তাঁর কাছে হার মানিল। সাচ্চা সাধক, অতি সরলভাবে তাঁর জীবনযাত্রা, সকল লোকের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ। সম্প্রদায়-বিধি মন্ত্র-"বাদ" তিনি মানেন না, ষড়্দর্শন হইতে তিনি স্বতন্ত্র। সকল ভেখ ত্যাগ করিয়া যিনি ভগবানকে ভজিলেন। পরিপূর্ণ সত্যের তিনি মূর্ত্তিমান নির্য্যাস।"

আয়ে মেরে পারব্রহ্মকী প্যারে।
ত্রিগুণ রহিত নির্বন্ধ ব্রহ্মরসরত সকল স্বাংগ গহি ডারে।
মালা তিলক করে নহীঁ কবহূঁ সব পাখংড পচি হারে।
সাচে সাধ রহতে সাদী গতি সকল লোকমেঁ সারে।
মংত শাখ নেম বাদ ন মানৈ ষটদর্শন সোঁ ন্যারে।
ভজে ভগবংত ভেখ সব ত্যাগে এক সাচকে গারে॥

(রাগগুংড, ১১)।

"দাদূ ছিলেন উদার, দাতা, দয়ালু ও মহামনা। তাঁহার বীর্য্য ও মহত্ত্বের কোনো সীমাই ছিল না। "অহম্-ভাব-"বিমুক্ত মুক্তপ্রাণ দাদূ ছিলেন সকলেরই কল্যাণ-হেতু। তিনি ছিলেন সাধকাগ্রগণ্য, ভগবৎপ্রেমে ভরপূর ও সাধকগণের মুকুটমণি"। (রজ্জব, দাদূ দয়ালজীকা ভেটকা সবৈয়া)।

৫১। **গরীবদাস ও জাইসা :** গরীবদাস বলেন,"প্রেম পান করিয়া ও প্রেম পান করাইয়া দাদূ সকল তৃষিতকে তৃপ্ত করিতেন। তাঁহার দরশনে সকল দুঃখ, সকল জ্বালা দূর হইয়া যাইত।"

ভক্ত জাইসা বলেন, "গুরুর গুরু কমাল মহামানব চিনিবার যে যে লক্ষণ

বলিয়াছেন, দাদূ সেই সেই লক্ষণেই মহামানব ছিলেন। কমাল যে বলেন মুক্তস্বরূপকে বুঝিবার জন্যই সাধককে আপনার অন্তরের ও বাহিরের সকল বন্ধনকে অতিক্রম করিতে হয়, দাদূ তাহাই করিয়াছিলেন। (কমালের মহামানবের মতই) দাদূ তত্ত্ব বুঝিবার জন্যই দর্শন ও "বাদ" ছাড়িলেন, মানবের মহিমা বুঝিবার জন্যই দাদূ জাতি-পংক্তি ছাড়িলেন, ভাগবত-রস-মাধুর্য্য বুঝিতে তিনি শুষ্ক তত্ত্ববাদ ছাড়িলেন, সৃষ্টির লীলারস বুঝিতে তিনি পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব ও মত-কার্পণ্য ছাড়িলেন, রস ও সৌন্দর্য্য বুঝিতে তিনি নিয়ম ও ভেখ (অন্তরের ও বাহিরের সীমা ও সঙ্কীর্ণতার ব্যর্থ বিধি ও অলঙ্কার) ছাড়িলেন, বিশ্বাত্মাকে বুঝিতে দাদূ আপনাকেই ছাড়িলেন।"

দাদূর বর্ণিত পূর্ব্ব ভাগবতগণ।

সাধকের প্রধান বলিবার কথা হইল সাধনা ও তাহার পথ। এই পথ চিনাইয়া দিবার জন্য যে প্রত্যক্ষদর্শী জ্ঞানীর প্রয়োজন এ কথাও আমাদের দেশে পুরাতন। সাধনার জগতে গুরু ও সাধুসঙ্গ চাই একথা চিরপরিচিত। বেদপুরাণাদি শাস্ত্র হইল প্রাচীন মানব অভিজ্ঞতার সঞ্চিত ভাণ্ডার। শাস্ত্র ও গ্রন্থের দ্বারা যাঁহারা প্রাচীন কালের অভিজ্ঞতার সহায়তা লাভ করিতে পারেন নাই ও বিবিধ বিদ্যার দ্বারা যাঁহারা নানাস্থানের অভিজ্ঞতারও পরিচয় পান নাই তাঁহারা কোনো সত্যকে পাইতে হইলে ভগবানের করুণা ও তাঁহার নির্দ্দেশের উপরেই একান্ত নির্ভর করেন। এ জগতে মানুষের অভিজ্ঞতার কোনো সহায়তা পাইতে হইলেই এমন সব শাস্ত্রহীন বিদ্যাবিহীন সরল সাধনার্থীকে গুরুরই খোঁজ করিতে হয়। এমন কথা আমাদের দেশের বিদ্যাবিহীন ও শাস্ত্রজ্ঞানহীন সকল সাধকের দলই বলিয়াছেন।

এই কথা স্বীকার করিলেও দাদূ ভগবানের সহায়তাকেই সর্ব্বাপেক্ষা বড় আশ্রয় মনে করিয়াছেন। "গুরু" অঙ্গে ও "সাধু" অঙ্গে এই কথা তিনি বারবারই বলিয়াছেন। কাহারও কাহারও মতে সাধক কমাল এবং কাহারও কাহারও মতে কমাল পরিবারেরই বুদ্ধন ছিলেন দাদূর গুরু। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে সুন্দরদাস তাঁহার গুরুসম্প্রদায়গ্রন্থে বৃদ্ধানন্দকে দাদূর গুরু বলিয়াছেন। এবং এই উল্লেখ করিবার হেতুও বলা হইয়াছে। জনগোপালের "দাদূ-পরচী"গ্রন্থেও একথার উল্লেখ আছে (দ্রঃ সুন্দরসার, ৮৩ পৃঃ)। গুরু ভগবানেরই প্রেরিত, তাঁর মধ্যেও ভগবানকে প্রত্যক্ষ করা যায় বলিয়া দাদূ গুরুকে কখনও "গুরুগোবিন্দ" "গুরুসুন্দর" প্রভৃতি বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন।

(দাদূ, গুরু অঙ্গ, ৫৯ ইত্যাদি)।

অথচ আসলে পরব্রহ্মই একমাত্র উপাস্য ও ব্রহ্মই তাঁহার গুরু এই কথা বলাতে তাঁহার সম্প্রদায়কে ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ও বলা হইয়াছে।

(সুন্দরসার, পৃঃ ১৩ ; পৃঃ ৯৫)।

৫২। **সাধক নাম পরম্পরা ঃ** পূর্ব্ববর্ত্তী ভাগবতদের নাম করিতে গিয়া দাদূ প্রথমেই নারদের নাম করিয়াছেন। তারপর নাম করিয়াছেন প্রহ্লাদ, শিব ও কবীরের; তার পর নাম করিয়াছেন শুকদেব, পীপা, রইদাস (রবিদাস), গোরখনাথ, ভর্ত্তৃহরি, অনন্ত সিদ্ধাগণ ও গোপীচন্দ্রের।

(সুমিরণ অঙ্গ, ১১১—১১৪)।

সিদ্ধাদের নাম দাদূ করিয়াছেন রাগ সিন্ধুড়া ২৫১ পদে, এবং রাগ গৌড়ী ৫৮ পদে।

এস্থলে দাদূর শিষ্য সুন্দরদাসের বর্ণিত সহজপথের ও যোগপথের সাধকদের নাম করা উচিত। সহজ পথের সাধক—

"সোজা", "পীপা" সহজি সমানা।
"সেন" "ধনা" সহজৈ রস পানা॥
জন "রেদাস" সহজ কোঁ বংদা।
গুরু "দাদূ" সহজৈ আনংদা॥

(সুন্দরদাস, সহজানন্দগ্রন্থ, ২৩)।

আর যোগ (হঠযোগ) পথের সাধক হইলেন—

"আদিনাথ" "মৎসেন্দ্র" অরু "গোরখ" "চর্পট" "মীন"।
"কাণেরী" "চৌরঙ্গ" পুনি হঠ সুযোগ ইনি কীন॥

(সুন্দরদাস, সর্ব্বাঙ্গযোগগ্রন্থ, ৪)।

হঠ প্রদীপিকা মতে আদিনাথ, যাজ্ঞবল্ক্য, গোরক্ষনাথ, মৎসেন্দ্রনাথ, ভর্ত্তৃহরি, মংথান, ভৈরব, কংথড়ি, চর্পট, কানেরী, নিত্যনাথ, কপালী, ঢিংঢণী, নিরঞ্জন ইত্যাদি হঠযোগী।

দাদূ বলেন, কবীর মহাশক্তিশালী সাধক।

কবীর বিচারা কহ গয়া বহুত ভাঁতি সমঝাই।
দাদূ দুনিয়া বাররী তাকে সংগি ন জাঈ॥

অর্থাৎ বেচারা কবীর কত রকমেই এই কথা গেল বুঝাইয়া, কিন্তু দুনিয়া এমন পাগল যে তাঁর সঙ্গে চলিবে না।

(সাচ কৌ অংগ, ১৮৬)।

৫৩। **কবীর।** কবীর যেমন অনায়াসে বড় বড় সব বাধা অতিক্রম করিয়া সাধনার পথে অগ্রসর হইয়াছেন, তেমন করিয়া অগ্রসর হইতে ও তাঁর সঙ্গে সমান চালে চলিতে কেহই পারে না। সত্যের মধ্যে কবীরের সহজ ও গভীর স্থিতি অন্যের পক্ষে অনুকরণ করা যেমন কঠিন তেমনিই বিষম। যে "এককে" কেহ পারে না ধরিতে তাহার সঙ্গে তিনি রহিলেন যুক্ত হইয়া, যেখানে কালও আসিয়া পারে না ঝাঁপাইয়া পড়িতে।

(দাদূ, মধ্যঅঙ্গ, ১৭, ১৮)।

"ভিতরে মনের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া, অন্তরের সকল শত্রু জয় করিয়া, অনুপম শৌর্য্য বীর্য্যের সঙ্গে ভগবানের চরণে তনু মন প্রাণ সকল উৎসর্গ করিয়াই কবীর সকল সাধনা পূর্ণ করিয়াছেন, এ কথা দাদূ জানেন।"

(দাদূ, সূরাতন অঙ্গ, ৫৩, ৫৪)।

দাদূ বলেন, "তাঁহার মধ্যে মিলিয়া যাইতে হইবে, এই জন্য যদি ঐহিক সীমাবদ্ধ জীবনকে মরিতে হয় তবু ভাল, কারণ ঐটুকুই হইয়াছে, তাঁর সঙ্গে বিচ্ছেদের হেতু। কেন আর বৃথা প্রিয়তমের সঙ্গে বিচ্ছেদ ব্যথা সহ্য করা ?"

দাদূ মরণা খুব হৈ, মরি মাঁহৈ মিলি জাই।
সাহিবকা সংগ ছাড়ি করি, কৌন সহৈ দুখ আঈ॥

(সূরাতন অংগ, ৫২)।

কবীরের এই সব এই সাধনার কথা শুনিতে যদিও ভয়ঙ্কর তবু একথা সত্য বলিয়াই দাদূর ভাল লাগে,—

"সাচা সবদ কবীরকা মীঠা লাগৈ মোহিঁ"

(দাদূ, সবদ অঙ্গ, ৩৪)।

কবীর ভাবিয়াছেন, "প্রিয়তমকে পাইবার সাধনা যদি কঠিন হয় তবে আনন্দেরই কথা। কারণ সাধনার দুঃখ সহিতে পারিলেই বুঝা যাইবে যে প্রিয়তমের প্রতি প্রেম আমাদের কত গভীর। তাঁর জন্য দুঃখ সহিতে পারাই

মহাসৌভাগ্য।" "দাদূরও প্রিয়তম তিনিই, যিনি কবীরেরও প্রিয়তম। তাঁহাকেই তো দাদূ জীবনে বরণ করিতে চাহেন" *—

"জো থা কংত কবীরকা সোই বর বরিহূঁ"

(দাদূ, পীব পিছাণ অঙ্গ ১১)।

এই কারণেই এক এক সময় দাদূ কবীরের বাণীকে নিজেরই বাণী করিয়া লইয়াছেন ও আপন বাণীর মধ্যে বসাইয়া দিয়াছেন।

(যথা, দাদূ, ভেষ অঙ্গ,১৯ ইত্যাদি ; নিহকরমী পতিব্রতা অংগ, ৩, ২২, ২৯ ; রাগ টোড়ী ২৭৯ ; ইত্যাদি)।

নামদেব, কবীর ও রইদাসের নাম তিনি গানের মধ্যে বার বার করিয়াছেন।

(দাদূ, নটনারায়ণ রাগ, ২৯৬ সবদ ;)।

"ইহি রসি রাতে নাঁমদেব পীপা অরু রৈদাস।"
পীবত কবীরা না থক্যা অজহূঁ প্রেম পিয়াস॥

(রাগ গৌড়ী, সবদ ৫৮)।

"নামদেব পীপা রবিদাস এই রসেই মত্ত। এই রস পান করিয়া কবীর আজও তৃপ্ত নহেন, আজও তাঁর প্রেমের পিপাসা।"

৫৪। **নামদেব ঃ** এক নামদেব মহারাষ্ট্রের প্রাচীন ভক্ত ও সাধককবি। মহারাষ্ট্রের নামদেব অনেক আগেকার লোক। উত্তরপশ্চিমের বুলন্দসহরে "ছিপি" জাতির লোকদের গুরু-স্থানীয় ভক্ত নামদেব একজন জন্মিয়াছিলেন। "ছিপিরা" কাপড়ে ছাপ দেয়, তাহাদের মতে নামদেবই প্রথমে তাহাদিগকে কাপড়ে নানাপ্রকারের সুন্দর নমুনার ছাপ দিবার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়া যান। ঐ পদ্ধতির ও ছাপের নানাবিধ বিচিত্র নমুনার তিনিই উদ্ভাবনকর্ত্তা। এই শিক্ষাপদ্ধতি ও সাধনার পদ্ধতি তাঁহার কাছে পাইয়াছে বলিয়া ছিপিরা নিজেদের পরিচয় দেয় "নামদেও-বংশী" বলিয়া। ১৪৪৩ খ্রীষ্টাব্দে মারওয়াড়ে তুলাধুনকর এক নামদেবের জন্ম হয়। সিকিন্দর লোদী বাদশার

---

* ভক্তরা বলেন এই উক্তিটি দাদূর কন্যাদের। উক্তিটি তাঁর মনের মত হওয়ায় তিনি ইহা স্বীকার করিয়াছেন, একথা অন্যত্র বলা হইয়াছে।

সময় তিনি জীবিত ছিলেন। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের দলপতিদের হাতে তাঁহাকে অনেক নিগ্রহ সহ্য করিতে হয়, গৃহহীন হইয়া নিরাশ্রয়ভাবে তাঁহাকে দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। একজন নামদেব পাঞ্জাবে খুব সম্মানিত। তিনি মহারাষ্ট্রের পাণ্ঢরপুরের নামদেব কি না সে বিষয়ে তর্ক আছে। জীবনের শেষভাগে পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলায় বটালা তহসিলের অন্তর্গত "ঘুমান" গ্রামে তিনি আশ্রয় নেন, এখানে এখনও তাঁর ভক্তরা দরবার করেন। মাঘী সংক্রান্তিতে এখানে খুব বড় মেলা বসে। তাঁর ভক্তরা প্রায়ই ছিপি, ধুনকর ও ধোপা জাতির। তাহারা বিশেষ কোনো একটা সম্প্রদায় ঠিক গড়িয়া তোলে নাই। তিনি শিক্ষা দিয়াছেন, "ঈশ্বর এক ; আন্তরিক শুদ্ধতা ও ভক্তির দ্বারা তাঁর সঙ্গে আমাদের যোগ হয়। বাহ্য আচার-অনুষ্ঠান-পুঞ্জ মিথ্যা সাধনার ও ব্যর্থ প্রয়াসের বোঝামাত্র, আমাদের এই আত্মরচিত বাধাই ভগবানের সঙ্গে যোগের পথে প্রধান বাধা।" ঘুমান মঠের প্রমাণ অনুসারে ১৩৬৩ ঈশাব্দে বোম্বাই সাতারার নরসী-বাহমনি গ্রামে এই নামদেবের জন্ম।

শিখদের আদিগ্রন্থে নামদেবের কিছু সবদ আছে। খুব সম্ভবতঃ তিনি ঘুমান মঠের সাধক নামদেব। এখনও তাঁর পুত্র বোহরদাসের বংশ ও তাঁর মঠ সেখানে আছে। কাহারও কাহারও মতে এই নামদেব নিজেও ছিলেন ধুনকর আর গুরুও ছিলেন ধুনকরদের। দাদূরও অনেক শিষ্য ধুনকর, তাই এমন লোকও আছেন যাঁহারা দাদূকেও গোলেমালে নামদেবের সঙ্গে যুক্ত করিয়া ফেলিয়াছেন। Tribes and castes of N. W. Provinces and Oudh গ্রন্থের (1896, Vol. II), ২২৫, ২৯৯ পৃষ্ঠায় ইহাদের কিছু বিবরণ আছে।

৫৫। **মুসলমানী-প্রভাব।** পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে এমন প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যাহাতে দাদূকে দাউদ হইতে হয়। কেহ কেহ বলেন সাম্ভরবাসী সাধক বুরহানউদ্দীপনের কাছে তিনি সাধনা বিষয়ে কিছু কিছু শিক্ষাও লাভ করেন, কিন্তু তাহার কিছু সঠিক প্রমাণ মেলে না। এই মত অনুসারে দাদূর পিতার নাম ছিল সুলেমান। আর রজ্জব-ভক্তরা যেমন করিয়া রজ্জবের মুসলমানী উর্দ্দূ, ফারসী ও আরবী শব্দ ও লেখা চাপিয়া যাইতে

চাহেন তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। দাদূর লেখাতেও ফারসী আরবীর অনেক পদ আছে। তাঁহার বিরহ অঙ্গের ৪০ পদ এবং ঐ অঙ্গেরই ৬৪-৭০ পদ, ১৫২ পদ দ্রষ্টব্য। এখানে বিরহ অংগ হইতে কয়েকটি পদ উদ্ধৃত করা যাইতেছে। তাহা হইলেই তাঁর মুসলমানী ভাবের লেখা বুঝা যাইবে—

ইস্‌ক মহবতি মস্ত মন তালিব দর দীদার।
দোস্ত দিল হরদম হজূর য়াদিগার হুসিয়ার ॥
(দাদূ, বিরহ কৌ অঙ্গ, ৬৪)।

আসিক এক অলাহকে ফারিক দুনিয়াঁ দীন।
তারিক ইস ঔজূদ থৈঁ দাদূ পাক অকীন ॥
(দাদূ, বিরহ কৌ অঙ্গ, ৬৫)।

আসিকাঁ রহ কবজ করদাঁ দিল ব্র জাঁ রফতংদ।
অলহ আলে নূর দীদম দিলহি দাদূ বংদ ॥
(দাদূ, বিরহ কৌ অঙ্গ, ৬৬)।

দাদূর "পরচা" অঙ্গের এই রকমই দুই একটি পদ উদ্ধৃত করা যাইতেছে,—

পূর্ব্বপদ

মৌজূদ খবর মাবুদ খবর অররাহ খবর ব্রজূদ।
মকাম চিঃ চীজ হস্ত, দাদনী সজূদ ॥
(দাদূ, পরচা কৌ অঙ্গ, ১৩১)।

উত্তরপদ

মৌজূদ মকাম হস্ত,
নফ্‌স গালিব কিব্র কাবিজ, গুস্‌সঃ মনী এস্ত।
দুঈ দরোগ হির্স হুজ্জত, নাম নেকী নেস্ত ॥
(দাদূ, পরচা কৌ অঙ্গ, ১৩২)।

অররাহ মকাম অস্ত,
ইশ্‌ক ইবাদত বংদগী, য়গানগী ইখলাস।
মেহর মুহব্‌বত খৈর খূবী, নাম নেকী খাস ॥
(দাদূ, পরচা কৌ অঙ্গ, ১৩৩)।

মাবূদ মকামেঁ হস্ত ।
ইত্যাদি

(দাদূ, পরচা কৌ অঙ্গ, ১৩৪)।

হক হাসিল নূৰ দীদম, করারে মক্‌সূদ ।
দীদারে য়ার অরৱাহে আদম, মৌজূদে মৌজূদ ॥

(দাদূ, পরচা কৌ অঙ্গ, ১৩৮)।

এই রকম আর আরও অনেক আছে। এ মুসলমান স্থফীর মতই লেখা। ইহাদের পরে হিন্দু শিষ্যরাও এমন ভাবে মাঝে মাঝে লিখিতেন।

৫৬। **মুসা ও মহম্মদ ঃ** ইহুদী ভক্ত মুসার ও মহম্মদের নামও দাদূ করিয়াছেন। মুসা নাকি একবার মৃত্যুভয়ে পলাইতে গিয়া দেখেন কবর ছাড়া স্থান নাই। যেখানেই যান সেখানেই কবর —

"মূসা ভাগা মরণ থৈঁ জহাঁ জাই তহঁ গোর।"

(দাদূ, কাল অঙ্গ, ৬৯)।

দাদূর ভেখ অংগে এই বাণীটি বলা হইয়াছে—

শেয মসাইক ঔলিয়া পৈকংবর সব পীর।"

(ভেখ অংগ, ৩৩)।

তাহাতেই বুঝা যায় সেখ, মুসা-পন্থী-ইহুদী,ঔলিয়া, পৈগম্বর ও পীরগণের সাধনা তাঁর জানা ছিল।

সত্যদ্রষ্টা নবী (ঋষি) গণের মুকুটমণি ভক্ত মহম্মদের নামও দাদূ বহুস্থানে করিয়াছেন। যথা—

"কহাঁ মহম্মদ মীর থা সব নবিয়োঁ সিরতাজ ॥"

(দাদূ, কাল অঙ্গ, ৮৩)।

মহম্মদ ও স্বর্গদূত জিবরইলের (Gabriel) নামও তিনি করিয়াছেন—

"মহম্মদ কিসকে দীন মৈঁ জবরাইল কিস রাহ ?"

(দাদূ, সাচ অঙ্গ, ১১৫)।

ভারতীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে যোগী, জঙ্গম (দক্ষিণ ভারতের লিঙ্গপূজক শৈব

১৮

সম্প্রদায়), জৈন ও শৈব মতাবলম্বী সেরড়া, বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ও মুসলমান সম্প্রদায়ের নামও দাদূ করিয়াছেন।

(দাদূ, ভেখ অঙ্গ, ৩২ ; দাদূ, মধ্য অঙ্গ, ৪৭)।

জয়দেব ঃ তখনকার দিনে সাধকশ্রেষ্ঠ কবীর নানক প্রভৃতি সবাই ভক্ত জয়দেবের নামে ও বাণীতে গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। গ্রন্থসাহেব-উদ্ধৃত কবীর-বাণীতে এক জায়গায় পাই—জয়দেব নামদেবের প্রতি ভগবানের অপার কৃপা হইয়াছে (বাণী ১১৩, কবীর পরিশিষ্ট, নাগরী প্রচারিণী সম্পাদিত)। আবার ঐ গ্রন্থসাহেবেই উদ্ধৃত কবীর-বাণীতে দেখি, "ভগতি ও প্রেমের মর্ম্ম জয়দেব ও নামদেবই জানেন" (ঐ ২০৮ পদ)। গ্রন্থসাহেবে জয়দেবের বাণীও উদ্ধৃত আছে। তাহাতে দেখি গীতগোবিন্দের বাণীর সঙ্গে তার কিছুমাত্র ভাবের সম্পর্ক নাই। অথচ এই জয়দেবও বাংলারই জয়দেব। কাজেই দেখা যায় জয়দেবের একটা পরিচয় আমাদের কাছে চাপা পড়িয়া আছে। সুযোগ ঘটিলে এ বিষয়ে আরও কিছু আলোচনা করার ইচ্ছা আছে।

ধর্ম্মের নামে তখনকার দিনেও নানাবিধ নষ্টামি চলিত। সমাজের সেই সব ভয়ঙ্কর ব্যাধির কথা দাদূর বাণীতেই পাই। যে মধুর প্রেমের সম্বন্ধ ভগবানের সঙ্গে, সেই ভাবের সম্বন্ধ মানুষের সঙ্গে কল্পনা করিয়া লোকে ধর্ম্মকে ডুবাইত।

(দ্রষ্টব্য—দাদূ, নিহকরমী পতিব্রতা অঙ্গ, ৫০, ৫১ বাণী, ইত্যাদি)।

প্রেমযোগ ঃ ঈশ্বরের সঙ্গে ভক্তের সম্বন্ধ প্রেমের, ঐশ্বর্য্যের নয়। প্রেমের দাবীতে স্বামীর সংসারে সব সেবাই করিতে হয়। কর্ম্মে সেবায় সৌন্দর্য্যে প্রেমে এই সম্বন্ধের ভাব ভরপূর। আবার ঈশ্বরের একত্ব বুঝাইবার জন্য তাঁহাকে স্বামী বলার মধ্যে একটি গভীর সার্থকতা ভারতে আছে। কারণ তাঁর সঙ্গে ভক্তের যোগ একনিষ্ঠ প্রেমের। সাধনায় এই শুচিতাটি নারীর পাতিব্রত্যের মতই যত্নে রক্ষা করিতে হয়। তাই ভগবৎ প্রেমের সঙ্গে পাতিব্রত্যের তুলনা দেওয়া হইয়াছে। দাদূর অষ্টম অঙ্গটিও আগাগোড়াই হইল নিষ্কামকর্ম্মী পতিব্রতার অঙ্গ। আল্লা ও রাম যে এক

সেই একত্বটি জোর করিয়া বুঝাইবার জন্যই কবীর বলিয়াছেন "আমি সেই আল্লা রামের পুত্র, তিনি আমার পিতা।"

(তুলনীয় কবীর, ৩য় খণ্ড, ৩ পৃঃ)।

"পীর পিছাণ অঙ্গে" দাদূ তাঁহার ভূগোল খগোল ও ব্রহ্মাণ্ড জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। তিনলোক ব্রহ্মাণ্ড, সপ্তদ্বীপ, নবখণ্ড, সওয়ালক্ষ মেরু গিরি-পর্ব্বত, আঠার ভার তীর্থ, চৌদ্দলোক, চৌরাশিলক্ষ চন্দ্রসূর্য্য, ধরিত্রী গগন, পবন, জল, সপ্ত সমুদ্র।

(পীর পিছাণ অঙ্গ, ৫, ৬)।

দাদূর শিষ্য-পরিচয়। (চ)

দাদূর ৫২ জন প্রখ্যাত শিষ্য ছিলেন, ট্রেইল সাহেব ভুলক্রমে ১৫২ লিখিয়াছেন। বোধ হয় অনবধানতাবশতঃ সংখ্যাপাত হইয়া গিয়াছে (Encyclopœdia of Religion and Ethics, Edited by John Hastings, Volume IV, pp 385, 386, "Dadu") তাঁহাদের মধ্যে জাইসা, সুন্দরদাস (ছোট), রজ্জবজী, মাধোদাস, প্রয়াগদাস, গরীবদাস, বখনাজী, বনওয়ারীদাস, শঙ্করদাসের নাম পূর্ব্বেই করা হইয়াছে। ইহাঁরা প্রত্যেকেই এক একটি "থাংভা" বা স্তম্ভ প্রবর্ত্তক ও প্রখ্যাত লেখক। ইহাঁদের বাণী আজিও ভক্তগণ শ্রদ্ধার সহিত রক্ষা করিতেছেন। উপক্রমণিকায় স্থানান্তরে ইহাঁদের বাণীর বাহুল্যের বিষয়ও বলা হইয়াছে। নারায়ণা ও সাম্ভর হইতে দাদূকে লিখিত পত্রে তাঁহার প্রায় চল্লিশজন শিষ্যের নাম পাওয়া যায়।

শিষ্যদের মধ্যে দাদূর "জীবন পরচী" অর্থাৎ জীবন-পরিচয় লেখার দরুণ জনগোপাল ও জগজ্জীবন দাসের নাম বিশেষভাবে ভক্তগণ ও তত্ত্বজিজ্ঞাসুগণের কাছে প্রখ্যাত। সংতদাস ও জগন্নাথদাস দাদূর বাণী সযত্নে সংগ্রহ করার জন্য সকল ভক্তজনের পূজিত ও খ্যাত হইয়াছেন। তাঁহাদের সংগৃহীত "হরডে বাণী" তাঁহাদের নাম অক্ষুণ্ণ রাখিবে। বেশী কিছু না লিখিলেও ভক্ত মোহনদাসের নাম দাদূভক্তগণ কখনও বিস্মৃত হইবেন না। যোগদৃষ্টিতে ও ভাবের গভীরতায় ইনি খুব উচ্চধরণের সাধক ছিলেন, তাঁর সময় ভক্ত ও সাধকগণ তাঁহার সঙ্গ পাইলে কৃতার্থ হইতেন। ভক্ত ক্ষেত্রদাসের লেখাতে দাদূর সাম্যনীতির সর্ব্বজনীনত্বের ও বিশ্বমৈত্রীর অনেক পরিচয় আমরা পাই। তাহা ছাড়া চৈনজী, ঘাটম দাসজী, সাধুজী, টিলাজী, খেমদাসজী, জয়মালজী-চৌহান, জয়মালজী-যোগী, ঘরসীজী, হরিসিংজী, মাখুজী প্রত্যেকেই এক একটি দিক্‌পাল বিশেষ। দৃষ্টান্তসংগ্রহকার চম্পাবাম তো সর্ব্বজনসমাদৃত।

তাহা ছাড়া শিষ্য অনুশিষ্যদের অনেকের পরিচয় মেলে পরবর্ত্তী সব ভক্তবাণীসংগ্রহগ্রন্থে।

৫৭। **রজ্জবজী ঃ** ভক্ত রজ্জবজী মুসলমান সম্প্রদায়ের অত্যন্ত হীন কলাল বংশে জন্মগ্রহণ করেন। এই কলালরা পূর্ব্বে হিন্দু “কলাল”ই অর্থাৎ সুরা বিক্রেতাই ছিল, পরে মুসলমান হইয়া মুসলমান কলাল হইয়া যায়। এ কথাটা এখনকার দাদূপন্থী ও রজ্জবভক্তগণ অনেকে চাপিয়া যাইতে চান। তাঁহারা মনে করেন যে ইহাতে দাদূর ও রজ্জবের মাহাত্ম্য যেন অনেকটা কমিয়া যায়। কেহ কেহ বলিতে চান যে রজ্জবজী হিন্দুবংশে ভাল কুলে জন্মগ্রহণ করেন, শিশুকালে অনাথ হইয়া মুসলমানের ঘরে পালিত হন এবং পূর্ব্বসংস্কারবশে দাদূকে গুরু পাইয়া আপনার পূর্ব্বজন্মের উপার্জ্জিত সাধনা ফিরিয়া পান। কেহ কেহ বলেন তিনি মুসলমানই ছিলেন আর দাদূ তাঁহাকে শিষ্যরূপে স্বীকারও করেন নাই; কবীরের মতই তিনিও দাদূর উপদেশ দূর হইতে শুনিয়া অনুপ্রাণিত হইয়া দূরে থাকিয়াই একলব্যের মত গুরুর অজ্ঞাতসারে সাধনা করিয়া সিদ্ধ হন। আবার কেহ কেহ সরলভাবে সব কথাই স্বীকার করেন। কাহারও কাহারও মতে তাঁহার জন্ম “কুলাল” অর্থাৎ কুম্ভকার কুলে।

উপক্রমণিকায় যে রজ্জবজীর বিস্তৃত সংগ্রহের কথা বলা হইয়াছে তাহা জয়পুর শেখাবাটী প্রভৃতি স্থানের সর্ব্বসম্প্রদায়পূজিত সুবিখ্যাত বড় বড় ভক্ত মহন্ত ও পণ্ডিতজনের সম্পাদিত। তাঁহাদের অনেকের নামই ঐস্থানে দেওয়া আছে। তাঁহারা এত বড় সংগ্রহ করিয়াও ভূমিকায় রজ্জবজীর জীবনী বা ইতিহাসের কথা একেবারেই চাপিয়া গিয়াছেন, রজ্জবজীর জাতিকুলেরও বিন্দুমাত্র উল্লেখ করেন নাই, অথচ সম্পাদক মহাশয় সেই ভূমিকাতেই তাঁহার সহায়ক বর্ত্তমান কালের প্রত্যেক জন ভক্ত ও পণ্ডিতের পূর্ণ পরিচয় দিয়াছেন অথচ যাঁহার জন্য ভূমিকা তাঁহার পরিচয়ই কিছুমাত্র দেন নাই। বরং রজ্জবজীর লেখাতে প্রচুর পারসী ও উর্দ্দূ শব্দের বাহুল্য দেখিয়া আসল কথাটা চাপা দিবার জন্য নিজেরাই আগে হইতেই জোর গলায় সকলকে শুনাইতেছেন, “শ্রীরজ্জবজীর বাণী পড়িয়া অধিকাংশ নব্য শিক্ষিত যুবকগণ বলিয়া উঠিবেন যে, ‘এই গ্রন্থে দেখিতেছি ফারসী ও উর্দ্দূ শব্দের বড়ই অতিরিক্ত

পরিমাণে মিশ্রণ রহিয়াছে!’ এই বিষয়ে তাঁহাদের কাছে আমাদের এই নিবেদন যে আজকাল যেমন ইংরাজী ভাষার প্রাবল্য, হিন্দী লিখিতে গেলেও তাহাতে ইংরাজী ভাষা না মিলাইলে এখনকার দিনে চলে না, মুসলমান রাজ্যের যখন প্রাবল্য ছিল উর্দ্দূ পারসী শব্দেরও তখন সেই কারণেই প্রচুর ব্যবহার ছিল। এই কারণেই রজ্জবজীর বাণীতে এত উর্দ্দূ পারসী শব্দের বাহুল্য” (রজ্জবজীকীবাণী”—ভূমিকা, ঘ পৃষ্ঠা)। ইহাতেই যেন সব হেতু জানাইয়া দেওয়া হইল! এই গ্রন্থটির নাম-পৃষ্ঠায় লেখা আছে “শ্রীস্বামী মহষি দাদূজীকে সুযোগ্য শিষ্য মহারাজ শ্রীস্বামী রজ্জবজীকী বাণী।” আর ভূমিকায় পরিচয় দিয়াছেন, “যোগীরাজ মহাত্মা শ্রীস্বামী রজ্জবজী মহর্ষি দাদূরাম জীর শিষ্য ছিলেন” (ঐ ভূমিকা, ক পৃষ্ঠা)। এই বাণীর সম্পাদক মহাশয় ভূমিকায় বলেন,“এই সব বাণী ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫৯৩ খৃষ্টাব্দ মধ্যে লেখা। রজ্জবজী সংস্কৃত ও নিশ্চয়ই ভাল জানিতেন, তবে লিপি-দোষে এমন উত্তম লেখায়ও নানা অশুদ্ধি প্রবেশ করিয়াছে; কাজেই অনেকেরই ইচ্ছা ভবিষ্যতে এই সংগ্রহ বাহির করিতে হইলে একেবারে ইহার লেখা শুদ্ধ বানাইয়া প্রকাশ করা।” (ঐ ভূমিকায়—“ঙ” পৃষ্ঠা)।

“শ্রীমান ঠাকুর সাহেব ভূরসিংহজী ভক্তিমান্ ও কাব্যজ্ঞানসম্পন্ন, ইহার সহায়তায় মাত্রাগত ছন্দোগত দোষ প্রভৃতি সব দূর করিয়া ২য় সংস্করণ বাহির করা যাইবে।” ঐ ভূমিকা—“ঙ” পৃষ্ঠা।

আমাদের মতে রজ্জবজীর বাণীগুলি আরও পূর্ব্বে রচিত হয়। ১৬০৩ ঈশাব্দে যখন দাদূজীর মৃত্যু হয়,তখন তাঁর বহু বাণী রচিত হইয়া গিয়াছে। রজ্জবজীর হিন্দু ও মুসলমান এই দুই শ্রেণীর শিষ্যই আছেন। কেহ কেহ বলেন ইহাঁর হিন্দু শিষ্যগণকে বলে “উত্তরাঢী” (Crookes—Tribes and castes of North-Western Provinces and Oudh, Volume II, 237 page)

৫৮। **বনওয়ারীদাস ঃ** Traill সাহেব বলেন এই উত্তরাঢি দলের আদি প্রবর্ত্তক ভক্ত বনওয়ারীদাস; অধিকাংশ ভক্তদেরও এই মত। কিন্তু আসলে এই বিষয়ে বনওয়ারীদাস রজ্জবজীরই অনুবর্ত্তন করিয়াছেন। বনওয়ারীদাসজীর প্রধান স্থান পাতিয়ালা রাজ্যের অন্তর্গত রত্তিয়াগ্রামে। ভক্ত শ্রীবনওয়ারীদাসের সাধনার বলে এইগ্রামটি এখনও

বহু সাধু ভক্তজনের পুজনীয়। রতিয়াতে ভক্ত ধর্ম্মদাস সাধু বনওয়ারীদাসের সম্প্রদায়ের এখনকার সময়ের শ্রেষ্ঠ ও কেন্দ্রস্থানীয় ব্যক্তি। তাহাদের ৫২ থাম্ভা। ডেহরে গ্রামে তাহাদের চতুর্দ্দশ গদী। এখনো সাধক বিহারীদাসজী সেখানে ভক্তমুখ্য।

ভারতবর্ষের উত্তরভাগেই এই মতের অনেকটা প্রচার হইয়াছিল। ক্রমে হরিদ্বারে এই শাখার একটি মঠ গড়িয়া উঠে। ভক্ত গোপালদাসজী এই মঠটি ভাল করিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন। কিছুদিন পূর্ব্বেও সচ্চিদানন্দজী নামে একজন সমর্থ সাধক সেখানে ছিলেন। এখন সেখানে ভাল সাধক বা ভক্ত কেহ নাই। বনওয়ারীদাসের উত্তরাটী শাখা একটু বেশী হিন্দু ভাবাপন্ন। ইহাঁরা অনেকবার নিজের সম্প্রদায়ে সাম্প্রদায়িক ভাবে হিন্দুর সাম্প্রদায়িক পূজা-অর্চ্চনাদি চালাইতে চাহিয়াছেন, কিন্তু নাগাদের আপত্তি ও বিরুদ্ধতায় তাহা চলিয়া উঠে নাই।

জয়পুরের চারিক্রোশ দক্ষিণে নদীতীরে সাঙ্গানের নামে একটি ছোট নগরী আছে। রজ্জবজী অনেক সময় সেখানে থাকিতেন। সেখানে তিনি গুরুভাই পরমভক্ত মোহনজীর সঙ্গ লাভ করিয়া চরিতার্থ হইতেন।

৫৭। **সুন্দরদাস :** সুন্দরদাস নামে দাদূর দুইজন শিষ্য ছিলেন। বড় সুন্দরদাস বীকানীরের রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন। কাহারও কাহারও মতে ইনি নাগা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। পরবর্ত্তীকালে বীকানীরের রাজভ্রাতা ভীমসিংহ এই নাগা সাধক সম্প্রদায়কে একদল প্রবল যোদ্ধা বানাইয়া তোলেন।

দাদূপন্থী নাগাদের পূর্ব্বে আরও বহু সম্প্রদায়ে নানাভাবের নাগাদল গঠিত হইয়াছে। বৈদিককালেও বেদমতবাদীদের বাহিরে নগ্ন সাধকদের অস্তিত্ব ছিল। জৈনদের দিগম্বরী প্রভৃতি সাধুদের কথাও স্মরণীয়। শৈবনাগা নিহংগ প্রভৃতি দলও আছে। রামানন্দের চারিজন শিষ্য চারিটি সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করেন। তার মধ্যে যাহারা বিরক্ত ও সংসারসম্বন্ধহীন তাহারা "নাগা" ও সংসারীরা "সংযোগী"। যত রকম নাগাই থাকুক দাদূপন্থী নাগাদেরই খুব নাম ও প্রভাব।

ধর্ম্ম সাধনাতে অন্তরের বীরত্ব থাকা চাই একথা দাদূ খুব জোর করিয়াই বলিয়া গিয়াছেন (দ্রষ্টব্য দাদূ—সূরাতন অঙ্গ)। সেই মহৎ সত্যের সাধনাকে

সাংসারিক প্রয়োজনে প্রয়োগ করিতে গিয়াই পরে বিশেষ শোচনীয় অবস্থা হইল। ফললোভীদের হাতে পড়িয়া সত্যের বিশুদ্ধ স্বরূপ যখন মহদ্ ভাব ও আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হয় তখন এমন দুর্গতিই হয়। যাঁহারা ভাব ও আদর্শকে অনাবশ্যক মনে করিয়া কেবল কর্ম্ম ও উপযোগিতাকে প্রধান জিনিষ মনে করেন তাঁহারা যে ইতিহাসের কাছে এই শিক্ষা বার বার পাইয়াও কেমন করিয়া তাহা ভোলেন তাহা বুঝা মুস্কিল। পরে দুর্গতি এতদূর হইল যে পয়সা পাইলে এই নাগারা অত্যাচারী রাজাদের পক্ষ হইয়া অনিচ্ছুক দুর্ব্বল প্রজাদের ঠেঙ্গাইয়া খাজনা আদায় করিত। ক্রমে ইহারা রীতিমত ভাড়াটিয়া যুদ্ধজীবীদলে পরিণত হইয়া পড়ে (Crooke's Tribes and castes of North Western Provinces and Oudh, Vol II, ২৩৮ পৃঃ)। হণ্টারের গেজেটিয়ারের মতে (1866 Edition, Vol X) সিপাহী বিদ্রোহের সময় এই নাগারা বেতন লইয়া ইংরাজদের পক্ষ হইয়া লড়িয়াছিল। এখনও দাদূপন্থীদের প্রধান তীর্থ নারায়ণা গ্রামে নাগা সন্ন্যাসীদের প্রধান আড্ডা। ইহাদের কোনও দেবালয় বা দেবমূর্ত্তি নাই, ইহারা একেশ্বর বাদী; সেখানে ইহাদের সংখ্যা প্রায় চারি বা পাঁচ হাজার (Hunter's Gazetteer 1866, Vol X)।

৬০। **সুন্দরদাস (ছোট)** ঃ পণ্ডিত সমাজে ছোট সুন্দরদাসেরই খুব নাম। রাঘবদাস কৃত ভক্তমালে সুন্দরদাসকে শঙ্করাচার্য্যেরই অবতার বলা হইয়াছে। কারণ তিনি "পরপক্ষ বিমর্দ্দন করিয়া, সর্ব্বভাবে দ্বৈতমত চূর্ণ করিয়া, অদ্বৈতের মহিমাই গান করিয়াছেন। ভক্তি জ্ঞান যোগ সাংখ্য সকল শাস্ত্রের তিনি পারে গিয়াছেন।" পণ্ডিত ও বিদ্বান জনেরা মনে করেন দাদূর ভক্তদের মধ্যে তিনিই যোগ্যতম লোক। ইহাঁর অন্য নাম সুন্দরদাস "ফতহপুরীয়া"। ফতহপুর জয়পুর শেখাবাটীরই মুসলমানী নাম।

উত্তম বৈশ্য জাতীয় বূসর গোত্রে খণ্ডেলওয়াল মহাজন কুলে দ্যৌসা গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতা যে ইহাঁকে সাতবৎসর বয়সে দ্যৌসাগ্রামে দাদূর চরণে সমর্পণ করেন একথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে (প্রকরণ ৪২ দ্রষ্টব্য)। ইনি যে বৎসর সন্ন্যাসের দীক্ষা লইলেন তাহার পর বৎসরই দাদূ নারায়ণাগ্রামে দেহ রক্ষা করিলেন। ইহাঁর শাস্ত্রজ্ঞানের পিপাসার অন্ত ছিল

না, তাই ডীডৱানা ও ফতহপুরে ভক্ত জগজীবনজীর উৎসাহ পাইয়া ইনি কাশীতে শাস্ত্র পড়িতে যান। সেখানে তিনি সাহিত্য পুরাণ ছন্দ ও অলঙ্কার শাস্ত্রে বিশেষ পাণ্ডিত্য লাভ করেন। সাংখ্যবেদান্তাদি দর্শনে তাঁর গভীর ব্যুৎপত্তি জন্মে। পরে সুন্দরদাস তাঁর বেদান্ত অলঙ্কার ও ছন্দশাস্ত্রের জ্ঞানের জন্য প্রখ্যাত হন। সুন্দরদাসের রচিত বহু বেদান্তভাবের গ্রন্থ বিদ্বৎসমাজে সমাদৃত ও তাঁর কাব্য-গ্রন্থে অলঙ্কারশাস্ত্রের নানাবিধ দুঃসাধ্য নমুনার প্রাচুর্য্য বিদ্যমান। জয়পুরের পুরোহিত হরিনারায়ণ যে সুন্দরসার গ্রন্থ লিখিয়াছেন (মনোরঞ্জন পুস্তকমালা—নাগরী-প্রচারিণী সভা, কাশী), তাহাতে বিশেষ যত্ন করিয়া তিনি সুন্দরদাসের সেই সব অলঙ্কারশাস্ত্রের পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বিশেষ পৃষ্ঠা মুদ্রিত করিয়া তিনি সুন্দরের ছত্রবন্ধ ও নাগবন্ধের কবিতার পরিচয় দিয়াছেন। সুন্দরের গ্রন্থে এইরূপ বহুবিধ বর্ণগত বিন্যাসগত ও শব্দগত চিত্রবন্ধ অলঙ্কারের ছড়াছড়ি। তাঁর লেখায় আদ্যাক্ষরী, মধ্যাক্ষরী, অন্তাক্ষরী, চৌবোলা, গূঢ়ার্থ প্রভৃতি নানাবিধ অলঙ্কারের নমুনা আছে। এইজন্য পণ্ডিতজনেরা তাঁহার কলা-নৈপুণ্যে একবারে মুগ্ধ। অশিক্ষিত সরল সাধকেরা এসব কৃত্রিম বস্তু বোঝেন না। তাঁহারা চাহেন সরল ভাষায় গভীর সত্যের সহজপ্রকাশ। সর্ব্বজনের মধ্যে এই সরল লেখারই আদর। তাঁহারা সুন্দরদাসের "সহজানন্দ" প্রভৃতি গ্রন্থের সমাদর করেন। তাহাতে কোনো কৃত্রিমতা বা কৃচ্ছ্রসাধন ছাড়া সহজেই ব্রহ্মযোগের উপায় বর্ণিত আছে। অশিক্ষিত ভক্তসাধকদের রুচি একরকম ও শিক্ষিত পণ্ডিতগণের রুচি অন্যরকম; উভয়দলের শক্তি রুচি ও নির্ব্বাচনের প্রণালী একেবারে ভিন্নরূপ।

১৫৯৬ খ্রীষ্টাব্দে জয়পুর হইতে অনতিদূরে দ্যোসা নগরীতে দাদূর প্রিয় শিষ্য সাধু "জগ্গার" আশীর্ব্বাদে সুন্দরদাসের জন্ম হয়। সাধু "জগ্গার" আশীর্ব্বাদেই শিশুকালেই সুন্দরদাসের সংসারে বিরাগ হয় এবং শিশু বয়সেই দীক্ষা গ্রহণ করেন। দাদূর মৃত্যুর পর সুন্দরদাস নারায়ণাতেই কিছুকাল ছিলেন পরে কাশীতে বিদ্যা শিক্ষার জন্য যান ও সেখানে দেশ দেশান্তরের নানা ভাবের কবিগণের সঙ্গ লাভ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ করেন।

১৬২৫ খ্রীষ্টাব্দে ইনি জয়পুর শেখাবাটীতে ফিরিয়া আসেন ও তখন হইতেই

রীতিমত কাব্য রচনা করিতে থাকেন। শেখাবাটীর তখন অপর নাম ছিল ফতহপুর। ফতহপুরের নবাব আলফ খাঁ ছিলেন কবি ও হিন্দী ভাষার অনুরাগী। আলফ্ খাঁর সঙ্গে সুন্দরদাসের পরিচয় ও সখ্য হয়। শেখাবাটীতে এই দুই কবি বন্ধুতে প্রায়ই কাব্য আলোচনা হইত ও কাব্য প্রসঙ্গে উভয়ের দিন কাটিয়া যাইত। এই দলের মধ্যে ভক্ত প্রয়াগদাস, ভক্ত রজ্জবজী ও ভক্ত মোহনদাস ও মাঝে মাঝে আসিয়া জুটিতেন। এই সব ভক্তের দল জুটিলে কাব্যপ্রসঙ্গ যথাসম্ভব গভীর হইয়া উঠিত। ইহাঁদের সকলের সঙ্গেই সুন্দরদাসের গভীর প্রেম ছিল। ১৬২৫ খৃীষ্টাব্দে সুন্দরের পঞ্চেন্দ্রিয়চরিত্র গ্রন্থ রচিত হয়। ১৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দে সুন্দরদাসের মহাগ্রন্থ জ্ঞানসমুদ্র সমাপ্ত হয়। ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দের পর সুন্দরদাসের আর কোনো বৃহৎ গ্রন্থ রচিত হয় নাই, তবে ছোট ছোট কাব্যরচনা তখনও মাঝে মাঝে চলিতেছিল।

সুন্দরদাস একস্থানে দীর্ঘকাল থাকিতে ভালবাসিতেন না, নানা দেশ পর্য্যটন করিতে নানা রকম লোকের সঙ্গে মিশিতে ভালবাসিতেন। তাই তিনি প্রায়ই শেখাবাটী ফতহপুর হইতে নানা দিকে বাহির হইতেন। দক্ষিণ ভারত, গুজরাত, কাঠিয়াওয়াড়, পাঞ্জাব, কাশী প্রভৃতি স্থানের সহিত তিনি সুপরিচিত ছিলেন। পাঞ্জাবের ভক্তরা বলেন পাঞ্জাবে গেলে সুন্দরদাস প্রায়ই লাহোরের ভক্ত ছজ্জুদাসের মঠে বাস করিতেন। পর্য্যটনের সময় সুন্দরদাস নানা সম্প্রদায়ের লোকের সহিত আলাপ করিলেও বিশেষভাবে প্রত্যেক স্থানে নিজ গুরু-ভাইদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলাপ করিতেন। রাজপুতানায় কুরসানা, সাঙ্গানের, নরাণা, মোরাঁ, গলতা, আমের প্রভৃতি সর্ব্বস্থানে ভক্তজন তাঁর প্রতীক্ষা করিতেন। সর্ব্বত্র তাঁর যাতায়াত ছিল।

১৬৩১ খৃষ্টাব্দে শেখাবাটীতে ভক্ত প্রয়াগদাসের মৃত্যু হয়। ইহার পর আর শেখাবাটীতে তাঁহার মন টিকিত না। তখন তিনি কখনও মোরাঁ গ্রামে কখনও আমেরে কখনও কুরসানা গ্রামে কখনও রজ্জবজীর কাছে সাঙ্গানেরে এইরূপ নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। কুরসানা গ্রামটী তাঁর বড়ই প্রিয় ছিল, এমন সুন্দর স্থান নাকি তাঁর নজরে কখনও পড়ে নাই। সুন্দরদাস তাঁহার রচিত সবৈয়া গ্রন্থে তাঁর পরিভ্রমণকালের দশদিকের বর্ণনা দিয়াছেন, তখনকার কালের একটী সুন্দর চিত্র তাহাতে পাওয়া যায়। তিনি

দক্ষিণদেশ, গুজরাত মারবাড়, পঞ্জাব, পূর্ব্বদেশ প্রভৃতি স্থানের সমালোচনা করিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিলেন কুরসানাই সব চেয়ে ভাল।

“পূরব পচ্ছিম উত্তর দচ্ছিন দেশ বিদেশ ফিরে সব জানেঁ।
সোচ বিচারি কৈ সুন্দরদাস জু য়াহিঁ তৈঁ আন রহে কুরসানে॥
(দশোঁ দিশাকে সবৈয়ে)

ফতহপুর তাঁহার পছন্দ হয় নাই সেখানকার নারীরা এলোমেলো ও নির্লজ্জ বলিয়া। সুন্দরদাসের “বরবা” ছন্দে যে পূরবী ভাষায় নমুনা দিয়াছেন তাহাতে আমাদের দেশের বাউলদের হেঁয়ালী আছে। “হরিবোল চিতাবনী” গ্রন্থের প্রত্যেক পদের শেষে তিনি “হরিবোলো হরিবোল” লিখিয়াছেন তাহাতেও আমাদের দেশের কথা স্মরণ হয়।

এই কুরসানা গ্রামে বসিয়াই সুন্দরদাস তাঁহার “সবৈয়া” গ্রন্থ রচনা করেন। এই “সবৈয়া” গ্রন্থই পরে “সুন্দরবিলাস” নামে খ্যাত হয়। “জ্ঞানসাগর” গ্রন্থ বৃহৎ হইলেও সুন্দরের রচনার মধ্যে সবৈয়ারই খুব প্রতিষ্ঠা। সুন্দরদাস “জ্ঞানসাগর” প্রভৃতি প্রায় চল্লিশখানি গ্রন্থ রচনা করেন। পূরবিয়া সাধুদের কাছে সুন্দরদাসের সবৈয়া গ্রন্থখানির বাংলা রূপ দেখিয়াছি, বাঙ্গালী সাধু বাংলা অক্ষরে লিখিয়াছেন।

ভক্ত বন্ধুগণের সঙ্গ লাভ করিবার জন্য সুন্দরদাস ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে সাঙ্গানের নগরীতে যান। এখানে কয়েকদিন থাকিয়াই তিনি রুগ্ন হইয়া পড়েন। ভক্ত বন্ধুরা নিরন্তর সেবা করিতে লাগিলেন কিন্তু তখন ৯৩ বৎসরের বৃদ্ধ সুন্দরদাসের ভগ্ন শরীর আর সুস্থ হইল না। কিন্তু সুন্দরদাসের মনে কিছুই নিরানন্দ নাই, তিনি বলিলেন—

“সাত বরষ সৌ মেঁ ঘটৈ ইতনে দিনকী দেহ।
সুন্দর আতম অমর হৈ দেহ খেহ কি খেহ।”

“সাত কম একশত বৎসর, এতদিনের এই দেহ! হে সুন্দর, আত্মাই তো অমর, দেহ তো ধুলার ধুলা।”

“বৈদ্য হমারৈ রামজী ঔষধি হূ হরিনাম।
সুন্দর য়হৈ উপায় অব সুমিরণ আঠৌঁ জাম॥

সুন্দর সংশয় কো নহীঁ বড়ৌঁ মহুচ্ছব য়েহ।
আতম পরমাতম মিল্যো রহো কি বিনসৌ দেহ।

"এখন রামই আমার বৈদ্য, আর হরিনামই ঔষধ; হে সুন্দর এখন অষ্ট প্রহর ভগবানকে স্মরণই হইল উপায় (প্রতিকার, দুঃখতাপহরণের ব্যবস্থা)। হে সুন্দর, এখন আর কোনও সংশয় নাই, এই এক মহোৎসব, আত্মায় পরমাত্মায় হইল মিলন, এখন দেহ রহুক কি যাউক।"

১৬৮৯ খৃষ্টাব্দের কার্ত্তিক মাসের শুক্লাষ্টমীতে বৃহস্পতিবারে তৃতীয় প্রহরে আত্মা-পরমাত্মায় মিলনের এই মহোৎসব নিজ জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়া আপন মুখে ভগবানের কৃপার সাক্ষ্যবাণী উচ্চারণ করিতে করিতে সুন্দরদাস ইহলোক হইতে প্রস্থান করিলেন।

সুন্দরদাসের মৃত্যুর আট বৎসর পূর্ব্বেই তাঁহার প্রিয়শিষ্য নারায়ণ দাস পরলোক গমন করেন। সুন্দরের মৃত্যুর পর নারায়ণ দাসের শিষ্য রামদাস ফতহপুর মঠের মহন্ত হন। নারায়ণ দাস ছাড়াও সুন্দরের আর কয়েকজন প্রখ্যাত শিষ্য ছিলেন—যথা শ্যামদাস, দামোদরদাস, দয়াল দাস, নির্ম্মল দাস মহাযোগী বালকরামজী বেদান্তী ইত্যাদি।

সুন্দরদাস তাঁহার গুরু সম্প্রদায় গ্রন্থে পরমেশ্বরকেই আদিগুরু কহিয়াছেন। তারপর একটির পর একটি গুরুর যে নাম করিয়াছেন সেগুলি এক একটি ভাব মাত্র। এইরূপ ৩৮টি গুরুর পর সুন্দরদাসে আসিয়া ধারা পৌঁছিয়াছে। বিধাতাই যে গুরু পাঠাইয়া জ্ঞান দেন আর সেই ভাবেই যে তিনি দ্যোসাতে দাদূকে পাঠাইয়াছিলেন তাহাও তিনি লিখিয়াছেন। তিনি দাদূর গুরুর আসল নামটি না বলিয়া বলিয়াছেন "বৃদ্ধানন্দ"।

সাঙ্গানের ধাভাঙ্গজীর বাগানের উত্তরভাগে সুন্দরদাসের সমাধি বিদ্যমান। সেখানে একটী শ্বেত পাথরে তাঁর মৃত্যু তিথি লেখা আছে আর চরণচিহ্ন খোদিত আছে।

সংবত সত্রাসৈ ছীয়ালা।
কাতিক সুদী অষ্টমী উজালা॥

তীজে পহর ভরসপতি বার।
সুন্দর মিলিয়া সুন্দরসার॥

এখানে এখনও ভক্তেরা মহোৎসবে সম্মিলিত হন। ফতহপুরে "কেজড়ীবাল" বংশীয় বৈশ্যেরা সুন্দরদাসের জন্য একটী বাসস্থান তৈয়ার করিয়া দিয়াছিলেন। সেখানে মাটির নীচে একটি ঘর (ইহাকে গুহাও বলে), কূপ ও পাকা বাসস্থান এখনও বিদ্যমান।

৬১। **প্রয়াগদাসজী।** প্রয়াগদাসজী বীহাণী যোধপুরে অন্তর্গত ডীড্‌বাণা এবং ফতহপুরে থাকিতেন। সুন্দরদাস (ছোট) তাঁর কাছে থাকিয়া ধর্ম্মালোচনা ও সাধনা করিতে ভলোবাসিতেন। কবি ও হিন্দীভাষারসিক আলফখাঁ প্রয়াগদাসের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। পূর্ব্বেই ইহা উল্লিখিত হইয়াছে যে ইহারা একত্র হইতেন এবং অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ইহাঁদের সাহিত্যালোচনা চলিত। হিন্দু ও মুসলমান সাধনার যোগে যে একটি মহা ভবিষ্যৎ গড়িয়া উঠিবে—তাহার স্বপ্ন ইহাঁরা প্রত্যক্ষ হইতেও সত্য মনে করিতেন। প্রত্যক্ষ সব ভেদ ও সঙ্কীর্ণতা প্রতিদিন দেখিলেও সেই সবই তাঁহারা মায়া বলিয়া উড়াইয়া দিতেন আর সুদূরস্থিত সাধনা-লভ্য ঐক্যকেই পরমসত্য বলিয়া উপলব্ধি করিতেন। এই সব ঐক্যবাদী স্বপ্নদ্রষ্টার দল ধীরে ধীরে দারা শিকোহের সময় পর্য্যন্ত পৌঁছিল।

এই দারাকে নাকি একবার ঔংরঙ্গজেব মারিতে চেষ্টা করিয়া গোপনে খাদ্যে বিষ মিশাইয়া দেন। পরে অনেক কষ্টে দারা আরোগ্য লাভ করেন। বিপদের দিনেও দারা শিখগুরু হররায়ের সঙ্গে ভগবৎপ্রসঙ্গে যোগ দিয়া প্রার্থনা করেন—"পার্থিব সাম্রাজ্য আমার যায় যাউক; ঈশ্বরের প্রেম রাজ্যে যেন স্থান পাই"। গুরু হররায় আশীর্ব্বাদ করেন "ভক্তহৃদয়রাজ্যে তোমার সিংহাসন অটুট রহিবে!" পরে দারার আপন অনুচর জীবনখাঁ পাঠান তাঁহাকে ধরাইয়া দেয়। মুসলমানধর্ম্মের বিরুদ্ধতা করার অপরাধে আওরংজেবের অনুরোধে ৩৭০ জন মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্রবিশারদ তাঁর প্রাণদণ্ড প্রার্থনা করেন। সূরজপ্রকাশ গ্রন্থকার মতে সাধক সরমদ এই কাগজে স্বাক্ষর না করায় আওরংঙ্গজেবের কোপে পতিত হন। সরমদের পরে প্রাণদণ্ড হয় তবু তিনি বিচলিত হন নাই।

হিন্দু ও মুসলমানদলের অনৈক্যবাদী শক্তিপন্থী সাধকেরা ইহার পরে ভারতবর্ষকে আপন আপন সঙ্কীর্ণ নীতি অনুসারে গড়িতে গেলেন তাই সবই নষ্ট হইয়া গেল।

১৬৩১ খ্রীষ্টাব্দে প্রয়াগদাসের মৃত্যুর পর ডীডৱাণা শূন্য হইয়া গেল। সুন্দর দাসও আর বড় সেখানে থাকিতেন না। তবে এখনও ডীডৱাণা এই সম্প্রদায়ের ভক্তদের একটি বড় তীর্থ। এখনও অনেক পুঁথী এখানে আছে। এখন সাধু শ্রীগোপালজী এখানে মহন্ত।

৬২। গরীবদাসজী ও মস্কীনদাসজী।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ভক্ত গরীবদাসজী দাদূর জ্যেষ্ঠপুত্র। গরীবদাসের ছোট ভাই ছিলেন মস্কিনদাসজী। উভয়েই গভীর সাধনার বিষয় প্রকাশ করিয়া কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। আবার কেহ কেহ বলেন গরীবদাস দাদূর পালিত পিতৃমাতৃহীন শিষ্য। অনাথ দেখিয়া দয়াবশতঃ দাদূ ইহাঁকে পালন করেন আর তাই দাদূকে ইনি পিতা বলিয়া জানেন। ইহাঁর "অনভয়-পরমোদ" অর্থাৎ অনুভব-প্রমোদ গ্রন্থ ভক্তজনের মধ্যে খুব সমাদৃত।

দাদূর মৃত্যুর পর নারায়ণাতে তাঁহার শ্রাদ্ধ মহোৎসবে গরীবদাসই প্রধান শ্রাদ্ধাধিকারী ছিলেন। ইনি পরে নারায়ণাতেই বাস করেন। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে সুন্দরদাসকে ইনি সেই সময় অবহেলা করিয়াছিলেন মনে করিয়া সুন্দরদাস তার তীব্র প্রতিবাদ করেন।. এখন এই মঠে সাধু শ্রীদয়ারামজী মহন্ত পদে আসীন। দাদূর মৃত্যুর পর নিজের সম্মতি না থাকিলেও সকলের সম্মতিতে গরীবদাসই দাদূর অনুরাগীদের নেতা হন। গরীবদাস ছিলেন সাধক; দল চালাইবার মত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও সর্ব্বতোমুখী সতর্কতা তাঁর ছিল না। তাই যখন নানা ত্রুটি এই পন্থে প্রবেশ করিতে লাগিল তখন কেহই আর একথা খুলিয়া বলিতে সাহস করেন নাই। অবশেষে সকলের অনুরোধে রজ্জবজী গরীবদাসের কাছে যান এবং অতি ভদ্রভাবে ইঙ্গিত করিয়া লেখেন—

"দাদূকৈ পাট দীপৈ দিনহী দিন।"

(রজ্জব লিখিত গরীবদাসকী ভেটকা সবৈয়া)।

"দাদূর পাট দিনে দিনেই দীপ্ত হইতেছে" অর্থাৎ রাত্রে তাঁর নিয়ম কেহ মানেন না। যদিও রজ্জব ইহাও বলিলেন—গরীবদাস

"উদার অপার সবৈ সুখদাতা।"

(রজ্জব লিখিত গরীবদাসকী ভেটকা সবৈয়া)।

"উদার অপার ও সকল সুখদাতা"। "গরীবের গর্ব্ব নাই, দীনরূপে সকল সেবকের মাঝে থাকিয়া সেবা করিতেছেন কেহ তাঁহার কাছে আসিয়া বিমুখ হন না; তিনি আনন্দরূপ।"

"গরীবকে গর্ব্ব নাহি দীনরূপ দাস মাহিঁ।
আয়ে ন বিমুখ জাহি আনন্দকা রূপ হৈ॥"

(রজ্জব কৃত গরীবদাসজী ভেটকা সবৈয়া)।

গরীবদাস ইঙ্গিতটুকু বুঝিতে পারিয়া নিজে তাঁর পদ পরিত্যাগ করিলেন ও তাঁর ছোট ভাই মস্কীনদাস দলের ভার লইলেন। গরীবও মস্কীনদাসের স্থান এখন নারায়ণাতেই বিরাজিত।

দাদূভক্তদের মধ্যে "বিরক্তরা" মাথা মুড়ান ও এক বস্ত্র ও এক কমণ্ডলু মাত্র রাখেন। "নাগা"দের কথা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। ইহাঁদের অনেকেই অস্ত্রধারী যোদ্ধা। "বিস্তর-ধারী"রা সাধারণ গৃহস্থ। ইহাঁরা তিলক ধারণ না করিলেও মালা ব্যবহার করেন। ইহাঁদের মাথায় সাদা গোল বা চৌকোণ "টোপা" থাকে, সাধক তাহা নিজেই সেলাই করেন। ইহাঁদের অনেকে জীবের প্রতি দয়াবশত মৃতদেহ দাহ না করিয়া নির্জ্জনে নিক্ষেপ করেন, পশু পক্ষী তাহা খায়।

দাদূর মৃত্যুর প্রায় একশত বৎসর পরে শিখগুরু গোবিন্দ সিংহ নরাণাতীর্থে যান। ১৭০৬ ঈশাব্দের শেষভাগে তিনি রাজপুতানা ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখনই তাঁহার নারাণা দর্শনের সুযোগ ঘটে। সেই সময়ে ভক্ত জৈতজী ছিলেন সেখানে মহন্ত। গুরু গোবিন্দ তাঁর কাছে দাদূর উপদেশ শুনিতে চাহিলেন। জৈতজী দাদূর উপদেশ শুনাইলেন, "ভবের বাজারে আসিয়া কত লোক ব্যর্থ ফিরিয়া গেল, হে দাদূ, জগতের প্রত্যেক বস্তুর উপর লোভ ও দাবী ত্যাগ কর, নিষ্কাম হইয়া জীবন কাটাও, দাবী কিছু করিও না।" গুরু

গোবিন্দ বলিলেন, "ধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের জন্য এই কথা ভাল কিন্তু এমন শান্তভাবে সাধনা যারা করে তাহারা কি কখনো ধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারে ? বরং বল, 'জগতের উপর দৃঢ় রাখ দাবী, দুষ্টের অধিকার লও ছিনাইয়া, দুর্বৃত্ত বৈরীকে কর নিঃশেষ।'"

মহন্ত জৈতজী দাদূর একটি উপদেশ পড়িলেন "কেহ যদি তোমাকে ঢেলা নিক্ষেপ করে তবে মাথায় করিয়া সেই ঢেলা বহন কর।" গুরু গোবিন্দ বলিলেন, "সে কি কথা ? কেহ যদি তোমাকে ঢেলা মারে, তবে তাহাকে পাথর ছুড়িয়া মার।" গোবিন্দ তখন জৈতজীকে বুঝাইতে লাগিলেন, "সময় বড় মন্দ পড়িয়াছে, দুষ্টেরা বড় প্রশ্রয় পাইয়াছে, সাধু সন্তজনের উপর অনবরত চলিয়াছে জুলুম। কাজেই অত্যাচারীদের পিশিয়া ফেলিতে হইবে। ক্ষমার দ্বারা ইহাদের হৃদয় জয় করিতে পারিবে এমন কথা মনেও স্থান দিও না। যাহারা এই পবিত্র উদ্দেশ্যে অস্ত্রধারণ করিবে ও জীবন উৎসর্গ করিবে সাধকের সদ্‌গতি ও স্বর্গের তাহারাই অধিকারী। এইজন্যই আমি আমার "খালসা" প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি, আমার শিখদের হাতে অস্ত্র দিয়াছি তাহাদিগকে বীরের দীক্ষায় সিংহ করিয়া তুলিয়াছি।"

দাদূর সমাধিস্থলকে গুরু গোবিন্দ শ্রদ্ধাভরে প্রণতি করিয়াছিলেন। তাঁর শিষ্য হইয়াও মানসিংহ তাঁহাকে খালসার নিয়ম শুনাইয়া দিলেন, "ভুলক্রমেও মুসলমানদের গোরস্থান বা হিন্দুর সমাধিস্থানকে পূজা করিবে না।" গুরু নিজের ত্রুটি স্বীকার করিয়া স্বেচ্ছাক্রমে সওয়া শত টাকা দণ্ড দিলেন।

৬৩। **মাধোদাসজী ও শঙ্করদাসজী ঃ**

ভক্ত মাধোদাসের স্থান যোধপুরের অন্তর্গত গুলর গ্রামে। রেলের গাছিপুরা ষ্টেশন হইতে এখানে যাইতে হয়। এখানে সাধু রামলালজী মহান্তপদে বিরাজিত। এখানেও অনেক সাখী ও সবদের সংগ্রহ আছে।

ভক্ত শঙ্করদাসের মঠ যোধপুরের অন্তর্গত বূশেরা গ্রামে। বালোত্রা ষ্টেশন হইয়া এখানে যাইতে হয়। এখানেও অনেক হাতে লেখা পুঁথি আছে।

৬৪। **জনগোপালজী ঃ** ভক্ত জনগোপালের মঠ জয়পুর শেখাবাটীর অন্তর্গত আন্ধী (Andhi) গ্রামে। এখানে মহন্ত ধনসুখদাসজী এখন বর্ত্তমান আছেন।

৬৫। **জগজ্জীবন ঃ** ভক্ত জগজ্জীবন দ্যোসা নগরীর উপকণ্ঠে টহলড়ী পাহাড়ে বাস করিতেন। নিজে তেমন শিক্ষিত না হইলেও ইনি বিদ্যার বড় অনুরাগী ছিলেন। ইহার উৎসাহ ও সহায়তায় সুন্দরদাস যে কাশীতে বিদ্যাশিক্ষার জন্য যান ইহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে।*

৬৬। **মোহনজী জগ্গাদাসজী ও অন্যান্য ভক্তগণ ঃ** ভক্ত মোহনজী ছিলেন রজ্জবজীর অন্তরঙ্গ বন্ধু। ইহাঁরা প্রায়ই একসঙ্গে সাঙ্গানের নগরীতে বাস করিতেন। সুন্দরদাস তাঁহার জীবনের শেষ বৎসরটি ইহাঁদের কাছেই যাপন করেন এবং সেইখানেই ইহলোক হইতে বিদায় নেন।

ভক্ত জগ্গাদাস প্রায় গুরুর সঙ্গে ছায়ার মত ঘুরিতেন। দাদূ বৃদ্ধ হইলে ইনিই গুরুর হইয়া দূর গ্রামে বা নগরে সর্ব্ববিধ কাজে যাইতেন। দাদূ যখন আমেরে যান তখন সোঁকিয়া গোত্রের খণ্ডেলওয়াল বৈশ্য বংশের কন্যা সতী দেবীকে "সৎপুত্রবতী হও" বলিয়া ইনিই আশীর্ব্বাদ করেন।† সতীদেবীর পুত্রই হইলেন সুন্দরদাস। রাঘবদাসের ভক্তমালে এই বিষয়ে ভালরূপ বিবরণ দেওয়া আছে।

জৈমল, জাইসা ভক্ত, বখনাজী প্রভৃতিরা আপনাদের লেখা দ্বারাই নিজেদের অমর করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। ইহাঁদের স্থানগুলি এখনও ভক্তদের নিকট তীর্থ বলিয়া পূজিত। সাত বৎসরের সুন্দরদাসকে যখন তাঁহার পিতামাতা দাদূর চরণে উৎসর্গ করেন তখন দাদূর সঙ্গে ছিলেন ভক্ত জাইসা ও ভক্ত খেমদাস। "জন্ম পরীচী" গ্রন্থে জনগোপাল ইহাঁদের বিষয় লিখিয়াছেন।

ভক্ত ক্ষেত্রদাস গভীর সাধক ছিলেন। দাদূর সাম্যভাবের একটি সুন্দর চিত্র আমরা ক্ষেত্রদাসের লেখাতে পাই।

দাদূর দুই কন্যার বাণীও অতি চমৎকার। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা বড়ই

---

* প্রকরণ (৬০) দ্রষ্টব্য।

† প্রকরণ (৬০) দ্রষ্টব্য।

দুষ্প্রাপ্য। তাঁহার আরও সম্ভ্রান্ত নারী শিষ্যা ছিলেন। তাঁহাদের বাণীও এখন দুর্লভ।

আবার দুই একজন শিষ্য ইহাঁকে পরিত্যাগ করিয়া নিজেরা সম্মানের আকাঙ্ক্ষায় নূতন পন্থা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। যেমন ভিডওয়াণার সাধু হরিদাস নিরঞ্জনী দাদূকে ত্যাগ করিয়া কবীরপন্থে যান। পরে আবার নিজেরই এক নূতন পন্থ প্রবর্ত্তন করেন।

দাদূ সম্পর্কীয় গ্রন্থমালা বিশেষজ্ঞগণ (ছ)

অধ্যাপক James Hastings কর্তৃক সম্পাদিত Encyclopædia of religion and Ethics, Vol IV, ৩৮৫ ও ৩৮৬ পৃষ্ঠায় Dadu নামক প্রবন্ধটি John Traill সাহেবের লেখা। এই Traill সাহেবই জয়পুর হইতে ১৮৮৪ সালে Bhasha literature সম্বন্ধে একটি সুলিখিত memorandum প্রকাশ করেন। ট্রেল সাহেবের মতেও দাদূর কাল ১৫৪৪ হইতে ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দ। অর্থাৎ মঠবাসী মহন্তদের মতই তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন। এবং তাই তিনি দাদূর জন্ম বিষয়েও তাঁহাদের মতই লিখিয়া দিয়াছেন। অর্থাৎ তিনি বলেন, দাদূ আমেদাবাদে গুজরাতী ব্রাহ্মণ লোদিরামের পুত্র এবং পরে দাদূ সাম্ভর, আমের ও নারায়ণাতে বাস করেন। সাম্ভরে এখনও দাদূর জামা ও খড়ম রক্ষিত আছে। আকবরের সঙ্গে দাদূর ধর্ম্ম আলোচনা হইত। ইনি বলেন দাদূর ১৫২ জন শিষ্য। ইহা বোধ হয় লিখিবার বা ছাপার ভুল হইয়াছে। মুখ্য শিষ্য সংখ্যা হইবে ৫২ জন। Traill সাহেবের এই লেখাটিতে দাদূপন্থীদের সম্বন্ধে আরও অনেক কথা আছে। ঐ সম্প্রদায়ের গৃহস্থ, সন্ত, সাধু, স্বামী, খালসা (শিখদের খালসা নয়, দাদূপন্থী খালসা), নাগা উত্তরাঢ়ী, বিরক্ত, খাকী প্রভৃতিদের বিষয়ে কিছু কিছু পরিচয় দেওয়া আছে।

Traill সাহেব এই সকল গ্রন্থও দেখিতে বলেন—W. W. Hunter, Imperial Gazetteer of India, 1885—87 ; vi, 344 p. ; vii, 5 ; and Article "Amber" "Naraina".

W, Crooke, Tribes and castes of N. W. Provinces and Oudh, Calcutta. 1896, vol II, 236—239.

E. W. Hopkins, Religions of India, London, 1896, p. 513 f.

J. C. Oman, Mystics, Ascetics and Saints of India. London 1903 ; pp. 133. 189.

A. D. Bannermann, Rajputana Census Report, Lucknow, 1902, p. 47 f.

ট্রেল সাহেবের উল্লিখিত এই সকল গ্রন্থ ছাড়া আরও দর্শনীয়—A Grierson, The Modern Vernacular Literature of Hindusthan. M. Garcin De Tassy, Histoire De La Literature Hinduie Et Hindaustanie.

G. R. Siddons. I. A. S. B. June 1837.

H. H. Wilson. Asiatic researches XVII, 302 p ; Religious sects of the Hindus p 103.

History etc of the Hindus, vol II, p. 481.

দবিস্তাঁ (A. Troyerএর অনুবাদ), "দাদূ দরবেশ।"

জন গোপালের লেখা "জীবন পরীচী" ও দাদূর অন্যান্য ভক্তদের লেখা। এলাহাবাদ সন্তবাণী পুস্তকমালাতে (বেলভেডিয়র প্রেস) দাদূবাণী ও তাহার উপক্রমণিকা।

পণ্ডিত চণ্ডিকাপ্রসাদ ত্রিপাঠী (আজমের বৈদিক যন্ত্রালয়)—দাদূবাণী ও তাহার ভূমিকা। দাদূপন্থী সাহিত্য সংগ্রহ করিয়া ত্রিপাঠী মহাশয় সকল দাদূ-সাহিত্য-প্রেমিকের মহদুপকার করিয়াছেন।

পূর্ব্বে উল্লিখিত ও জয়পুরজেলপ্রেসে ছাপা ডাক্তার রায় দলজং সিংহ খেমকা বাহাদুরের দাদূর বাণী (শ্রীমান শেঠ যুগলকিশোর বিরলার সাহায্যে মুদ্রিত)।

বোম্বাই বেঙ্কটেশ্বর প্রেস হইতে প্রকাশিত দাদূবাণী। কাশী নাগরী প্রচারিণী সভা হইতে প্রকাশিত সুধাকর দ্বিবেদীর দাদূবাণী ও বিশেষরূপে তাহার দ্বিতীয়ভাগের ভূমিকা।

গাড়ওয়াল, পৌড়ী হইতে শ্রীযুত তারাদত্ত গৈরালা দাদূর কতক বাণী বাছিয়া তাহার ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন, শীঘ্রই তাহা প্রকাশিত হইবে।*

ভক্ত ও কবিদের সম্বন্ধে যে সব হিন্দী লেখকদের লেখা আছে তাহাও

---

* পরে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে।

দ্রষ্টব্য। যথা, মিশ্র-বন্ধু-বিনোদ (৩ খণ্ড), হিন্দীগ্রন্থ প্রচারকমণ্ডলী, (এলাহাবাদ); ইত্যাদি।

Modern Vernacular Literature of Hindusthan. (Sir George A. Grierson).

Asiatic Society of Bengal, Calcutta ;

কবিতাকৌমুদী (১ম ভাগ, রাম নরেশ ত্রিপাঠী), সাহিত্য সম্মেলন, এলাহাবাদ, প্রভৃতি হিন্দী সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে গ্রন্থ।

নাভাজীর ভক্তমালে বা প্রিয়দাসের টীকায় দাদূ বা তাঁর পন্থ সম্বন্ধে কিছুই নাই। তবে রাঘবদাসজীর ভক্তমাল ও ঐরূপ ভক্তদের চরিত-গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

Glossary of Tribes and castes, The Punjab and North Western frontier Provinces, Vol. I. দ্রষ্টব্য।

ইহা ছাড়া "সুরজপ্রকাশ"; ফানী রচিত দবিস্তান-ই-মজাহিব; "গুরু-বিলাস"; "ভক্ত-লীলামৃত" প্রভৃতি গ্রন্থ; উর্দ্দু ও পারসীতে লেখা ভক্তদের সম্বন্ধে লিখিত আরও গ্রন্থ আছে। সবগুলি প্রকাশিতও হয় নাই; সেগুলিও দ্রষ্টব্য।

Shahpur Gazetteer দ্রষ্টব্য। তাহাতে এই tradition বা পুরাবার্ত্তার উল্লেখ আছে যে দারাশিকোহ নাকি দাদূর বন্ধু ছিলেন। এখানে লেখা উচিত ছিল দাদূ-পন্থীয় দাদূর ভক্ত সাধু ও মরামিয়াদের সঙ্গে দারাশিকোহর আলাপাদি হইত। ভক্ত বাবালালের সঙ্গে দারার দীর্ঘ আলাপ ভক্তদের মধ্যে প্রসিদ্ধ। দারাশিকোহ দাদূ হইতে অনেক পরবর্ত্তী সময়ের লোক। তবে তিনি যে দাদূপন্থী সাধকদের সঙ্গে গভীর আলাপ করিতেন ইহা প্রসিদ্ধ আছে।

পাঞ্জাবের দিকে দাদূর চিত্রাদি পাওয়া যায়। একটি চিত্রে দেখা যায় স্বয়ং ভগবান গুরু হইয়া দাদূর মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। চিত্রের মধ্যে দেখা যায় দাদূ বালক মাত্র। কিন্তু এই সব চিত্র বিশ্বাসযোগ্য নয়। নারায়ণা, আমের প্রভৃতি মঠে তাঁর ব্যবহৃত খড়ম, লাঠী, জামা বা চিত্রাদি বলিয়া যাহা আছে, সেগুলির সত্যতা সম্বন্ধেও নিশ্চয় করিয়া বলা চলে না। আমেরের মঠে দাদূর সাধনার গুহাও দেখান হয়। এখানকার মহন্তের মতে এই গুহাতেই দাদূদয়াল সাধনা করেন।

সান্তর নারায়ণা প্রভৃতি স্থানে দাদূপন্থীদের যে সব মঠ আছে তাহাকে রীতিমত "বিদ্যায়তন" বলিলেও চলে। সেখানে অধ্যাপকেরা উপরের তলায় ও শিষ্যেরা নীচের তলায় থাকেন। সর্ব্বত্র শান্তি শৃঙ্খলা ও গাম্ভীর্য্য সুপ্রতিষ্ঠিত দেখা যায়।

এই তো গেল সব গ্রন্থের নাম। তারপর যে সব মানুষের কাছে এখনও এই সব খবর মিলিতে পারে দিনদিনই তাহাদের সংখ্যা কমিয়া আসিতেছে। জয়পুর শেখাবাটীর উদয়পুরের অন্তর্গত বিদসর নিবাসী শিবভজনজী এখন পরলোকে, খণ্ডেলার সুতলীদাসজীও এখন জীবিত নাই।

জয়পুরের ভরথরীজীও এখন পৃথিবীতে নাই, সুরত বেগমপুরার পণ্ডিত মোতিরামজী অল্পদিন হইল স্বর্গগত হইয়াছেন। মহন্ত বিহারীদাস একজন ভাল তত্ত্বজ্ঞ ছিলেন। তাঁর কাছে অনেক প্রবীণ সব দাদূপন্থী সাধক আসিয়া মাঝে মাঝে থাকিতেন। এখন তাঁর শিষ্য গঙ্গারামজী জয়পুরে বিদ্যাধরকা রাস্তাতে তাঁর স্থানে আছেন।

আমার সম্পাদিত "কবীরের" প্রথম খণ্ডে যে কয়জন সাধুর নাম করিয়াছি দাদূর বিষয়েও তাঁহাদের নাম করা উচিত। নাম উল্লেখ করিবার অনুমতি পাই নাই এমন মৃত ও জীবিত কয়েকজনের নাম এখানে করিতে পারিলাম না।

এই ক্ষেত্রে যে কয়জন জীবিত অভিজ্ঞ জনের নাম করিতে পারি তার মধ্যে পদমর্য্যাদা অনুসারে নারায়ণামঠের মহন্ত শ্রীস্বামী দয়ারামজী মহারাজের নাম প্রথমে উল্লেখযোগ্য। তার পরই জয়পুরের শেখাবাটী শীকরের সুবিদ্বান মহন্ত রামকরণজীর নাম করা উচিত। জয়পুর আমেরের মহন্ত বিহারীদাস, জয়পুরের অন্তর্গত উদয়পুরের লালশোধ, চাঁদসেন নরাইর নাম করা উচিত। জয়পুরের শ্রীযুত লক্ষ্মীদাস বৈদ্য ও পুরোহিত হরিনারায়ণ ও ডাক্তার দলজং সিংহ খেমকা মহাশয়ের নাম করা উচিত। রজ্জব উপক্রমণিকার প্রারম্ভে রজ্জবজীর গ্রন্থ সম্পাদন বিষয়ে নিযুক্ত সব কয়জন ভক্তজনেরই নাম করা যায়। মলসীসরের সর্দ্দার শ্রীমান ঠাকুর সাহেব ভূরসিংহজীর নাম করা যাইতে পারে। নারায়ণামঠের সাধু রামদাসজী ভক্ত যুবক হইলেও তীর্থযাত্রার অনুরাগবশতঃ নানাস্থানের খবর দিতে

পারেন। সুরত বেগমপুরার মঠের মহন্ত রামপ্রসাদজী গুজরাতের সব খবর দিতে পারেন। তবে কাহারও কাছেই সব খবর মিলিবে না, নানাস্থান হইতে নানাদিকের খবর নিতে হইবে। এখানে দাদূ-শিষ্যদের প্রতিষ্ঠিত নানা মঠে যে সব সাধু ভক্ত মহন্তরা জীবিত আছেন তাঁহাদের নামও অনেকস্থানে দেওয়া হইয়াছে। তাহাও দর্শনীয়।

সাম্প্রদায়িকবর্গ ও সাধকবর্গ (জ)

এত যে মুদ্রিত পুস্তকের, পুঁথির ঠিকানার ও মানুষের খবর দেওয়া গেল তাহার একটু কারণ আছে। আমার সংগৃহীত "কবীরের" বাণীগুলি দেখিয়া অনেক খ্রীষ্টীয় মিশনারী মহাশয় অভিযোগ জানাইয়াছেন যে কেন আমি কেবলমাত্র কবীর বীজকের বাণীই ছাপাই নাই। কবীরের প্রথম খণ্ডের ভূমিকা দেখিলেই তাঁহারা জানিতে পারিতেন যে আমার প্রধান চেষ্টা ছিল (মরমিয়া) সাধকদের মধ্যে মুখে মুখে প্রচলিত পাঠগুলিকে সংগ্রহ করিয়া রক্ষা করা। কারণ এই সব পাঠগুলি অতিশয় গভীর ও সুন্দর; আর মরমিয়া সাধুদের সঙ্গে সঙ্গে এই সব বাণীও লোপ হইয়া আসিতেছে। যে সব সাধুদের নিকট আমার সংগ্রহ, তাঁহাদের অনেকেরই নাম আমি সেখানে দিয়াছি। যাঁহারা তাঁহাদের নাম প্রকাশের অনুমতি দেন নাই তাঁহাদের নাম অবশ্য প্রকাশ করিতে পারি নাই। যাঁহারা বীজক ও অন্যান্য মুদ্রিত গ্রন্থের পাঠ দেখিতে চান তাঁহাদের জন্য সে সব সন্ধানও সেখানেই দিয়াছি। মুদ্রিত বীজকাদি গ্রন্থের বাণীগুলি এখনই নষ্ট হইবার ভয় নাই বলিয়াই আপাততঃ সেইদিকে মন দেই নাই। আমার প্রিয় ও যোগ্য ছাত্র শ্রীমান তুলারে সহায় শাস্ত্রী নিজে কবীর পংথী। তিনি সম্প্রতি কবীর বীজক বাহির করার ইচ্ছা করিয়াছেন। ত্রিজ্যা ও বাখেলখণ্ডী টীকা সমেত বীজক আরও অনেকে বাহির করিয়াছেন। আমার সংগৃহীত কবীরের বাণী হইতে শ'খানেক পদ শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অনুবাদের সাহায্যে দেশে দেশে ছড়াইয়াছে ও অতিশয় সমাদৃত হইয়াছে।

বৈদেশিক প্রচারকেরা যখন আমাদের ধর্ম্মের কোনো বিষয় জানিতে চান তাঁরা অনেক সময় ভুলিয়া যান যে যাহার বিষয় তাঁহাদের জানিবার ইচ্ছা, তাহার জীবন বলিয়া একটা বালাই থাকিতে পারে। ভক্ত সাধকদের মধ্যে এই সব বাণী ক্রমে কিছু রূপান্তরিত হইতেও পারে, সব ধর্ম্মেই তাহা হয় কিন্তু জানিবার ইচ্ছার ঝোঁকে অনেক সময় জ্ঞেয় বিষয়টির প্রতি এই সব তত্ত্ব-

সন্ধানীরা নিষ্ঠুর হইয়া ওঠেন। জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে নানাভাবেই Vivisection অর্থাৎ জীবন্ত জ্ঞেয় বস্তুকে ছেদন করিয়া দেখা হয়। এই সব ভারতের ধর্ম্ম বৈদেশিক কুতূহলী দ্রষ্টার কাছে জ্ঞেয় বস্তুমাত্র। কিন্তু ভারতের সাধনা ও ধর্ম্ম যাঁহাদের মরমের বস্তু তাঁহাদের কাছে এই সব জিনিষের জীবন আছে ও তাই তাঁদের কাছে এসব বস্তুর একটি দরদের দাবীও আছে।

সাধারণতঃ মঠে ও সাম্প্রদায়িক গ্রন্থাদিতে সাম্প্রদায়িক বাণীই স্থান পায়। মহাবাণীগুলি প্রায়ই সম্প্রদায় প্রভৃতির সঙ্কীর্ণতা ও ভেদবুদ্ধির উপর বজ্রের আগুন ঢালিয়া দেয়। মহাপুরুষেরা এই সব জ্বলন্ত বাণীর উৎস বলিয়া যখন তাঁহারা জীবিত থাকেন তখন তাঁহারা সমাদর পান না। কারণ এই সব জীবন্ত ও জ্বলন্ত মহাপুরুষদিগকে হজম করা সহজ কথা নহে। তাঁহারা যখন সংসার হইতে চলিয়া যান তখন লোকেরা তাহাদের মহাবাণীগুলিকে বাদসাদ দিয়া আগুন নিবাইয়া নিরাপদ করিয়া নিজেদের পছন্দমত করিয়া লয়। জীবন্ত, জ্বলন্ত সব মহাপুরুষকে নিজেদের সুবিধামত নির্জীব করিয়া লোকেরা সমাজমন্দিরে প্রতিষ্ঠা করে ও সম্প্রদায় চালায়। প্রায়ই দেখা যায় মহাপুরুষদের মঠগুলি ও সম্প্রদায়গুলি তাঁহাদের অগ্নিময়ী বাণী যথাসাধ্য পরিহার করে ও এড়াইয়া চলে। অনেক জীব আছে যাহার শিকার করিয়া তাহাকে পচাইয়া নরম করিয়া নিজেদের সুবিধামত হইলে তবে আহার করে। কবীরের মৃত্যুর পর যখন তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে সম্প্রদায়-স্থাপনাকাঙ্ক্ষী বিষয়ীর দল ভেদবুদ্ধি ধ্বংশকারী কবীরকে নরম করিয়া সুবিধামত করিয়া লইয়া দল বাঁধিতে ইচ্ছা করিলেন তখন তাঁহার পুত্র কমাল যে কিরূপে তাহাতে বাধা দিলেন তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি কিছুতেই সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করিতে সহায়তা করিলেন না দেখিয়াই সবাই বলিলেন—

"ডূবা বংশ কবীরকা জব উপজা পুত্র কমাল।"

অর্থাৎ, "কবীরের যে কমাল পুত্র জন্মিল, তাহাতেই তাঁহার বংশ ডুবিল।" পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে এই কথাটির নানারকম ব্যাখ্যা আছে। তারপর বহুকাল গেল, সম্প্রদায় আর হয় না। অবশেষে সুরত-গোপালকে ধরিয়া সেই মঠ ও সম্প্রদায়ই গড়িয়া উঠিল যাহার বিরুদ্ধে কবীর আজীবন যুদ্ধ করিয়াছেন। তারপর গড়িয়া উঠিল ধর্ম্মদাসের সম্প্রদায়। আজ যদি কবীর জন্মগ্রহণ

করিতেন তবে সকলের আগে বোধ হয় তাঁহার নিজের মঠ ও সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধেই তাঁহাকে হাত দিতে হইত।

মহাপ্রাণ মহামানব খ্রীষ্টের অনুবর্ত্তী মিশনরী মহোদয়গণ কেন যে কবীরের সাম্প্রদায়িক বাণীর উপরই এত ঝোঁক দেন তাহা তো বুঝি না। তাঁহারা কবীরের সময় ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের জন্য এত ব্যগ্র হইলেও খ্রীষ্ট সম্বন্ধে কি সেই ঐতিহাসিক গবেষণা পছন্দ করেন? তখন তাঁরা পরবর্ত্তী ভক্তদের মধ্য দিয়া যে খ্রীষ্ট গড়িয়া উঠিয়াছেন তাঁহাকেই আশ্রয় করিতে চাহেন। অথচ পৃথিবীর অন্যান্য সাধকজনের ক্ষেত্রে তাঁরা এই উদারতাটুকু দেখাইতে অসম্মত।

মহাপুরুষের সত্য ও সাধনাকে যাঁহারা বৈষয়িক উত্তরাধিকারীর মত অধিকার করিয়া রাখিতে চান সেই সব সাম্প্রদায়িকরা মনে প্রাণে গুরুকে আপনাদের প্রয়োজনমত করিয়া লইতে গিয়া যথার্থ গুরুকে বধ করেন। মরমিয়ারা বলেন "তাঁহারাই 'গুরুহন্তা' যাঁহারা গুরুর অগ্নিবাণীর ভয়ে ও বজ্রসাধনার ভয়ে সত্য গুরুকে বধ করিয়া নিজেদের পছন্দমত ক্ষুদ্র গুরু সৃষ্টি করেন। গুরুহীন 'নিগুরা' হইতে এই সব 'গুরুমারেরা' ভয়ঙ্কর।" ইহাঁরা গুরুকে নিজের মত করিয়া লইয়া নিজেদের ভাবেই বাণী রক্ষা করেন। আত্মকল্পিত ও আত্মসৃষ্ট গুরুর অনুবর্ত্তন করা অপেক্ষা সোজাসুজি অন্তরের মধ্যে প্রকাশিত সত্যকে মানাই ভাল। কারণ তাহাতে ভগবদ্‌বাণী শ্রবণ করিবার কিছু সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু স্বয়ং-সৃষ্ট গুরুকে লইয়া কাজ করিতে গেলে আধ্যাত্মিক স্বার্থপরতা ফলাইবারই সুযোগ ঘটে। দল হইতে ভ্রষ্ট বিষয়-বুদ্ধিহীন ক্ষেপা মরমিয়া সাধুরা কৃপা করিয়া মুখে মুখে যে সব মহাবাণী রাখেন, তাহাতেই মহাপুরুষদিগের পরিচয় পাইবার উপায় কতক পরিমাণে থাকিয়া যায়।

বাংলাদেশের সম্প্রদায়ী সাধক ও অসম্প্রদায়ী বাউলদের দেখিয়া এই কথাটা আমার মনের মধ্যে আরও গভীর হইয়া বসিয়া গিয়াছে।

সুধাকর দ্বিবেদী মহাশয় দুঃখ করিয়া বলেন "বড় দুঃখের কথা এখনকার সম্প্রদায়পতি ও মঠাধিকারী মহন্তরা অনেকেই এই সব মহাপুরুষদের গ্রন্থাদিও দেখিতে দেন না, নানাস্থানে এই সব গ্রন্থ লোকলোচনের অন্তরালে পচিয়া যাইতেছে তবু ইহারা যথাসম্ভব সব জ্ঞাতব্য বিষয় লুকাইবেন।"

এই সব ক্ষেত্রে যাঁহারা গভীরভাবে কাজ করিতে চান তাঁহারাই দ্বিবেদী মহাশয়ের এ উক্তি যে কত সত্য তাহা বর্ণে বর্ণে অনুভব করিবেন। এই ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ সেবকদের এ সব দুঃখ যে আছে তাহা জানিয়া রাখা উচিত।

মিথ্যা পরিচয় দিয়া ভক্তজনকে যাঁহারা উচ্চে উঠাইয়া তুলিতে চান তাঁহারা বুঝেন না এইরূপ চেষ্টা কত গর্হিত। দাদূর বাণীতে বিস্তর মুসলমানী ভাব আছে, অথচ তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বানান দরকার। এই উভয় দিক রক্ষা পায় কিসে? তখন মনে পড়িল, গুজরাতের নাগর ব্রাহ্মণেরা চিরকাল মুসলমান রাজাদের আমলা; কাজেই আরবী পারসী শিক্ষায় দীক্ষায় তাহারা মুসলমান অপেক্ষা হীন নহেন। তাই দাদূকে হইতে হইল নাগর ব্রাহ্মণ।

এমন অবস্থায় দাদূকে কায়স্থ করিলেও চলিত। আর এইরূপ নজীর যে না আছে তাহা নয়, কিন্তু তাহা হইলে তাঁহাকে তো ব্রাহ্মণ করা হইত না। তাই দাদূকে নাগর ব্রাহ্মণের ঘরেই জন্মিতে হইল।

নাগর হইতে হইলেই জন্মিতে হয় গুজরাতে, তাই তাঁহার জন্মস্থান হইল আমেদাবাদ। সেখানে না তাঁহাকে কেহ জানে, না তাঁহার কোনো চিহ্ন আছে। মাত্র সওয়া তিন শত বৎসর হইল তিনি পরলোক গিয়াছেন। ইহার মধ্যেই তাঁহার সব চিহ্ন সব স্মৃতি তাঁহার জন্মস্থান হইতে এমন ভাবে মুছিয়া গেল? অথচ আমেদাবাদের উত্তরে দক্ষিণে নানাস্থানে দাদূর বহু অনুরাগী ও ভক্ত আজও আছেন মঠমন্দিরাদিরও অভাব নাই।

দাদূর ধুনিয়া বংশে জন্মের কথা প্রকাশ্যভাবে লিখিত হইবার পর আমি একবার আজমীরে চন্দ্রিকা প্রসাদজীর সঙ্গে দেখা করি। তিনি দুঃখ করিয়া বলিলেন—"জানেন? আমাদের এই সব লেখালেখিতে মঠের মহন্তরা ও সাধুরা দাদূর সম্বন্ধে মঠে রক্ষিত সব প্রামাণিক পুঁথিগুলি নষ্ট করিতে আরম্ভ করিয়াছেন!" হয়তো পূর্ব্বেও এই বিষয়ে বিস্তর প্রমাণ নষ্ট করা হইয়াছে। তবু সে সব অত্যাচার এড়াইয়াও যে সব প্রমাণ রহিয়া গেছে তাহা লইয়াই সত্যকে কোনও কোনও বিষয়ে এখনও নিঃসংশয়িতরূপে প্রতিষ্ঠিত করা যায়। কিন্তু তাঁহাদের এই সকল প্রয়াস সফল হইলে ভবিষ্যতে এই সব সত্য জানিবার আর কোনো উপায় অবশিষ্ট থাকিবে না।

দাদূ সংগ্রহ পরিচয় (ঋ)

দাদূ ছিলেন অক্ষরপরিচয়হীন সাধক। যখন যে সত্য তিনি জীবনে উপলব্ধি করিয়াছেন, যখন যে অনুভব তাঁহার অন্তরকে পূর্ণ করিয়াছে, তাহাই তিনি কণ্ঠে প্রকাশ করিয়াছেন। অধিকাংশ শিষ্যই তাহা শুনিয়া কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছেন। সৌভাগ্যবশতঃ দুই একজন শিষ্য লিখিতে জানিতেন তাঁহারা পরে অনেক বাণী অনেক কণ্ঠ হইতে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন। নানা জনের নিকট হইতে সংগ্রহ করায় একই বাণী নানা আকার ধারণ করিয়াছে। হয়তো দাদূ নিজেও বিশেষ বিশেষ ভাবের শ্রোতার কাছে একই বাণীকে ভাবানুসারে একটু আধটু বদ্‌লাইয়া বদ্‌লাইয়া অনেক রকম করিয়া ফেলিয়াছেন। আবার হয়তো বা বহুশিষ্যের বহুবিধ বৈচিত্র্যবশতঃ বাণীর নানা আকার হইয়া বাণীর সংখ্যা বৃথাই বাড়িয়া গিয়াছে।

৬৯। **বাণীর সংখ্যা ঃ** এই কারণেই দাদূর পদ এখন ২০ হাজারের উপর। যদিও শিষ্যদের সংগৃহীত কোনো একখানি গ্রন্থেই তিন চারি বা বড় জোর পাঁচ হাজারের বেশী বাণী বা শব্দ নাই। আর তাহার মধ্যেও একই পদের একাধিকবার পুনরুক্তি আছে। একটি ভাবকে মনের মধ্যে দাগিয়া দিবার জন্য দাদূ এক এক সময় একই বাণীকে বদ্‌লাইয়া নানাভাবে বহুবার বলিয়াছেন। অবশ্য তাহাকেও আমি পুনরুক্তির মধ্যে ধরিতেছি না। লেখা সংগ্রহগুলি যে বাণী রচনার অনেক পরে সংগৃহীত হইয়া ছিল তাহা সংগ্রহগুলির বৈচিত্র্য ও ভেদ দেখিলেই বুঝা যায়।

যে কারণে দাদূর বাণীর সংখ্যা-বহুলতা সেই কারণেই তাঁহার শিষ্যদের রচিত বাণীর সংখ্যা ও বহু বিস্তৃত। প্রথিত আছে যে ভক্ত জাইসার রচিত পদ সওয়া লক্ষ, ভক্ত সুন্দরদাসের রচিত পদ এক লক্ষ বিশহাজার, ভক্ত রজবজীর পদ ৭২ হাজার, ভক্ত মাধোদাসের ৬৮ হাজার, ভক্ত প্রয়াগদাসের ৪৮ হাজার, ভক্ত গরীবদাসের ৩২ হাজার, ভক্ত বখনাজীর ২০ হাজার, বাবা বনওয়ারীদাসের ১২ হাজার, ভক্ত শঙ্করদাসের সাড়ে চারিহাজার। কিন্তু

জয়পুর-রাজ্য-অন্তর্গত শেখাবাটি প্রান্তস্থ ভক্ত সমাজ যে রজ্জবজীর বাণীর বৃহৎ চয়ন সংগ্রহ করিয়াছেন তাহাতে ৭২ হাজারের স্থলে ১০,০১৩টি মাত্র পদ পাওয়া গেল। এই বাণী সংগ্রহে যত ব্যয় লাগিয়াছে সব দিয়াছেন খেতড়ী এলাকার চূড়ীগ্রামবাসী শেঠ শিবনারায়ণ সূরজমল নেমানী, আরও ব্যয় লাগিলে তিনি একাই সব বহন করিতে প্রস্তুত ছিলেন। রজ্জবজীর এই এই বাণী সংগ্রহে শীকরনিবাসী মহাত্মা শ্রীরামকরণজী, মহাত্মা শ্রীবলদেব দাসজী বিরক্ত, মহাত্মা লালদাসজী, পণ্ডিত হীরালালজী, মহাত্মা শ্রীরামদাসজী মণ্ডলীশ্বর দূবলধনিয়া, সন্তশ্রী কেশবদাসজী (কালডৈরা জয়পুর), ও প্রধান সম্পাদক ভিৱানী নগরীস্থ শ্রী ১০৮ রামকৃষ্ণ দাসজী বৈদ্যের শিষ্য পণ্ডিত কৃপা রামজী সাধু বৈদ্য। সকলে মিলিয়া শ্রম ও চেষ্টা করিয়াছেন তবু দশ হাজার তেরটি মাত্র পদ পাইয়াছেন, তার মধ্যেও বিস্তর পুনরুক্তি আছে।

সুন্দরদাসের একলক্ষ বিশ হাজার পদের স্থানে আসলে আট দশ হাজারের বেশী পদ মিলিতেছে না। জয়পুরের শ্রীযুত পুরোহিত হরিনারায়ণ মহাশয় কাশী নাগরী প্রচারিণী সভার তরফ হইতে একখানি "সুন্দরসার" বাহির করিয়াছেন ও এখন সুন্দরের সম্পূর্ণ পদ প্রকাশের উদ্যোগে আছেন। কিন্তু তাহাতেও সম্পূর্ণ পদ ৮ হাজার হইতে অধিক হইবে না।

জনগোপালের লেখা ২৮৬৪ পদ। তার মধ্যে ১৫০টি শ্লোকে দাদূর "জীবন পরীচী" বা জীবন পরিচয়। এই কারণে এই গ্রন্থখানি খুব মূল্যবান। নাভাজীর ভক্তমালে বা প্রিয়াদাসের টীকায় দাদূর নামমাত্রও নাই। নানক প্রভৃতি অনেক বড় বড় সাধুর নামই ভক্তমালে নাই। যে সব মহাত্মারা প্রচলিত শাস্ত্রাদির বা লোকপ্রতিষ্ঠিত মতের বাহিরের কথা বলিয়াছেন, তাঁহাদের কথা অনেক স্থলে ভক্তমাল বলেনই নাই অথবা তাঁহাদিগকে নিজের মতের মত করিয়া লইয়া তবে তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

যে কয়জন ভক্ত শিষ্য দাদূর বাণী সংগ্রহ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে রজ্জবজী মুসলমান, ভক্ত সন্তদাসজী ও ভক্ত জগন্নাথজী হিন্দু। ইহারাও বাছিয়া বাছিয়া বাণীগুলি গ্রহণ করিয়াছেন ও নিজেদের পছন্দমত আকারই রাখিয়াছেন। ইঁহাদের সংগ্রহে বাদ পড়িয়া গিয়াছে এমন কিছু কিছু গভীর বাণীও নিরক্ষর ভক্তেরা কণ্ঠে রক্ষা করিয়াছেন, অথচ লেখা বাণীর সবগুলি

কণ্ঠে রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। কণ্ঠে করিয়া রাখিবার শক্তির সীমা আছে, কাজেই সাধনার জন্য যাহা সব চেয়ে মূল্যবান ও গভীর বাণী তাহাই তাঁহারা রক্ষা করিয়াছেন। লেখায় যতটা ধরে স্মৃতিতে ততটা ধরে না তাই তাঁহাদিগকে অনেক বাছিয়া বাছিয়া লইতে হয়। এইখানেই "কাগজিয়া" ও "মগজিয়া" ভক্তের পার্থক্য। সাধক পরম্পরায় বাছাই হওয়ায় খুব অল্প সংখ্যক পদেই দাদূর সবগুলি ভাব ও সৌন্দর্য্যই ফুটিয়া উঠিয়াছে। মরমিয়া ভক্তেরাই মরম অনুসারে পদগুলিকে সুন্দর করিয়া বাছাই করিয়া সাজাইয়াছেন। ইঁহারা সাজাইয়াছেন নিজেদের ভাবের অনুসারে। সেই ভাবের প্রকরণগুলি পরে লেখা হইবে। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ লিখিত পুঁথির ৩৭ অঙ্গকে স্বীকার করিয়াছেন কিন্তু ৩৭ অঙ্গকে স্থান দিয়াছেন প্রধান ছয় প্রকরণের মধ্যে।

দাদূর নিজের কোনো সাজাইবার প্রণালীর কথা জানা নাই। কাজেই ভক্ত সন্তদাস ও জগন্নাথ দাস যে দাদূ বাণী সংগ্রহ করিয়াছেন তাহাতে বাণীগুলির ভাল ভাবে অঙ্গ বিভাগ করা নাই, এবং একই বাণী বহু আকারে বহু স্থানে আছে। এই সংগ্রহের নাম "হরডে বাণী"। রজ্জবজীর সংগ্রহেও পুনরুক্তি দোষ আছে, তবে হরডে বাণীর মত বেশী নয়।

রজ্জবজী যে সব পদ সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা তিনি ৩৭ অঙ্গ ভাগ করিয়া সাজাইয়াছেন। এই সংগ্রহের নাম তাই "অংগবংধূ"। পরবর্ত্তী অধিকাংশ পুঁথিই রজ্জবজীর "অংগবংধূ"র প্রণালী অনুসারে লেখা। যে সব পুঁথি "অংগবংধূ" গ্রন্থকে অনুসরণ করিয়াছে তাহাদেরও কোনো দুইটী পুঁথির পদের সংখ্যা বা পদের মর্য্যাদা ঠিক এক নহে। অবশ্য অঙ্গ ৩৭টি ঠিকই আছে আর অনেক শ্লোকই প্রায় মেলে। আমার অধ্যাপক কাশীর পূজ্যপাদ স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় সুধাকর দ্বিবেদী মহাশয়ের "অংগবংধূ" প্রণালীতে লেখা পুঁথিখানিতে সাখী সংখ্যা ২৬২৩ ও গানের সংখ্যা ৪৪৫ ছিল অথচ জয়পুরের ডাক্তার রায় দলজং সিংহ খেমকা বাহাদুরের পুঁথিতে লেখা আছে সাখীর সংখ্যা ২৪৪২ আর গানের সংখ্যা ৪৪৪ কিন্তু গণিয়া পাইলাম ২৩৭৪ সাখী আর ৪২৮টি গান। ডাক্তার খেমকা বাহাদুরের পুঁথিও "অংগবংধূ" অনুসারে লেখা। ডাক্তার খেমকা তাঁর সম্পাদিত পুঁথিতে নিজের নাম দেন নাই।

বইখানিতে আছে "কাল ভৈরা কা সুখদেবজী নে পঠনার্থ লিখী।" "জেল প্রেস জয়পুর মেঁ শ্রীমান সেঠ যুগল কিশোরজী বীরলা পিলানীবালাকে সহায়তা সে মুদ্রিত হুঈ।"

আজমীঢ়ের পণ্ডিত চন্দ্রিকা প্রসাদ ত্রিপাঠী মহাশয়ের অতি সুন্দর গ্রন্থ দাদূ দয়ালজী কী বাণীতে পাই ৩৭ অঙ্গে ২৬৫৮টি সাখী ও ২৭ রাগে ৪৪৫টি গান ও শ্লোক। সর্ব্বশেষে মুদ্রিত হইলেও কায়াবেলীর পদের নম্বর ৩৫৭—৩৬৪ পর্য্যন্ত। টীকা দিবার প্রয়োজন থাকায় এই অংশটুক সর্ব্বশেষে ছাপা হইয়াছে। এই উপক্রমণিকাতে উদ্ধৃত প্রায় দাদূবাণীগুলিতেই এই গ্রন্থানুসারে সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ক্বচিৎ দুই একটিতে দ্বিবেদী মহাশয়ের গ্রন্থানুসারে দেওয়া হইয়াছে।

দাদূর লেখা বাণীর কতক "সাখী" ও কতক "শবদ" বা গান। এই গুলির কতক "ভাবপদ" অর্থাৎ ভাবের পদ ও কতক "করণী পদ" অর্থাৎ সাধন কবিবার পদ্ধতির উপদেশ। "করণী পদ" প্রায়ই পুঁথিতে থাকে না, সে সব জিনিষ গুরু শিষ্যকে সাধনার সময় শিক্ষা দেন, কাজেই সেগুলি কতকটা গুপ্ত। সেই সব পদে দেহতত্ত্ব, ষট্‌চক্র, কমল স্থান, ভ্রমর বেধ, ইড়া-পিঙ্গলা-সুষুম্নার ত্রিবেণী, ধারা উল্টাইয়া ব্রহ্মস্থানে পৌছান প্রভৃতির কথা থাকে। "করণী পদ"গুলি ক্রিয়াগত বলিয়া যাঁহারা সেই প্রণালীতে সাধনার্থী নন তাহারা বড় একটা জানিতে চান না। আর সম্প্রদায়স্থিত লোকেরাও বাহিরের লোককে তাহা জানাইতে চান না। কাজেই সেগুলি পুঁথিতে থাকে না, মুখে মুখেই থাকে, সে গুলির সংখ্যাও বেশী নহে। সব সংগ্রহেই ভাবপদের মাঝে মাঝে কখনও কখনও এক আধটা করণী পদ ও আসিয়া পড়িয়াছে।

স্বর্গীয় সুধাকর দ্বিবেদী মহাশয় দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন,"প্রায় সর্ব্বত্রই দাদূর বাণী ও শবদ একত্রে মিশান পাওয়া যায়, পাঠকদের হিতার্থ আমি তাহা আলাদা করিয়া করিয়া সাজাইয়া প্রকাশ করিয়াছি, কারণ তাহা না হইলে পাঠকগণের বড় অসুবিধা।"

"ভাবপদ" কে দাদূ কখনও কখনও "কথনী পদ"ও কহিয়াছেন। "কথনী" অর্থাৎ যাহা সকলকেই বলা চলে। "কথনী" ও "করণীর" যোগে

সাধনা পূর্ণ করিলে জ্ঞানের উদয় হয়। "ইড়া-পিঙ্গলা-সুষুম্না"র ত্রিবেণীর মত সাধনায় যদি "কথনী-করণী-জ্ঞানের" ত্রিবেণী ঘটে তবে সাধক পরিপূর্ণতা লাভ করে, তাহাতেই মুক্তি। দাদূর মতে পরিপূর্ণতার মধ্যে নিজেকে ডুবাইয়া দেওয়াই মুক্তি, মুক্তি অর্থ কোনো বিশেষ রকমের বা কোনো পবিত্র রকমের আত্মঘাত নহে; ইহা একান্ত সহজ অবস্থা। সাধনাকে অনেক সময় অন্যায় রকম সোজা করিতে গিয়া সাধক আপনাকেই সব দিক দিয়া ক্ষয় করিয়া দেয়। পাপ হইতে আপনাকে রক্ষা করা বরং সহজ কিন্তু ধর্ম্মের নামে আত্মঘাত হইতে নিজেকে রক্ষা করা অনেক সময় কঠিন।

১০। **বাণী-বিভাগ ঃ** সাধারণতঃ বাণীর পদগুলি ৩৭ অঙ্গে বিভক্ত। রজ্জবজীর অংগবংধূর প্রণালীতেই এই ভাগ সর্ব্বত্র করা হইয়াছে বলিয়া অঙ্গগুলির ভাগ করার পদ্ধতিতে বড় একটা প্রভেদ কোথাও নাই। অবশ্য সন্তদাস জগন্নাথদাসের প্রণালীতে এই ভাগ মানা হয় না। স্বর্গীয় সুধাকর দ্বিবেদী, আজমীরের শ্রীযুক্ত চন্দ্রিকাপ্রসাদ ত্রিপাঠী, জয়পুরের ডাক্তার দলজং সিংহ খেমকা প্রভৃতি প্রায় সবাই এই প্রণালীতেই সাজাইয়াছেন, কারণ সকলেই "অংগবংধূ" সংগ্রহই প্রকাশ করিয়াছেন।

১।	গুরু	কো	অঙ্গ	
২।	সুমিরণ	"	"	
৩।	বিরহ	"	"	
৪।	পরচা	"	"	
৫।	জরণা	"	"	
৬।	হৈরাণ	"	"	
৭।	লয়	"	"	(ত্রিপাঠী—"লৈ")।
৮।	নিহকরমী পতিব্রতা	"	"	
৯।	চেতরণী	"	"	(ত্রিপাঠী—চিতরাণী) (দলজংসিং খেমকা—চিন্তামণি)।
১০।	মন	"	"	
১১।	সূচ্ছম জনম	"	"	(ত্রিপাঠী—সূষিম জনম)।
১২।	মায়া	"	"	

১৩। সাঁচ ” ”
১৪। ভেখ ” ”
১৫। সাধু ” ” (সাধ—ত্রিপাঠী)।
১৬। মধ্য ” ” (মধি—ত্রিপাঠী)।
১৭। সারগ্রাহী ” ”
১৮। বিচার ” ”
১৯। বিশ্বাস ” ” (বেসাস—ত্রিপাঠি)।
২০। পীয় পিছানন ” ” (পীব্ব পিছাঁণ—ত্রিপাঠী)।
২১। সমরথাঙ্গ ” ”
২২। সবদ ” ”
২৩। জীবিত মৃতক ” ”
২৪। সুরাতন ” ”
২৫। কাল ” ”
২৬। সজীবন ” ”
২৭। পারিখ ” ” (ডাক্তার খেমকার গ্রন্থে “পারষ”)।
২৮। উপজ ” ” (ত্রিপাঠী—উপজণি)।
২৯। দয়া নিরবলতা ” ” (ত্রিপাঠি ও ডাক্তার
খেমকার গ্রন্থে নির্বৈরতা)।
৩০। সুন্দরী ” ”
৩১। কস্তূরিয়া মৃগ ” ”
৩২। নিন্দা ” ”
৩৩। নিরগুন ” ” (ত্রিপাঠী “নিগুণাঁ” ; খেমকা “নগুণা”)।
৩৪। বিনতী ” ”
৩৫। সাষীভূত ” ”
৩৬। বেলী ” ”
৩৭। অবিহড় ” ”

এই ৩৭টি অঙ্গে স্বর্গীয় দ্বিবেদী মহাশয়ের গ্রন্থে ২৬২৩টি পদ আছে। ডাক্তার শ্রীযুত খেমকার গ্রন্থে ২৩৭৪টি পদ আছে।

সবদ বা গানের মধ্যে দ্বিবেদী মহাশয়ের গ্রন্থে ২৭টি রাগ ও ডাক্তার খেমকার গ্রন্থে ২৮টি রাগ পাই।

দ্বিবেদী মহাশয়ের গ্রন্থে গানের সংখ্যা ও রাগ অনুসারে ভেদ দেওয়া যাইতেছে।

রাগের নাম	গান সংখ্যা দ্বিবেদীর গ্রন্থে।
১। মালীগোড়	১৬
২। ভৈরো	৫৬
৩। রামকলী	৪৬
৪। অসাবরী	৩৪
৫। কেদারা	২৬
৬। মারূ	২৬
৭। বিলাবল	২১
৮। গুংড	২১
৯। টোড়ী	২০
১০। মালীগোড়	১৫
১১। সোরঠ	১৪
১২। কান্‌হড়া	১৫
১৩। সূহৌ	১০
১৪। ধনাশ্রী	১০
১৫। বসন্ত	৯
১৬। সীঁধভা	৮
১৭। নটনারায়ণ	৭
১৮। অড়ানা	৬
১৯। সারংগ	৫
২০। ললিতা	৫
২১। ভাঁণমলী	৪
২২। দেবগন্ধার	৩
২৩। গৌড়ী	২

২৪।	কল্যাণ	২
২৫।	হুসেনী বংগালৌ	২
২৬।	জৈতশ্রী	২
২৭।	পরজ	১

দ্বিবেদী মহাশয়ের গ্রন্থে মোট ৩৮৬টি গান। ত্রিপাঠী মহাশয়ের গ্রন্থে ৪৪৫টি গান। ডাক্তার দলজং সিংহ খেমকার গ্রন্থে ৪২৮টি গান। তারপর কোন রাগে কয়টি গান তাহাতেও কিছু পার্থক্য আছে।

ইহার অধিকাংশ গানই দীর্ঘ এবং বহুজনের এক সঙ্গে গাহিবার মত গান। আরতিগুলি বেশ দীর্ঘ। পুঁথিতে লিখিত গান ছাড়াও দাদূর বহু গান ভক্তদের কণ্ঠে কণ্ঠে আছে। সাধু ভক্তেরা দাদূর সঙ্গীত অতি মধুর স্বরে গান করেন, গানের সুরও অতিশয় মধুর। মধ্যযুগের সাধকেরা ভাব অনুসারে নূতন নূতন সুর সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা এ বিষয়ে কোনো নির্জীব ব্যাকরণ বা বিধান মানেন নাই। তাঁহাদের সুররচনা সহজ মধুর ও গম্ভীর, তাহাতে কোন ওস্তাদী জটিলতা নাই, এই প্রণালীর সুরকে ভজন বলে। ভজনের মধ্যে পুরাতন নানাবিধ সুর ভাবানুসারে মিশ্রিত করা হয় ও নূতন নূতন সুরেরও সৃষ্টি হয়। বড় বড় ওস্তাদরা এই সব সাধুদের পদতলে বসিয়া ও পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াই ধন্য হইয়াছেন। ইহাঁদেব কাছেই ওস্তাদরা নূতন নূতন সুর গ্রহণ করিয়াছেন আর তাহাতেই পরে ওস্তাদীর ঐশ্বর্য্য বসাইয়া নিজেদের প্রয়োজন সাধন করিয়াছেন। কাশী, রাজপুতানা ও আবুপর্ব্বতের নানাভাগে পাঞ্জাবে ও সিন্ধুদেশে এই সব সুরের গায়ক সাধু ভক্তের এখনও দেখা মেলে। কাঠিয়াওয়াড়েও এই সব সুর শোনা যায়। গুজরাত দাদূপন্থীদের একটি প্রাচীন আড্ডা হইলেও এখন আর সেখানে তেমন ভজনাদি মেলে না। কাঠিয়াওয়াড় হইতে মাঝে মাঝে ব্যবসায়ী ভজনগায়কদের গুজরাতে পরিভ্রমণ করিতে দেখা যায়।

মরমিয়া সাধু ভক্তরা অন্তরের ভাব অনুসারে দাদূর বাণীকে প্রধানতঃ ৬টি প্রকরণে ভাগ করেন। "অংগবংধূ"র ৩৭ অঙ্গ যাঁহারা স্বীকার করেন, তাঁহারা ঐ ছয় প্রকরণের মধ্যেই ৩৭ অঙ্গকে বসাইয়া দেন যথা—

প্রথম প্রকরণ—জাগরণ। ইহাতে গুরু সাধু ও চেতবণী এই তিনটি অঙ্গ থাকে।

দ্বিতীয় প্রকরণ—উপদেশ। ইহাতে নিন্দা, সুরাতন, পারিখ, দয়া নিরবলতা ও জীবিত মৃতক এই পাঁচটি অঙ্গ থাকে।

তৃতীয় প্রকরণ—তত্ত্ব। ইহাতে কাল, সাঁচ, বিচার (সিদ্ধসত্য), কস্তূরিয়া মৃগ ও সবদ এই পাঁচটি অঙ্গ থাকে।

চতুর্থ প্রকরণ—সাধনা। ইহাতে প্রথমে আছে ৭টি বাধার অঙ্গ যথা ভেখ (বাহিরে সজ্জার বাধা), মন (অন্তরের বাধা), মায়া (মিথ্যা তত্ত্বের বাধা) সূক্ষ্ম জন্ম (অস্থিরতা চঞ্চলতার বাধা), উপজ ("অহম্ ভাব" উৎপত্তির বাধা), নিরগুণিয়া (সাধকের আপন অযোগ্যতার বাধা), হৈরান (পরিমাণের দ্বারা অপরিমেয়কে বুঝিবার চেষ্টায় ব্যর্থতার বাধা), এই সাতটি বাধার অঙ্গ।

আর সাতটি সহায়ক অঙ্গ। যথা—বিনতি (দয়া প্রার্থনা), বিশ্বাস, মধ্য (অপক্ষপাত), সারগ্রাহী, সুমিরণ (স্মরণ) লয়, সজীবন এই সাতটি সহায়ক অঙ্গ।

পঞ্চম প্রকরণ—পরিচয়। ইহাতে আছে জরণা (ভাবকে আপনার মধ্যে সমাহিত রাখা), পরচা (পরিচয়), অবিহড় (অবিকার অবিনশ্বর), সাখীভূত (ভগবানই সব, জীব সাক্ষী ভূত মাত্র), বেলী (জীব অমৃতবল্লী), সমরথাই, পীয় পিছানন এই ৭টি অঙ্গ।

ষষ্ঠ প্রকরণ—প্রেম। ইহাতে আছে বিরহ, সুন্দরী (ব্যাকুলতা) নিহকরমী পতিব্রতা, এই তিনটি অঙ্গ।

মরমিয়া শ্রেণীর ভাল সাধকদের মধ্যে মধ্যে খুব চমৎকার নির্বাচিত বাণী ও সবদ পাওয়া যায়। সেগুলি সংখ্যাতে কম হইলেও দেখা যায় যে বিস্তৃত রচনাবলীতে আর তার বেশী কোনো বড় ভাব নাই। পুঁথির পদের সঙ্গে কণ্ঠের পদের ও ভিন্ন ভিন্ন কণ্ঠের পদের মধ্যে একটু আধটু আকারগত অমিল অনেক সময় থাকে। ভিন্ন ভিন্ন পুঁথির পদেও এমন অমিল ও ইহা অপেক্ষা আরও বেশী অমিল যে দেখা না যায় তাহা নহে।

এই সংগ্রহে যে বাণী ও সবদ প্রকাশ হইতেছে তাহা সাধুদের কণ্ঠ হইতে নেওয়া। তবু তার প্রত্যেকটি আমি পুঁথির সঙ্গে মিলাইয়া দেখিয়াছি।

যে সব পদ ও গানের কাছাকাছি কিছুই কোনো পুঁথিতে নাই অর্থাৎ যে সব ভাব পুঁথিতে গৃহীত হয় নাই তাহা আপাততঃ এইবার প্রকাশ করিলাম না। ইহাতে একটি কি দুইটি পদ ছাড়া সব পদ ও গানই কোনো না কোনো পুঁথিতে আছে তবে আকার ও সন্নিবেশের কিছু পার্থক্য থাকিতে পারে। হয়তো ইহার একটি শ্লোক কি দুইটি শ্লোক পুঁথির মধ্যে ৫।৭টি শ্লোকে ছড়াইয়া আছে। ৩৭ অঙ্গ রাখিলেও আমি তাহা সাধুদের কাছে পাওয়া ছয় প্রকরণে বিভক্তভাবেই রাখিয়াছি। অনেক বহুমূল্য ও চমৎকার পদও কোনও কোনও পুঁথিতে এখনও দেখি নাই বলিয়া এই গ্রন্থে বাদ দিলাম। প্রয়োজন বোধ করিলে পরে সে সব প্রকাশ করা যাইবে।

আবুপর্ব্বত-প্রদেশ ও কাঠিয়াওয়াড়ে প্রাপ্ত পদগুলির মধ্যে গুজরাতী শব্দের প্রাচুর্য্য আছে। রাজপুতানায় সাধুদের কাছে পাওয়া পদে রাজপুতানী শব্দ ও কাশী প্রভৃতি অঞ্চলের সাধুদের কাছে পাওয়া পদে পূরবিয়া শব্দ বেশী মেলে। পুঁথিতেও এই সব রকম ভিন্নতাই দেখা যায়। স্বর্গীয় সুধাকর দ্বিবেদী মহাশয় (নাগরী প্রচারিণী সভার গ্রন্থমালার চতুর্দ্দশ খণ্ডে) তাঁহার সংগ্রহেও এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের পদের কথা স্বীকার করিয়াছেন ও প্রকাশ করিয়াছেন।

কাশী ও রাজপুতানা অঞ্চলের বহু মঠেই দাদূর নানা পুঁথি রক্ষিত আছে নানা স্থানে ভক্তেরাও অনেক পুঁথি রক্ষা করিতেছেন। রাজপুতানার নারায়ণা (নিরাণা) গ্রামের মঠে, জয়পুরের আমের ও সম্বরের দাদূদ্বারায়, শীকরে (শেখাবাটী), জয়পুর উদয়পুরে (শেখাবাটী), ফতেপুর অর্থাৎ শেখাবাটীতে, আন্ধীতে (শেখাবাটী), সাঙ্গানেরে, বুসেরা গ্রামে, ডিডবানা গ্রামে, রনীলা গ্রামে, যোধপুরের অন্তর্গত গুলর গ্রামে, পাতিয়ালার অন্তর্গত রতিয়া গ্রামে, খণ্ডেলায়, কোটাতে, জয়পুরে ও আজমীরে ও আরও বহু স্থানে ভক্তদের কাছে দাদূর সম্বন্ধীয় নানা গ্রন্থ আছে।

সাধনার সুবিধার জন্য এক ভাবলক্ষ্যে অনুপ্রাণিত নানা মতের সাধকদের বাণী সংগৃহীত হইলে সুবিধা হইবার কথা। ইহাতে সুন্দর একটি উদারতা থাকা বাঞ্ছনীয়। ভারতে ভক্তগণের মধ্যে বহু প্রাচীন কাল হইতে নানা রকম ভক্তি ও প্রেম পদের সংগ্রহ আছে। কিন্তু সে সব বাণী প্রায়ই দেখা যায় তাঁহাদের নিজেদের সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ভক্তগণেরই রচিত। ভিন্ন

সম্প্রদায়ের ভক্তগণের বাণী সংগ্রহে যে সাহস ও মনের উদারতা থাকা দরকার তাহা সচরাচর তখন দেখা যাইত না। এই হিসাবে দাদূ ও তাঁহার ভক্তগণ ভারতের সাধনায় একটি সুন্দর প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। শিখদের গ্রন্থসাহেবের কথা সবাই জানেন। ইহাতে তাঁহাদের নিজেদের বাণী ও পূর্ব্ববর্ত্তী নানা সম্প্রদায়ের ভক্তদের পদ রক্ষিত আছে। ভক্তরা বলেন নানকপন্থীদের গ্রন্থসাহেবের সংগ্রহের পূর্ব্বেই দাদূ তাঁর প্রধান দুই শিষ্যকে নানা ভক্তের পদ সংগ্রহ করিয়া সাধনার একটি সার্ব্বভৌম সংগ্রহগ্রন্থ রচনা করিতে আদেশ দেন। তদনুসারে হিন্দুবংশীয় সাধক জগন্নাথজী তাঁর অপূর্ব্ব সংগ্রহ "গুণগঞ্জনামা" সংগ্রহ করেন এবং মুসলমানবংশীয় সাধক রজ্জব তাঁহার "সর্ব্বাঙ্গী" সংগ্রহ করেন। গুণাগঞ্জনামায় ৫৫৯১টি দোহা ও চৌপাই আছে ৮০০০। সর্ব্বাঙ্গী অতি অপরূপ গভীর আধ্যাত্মিক বাণীর সংগ্রহগ্রন্থ। এই দুই সংগ্রহে ইহাঁদের উদারতা, মরমের গভীরতা ও রসগ্রাহিতা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। এই দুইটি সংগ্রহই সম্পূর্ণ হয় দাদূ জীবিত থাকিতে। দাদূ উভয় সংগ্রহেরই রসাস্বাদনে পরিতৃপ্ত হন। দাদূর মৃত্যুকাল ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দ। কাজেই অন্ততঃ ১৬০.. খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বেই এই সংগ্রহ দুইটি হওয়ার কথা। গুরু অর্জ্জুন ১৬০৪খ্রীষ্টাব্দে প্রথম গ্রন্থসাহেব সংগ্রহ করেন। হয়তো এই সংগ্রহের ভাব তাঁহারা নিজেরাই পাইয়াছিলেন তবু তাঁরা দাদূর পরবর্ত্তী। সংস্কৃত সাহিত্যে সুভাষিত সংগ্রহ নানাবিধ আছে; ভক্তদের পদ সংগ্রহও আছে—কিন্তু নানা সম্প্রদায়ের পদসংগ্রহপ্রথাপ্রবর্ত্তনবিষয়ে দাদূর কিছু বিশিষ্টতা আছে।

পরে দাদূপন্থী সংগ্রহে আরও নানাবিধ পদ আরও নানাভাবের সাধকদের কাছে উদারভাবে গৃহীত হইয়াছে। এই সংগ্রহের কাজ পরবর্ত্তী সাধকরাও করিয়াছেন।

আজমীরের শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রসাদ ত্রিপাঠীর এইরূপ দুইটি পঁচিশ সের ওজনের এন্‌সাইক্লোপিডিয়া রকমের সংগ্রহ গ্রন্থ আছে। তাতে দাদূপন্থী সাধুদের কৃত নানাভাবের পদের সংগ্রহ আছে। এই দুইখানি গ্রন্থে ১২৩ জন ভক্তের বাণী সংগৃহীত। এই সংগ্রহও দেখিয়াছি। দাদূ ভক্তরা এইরূপ বহু সংগ্রহ তাঁহাদের বহু সাধনার স্থলে যত্ন করিয়া রাখিয়াছেন।

ভারতের সাধনার পরিচয় ও ইতিহাস জানিতে হইলে সেগুলির দ্বারা বহু উপকার সাধিত হইবে। সুযোগ পাইলে ভবিষ্যতে সে সব সংগ্রহের কিছু পরিচয় দিবার ইচ্ছা আছে। দাদূপন্থী ভক্তগণের বাণীসংগ্রহগ্রন্থে সর্ব্বাপেক্ষা বেশি বাণী দাদূজীরই থাকার কথা। তারপরই দেখা যায় বিস্তর কবীরজীর বাণী। তাহা ছাড়া নামদেব, রবিদাস ও হরদাসজীর বাণী। এই পাঁচ ভক্তের বাণীর সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা বেশি। তারপর রামানন্দ, পীপা, নরসী মেহ্‌তা, সুরদাস, মৎস্যেন্দ্রনাথ, গোরখনাথ, ভরথরী, চর্পটনাথ, হালিপাব (হাড়ি ফা), গোপীচন্দ, শেখ বাহাউদ্দীন, গুরু নানক, শেখ ফরীদ, সাধক কমালের পদ থাকে।

জয়পুরে এক অতি বৃদ্ধ সাধুর কাছে একবার একখানি দাদূপন্থী ভক্তবাণী সংগ্রহ দেখিয়াছিলাম। তাঁহার শিষ্য বিরমগামবাসী শঙ্করদাসজীর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। তাই গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত দেখিবার সুবিধা হইয়াছিল। গ্রন্থখানি ১৭৬৬ সংবতে (১৭০৯ খ্রীষ্টাব্দে) লিখিত। বৈশাখ মাসের কৃষ্ণা একাদশীতে গ্রন্থলেখন সমাপ্ত হয়। বাবা ঈশ্বরদাস তাঁহার শিষ্য বৈরাগী সন্তা দ্বারা ইহা লেখান। কুতব খাঁর মড়ীতে বাবা গোকুলদাসের কুটীরে গ্রন্থখানি লেখা হয়। এই গ্রন্থখানি আরও প্রাচীন একখানি গ্রন্থ দেখিয়া লিখিত। শুনিয়াছি পুরাতন একখানি এই রকম সংগ্রহ গ্রন্থ আছে জয়পুর জোহরী বাজারে কল্যাণদাসজী ভাণ্ডারীর বাড়ী, রাধামোহন লালজীর কাছে।

যাহা হউক আমার দেখা সেই বৃদ্ধ সাধুর সংগ্রহগ্রন্থখানিতে দাদূজী ও কবীরজী ছাড়া নামদেবজী, রৈদাসজী, হরদাসজী, নানকজী, কান্‌হাজী গরীবদাসজী, বনওয়ারীজী, রামানন্দজী, পীপাজী, পরসজী, ছীতমজী, বহবলজী, রহবাজী, কাজী কাদমজী, শেখ ফরীদজী, কাজী মহমুদজী, (দরবেশ নামে খ্যাত), সেখ বহাবদজী, তিলোচনজী, সোমজী, চতুর্ভুজজী, নরসীজী, ভীবজী, বছনাগরজী, খিসাজী, বেণীজী, সিবশ্রমজী, বিজলজী, গোবিন্দদাসজী, (১) নরসিংহদাসজী, মুকুন্দভারতীজী, সন্তদাসজী, বিদ্যাদাসজী, নেতজী, সারীজী, বাল্মীকজী, অংগদজী, ভুবনজী, সীহাজি, শ্রীরঙ্গজী, দীবাজী, ঘাটমদাসজী, চন্দনদাসজী, গোবিন্দদাসজী (২), রংগজী, ব্যাসজী, কীলহজী, নাভাজী, পরমানন্দজী, সুরদাসজী, শঙ্করজী, গোরখজী, বখনাজী, জনগোপালজী,

চৈনজী, টীলাজি, সাধুজী, পূরণজী, দূজনজী, জগজীবনদাসজী, জৈমলজী, রজ্জবজী, ঘরসীজী, সুন্দরদাসজী প্রভৃতি ভক্তের পদ আছে। দেখা যাইতেছে ইহাদের মধ্যে অনেকে মুসলমান বংশে জাত ভক্ত।

ইহাতে দেখা যায় কবীরের বাণীর ৫৮ অঙ্গে ভাগ করা সংগ্রহ তাঁহারা ব্যবহার করিয়াছেন। গোরখনাথজীর কয়েকখানি গ্রন্থের পরিচয়ও ইহাতে পাই যথা—পন্দ্রহতিথি গ্রন্থ, নির্ভয়বোধ গ্রন্থ, প্রাণসংগলী গ্রন্থ* মিথ্যাদর্শন যোগগ্রন্থ, অনভয়মাত্রবোধ গ্রন্থ, মচ্ছন্দরগোরখবোধ সংবাদ, আত্মবোধ যোগগ্রন্থ, রোমাবলী গ্রন্থ, জ্ঞানবতীক সারিকবোধ ইত্যাদি। গোরখনাথের যোগেশ্বরী সব্দী এক গ্রন্থ দেখি। নবনাথ ও তাঁহাদের পদও পাই। তাহাতে কিছু গৌড়ীয় নাথপদও আছে যথা—"অদেখ দেখিবা, দেখি বিচারিবা, আক্লষ্ট রাখিবা বাচিয়া … … পাতাল গঙ্গা স্বর্গে চঢ়াইবা"—ইত্যাদি পদের কথা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে।

নাভাজীরচিত ভক্তমালে অনেক উদার ভক্ত সাধকদের নামও গৃহীত হয় নাই। সেই অভাব অনেক ভাবে দূর হইয়াছে দাদূ সম্প্রদায়ী ভক্ত রাঘবদাসজীর রচিত ভক্তমালে। ইহাতে পৌনে দুইশত ভক্তের চরিত সংগৃহীত আছে। এই চরিতগ্রন্থে নানা সম্প্রদায়ের ভক্তগণেরই বিবরণ পাই। ইহাতে দেখিতে পাই ভারতের নানাবিধ সাধনার সঙ্গেই দাদূপন্থীদের যোগ আছে।

(১) ৩১ জন সম্প্রদায়ের বহির্ভূত ভক্তের কথা।

(২) চতুঃসম্প্রদায়ী ভক্তদের মধ্যে

(ক) রামানুজ সম্প্রদায়ের ২০ জন ভক্তের কথা।

(খ) বিষ্ণু স্বামী সম্প্রদায়ের ৬ জন ভক্তের কথা।

(গ) মধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ের ১৫ জন ভক্তের কথা।

(ঘ) নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের ৬ জন ভক্তের কথা।

(৩) দ্বাদশ পন্থ মধ্যে

(ক) ষড়্দর্শন বাদী সন্ন্যাসী, যোগী, জঙ্গম, জৈন, বৌদ্ধ, সুফী।

(খ) নিরঞ্জনপন্থী, কবীর পন্থী, নানক পন্থী, দাদূপন্থী—চতুঃপন্থী ভক্তের কথা।

---

* নানকজী নামেও একখানি প্রাণসংগলী গ্রন্থ প্রখ্যাত আছে।

দাদূ নিজেই সুমিরণ অঙ্গে অনেকভাবের অনেক ভক্তের নাম করিয়া গিয়াছেন। যথা—নারদ, প্রহ্লাদ, শিব, কবীর, নামদেব, শুকদেব, পীপা, রবিদাস, গোরখ, ভর্ত্তৃহরি, অনন্ত সিদ্ধাগণ, গোপীচন্দ, দত্তাত্রেয় (সুমিরণ অঙ্গ—১১০-১১৪); (দ্রষ্টব্য শব্দ ৫৮, ৫১ প্রভৃতি)।

তাহা ছাড়া তিনি নানা মতবাদীরও নাম করিয়াছেন, যথা—জোগী, জঙ্গম, জৈন ও শৈব সেবড়া সন্ন্যাসী, বৌদ্ধ, সন্ন্যাসী, ষড্‌দর্শনবাদী, সেখ, মুসার অনুবর্ত্তী অর্থাৎ ইহুদী, ঔলিয়া, পৈগম্বর বাদী ও পীরবাদী প্রভৃতি (ভেষ কো অংঙ্গ, ৩২, ৩৩)।

দাদূ নাম না করিলেও তাঁর পূর্ব্বগুরু কবীর যে সব নাম করিয়াছেন তার মধ্যে জয়দেবের নাম উল্লেখ যোগ্য (দ্রষ্টব্য কবীর, নাগরী প্রচারিণী সভা, পরিশিষ্ট পদ ১১৩, ২০৮)। গ্রন্থ সাহেবেও জয়দেবের নাম শ্রদ্ধার সহিত উল্লিখিত। সেখানে তাঁর যে বাণী উদ্ধৃত আছে তাহাতে আমরা জয়দেবের যে বাণী গীতগোবিন্দে দেখি তাহা হইতে একেবারে বিভিন্ন রকমের বাণীর পরিচয় পাই। জয়দেবের সেই দিকের পরিচয় পাইয়াই কবীর, নানক, রজ্জব, সুন্দরদাস প্রভৃতি ভক্তগণ বারবার তাঁহার নাম স্মরণ করিয়াছেন।

পূর্ব্বে উল্লিখিত বৃদ্ধ সাধুর কাছে দেখা ১৭০৯ খ্রীষ্টাব্দের লিখিত পুঁথীখানিতে রামানন্দের তিনটি পদ পাই। তার মধ্যে একটি পদ গ্রন্থসাহেবের সংগ্রহেও আছে। ইহাতে রামানন্দের সব মতের ও কথারই আভাস একস্থানে সংহতভাবে দেখিতে পাই। এমন কি সহজ শূন্যের কথাও পাই। "এই জীবনের মধ্যেই সব পাইয়াছি, বাহিরে আর যাওয়া কেন? চিত্ত তো বাহিরে চায় না যাইতে। বাহিরে শুধু জল আর পাষাণ অথচ ভগবান তো সর্ব্বত্র আছেন পূর্ণ করিয়া। পূজার জন্য ব্যাকুল হইয়া চুয়া চন্দন লইয়া মন চলিয়াছিল পূজা করিতে; গুরু দেখাইলেন, যাহাকে পূজা করিবে তিনি যে অন্তরেরই মধ্যে। এক ব্রহ্মের মধ্যেই রামানন্দের চলিয়াছে বিলাস। গুরুর এক শব্দে কোটি কর্ম্মবন্ধন যায় কাটিয়া। সহজ শূন্যের মধ্যে নিত্য বসন্ত, এখন আর এই জীবন অন্যত্র চায় না যাইতে।" ইত্যাদি।

রামানন্দেরই প্রবর্ত্তিত ছিল পূর্ব্বে নাগা সম্প্রদায়। পরে দাদূর শিষ্যগণের মধ্যেও নাগা খালসা প্রভৃতি নানা বিভাগ স্থাপিত হইল। দাদূর মৃত্যুর পর

গরীবদাসজী প্রধান হন। তাঁর চালনাতে শৈথিল্য দেখায় বাহির হইতে কিছু তিরস্কার আসে তাই মস্কীনদাসজী প্রধান হন। তার পর দুই একজন নেতার পর ফকিরদাসজী নেতা হন। ইনিও মুসলমান বংশে জাত। দাদূর মৃত্যুর পর একশত বৎসর পর্য্যন্ত হিন্দু মুসলমান যিনি যোগ্য হইতেন তিনিই গদীতে বসিতেন। তারপর ক্রমশঃ এই সঙ্ঘ হিন্দু ভাবাপন্ন হইয়া উঠিল। রজ্জবদাসজীর গদীতে তারপরও হিন্দুমুসলমান নির্ব্বিশেষে যোগ্যতমেরাই নেতা হইয়া চালনা করিয়া আসিতেছেন। আজ পর্য্যন্ত দাদূপন্থীদের মধ্যে পৌত্তলিকতা চলিতে পারে নাই। একবার উত্তরাঢ়ী শাখার ভক্তগণ সেইরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু নাগাগণের ভীষণ বাধাতে তাহা সফল হয় নাই।

দাদূর মৃত্যুর পর প্রায় শ'খানেক বৎসর কোনো ভেদ হয় নাই। তারপর ভক্ত জেতরামের সময় খালসা, নাগা, বিরক্ত প্রভৃতি নানা ভাগ হইয়া যায়।

সকলে মিলিয়া যাঁহাকে যোগ্যতম মনে করেন তিনিই মহন্ত হন। পূর্ব্ববর্ত্তী মহন্তের কাহাকেও নির্ব্বাচিত করিয়া যাওয়া নিয়ম নহে। মহন্ত পদের জন্য কোনো শিষ্য বিশেষকে নিয়োগপত্র দিয়া যাওয়া বিধিবিরুদ্ধ। নারায়ণার মহন্ত তাঁহার শিষ্য কানাজিকে এমন একখানি লিপি দিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে সকলের কাছে পরে ক্ষমা চাহিতে হয়।

ইঁহাদের মধ্যে এখনো নানাস্থানে নানাভাবের সাধুদের বড় বড় সমাগম হয়। ফাল্গুন অমাবস্যাতে ফুলেরার কাছে "ডুংগর ভরাণা"তে চারিদিন খুব বড় সাধুসঙ্গম হয় তারপর নারাণাতে আটদিন মেলা বসে। তারপর দাদূর তপঃক্ষেত্র সাম্ভরে বড় মেলা হয়। তাহা ছাড়া আরও অনেক মেলা ভক্তসমাগম উৎসবাদি ইঁহাদের আছে।

উপক্রমণিকা পরিশিষ্ট

(শূন্য ও সহজ)

দাদূর শূন্যবাদ দেখিলেই কবীর ও রজ্জবের মত বুঝা যায়, তাই কবীর রজ্জবের শূন্যবাদ বাহুল্যভয়ে এখানে দেওয়া হইল না।

মধ্যযুগে যে ভাবে আমরা শূন্যবাদকে পাই ঠিক সে ভাবে না পাইলেও শূন্যবাদ আমাদের দেশে অতি প্রাচীন কাল হইতেই নানা আকারে চলিয়া আসিতেছে। বেদের নাসদাসীয় প্রভৃতি সূক্তে অথর্ব্বের নানা স্থানে উপনিষদের নেতিনেতিমুখে ব্রহ্মবস্তু বুঝাইবার চেষ্টায় ইহার প্রথম প্রকাশ আমাদের কাছে ধরা পড়ে। বুদ্ধদেবের অনাত্মবাদের ও নির্ব্বাণবাদের ব্যাখ্যায় বিষয়টা আরও একটু খোলসা হইল। অশ্বঘোষ, নাগার্জ্জুন, আর্য্যদেব, অসঙ্গ বসুবন্ধু প্রভৃতি মহাপুরুষেরা কথাটা আরও একটু পরিষ্কার করিলেন। মহাযান সাধনায় শূন্য তত্ত্বটি ক্রমশঃ নানা ভাবে সুখে ও ঐশ্বর্য্যে ভরিয়া উঠিতে লাগিল। ক্রমে মাধ্যমিক মতবাদে বুদ্ধ, ধর্ম্ম, ঈশ্বর সবাই শূন্য হইয়া উঠিলেন। বজ্রযান যোগাচার প্রভৃতি মতবাদীদের কৃপায় শূন্যই ক্রমে হইয়া দাঁড়াইল বিশ্বের মূলতত্ত্ব। শূন্য ছাড়া বিশ্ব জগৎ দেব দেবী প্রভৃতি কিছুই কিছু নয়, সবই মায়া।

এই শূন্যই ক্রমে অলখ নিরঞ্জন হইয়া নাথপন্থ নিরঞ্জনপন্থ প্রভৃতিদের মধ্যে স্থান পাইল। গোরখনাথ প্রভৃতি যোগীদের মতবাদেও ইহা বেশ স্থান জমাইয়া বসিল। অওঘড় প্রভৃতি বারপন্থীদের মধ্যেও শূন্যবাদের গৌরবময় স্থান। চৌরাশী সিদ্ধাদের উপদেশে শূন্য একটি খুব বড় কথা। বাংলায় ক্রমে ক্রমে এই শূন্যবাদ ধর্ম্মপূজা প্রভৃতিতে নানাভাবে জাঁকিয়া উঠিল। ধর্ম্মপূজা বিধান, ধর্ম্মমঙ্গল, শূন্যপুরাণ প্রভৃতি বাংলার নানা গ্রন্থে শূন্য আরও সুপ্রতিষ্ঠিত। উড়িষ্যার নিরঞ্জন পন্থে, মহিমাপন্থে, ধর্ম্মপূজকদের মধ্যে এমন কি বলরাম দাস প্রভৃতি ভাগবতদের মধ্যেও শূন্যবাদের খুবই পসার।

মধ্যযুগের ভক্ত দাদূর বাণীর মধ্যে যে শূন্যবাদ আছে, তাহা লইয়াই এই প্রসঙ্গ। এখানে শূন্যবাদের আরও সব প্রাচীন পরিচয়ের অবকাশ নাই। আর তা ছাড়া অনেক পণ্ডিতজনের দৃষ্টি সে সব ক্ষেত্রে পতিত হইয়াছে, কাজও আরম্ভ হইয়াছে, কিছু লেখাও হইয়াছে, আরও হইবে। তবে বাংলার যোগীদের গানে ও সাহিত্যে ও নাথপন্থীদের গ্রন্থাদিতে ও আউল বাউল দরবেশদের বাণী আলোচনা করিলে সহজ ও শূন্যবাদের অনেক চমৎকার জিনিষের পরিচয় মিলিবে যদিও এখানে তাহার আলোচনার স্থান নাই।

বৈদিক বৌদ্ধ প্রভৃতি মতের শূন্যবাদ হইতে মধ্যযুগের শূন্যবাদ ভিন্ন রকমের। কবীর দাদূ প্রভৃতির শূন্যবাদ আলোচনা করিলেই তাহা ধরা পড়ে। দাদূর শূন্য সহজ বুঝিলেই কতকটা সেই যুগের শূন্যবাদের পরিচয় পাওয়া যায়। দাদূর কথা বুঝাইতে গিয়া তাঁর শিষ্য দুই একজনের মত আলোচনা করিলে সুবিধা হইতে পারে। তাঁহার শিষ্যও অনেক। তাঁহাদের সকলের মত আলোচনা করা এখানে অসম্ভব।

গুরু ও সাধু প্রকরণে সহজশূন্যের সাধারণ ভাবে একটু পরিচয় দিবার চেষ্টা করা গিয়াছে। জীবনের প্রকাশের জন্য একটি মুক্ত অবকাশ চাই। জীবনাধার পরব্রহ্ম তাই আপনাকে মুক্ত অবকাশ শূন্যরূপ করিয়াছেন, তাহাই সহজ। গুরুকেও সেইভাবের অনুবর্ত্তন করিতে হইবে। তাই মধ্যযুগে ভক্তরা যাহাকে শূন্যতত্ত্ব বলিয়াছেন তাহা একটা নাস্তিধর্ম্মাত্মক বস্তুমাত্র নয়। "পরম-অস্তিকে" বুঝাইতে গিয়া মাঝে মাঝে "নেতি-নেতির" দ্বারা বুঝাইতে হয়। এই 'শূন্য' তাহা নহে। আর 'নাই' বস্তুর উপর কি কোনো সত্য সাধনা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে? দাদূ প্রভৃতি সাধকরা একেবারে পরম 'আস্তিক'। ঐরূপ 'নাইবস্তু'কে তাঁহারা আমলই দেন নাই। তাঁহারা যাহাকে 'শূন্য' বলিয়াছেন তাহা মোটেই "নাই"তত্ত্ব নহে। তাই দাদূ বলিলেন,—'কিছু' নাই বস্তুর আবার নাম কি? তাহা ধরিতে গেলেই হইবে ঝুঠা।"

(সাচ অঙ্গ, ১৫৫)

কুছ্ নাহীঁকা নাঁৱ ক্যা জে ধরিয়ে সো ঝুঠ।

তাই দাদূ বলিলেন—"সেই 'কিছুনা'র নাম ধরিয়াই ভ্রমিয়া মরিতেছে সব

সংসার। সাচাই বা কি ঝুঠাই বা কি তাহাও বোঝে না, আর না কিছু করে বিচার।”

কুছ নাহীঁকা নাঁব্র ধরি ভরম্যাঁ সব সংসার।
সাচ ঝূঠ সমঝৈ নহী, না কুছ কিয়া বিচার॥

(সাচ কৌ অঙ্গ, ১৪৬)

একদিকে “নাই বস্তু” যেমন ঝুঠা, তাহার উপর কোনো সাধনা ও সত্যভাবের প্রতিষ্ঠাই হইতে পারে না, তেমনি স্থূল-বস্তুকেও যদি তাহার বিশেষ বিশেষ আকারেই একান্ত সত্য বলিয়া জানি তাহা হইলে হইবে আরও ঝুঠা। এই বাহ্য স্থূল আকারের অতীত এক সূক্ষ্ম নিরাকার সত্যলোক আছে, তাহা সহজ, তাহা সত্য, তাহাই একান্ত নির্ভরযোগ্য। তাই দাদূ বলেন—“সবাই শুধু দেখে স্থূলকে, সবাই দেখে যে এই বস্তুর এই আকার। সেই সূক্ষ্ম সহজকে ত কেহই দেখে না যাহা নিরাকার নিরাধার।” আকারের অতীত তাহাই সহজ শূন্য লোক।

দাদূ সব দেখৈঁ অস্থূল কৌ, যহু ঐসা আকার।
সূখিম সহজ ন সূঝঈ নিরাকার নির্ধার॥

(ভেষ কৌ অঙ্গ, ৩৬)

এই সহজ শূন্য লোকে প্রবেশের বাধা হইল কাম। কামনাকে যে জয় করিতে পারে সে-ই সর্ব্বত্র সহজলোকে প্রবেশ করিতে পারে। শূন্যের সমাধিলোকে তাহারই গতি। সকলের সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্য ও আনন্দের মধ্যে তাহার অবারিত সহজ প্রবেশ, যে অবস্থাকে শ্রুতি বলিয়াছেন “সর্ব্বমেবাবিবেশ” (প্রশ্ন উ, ৪, ১১), অর্থাৎ তখন পরমাত্মার সাক্ষাৎ-প্রাপ্ত সাধক সকলের মধ্যেই প্রবেশ করেন। ছান্দোগ্য বলেন এমন সাধকের সকল লোক প্রাপ্ত হয়, সকল কামনা সিদ্ধ হয়—“স সর্ব্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ কামান্” (ছা, ৮, ৭, ১)। দাদূও তাই বলিয়াছেন,—“যে কামকে দহে, সহজের মধ্যে রহে, আর শূন্যের ধ্যানের মধ্যে প্রবেশ করে, হে দাদূ, সে সকলের সব কিছুই প্রাপ্ত হয়, আর কখনও সে হারে না।”

কাঁম দহৈ, সহজৈঁ রহৈ অরু সূঁন্য বিচারৈ।
দাদূ সো সবকী লহৈ, অরু কবহূঁ ন হারৈ॥
(দাদূ, রাগ বিলাৱল, পদ ৩৪৯)

এখানে 'বিচার' বাংলা অর্থে গ্রহণ করিলে চলিবে না। মধ্যযুগে ভক্তরা বিচার অর্থে জ্ঞান, ধ্যান, সমাধি, যোগ প্রভৃতি বুঝিয়াছেন।

যে শূন্যভাবের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সাধক সহজ হইবেন, সর্ব্বত্র অবারিত প্রবেশ-অধিকার লাভ করিবেন, সেই শূন্যভাবের একটু পরিচয় না পাইলে কথাটা বুঝা যাইবে না। তাই শূন্যের একটু পরিচয় দেওয়া দরকার। দাদূর বাণী হইতেই সেই পরিচয়টা দেয়ওা যাউক। "সর্ব্ব ঠাঁই বিরাজমান সেই সহজ শূন্য; সর্ব্বঘটে, সকলেই মধ্যে, সর্ব্বত্রই সেই নিরঞ্জন করিতেছেন বিহার; কোনো গুণই তাঁহাকে পারে না ব্যাপিতে" (পরচাকে অঙ্গ, ৫৬)। "সেই সহজ শূন্য সরোবরের তীরে আত্মা হংস মুক্তা করে চয়ন (মুক্তা অনন্তস্বরূপ তিনিই, দ্রষ্টব্য ৬৪ নং বাণী), অমৃত নির্ঝরিণীর নীর করে পান, এই আত্মা ও পরমাত্মার নিত্যযোগসঙ্গীত শোনে" (ঐ ৫৭)। "হে দাদূ, সেই সহজ শূন্য সরোবরের তীরেই সাধনীয় যত জপ তপ সংযমাদি, সেখানেই নিখিল সৃজনকর্ত্তা সম্মুখে বিরাজমান, যে প্রেমরস তিনি পান করান তাহা কর পান" (ঐ ৫৮)। "সেই সহজ শূন্য সরোবরের তীরেই সব-মন-প্রাণ মোহন সঙ্গী। সেখানে বিনা-করে বাজিতেছে বীণা, বিনা-রসনায় চলিয়াছে সঙ্গীত" (ঐ ৫৯)। "সেই সহজশূন্য সরোবরের তীরে চরণকমলে আনিলাম চিত্ত; সেখানেই আদি নিরঞ্জন প্রিয়তম, আমার সৌভাগ্য সমাগত" (ঐ ৬০)। "হে দাদূ, আত্মাই সহজ শূন্য সরোবর, হংস করে সেখানে কেলি-কল্লোল; পরিপূর্ণ সেই আনন্দসাগর, উপলব্ধি করিয়া লও মন সেই মুক্তাফল" (ঐ ৬১)। "হে দাদূ, সর্ব্বভাবে পূর্ণ সেই হরি-সরোবর। যেথায় সেথায় কর সেখানে রসপান; সকল দিকে সকল ভাবে সেই রস পান করিতেই গেল তৃষ্ণা, আত্মার হইল আনন্দ" (ঐ ৬২)। "কী পূর্ণতায় ভরপূর সেই আনন্দ সাগর! উজ্জ্বল নির্ম্মল তার নীর; হে দাদূ, সেই সাগরতীরেও বিনা পিপাসায় কেহই করে না পান" (ঐ ৬৩)।

সহজ সুঁনি সব ঠৌর হৈ, সব ঘট সবহী মাঁহী।
তহাঁ নিরঞ্জন রমি রহ্যা, কোই গুণ ব্যাপৈ নাহি॥

(পরচা, ৫৬)।

দাদূ তিস সরবরকে তীর, সো হংসা মোতী চুণৈঁ।
পীবৈঁ নীঝর নীর, সো হৈ হংসা সো সুণৈঁ॥

(পরচা, ৫৭)।

দাদূ তিস্ সরবরকে তীর, সংগী সবৈ সুহাবণৈঁ।
তহাঁ বিন কর বাজৈ বেন, জিভ্যাহীণে গাবণে॥

(পরচা, ৫৯)।

দাদূ তিস্ সরব্বরকে তীর চরণ কমল চিত লাইয়া।
তহঁ আদি নিরংজন পীব, ভাগ হমারে আইয়া॥

(পরচা, ৬০)।

দাদূ সহজ সরোবর আতমা, হংসা করৈঁ কলোল।
সুখ সাগর সূ ভর ভর্যা মুক্তাহল মন মোল॥

(পরচা, ৬১)।

দাদূ হরি সরবর পূরণ সবৈ, জিত তিত পানী পীব।
জহাঁ তহাঁ জল অচংতাঁ, গঈ তৃষা সুখ জীব॥

(পরচা, ৬২)।

সুখসাগর সূভর ভর্যা, উজ্জ্বল নির্ম্মল নীর।
প্যাস্ বিনা পীবৈ নহীঁ, দাদূ সাগর তীর॥

(পরচা, ৬৩)।

এখানে দেখিতেছি সহজশূন্যকে পরিপূর্ণ সরোবর বলিয়া দাদূ বুঝিয়াছেন। সেই সহজশূন্য সরোবরকে কোথাও "আতমা সরোবর" কোথাও "হরি সরোবর" বলিয়া তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন। 'শূন্যের' পূর্ণতার ইহা অপেক্ষা বড় সাক্ষ্য তিনি কি আর দিতে পারিতেন? ইহাতেও যদি কিছু সংশয় থাকে তবে দাদূর সহজশূন্য সম্বন্ধে আরও কয়েকটি বাণী ঐ পরচা অঙ্গ হইতেই উদ্ধৃত করা যাউক। উপরি উক্ত বাণীগুলির অব্যবহিত পরেই তিনি এই বাণীগুলি

বলিয়াছেন। ইহাতে মুক্তা প্রভৃতি কথা দ্বারা দাদূ কি বুঝাইতে চাহেন তাহাও একটু খোলসা করা হইয়াছে। টীকাকাররা শূন্য শব্দে কোথাও শান্ত নির্ব্বাণপদ, কোথাও বা লয়-লীন অবস্থা বা সমাধি বুঝাইয়াছেন।

(স্বামী দাদূ দয়ালকী বাণী, ৭০ পৃষ্ঠা, টীকা)।

“সহজ শূন্যের সরোবরে মনই হইল হংস, অনন্ত আপনিই সেখানে মুক্তা; হে দাদূ, চঞ্চু ভরিয়া ভরিয়া সেই মুক্তা চয়ন করিয়া করিয়া সন্তজন রহেন জীবিত।” (ঐ ৬৪) “সহজ শূন্য সরোবরে মনই হইল মীন, নিরঞ্জন ভগবানই সেখানে নীর; হে দাদূ, এই রসেই কর বিলাস, অনির্ব্বচনীয় সেই রস, অজ্ঞেয় তাহার রহস্য” (ঐ ৬৫)। “সহজশূন্য সরোবরে মনই হইল ভ্রমর, করতার (= কর্ত্তা) পরমেশ্বর সেখানে কমল; হে দাদূ, সেই পরিমল কর পান, অখিল-সৃজন-কর্ত্তা সেখানে তোমার সম্মুখে” (ঐ ৬৬)। “সহজের সেই শূন্য সরোবরে মনই হইল মুক্তান্বেষী ডুবারী; হে দাদূ, তাহার ভিতরে যে রামরতন তাহা সে লইবে বাছিয়া বাছিয়া” (ঐ ৬৭)। “হে দাদূ, বিমল জল সেই সরোবর-মাঝারে, হংস করে সেখানে কেলি, মুক্ত হইয়া মুক্তা সেখানে সে করে চয়ন, সেখানে হংস সকল-ভয়ের-অতীত” (ঐ ৬৮)। “অখণ্ড সেই সহজ শূন্য সরোবর, অগাধ তাহাতে জল, হংস করে তথায় অবগাহন; নির্ভয়ে সে পাইয়াছে আপন নিবাস, এখন আর সে উড়িয়া অন্য কোথাও যাইবে না।” (ঐ ৬৯)।

সুন্য সরোৱর হংস মন, মোতী আপ অনংত।
দাদূ চুগি চুগি চংচ ভরি, য়োঁ জন জীৱেঁ সংত॥

(পরচা কো অংগ, ৬৪)।

সূন্য সরোৱর মীন মন, নীর নিরঞ্জন দেৱ।
দাদূ যহু রস বিলসিয়ে, ঐসা অলখ অভেৱ॥

(পরচা কো অঙ্গ, ৬৫)।

সূন্য সরোবর মন ভৱঁর, তহাঁ কৱঁল করতার।
দাদূ পরিমল পীজিয়ে, সনমুখ সিরজনহার॥

(পরচা কো অঙ্গ, ৬৬)।

সূন্য সরোৱর সহজকা, তহঁা মরজীৱা মন।
দাদূ চুণি চুণি লেইগা, ভীতরি রাম রতন ॥

(পরচা কো অঙ্গ, ৬৭)।

দাদূ মংঝি সরোৱর বিমল জল, হংসা কেলি করঁাহি।
মুকুতাহল মুকতা চুগৈং, তিহিঁ হংসা ডর নাঁহি ॥

(পরচা কো অঙ্গ, ৬৮)।

অখংড সরোৱর অথগ জল, হংসা সরৱর ন্হাঁহি।
নির্ভয় পায়া আপ ঘর, ইব উড়ি অনত ন জাঁহি ॥

(পরচা কো অংগ, ৬৯।

দাদূ প্রভৃতি মহাপুরুষেরা যুক্তি-তর্ক-ব্যবসায়ী নহেন। তাঁহাদের বাণীর মধ্যে যুক্তিতর্কের দুরূহতা কিছুই থাকিবার কথা নাই। তবু যে তাঁহাদের সব কথা সব সময় বুঝা যায় না, তাহার হেতু ইহা নহে যে তাহাতে কোন কৃত্রিম দুরূহতা সঞ্চার করা হইয়াছে। সাধনা দ্বারা তাঁহারা যে সব সত্য প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, নিরন্তর ধ্যানে তাঁহাদের কাছে যে সব সত্য সুপরিচিত, সে সব সত্য অনেক সময় আমাদের কাছে পরিচিত নহে। তাই তাঁহার সহজ শূন্য কথাটা আর একটু খোলসা করা হয় ত দরকার। কিন্তু তাহা হইলেও দাদূর বাণী দিয়াই যতটা খোলসা করা চলে তাহাই করা ভাল, তাহার বাহিরে যাওয়া চলিবে না। তাঁহার "প্রশ্নোত্তরী"গুলি হয় ত এ বিষয়ে অনেকটা সহায়তা করিতে পারে।

দাদূর প্রশ্নোত্তরী দেখিতেছি—"বিনা চরণের এই পথ, কেমন করিয়া পৌঁছে তবে প্রাণ?"

দাদূ বিন পায়ন কা পংথ হৈ,
কৈঁ্যা করি পঁহুচৈ প্রাণ ॥

(লৈ কৌ অংগ, ১০)।

উত্তর—"মন চড়ে চৈতন্য ঘোড়ায়, লয়কে করে লাগাম, গুরুর সবদ (সঙ্গীত) হইল চাবুক, পৌঁছে যদি কেহ সাধক সুজন।"

মন তাজী চেতন চঢ়ৈ ল্যো কী করে লগাম।
সবদ গুরুকা তাজণাঁ, কোই পহুচৈঁ সাধ সুজান ॥

(লৈ অংগ, ১১)।

"কোন পথে যে আসে আর কোন পথে যায়, হে দাদূ, যতই কেন না চেষ্টা করুক, কেহই তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না।" "শূন্যপথেই আসে আর শূন্যপথেই যায়, চৈতন্যই হইল সুরতির পথ, হে দাদূ, লয়ের মধ্যে থাক ডুবিয়া।" "হে দাদূ, পরব্রহ্ম দিলেন পথ, সহজ সুরতি লয় হইল সার; সেই পথের মধ্যেই হইল মনের ঘর, সৃজনকর্ত্তা হইলেন এই পথে সঙ্গী।"

কিঁহিঁ মারগ হ্ৱৈ আইয়া, কিঁহিঁ মারগ হ্ৱৈ জাই।
দাদূ কোঈ নাঁ লহৈ, কেতে করৈঁ উপাই ॥

(লৈ কৌ অংগ, ১২)।

সূন্যহি মারগ আইয়া, সূন্যহি মারগ জাই।
চেতন পৈঁডা সুরতি কা, দাদূ রহু ল্যো লাই ॥

(লৈ কৌ অংগ, ১৩)।

দাদূ পারব্রহ্ম পৈঁডা দিয়া সহজ সুরতি লৈ সার।
মন কা মারগ মাঁহি ঘর, সংগী সিরজন হার ॥

(লৈ কৌ অংগ ১৪)।

এখন দেখিতেছি শূন্যই সাধনার পথ, আবার চৈতন্য সহজ সুরতি লয়ও পথ। কাজেই শূন্যের কতকটা পরিচয় পাওয়া গেল। এই লয় অঙ্গেই দাদূর বাণী দেখি, "একদিকে যোগ সমাধি, অন্যদিকে আনন্দ সুরতি। ইহার মধ্যপথেই সহজে সহজে আইস চলিয়া। এই দুয়ের মধ্যপথ দিয়াই সাধন মহলের দ্বার মুক্ত, এই ত ভক্তির ভাব। এই দুয়ের মধ্যে যে সহজ শূন্য সেখানে রাখ মন; সেখানে লয় সমাধির রস কর পান, সেখানে কাল ভয় নাহি।"

জোগ সমাধি সুখ সুরতি সৌঁ, সহজৈঁ সহজৈঁ আৱ।
মুক্তা দ্বারা মহল কা, ইহৈ ভগতি কা ভাৱ ॥

(লৈ অংগ, ৮)।

সহজ সুঁনি মন রাখিয়ে, ইন দূন্যূঁ কে মাঁহিঁ ।
লৈ সমাধি রস পীজিয়ে, তহঁা কাল ভৈ নাঁহি ॥

(লৈ অংগ, ৯) ।

এখানে দেখা যাইতেছে যোগ সমাধি ও সহজ সুরতির মাঝে হইল সহজ শূন্য। টীকাকার এখানে বলেন সহজ শূন্যের একদিকে সমাধি যোগ, অন্যদিকে ভক্তিযোগ (দ্রঃ, স্বামী দাদূ দয়ালকী বাণী, ত্রিপাঠী, পৃঃ ১২২ নোট)। 'সহজ শূন্য' সেই উদার মহাসত্য যাহা দুই বিচ্ছিন্ন কোটিকে ভাবযোগে ঐক্যদান করে। এ কথা দাদূ "মধ্য" অঙ্গে বার বার বলিয়াছেন। "দুই পক্ষের দ্বৈত ভাব অপগত হয় যাহাতে তাহাই সহজ, তাহাতে সুখ দুঃখের ভেদ হয় বিদূরিত, জীবন মরণের বিরুদ্ধতা দূর হয় সেই সহজে। তাহাই পরিপূর্ণ নির্ব্বাণপদ।" যে দ্বৈত মিটাইতে হইবে সে দ্বৈত কিসের দ্বৈত ? দাদূর বাণী হইতেই তাহার উদ্দেশ মিলিবে। সুখ দুঃখ, জীবন মরণ এই সবই দ্বৈতবুদ্ধি।

দাদূ দ্বৈ পখ রহিতা সহজ সো, সুখ দুঃখ এক সমান।
মরৈ ন জীৱৈ সহজ সো, পূরা পদ নির্ব্বাণ ॥

(মধি অংগ, ২) ।

"তখনই সহজ রূপ মনের হইল যখন দ্বৈতের সব ভেদ তরঙ্গ গেল মিটিয়া।"

"সহজ রূপ মনকা ভয়া, জব দ্বৈ দ্বৈ মিটী তরংগ।"

(মধি অংগ, ৩) ।

"যখন ভগবদ্ রঙ্গে রঙ্গিয়া মন আর সুখ দুঃখ মানে না, যখন সব রকম দ্বৈত ভাব ছাড়িয়া প্রেম রসে মন হইয়া যায় মত্ত, তখনই বুঝা যাইবে সহজ ভাব।"

সুখ দুখ মনি মানৈ নহীঁ, রাম রংগ রাতা।
দাদূ দূন্যূঁ ছাঁড়ি সব, প্রেম রসি মাতা ॥

(মধ্য অংগ, ৪) ।

"যখন মন আর সুখ দুঃখ মানে না, যখন আত্ম পর 'ভায়' সমান ; সেই সমত্ব-ভাব মনে লইয়া, সর্ব্ব-পূরণ ধ্যানে পূর্ণ হইয়া কর সাধনা।"

সুখ দুখ মনি মানৈ নহীঁ আপা পর সম ভাই।
সো মন মন করি সেৱিয়ে, সব পূরণ ল্যৌ লাই ॥

(মধ্য অংগ, ৭) ।

"এমনই এই 'জ্ঞান-বিচার' যে আমি না করিব গ্রহণ. না করিব বর্জ্জন, স্বরূপ মধ্য ভাবই সদা করিব সেবা ; হে দাদূ ইহাই মুক্তি-দ্বার।"

নাঁ হম ছাড়ৈঁ নাঁ গহৈঁ ঐসা জ্ঞান বিচার।
মধি ভাই সেৱৈঁ সদা, দাদূ মুকতি দুৱার॥

(মধ্য অংগ, ৮)।

"এখানে দাদূ আবার বলিতেছেন, "সেই সহজ শূন্যের মধ্যেই রাখ তোমার মন যাহা এই দুয়েরই মাঝখানে। কাল ভয়ের অতীত সেই ধামে লয় সমাধি রস কর পান।"

সহজ সূঁনি মন রাখিয়ে, ইন দূন্যুঁকে মাহিঁ।
লৈ সমাধি রস পীজিয়ে, তহাঁ কাল ভয় নাহিঁ।

(মধ্য অংগ, ৯)।

এই বাণীই তাঁহার একবার বলা হইয়াছে লয় অঙ্গে।

"এইতো আকার লোক, ইহার অতীত সুখ লোক, সুখ লোকেরও অতীত সেই স্থান, হর্ষ শোকের অতীত সেই ধাম।"

দাদূ ইস আকার থৈঁ দূজা সুখিম লোক।
তাথৈঁ আগে ঔর হৈ, তহঁৱাঁ হরিখ ন শোক॥

(মধ্য অংগ, ১২)।

"ভয় ও 'পক্ষের' অতীত হইয়া, সব সীমা ছাড়িয়া দাদূ অসীমের মধ্যে সেই একের সঙ্গে রহে যুক্ত হইয়া, যেখানে দ্বৈত আর কিছু নাই।"

দাদূ হদ্দ ছাড়ি বেহদ্দমৈঁ, নির্ভয় নির্পখ হোই।
লাগি রহৈ উস এক সৌঁ, জহাঁ ন দূজা কোই॥

(মধ্য অংগ, ১৩)।

"মন চিত্ত মানস আত্মা তাহার মধ্যে সহজ সুরতি (ইহাকেই ৯ম বাণীতে সহজ শূন্য বলিয়াছেন) ; হে দাদূ, যেখানে ধরিত্রী অম্বর কিছুই নাই সেখানে এই পঞ্চ লও পূর্ণ করিয়া।"

মন চিত মনসা আতমা সহজ সুরতি তা মাঁহিঁ।
দাদূ পঞ্চুঁ পূরিলে, জহঁ ধরতী অংবর নাঁহিঁ॥

(মধ্য অংগ, ১৬)।

এই "সহজ স্মরতি"র স্থলে এই মধ্য অঙ্গেরই ৯ম বাণীতে দাদূ বলিয়াছেন "সহজ শূন্য।" এই শূন্য যে কত বড় পূর্ণতা তাহা বুঝি, যখন দাদূ এই পূর্ণতায় পঞ্চ ইন্দ্রিয় মন চিত্ত মানস আত্মা প্রেম সবই লইতে চান পূর্ণ করিয়া।

কবীর সদাই নাকি সহজে এই ভাবরসে ভরপূর হইয়া থাকিতেন। অন্যের পক্ষে যাহা বহু সাধনায় লভ্য তাহা তাঁহার পক্ষে ছিল একান্ত স্বাভাবিক। তাই দাদূ এখানে বলেন, "কবীরের 'অধর' (অনাধার সহজ) চাল অন্যের পক্ষে সাহস করাই চলে না।"

অধর চাল কবীরকী আসঁঘী নহিঁ জাই।

(মধ্য অংগ, ১৭)।

"এই যে কালের আক্রমণের অতীত 'অধর' একের সঙ্গে যুক্ত হইয়া নিরন্তর অবস্থিতি, ইহাই কবীরের যোগ-স্থিতি ; বিষম কঠিন এই চাল।"

দাদূ রহণী কবীরকী কঠিন বিষম য়হু চাল।
অধর একসৌ মিলি রহ্যা জহাঁ ন ঝম্পৈ কাল॥

(মধ্য অংগ, ১৮)।

সেই ধাম দাদূ বলেন "সদা একরস" (মধ্য ২৩, ২৭) ; "সহজে সমাহিত" (ঐ, ২৪) ; "অবিনাশী পূর্ণ ধাম" (ঐ, ২৫) ; "সহজ রূপ" (ঐ, ২৮) "নিরন্তর পূর্ণ" (ঐ, ২৯) ; "যেখানে নিকট নিরঞ্জন রাম" (ঐ, ৩০) ; "বেদ কোরাণের অগম্য ধাম," (ঐ, ৩২)।

দাদূ বলেন, "যেখানে সদা এক রস আমি সেই সহজ দেশেরই লোক।"

"হম্ দাদূ উস দেশকে জহঁ সদা এক রস হোই।"

(মধ্য অংগ, ২৭)।

"আমি দাদূ সেই দেশের যেখানে সহজ রূপেরই লীলা।"

"হম দাদূ উস দেশকে সহজ রূপ তা মাঁহিঁ।"

(মধ্য অংগ, ২৮)।

দাদূর বাণী অনুসারে দেখা যাইতেছে এই শূন্যঅবস্থার ও নানা স্তর আছে। "পরচা অঙ্গে" ১২৭-১৩০ নং বাণীতে দাদূর প্রশ্নোত্তরীতে দেখি দাদূ এবিষয়ে কিছু প্রশ্ন ও উত্তর করিয়াছেন। "ব্রহ্ম-শূন্য ধামে রহে কি? আত্ম-শূন্য

স্থানে রহে কি ? কায়া-শূন্য স্থানে রহে কি ?" "সদ্‌গুরু কহেন হে সুজন, কায়ার স্থলে রহে মন রাজা, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, প্রধান, পঁচিশ প্রকৃতি, তিনগুণ, অহংকার, গর্ব্ব গুমান। আত্ম-শূন্য স্থানে আছে জ্ঞান ধ্যান বিশ্বাস ; ভাব ভক্তি নিধির পাশে সহজ শীল সত সন্তোষ। ব্রহ্ম-শূন্য স্থানে আছেন ব্রহ্ম নিরঞ্জন নিরাকার, সেথায় দীপ্তি, তেজ, জ্যোতি ; দাদূ তাহা করেন প্রত্যক্ষ (পরচা অংগ , ১২৭-১৩০)।"

ব্রহ্ম সুঁনি তহঁ ক্যা রহৈ আতম কে অস্থান ?
কায়া অস্থলি ক্যা বসৈ ? সতগুর কহৈ সুজান ॥

(পরচা অংগ. ১২৭)।

কায়াকে অস্থলি রহৈঁ মন রাজা পঞ্চ প্রধান।
পচীশ প্রকীরতি তীনি গুণ গুণ, আপা গর্ব গুমান ॥

(পরচা অংগ, ১২৮)।

আতমকে অস্থান হৈঁ, জ্ঞান ধ্যান বিস্বাস।
সহজ সীল সংতোষ সত, ভাব ভগতি নিধি পাস ॥

(পরচা অংগ, ১২৯)।

ব্রহ্ম সুঁনি তহঁ ব্রহ্ম হৈ, নিরংজন নিরাকার
নূর তেজ তহঁ জোতি হৈ, দাদূ দেখন হার ॥

(পরচা অংগ, ১৩০)।

এই ১৩০নং শেষ বাণীটির দেখা পাওয়া গিয়াছে। এখানে মনে হইতেছে দাদূর মতে কায়া-শূন্য আত্ম-শূন্য ও ব্রহ্ম-শূন্য এই তিন স্থান। কিন্তু এই অঙ্গে ৫০নং বাণীতে দাদূ শূন্যের চারিটি ধামের কথা বলিয়াছেন। "প্রথম তিনটি শূন্যই হইল আকার লোকের, চতুর্থটি হইল নির্গুণ। সেই সহজ শূন্যে আমি করিতেছি বিহার, যেখানে সেখানে সব ঠাঁই সে সহজ লোক।"

দাদূ তীনি সুঁনি আকারকী চৌথী নির্গুণ নাঁৱ।
সহজ সুঁনি মৈঁ রমি রহ্যা জহাঁ তহাঁ সব ঠাঁৱ ॥

এই সহজ শূন্য দেখা যাইতেছে কোন স্থান বিশেষে আবদ্ধ লোক নয়। ইহা "জহাঁ তহাঁ সব ঠাঁৱ" যেখানে সেখানে সর্ব্বত্র বিরাজিত, ইহা একটি আধ্যাত্মিক ভাবাবস্থিতি। বাহিরের স্থান স্থিতির সঙ্গে তাহার কোনো সম্বন্ধ নাই।

এখানে দাদূ বলিতেছেন চতুর্থ শূন্য পদ হইল নির্গুণ সহজ শূন্যপদ। "কায়া শূন্য," "আত্মশূন্যে"র খবর পূর্ব্বেই পাওয়া গিয়াছে, এখন তৃতীয় শূন্য পদটি কি? এই পরচা অঙ্গেরই ৫৩নং বাণীতে তাহা "পরম শূন্য," সেখানে দাদূ বলেন, "কায়া শূন্যে" পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বাস, "আত্ম শূন্যে" প্রাণ প্রকাশ, "পরম শূন্যে" ব্রহ্মের সঙ্গে (জীবের) মেলা, তারও পরে "আত্মা একলা"।

কায়া সুঁনি পংচ কা বাসা
আতম সুঁনি প্রাণ প্রকাসা।
পরম সুঁনি ব্রহ্মসৌঁ মেলা
আগেঁ দাদূ আপ অকেলা॥
(পরচা অংগ, ৫৩)।

এখানে দাদূ বলেন প্রথমে 'কায়াশূন্য,' এখানে পঞ্চেন্দ্রিয়াদি স্থূল-শরীর লয় সমাধি। দ্বিতীয় 'আত্মশূন্য', এখানে সূক্ষ্ম-শরীর-লয় সমাধি। তৃতীয় 'পরমশূন্য' এখানে জীবের অনুভূতি। চতুর্থ 'সহজ শূন্য' বা ব্রহ্মশূন্য যেখানে যোগী পরব্রহ্মে বিলীন, ইহাই নির্ব্বাণরূপ। ১৩০ নং বাণীতে পূর্ব্বেই আমরা দেখিয়াছি—"ব্রহ্মশূন্যে নিরঞ্জন ব্রহ্মই বিরাজমান। দাদূ দেখিয়াছে সেখানে শুধু দীপ্তি, তেজ ও জ্যোতি।"

ব্রহ্ম সুঁনি তহঁ ব্রহ্ম হৈ নিরংজন নিরাকার।
নূর তেজ তহঁ জ্যোতি হৈ দাদূ দেখনহার॥
(পরচা অংগ, ১৩০)।

কবীরের ভেদবাণীতে এই সুরের উপরে সাত শূন্য ও নীচে সাত শূন্য দেখিতে পাওয়া যায়। ("কবীর সাহেব কী শব্দাবলী" বেলবেডিয়ার প্রেস, পদ ২৬)।

দাদূ বলেন পূর্ব্বে কবীর প্রভৃতি সাধকগণ এই সহজ শূন্যেই সাধনার পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছেন। পরবর্ত্তী রজ্জব, সুন্দর দাস প্রভৃতিও এই সহজ শূন্যের সাধনাকে অতি গভীর সাধনা মনে করেন। সুন্দর দাস তো বলেন "এই শূন্য ধ্যানের সমান আর ধ্যান নাই, সব ধ্যানের মধ্যে ইহাই উৎকৃষ্ট ধ্যান।"

ইহি শূন্য ধ্যান সম ঔর নাহিঁ ।
উৎকৃষ্ট ধ্যান সব ধ্যান মাহিঁ ॥

(সুন্দরদাস, জ্ঞানসমুদ্র গ্রন্থ ৮৩)।

“গুরুর প্রসাদে এই শূন্যতেই সমাধি আন।”

গুরুকে প্রসাদ শূন্য মেঁ সমাধি লাইয়ে।

(সুন্দরদাস, জ্ঞানসমুদ্র, ১২)।

এইরূপ আরও বহু আছে।

অন্যের সহজ যে ভাবেরই হউক দাদূর সহজ হইল ভগবানের প্রেমের একান্ত নির্ভর। দাদূ কহিতেছেন—

“হরিই আমার একমাত্র আশ্রয়, তিনিই আমার তারণ, তিনিই আমার তরণ। তপও আমার পথ নহে, ইন্দ্রিয় নিগ্রহও আমার নহে, তীর্থ ভ্রমণও কিছু আমার পথ নয়, দেবালয় পূজা ধ্যান ধারণা এ সব কিছুই আমার নয়। যোগ যুক্তি কিছুই আমার নয়, না আমি সাধনই কিছু জানি।”

হরি কেবল এক অধারা।
সোই তারণ তিরণ হমারা॥
নাঁ তপ মেরে ইন্দ্রী নিগ্রহ, না কুছ তীরথ ফিরণাঁ।
দেৱল পূছা মেরে নাহিঁ, ধ্যাঁন কছূ নহিঁ ধরণাঁ॥
জোগ জুগতি কছূ নহিঁ মেরে, না মৈঁ সাধন জানৌঁ॥

(দাদূ আসাৱরী পদ, ২১৬)।

দাদূর পূর্ব্বে ও পরে মধ্য যুগের শত শত সাধকের মধ্যে শূন্য সহজ প্রভৃতি বিষয়ে অনেক অনেক বাণী আছে। সুন্দরদাসজীও রজ্জবজী হইতে তাহার কতক আভাস হয়ত মিলিবে। এখানে সে সব উল্লেখ করার স্থান নাই। শূন্য সম্বন্ধে দাদূর আর কিছু বাণী উল্লেখ করিয়া শূন্য সম্বন্ধে দাদূর মতটি সমাপ্ত করা প্রয়োজন।

পরচা অঙ্গের ৫৩নং বাণীতেই দাদূ বলিয়াছেন—

কায়া সুঁনি পংচকা বাসা, আতম সুঁনি প্রাণ প্রকাসা।
পরম সুঁনি ব্রহ্মসোঁ মেলা, আগৈঁ দাদূ আপ অকেলা॥

(পরচা অংগ, ৫৩ পূর্ব্বে দর্শনীয়)।

তার পরের বাণীতেই (৫৪ নং) দাদূ বলিলেন সেই পরম শূন্যই হইল এই বিশ্ব-চরাচর সৃষ্টির উৎস । "হে দাদূ ; যেখান হইতে চন্দ্র, সূর্য্য, আকাশ সব সৃষ্টি ধারা উৎপদ্যমান ; যেখান হইতে জল, পবন, পাবক ধরিত্রীর হইল প্রকাশ ; কাল, করম, জীব, মায়া, মন, ঘট (দেহ, অন্তর) শ্বাস যেখানে উৎপদ্যমান ; সেখানেই সর্বশূন্য (রহিতা) সর্বলীলাময় রাম বিরাজমান, সকলের সঙ্গে তিনি সহজ শূন্য ।"

দাদূ জহাঁ থৈঁ সব উপজে, চংদ সূর আকাস ।
পানী পৱন পাৱক কিয়ে ধরতী কা পরকাস ॥
কাল করম জিৱ উপজে মায়া মন ঘট সাস ।
তহঁ রহিতা রমিতা রাম হৈ, সহজ সুঁনি সব পাস ॥

(পরচা অংগ, ৫৪, ৫৫) ।

এই সহজ শূন্য নাস্তিধর্মাত্মক শূন্য তো মোটেই নন বরং তাঁহাকেই সৃষ্টির উৎস পরমানন্দময় বলা হইয়াছে। দাদূ যখন প্রশ্ন করিলেন "যে মুহূর্ত্তে সব কিছু হইল সৃষ্টি তাহার কর বিচার। (এই বিচারই যদি না করিলেন) তবে কাজী পণ্ডিত প্রভৃতি পাগলেরা কি লিখিয়া বাঁধিতেছেন বৃথা বোঝা ?"

দাদূ জিহি বিরিয়াঁ যহু সব কুছ ভয়া, সো কুছ করৌ বিচার ।
কাজী পণ্ডিত বাৱরে, ক্যা লিখি বংধে ভার ॥

(বিচার অংগ, ৩৮) ।

তখন বখনা উত্তর দিলেন "যে ক্ষণে এই সব কিছু হইল সৃষ্টি সে আমি করিয়াছি বিচার। হে বখনা, সে ক্ষণ হইল আনন্দের, প্রভু হইলেন সৃজন-কর্ত্তা।"

জিহি বরিয়াঁ যহু সব ভয়া, সো হম কিয়া বিচার ।
বখনাঁ বরিয়াঁ খুসী কী, কর্তা সির্জনহার ॥

দাদূ নিজেও গাহিয়াছেন—"কেন বা তুমি এই বিশ্ব করিলে সৃষ্টি, হে গোঁসাই ? কোন আনন্দ তোমার মনের মধ্যে ?" ইত্যাদি—

(পুরা পদটি অন্যত্র দেওয়া হইয়াছে) ।

ক্যোঁ করি য়হু জগ রচ্যৌ গুসাঁই ।
তেরে কৌঁন বিনোদ বন্যৌ মন মাঁহীঁ ॥

(রাগ আসাৱরী ; পদ ২৩৫) ।

দাদূ সহজ শূন্যকে সর্বভাবে ভরপূর সরোবরের সঙ্গে তুলনা করিয়া অনেক বাণী প্রকাশ করিয়াছেন। পরচা অঙ্গ, ৫৭ সংখ্যক বাণী হইতে ৬৯ সংখ্যক বাণী পর্য্যন্ত সবই এইভাবের বাণী। পূর্ব্বেই তাহার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। এখানে দাদূ সহজ শূন্যের লীলার একটি চমৎকার বর্ণনা দিয়াছেন। ৭০ সংখ্যক বাণীতে দাদূ কহিলেন সেই শূন্য হইল "প্রেমের সাগর, তাহাতে আত্মা ও পরমাত্মা এক ভাবরসে রসময় যোগযুক্ত হইয়া খাইতেছেন দোলা।"

দাদূ দরিয়া প্রেম কা, তামৈঁ ঝূলৈঁ দোই।
ইক আতম পরআতমা, একমেক রস হোই॥

(পরচা, ৭০)।

"হে দাদূ এই তো সেই শূন্য সহজ সাগর, তার মাঝেই মাণিক; হে সাধক, সেই সাগরে আপনার মধ্যেই ডুব দিয়া দেখিয়া লও সেই রতন।"

দাদূ হিণ দরিয়ার, মাণিক মংঝেঈ।
টূবী ডেঈ পাণ মেঁ, ডিঠো হংঝেঈ॥

(পরচা, ৭১)।

"পরমাত্মার সঙ্গে আত্মার লীলা যেমন সরোবরের মধ্যে হংসের লীলা। পরস্পরে যোগযুক্ত হইয়া খেলা চলে প্রিয়তমের সঙ্গে, সেখানে ভিন্ন কেহই নাই।"

পরমাতম সোঁ আতমা, জ্যূঁ হংস সরোবর মাঁহি।
হিলি মিলি খেলৈঁ পীরসৌঁ, দাদূ দূসর নাঁহি॥

(পরচা, ৭২)।

"হে দাদূ সহজের সেই সরোবর, তাহাতে চলিয়াছে প্রেমের তরঙ্গ; মন আতমা সেখানে দোলা খাইতেছে আপন স্বামীর সঙ্গে।"

দাদূ সরবর সহজ কা তামৈঁ প্রেম তরংগ।
তহঁ মন ঝূলৈ আতমা অপণে সাঁঈ সংগ॥

(পরচা, ৭৩)।

সেই সহজ তবে কি বাহিরে কোন ভৌগোলিক লোক?

"হে দাদূ, সেখানে দেখিতেছি নিজ প্রিয়তমকে, অপর আর কিছুই পাই না

দেখিতে। সকল দিক দেশ খুঁজিয়া খুঁজিয়া শেষে পাইলাম আপনারই অন্তরের মধ্যে।”

দাদূ দেখৌঁ নিজ পীৱকৌঁ দূসর দেখৌঁ নাঁহি।
সবৈ দিসা সোঁ সোধি করি, পায়া ঘট হী মাঁহি॥

(পরচা, ৭৪)।

তবে কি সহজ শূন্য অন্তরেরই মধ্যে, বাহিরে কোথাও নয়? পাছে এই ভুল হয় তাই তার পরের বাণীটিতেই তিনি বলিতেছেন, “হে দাদূ, শুধু দেখিতেছি নিজ প্রিয়তমকে, আর তো কাহাকেও পাই না দেখিতে। ভরপূর দেখিতেছি প্রিয়তমকেই, বাহিরে ভিতরে তিনিই বিরাজমান।”

দাদূ দেখৌঁ নিজ পীবকৌঁ, ঔর ন দেখৌঁ কোই।
পূরা দেখৌঁ পীৱকৌঁ বাহরি ভীতরি সোই॥

(পরচা, ৭৫)।

“হে দাদূ দেখিতেছি নিজ প্রিয়তমকেই, দেখিতেই মিটিয়া যায় সব দুঃখ। আমি তো দেখিতেছি প্রিয়তমকে নিখিল বিশ্বে আছেন সমাহিত হইয়া।”

দাদূ দেখৌঁ নিজ পীৱকৌঁ, দেখত হী দুখ জাই।
হূঁ তৌ দেখৌঁ পীৱকৌঁ, সব মৈঁ রহ্যা সমাই॥

(পরচা, ৭৬)।

“হে দাদূ, দেখিতেছি আমার আপন প্রিয়তমকে, সেই দেখাই তো যোগ (এই নিখিল বিশ্বেই প্রত্যক্ষ দেখিতেছি প্রিয়তমকে)। লোকেরা আবার কোথায় বৃথা দেয় তাঁর সন্ধান?”

দাদূ দেখৌঁ নিজ পীৱকৌঁ, সোঈ দেখণ জোগ।
পরগট দেখৌঁ পীৱকৌঁ, কহাঁ বতাৱৈঁ লোগ॥

(পরচা, ৭৭)।

বাহিরে ভিতরে কেমন ভরপূর প্রিয়তমের সেই সহজ লীলা তাহা দাদূ এখন চমৎকার বুঝাইতেছেন। তাহাতে বুঝা যাইবে শূন্যের কি অপরূপ পূর্ণতা।

“চাহিয়া দেখ দাদূ সেই দয়ালকে, নিখিল বিশ্ব ভরপূর করিয়া তিনি

বিরাজমান। প্রতি রোমে রোমে তিনি করিতেছেন বিহার, তুই যেন মনে না করিস তিনি দূরে।”

দাদূ দেখু দয়ালকোঁ, সকল রহ্যা ভরপূরি,
রোম রোম মৈঁ রমি রহ্যা, তূঁ জিনি জাণৈ দূরি।

(পরচা, ৭৮)।

“হে দাদূ, দেখ্ আমার দয়ালকে, বাহিরে ভিতরে তিনিই বিরাজিত। সকল দিশি সব দিকে দেখিতেছি প্রিয়তমকেই ? তিনি ভিন্ন আর ত কেহই নাই।”

দাদূ দেখু দয়াল কোঁ বাহরি ভিতরি সোই।
সব দিসি দেখোঁ পীরকোঁ, দূসর নাঁহীঁ কোই॥

(পরচা, ৭৯)।

“দাদূ, দেখ্ জীবনের সার দয়াময় স্বামী সম্মুখে বিরাজমান; যেদিকে দেখ চাহিয়া সেই দিকেই নয়ন ভরিয়া সৃজনকর্ত্তা পরমেশ্বর।”

দাদূ দেখু দয়ালকোঁ সনমুখ সাঁঈ সার।
জিধরি দেখোঁ নৈন ভঁরি, তীধরি সিরজনহার॥

(পরচা, ৮০)।

“দাদূ, দেখ্ দয়াল আমার সব ঠেলিয়া ঠাসিয়া ভরিয়া আছেন সকল অবকাশ, সকল ঠাঁই ঘটে ঘটে বিরাজিত আমার স্বামী, তুই যেন মনে আর না করিস্ কিছু।”

দাদূ দেখু দয়ালকোঁ রোকি রহ্যা সব ঠৌর।
ঘটি ঘটি মেরা সাঁইয়া তূঁ জিনি জাণৈ ঔর।

(পরচা, ৮১)।

“দশ দিক সর্ব্বত্র চাহিয়া দেখ দাদূ, নাই তনু, নাই মন, নাই আমি, নাই জীব, নাই মায়া। সর্ব্বত্র দেখ এক বিরাজমান আমার প্রিয়তম।”

তন মন নাঁহীঁ মৈঁ নহীঁ নহিঁ মায়া নহিঁ জীব।
দাদূ একৈ দেখিয়ে, দহ দিশি মেরা পীব॥

(পরচা, ৮২)।

এই বিশ্বচরাচরই সেই সহজ শূন্য সরোবর বা সাগর। তাই দাদূ বলিতেছেন—"এই জলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখ দাদূ, দৃষ্টি উঘারিয়া। 'জলা বিম্ব' সব ভরিয়া বিরাজিত তিনি, এমনই ব্রহ্ম বিচার।" উপলব্ধি, জ্ঞান, ধ্যান, লয়, সমাধি প্রভৃতি অর্থে ইঁহারা "বিচার" শব্দ প্রয়োগ করেন।

দাদূ পাণী মাঁহৈ পৈসি করি দেখৈ দৃষ্টি উঘারি।
জলা ব্যংব সব ভরি রহ্যা, ঐসা ব্রহ্ম বিচারি॥ *

(পরচা ৮৩)।

সহজ শূন্য ভরিয়া এই যে ব্রহ্ম বিহার তাহা কি অপরিসীম আনন্দময় তাহা বুঝাইতে গিয়া দাদূ বলিতেছেন—"সদাই লয়যুক্ত সেই আনন্দে, সব ঠাঁই সব অবকাশ ভরপুর করা সেই সহজরূপ, সেই এককেই সদা দেখিতেছে দাদূ, দ্বিতীয় আর কেহই নাই।"

সদা লীন আনন্দ মৈঁ সহজ রূপ সব ঠৌর।
দাদূ দেখৈ এক কোঁ, দূজা নাঁহী ঔর॥

(পরচা, ৮৪)।

"হে দাদূ, যেখানে সেখানে সর্ব্বত্র সাথী আমার আছেন সঙ্গে সঙ্গে, সদাই তিনি আমার আনন্দ; নয়নে-বচনে-হৃদয়ে পূরণ পরমানন্দ তিনি বিরাজিত!"

দাদূ জহঁ তহঁ সাথী সংগ হৈঁ, মেরে সদা অনংদ।
নৈন বৈন হিরদৈ রহৈঁ, পূরণ পরিমানন্দ॥

(পরচা, ৮৫)।

"দশদিকেই সেই দীপ্যমান দীপক, বিনা বাতি, বিনা তেল; চারিদিকে দেখ সেই সূর্য্য; দাদূ, অদ্‌ভূত এই লীলা!"

দহ দিসি দীপক তেজকে বিন বাতী বিন তেল।
চহুঁ দিসি সূরজ দেখিয়ে দাদূ অদভূত খেল।

(পরচা, ৮৭)।

---

* এই সব কথার যোগ পরিভাষার অর্থও আছে। তাহা আর এখানে দিলাম না।

"তার প্রতি রোমে রোমের সাথে সাথে কোটি সূর্য্যের প্রকাশ। হে দাদূ, জগদীশের সেই জ্যোতি, না আছে তার অন্ত না আছে তার পার!"

সূরজ কোটি প্রকাস হৈ, রোম রোম কী লার।
দাদূ জোতি জগদীস কী অংত ন আরৈ পার ॥

(পরচা, ৮৮)।

"যেমন সমগ্র আকাশ ভরিয়া এক রবি, এমনই সকল ভরপূর। হে দাদূ, অনন্ত সেই তেজ, সর্ব্বোপরি জ্যোতি ভগবান!"

জ্যোঁ রবি এক অকাস হৈ, ঐসে সকল ভরপূর।
দাদূ তেজ অনংত হৈ অল্লঃ আলী নূর ॥

(পরচা, ৮৯)।

"সূর্য্য নাই যেখানে সেখানে দাদূ দেখে সূর্য্য, চন্দ্র নাই যেখানে সেখানে দেখে চন্দ্র, তারা নাই যেখানে সেখানে ঝিলমিল দেখে তারা, কী অপরিসীম আনন্দ!"

সূরজ নহি তহঁ সুরিজ দেখে, চংদ নহীঁ তহঁ চংদা।
তারে নহি তহঁ ঝিলিমিলি দেখ্যা, দাদূ অতি আনংদা ॥

(পরচা, ৯০)।

"বাদল নাহি সেখানে দেখিল বরষিতে, শব্দ নাহি শুনিল গরজিতে, বিদ্যুৎ নাহি সেখানে দেখিল চমকিতে, দাদূর পরমানন্দ!"

বাদল নহি তহঁ বরিখত দেখ্যা, সবদ নহীঁ গরজংদা।
বীজ নহীঁ তহঁ চমকত দেখ্যা দাদূ পরিমানংদা ॥

(পরচা, ৯১)।

নিবেদন

এই উপক্রমণিকাটি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে লিখিত, অবশ্য পরে নূতন তথ্যও অনেক স্থানে দেওয়া হইয়াছে। তবু মনে রাখিতে হইবে যে অনেক স্থলে নির্দ্দিষ্ট সময় কয়েক বৎসর পূর্ব্বেকার।

উপক্রমণিকাতে দাদূর যে সব বাণী উদ্ধৃত হইয়াছে সেগুলি আমার নিজের সংগ্রহ হইতে গৃহীত হয় নাই। প্রামাণ্যতার জন্য তাহা দাদূর প্রখ্যাত "অংগবধূ" সংগ্রহ হইতে গৃহীত ও সেই ভাবেই উদ্ধৃত। কাজেই উপক্রমণিকায় উদ্ধৃত বাণীগুলি আমার এই সংগ্রহে ঠিক তেমনি ভাবে নাও পাইতে পারেন, একেবারেও না থাকিতে পারে।

পরিশেষে আমায় একান্ত কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি পূজনীয় কবিগুরু শ্রীমদ্ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের উদ্দেশ্যে। তাঁহার উৎসাহেই এই কার্য্যে হাত দিয়াছিলাম, তাঁহার সহায়তাতেই এই সংগ্রহ বাহির করা সম্ভব হইয়াছে এবং তাঁহার কাছে আমি এই জন্য কত যে ঋণী তাহা কহিয়া বুঝাইবার নহে।

তার পর বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী মহাশয় কষ্টকর প্রুফ দেখার কাজে আমাকে সহায়তা করিয়া আমার প্রভূত উপকার করিয়াছেন। তাঁহাকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

সাধু ও গৃহস্থ বহু ভক্তজন ও সজ্জনের কাছে এই কার্য্যের জন্য আমি নানা ভাবে ঋণী; অনেকের ঋণ পরিশোধ করা অসম্ভব। সকলের নাম করা সম্ভব নহে, তবু আমি সকলের উদ্দেশ্যেই আমার বিনীত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। জানি না এ গ্রন্থের দ্বারা কাহারও কোনো উপকার বা আনন্দ হইবে কিনা। এই গ্রন্থ প্রকাশিত করার যাহা উদ্দেশ্য তাহা আমার দ্বারা ঠিক সাধিত হইয়াছে কিনা তাহাও ঠিক জানি না; কারণ এই বিষয়ে আমার যোগ্যতার কোনো দাবী নাই। তবু শ্রদ্ধাভরে সকল ভক্তিরসপিপাসু সজ্জনের কাছে এই ভক্তবাণীসংগ্রহ খানি উপস্থিত করিতেছি। মধ্যযুগের সাধনার যাঁহারা রসিক তাঁহাদের যদি ইহাতে কিছুমাত্র সন্তোষ হয় তবেই আমার সকল প্রয়াস সার্থক হইবে। ইতি

শান্তিনিকেতন,
১লা বৈশাখ, ১৩৪০ সাল।

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন।

দাদূ

দাদূ-বাণী

প্রথম প্রকরণ—জাগরণ

প্রথম অঙ্গ—গুরু অঙ্গ

প্রবেশক

ভক্তদের বিভাগমত দাদূর এই ছয় ভাগের মধ্যে প্রথমেই হইল জাগরণ। জাগরণের মধ্যে প্রথমেই গুরুর অঙ্গ। এই সব সম্প্রদায়ের লোকেরা তো জ্ঞানী বা পণ্ডিত নহেন, যুগযুগান্তরের সাধনা ও সত্যের পরিচয় ইহাঁরা শাস্ত্রের ভাণ্ডার হইতে পান না। তাই ইহাঁরা এমন মানুষ চাহেন যাঁহার মধ্য দিয়া চিরদিনের সত্য, সকল মানবের উপলব্ধি পাইতে পারেন। গুরুর ও ভক্তদের মধ্য দিয়াই এঁরা সকল যুগের সকল দেশের সব রকম সাধনার মধ্যে প্রবেশের দ্বার পান।

গুরুর কৃপায় অন্তরাত্মা বিকশিত হইয়া ওঠে; তাঁর পরশ হইল পরশমণির পরশ। পরশমণি হইতেও তাঁর পরশ বেশী। কারণ পরশমণির পরশ লোহাকে কাঞ্চনমাত্র করে পরশমণি তো করে না। সাধকের পরশ পাইলে মানব সাধকই হইয়া উঠে। কবীরও এই কথা বলিয়াছেন। "জাগরণে" প্রথম স্থান গুরুর, দ্বিতীয় স্থান পৃথিবীর অন্য সব সাধকের। তা সাধক যে দেশের, যে ধর্ম্মের বা যে সম্প্রদায়েরই হউন না কেন। সব দেশের ও সব ধর্ম্মের সব সম্প্রদায়ের সকল প্রকার সাধকের সাধনাই আমাদের সাধনাতে

সহায়তা করে। যে সাধনাই হউক, তাহা যদি সত্য হয়, তবে তাহা সকল মানবের নিত্য কালের ধন ও সাধনার সহায় হইয়া রহিল, তাহা কাহারও পক্ষে নিরর্থক নহে।

গুরু ও সাধকে মিলিয়াই "চেতৱনী"। চেতৱনী হইল জাগরণের তৃতীয় অঙ্গ। "চেতৱনী" অর্থাৎ অন্তরকে সচেতন করার অঙ্গ। সাধকের অন্তরের চেতনাই হইল জাগরণ-সাধনার শেষ কথা।

লৌকিক গুরু হইলেন উপলক্ষ্যমাত্র। আসল গুরু ভগবান স্বয়ং। তিনি যদি কৃপা করিয়া আপনাকে প্রকাশ না করেন তবে কার সাধ্য তাঁকে প্রকাশ করে? তিনি লৌকিক গুরুকে উপলক্ষ্য করিয়া আপনার কাজ করাইয়া লন। যেমন প্রতি মাতা ও পিতার মধ্য দিয়া আমরা জগন্মাতা ও জগৎ-পিতার পরিচয় পাই, তেমনি গুরুর মধ্যে দিয়াই সেই পরমগুরুরই পরিচয় পাই। তাঁর ইচ্ছা হইলে তিনি এই সব লৌকিকগুরু ছাড়াও আপনার কাজ করিতে পারেন এবং এমন লীলা তিনি কত ক্ষেত্রেই করিয়াছেন। গুরু সকল সম্প্রদায়ের অতীত, কারণ তাঁর কোনো গুণ ও আকার নাই।

দাদূ অলহ রামকা দোনোঁ পখ তৈঁ ন্যারা।
রহিতা গুণ আকারকা সো গুরূ হমারা॥

(দাদূ-বাণী, মধ্য কো অঙ্গ, ৪৮)।

দাদূ বলেন, "আমার গুরু গুণ ও আকার রহিত, তিনি আল্লা ও রাম এই দুই পক্ষেরই অতীত।"

সাধক কমাল এ বিষয়ে একটি চমৎকার তুলনা দিয়াছেন, তাহা উল্লেখ করা উচিত। কমাল বলেন, "আসলে তো মন্ত্র ও উপদেশ বলে মুখ ও জিহ্বা। তবু মানুষ তো বলে না আমি মুখের বা জিহ্বার শিষ্য। মুখ ও জিহ্বা যে গুরুর, সেই পরিপূর্ণ গুরুরই পরিচয় সাধক দেয়। ভিন্ন ভিন্ন মানুষের মধ্যে যে আমরা গুরুকে পাই তাহাও তাঁহারা সেই পরমাত্মা সর্ব্বময় মহাগুরুর অঙ্গ-স্বরূপ বলিয়াই। এই ক্ষেত্রেই বা কেন আমরা পরমাত্মাকেই গুরু না বলিব? গুরু এক তিনিই। এঁরা সবাই তাঁরই অঙ্গ, তাঁরই নিয়োজনে নিয়োজিত, তাই এঁরা পূজ্য, তাই এঁদের উপদেশ ভক্তির সহিত গ্রহণীয়।"

মধ্যযুগের ভক্তদের ও আউল বাউলদেরও এই রকমই ভাব। "আমার

গুরু আপনি একেলা করেন লীলা। তিনি আপনি অলখ নিরঞ্জন রায়। চন্দ্র সূর্য্য দুই বাতি জ্বালাইয়া তিনি রাত্রি দিবস করিয়া লইলেন সৃষ্টি। পরমগুরু আমার প্রাণ, অনন্ত অপার তাঁর লীলা।"

মেরা গুরু আপ অকেলা খেলৈ ·……
আপৈ অলখ নিরংজন রায়া………
চংদ সূর দোই দীপক কীন্হাঁ রাতি দিব্বস করি লিন্হাঁ… ..
পরম গুরু সো প্রাণ হমারা………
দাদূ খেলৈ অনত অপারা।

(রাগ আসাবরী, ২৪৩)।

আবার সাধকের অন্তরের অন্তরে তিনিই সদ্গুরুরূপে বিরাজমান—

মাহৈঁ কীজৈ আরতী মাহৈঁ পূজা হোই।
মাহৈঁ সদগুর সেইয়ে বূঝৈ বিরলা কোই॥

(দাদূ পরচা কো অঙ্গ, ২৬৫)।

"অন্তরের মধ্যেই আরতি কর, অন্তরেই পূজা হইবে। অন্তরের মধ্যেই সদ্গুরু, তাঁর সেবা কর। এই তত্ত্ব ক্বচিতই কেহ বুঝে।"

গুরুর—অঙ্গ

বাণী

গোপন অন্তরের মধ্যে গুরুর দর্শন পাইলাম। যাঁর দয়ায় অসম্ভবও সম্ভব তাঁর প্রসাদ পাইলাম। তিনি অসীম রহস্য দেখাইয়া দিলেন। তিনি আমাকে প্রেমের আলিঙ্গন দিয়া অন্তরের প্রদীপ জ্বালাইয়া দিলেন। তাঁর প্রেমস্পর্শেই সব বদ্ধ কপাট আপনিই খুলিয়া গেল। নয়নে তিনি যে প্রেমের অঞ্জন দিলেন তাতে নয়নের সব পরদা সরিয়া গেল। ইন্দ্রিয়ের মুখ ফিরিয়া গেল। বিষয়পিপাসু ইন্দ্রিয়গণ যেই অন্তরের দিকে ফিরিয়া গেল অমনি পঞ্চেন্দ্রিয় যেন পঞ্চদলকমলের মত ফুটিয়া উঠিল, পঞ্চ প্রদীপের মত জ্বলিয়া উঠিল। সেই পঞ্চদলকমলে দেবতাকে বসাইয়া পঞ্চপ্রদীপে তাঁর আরতি করিতে হইবে।

গৈব মাহিঁ গুরুদেৱ মিল্যা পায়া হম পরসাদ।
মস্তকি মেরে কর ধর্‌য়া দখ্যা অগম অগাধ॥
সতগুরু সো সহজৈ মিলা লিয়া কণ্ঠ লগাই।
দায়া ভঈ দয়ালকী দীপক দিয়া জগাই॥
দাদূ দেৱ দয়ালকী গুরু দিখাঈ বাট।
তালা কুংচী লাই করি খোলে সবৈ কপাট॥
সতগুরু অংজন বাহি করি নৈন পটল সব খোলে।
বহরে কানৌঁ সুননে লাগে গূঁগে মুখ সোঁ বোলে॥
সতগুরু কিয়া ফেরি করি মনকা ঔরৈ রূপ।
দাদূ পংচৌ পলটি করি কৈসে ভয়ে অনূপ॥

"ইন্দ্রিয়ের অগম্য ধামে মিলিয়াছেন গুরুদেব, তাঁহার প্রসাদ আমি পাইলাম। আমার মাথায় তিনি হাত রাঁখিলেন (আশীর্ব্বাদ করিলেন), অগম্য অগাধ (দুর্ব্বোধ্য অসীম) দীক্ষায় আমাকে তিনি দীক্ষা দিলেন। সহজেতেই সেই সদ্‌গুরু গেলেন মিলিয়া, তিনি আমাকে করিলেন আলিঙ্গন; দয়ালের হইল দয়া, তিনি (আমার অন্তরের) জাগাইয়া দিলেন দীপটি। হে দাদূ, দয়াল দেবতার পথ দেখাইয়া দিলেন গুরু; তালার চাবী আনিয়া সবগুলি কপাটই গুরু দিলেন খুলিয়া। সকল অঞ্জন দূর করিয়া সদ্‌গুরু নয়নের সব পটল দিলেন খুলিয়া; বধির শুনিতে লাগিল কানে, বোবা মুখ দিয়া কহিল কথা।

মনকে ফিরাইয়া সদ্‌গুরু সম্পূর্ণ আর একরূপই দিলেন করিয়া, হে দাদূ, পঞ্চেন্দ্রিয় পালটিয়া গিয়া কি জানি কেমন করিয়া হইয়া গেল অনুপম।"

ইন্দ্রিয় যখন বাহিরের দিকে ছিল তখন তার ছিল একরূপ। যখন সদ্‌গুরুর দয়াতে ইন্দ্রিয়ের মুখ অন্তরের দিকে ঘুরিয়া গেল, তখন অন্তরের মধ্যে অনুপম লীলা প্রত্যক্ষ করিলাম।

শেষের বাণীটির আর একটি অর্থও হয়। "মনকার" এক অর্থ "মনের", আর এক অর্থ "মালা"। অর্থাৎ সদ্‌গুরুর জপের প্রভাবে মালার দেখি আর একরূপ হইয়া গেল। রূপ, রস, গন্ধ, পরশ ও ধ্বনির যে অনুভব আমাদের পর পর হইতেছে তাহাকেই জপের গুটির মত ব্যবহার করিতেই পারি, সদ্‌গুরু যদি এই

অপরূপ অনুভব গুটিকার মালা ফিরাইতে শেখান। এই শিক্ষা পাইলে আমাদের ইন্দ্রিয়ের বোধগুলির একেবারে আর এক অর্থ হইয়া যায়। তাহারা রূপ ও সীমা হইয়াও প্রতিমুহূর্ত্তে অরূপ ও অসীমকেই প্রকাশ করে। গুটি নিজে যাহা তাহা তো প্রকাশ করে না; প্রকাশ করে সে দেবতাকে। পঞ্চেন্দ্রিয়ের সব অর্থ পালটিয়া গেলে অনুপম লীলা প্রকাশ হয়।

সাধনার পথ দীর্ঘ ও কঠিন। এ পথ অতিক্রম করিবার জন্য সাধকদের মধ্যে দুই প্রকার রীতি আছে। জ্ঞানের পথে যে নিজের জোরে হাঁটিয়া চলে সে দীর্ঘ পথ চলিতে হইবে বলিয়া আপন মাথার সব ভার ফেলিয়া দেয়। তাই সে "নেতির" পথে চলিয়া দিন দিন সৌন্দর্য্য-রস-গীত-নৃত্য-কলা-ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি সবই ফেলিতে ফেলিতে হাল্কা হইয়া অগ্রসর হইতে থাকে। সাজ, সজ্জা, আভরণ, মাল্য, পুষ্প, চন্দন, অর্ঘ্য সবই সে ফেলিয়া চলে। এ পথে থাকে কেবল জ্ঞান ও বৈরাগ্য আর কঠোর সাধনা। এ হইল শুদ্ধতার ও শুষ্কতার পথ। দীর্ঘ পথে চলিতে হইলে ভারই যে হয় প্রধান বাধা, তাই সে রিক্ত হইয়া চলে। যাহা শোভন ও সুন্দর তাহাও সে বহন করিয়া দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে পারেনা।

আর যে সাধককে পায়ে হাঁটিয়া চলিতে হয়না, প্রেমের পথে যে চলে, ভগবৎ প্রেমের বলেই যে সাধক "ঠাইঞে" বসিয়াই অগ্রসর হয়, সে ফুল, চন্দন, মালা, অর্ঘ্য, গীত প্রভৃতি সব শোভা সব মাঙ্গলিক লইয়া সুন্দর হইয়া প্রেমময় দেবতার সঙ্গে মিলিবার জন্য রহে প্রস্তুত হইয়া। সে পথ "নেতির" পথ নহে। সদ্গুরু এই প্রেমের পথ দেখাইয়া দেন। তাঁর চরণতরীতে চড়িয়া ভক্ত প্রেমের পথ বাহিয়া অনায়াসে চলে। সব ভার থাকে তাঁরই উপরে।

সাঁচা সতগুরু জে মিলৈ সব সাজ সঁৱারৈ।
দাদূ নাৱ চঢ়াই করি লে পার উতারৈ॥

"সাচ্চা সদ্গুরু যদি মেলে তবে সব সাজে তিনি সাধককে নেন সাজাইয়া। হে দাদূ, তিনি (ভগবৎকৃপার) নৌকায় সাধককে চড়াইয়া পারে করিয়া দেন উত্তীর্ণ।"

কেমন গুরু মিলিলেন?

দাদূ কাঢ়ে কাল মুখি অংধে লোচন দেই।
দাদূ ঐসা গুরু মিলা জীব ব্রহ্ম করি লেই॥

দাদূ কাঢ়ে কাল মুখি স্রবনহু সবদ সুনাই।
দাদূ ঐসা গুরু মিলা মিরতক লিএ জিলাই ॥
দাদূ ঐসা গুরু মিলা সুখমেঁ রহে সমাই। *
দাদূ ঐসা গুরু মিলা মহিম বরনি ন জাই ॥
দাদূ খেৱট গুরু মিলা লিএ চঢ়াই নাৱ।
আসন অমর অলেখ থা লে রাখে উস ঠাঁৱ ॥
কিরতম জাই উলংঘি করি জহঁা নিরংজন থান।
সাচা সহজৈ লে মিলৈ জহঁ প্রীতম কা থান ॥

"হে দাদূ, এমন গুরু মিলিয়াছেন যিনি অন্ধকে দেন লোচন, জীবকে নেন ব্রহ্মময় করিয়া, (আর এমন করিয়া) কালের মুখ হইতে করেন নিস্তার। হে দাদূ, এমন গুরু মিলিয়াছেন, যিনি শ্রবণে সঙ্গীত শুনাইয়া মৃতকে দেন বাঁচাইয়া আর কালের মুখ হইতে করেন উদ্ধার। হে দাদূ, এমন গুরু মিলিয়াছেন যিনি আনন্দের মধ্যে থাকেন সমাহিত। তাঁহার মহিমা করা যায় না বর্ণনা। হে দাদূ, গুরু মিলিয়াছেন খেয়ার মাঝি, তিনি নৌকায় চড়াইয়া নিয়া অমর ও অলখ যে আসন ছিল, সেখানে নিয়া দিলেন পৌঁছাইয়া। কৃত্রিমকে লঙ্ঘন করিয়া যেখানে নিরঞ্জনের স্থান সেখানে গেল যাওয়া, যেখানে প্রিয়তমের স্থান সেখানে সত্যই সহজে নিয়া মিলাইল।"

গুরু আসিয়া কি করিলেন? গুরু তাঁহার মন্ত্র বলে, তাঁহার সঙ্গীতে আমাদের অন্তরের সব কঠিনতা সব বাধা চূর্ণ করিয়া দিলেন। তাঁর সঙ্গীতের মধ্যে এমন কিছু আছে যে কিছুতেই তাহা মন হইতে দূর করিয়া দিতে পারি না। কথা ভুলিয়া যাই তো সুর মনে লাগিয়া থাকে। সেই সঙ্গীত আমাদের অন্তরকে মন্থন করিয়া যে রস বাহির করে তাহাতেই ঘৃতের প্রদীপের মত সাধনার প্রদীপ জ্বলিয়া ওঠে।

---

* "সমানা" হিন্দী কথার বাংলা করা সহজ নহে। প্রাদেশিক বাংলাতে "সামায়" আছে, তাতে ঠিক বুঝা যায় না। কোনো কিছুতে ডুবিয়া তাহাকে পূর্ণ করিয়া বিরাজ করাকে "সামায়" বলা যাইতে পারে। সমাহিত কথাটাও যেন ঠিক হইল না।

বাহরি সারা দেখিয়ে ভীতরি কীয়া চূর।
সতগুরু সবদোঁ মারিয়া জান ন পাবৈ দূর।
গুরু সবদ মুখ সোঁ কহা ক্যা নেড়ে ক্যা দূর।
দাদূ সিখ শ্রবণহু সুনা সুমিরনি লাগা সুর ॥*
কামধেনু ঘটি ঘীব হৈ দিন দিন দুরবল হোই।
গুরু গ্যান না উপজৈ মথি নহিঁ খায়া সোই॥
মথি করি দীপক কীজিয়ে সবঘটি ভয়া প্রকাস।
দাদূ দীবা হাথি করি গয়া নিরংজন পাস॥

"বাহিরে (আমাকে) দেখিতেছ বটে আস্ত, কিন্তু ভিতরে তিনি একেবারে করিয়া দিয়াছেন চুর; সদ্‌গুরু যখন "সবদ" (=সঙ্গীত) দিয়া মারেন তখন বাহিরের কেহ বুঝিতেই পারে না। (সাধক) গুরু মুখে "সবদ" গাহিলেন (সাধনার সত্যে পূর্ণ হইয়া তাহা তখন জগতের সবার ধন হইয়া গেল), তখন তার পক্ষে নিকটই বা কি আর দূরই বা কি? হে দাদূ, শিষ্য তাহা শ্রবণ ভরিয়া শুনিল এবং (শুধু তার) সুরখানি স্মরণে রহিল লাগিয়া।

এ "ঘট" (কায়া ও রূপ) হইল কামধেনু, ইহাতে ঘৃত বিদ্যমান; অথচ দিন দিন এ দুর্ব্বল হইয়া চলিয়া চলিয়াছে যাবৎ গুরু-জ্ঞান উপজে নাই বা মথন করিয়া সেই ঘৃত হওয়া হয় নাই।

এই ঘট মন্থন করিয়া সেই ঘৃতের প্রদীপ কর। (প্রদীপ যখন জ্বলিল) তখন সব ঘট প্রকাশ হইয়া গেল, হে দাদূ, সেই প্রদীপ হাতে করিয়া নিরঞ্জনের পাশে গেলাম।"

তোমার আপন সাধনার প্রদীপ জ্বাল:

তোমার জীবন প্রদীপ জ্বালাইয়া তোল। দীপ হাতে না থাকিলে সে ঘরে কেহ প্রবেশ করিবার অধিকার পায় না।

দীবৈ দীবা কীজিএ গুরুমুখ মারগ জাই।
দাদূ অপনে পিউকা দর্সন দেখৈ আই॥

---

* এখানে "সূর" এই পাঠ হইলে অর্থ হইবে বীর সাধক। অর্থাৎ বীর সাধক লাগিয়া রহিল সাধনে।

দাদূ দীৱা হৈ ভলা দিৱা করো সব কোই।
ঘরমেঁ ধর্য়া ন পাইএ জে কর দিয়া ন হোই॥
দীয়া জগমেঁ চাঁদনা দীয়া চালৈ সাথি।
পরাপরি পাসৈঁ রহৈ কোই ন জানৈ বাতি॥

"সাধনায় দীক্ষার পথে গিয়া দীপ হইতে দীপ লও জ্বালাইয়া। (এই দীপ হাতে করিয়া) হে দাদূ, আপনার প্রিয়তমের রূপ আসিয়া কর দর্শন কর। হে দাদূ, এই সাধনার দীপই ভাল, সকলেই এই দীপ জ্বালিয়া লও। এই দীপ যার হাতে নাই ঘরে রক্ষিত ঐশ্বর্য্যও তাহার (অথবা প্রবেশও) পাইবার উপায় নাই। (তাঁহার) দীপ জগতের চন্দ্রালোকের মত রহিয়াছে, কিন্তু (তোমার আপন সাধনার) দীপই সাথী হইয়া তোমার সঙ্গে (সর্ব্বত্র) যাইবে নিত্য কাল ধরিয়া; এই দীপ সবার পাশেই আছে, কিন্তু কেহই সেই দীপের তত্ত্ব জানে না।"

আমার মধ্যেই আছে বাহিরে যাইবার প্রয়োজন নাই।

মুঝহিমেঁ মেরা ধনী পরদা খোলি দিখাই।
সরৱর ভরিয়া দহ দিসা পংখী প্যাসা জাই॥
মানসরোৱর মাহি জল প্যাসা পীৱৈ আই।
ভরিভরি প্যালা প্রেমরস অপনে হাথ পিলাই॥

"আমার মধ্যেই আমার মালিক, পরদা খুলিয়া (গুরু) ইহা দেখাইলেন। দশদিশ পূর্ণ হইয়া আছে সরোবর, অথচ পাখী (জল না পাইয়া) পিয়াসী হইয়াই চলিল। মানস সরোবরের মধ্যেই তো জল, পিপাসিত যে সে আসিয়া পান করে, প্রেমরসের প্যালা ভরিয়া ভরিয়া (গুরু) নিজ হাতে করান পান।"

অন্তরের উপলব্ধির উপায়। সদ্‌গুরু আসিয়া ব্যথার আঘাত দিয়া আমাদের জাগাইয়া দেন। কিন্তু জাগরণ ও সাধনা সত্য হওয়া চাই আমাদের অন্তরের সত্যকে জাগাইয়া তোলা চাই, নহিলে সাধনাতে বাহিরের অপরিমেয় ঐশ্বর্য্যও যদি লাভ হয় তবুও কোনো লাভ নাই। বাহিরে

অগণিত চন্দ্র সূর্য্য থাকিলেও কোনো লাভ নাই, অন্তরে নামের প্রদীপটি জ্বালাইয়া লও। ক্ষুদ্র হইলেও ইহা তোমার সৃষ্টি, ইহাই তোমার সাধনার নিত্য সাথী। বাহিরের ঐশ্বর্য্যে কেবল দিন দিন অহঙ্কারই বাড়িয়া চলে, অথচ এই অহঙ্কারকে দূর করাই হইল সাধনা। এই অহঙ্কার দূর না হইলে সাধনার জগতে আমার ঠাঁই নাই। অহঙ্কার গেলে, তাঁহার দয়া হইবে তখন প্রেম সুধারসের অধিকারী হইব। সেই প্রেমরস দূরে নাই, নিকটেই আছে, অথচ বুঝিতে পারা যায় না। বস্তু একান্ত বিভিন্ন হইলে উপলব্ধি হয় না; যেমন চক্ষু শব্দ শোনে না। আবার একান্ত অভিন্ন হইলেও উপলব্ধি হয় না; যেমন নয়ন নয়নকে দেখে না। নয়ন দর্পণ পাইলে আপনাকে উপলব্ধি করিতে পারে। আত্মাকে আত্মা কি করিয়া উপলব্ধি করিবে? সবার অন্তরের মধ্যেই সেই দর্পণ আছে, গুরু তাহা দেখাইয়া দেন।

দেবৈ কিরকা দরদকা টূটা জোবৈ তার।
দাদূ সাধৈ সুরতি কো সো গুরু পীর হমার॥
সাঁচা সতগুরু সোধিলে সাঁচে লীজৈ সাধ।
সাঁচা সহিব সোধি করি দাদূ ভগতি অগাধ॥
অনেক চংদ উদয় করৈ অসংখ সূর প্রকাশ।
এক নিরংজন নাঁৱ বিন দাদূ নহীঁ উজাস॥
কদি য়হ আপা জাইগা কদি য়হ বিসরৈ ঔর!
কদি য়হ সূষিম হোইগা কদি য়হ পাবৈ ঠৌর॥
দাদূ প্যালা প্রেমকা প্রেম মহারস পান।
জব দরবৈ তব পাইয়ে নেরাহি অস্থান॥
নৈন ন দেখৈ নৈন কো অংতর ভী কুছ নাঁহিঁ।
সতগুরু দরপন কর দিয়া অরস পরস মিলি মাহিঁ॥

“যিনি (জীবন তারে) ব্যথার তীব্র আঘাত দেন আবার (সে তার ছিঁড়িলে) ছিন্ন তার দেন জুড়িয়া; এমন করিয়া যিনি প্রেম-ধ্যান সাধন করান, হে দাদূ, সেই গুরুই আমার শিক্ষাদাতা। সত্য সদ্গুরু লও সন্ধান করিয়া, সত্যকে

লও সাধিয়া ; সত্য স্বামীকে সন্ধান করিয়া হে দাদূ অগাধ* ভক্তি কর সাধন। অনেক চন্দ্রের যদি করা হয় উদয়, অসংখ্য সূর্য্যের যদি করা হয় প্রকাশ, তবু হে দাদূ, এক নিরঞ্জনের নাম বিনা হয় না কোনো আলোক। কবে এই "অহম্" যাইবে চলিয়া, কবে এ আর সব হইবে বিস্মরণ, কবে (স্থুলত্ব দূর হইয়া) ইহার হইবে সূক্ষ্মত্ব, কবে এ দাঁড়াইবার পাইবে ঠাঁই ? হে দাদূ, প্রেমেরই পেয়ালা, প্রেম মহামৃতেরই চলিতেছে পান। সেই স্থান নিকটেই বিদ্যমান, যখন (তাঁহার) হইবে দয়া† (অহংকারের বাধা যাইবে গলিয়া) তখনই মিলিবে সেই স্থান। নয়ন নয়নকে পায় না দেখিতে অথচ অন্তরও কিছু নাই। সদ্‌গুরু যখন হাতে দর্পণ দিলেন তখন অন্তরের মধ্যেই মিলিল দরশ পরশ।"

সাধনায় দেখিতে হইবে ঃ প্রত্যেকের মধ্যেই মনুষ্যত্বের অমূল্যনিধি আছে, গুরু-দত্ত প্রদীপ পাইলে তবে তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। অন্তরের সেই দিবারাত্রিকালব্যবস্থার অতীত অন্ধকারহীন জ্যোতির্ম্ময় লোকে জপ চলুক। সেখানে সাধনা সহজ, কারণ সাধকের পাশে প্রিয়তম বিরাজমান। অগম্য জ্যোতির্ম্ময় লোক তোমার পক্ষে গম্য হইবে কারণ সেই অনন্ত সহজে নিজেই যদি তোমার সদ্‌গুরু হন তবে নিত্য তোমার ঘরেই বসন্ত উৎসব চলিবে। বাহিরের ভেখ যথার্থ ফকীরী নহে, অন্তরে ভেখ নিয়া ফকীর হইতে হইবে এবং অলেখ অসীম অনন্তকেই ভিক্ষা মাগিতে হইবে ; কারণ ক্ষুদ্র কোনো দানে অন্তরাত্মা তৃপ্ত হইবার নহে।

অন্তরের ফকীরী বাহিরের ফকীরীর মত সব কিছুকে অস্বীকার করিয়া নহে। সেই দীক্ষা পাইলে সকলকে স্বীকার করিব। যেখানে যেখানে তাহার সম্বন্ধ, সেখানে সেখানে সে যুক্ত হইবে, এমন করিয়াই বাদ বিবাদ ঘুচে, ইহাই সত্য যোগ। ঘর ছাড়িয়া বনেও যাইতে হইবে না, বাহিরের মন্দিরেও যাইতে হইবে না, অন্তরেই দেবতার দরশন ও সেবা চলিবে। অন্তরেই গুরুর উপদেশ মিলিবে, ব্যর্থ জটা-বাঁধা সাধু হইয়া বাহিরে ঘুরিয়া মরিতে হইবে না।

---

* হিন্দীতে অগাধ অর্থে অতি গভীর অতলস্পর্শ, অপার, অসীম, অত্যন্ত, বোধাগম্য, দুর্ব্বোধ, যার পার মেলে না, যাহা বুঝিতে পারা যায় না।
(হিন্দী শব্দসাগর, পৃঃ ৪৪)।

† "দরবৈ" অর্থ দয়া হইবে, এবং দ্রব হইবে, এই দুইই হয়।

ঘট ঘট রাম রতন হৈ দাদূ লখৈ ন কোই।
জবহী কর দীপক দিয়া তবহী সূঝন হোই॥
মন মালা তহঁ ফেরিয়ে দিব্বস ন পরসৈ রাত।
তহঁ গুরু বানা দিয়া সহজৈ জপিয়ে তাত॥
মন মালা তহঁ ফেরিয়ে প্রীতম বৈঠে পাস।
অগম গুরুতৈঁ গম ভয়া পায়া নূর নিব্বাস॥
মন মালা তহঁ ফেরিয়ে আপৈ এক অনংত।
সহজৈঁ সো সতগুর মিলা জুগ জুগ কাল বসংত॥
সতগুর মালা মন দিয়া পব্বন সুরতি সো পোই।
বিনা হাথ নিস দিন জপৈ মরম জাপ য়ূঁ হোই॥
মন ফকীর মাহৈঁ হুয়া ভীতরি লিয়া ভেখ।
সবদ গহৈ গুরুদেব্বকা মাঁগৈ ভীখ অলেখ॥
মন ফকীর সতগুরু কিয়া কহি সমঝায়া গ্যান।
নিহচল আসনি বৈঠি করি অকল পুরুস কা ধ্যান॥
মন ফকীর ঐসৈঁ ভয়া সতগুরু কে পরসাদ।
জহঁকা থা লাগা তহাঁ ছূটে বাদ বিবাদ॥
না ঘরি রহ্যা না বন গয়া না কুছ কিয়া কলেস।
দাদূ জ্যোঁ হি ত্যোঁ মিলা সহজ সুরত উপদেস॥ *
য়হু মসীতি য়হু দেব্বংরা সতগুরু দিয়া দিখাই।
ভীতরি সেবা বংদগী বাহরি কাহে জাই॥
মংঝেহি চেলা মংঝে গুর মংঝেহি উপদেস।
বাহরি ঢূঁঢৈঁ বাব্বরে জটা বঁধায়ে কেস॥

"হে দাদূ প্রতি ঘটেই (জীবে জীবেই) রাম রতন বিরাজমান। অথচ কেহই দেখিতে পায় না; যখনই গুরু হাতে সাধনার প্রদীপ দেন তখনই দর্শন মেলে। মন মালা সেখানে ফিরাও যেখানে দিবসের ও রাত্রির নাই কোনো পরশ;

---

* "দাদূ মনহীঁ মন মিল্যা সতগুরকে উপদেস" এই পাঠও আছে।

সেখানে গুরু দিয়াছেন সাধনার রীতি, সহজেই কর সেখানে জপ। মন মালা সেখানে ফিরাও যেখানে প্রিয়তম বসেন পাশে, গুরুর প্রসাদে অগম্যও হইয়াছে গম্য, জ্যোতির্ম্ময় ধাম গিয়াছে পাওয়া।

মনমালা ফিরাও সেখানে, যেখানে তিনি আপনিই একা অনন্ত। সহজেই সেই সদ্‌গুরু মিলিয়াছে ; এখন যুগের পর যুগ আমার ফাগ, যুগের পর যুগ আমার বসন্তোৎসব।

প্রেমের নিশ্বাসে মালা গাঁথিয়া সদ্‌গুরু দিলেন মন-মালা। বিনা হাথে নিশিদিন চলিয়াছে জপ, এমন করিয়াই হয় মরম জাপ।** ভিতরেই মন হইল ফকীর, ভিতরেই লইল ভেখ, ভিতরেই গুরুদেবের শব্দ (সঙ্গীত) করিল গ্রহণ আর অলেখ (অপার অনন্ত) চাহিল ভিক্ষা। সদ্‌গুরুই মনকে ফকীর করিয়া দিলেন, কহিয়া বুঝাইয়া দিলেন জ্ঞান। এখন নিশ্চল আসনে বসিয়া অনন্ত অকল পুরুষের ধ্যান করিতে হইবে সাধন। সদ্‌গুরুর প্রসাদে মন এমনি হইয়া গেল ফকীর। যেখানকার সে ছিল সেখানেই সে গেল যুক্ত হইয়া, সব বাদ-বিবাদ গেল ঘুচিয়া। ঘরেও সে রহিল না, বনেও সে গেল না, কিছু ক্লেশও সে করিল না, হে দাদূ, সহজ প্রেমধ্যানের উপদেশে, ঠিক যেমন ধারা তেমনি গেল মিলিয়া।† সদ্‌গুরু দেখাইয়া দিলেন যে এই অন্তরেই মসজিদ অন্তরেই দেবমন্দির, ভিতরেই সেবা ভিতরেই প্রণতি, তবে বৃথা আর বাহিরে কেন যাওয়া ? হে দাদূ, অন্তরের মধ্যেই চেলা, অন্তরের মধ্যেই গুরু, অন্তরেই উপদেশ। কেশে জটা বাঁধিয়া পাগলেরা বাহিরে বৃথা মরে খুঁজিয়া।”

** বিনা মালায় শ্বাসে শ্বাসে নাম জপই অজপা জাপ ; (পবন) শ্বাসই এই জপমালার গুটিকা, প্রেমই ইহার সূত্র, দিবানিশিই এই মালা ফিরিতেছে, ইহার সঙ্গে মন যদি যোগ দেয় তবেই জপ পূর্ণ হয়।

† “জ্যোঁ কা ত্যোঁ” অর্থে সাধকেরা বোঝেন যে পরমদেবতা ব্রহ্ম কল্পিত বা abstract নহেন। তিনি বিশ্বজগতে আত্মসত্তায় ও পরমসত্তায় ঠিক যেমনতরটি আছেন তেমনভাবেই স্বীকার্য্য। আমাদের মনের সৃষ্ট কোনো দর্শন বা তত্ত্ববাদ দিয়া দেখিতে গেলে যদি তাঁর মধ্যে কোনো অসঙ্গতি বৈচিত্র্য বা বিরোধ থাকে তবে তা থাকুক। সে সব সত্ত্বেও তাঁহাকে ঠিক সহজরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। আমাদের তত্ত্ববাদের বা দার্শনিকমতের অনুরোধে বিরোধহীন

প্রতি ঘটে অমৃত : ঘানি ঘুরিলে তিল বা ইক্ষু প্রভৃতির রস চুয়াইয়া পড়ে। বিশ্বজগতের সূর্য্য চন্দ্র তারা যে ঘুরিতেছে, তাহাতে ঘুরিতেছে বিশ্বের চক্র। তাই অমৃত মহারস পড়িয়া যাইতেছে বহিয়া, সাধনার দৃষ্টি নাই তাই সব বৃথা যাইতেছে। কবীর কহিয়াছেন—

“আঠহূ পহর মতৱাল লাগী রহৈ
আঠহূ পহরকী ছাক পীৱৈ।
আঠহূ পহর মস্তান মাতা রহৈ
ব্রহ্মকে দেহমেঁ ভক্ত জীৱৈ॥

(শান্তিনিকেতন কবীর ২য় ভাগ ৬৫ পৃঃ)

“অষ্টপ্রহর মত্ততা লাগিয়া আছে, অষ্টপ্রহরকে নিংড়াইয়া তার নির্য্যাস সাধক পান করিতেছেন। অষ্টপ্রহর সাধক সেই মত্ততায় মাতিয়া আছেন, ব্রহ্মের দেহে ভক্ত রহেন জীবন্ত।”

আমাদের চারিদিকেও যে বিশ্বের নাম ও রূপের চক্র চলিয়াছে ও কালের চক্র ঘুরিতেছে তাহাতে যে অমৃতরস বহিয়া যাইতেছে সাধনা না থাকায় তাহা আমরা হারাইতেছি। ঘানি চলিলেই তেল বা রস হয় না। তার মধ্যে কিছু বস্তু থাকা চাই। বিশ্বচক্রের মূলে, আমাদের চক্রের মূলে অমৃতস্বরূপ ব্রহ্ম বস্তুকে পাইলে অমৃতধারার আর বিরাম নাই। এ অমৃত পান করিলে কাল ও মৃত্যুকে জয় করিতে পারি।

ঘর ঘর ঘট কোল্হূ চলৈ অমী মহারস জাই।
অমর অভয় পদ পাইয়ে কাল কভী নহিঁ খাই॥
হৌঁ কী ঠাহর হৈ কহৌ তনকী ঠাহর তূঁ।
রীকী ঠাহর জী কহৌ জ্ঞান গুরুকা যূঁ॥

ন্যায়সঙ্গত করিতে গিয়া তাঁহাকে কৃত্রিম ও মিথ্যা করিয়া তুলিলে চলিবে না। তাঁহার অসীম অপার অগাধ অলেখ স্বরূপ, যুক্তি ও মতের সীমায় বদ্ধ আমাদের মনকে মুক্তি দিবে। সেই বদ্ধ মনের অনুরোধে যেন আমাদের মুক্তির একমাত্র উপায় ব্রহ্মকেও কৃত্রিম করিয়া আমাদের মুক্তির সম্ভাবনা একেবারে না হারাইয়া বসি।

"ঘরে ঘরে ঘটে ঘটে চলিয়াছে ঘানি, অমৃত মহারস যাইতেছে বহিয়া; অমর অভয়পদ প্রাপ্ত হও, কাল কখনও তোমাকে বিনাশ করিবে না।

"আছির" স্থলে কহিতে হইবে "আছে", "তনুর" স্থানে কহিতে হইবে "তুমি", "রী"র স্থানে কহিতে হইবে "জী" (পরম জীবন), এই রূপই গুরুর জ্ঞান মন্ত্র।"

দয়ার বেদনা ঃ গুরু যে বেদনা দেন তাহা দুঃখ দিবার জন্য নহে। সাধকদের মধ্যে নিহিত মহত্ত্ব আছে, তাহাকে বিকশিত করিতে হইবে বলিয়াই এই দুঃখ দেওয়া। মানবের মধ্যে মহত্ত্বের মনুষ্যত্বের অমর বীজ আছে বলিয়াই মানুষকে বিধাতা দুঃখের পর দুঃখ দিয়া বিকশিত করেন। পশুপক্ষী বৃক্ষলতার মধ্যে সেই বীজ নাই বলিয়াই মানুষের প্রাপ্য দুঃখ তাহাদের নাই। এই বেদনা যে না পাইল তাহার দুর্ভাগ্য, তাহার মধ্যে অমৃতের সম্ভাবনা সেই পরিমাণেই কম।

সোনে সেতীঁ বৈর ক্যা মারৈ ঘনকে ঘাই।
দাদূ কাটি কলংক সব রাখৈ কংঠ লগাই।
পানী মাঁহেঁ রাখিয়ে কনক কলংক ন জাহি।
দাদূ গুরুকে জ্ঞানসৌঁ তাই অগিনি মেঁ বাহি॥
মাহেঁ মীঠা হেত করি উপরি কড়ুৱা রাখি।
সতগুরু শিখকৌঁ সীখ দে সব সাধূঁ কী সাখি॥

"সোনার সঙ্গে কি শত্রুতা যে তাকে প্রকাণ্ড হাতুড়ীর আঘাত নিরন্তর মারা হয়? হে দাদূ, তার সব কলঙ্ক কাটিয়া যে তাকে কণ্ঠে (হার করিয়া) রাখে লাগাইয়া। জলের মধ্যে যদি রাখ তবে তো সোনার কলঙ্ক যাইবে না। তাই হে দাদূ, গুরুর জ্ঞান দিয়া তাহাকে অগ্নিতে ফেলিয়া দিয়া করিতে হয় তপ্ত। সদ্‌গুরু অন্তরে মধুর প্রেম রাখিয়া বাহিরে রাখেন কটুভাব, এমন করিয়াই তিনি শিষ্যকে দেন শিক্ষা, সব সাধুই এই কথায় একই সাক্ষ্য দিবেন।"

কুশিষ্য ঃ তাই বলিয়া কুশিষ্য বা কুগুরু যে নাই, তাহাও নহে। শিষ্য যদি ভাল না হয় তবে সদ্‌গুরুর সব চেষ্টাই বিফল হইয়া যায়। তাহা হইলে সাধনার জন্য সব বেদনাই বিফল হয়।

কহি কহি মেরী জীভ রহী সুনি সুনি তেরে কান।
সতগুরু বপুরা ক্যা করৈ চেলা মূঢ় অজ্ঞান॥
পংচ সৱাদী পংচ দিসি পংচে পাঁচো বাট।
তবলগ কহা ন কীজিয়ে গুরু দিখায়া ঘাট॥
জ্ঞান লিয়া সব সীখি সুনি মনকা মৈল ন জাই
তৌ দাদূ ক্যা কীজিয়ে বুরী বিথা মন মাহিঁ॥

"কহিয়া কহিয়া আমার রসনা ও শুনিয়া শুনিয়া তোমার কান হইল হয়রান, সদ্‌গুরু বেচারা করিবে কি? চেলাই যে মূঢ় অজ্ঞান। (পঞ্চেন্দ্রিয়ের) পাঁচদিকে পাঁচ রকম (রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ) স্বাদ, পাঁচের পাঁচ রকম পথ; যে পর্য্যন্ত না গুরু (এই পঞ্চেন্দ্রিয়কে সহায় করিয়া পঞ্চরসে মধুর সাধনায়) ঘাট (পথ) দেখাইয়া দেন, সে পর্য্যন্ত এসম্বন্ধে কোনো কথা বলিও না। শিষ্য তো জ্ঞান সব শুনিয়া শিখিয়া নিল, মনের ময়লা তো গেল না; তবে দাদূ কি করিবে? ব্যর্থ ব্যথাই রহিয়া গেল মনের মধ্যে।"

কুগুরু ঃ আবার উপদেশক গুরু যদি যোগ্য না হন তবে সাধকের সব দুঃখই বৃথা। যে নিজেই মানবের অন্তরমন্দিরের নিগূঢ় রহস্য না জানে সে আবার কিসের উপদেশ দিবে? এক মিথ্যা হইতে নিয়া অপর মিথ্যার মধ্যে যদি গুরু ফেলেন? নিজে না জানিয়া যদি অন্যকে দেন উপদেশ, তবে সেই উপদেশ কোথায় লইয়া যাইবে? তখন গুরুর নিজের ও যেমন দুর্গতি শিষ্যেরও তেমনি দুর্গতি।

অংধে অংধা মিলি চলে দাদূ বাঁধি কতার।
কুপ পড়ে হম দেখতে অংধে অংধা লার॥
সোধী নহীঁ সরীরকো ঔরোঁ কো উপদেস।
দাদূ অচরজ দেখিয়া যে জাহিঁগে কিস দেস॥
মায়া মাহৈঁ কাঢ়ি করি ফিরি মায়া মেঁ ডার।
দাদূ সাঁচা গুরু মিলৈ সনমুখ সিরজনহার॥
তূঁ মেরা হঁউ তেরা গুরু সীখ কিয়া মংত।
দোনোঁ ভূলে জাত হৈঁ দাদূ বিসরা কংত॥

"হে দাদূ, অন্ধের সঙ্গে অন্ধ যুক্ত হইয়া কাতার বাঁধিয়া চলিয়াছে, আমি দেখিতেছি অন্ধের পর অন্ধ সারি বাঁধিয়া পড়িতেছে কূপে। (গুরু) নিজেকে বিশুদ্ধ করিল না, দেহের মধ্যে খুঁজিয়া দেখিল না, অথচ আর সকলকে দিতেছে উপদেশ! দাদূ এই আশ্চর্য্যই দেখিতেছে, ইহারা চলিয়াছে কোন দিকে? ইহারা মিথ্যা হইতে মানুষকে বাহির করিয়া আবার মিথ্যাতেই ডুবাইতেছে; হে দাদূ, সত্য গুরু যদি মেলে (তবে তিনি দেখাইয়া দেন) সম্মুখেই সৃজনকর্ত্তা। "তুমি আমার আমি তোমার"* গুরু শিষ্য এই মন্ত্র তো জপিলেন; হে দাদূ, স্বামীকে বিস্মৃত হইয়া এই উভয়েই চলিলেন ভুলিয়া।"

পণ্ডিত আরও পথ ভুলাইয়া দেয়।

ভরম করম জগ বংধিয়া পংডিত দিয়া ভুলাই।
দাদূ সতগুরু না মিলৈ মারগ দেই দেখাই॥
পংথ বতাৱৈ পাপ কা ভরম করম বেসাস।
নিকট নিরংজন জো রহৈ ক্যোঁ ন বতাৱৈ তাস॥
আপ সৱারথ সব সগে প্রাণ সনেহী কাম।
দুখ কা সাথী সাইয়াঁ প্রেম ভগতি বিস্রাম॥

"একেই তো জগৎ ভ্রমে ও কর্ম্মজালে বদ্ধ, তার উপর আবার ভরমে করমে জগৎকে বাঁধিয়া পণ্ডিত সকলকে ভুলাইল। হে দাদূ, পথ দেখাইয়া দেন এমন সদ্‌গুরু তো মেলে না। গুরু পাপের পথই করেন উপদেশ, ভরমে করমে করেন বিশ্বাস; নিকটে যে নিরঞ্জন আছেন তাঁর কথা কেন বলেন না? নিজের স্বার্থে সবাই হয় আপন, প্রাণের প্রেমীই দরকার। দুঃখের সাথী এক স্বামী; প্রেম ভক্তিই যথার্থ বিশ্রাম। †

---

* "তুমি আমার আমি তোমার" (তৈঁ মেরা মৈঁ তেরা) এটি মরমী সাধকদের গায়ত্রী মন্ত্র বিশেষ। ইহা অনেকে শ্বাসের সহিত জপ করেন। এই মন্ত্রটির উদ্দেশ্য হওয়া উচিত পরব্রহ্ম ভগবান। ক্ষুদ্র গুরুরা যখন ভগবানের স্থানে নিজেকেই এই মন্ত্রের লক্ষ্য করিতে চান তখনই শিষ্যদের ঘটে দুর্গতি।

† সাধকেরা প্রায়ই বলেন "প্রেমেতেই সকল ক্ষোভের ও সকল গতির শান্তি।"

সত্যশিক্ষা বিস্তৃত রচনা নহে : অল্প বাণীও যদি সত্য হয়, তবে তাতেই সব সিদ্ধ হয়। তবে তাহা সত্যদ্রষ্টার বাণী হওয়া চাই।

একৈ সবদ অনংত সিখ জব সতগুরু বোলৈ।
দাদূ জড়ে কপাট সব দে কুঁচী খোলৈ॥

"যখন সদ্‌গুরু বলেন, তখন একটি "শবদেই" (সঙ্গীতেই) অনন্ত শিক্ষা। হে দাদূ, যে সব কপাট জোড়ালাগা বন্ধ, সেই শবদের চাবি দিয়াই সে সব তিনি দেন খুলিয়া।"

প্রথম প্রকরণ—জাগরণ

দ্বিতীয় অঙ্গ—সাধু অঙ্গ

ভাব ও ভক্তির প্রত্যক্ষ রূপ-সাধু : গুরুর সঙ্গে সাধকের সম্বন্ধ ব্যক্তিগত, আর সাধকদের সঙ্গে সাধকের সম্বন্ধ সমূহগত ; সকল সাধকই আমাদের সাধনার সহায়।

নিরাকার পরব্রহ্মকে আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই না, কিন্তু ভগবৎপ্রেমে ভরপূর সাধক আমাদের প্রত্যক্ষ। তাঁদের প্রেম ভক্তি আমাদের প্রেম-ভক্তিকে জাগ্রত করে, তাঁদের ভগবদ্‌রস-পিপাসা আমাদের পিপাসাকে জীবন্ত করে।

মাটির মধ্যে যে রস আছে তাহা মানুষ ভোগ করিতে পায় না। বৃক্ষ সেই পার্থিব রসকে লইয়া ফলে ফুলে পত্রে মূলে অপার্থিব রসে পরিণত করিয়া দিলে মানুষ তাহা গ্রহণ ও সম্ভোগ করিতে পারে। অনির্ব্বচনীয় ব্রহ্মরসও তেমনি সাধকদের জীবনে জীবন্ত ও সম্ভোগ্য হইয়াই আমাদের পক্ষে গ্রহণীয় হয়। এই জন্যই অলখ অগম্য ব্রহ্মরসকে সাধকের মধ্যেই গম্য ও প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই, ব্রহ্মকেও সাধকের মধ্যে জীবন্ত ও প্রত্যক্ষ দেখি।

নিরাকার মন সুরতি সৌঁ প্রেম প্রীতি সৌঁ সেব।
জে পূজৈ আকার কো তৌ সাধূ পরতখ দেব।

"হে মন, সরস ভাবে প্রেমে ও প্রীতিতে নিরাকারকে সেবা কর; যদি আকারকে পূজা করিতে চাও, সাধুই তবে প্রত্যক্ষ দেবতা।"

রূপ ও ভাবের পরস্পরে পূজা : নিরাকার বা আকার কেহই তুচ্ছ নয়। যদি আকারের প্রত্যেক অণুতে প্রত্যেক তনুতে নিরাকার প্রকাশিত না হয় তবে নিরাকারের কোন অর্থই নাই, তা সে যতই অসীম বা অপার হউক না কেন। প্রতি পলে প্রতি দণ্ডে যদি অনন্ত (কাল) আপনাকে প্রত্যক্ষ করাইয়া না তোলে তবে সে অনন্তের কোনো অর্থই নাই। আবার আকারেরও কোনো মূল্য নাই যদি নিরাকার অসীমকে সে প্রকাশ না করে। দণ্ড পলের কোনো সত্যই নাই যদি অনন্তের প্রকাশ তাহাতে না থাকে।

তাই ভারতীয় মধ্যযুগের সাধকেরা বার বার বলিয়াছেন—"সীমা অসীমকে পূজা করে, ক্ষণ ও পল অনন্তের পূজা করে। আবার অসীম ও অনন্ত পূজা করে সীমা ও ক্ষণকে। কারণ ইহাকে ছাড়িলে উহার অর্থ নাই, উহাকে ছাড়িলে ইহারও মূল্য নাই।"

ৱাস কহৈ হম ফূল কো পাউঁ ফূল কহৈ হম ৱাস।
ভাস কহৈ হম সত কো পাউঁ সত কহৈ হম ভাস॥
রূপ কহৈ হম ভাৱ কো পাউ ভাৱ কহৈঁ হম রূপ।
আপস মেঁ দউ পূজন চাহৈ পূজা অগাধ অনূপ॥*

"গন্ধ বলে, যেন আমি ফুলকে পাই! (তবে আমি আশ্রয় ও প্রকাশ পাইতাম), ফুল বলে, যেন আমি গন্ধকে পাই (তবে আমি সার্থক হইতাম)।

ভাস (প্রকাশ) বলে, যেন আমি সত্যকে পাই; আর সত্য বলে, যেন আমি ভাসকে পাই! রূপ বলে, যেন আমি ভাবকে পাই, আর ভাব বলে যেন আমি রূপকে পাই। পরস্পরে উভয়ে উভয়কে করিতে চাহে পূজা! অগাধ (অসীম, অপার, অতলস্পর্শ) অনুপম হইল এই পরস্পরকে পরস্পরের পূজা!"

---

* এই বাণীটি তৃতীয় প্রকরণ, তৃতীয় অঙ্গ, "বিচার" অঙ্গেও আছে।

সাধুর মাহাত্ম্য ঃ

রূখ বিরিখ বনরাই সব চংদন পাসৈঁ হোই।
দাদূ ৱাস লগাই করি কিয়ে সুগন্ধে সোই॥
সাধু নদী জল রাম রস তহঁা পখালৈ অংগ।
দাদূ নিরমল মল গয়া সাধূ জনকে সংগ॥
সাধু মিলৈ তব উপজৈ প্রেম ভগতি রূচি হোই।
দাদূ সংগতি সাধুকী দয়া করি দেৱৈ সোই॥
সাধু মিলৈ তব উপজৈ হিরদয় হরিকী প্যাস।
দাদূ সংগতি সাধুকী অৱিগতি পূরৱৈ আস॥

(গন্ধহীন) "বৃক্ষ পাদপ বনস্পতি যদি চন্দনের নিকট থাকে, তবে হে দাদূ, সেই চন্দনই আপন গন্ধ লাগাইয়া তাহাকে লয় সুগন্ধ করিয়া। সাধুরা যেন নদী, ভগবদ্‌রস সেই নদীর জল, হে দাদূ সেইখানে অঙ্গ প্রক্ষালন করিলে সাধুজনের সঙ্গগুণে সব মল দূর হইয়া যায় নির্ম্মল হইয়া।

সাধু যদি মিলে, তবেই তা প্রেম ভক্তি উপজে (অঙ্কুরিত হইয়া জীবন্ত হইয়া ওঠে), তবেই প্রেমে ভক্তিতে হয় রুচি। হে দাদূ, তিনিই দয়া করিয়া সাধু সংগতি করেন দান।

সাধু যদি মিলে, তবেই তো হৃদয়ে উপজে হরির পিপাসা, হে দাদূ, সাধুর সঙ্গতি গুণেই সেই অপার অগম্য আকাঙ্ক্ষা ও লালসা হয় পূর্ণ।"

সঙ্গীতের ব্যথা দেন সাধু ঃ

সাধু সপীড়া মন করৈ সতগুরু সবদ সুনাই।
মীরাঁ মেরা মিহর করি অংতর বিরহ উপাই॥
জ্যোঁ জ্যোঁ হোৱৈ ত্যোঁ কহৈ ঘট বঢ় কহৈ ন জায়।
দাদূ সো সুধ আতমা সাধু পরসৈ আই॥

"সদ্‌গুরুর সবদ (সঙ্গীত) শুনাইয়া সাধু আমার মনকে বেদনায় করেন ব্যথিত, আমার প্রভু দয়া করিয়া অন্তরে বিরহ করেন উৎপন্ন।

যেমন যেমন ঘটে তেমন তেমনই যে বলে, একটুও কম বা বেশী করিয়া

বলা যাহার পক্ষে অসম্ভব, হে দাদূ, সেই শুদ্ধ আত্মাকে সাধু আসিয়া করেন পরশ।”

সাধু সঙ্গতির রস অপার্থিব, জগতে আর কোথাও তাহা মিলিবে না।

দাদূ পায়া প্রেম রস সাধু সংগতি মাহিঁ।
ফিরি ফিরি দেখৈ লোক সব য়হু রস কতহূঁ নাহিঁ॥
জিস রস কো মুনিবর মরৈঁ সুরনর করৈঁ কলাপ।
সো রস সহজৈঁ পাইয়ে সাধু সংগতি আপ॥

“সাধু-সঙ্গতির মধ্যে দাদূ যে প্রেমরস পাইয়াছে, সকল লোক ফিরিয়া ফিরিয়া দেখিল সেই রস আর কোথাও নাই। যেই রসের জন্য মুনিবর মরিতেছেন, সুর নর যার জন্য করিতেছেন কলাপ (বিলাপ, শোক), সেই রস সাধু সঙ্গতির মধ্যে সহজেই পাইবে আপনি।”

সাধু সঙ্গতি প্রাণ জুড়ায়, স্বর্গে বা লোকে কোথাও সেই শান্তি নাই।

দাদূ নেড়া দূরতৈঁ অবিগতি কা আরাধ।
মনসা বাচা করমনা দাদূ সংগতি সাধ॥
সরগ ন সীতল হোই মন চংদ ন চংদন পাস।
সীতল সংগতি সাধুকী কীজৈ দাদূ দাস॥
দাদূ সীতল জল নহীঁ হিম নহিঁ সীতল হোই।
দাদূ সীতল সংত জন রাম সনেহী সোই॥
দাদূ চংদন কদি কহ্যা অপনা প্রেম প্রকাস।
যেহি* দিসি পরগট হোই রহ্যা সীতল গন্ধ সুবাস॥
দাদূ পারস কদি কহ্যা মুঝতৈঁ কংচন হোই।
পারস পরগট হোই রহ্যা সাচ কহৈ সব কোই॥

---

* “দহ দিশি” পাঠে, “দশ দিকেই” অর্থ হইবে।

"অনির্বচনীয়ের আরাধনাকে যদি সুদূর ও অজ্ঞেয় ধাম হইতে নিকটস্থ ও প্রত্যক্ষ করিতে চাও তবে মন বচন ও কর্ম দিয়া হে দাদূ, সাধুসঙ্গ কর সাধন। এই মন স্বর্গে ও শীতল হয় না, চন্দ্র বা চন্দনের কাছেও শীতল হয় না, সাধুর সঙ্গতিই শীতল, হে দাস দাদূ, তাহাই কর সাধন। জলও শীতল নয়, হিমও শীতল নয়; হে দাদূ, যে সাধক ভগবৎপ্রেমে প্রেমিক, একমাত্র শীতল সে-ই। হে দাদূ, চন্দন কবে আপনার প্রেম প্রকাশ করিয়া বলিয়াছে? যে দিকে সে বিদ্যমান থাকে সেই দিকেই শীতল গন্ধ ও সুবাস বিরাজিত। পরশ মণি কবে কহিয়াছে, 'আমা হইতে হয় কাঞ্চন?' হে দাদূ, পরশ যখন তাহার প্রত্যক্ষ হয় তখন সবাই বলে, হাঁ সাচ্চা বটে।"

ভক্তের মহিমা ঃ

ধরতী অংবর রাত দিন রবিসসি নাৱৈঁ সীস।
দাদূ বলি বলি ৱারণে জে সুমিরৈঁ জগদীস॥
চংদ সূর সিজদা করৈঁ নাৱঁ অলহ কা লেই।
দাদূ জিমীঁ অসমান সব উন পাউঁ সির দেই॥

"যিনি জগদীশের নাম স্মরণ করেন, হে দাদূ তাঁহার নিছনি লইয়া মরি; ধরিত্রী, অম্বর, দিন রাত্রি, রবি শশী (তাঁর চরণে) মাথা করে প্রণত। যিনি আল্লার নাম নেন, চন্দ্র সূর্য্য তাঁহার চরণে করে প্রণতি, হে দাদূ, সমস্ত স্বর্গ ও মর্ত্ত্য তাঁর পায়ে মাথা করে প্রণত।"

ভক্তের-শোভা ঃ

জে জন হরিকে রংগ রংগে সো রংগ কভী ন জাই।
সদা সুরংগে সংত জন রংগ মেঁ রহে সমাই॥
সাহিব কিয়া সো ক্যোঁ মিটৈ সুংদর সোভা রংগ।
দাদূ ধোৱৈঁ বাৱরে দিন দিন হোই সুরংগ॥

"যে জন হরি রঙ্গে* রঙ্গিয়াছে সে রঙ্গ তো কখনও যায় না; সাধক জন

---

* রং অর্থ এখানে নয়নের গ্রাহ্য সুন্দরবর্ণ ও অন্তরের গ্রাহ্য লীলা দুইই হইতে পারে।

সদাই সু-রঙ্গে রঙ্গিয়া সেই রঙ্গেই আছেন ভরপুর হইয়া। স্বামী যে সুন্দর শোভা রঙ্গ করিয়া দিয়াছেন তাহা কেন যাইবে মিটিয়া? ওরে দাদূ, পাগল লোক সে রঙ্গ যতই ধুইয়া তুলিতে চায়, ততই দিন দিন তাহা আরও হইতে থাকে সু-রঙ্গ।"

সত্য সাধু কে? যিনি অপকার পাইলেও উপকারই ফিরাইয়া দিতে পারেন, যিনি বিষ পাইলেও ফিরাইয়া দেন অমৃত, বাঁকা পাইলেও সরল করিয়া দিতে পারেন ফিরাইয়া, তিনিই সত্য সাধু। তিনি অপূর্ণকে পূর্ণ, ক্ষারকে মিষ্ট, ফুটাকে সারা করিয়া দিতে পারেন। এমন সাচ্চা সাধক দুর্লভ, কিন্তু ইহাই হইল সাচ্চা সাধুর লক্ষণ।"

ৱিষকা অমৃত করি লিয়া পাৱককা পাণী।
বাঁকা সূধা করি লিয়া সো সাধু বিনাণী॥
ঊরা পূরা করি লিয়া খারা মীঠা হোই।
ফূটা সারা করি লিয়া সাধু বমেকী সোই॥
বংধ্যা মুক্তা করি লিয়া উরঝা সুরঝি সমান।
বৈরী মিংতা করি লিয়া দাদূ উত্তিম জ্ঞান॥
ঝূঠা সাঁচা করি লিয়া কাচা কংচনসার।
মৈলা নির্মল করি লিয়া দাদূ জ্ঞান বিচার॥

"বিষকে যে লইল অমৃত করিয়া, অগ্নিকে (তপ্তকে) যে জল (শীতল) করিয়া লইল, বাঁকাকে যে সিধা করিয়া লইল, এমন সাধুই যথার্থ জ্ঞানী। উনকে যে পূর্ণ করিয়া লইল, ক্ষার যাঁহার (কাছে আসিয়া) হইয়া গেল মিঠা, ফুটাকে যে লইল সারা (আস্ত, পূর্ণাঙ্গ) করিয়া, সেই সাধুই তো বিবেকী। বদ্ধকে যে লইল মুক্ত করিয়া, অবরুদ্ধকে যে লইল বিগতপাশ করিয়া, বৈরীকে যে করিয়া লইল মিত্র, তাহারই তো উত্তম জ্ঞান। ঝুঠাকে যে করিয়া লইল সাচ্চা, কাচকে (অসার) যে লইল কাঞ্চন-সার করিয়া, ময়লাকে যে করিয়া লইল নির্মল, তাহারই তো জ্ঞান বিচার।"

সাধনাতে মিথ্যা অচলঃ সাধুদের সব হইতে বড় কাজ যে তাঁরা "ঝুটা"কে নেন "সাচ্চা" করিয়া। কারণ সাধনার জগতে

"ঝুটা" কোনো মতেই চলে না। কারণ যাহার বলে মানুষ তরিবে, যাহার বলে মুক্ত হইবে, তারই মধ্যে যদি থাকে "ঝুটা"; তবে তাহাতেই মরিবে ডুবিয়া, তাহাতেই পচিয়া মরিবে বদ্ধ হইয়া। সাধনার জগতেই দেখিতে পাই আসিয়া জুটিয়াছে যত কপট যত মিথ্যা, অথচ এখানে কপটতামাত্রই অচল।

জহঁ তিরিয়ে তঁহ ডূবিয়ে মন মেঁ মৈলা হোই।
জহঁ ছূটৈ তহঁ বংধিয়ে কপটি ন সীঝৈ কোই॥

"মনে যদি ময়লা থাকে (হে সাধক), তবে যাহাতে করিয়া তরিবে তাহাতেই মরিবে ডুবিয়া। যাহাতে মুক্ত হইবে তাহাতেই মরিবে বদ্ধ হইয়া, (সাধনার ক্ষেত্রে) কপটে কিছুই সিদ্ধ হইবার নহে।"

সেবার ও সেবকের রহস্য ঃ সাধকেরা সেবার যোগে চন্দ্র সূর্য্য পবন জল রাত্রি দিন বৃক্ষলতা সকল বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে সমভাবে যুক্ত। চন্দ্র সূর্য্য আদি প্রকৃতির এই সব সাধকেরা সেবার যোগেই হইয়াছেন মহৎ। মানব সাধকেরাও সেবার দ্বারাই ইহাঁদেরই মত বিরাট ও গভীর হইতে পারেন। স্বার্থ ও সঞ্চয়ের ভারই আমাদিগকে ভারগ্রস্ত ও বদ্ধ করে ক্ষুদ্র করে ও বিশ্বজীবনের ধারা হইতে বঞ্চিত করে।

চংদ সুর পাৱক পৱন পানীকা মত সার।
ধরতী অংবর রাত দিন তরৱর ফলৈ অপার॥
জিসকা তিসকো দীজিয়ে সুকরিত পর উপকার।
দাদূ সেৱক সো ভলা সির নহিঁ লেৱৈ ভার॥
পরমারথ কো রাখিয়ে কীজৈ পর উপকার।
দাদূ সেৱক সো ভলা নীরংজন নিরাকার॥

"চন্দ্র সূর্য্য, পাবক পৱন জল, ধরিত্রী আকাশ, রাত্রি দিন, অপার ফলে ফলবান তরুবর, এই সবাকার (সেবা করিবার) মতই দেখ সার মত। যাহার যাহা (প্রাপ্য ও প্রয়োজন) তাহা তাহাকেই দাও, পর উপকারই সুকৃত; হে দাদূ সেই তো ভাল সেবক যে নিজ মাথায় (স্বার্থ ও সঞ্চয়ের) ভার বৃথা বহিয়া

বেড়ায় না। পরম অর্থ সাধন কর, পর উপকার কর; হে দাদূ, সেবক তো সে-ই ভাল যে নিরঞ্জন ও নিরাকার।" *

সেবাই প্রভুকে স্বীকার করা ঃ প্রভু আমার নিজেই সেবক। তাঁকে যে স্বীকার করিবে সে সেবা দ্বারাই স্বীকার করিবে। মুখে যে স্বীকার করে অথচ সেবাদ্বারা যে স্বীকার করে না, তাহাকে প্রভুর সেবক বলা চলে না। মুখে সে আস্তিক হইলেও জীবনে সে নাস্তিক।

সেৱা সুকরিত সব গয়া মৈঁ মেরা মন মাহিঁ।
দাদূ আপা জব লগৈ সাহিব মানৈ নাহিঁ॥

"সেবা সুকৃত সবই গেল, মনের মধ্যে রহিল শুধু আমি ও আমার। হে দাদূ, যতক্ষণ অহমিকা স্বার্থ আছে ততক্ষণ স্বামীকে স্বীকার করাই হয় নাই।" **

সাধুর কাছে বিশ্রাম ও শান্তি ঃ

ফিরতা চাক কুম্‌ভার কা য়োঁ দীসৈ সংসার।
সাধূ জন নিহচল ভয়ে জিনকে রাম অধার॥
জলতী বলতী আতমা সাধু সরোৱর জাই।
দাদূ জীৱৈ রামরস সুখমেঁ রহে সমাই॥
অসত মিলৈ অংতর পড়ৈ ভাৱ ভগতি রস জাই।
সত মিলৈ সুখ উপজৈ আনন্দ অংগি ন মাই॥

"সবাই দেখিতেছে যে সংসার চক্র কেবলি ঘুরিতেছে কুমারের চাকের মত; তাহার মধ্যে কেবল সাধুজনই স্থির, রাম যাঁহাদের আধার। জ্বলিয়া পুড়িয়া আত্মা (মানুষ) যখন সাধু-সরোবরে যায়, হে দাদূ, সে তখন ভাগবত-রস পান করিয়া আনন্দ সরোবরে থাকে ডুবিয়া। অসৎ যদি আসিয়া মিলে তবে পড়িয়া যায় ব্যবধান (সব কিছুর সঙ্গে যোগ হয় নষ্ট); ভাব, ভক্তিরস, সব যায় দূরে। সৎ আসিয়া মিলিলে উপজে আনন্দ, আনন্দ আর তখন ধরে না অঙ্গে।"

---

* ব্রহ্ম আপনার অসীম বিভূতি অপারভাবে দান করিয়া নিরঞ্জন নিরাকার হইয়া আছেন। তাহাই তাঁহার মহত্ত্ব। তাঁর কাছেই এই ব্রতের দীক্ষা লও।

** "স্বামী তাহা মানিতে পারেন না", অর্থও হয়।

সেবক কখনই একা নহে; প্রভুই সেবকের সহায় ও সাথী :

সব জগ দীসৈ একলা সেৱক স্বামী দোই ।
জগত দুহাগী রাম বিন সাধু সুহাগী সোই ॥
অংতর এক অনংত সোঁ সদা নিরংতর প্রীতি ।
জিহি প্রাণ প্রীতম বসৈ বৈঠা ত্রিভৱন জীতি ॥
আনংদ সদা অডোল সোঁ রামসনেহী সাধ ।
প্রেমী প্রীতম কো মিলৈ য়হু সুখ অগম অগাধ ॥

"সমস্ত জগৎ দেখিতেছে (সেবক) একলা, কিন্তু সেবক স্বামী দুইই আছেন (যুক্ত)। রাম বিনা জগৎ দুর্ভাগ্য, ভগবৎ-সঙ্গ পাইয়াই সাধু সৌভাগ্যশালী। যে অন্তর এক অনন্তের সঙ্গেই আছে যুক্ত, সদাই তাঁর সঙ্গে যার নিরন্তর চলিয়াছে প্রীতি, যেই প্রাণে প্রিয়তম বিরাজমান, সে ত্রিভুবন জিতিয়া বসিয়াছে। ভগবৎপ্রেমিক সাধুর সেই অটল ভগবানের সঙ্গেই সদা আনন্দ। প্রেমিকের হইল প্রিয়তমের সঙ্গে মিলন, সেই আনন্দ অগম্য ও অগাধ।"

ভক্তের জীবনই সর্ব্বাপেক্ষা সহজ প্রচার। যে জীবন ব্রহ্মজ্যোতি লাভ করিল সে কি আর নিজেকে কোথাও লুকাইতে পারে ? সদাই সেই ভক্তের দেহ-প্রদীপে ব্রহ্ম জ্যোতির শিখা দীপ্যমান। এই জ্যোতিতে সব অন্ধকার বিদূরিত ও যত প্রাণ-পতঙ্গ আকৃষ্ট।

ভক্ত ব্রহ্ম-প্রদীপ :

জিঁহিঁ ঘটি দীপক রামকা তিঁহিঁ ঘটি তিমর ন হোই ।
উস উজিয়ারে জোত কো সব জগ দেখৈ সোই ॥
য়হু ঘট দীপক সাধুকা ব্রহ্ম জোতি পরকাস ।
দাদূ পংখী সংত জন তহাঁ পরৈঁ নিজ দাস ॥
ঘর বন মাঁহৈঁ রাখিয়ে দীপক জোতি জগাই ।
দাদূ প্রাণ পতংগ সব জহঁ দীপক তহঁ জাই ॥

ঘর বন মাঁহৈঁ রাখিয়ে দীপক জলতা হোই।
দাদূ প্রাণ পতংগ সব আই মিলৈঁ সব কোই॥
ঘর বন মাঁহৈঁ রাখিয়ে দীপক প্রগট প্রকাস।
দাদূ প্রাণ পতংগ সব আই মিলৈঁ উস পাস॥
ঘর বন মাঁহৈঁ রাখিয়ে দীপক জোতি সহেত।
দাদূ প্রাণ পতংগ সব আই মিলৈঁ উস হেত॥

"যেই ঘটে ভগবৎ প্রদীপ শিখা জ্বলিতেছে সেই ঘটে তিমির থাকিতেই পারে না, সেই উজ্জ্বল জ্যোতি দেখিলে জগতের সবাই বুঝে যে ইহা সেই জ্যোতি। সাধকের দেহখানি তো একটি দীপের মত, ব্রহ্মজ্যোতিতে সে দীপ্যমান ; হে দাদূ ভগবানের দাস যত সন্তজনেরা পক্ষীর মত আসিয়া সেই দীপশিখায় পড়ে ঝাঁপাইয়া। ঘরের মাঝে বা বনের মাঝে যেখানেই এই প্রদীপ রাখ জালাইয়া, হে দাদূ, যত সব প্রাণ পতঙ্গ, যেখানে এই দীপ সেখানেই যাইবে চলিয়া। ঘরের মাঝেই রাখ বনের মাঝেই রাখ, এই প্রদীপ যদি জ্বলিতে থাকে, তবে যত প্রাণ পতঙ্গ সবাই আসিয়া মিলিবে সেখানে। ঘরের মাঝে বনের মাঝে যেখানেই রাখ এই দীপ-জ্যোতি প্রত্যক্ষ প্রকাশ হইবেই হইবে ; হে দাদূ, যত সব প্রাণ পতঙ্গ তার কাছে আসিয়া মিলিবেই মিলিবে। ঘরের মাঝে বনের মাঝে যেখানেই রাখ, দীপকের জ্যোতির সঙ্গে আছে প্রেমের যোগ ; হে দাদূ, যত সব প্রাণপতঙ্গ তাই সেই দীপশিখার প্রেমে সেখানে আসিয়া পড়িবেই পড়িবে।"

ব্রহ্ম-ঐশ্বর্য্যে সাধুরা ঐশ্বর্য্যবান্ঃ অসীম নিরাকার পরব্রহ্মের সাধকগণের চরণধূলি চাই। তাঁরা সামান্য নহেন ; নিরাকার অসীম প্রভুর সব (আধ্যাত্মিক) ঐশ্বর্য্য, সকল সম্ভাবনা, সব প্রেমরস-রচনা তাঁর সেবকদের মধ্যেই প্রকাশিত হইবে। তাঁর সেবকরাই তাঁহার প্রত্যক্ষ বিগ্রহ, কাজেই প্রভু হইতে তাঁহাদের অভিন্ন ধরা যাইতে পারে। ব্রহ্মামৃত রস যাহার সাধনার অতীত, সাধকদের সাধনামৃত রসে সে নবজীবন পাইবে। সাধুদের সেই অপার্থিব রস অন্তরে গ্রহণ করিয়া নব-জীবন লাভ করিতে চাই। সেই রসকে বাহিরে বহিয়া যাইতে দিতেছি বলিয়া অন্তরের শুষ্কতা কিছুতেই দূর হইতেছে না।

নিরাকার সোঁ মিলি রহৈ অখংড ভগতি করি লেহ।
দাদূ ক্যোঁ কর পাইয়ে উন চরণোঁ কী খেহ।
সাহিব কা উনহার সব সেৱগ মাঁহৈঁ হোই।
দাদূ সেৱগ সাধু সোঁ দূজা নাহিঁ কোই॥
সোই জন সাধু সিদ্ধ সো সোঈ সকল সিরমৌর।
জিহিঁ কে হিরদৈ হরি বসৈ দূজা নাহীঁ ঔর॥
সবহী মিরতক দেখিয়ে কিহিঁ বিধি জীৱৈ জীৱ।
সাধু সুধারস আনি করি দাদূ বরিষৈ পীৱ॥
হরি জল বরিষে বাহিরা সূখে কায়া খেত।
দাদূ হরিয়া হোইগা সীঁচনহার সুচেত॥

"নিরাকারের (পরব্রহ্মের) সঙ্গে মিলিয়া যুক্ত থাকিয়া অবিচ্ছিন্ন পরিপূর্ণ ভক্তি সাধনা করিয়া নিয়াছেন যে সাধক, হে দাদূ, কেমন করিয়া মেলে তাঁর চরণের ধূলি? স্বামীর (মহত্ত্ব) অনুসারে তাঁর সেবকের মধ্যেই সব কিছু সিদ্ধ হইবে, হে দাদূ, (আমার স্বামী ও) সেবক সাধুর মধ্যেই তাই কোনো প্রভেদই নাই। যাঁহার হৃদয়ে হরি বাস করেন সেই জনই তো সাধু, সেই জনই তো সিদ্ধ, সে-ই তো সকলের মাথার মুকুটমণি, তাঁহা হইতে পর ও বিভিন্ন কিছুই নাই। (বিশ্ব ও বিশ্বনাথ সবই যে তিনি আপনা হইতে অভিন্ন মনে করেন। সর্ব্বভূতে ও পরমাত্মাতে যেমন সত্য করিয়া তিনি আপনাকে উপলব্ধি করিয়াছেন তেমন করিয়া তিনি আপনার সঙ্কীর্ণ ব্যক্তিত্বের মধ্যে নিজেকে তো উপলব্ধি করেন নাই)।

সবই তো দেখা যাইতেছে মৃত, জীব বাঁচে কেমন করিয়া? (মৃতকে নবজীবন দিবার জন্য) প্রিয়তম আবার সাধু সুধারস আনিয়া প্রেমধারা করিতেছেন বর্ষণ। সেই হরি-জল যাইতেছে বাহিরেই বরষিয়া, অথচ জীবনের (সাধনার ক্ষেত্র) কায়াক্ষেত্র চলিয়াছে শুকাইয়াই; (অন্তরে সেই হরিপ্রেমরস-ধারা কর গ্রহণ) সব জীবন্ত সবুজ হইয়া যাইবে, সেচনকারী যে বড়ই সুবিবেচক ও সহৃদয় (সুচেত)।"

ব্রহ্ম হইতেও সাধু সরস। ব্রহ্ম অসীম হইতে

পারেন কিন্তু সাধুর মধ্যে যে মাধুর্য্যটি পাই ব্রহ্মে তাহা মিলে কই? সমুদ্র অসীম, কিন্তু গঙ্গা যমুনা সরস্বতীর মধ্যে যে মাধুর্য্য তাহা সমুদ্রে কোথায়? অথচ এই সমুদ্রই হইল গঙ্গা যমুনা সরস্বতীর আরাধ্য ধাম, এরই সঙ্গে মিলিতে ইহারা দিবানিশি ধাবমান, কারণ তাহা না হইলে এদেরও মাধুর্য্য থাকিত না, ইহারাও পচিয়া বিকৃত হইয়া উঠিত। যুগে যুগে দেশে দেশে ভক্তরা সাধনার কমলের একটি একটি দলের মত ফুটিয়াছেন। সেই সাধন-কমলের রস স্বয়ং ভগবানেরও লোভনীয়। ভক্তের মিষ্টতা চান ভগবান, ভগবানের অসীমতা চাহেন ভক্ত। সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ক্ষাররস হইয়া গেলেও জীবন্ত থাকিবার জন্য মাধুর্য্য বিসর্জ্জন দিয়াও নদী অসীমকেই চাহে। এইজন্যই ভক্ত মধুর, আর ব্রহ্ম অসীম অনির্ব্বচনীয় ও মহান। তাই ঈশ্বরকেও মধুর করিতে গিয়া ক্ষুদ্র করিয়া লইলে সাধকের হইবে পচিয়া মরিতে। সমুদ্রকে ক্ষুদ্র করিলে অশেষ বিকার হইতে রক্ষা করিতে পারে কে?

অসীমতার মধ্যে আপনাদের উৎসর্গ করিয়া, সীমা ব্যক্তিত্ব ও মাধুর্য্য বিসর্জ্জন দিয়া তাহারা নিত্য নিরন্তর অপার সাধন জীবন লাভ করে, তাই এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাহারা আপন আপন মিষ্টতা বাঁচাইবার জন্য এক পা পিছনে ফিরিবার কথাও মনে আনিতে পারে না।

গংগা জমুনা সুরসতি মিলৈঁ জব সাগর মাঁহিঁ।
খারা পানী হোই গয়া দাদূ মীঠা নাহীঁ ॥
সাধ কমল হরি বাসনা সংত ভঁবর সংগ আই।
দাদূ পরিমল লে চলে মিলে রাম কো জাই ॥

"গঙ্গা যমুনা সরস্বতী (আপন আপন মিষ্ট জল ধারা লইয়া) যখন সাগরের মধ্যে গিয়া মিলিল, তখন তাহারা ক্ষারজলই হইয়া গেল, হে দাদূ, তখন আর তাহারা মিঠা রহিল না।

সাধনার কমলের মধ্যে হরির বাঞ্ছিত মধুর সৌরভ, ভক্ত ভ্রমর সেই সৌরভের সঙ্গ করিল লাভ। হে দাদূ, এই (শ্রীহরিরও দুর্লভ ও আকাঙ্ক্ষিত) পরিমল লইয়া গিয়া ভক্ত রামের কাছে যাইয়া মিলিল।"

ভক্ত জানে যে এই পরিমল লইয়া গেলে শ্রীহরি আপন আনন্দ সম্ভোগের

জন্যই ভক্তকে ডাকিয়া লইবেন এবং ভক্ত যেমন হরি-সঙ্গ পাইয়া ধন্য হইবে তেমন সাধন-কমল-রস দিয়া হরিকেও সে ধন্য করিবে। দান করিব না কেবল নিব—ইহাই দীনতা। ভক্তের দীন হইবার কোনো হেতু নাই। পূর্ব্বে উদ্ধৃত, "বাস কহৈ হম ফুল কো পাউঁ" বাণীটি এখানে তুলনীয়।

প্রথম প্রকরণ—জাগরণ

তৃতীয় অঙ্গ—চেতবনী অঙ্গ

জাগরণের শেষকথা ও আসল কথাই হইল চেতবণী অর্থাৎ আত্ম-চেতনা বা সাধারণ অর্থে আত্মদৃষ্টি। এই চেতবনীর দীক্ষা পাই গুরুর কাছে ও সহায়তা পাই সাধু সাধকের কাছে। যদি চেতবনী না হইল তবে গুরু দিয়াই বা ফল কি আর সাধু সঙ্গেই বা লাভ কি? প্রিয়তমের জন্য যদি ব্যাকুলতা না জন্মে, তাঁর প্রেমের আনন্দে মন যদি ভরপূর না হয় তবে এই প্রাণ থাকিয়াই বা লাভ কি? প্রিয়তমের সঙ্গে প্রেম কেবল বাক্যেই হইলে হইবে না, মন দিয়া তাঁকে প্রেম করিতে হইবে, কর্ম্ম দিয়া সেবা দিয়া সেই প্রেমকে পূর্ণ করিতে হইবে।

সাহিব কোঁ ভাবৈ নহীঁ সো সব পরহরি প্রাণ।
মনসা বাচা করমনা জে তূঁ চতুর সুজান॥

"মনে বাক্যে ও কর্ম্মে তুই স্বামীকে পারিলি না ভালবাসিতে? এমন প্রাণ তুই কর পরিহার, যদি তোর বুদ্ধি ও যথার্থ জ্ঞান থাকে।"

প্রেম শ্রান্ত হয় না, জাগিয়া সেবা করিয়াই তার আনন্দ; কিন্তু মন হইয়া পড়ে শ্রান্ত। মনের নানাবিধ চতুরতাই আছে, সে সব সাধনার অঙ্গে দেখা যাইবে। কিন্তু তার সাঙ্ঘাতিক চতুরতা হইল যে সে যখন ঘুমায় তখনও সে জাগিয়া থাকায় করে ভান, তখন স্বামীর সঙ্গ দিয়া তাকে জানাইতে হয়।

দাদূ অচেত ন হোইয়ে চেতন সোঁ চিত লাই।
মনুআঁ সূতা নীঁদ ভরি সাঈঁ সংগ জগাই॥

দাদূ অচেত ন হোইয়ে চেতন সৌঁ করি চিত্ত ।
অনহদ জহঁা তৈঁ উপজৈ খোজৌ তহঁ হাঁ নিত্ত ॥

"হে দাদূ, চৈতন্যময় পরমেশ্বরের সঙ্গে প্রেম করিয়া হইও না অচেতন। মন যে নিদ্রায় ভরিয়া শুইয়া আছে, তাকে স্বামীর সঙ্গ দিয়া জাগাও। হে দাদূ, চৈতন্যময়ের সঙ্গে প্রেম-ইচ্ছা করিয়া অচেতন হইও না, অনাহত যেখান হইতে হইতেছে উৎপন্ন সেইখানে নিত্য কর অন্বেষণ।"

জানা হৈ উস দেস কৌঁ প্রীতি পিয়া সৌঁ লাগি।
দাদূ অৱসর জাত হৈ জাগি সকৈ তৌ জাগি ॥

"প্রিয়তমের প্রেমে যুক্ত হইয়া সেই দেশে যাইতে হইবে, হে দাদূ, সুযোগ যাইতেছে চলিয়া, জাগিতে পারিলে উঠ জাগিয়া।"

বার বার য়হু তন নহীঁ নর নারায়ণ দেহ।
দাদূ বহুরি ন পাইয়ে জনম অমোলিক য়েহ ॥

"বার বার এই তনু পাইবে না, এই মানবদেহ নর নারায়ণের (মিলন-তীর্থ); এই মানব জন্ম অমূল্য (ঐশ্বর্য্য), হে দাদূ, ফিরিয়া আর ইহা মিলিবে না।"

দ্বিতীয় প্রকরণ—উপদেশ

প্রথম অঙ্গ—নিন্দা অঙ্গ

জাগরণের পরই হইল উপদেশের প্রকরণ। কারণ উপদেশ পাইলে তদনুসারে চিত্ত শুদ্ধ হইবে। তখন তত্ত্ব কিছু কিছু উপলব্ধ হইলে সাধনার আরম্ভ হইবে। সাধনার ফলে পরিচয় এবং সর্ব্বশেষ হইবে প্রেম। প্রেম শেষফল, ইহা আর কোনো অবস্থান্তরে পৌছিবার উপায় স্বরূপ নহে।

উপদেশের প্রথমই হইল হিংসা ত্যাগ করিতে হইবে। পরকে কোনো মতেই আঘাত করিব না। তার পর অহিংসা দ্বারা চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে সাধক বীরত্বের পথে অগ্রসর হইতে পারিবে। তাহাই হইল সুরাতনের অঙ্গ। অহিংসা ছাড়া বীরত্ব হয় না, বীরত্ব ছাড়া সাধনাও হয় না। তান্ত্রিকদের মধ্যেও বিশ্বাস আছে সাধকদের দুইশ্রেণী। বীর ও পশু। বীরই উৎকৃষ্ট সাধনায় অধিকারী, পশু-সাধক সাধনার জগতে আসিয়া কিছু ফলের অধিকারী হয় মাত্র। কিন্তু শেষে হইয়া দাঁড়াইল এই, যে সাধারণ লোকে বুঝিল বীর অর্থ যে মদ্যপান করে ও পশু বলি দেয়। কিন্তু উচ্চতর তন্ত্রের মত তাহা নহে। সাধারণভাবে লোকে অর্থ করে এই, পশু হইল তাহারা মদ মাংস যাহারা ব্যবহার না করে। বীরাচার ও পশ্বাচারের অপর দুই নাম বামাচার ও দক্ষিণাচার। কিন্তু মরমিয়ারা বলেন যতক্ষণ সাধক কামক্রোধাদি দেহস্থিত চালকের বা শাস্ত্রলোকাচারাদি বাহ্য চালকের দ্বারা পশুবৎ চালিত, ততক্ষণই সে পশু; যখন সে এই সব দেহস্থ ও দেহ-বাহ্য চালনাকে জয় করিয়া স্বাধীন সহজ হয় তখনই সে বীর। এই বীর-আচারই তাহাদের সহজাচার। তাহা স্বাধীনাচার কিন্তু স্বৈরাচার নহে।

সাধনাতে বীরত্বের অতিশয় প্রয়োজন। বীর না হইলে সাধক হওয়াই যায় না, ইহাই দাদূর মত। তার ফলে "দাদূ পংথী"রা অনেকেই খুব বীর-ভাবাপন্ন হইয়া উঠিলেন। ফলে শেষে আদর্শ যখন মলিন হইয়া আসিল তখন এইরূপ দাঁড়াইল যে দাদূপংথীদের নাগা সন্ন্যাসীরা রীতিমত যোদ্ধা হইয়া নানা রাজার দলে অর্থ লইয়া লড়িতে লাগিল। ইংরাজরা আসিয়া

এই "নাগা সাধু সিপাহী"দের বেতন দিয়া নিজেরা প্রয়োজন মত লড়াইলেন পরে ইহাদের লড়াইবার পদ্ধতি বন্ধ করাইয়া দিলেন। এখনও কুম্ভমেলাতে যাঁরা নাগা সাধুদের দেখিয়াছেন তাঁরাই জানেন তারা কেমন বলিষ্ঠ ও যুদ্ধ-কুশলদের মত সুপরিচালিত নির্ভীক ও কষ্টসহিষ্ণু। এত বড় একটা আধ্যাত্মিক সত্যকে লোকে শেষে সাংসারিক সুবিধাতে প্রয়োগ করিয়া লাভবান হইতে চাহিল মাত্র। ইহাই সব চেয়ে নিকৃষ্ট "exploitation" অর্থাৎ ব্যভিচার।

দাদূর মৃত্যুর এক শত বৎসর পরে জেতজীর সময় শিখগুরু গুরুগোবিন্দ নরাণাকে গিয়া যে তাঁহাদের যুদ্ধার্থ প্রযোজিত করেন সে কথা উপক্রমণিকাতেই লেখা গিয়াছে। বীরত্ব যে সাধনাতে অত্যাবশ্যক তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু সে বীরত্ব পরকে আঘাত করিয়া নহে, আপনাকে জয় করিয়া, সকল ভয়ে নির্ভীক হইয়া! অহিংসার সঙ্গে এই বীরত্বের নিত্য সম্বন্ধ, কোথাও তাহাদের বিরোধ নাই।

তার পরই হইল "পারিখ" অর্থাৎ সত্যকে পরখ করিয়া নেওয়া। সত্যকে যে পরখ না করিয়া যা' তা' বিশ্বাস করে সে নাস্তিকেরই সমান। পরখ না করা সত্য যখন সংসারের আঘাতে ভাঙ্গিয়া যায় তখন সাধক সত্য মাত্রেরই উপর হইয়া যায় বীতশ্রদ্ধ। তাই দাদূর গুরু কমাল বলেন, "অপরখিয়ারা" নাস্তিকেরই সমান, কারণ তারা পরখ-না-করা সত্য টেকে না দেখিয়া পরিশেষে সত্যমাত্রকেই ত্যাগ করে। আর যে আস্তিক সাধক সে পরখ করিয়া সত্যকে স্বামীর মত বরণ করে।" সে-সত্য বীরের মতই অচল, অটল, অজেয়। পরখ করিয়া বরণ করাই হইল সত্যের সম্মাননা। সীতা তাঁর স্বামীকে বরণের পূর্ব্বে ধনুর্ভঙ্গের পরখ করিয়া লইয়াছেন, কিন্তু তারপর আর জীবনের পথে একদিনও তাঁর বীর্য্যে ও মহত্ত্বে সংশয় করেন নাই।

সত্য হইল অশ্বমেধের ঘোড়া। তাকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরাইয়া আনিতে হইবে, জয়ী যদি সে হইয়া আসে তবেই তাহাকে দিয়া যজ্ঞ হয়, হারিয়া আসিলে সে ঘোড়া দিয়া যজ্ঞ হয় না। আর ভয়ে ভয়ে ঘোড়া বাহির হইতেই যে না দেয়, সে আরও হীন। সে কাপুরুষ এবং লোভী দুই-ই। এই রকম হীন "অপরখা" ঘোড়া যজ্ঞের

অযোগ্য। তাই "অপরখা" সত্য দিয়া সাধনাই চলে না। সাধক সাধনের আসনে বসিবার পূর্ব্বে আসন নাড়া দেন, না টলিলে বসেন; তাহাই হইল আসন-পরখ। সত্যই সাধনার যথার্থ আসন, যে তাহা নাড়া না দিয়া বসিতে গেল, সে "ফল-লোভী" বা "কাল-কৃপণ।" সে দেরী করিতে চাহে না; প্রতীক্ষার সাহস তাহার নাই। কিন্তু শেষে সাধনায় ব্যর্থতা আসিয়া এমন সাধককে সমূলে করে বিনষ্ট।

তাই "পরখ" চাই। সাধক "পরখা" সত্য ছাড়া যা' তা' সত্য আশ্রয় করিয়া কখনও যেন সাধনা না করেন।

তারপরই হইল "দয়া নির্ব্বৈরতা"ও "জীবিত মৃতক" অঙ্গ। ইহাদের মর্ম্ম সেই সেই অঙ্গের প্রথমে বর্ণিত হইবে।

সাধনার উপদেশে প্রথম স্থানই অহিংসার। সাধনার ক্ষেত্রে সাধারণতঃ হিংসা নিন্দারই আকার গ্রহণ করে। আকৃতি পরিবর্ত্তন করিলেও নিন্দার মধ্যে হিংসার প্রকৃতি পূর্ণভাবেই ধরা পড়ে, তাই হিংসার বিরুদ্ধে চলিতে গিয়া দাদূ নিন্দাকেই আঘাত করিয়াছেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে দাদূ প্রভৃতি সাধকেরা নীচবংশে জন্মিয়াছেন বলিয়া উচ্চবংশীয় সাধকদের অনেকের কাছে বেশ আঘাত পাইয়াছেন। সেই সব আঘাত নিন্দার আকারে আসিয়াছে, কিন্তু দাদূ তাহাতে কখনও প্রতি-আঘাত করেন নাই।

নিন্দা করিতে গিয়া নিন্দুক আসলে নিজেরই ক্ষতি করে; যাহাকে সে আঘাত করিতে যায় সেই আঘাতে তাহার কোনো ক্ষতিই হয় না ইহা বুঝিতে পারিলে ক্ষুদ্র-স্বার্থ বুদ্ধি লইয়াও লোকে নিন্দা ত্যাগ করে। তাই দাদূ বলিয়াছেন—

নিংদ্যা নাম ন লীজিয়ে সুপিনৈহী ঁ জিনি হোই।
না হম কহৈঁ না তুম সুনৌ হম জিনি ভাখৈঁ কোই॥
নিন্দক বপুরা জিনি মরৈ পর উপকারী সোই।
হম কূঁ করতা উজলা আপণ মৈলা হোই॥

"নিন্দার নামও নিও না, স্বপ্নেও যেন নিন্দা না হয়; আমিও যেন নিন্দার

বাণী না বলি তুমিও যেন না শোনো ; আমি যেন কোনোপ্রকার নিন্দাভাষণ না করি।

নিন্দুক বেচারা যেন না মরে, কারণ সে-ই যথার্থ পর-উপকারী ; সে নিজে (নিন্দার দ্বারা) ময়লা হইয়াও আমাকে করে উজ্জ্বল।"

লোকের নিন্দা করা যেমন দোষের সত্যকে নিন্দা করাও তেমনি। সত্য মাত্রই বিশ্বসত্যের বলে বলী। তাহার বিরুদ্ধে যে যায় সে আপনাকেই চূর্ণিত করে। উপনিষদের মত ইহাঁরাও বলেন সেই ব্যক্তি পাষাণে নিক্ষিপ্ত মাটির ঢেলার মত আপনি চূর্ণ হইয়া যায়।

ঝূঠ দিখাবৈঁ সাচকো ভয়ানক ভয়ভীত।
সাচা রাতা সাচ সৌঁ ঝূঠ ন আনৈঁ চীত॥
সাচে কূঁ ঝূঠা কহৈঁ ঝূঠা সাচ সমান।
দাদূ অচিরজ দেখিয়া য়হু লোগোঁ কা জ্ঞান॥

"সত্যকে দেখায় মিথ্যা বলিয়া, কি ভয়ঙ্কর ভয়ের কথা! যে সাচ্চা সে সাচ্চারই অনুরক্ত, মিথ্যাকে সে চিত্তেই দেয় না স্থান। সত্যকে বলে কিনা মিথ্যা, আর মিথ্যাকে বলে কিনা সত্যের সমান! ওরে দাদূ, আশ্চর্য্য এই ব্যাপার দেখিলাম, এই তো লোকের জ্ঞান!"

অম্রিত কূঁ বিষ বিষ কূঁ অম্রিত ফেরি ধরৈঁ সব নাৱঁ।
নিরমল মৈলা মৈলা নিরমল জাহিঁগে কিস ঠাৱঁ॥

"লোকে অমৃতকে বলে বিষ, বিষকে বলে অমৃত, উল্টা পাল্টা করিয়া ধরিয়াছে সব নাম। এঁরা নির্ম্মলকে বলেন মলিন, মলিনকে বলেন নির্ম্মল ; এঁরা যাইবেন কোন ঠাঁইয়ে ?"

সত্য মারৈ সাধু নিন্দৈ লাগে মূলমেঁ ধক্ক।
কাস ধসৈ ধরতী খসৈ তীনোঁ লোক গরক্ক॥

"যখন কেহ সত্যকে মারে, সাধুকে নিন্দা করে তখন (বিশ্বসত্যের) মূলে গিয়া লাগে আঘাত। তখন আকাশ পড়ে ধ্বসিয়া, ধরিত্রী পড়ে খসিয়া, তিন লোক ডুবিয়া যায় তলাইয়া।"

দ্বিতীয় প্রকরণ—উপদেশ

দ্বিতীয় অঙ্গ—সুরাতন, (বীরত্ব, শূরত্ব) অঙ্গ

সাধনার একটি প্রধান কথা হইল বীরত্ব। এই বীরত্ব অর্থ পরকে হিংসা করা, দুঃখ দেওয়া বা আঘাত করা নহে। কারণ দাদূর মতে সাধনার সব চেয়ে বড় কথা অহিংসা। পরবর্ত্তী কালে এই বিশুদ্ধ আদর্শ মলিন হইয়া গেলে, দাদূপন্থীদের অনেকে "সূর" (শূর অর্থাৎ বীর) হইতে গিয়া সাধারণ যোদ্ধা বনিয়া গিয়াছেন। নাগা সন্ন্যাসীরা অনেকেই এই পন্থের। এ সব কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

মৃত্যুকে স্বীকার ঃ

দাদূ সূরা সনমুখ রহৈ নহিঁ কাইর কা কাম।
দাদূ মরণ অসংখ* হৈ সোই কহৈগা রাম॥
রাম কহৈঁ তে মরি কহৈঁ জীৱত কহ্যা ন জাই।
দাদূ ঐসৈঁ রাম কহ সতী সূর সম ভাই॥

"হে দাদূ, যে বীর, সে থাকে সম্মুখে, এই (সাধনা) কাপুরুষের কাজ নহে। ওরে দাদূ মরণ তো অসংখ্য, প্রত্যেকটি মৃত্যু দিয়া বলিতে হইবে "রাম" (মরণের দ্বারাই স্বীকার করিতে হইবে)। যে কহে রাম, সে মরিয়াই এই নাম কহে, জীবন রাখিয়া ইহা কহা যায় না। হে দাদূ, এমন করিয়া রাম বল যেন সতী ও বীর উভয়কে সমান গৌরবের মনে হয়।"

আমার পক্ষেও অসম্ভব নয় ঃ যদিও আমি এখন মৃতেরই মত নিবীর্য্য, তবু যদি জীবনে কখনো বড় সুযোগ আসে তবে আমিই সকল ভয় শঙ্কা দুর্ব্বলতা পরিহার করিয়া বীরের মত যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়াইব। আপনার অন্তর্নিহিত অজ্ঞাত সুপ্ত মাহাত্ম্যকে আবিষ্কার করিয়া আমি আপনিই বিস্মিত হইয়া যাইব।

---

* কেহ কেহ বলেন "অসংক", তাহার অর্থ—শঙ্কাহীন নির্ভয়। "আসংঘৈ" পাঠও আছে, তাহার অর্থও নির্ভয় সাহস।

হম কায়র মৃত হোই রহে সূরা হমহি হোই।
নিকসি খড়া মৈদান মেঁ মোসম ঔর ন কোই॥
জে মুঝে হোতে লাখ সির তৌ লাখোঁ দেতী ৱারি।
ৱহ মুঝে দীয়া এক সির সোই সৌঁপৈ নারি॥

"আমি যে ভীরু, আমি যে মড়ার মত হইয়া আছি, আমিই আবার বীর হইতে পারি; রণক্ষেত্রে যেই একবার বাহির হইয়া খাড়া হইলাম, অমনি আর আমার মত বীর কেহই নাই। লক্ষ মাথা যদি আমার থাকিত, লক্ষ মাথাই তবে আমি করিতাম উৎসর্গ; (হায়) তিনি আমাকে একটিই মাথা দিয়াছেন, আমি নারী তাহাই সঁপিতেছি।"

বীরেরই লভ্য ঃ

কায়র কামি ন আৱঈ য়হ সূরেঁা কা খেত।
তন মন সৌঁপৈ রামকো দাদূ সীস সমেত॥
জব লগ লালচ জীৱ কা নিরভয় হুৱা ন জাই।
কায়া মায়া মন তজৈ চোট মুঁহহি মুঁহ খাই॥
জে তুঝে কাম করীম সোঁ চৌরে চঢ়ি করি নাঁচ।
ঝূঠা হৈ সো জাইগা নিহচৈ রহসী সাঁচ॥

"এই সাধনার ক্ষেত্র বীরের, ভীরুর এখানে নাই কোনোই প্রয়োজন; হে দাদূ, মাথা সমেত তনু মন রামকেই কর সমর্পণ। যতক্ষণ জীবনের লালচ, ততক্ষণ নির্ভয় হওয়া অসম্ভব, মন যদি কায়ার মায়া ত্যাগ করে তবে বুক পাতিয়া মুখের উপর আঘাতের পর খাইতে পারে আঘাত। যদি দয়াল পরমেশ্বরকে চাও তবে সতীর চিতার উপর দাঁড়াইয়া নাচ (যুদ্ধ সজ্জা লইয়া যুদ্ধে প্রস্তুত হও)। যাহা "ঝূটা" (মিছা) তাহা যাইবে চলিয়া, যাহা সাচ্চা (সত্য) তাহাই নিশ্চয় থাকিবে।"

অগ্রসর হও পিছাইও না ঃ অজানা অপূর্ব্ব

---

* পূর্ব্ব-রাজস্থানী ভাষায় "চৌড়ে" অর্থ ময়দান যুদ্ধক্ষেত্র প্রকাশ্য মুক্ত স্থান ও হয়।

অনির্ব্বচনীয়ের আহ্বানে তাহারই সন্ধানে সম্মুখের দিকেই সহজে অকারণে জীবন সদা চাহে অগ্রসর হইতে। পিছনের দিকে যে মায়া সে কেবল অলসের অগ্রসর না হইবার ইচ্ছা, বিষয়ীর মত পুরাতনকে আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকার মত ভাব। তাই বীর, পিছনের মোহকে অতিক্রম করিয়া নিত্য হইবে অগ্রসর। এমন করিয়াই অগম্য ধামের, অনির্বচনীয়ের মিলিবে ঠিকানা।

জীৱেঁকা সংসা পড়া কো কাকো তারৈ।
দাদূ সোঈ সূরিৱাঁ জে আপ উবারৈ॥
পীছেঁ হেলা জিনি করৈ আগৈঁ হেলা আৱ।
আগৈঁ এক অনূপ হৈ নহিঁ পীছেঁকা ভাৱ॥
পীছেঁ কো পগ না ভরৈ আগে কো পগ দেই।
দাদূ য়হু মত সূরকা অগম ঠৌর কৌঁ লেই॥
আগে চলি পীছা ফিরৈ তাকো মুঁহ মদীঠ।
কায়র ভাজৈ জীৱ লে ভাগৈ দে কর পীঠ॥

“জীবেরই পড়িয়া গেল সংশয়, কে বা কাকে তরায়! হে দাদূ, বীর তো সেই যে আপনাকে আপনি করে উদ্ধার। পিছনের ডাকে পিছনের দিকে সরিও না (পূর্ব্ব রাজস্থানী ভাষায় অর্থ হইল ডাক, আহ্বান), আগে আইস চলিয়া; সম্মুখে আছেন এক অনুপম, পিছের কোনো ভাব নাই। পিছের দিকে পা সরায় না, আগেই পা আগাইয়া দেয়, ইহাই হইল বীরের মত, (এমন করিয়াই বীরেরা) অগম্য ধামকে করেন অধিকার।

আগে চলিতে গিয়া যে পিছে ফেরে, তার মুখও দেখিতে নাই; প্রাণ লইয়া যে পালায়, পিঠ দেখাইয়া যে পালায়, সে ভীরু।”

বীরের কোনো বাধা কোনো বন্ধন নাই।

সূরা হোই সুমের লংঘৈ সব লোক* বংধ ছূটৈ।
দাদূ নিরভয় হোই রহৈ কায়র তিণা ন টূটৈ॥

---

* কেহ কেহ লোক স্থানে “গুণ” বলেন।

স্রপ কেসরি কাল কুংজর জোধা মারগ মাহিঁ ।
কোটি মেঁ কোই এক ঐসা মরণ আসংঘি জাহিঁ ॥

"শূর যদি হয় তবে সুমেরু যায় লঙ্ঘিয়া, সকল লোক-বন্ধন যায় ছিন্ন করিয়া (অগ্রসর হইয়া) ; হে দাদূ, সে রহে নির্ভয় হইয়া, আর যে ভীরু সে তৃণটুকুও পারে না ছিন্ন করিতে (ছিন্ন করিয়া অগ্রসর হইবার সাহস পায় না) ।

সর্প, কেশরী, ভীষণ কাল হস্তী, যোদ্ধা (প্রভৃতি বাধা) যদি পথে থাকে, তবুও সাহস করিয়া মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইয়া যাইতে পারে, এমন লোক হয় তো কোটির মধ্যে একজন মেলে ।"

প্রভুর কাছে আপনাকে উৎসর্গ করেঃ

যে বীর, যে সাধক, সে এমন করিয়াই আত্মোৎসর্গ করিয়া সকল বাধা উত্তীর্ণ হইয়া প্রভুকে জানায় প্রণতি । তাহার এই প্রণতিই সাচ্চা, সেই প্রণতই যথার্থ সাধক ।

তব সাহিব কো সিজদা কিয়া জব সির কো ধর্য্যা উতার ।
যোঁ দাদূ জীৱত মরৈ হিরিস হৱা কো মার ॥
তন মন কাম করীমকে আৱৈ তো নীকা ।
জিসকা তিসকৌ সৌঁপিয়ে সোচ ক্যা জীকা ।।
জে সির সৌঁপ্যা রামকো সো সির ভয়া সুনাথ ।
দাদূ দে উরন ভয়া জিসকা তিসকৈ হাথ ॥
জিসকা হৈ তিসকৌঁ চঢ়ৈ দাদূ উরণ হোই ।
পহিলে দেৱৈ সো ভলা পীছৈ তৌ সব কোই ॥

"প্রভুর কাছে তখনই হইলাম প্রণত, যখন মাথা (প্রভুর চরণে উৎসর্গ করিয়া) স্কন্ধ হইতে নামাইয়া রাখিয়া দিলাম নীচে ; লোভ ও কামকে মারিয়া এমন করিয়াই, দাদূ, সাধক মরে জীবন্তে ।

দয়াময়ের কাজের জন্যই এই তনু এই মন । যদি এ তনু মন তাঁর কাজে লাগে তবে ভালই । যাঁর ধন তাঁকেই দাও, এই জীবনের জন্য এত আশঙ্কা এত দুশ্চিন্তা কেন ? যেই শির রামকে করিলাম সমর্পণ, সেই শিরই হইল

"সনাথ" (তার "অনাথত্ব" ঘুচিল), যার ধন তার হাতে দিয়া দাদূ হইল অঋণী। যার প্রাপ্য ধন (আমার হাতে ন্যস্ত ধন তাঁকে ফিরাইয়া দিয়া) তাহাকে সমর্পণ করিতে পারিলেই, হে দাদূ, সাধক হয় অঋণী ; আগে যে (শির জীবন ও নিজেকে) দেয় সে-ই তো ভাল, পিছে তো দেয় সবাই।"

লৌকিক দায় না চুকাইতে পারিলে মধ্যযুগের মরমিয়াদের মতে সাধনায় সিদ্ধ হওয়া কঠিন। তাই সুফী প্রভৃতিরা নিজেদের নিজেরা হয় বলেন পাগল "দিবানা", বা বলেন, "আমরা মরিয়া গিয়াছি।" মৃত ও পাগলের কোনো দায় নাই। তাই সুফীদের মধ্যে জীবন্তে মরিয়া যাওয়াই হইল সাধনার একটা খুব বড় কথা। যে মরিয়াছে, সে মুক্ত হইয়া সব "বন্ধন এড়াইয়াছে" ; তার "আমি" "স্বামীর" (সু-আমি) মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছে, তার আর কোনো "ভয় ভীত" নাই। এই তত্ত্বটি আমাদের আউল বাউলরা ও ও মধ্যযুগের সাধকরা খুবই জোরের সঙ্গে ধরিয়াছিলেন। কাজেই প্রভুর চরণে মরিতে তাঁদের ভয় ছিল না, ইহাই ছিল তাঁদের সাধনা।

উৎসর্গ করিয়া ধন্য হও :

সাইঁ তেরে নাৱঁ পর সির জিৱ করূঁ কুরবান।
তন মন তুম পর ৱারনৈঁ দাদূ পিংড পরান॥
মরণে থীঁ তূঁ না ডরৈ অব জিৱ সোচ নিবার।
দাদূ মরনা মানিলে সাহিবকে দরবার॥
মরণে থীঁ তূঁ না ডরৈ মরনা অংতি নিদান।
রে মন মরনা সীরজ্যা কহিলে কেৱল প্রাণ॥

"হে স্বামী, তোমার নামে শির ও জীবন করিব উৎসর্গ, তনু মন দেহ প্রাণ তোমাকেই করিব সমর্পণ। মরণে তুই ভয় করিস্ না,জীবনের জন্য দুশ্চিন্তা এখন করিয়া দে দূর, ওরে দাদূ, আজ স্বামীর দরবারে (তিনি যদি বীর মনে করিয়া মৃত্যুই আমাকে দেন) মৃত্যুকেই স্বীকার করিয়া নে মানিয়া। মরণকে করিস্ না ভয়, মরণই হইল অন্ত নিদান ; ওরে মন, মরণকে এই জন্যই তিনি করিয়াছেন সৃষ্টি, একবার বলিয়া নে শুধু "প্রাণ"।"

মৃত্যুদ্বারা আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে প্রাণকে, মৃত্যুই স্বীকার করিবে "হে প্রাণ তুমি আছ।" মৃত্যুর অসীম অন্ধকারেই জীবনের জ্যোতি হইয়া উঠিবে দীপ্যমান।

দান ও উৎসর্গ করিবার ক্ষমতা দ্বারাই আমরা বিষয়ের অধিকার প্রমাণ করি। নাবালক উত্তরাধিকারী বিষয় ভোগ করে, দান করিতে পারে না। মৃত্যুকে স্বীকারের দ্বারা, স্বামীর চরণে জীবন সমর্পণের দ্বারা আমরা অমৃতত্বের অধিকারের পরিচয় দেই। রবীন্দ্রনাথও তাঁর আলোচনার মধ্যে ইহা সুন্দর করিয়া বুঝাইয়াছেন।

মরণই শ্রেয়ঃ

দাদূ মরনা খূব হৈ মরি মরি মাহৈঁ মিলি জাই।
সাহিব কা সংগ ছাড়ি় করি কৌন সহৈ দুখ আই॥
মাহৈঁ মন সেঁা জুঝ করি ঐসা সুরা বীর।
সাঈঁ কারণ সীস দেই বীর ভয়া কবীর॥
সাঈঁ কারণ সব তজৈ সেৱৈ তন মন লাঈ।
দাদূ সাহিব ছাড়ি় করি কাহূ সংগি ন জাই॥
জে তূঁ প্যাসা প্রেমকা জীৱনকী ক্যা আস।
মৃত পিয়ালা হাথ লেই ভরি ভরি পীৱৈ দাস॥

"হে দাদূ, যে মরণের মধ্য দিয়া তাঁহার মধ্যেই মিলিয়া যাই, সে মরণ কি সুন্দর ও চমৎকার! কে (এই সংসারে) আসিয়া স্বামীর সঙ্গ ছাড়িয়া (বৃথা) দুঃখ করিবে সহ্য?

অন্তরের মধ্যেই মনের সঙ্গে যুঝিয়া হইবে মরিতে, তবেই তো শূর ও বীর; স্বামীর জন্য শির দিয়াই তো কবীর হইলেন বীর।

স্বামীর জন্য সবই ছাড়, তনু মন লইয়া কর স্বামীরই সেবা; হে দাদূ, স্বামীকে ছাড়িয়া যাইও না আর কারও সঙ্গে।

তুই যদি প্রেমেরই পিয়াসী তবে আর কেন জীবনের জন্য মায়া? তাঁর দাস মৃৎ পেয়ালা (এই দেহ) হাথে লইয়া ভরিয়া ভরিয়া পান করিতেছে অমৃত। (অথবা মৃত্যুর পেয়ালা ভরিয়া ভরিয়া পান করিতেছে অমৃতরস)।"

সত্য বীরত্ব সত্য যুদ্ধ অন্তরে, বাহিরে নহে :

মন মনসা মারৈ নহীঁ কায়া মারণ জাহিঁ।
দাদূ বাঁবী মারিয়ে সরপ মরৈ ক্যোঁ মাহিঁ॥
জব জূঝৈ তব জানিয়ে কাছি খড়ে ক্যা হোই।
চোট মুঁহৈঁ মুঁহ খাইগা দাদূ সূরা সোই॥

"মন ও মানসকে (ইচ্ছা, কল্পনা) কেহ তো মারিল না, মারিতে গেল কিনা কায়া! হে দাদূ, গর্ত্তের উপর যদি আঘাত মারিস তবে ভিতরের সাপ কেন মরিবে?

যখন যুঝিবে তখনই জানা যাইবে বীরত্ব, কাপড় চোপড় আঁটিয়া (কাছিয়া) দাঁড়াইলে হইবে কি? সম্মুখে দাঁড়াইয়া যে চোটের পর চোট মুখের উপর খাইতে পারে, হে দাদূ, বীর তো সেই।"

স্বামীই আশ্রয় :

জিনকৌঁ সাঈঁ পধরা তিন বংকা নাহিঁ কোই।
সব জগ রূসা ক্যা করৈ রাখনহারা সোই॥
জে তূঁ রাখৈ সাঈয়াঁ মারি সকৈ নহিঁ কোই।
বার ন বংকা করি সকৈ জে জগ বৈরী হোই॥
নির্ভৈ বৈঠা রাম জপি কবহূঁ কাল ন খাই।
জব দাদূ কুংজর চঢ়ৈ তব সুনা ঝখি ঝখি জাই॥

"স্বামী যাহার সহায়. কেহই তাহার বিরুদ্ধ (বাঁকা, অনিষ্টকারী) নয়; তিনি যার রক্ষাকর্ত্তা, সমস্ত জগৎ রুষ্ট হইলেই বা তার করিবে কি? তুমি যদি রক্ষা কর হে স্বামী, তবেই কেহই পারে না মারিতে; যদি সমস্ত জগৎ হয় বৈরী তবু তাকে একটি বারও পারে না বাঁকাইতে (অথবা তার একটি কেশও পারে না বাঁকাইতে)। রাম নাম জপিয়া যে বসিল নির্ভয় হইয়া, কখনও কাল তাকে পারে না গ্রাস করিতে; হে দাদূ, (সাধক) যখন হাতীতে চড়িল তখন কুকুর বৃথাই তাহার পিছে পিছে করিয়া মরে চীৎকার।"

ভগবদ্‌বলেই সাধক বলী :

মহজোধা মোটা বলী সদা হমারা মীর ।*
সব জগ রূসা ক্যা করৈ জহঁা তহঁা রণধীর ।
ক্যা বল কহা পতংগকা জরত ন লাগৈ বার ।
বল তৌ হরি বলবংতকা জীবৈ জিহিঁ আধার ॥

"মহাযোদ্ধা প্রবলবলী সদাই আমার মালিক, সকল জগৎ রুষ্ট হইলেই বা আমার করিবে কি ? যেখানে সেখানে সর্ব্বত্রই বিরাজমান সেই রণধীর ।

কহ তো পতঙ্গের আছে কি বল, জ্বলিয়া যাইতে যার কিছুই লাগে না দেরী ? শক্তি হইল তো (আশ্রয়দাতা) বলবান হরির, যেই আশ্রয়েই সে সদা জীবন্ত ।"

তুমিই বল :

বালণ† তুম্‌হারা বাপজী গিনত ন রাণা রাৱ ।
মীর মালিক পরধান পতি তুম্‌হ বিন সবহি বাৱ ॥
তুম বিন মেরে কো নহীঁ হমকৌঁ রাখনহার ।
জে তূঁ রাখৈ সাইয়াঁ তৌ কোই ন সকৈ মার ॥
সব জগ ছাড়ৈ হাথ তৈঁ তুম্‌হ জিনি ছাড়হু রাম ।
নহিঁ কুছ কারিজ জগত সৌঁ তুম হীঁ সেতী কাম ॥

"হে পিতা, তোমার সন্তান না গণে কোনো রাণা না গণে কোনো রাজা । তুমিই তার মীর, তুমিই তার মালিক, তুমিই তার প্রধান, তুমিই তার পতি, তুমি বিনা সকলই বায়ু (ভূয়া, মিথ্যা) । তুমি বিনা আমাকে রক্ষা করিতে পারে এমন আমার কেহই নাই, তুমি যদি রাখ হে স্বামী, কেহই পারে না আমাকে মারিতে । সমস্ত জগৎ আমাকে হাথ হইতে দিতেছে ছাড়িয়া ; হে রাম, তুমি যেন আমায় না ছাড় । জগতের সঙ্গে আমার নাই কোনো প্রয়োজন, আমার প্রয়োজন শুধু তোমারই সঙ্গে ।"

---

* কেহ কেহ বলেন "ভীর" । "ভীর" অর্থ সহায়, পক্ষ ।

† "বলি" পাঠ গ্রহণ করিলে অর্থ হইবে—"তোমার বলে ।"

দ্বিতীয় প্রকরণ—উপদেশ

তৃতীয় অঙ্গ—পারিখ (পরখ) অঙ্গ

পরীক্ষা করিয়াই সত্যকে নিতে হইবে। লোকে এক তো পরীক্ষাই করিতে অনিচ্ছুক, তার কারণ জড়তা আলস্য ও অচেতনতা। যিনি উপদেষ্টা, তাঁহাকে শ্রদ্ধার যোগ্য হইতে হইবে; তাঁর সত্যও শ্রদ্ধেয় হওয়া দরকার; এ ভাবও সকলের মনে নাই। অধিকাংশ লোকই অলস, নিবীর্য্য, সুলভ-ফল-লুব্ধ। চক্ষু বুজিয়া যাহা তাহা স্বীকার করিতে ইচ্ছা, কাজেই এমন “স্বীকার” সাত্ত্বিক নহে, ইহা ঘোরতর তামসিক। কোনো মতে শাস্ত্রকে চক্ষু বুজিয়া মানিয়া লইব, গুরু ও মহাপুরুষকে চক্ষু বুজিয়া মানিয়া লইব, তবেই আর কোনো হাঙ্গামা নাই—ইহাই তামসিক জড়তা ও আলস্যের ফল। শাস্ত্র যদি বলে “সত্যকে যুক্তি দ্বারা পরীক্ষা করিতে হইবে,” গুরু যদি বলেন “পরখ কর”, তবুও শাস্ত্র ও গুরু চক্ষু বুজিয়াই মানিব, এমনই ভয়ঙ্কর জড়তা!

যে অশ্ব সর্ব্বত্রজয়ী হইয়া ফিরিল, তাহাতেই যজ্ঞ হয়; যে সত্য সর্ব্বত্রজয়ী, তাহাতেই সাধনা সম্ভব। “না-পরখা” সত্য বীরের সত্য নয়, অশ্বমেধের ঘোড়া নয়; এমন সত্যের উপর সাধকের বীরাসন করা চলে না। তাই পরখ করাই চাই। দেখিতে হইবে সাধনার সত্য সর্ব্বপরীক্ষাজয়ী কিনা।

আবার পরখ করিতে গেলেও লোকে বাহিরের পরখই করিবে। যে সত্য যেখানকার সেই সত্যকে সেখানকার পরীক্ষা দিয়া পরখ করা চাই। কমাল বলেন, **“দুই ক্রোশ চাউল, তিন সের পথ, এক প্রহর বস্ত্র,** বলিলে লোকে পাগল বলে। এক ধামের মানদণ্ড অন্য ধামে চলে না, এক রাজ্যের মুদ্রা অন্য রাজ্যে চলে না। তবে ধর্ম্মজগতের ও অন্তরের জগতের সত্যের নির্ণয়ে বাহিরের জড় তামসিক মানদণ্ড চলিবে কেন? আবার বাহিরের বিপরীত হইলেই যে অন্তরের সত্য-নির্ণয়ের মানদণ্ড হইল তাহাও নহে, কারণ সত্যের সঙ্গে সত্যের যোগ আছে।’’ এইখানেই যোগ দৃষ্টির ও অন্তর্দৃষ্টির দরকার।

অকুল সাগর পার হইতে গেলে শুধু নিজের অনুভবের উপরই নির্ভর করিয়া সব সময় নিশ্চিন্ত থাকা চলে না। অন্যের সঙ্গ ও সহায়তা পাইলে ভরসা দৃঢ় হয়। ঠিক তেমনই সাধনাতেও অন্য সাধকের অন্তর্দৃষ্টির সহায়তা পাইলে উপকার হয়। পরখ চাই এবং পরখ অন্তরের সত্যের হওয়া চাই। লোকে বুঝে না, তাতেই হয় তো পরখই করে না, করিলেও নিজের বুদ্ধিকেই অভ্রান্ত মনে করে। তারপর এক ক্ষেত্রের পরখে অন্য ক্ষেত্রের মানদণ্ড চায় প্রয়োগ করিতে। তাই বাহিরের দিক দিয়াই ভাসা-ভাসা রকমের একটু পরখ করিয়াই মনে করে যাহা করিবার তাহা করা হইল।

অন্তর পরীক্ষা কর।

য়হ পারিখ হৈ উপলী ভীতর কী য়হ নাহিঁ।
অংতর কী জানৈ নহীঁ তাতৈঁ খোটা খাহিঁ॥
জে নাহীঁ সো সব কহৈঁ হৈ সো কহৈ ন কোই।
খোটা খরা পরখিয়ে তব জ্যোঁ থা ত্যোঁ হী হোই॥
প্রাণ জৌহরী পারিখূ মন খোটা লে আব়ৈ।
খোটা মনকৈ মাথৈ মারৈ দাদূ দূর উড়াব়ৈ॥
দহদিস ফিরৈ সো মন্ন হৈ আব়ৈ জাই পব়ন্ন।
রাখনহারা প্রাণ হৈ দেখন হারা ব্রহ্ম॥

“এই পরীক্ষা হইল উপরের (বাহিরের উপর-উপর পরীক্ষা), ভিতরের পরীক্ষা এ নহে ; অন্তরের রহস্য জানে না বলিয়াই তো এরা কেবল ঠকিয়া মরে।

(অন্তরে) যাহা আছে তাহার কথা কেহই বলে না, যাহা নাই তাহাই সবাই বলে ; সাচ্চা ঝূঠা একবার দেখ পরীক্ষা করিয়া ; তবেই (চিরন্তন সত্য) ছিল যেমন, তেমনই হইবে (প্রতিষ্ঠিত)।

প্রাণ হইল পরখ-নিপুণ জহুরী আর মন আসে (বারবার) ঝূটা বস্তু নিয়া নিয়া ; হে দাদূ, মনের মাথায় জহুরী সেই মিথ্যা লইয়া করে আঘাত, আর দূরে উড়াইয়া দেয় ছুঁড়িয়া ফেলিয়া।

দশ দিক যাহা ফিরিয়া বেড়ায় তাহা মন, যাহা (এই দেহে) আসিতেছে

যাইতেছে তাহা পবন, যিনি রাখিবার কর্ত্তা তিনি প্রাণ, যিনি দেখিতেছেন তিনি ব্রহ্ম।"

অন্তরের পরিচয়ই পরিচয়।

জৈসে মাঁহৈঁ জিব্র রহৈ তৈসী আৱৈ বাস।
মুখি বোলৈ তব জানিয়ে অংতর কা পরকাস॥
দাদূ উপর দেখি করি সব কো রাখৈ নাঁৱ।
অংতরগতি কী জে লখৈঁ তিনকী মৈঁ বলি জাঁৱ॥

"যেমন জীব রহেন মধ্যে সেই অনুরূপ বাসই (গন্ধ) আসে বাহিরে; মুখে যদি বলে (ব্যক্ত করিয়া) তবেই অন্তরের প্রকাশ যায় জানা। হে দাদূ, উপর দেখিয়াই সকলের নাম হয় রাখা; যিনি অন্তরের মর্ম্মরূপ পান দেখিতে, আমি তাঁকেই যাই বলিহারি।"

সত্য নিজে পরখ করিয়া লও। নির্ভয়ে নিজে সব দেখিয়া বিচার কর।

শ্রবনা হৈঁ পর নৈনা নহীঁ তাথৈঁ খোটা খাঁহিঁ।
জ্ঞান বিচার ন উপজৈ সাচ ঝূঠ সমঝাঁহিঁ॥
জিন্হৈ জ্যোঁ কহী তিন্হৈ ত্যোঁ মানী জ্ঞান বিচার ন কীন্হাঁ।
খোটা খরা জিব্র পরখি ন জানৈঁ ঝূঠ সাচ করি লীন্হাঁ॥
দাদূ সাচা লীজিয়ে ঝূঠা দীজৈ ডারি।
সাচা সনমুখ রাখিয়ে ঝূঠা নেহ নিৱারি॥
সাচে কুঁ সাচা কহৈ ঝূঠে কূঁ ঝূঠা।
দাদূ দুবিধ্যা কোই নহীঁ জ্যোঁ থা ত্যোঁ দীঠা॥

"(শ্রুতি স্মৃতি শাস্ত্র ও অপরের বাণী শুনিবার মত) শ্রবণ আছে কিন্তু (নিজে দেখিবার মত) নয়ন নাই, তাই অসত্য দ্বারাই করিতে হয় নির্ব্বাহ; জ্ঞান বিচার অঙ্কুরিত হইয়া উৎপন্ন হইবারই পায় না সুযোগ, তাই মনের মধ্যে সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্য হয় সমঝিতে।

যে যাহা বলিল তাই লইল মানিয়া, জ্ঞানের দ্বারা বিচার করিয়াও

দেখিল না; তার জীবন ভালমন্দ সাচ্চা মিছা পরখ করিতেও জানিল না, মিথ্যাকেই গ্রহণ করিল সত্য বলিয়া।

হে দাদূ, সত্যকেই কর গ্রহণ; মিথ্যা দাও ফেলিয়া। সত্যকেই সদা রাখ সম্মুখে, মিথ্যার প্রতি মমতা কর দূর।

সত্যকেই বল সত্য, মিথ্যাকে বল মিথ্যা। হে দাদূ, যাহা যেমন তাহা ঠিক তেমনই গেল দেখা, (এখন) আর নাই কোনো দ্বিধা সংশয়।”

লোকে দেখি সত্য মিথ্যায় ভেদ বিচার করে না। যেখানে বিচার করিয়া পরখ করিয়া ভেদ করা চাই সেখানে ভেদ করে না, অথচ যেখানে ভেদ করা উচিত নয় সেখানে তারা করে ভেদ। যিনি সগুণ নির্গুণ প্রভৃতি কথা লইয়া সত্যেরও জাতিভেদ করেন, তাঁহাকেই লোকে বলে ধন্য ধন্য। মানুষকে যিনি উচ্চ নীচ বর্ণের বলিয়া ভেদ করেন তাঁহাকেই লোকে সাধু বলে। অথচ ভগবানের কাছে এমন কোনো ভেদ নাই, তাঁর কাছে সব মানুষই সমান; বাহিরের বিচারেই লোকে নানা ভেদ আনিয়া করে উপস্থিত।

তাঁর কাছে যেখানে ভেদ নাই সেখানেও আমাদের ভেদবুদ্ধি :

সরগুণ নিরগুণ পরখিয়ে সাধু কহৈঁ সব কোই।
সরগুণ নিরগুণ ঝূঠ সব সাহিব কে দরি হোই॥
পূরণ ব্রহ্ম বিচারিয়ে সকল আত্মা এক।
কায়া কে গুণ দেখিয়ে নানা বরণ অনেক॥

“সগুণ নির্গুণ প্রভৃতি (দার্শনিক বাঁধি বুলি বলিয়া, সত্যকে) বিচার করিলে সবাই বলে ‘হ্যাঁ সাধু বটে!’ কিন্তু সেই প্রভুর কাছে সগুণ নির্গুণ এই সব বিচারই যে ঝুটা।

পূর্ণ ব্রহ্মের দিক দিয়া বিচার করিলে সকল মানবই (আত্মা) এক, আর কায়ার দিক দিয়া যদি বিচার কর, তবে নানা বর্ণ ও অনেক ভেদ বিভেদ।”

তিনি দুঃখ দিয়া সাচ্চা ঝুটা পরখ করিয়া দেন ঃ

জে নিধি কহীঁ ন পাইয়ে সো নিধি ঘর ঘর আহি ।
দাদূ মহঁগে মোল বিন কোঈ ন লেৱৈ তাহি ॥
রাম কসৈ সেৱক খরা কধী ন মোড়ে অংগ ।
দাদূ জব লগ রাম হৈ তব লগ সেৱগ সংগ ॥
সাহিব কসৈ সেৱগ খরা সেৱগ কৌঁ সুখ হোই ।
সাহিব করৈ সো সব ভলা বুরা ন কহিয়ে কোই ॥
দাদূ কসি কসি লীজিয়ে দহনতৈঁ পরমান ।
খোটা গাঁঠি ন বাঁধিয়ে সাহিব কে দীৱান ॥

"কোথাও মেলে না যে নিধি সেই নিধিই বিরাজিত ঘরে ঘরে, বড়ই মহার্ঘ সেই নিধি, হে দাদূ, বিনামূল্যে কেহই তাহা পারে না লইতে।

ভগবান যাকে দুঃখ দিয়া কসিয়া নিয়াছেন পরখ করিয়া সেই তো সাচ্চা সেবক, তাঁর সেবক কখনও আপন অঙ্গ (তাঁর আঘাত হইতে বাঁচাইবার জন্য) একটুও বাঁকায় না বা সঙ্কুচিত করে না ; দাদূ বলেন, যতক্ষণ ভগবান আছেন ততক্ষণ সেবকও আছে সঙ্গে সঙ্গে ।

প্রভু যাহাকে কসিয়া পরখ করিয়াছেন সে-ই সাচ্চা সেবক ; কসনের দুঃখেই তার আনন্দ। প্রভু যাহা করেন তাহা সবই ভাল, তাহাকে তো কোনোমতেই বলা যায় না মন্দ ।

খুব কসিয়া কসিয়া লও পরখ করিয়া ; হে দাদূ, দহনেতেই মিলিবে সাচ্চাত্বের প্রমাণ। প্রভুর দরবারে আসিয়া ঝুটা কখনো নিও না গাঁঠে বাঁধিয়া।"

দ্বিতীয় প্রকরণ—উপদেশ

চতুর্থ অঙ্গ—দয়া নির্বৈরতা অঙ্গ

যাহাকে পণ্ডিতেরা মৈত্রী বলেন তাহাকেই দাদূ "দয়া নির্বৈরতা" বলিয়াছেন।

জগতে ভেদের অন্ত নেই। ধনী ও নির্ধন, জ্ঞানী অজ্ঞান, এদেশী ওদেশী প্রভৃতি ভেদ তো আছেই; ধর্ম্ম আবার তাহার উপর জাতি বর্ণ ধর্ম্ম ও সম্প্রদায় প্রভৃতি আনিয়া নানা ভেদ উৎপন্ন করিয়াছে। কোথায় ধর্ম্ম নানা ভেদ নানা বাধা দূর করিবে, না ধর্ম্মই নূতন নূতন বাধা সৃষ্টি করিয়াছে! ধর্ম্মের তৈয়ারী বাধাগুলি আরও ভীষণ ও সব চেয়ে সর্ব্বনাশা। তার কারণ ধর্ম্মই হইল যোগসেতু, শান্তি-দাতা, ভেদ-বুদ্ধি হইতে ত্রাতা; সে যদি নষ্ট হয় তবে আর রক্ষা করিবে কে? দেহে ব্যাধি হইলে "মর্ম্মপ্রাণ" তাকে ব্যাধি-মুক্ত করে, সেই "মর্ম্মপ্রাণ" যদি ব্যাধিত হয় তখন উপায় কি? কবীর বলিয়াছেন।

বেহ্ড়া দীন্‌হী খেত কো বেহ্ড়াহী খেত খায়।

"ক্ষেত রক্ষা করিতে দিলাম বেড়া, একদিন দেখি বেড়াই খাইতেছে ক্ষেত; এই কথা বুঝাইয়া আর বলি কাকে?"

নির্ব্বৈরতা হইল নিষেধাত্মক কথা। দলের সঙ্গে দলের, সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্প্রদায়ের, ধর্মের সঙ্গে ধর্মের, তখন খুবই মারামারি চলিয়াছে। তার মধ্যে যাঁরা শান্তি ও সমন্বয়ের কথা আনিলেন তার মধ্যে কবীর, দাদূ, নানক প্রভৃতি ভক্তেরা প্রধান। কিন্তু বৈরটুকু গেলেই কাজ তো পূরা হইল না, পরস্পরের প্রতি দয়া, প্রেম, মমতা হওয়া চাই। আসলে সকল জীবই তো তাঁর, সবাই তো তাঁরই স্বরূপ, তবে আর ভেদ কিসের? বাহিরের দিকের দৃষ্টি দিয়া দেখ কেন? অন্তরের দৃষ্টিতে সবাইকে এক বলিয়া জান। সমস্যা কঠিন। কিন্তু এড়াইলে চলিবে না। এই মিলনের সাধনাই প্রেমের সাধনা। ইহাই এড়াইয়া বনে গেলে সাধনা আর হইল কৈ? ধর্ম মানবের মধ্যে যোগসাধনা

না করিয়া সাধন করিতেছে ভেদ সাধনা। তাই সকল ধর্মের মধ্যে ঐক্যকে দেখা মহাসাধনা।

সার মত

আপা মেটৈ হরি ভজৈ তন মন তজৈ বিকার।
নিরবৈরী সব জীব সৌঁ দাদূ য়হ মত সার॥
সব দেখ্যা হম সোধি করি দূজা নহি আন।
সব ঘট একৈ আতমা ক্যা হিংদূ মুসল্‌মান॥
কাহে কোঁ দুখ দীজিয়ে সাঈঁ হৈ সব মাঁহিঁ।
দাদূ একৈ আতমা দূজা কোঈ নাঁহিঁ॥
সাহিবজীকা আতমা দীজৈ সুখ সন্তোখ।
দাদূ কোই দূজা নহীঁ চৌদহঁ তীনোঁ লোক॥
দাদূ কৈ দূজা নহীঁ একৈ আতম রাম।
সতগুরু সির পরি সাধু সব প্রেম ভগতি বিশ্রাম॥

"অহঙ্কার মিটাইয়া দেও, 'হরিকে ভজনা কর, তনুমনের বিকার ত্যাগ কর, সকল জীবের প্রতি নির্ব্বৈর (মৈত্রী-যুক্ত) হও, হে দাদূ, ইহাই হইল সার মত।

সব আমি দেখিলাম খোঁজ করিয়া, কেহ আর নয় ভিন্ন, কেহ আর নয় পর; কি হিন্দু কি মুসলমান একই আত্মা বিরাজমান সব ঘটে।

কেন তবে আর কাহাকেও দুঃখ দাও? স্বামী যে আছেন সবারই মধ্যে। হে দাদূ, সবাই এক-আত্মা, পর তো আর কেহ নাই।

যত জীব (আত্মা) সবাই প্রিয়তম আমার স্বামীর, তাই সকলকেই সুখ দাও সন্তোষ দাও; হে দাদূ, চৌদ্দ ভুবনে তিন লোকে পর বলিয়া আর কেহই নাই।

দাদূর কাছে পর বলিয়া কেহই নাই, সবই আমার একই আত্মারাম। মাথার উপরে আমার সদ্‌গুরু, মাথার উপরে আমার সব সাধকজন, প্রেম ভক্তিই বিশ্রাম।"

অর্থাৎ সর্ব্বত্রই আমার প্রেম, সর্ব্বত্রই আমার ভক্তি, তাই সর্ব্বত্রই আমার বিশ্রাম (শান্তি, আরাম)।

বৈরের স্থান কোথায়?

কিস সৌঁ বৈরী হ্‌বৈ রহ্যা দূজা কোঈ নাহিঁ ।
জিস কে অংগ তৈঁ উপজে সোঈ হৈ সব মাহিঁ ॥
সব ঘটি একৈ আতমা জানৈ সো নীকা ।
আপা পরমেঁ চীন্‌হি লে দরসন হৈ পী কা ॥
কাহে কোঁ দুখ দীজিয়ে ঘট ঘট আতম রাম ।
দাদূ সব সন্তোষিয়ে য়হ সাধু কা কাম ॥

"কার সঙ্গে চলিয়াছে শত্রুতা ? পর যে কেহই নাই। যাঁর অঙ্গ হইতে উপজিলে, তিনিই যে বিরাজমান সবার মাঝে।

সকল ঘটে একই আত্মা ইহা যে জানে সে-ই তো উত্তম, পরের মধ্যে আপনাকে লও চিনিয়া (অথবা আপন পর সকলের মধ্যেই পরমাত্মাকেই লও চিনিয়া), ইহাই হইল প্রিয়তমের দরশন পাওয়া।

কেন তুমি (অন্যকে) দাও দুঃখ, ঘটে ঘটেই যে আত্মারাম। হে দাদূ সকলকেই সুখী কর, এই তো হইল সাধুর কাজ।

সকলেই তাঁর, সবাই পরস্পরের ভাই :

প্রিয়তমের যোগে সর্ব্ব মানবই আপন, অথচ ধর্ম্ম ও সম্প্রদায়ই বৃথা আনিতেছে মিথ্যা যত সব ভেদ।

দাদূ একৈ আতমা সাহিব হৈ সব মাহিঁ ।
সাহিব কে নাতে মিলৈ ভেখ পংথকে নাহিঁ ॥
জব প্রাণ পিছানৈ আপ কোঁ আতম সব ভাঈ ।
সিরজনহারা সবনকা তা সৌঁ লয় লাঈ ॥
পূরণ ব্রহ্ম বিচারি লে দুতিয় ভাব করি দূর ।
সব ঘটি সাহিব দেখিয়ে রাম রহ্যা ভরপূর ॥

"হে দাদূ, একই আত্মা সবার, প্রভু বিরাজিত সবারই মধ্যে ; প্রভুর

সম্বন্ধেই আমরা যে সবাই পারি মিলিতে, ধর্ম্মের ভেখ (বেশ) ও পন্থের (মত ও সম্প্রদায়ের) দিক দিয়াই মিলন অসম্ভব।

প্রাণ যখন আপনাকে (আত্মাকে, সকলের মধ্যে) চিনিতে পারিল তখন সব মানুষই (আত্মাই) ভাই ; তিনিই সবার সৃজনকর্ত্তা, (সবাইকে ভাই জানিয়া) তাঁহার সঙ্গে প্রেম-ধ্যান কর যুক্ত।

পূর্ণ ব্রহ্মের দিক দিয়া সকলকে লও জানিয়া, আত্মপর দ্বৈত ভাব কর দূর, সকল ঘটেই দেখ প্রভু বিরাজিত, সর্ব্ব ঘটেই রাম ভরপূর বিরাজমান।"

ঐক্য স্বাভাবিক, ভেদ কৃত্রিম :

কায়াকে বসি জীৱ সব হ্ৱৈ গয়ে অনংত অপার।
দাদূ কায়া বসি করি নীরংজন নিরকার॥
ঘট ঘটকে উনহার সব প্রাণ পরস হোই জায়।
দাদূ এক অনেক হোই বরতে নানা ভায়॥
আয়ে একংকার সব সাঈঁ দিয়ে পঠাই।
দাদূ ন্যারা নাৱঁ ধরি ভিন্ন ভিন্ন হ্ৱৈ জাই॥

"(মূলতঃ এক হইলেও) দেহের (ভিন্নতার) বশেই জীব হইয়া গেল অনন্ত অপার ভাগে বিভক্ত। হে দাদূ, যে কায়াকে বশ করিয়াছে, কায়ার রহস্য বুঝিয়া লইয়াছে, তার কাছে সবাই নিরঞ্জন নিরাকার (ব্রহ্মস্বরূপ)।

প্রাণের পরশেই হইয়া যায় ঘটে ঘটে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও বিশিষ্টতা। হে দাদূ, একই হইয়াছে অনেক ; নানা ভিন্নভাবে সেই একই সর্ব্বত্র বর্ত্তমান।

সবাই একই আকারে আসিয়াছে জগতে, প্রভু (একই ভাবে সকলকে) দিয়াছেন পাঠাইয়া। হে দাদূ, (সেই একই) মিছামিছি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নাম ধরিয়া গেল ভিন্ন ভিন্ন হইয়া।

মানবদেহ দেবমন্দির :

দাদূ অরস খুদায়কা অজরামরকা থান।
দাদূ সো ক্যোঁ ঢাহিয়ে সাহিব কা নীসান॥
আপ চিন্হাৱৈ দেহুরা তিসকা করহিঁ জতন্ন।
পরতখ পরমেস্বর কিয়া, ভানৈ জীৱ রতন্ন॥

মসীতি সঁৱারী মানসোঁ তিস কো করেঁ সলাম।
ঐন আপ পৈদা কিয়া সো ঢাহৈঁ মুসলমান॥

"হে দাদূ, (যে মানব) ভগবানের মহামন্দির (সিংহাসন), অজর অমৃতের লীলাস্থান, প্রভুর রাজপতাকা (বা নিশানা), তাহাকে কেন কর বিনাশ ?

তিনি (আপনার এই) দেব-মন্দির আপনিই দেন চিনাইয়া, (অন্তরের প্রেম দিয়া) তিনি নিজেই তাহার করেন যত্ন। প্রত্যক্ষ পরমেশ্বর এমন যে করিলেন রচনা, সেই জীব রতনকেই লোকে করে কিনা বিধ্বস্ত ?

মানুষে রচনা করে যেই মসজিদ তাহাকে সবাই করে সেলাম; আর আপনার সত্তার অনুরূপ যে মন্দির ভগবান স্বয়ং করিলেন সৃষ্টি, তাহাকে কিনা বিধ্বস্ত করে মুসলমান।"

এই সময়কার অনেক দুঃখের ইতিহাস দাদূর লেখাতে পাওয়া যাইতেছে। তখন অকারণে অথবা সামান্য মতামতের বিভিন্নতার অজুহাতে যে প্রাণ দিতে হইত, সামান্য ঐহিক রাজশক্তির দম্ভে মানুষ যে কতই নিষ্ঠুর হইতে পারিত, সে সব দুঃখের কথা বুঝিতে পারা যাইতেছে।

অহিংসা :

কালা মুঁহ করি করদকা দিলতৈঁ দূর নিৱার।
সব সূরতি সুবহানকী মুল্লা মুরুখ ন মার॥
বৈর বিরোধৈঁ আতমা দয়া নহীঁ দিল মাহিঁ।
দাদূ মূরতি রামকী তাকোঁ মারন জাহিঁ॥
ভাৱহীন জে পিরথমী দয়া বিহূনাঁ দেস।
ভগতি নহীঁ ভগবংতকী তহঁ কৈসা পরৱেস॥

"(মুসলমানের প্রতি) জবাই করিবার ছোরার মুখে কালি দিয়া (অপমানিত করিয়া) হৃদয় হইতে তাহাকে দাও দূর করিয়া। সবাই তো সেই পবিত্র স্বরূপেরই প্রতিমূর্ত্তি ; হে মোল্লা, মূর্খকে আর আর মারিও না।

(হিন্দুর প্রতি) হৃদয়ের মধ্যে নাই দয়া তাই শত্রুতা করিয়া জীবকে (আতমা) কর আঘাত ; হে দাদূ, যে জীব হইল রামের প্রতিমূর্ত্তি, তাকে লোকে যায় কিনা মরিতে !

ভাবহীন যে পৃথিবী, দয়াহীন যে দেশ, ভক্তি নাই যে ভগবানে ; কেমন করিয়া সেখানে হইবে প্রবেশ ?”

মানবের মধ্যে থাকিয়াই সাধনা ।

জংগল মাঁহেঁ জীব জে জগথৈঁ রহৈ উদাস ।
ভীত ভয়ানক রাত দিন নিহচল নাহীঁ বাস ॥

“জগতের প্রতি উদাস হইয়া যে সব লোক (জীব) জঙ্গলের মধ্যে গিয়া করে বাস । রাত দিন সেখানে ভয়ানক ভীতি (সংসারের স্পর্শ হইবে বলিয়া বা বনের পশু হইতে), তার এখনও নিশ্চল সত্যস্বরূপে হয় নাই বাস ।”

মানবের মধ্যে নানা নিষ্ঠুরতা, পাপ ও অপরাধ আছে মনে করিয়া মানব-সমাজ ত্যাগ করিয়া জঙ্গলে গিয়া বাস করিলেও চলিবে না । এই মানবের মধ্যে থাকিয়াই সাধনা করিতে হইবে ।

দ্বিতীয় প্রকরণ—উপদেশ

পঞ্চম অঙ্গ—জীবিত মৃত অঙ্গ

("জ্যান্ত মড়া")

মধ্য যুগের সাধকদের মধ্যে "জীবন্তে মরা" একটা মস্ত সাধনার ইঙ্গিত ছিল। পারস্যের সুফীদের মধ্যে এই ভাব অতিশয় প্রসিদ্ধ। তাঁহাদের সাধনাতে ইহা একটি প্রধান অঙ্গ। ভারতীয় সাধনাতেও মনকে চঞ্চলতাহীন করিবার জন্যই পুনঃপুনঃ উপদেশ আছে। মন যখন চঞ্চলতাহীন হয় তখনই তাহাকে "মৃত" বলা হয়—

"যত্তু চঞ্চলতাহীনং তন্মনো মৃতমুচ্যতে।"

ভারতের সূফীদের মধ্যে একটি গল্প আছে তাহার সংক্ষিপ্তরূপ দেখিলেও বিষয়টির মর্ম্ম বুঝা যাইবে। দূর দেশের অরণ্য হইতে সংগৃহীত ও সুদূর ইরাণে নির্ব্বাসিত এক বদ্ধ শুক ছিল। তার বুলির জন্য মানুষ তাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। স্বদেশের বনের পাখীরা আসিয়া তাহাকে নানা বনের কাহিনী বলে আর তার মন উদাসী হইয়া যায়। একদিন এক জ্ঞানী শুক পাখী তার কাছে আসিলে সে চোখের জলে তাকে প্রশ্ন করিল "মুক্তি পাই কোন উপায়ে?" জ্ঞানী শুক বলিল, "উপায় দেখাইতেছি, প্রণিধান করিয়া ইহার মর্ম্ম গ্রহণ কর, বেশী করিয়া বলার যো নাই।" বদ্ধ শুকের সঙ্গে জ্ঞানী শুকও ধরা দিল আর নানা বুলী শুনাইতে লাগিল।

একদিন জ্ঞানী শুকটি মরিয়া পড়িয়া রহিল। লোকে আসিয়া তাকে নাড়ে চাড়ে, অবশেষে শিকল খুলিয়া মড়া পাখীটা ফেলিয়া দিল। লোক সব সরিয়া গেলে সে হঠাৎ "এই মুক্তির উপায়" বলিয়া উড়িয়া গেল।

বদ্ধ শুক মনে করিল, "তাই তো, আমাকে দিয়া এদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় বলিয়াই তো আমাকে বাঁধিয়া রাখে। আমি যদি অকর্ম্মণ্য হইয়া যাই, মরিয়া যাই তবে একদিন না একদিন শিকল খুলিয়া দিবেই। তবে আর

আমাকে বাঁধিয়া রাখিবে কোন উদ্দেশ্যে? সেও তাই জীবন্তেই মরিল ও সেই উপায়েই মুক্তি পাইল।

পারস্য হইতেই সম্ভবতঃ এই গল্পটি আসিয়াছে। কারণ জালাল উদ্দীন রুমির কবিতাতে একটি অনুরূপ কাহিনী আছে।

বিদেশগামী বণিক প্রিয় শুককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার জন্য ভারতবর্ষ হইতে কি আনিব?" শুক বলিল, "ভারতের মুক্ত শুকদের জিজ্ঞাসা করিও যে আমি এখানে রহিলাম বদ্ধ; এমন অবস্থায় মুক্তির আনন্দ সম্ভোগ করা কি তাহাদের উচিত? ইহার উত্তর আনিও, আর কিছু নয়।" ভারতে গিয়া বণিক হঠাৎ এক দল শুকের প্রতি সেই প্রশ্নটি করিলেন। একটি শুক হঠাৎ তাহা শুনিয়া মাটিতে মরিয়া পড়িয়া গেল। উত্তর কিছু কহিল না।

বণিক দেশে আসিয়া সেই ঘটনাটি বলিলেন। এই শুকটিও তাহা শুনিয়া মরিয়া গেল। বণিক দুঃখিত হইয়া তাহাকে ফেলিয়া দিলেন। তখন শুক উড়িয়া ডালে বসিয়া তার মুক্তির ইঙ্গিতটি বুঝাইয়া উড়িয়া গেল।

মানব স্বভাবতঃ সাধক ও মুক্ত। সে আপনার তত্ত্ব বিস্মৃত হইয়া নিজ গুণ ও ঐশ্বর্য্য লইয়া আছে মত্ত হইয়া। অথচ এই গুণঐশ্বর্য্য ও অহম্‌ভাবের জন্যই সংসার তাকে চায় বাঁধিয়া রাখিতে। এইগুলি যদি যায় তবে সংসার নিজেই তাকে রেহাই দেয়। তার মুক্তির সাধন সহজ হইয়া যায়।

এই "অহম্"ই সাধকের ভার, ইহাই তার বাধা, কারণ ইহা স্থূল নিরেট। ইহাই তাহাকে পরমাত্মার সঙ্গে প্রেমে মিলিতে দেয় না। এই দেহ হইল পরমাত্মার মন্দির, তাতে "অহম্" ও পরমাত্মা দুই জনের ঠাঁই হয় না। তাই তো নিত্য দুঃখ নিত্য টানাটানি। এই "অহম্" ঘুচিলেই সব টানাটানি মিটিয়া সহজ হইবে। আত্মাকে যদি পরমাত্মার মধ্যে ডুবাইয়া দেই তবে আমার ব্যক্তিগত মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইব, সকল জীবনের মধ্যে নিত্য জীবন লাভ করিব। এই অহম্ গেলেই সব ভয় গেল, ইহাকে লইয়াই তো যত দুশ্চিন্তা। ইহাই তো পরমাত্মার দর্শনের ব্যবধান হইয়া আছে। কাজেই ইহাকে সরিতেই হইবে, মরিতেই হইবে।

বড় কঠিন এই "অহম্‌কে" মারা। এক মূল মার তো অন্য মূলে সে ওঠে

বাঁচিয়া। ইহাকে কাটিয়া, ঘা দিয়া, চূর্ণ করিয়া, (বৈরাগ্যের) আগুনে পোড়াইয়া মারিতে হইবে। একটু রস পাইলেই ইহা ওঠে বাঁচিয়া।

সাধনা ছাড়া এই মরা হয় না। স্বাভাবিক মরা তো সবারই ঘটে, কিন্তু সাধনা দিয়াই এই মরণ লাভ করিতে হয়। হিন্দু সাধক তার "অহম্"কে হিন্দু পদ্ধতিতে মারে, মুসলমান সাধক মুসলমান পদ্ধতিতে মারে, ইহাকে না মারিলে সাধনাই হয় না। গুণ ইন্দ্রিয় মারিয়া দীন হীন হইয়া মরিতে হইবে।

সাধকের পক্ষে কর্ম্ম, সেবা, সাধনাও তো দরকার। "অহম্" গেলে তাহা কেমন করিয়া হইবে?

কেন? এই চন্দ্র, সূর্য্য, পবন, পৃথিবী এরা তো সবাই নিঃশব্দে সেবা করিতেছে। এদের কি কোনো অহঙ্কার আছে? এদের মত মাটি হইয়া সেবা করিতে হইবে। ইহাই সাধনার ইঙ্গিত। শুকের মত মরিলেই হইবে না সেবকের মত নিত্য জীবন্ত জাগ্রত সেবাও চাই। সেই সেবা করিবে "অহম্"-হীন মাটি হইয়া। দুই দিক সমান রাখিয়া তবে এই কঠিন সাধন পূরা করিতে হইবে। সর্ব্বদিকের সাধনা লইয়াই মানবের সাধনা। একদিকে সাধনা করিলে চলিবে কেন?

সাধকরা এই ভাবকে ফুলের বা গন্ধের আরক চোলাইর (Distillation) সঙ্গে তুলনা দেন। ফুল ও জল একত্র মিশিলেই নানা মলিনতা আসিয়া জমে। সে সব এড়াইতে হইলে জলকে আগুনে মারিয়া বাষ্প করিয়া শীতল করিয়া নূতন করিয়া জল করিলে বিশুদ্ধ আরক হয়। মলিনতা দূর করার জন্য সাধক আপনাকে বৈরাগ্য দিয়া মারিবে (সুফীদের "ফনা"), তার পর ভগবানের চরণতলে প্রেমের শীতলতায় সেই বাষ্প জমিয়া নূতন জীবন পাইবে। এতে গন্ধ আসিবে অথচ মলিনতা আসিবে না। এই রকম বাঁচা মরা দুই দিয়া সাধন পুরা হইবে।

ভারতের মধ্য যুগের সাধকরা এবং এখনকার বাউলরা দেখিতে পাই বৌদ্ধ নির্ব্বাণতত্ত্ব, বেদান্তের অদ্বৈতব্রহ্মবাদ, সুফীদের "ফণা" অর্থাৎ আত্মবিলয়তত্ত্ব সবই নানা বিচিত্রভাবে একত্রে মিশাইয়াছেন। তাহাতে তাঁহাদের সাধনার প্রণালী চমৎকার বিচিত্র ও সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে। দাদূর "জীবিত ম্রিতক" অর্থাৎ "জীবন্তে মড়ার" অঙ্গ দেখিলেই তাহা বুঝা যাইবে।

প্রকৃতির মহাভূতেরা সবাই সাধক। তাদের কাছে জ্যান্তমরণ শিক্ষা কর।

ধরতী সত্ত অকাস কা চংদ সুরুজ কা লেই।
দাদূ পাণী পৱনকা রাম নাম কহি দেই॥
দাদূ ধরতী হ্বৈ রহৈ ত্যাগি কপট অহঁকার।
সাঈ কারণ সিরি সহৈ পরতখ সিরজনহার॥
জীৱত মাটী মিলি রহৈ সাঁঈ সনমুখ হোই।
দাদূ পহিলে মরি রহৈ পীছে তো সব কোই।

“ধরিত্রী হইতে (সহিষ্ণুতা), আকাশ হইতে (অসীমতা ও নির্লিপ্ততা), চন্দ্রমা হইতে (শান্তি), সূর্য্য হইতে (প্রকাশ ও তেজস্বিতা), জল হইতে (মালিন্যহরণ ও তাপহরণ শক্তি), পবন হইতে (সদামুক্ত গতি ও সেবা), সাধক যদি সার সত্য লইতে পারে তবেই সে রামনাম জপ করিতে পারে।

হে দাদূ, কপট অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া ধরিত্রীর মত সহিষ্ণু হইয়া সাধক যদি সাধনা করে, যদি সে স্বামীর কারণে সবই মাথার উপর সহে, তবে নিজ সাধনাতেই তাহার কাছে সৃজনকর্ত্তা পরমেশ্বর হইবেন প্রত্যক্ষ বিরাজমান।

স্বামীর সম্মুখে রহিয়া জীবন্তই মাটীর সঙ্গে মিলাইয়া হইবে থাকিতে, হে দাদূ, আগে হইতেই (তাঁর সম্মুখে) থাকিতে হইবে মরিয়া, পিছে তো মরে সবাই।”

জীবন্তে মরিয়াই অমৃতত্ব লাভ হয়।

ঝূঠা গরব গুমান তজি তজি আপা অভিমান।
দাদূ দীন গরীব হোই পায়া পদ নিরবান॥
রাৱ রংক সব মরহিঁগে জীৱহিঁগে না কোই।
সোঈ কহিয়ে জীৱতা জো মরি জীৱা হোই॥

মেরা বৈরী মৈঁ মুৱা মুঝে ন মারৈ কোই।
মৈঁ হী মুঝ কৌঁ মারতা মৈঁ মরজীৱা হোই॥

“ঝূঠা গরব গুমান ত্যাগ করিয়া, অহমিকা অভিমান ত্যাগ করিয়া, দীন

হীন হইয়া, হে দাদূ, সাধক পাইল নির্বাণ পদ। রাজা কাঙ্গাল মরিবে সবাই, কেহই তো থাকিবে না জীবন্ত; তাহাকেই বলা উচিত "জীবন্ত" যে মরিয়া আবার লাভ করিয়াছে জীবন।

আমার শত্রু "আমি" মরিয়াছে। এখন আর আমাকে কেহ পারে না মারিতে। জীবন্তে মরণের সাধনা করিতে গিয়া আমি আপনিই আপনাকে মারিতেছি।"*

অহমই বাধা, অহমই ভার, তাহাকে ক্ষয় কর।

দাদূ আপা জব লগৈ তব লগ দূজা হোঈ।
জব য়হু আপা মিটি গয়া দূজা নাহীঁ কোই॥
তৌ তূঁ পাৱৈ পীৱ কো মৈঁ মেরা সব খোই।
মৈঁ মেরা সহজৈঁ গয়া তব নির্মল দরসন হোই॥
মৈঁ হী মেরে পোট সিরি মরিয়ে তাকে ভার।
দাদূ গুরু পরসাদ সৌঁ সিরতৈঁ ধরী উতার॥
মেরে আগৈঁ মৈঁ খড়া তাথৈঁ রহ্যা লুকাই।
দাদূ পরগট পীৱ হৈ জে য়হু আপা জাই॥

"হে দাদূ, যতদিন এই "অহম্"-ভাব আছে, তত দিনই আত্ম পর দ্বৈত ভাব আছে; এই "অহম্"-ভাব যখন গেল মিটিয়া তখন আর কেহই পর নয়।

"আমি" "আমার" এই সব খোয়াইতে পারিলেই হে সাধক তুমি পাইবে প্রিয়তমকে। "আমি" "আমার" যদি সহজেই যায় তবেই হয় নির্মল দরশন।

(আমার) মাথায় "আমি"-বোঝার ভার রহিয়াছে চাপিয়া, তার ভারেই তো মরণ। গুরুর প্রসাদে দাদূ সেই ভার মাথা হইতে রাখিয়াছে নামাইয়া।

---

* মরজীবা অর্থ যে জীবন্তে মরিয়া আছে। সমুদ্রে ডুব দিয়া যাহারা মুক্তা তোলে তাহাদের "মরজীবা" বলে। অসীমের মধ্যে ডুব দিয়া মুক্ত ঐশ্বর্য্য লাভ করাই হইল আধ্যাত্মিক "মরজীবার" সাধনা।

আমার আগে আড়াল করিয়া "অহম্" খাড়া,তাতেই (প্রিয়তম) রহিয়াছেন লুকাইয়া। হে দাদূ,যদি এই 'আমি' যায় তবে প্রিয়তম তো প্রত্যক্ষ বিরাজমান।"

"অহম্" ত্যাগ করিয়া সহজ হও।

জীৱত মিরতক হোই করি মারগ মাহৈঁ আৱ।
পহিলে সীস উতারি করি পীছে ধরিয়ে পাঁৱ॥
দাদূ মৈঁ মৈঁ জালি দে মেরে লাগৌ আগি।
মৈঁ মৈঁ মেরা দূর করি সাহিব কে সঁগি লাগি॥
মৈঁ নাহীঁ তব এক হৈ মৈঁ আঈ তব দোই।
মৈঁ তৈঁ পড়দা মিটি গয়া জ্যোঁ থা ত্যোঁ হী হোই॥
তৌ তূঁ পাৱৈ পীৱ কৌঁ আপা কছূ ন জান।
আপা জিস থৈঁ উপজৈ সোঈ সহজ পিছান॥

"জীবন্তেই মড়া হইয়া তবে এস (সাধনা) পথের মধ্যে। প্রথমে মাথাটি খসাইয়া পিছে (এই পথে) রাখ পা।

হে দাদূ "আমি আমি" টাকে দাও জ্বালাইয়া, "আমার" মধ্যে লাগুক আগুন, "আমি আমি" "আমার আমার" দূর কর, স্বামীর সঙ্গে হও যুক্ত।

"আমি"নাই তখন আছে এক, আমি আসিলে হইল দুই; "আমি" "তুমি"র পরদা যখন গেল মিটিয়া তখন যেমন ছিল ঠিক তেমনটিই হইল (কৃত্রিম ঘুচিয়া সহজ সত্য হইল)।

তবেই তুই প্রিয়তমকে পাইবি যদি আপনাকে কিছুই না মানিস্। এই "অহমিকা"টি যাহা হইতে উৎপদ্যমান সেই সহজকে নে চিনিয়া।"

বাহ্য আঘাতে মরাতে কেবল দুঃখ; সাধনায় এই মরণেই পূর্ণানন্দ।

বৈরী মারে মরি গয়ে চিততৈঁ বিসরে নাহিঁ।
দাদূ অজহূঁ সাল হৈ সমঝি দেখ মন মাহিঁ॥

"শত্রুর আঘাতে যদি মরিয়া যায় তবে চিত্ত হইতে সেই দুঃখ আর যায়ই না। হে দাদূ, (যে সব আঘাত পরের হাতে খাইয়াছ) ব্যথা তার আজও আছে, মনের মধ্যে এই কথাটা দেখ সমঝিয়া।"

অধ্যাত্ম পক্ষে—"কামাদি শত্রুকে মারিতেই হয়, অথচ যত দিন কামাদি শত্রুকে মারিবার অভিমান মনে থাকে তত দিন সেই কারণেও অন্তরে দুঃখ থাকেই থাকে।"

এই মরণ কেমন তর?

আপা গরব গুমান তজি মদ মচ্ছর অহঁকার।
গহৈ গরীবী বন্দগী সেৱা সিরজনহার॥

"অহমিকা গর্ব্ব গুমান ত্যাগ করিয়া মদ মাৎসর্য্য অহঙ্কার ছাড়িয়া সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবানের সেবা ও দীনতা গ্রহণ কর, প্রণত সেবা-ব্রত হও (ইহাই সেই মরণ)।"

সাধুর মতে এই মরণের লক্ষণ

মিরতক তবহীঁ জানিয়ে জব গুণ ইংদ্রী নাহীঁ।
জব মন আপা মিটি গয়া তব ব্রহ্ম সমানা মাঁহিঁ॥

"(সাধককে জীবন্তে) মড়া তখনই জানিবে যখন তার আর (নিজের বলিতে) কোনো গুণ বা ইন্দ্রিয় নাই, যখন তার মনের চঞ্চলতা ও অহমিকা মিটিয়া যায় তখনই তার মধ্যে ব্রহ্ম ভরপূর ভরিয়া রহেন বিরাজমান।"

ফকীরের মতে জ্যান্তে মরণ হইল তখন

গরীব গরীবী গহি রহ্যা মসকীনী মসকীন।
দাদূ আপা মেটি করি হোই গয়া লৱলীন॥

"(সাধক) দীন রহিল দৈন্যকে আশ্রয় করিয়া, দুঃখী নম্র রহিল দীন নতভাব আশ্রয় করিয়া; হে দাদূ, যখন অহমিকাকে সাধক ক্ষয় করিয়া দিল তখনই ধ্যানে ভক্তিতে রহিল লীন হইয়া ডুবিয়া।"

(দাদূর দুই পুত্র গরীবদাস ও মসকীন দাসের নাম এইখানে প্রসঙ্গক্রমে পাওয়া গেল!)

অথচ এই মরণ সাধন করাই চাই:

সব কোঁ সংকট এক দিন কাল গহৈগা আই।
জীৱত মিরতক হোই রহৈ তা কে নিকটি ন জাই॥

জীৱতহী ম্রিত হোই রহৈ সব কো ৱিরকত হোই।
কাঢ়ৌ কাঢ়ৌ সব কহৈঁ নাৱঁ ন লেৱৈঁ কোই॥
মনা মনী সব লে রহে মনী ন মেটী জাই।
মনা মনী জব মিটি গঈ তবহঁী মিলৈ খুদাই॥
কহিবা সুনিবা গত ভয়া আপা পরকা নাস।
দাদূ মৈঁ তৈঁ মিটি গয়া পূরণ ব্রহ্ম প্রকাস॥

"একদিন আছেই সকলের সঙ্কট—কাল আসিয়া করিবে গ্রাস। কিন্তু জীবন্তে যে মড়া হইয়া থাকে, কাল তার নিকট তো যায় না।

জীবন্তই যদি থাকে মরিয়া, সবাই তার উপর হয় বিরক্ত, সবাই বলে (ইহাকে) 'বাহির কর, বাহির কর', কেহ তার নামও চায় না লইতে।

সবাই আছে কেবল অহম্ ও অহংকার নিয়া, আর অহংকার ক্ষয় করাও যায় না। অহম্ ও অহংকার যখন মিটিয়া যায় তখনই মেলেন খোদা আপনি।

শুনিতে শুনিতে কহিতে কহিতে (বলা কহা ও শোনা) ঢের হইয়া গিয়াছে, এখন আত্ম-পর ভেদ নাশ (করিতে হইবে)। হে দাদূ, "আমি" "তুমি" যদি গেল মিটিয়া তবেই পূর্ণব্রহ্ম হয় প্রকাশ।"

কবে এই দুঃখ ঘুচিবে?

কদি য়হু আপা জাইগা কদি য়হু বিসরৈ ঔর।
কদি য়হু সুখিম হোইগা কদি য়হু পাৱৈ ঠৌর* ॥
দাদূ আপ ছিপাইয়ে জহাঁ ন দেখৈ কোই।
পিয় কৌঁ দেখি দেখাইয়ে ত্যোঁ ত্যোঁ আনংদ হোই॥
অন্তরগতি আপা নহীঁ মুখ সৌঁ মৈঁ তৈঁ হোই।
দাদূ দোস ন দীজিয়ে যোঁ মিলি খেলৈ দোই॥

"কবে এই "অহম্" যাইবে, কবে এ আর সব ভুলিবে, কবে স্থূলতা পরিহার করিয়া এ সূক্ষ্ম হইবে, কবে এ আশ্রয় (ঠাই) পাইবে?

হে দাদূ, যেখানে কেহই দেখেনা সেখানে আপনাকে লুকাও।

---

* গুরুর অঙ্গতে ও এই কবিতাটি প্রায় এই আকারেই আছে।

প্রিয়তমকেই দেখ ও দেখিয়া দেখাও, (যে পরিমাণে তাহা পারিবে) তেমন তেমনই হইবে আনন্দ।

অন্তরের মধ্যে যদি "অহম্" না থাকে, কেবল মুখেই যদি "আমি" "তুমি" (ব্যবহার জন্য) হয়, হে দাদূ, তবে দোষ দিও না, এমন করিয়াই খেলে দুই জনে।"

অহম্-লোপ সাধনার ধন, সকলের মধ্যে সত্য জীবন।

সীখ্যূঁ প্রেম ন পাইয়ে সীখ্যূঁ প্রীতি ন হোই।
সীখ্যূঁ দরদ ন উপজৈ জব লগ আপ ন খোই॥
দাদূ কাহে পচি মরৈ সব জীবৌ মৈঁ জীব।
আপা দেখি ন ভূলিয়ে খরা দুহেলা পীব॥

"যাবৎ আপনাকে (তাঁর মধ্যে) না হারাইয়া ফেলিবে তাবৎ শেখা কথায় প্রেম পাইবে না, শিখিলেই প্রীতি হইবে না, শিক্ষার ফলে দরদও জন্মিবে না।

হে দাদূ, কেন (আপনাতে বদ্ধ থাকিয়া) মর পচিয়া? সকল জীবনের মধ্যে (বিশ্ব জীবনে) থাক বাঁচিয়া। "আপনাকে" দেখিয়াই ভুলিও না, অতিশয় দুর্ভর কঠিন যে প্রিয়তম।"

অহম্ ক্ষয়েই অভয়।

দাদূ হৈ কো ভয় ঘণাঁ নাহীঁ কৌঁ কুছ নাহিঁ।
দাদূ নাহীঁ হোই রহু অপনে সাহিব মাঁহিঁ॥
মৈঁ নাহীঁ তহঁ মৈঁ গয়া একৈ দূসর নাহিঁ।
নাহীঁ কূঁ ঠাহর ঘণী দাদূ নিজ ঘর মাঁহিঁ॥
জহাঁ রাম তহঁ মৈঁ নহীঁ মৈঁ তহঁ নাহীঁ রাম।
দাদূ মহল বারীক হৈ দোউ কূঁ নাহিঁ ঠাবঁ॥

"হে দাদূ, (যাহার কিছু আছে তাহার) "আছে"র বিস্তর ভয়, (অকিঞ্চন) "নাহি"র কোনো ভয়ই নাই; হে দাদূ, আপন স্বামীর মধ্যে তাই "নাহি" হইয়াই থাক।

"আমি" যেখানে নাই সেখানে আমি গিয়াছি, সেখানে একমাত্র

(অদ্বিতীয় বিরাজমান), দ্বিতীয় আর কিছু নাই ; হে দাদূ যে (অকিঞ্চন) "নাহিঁ" হইয়া আছে নিজ ঘরের মধ্যে তাহারই দৃঢ় (অচল) প্রতিষ্ঠা।

যেখানে রাম আছেন সেখানে "আমি" নাই, যেখানে "আমি" আছে সেখানে রাম নাই ; হে দাদূ বড় সূক্ষ্ম সঙ্কীর্ণ সেই মন্দির, দুইয়ের সেখানে নাই ঠাঁই।"

তৃতীয় প্রকরণ—তত্ত্ব

প্রথম অঙ্গ—কাল অঙ্গ

জগতে সবই নশ্বর ; প্রতি আকার প্রতি বস্তু প্রতি প্রাণী দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে মরিতেছে, অথচ কেহই তাহা অনুভব করিতে পারিতেছে না।

ছোট বড় কাহাকেও এই মৃত্যু ছাড়ে না। জগতে যে-সব মহাবীর সাম্রাজ্য হাতে গড়িয়াছেন হাতে ভাঙ্গিয়াছেন তাঁহারাও আজ কোথায় ? দেব দানব অথবা সম্প্রদায় প্রবর্ত্তকরাই বা আজ কোথায় ?

মৃত্যু কেবল বাহিরের নহে, অন্তরেই যে আসল মৃত্যুর বাস। জীবন্তেই মানুষ দিনে দিনে অন্তরের মধ্যে শুষ্ক হইয়া মরে। অন্তরের এই পলে পলে মৃত্যু কেহ টেরই পায় না, ইহাই তো বিপদ।

প্রেমরস বিনা ভগবানের দয়া বিনা এই গভীরতর মৃত্যু হইতে রক্ষা নাই।

সবই অনিত্য :

যহু ঘট কাচা জল ভর্‌্যা বিনসত নাহীঁ বার।
য়হু ঘট ফূটা জল গয়া সমুঝত নহীঁ গবাঁর॥
সব কোই বৈঠে পংথ সিরি রহে বটাউ হোই।
জে আয়ে তে জাহিঁগে ইস্ মারগ সব কোই॥
সংঝ্যা চলৈ উতাবলা বটাউ বনখংড মাহিঁ।
বেরিয়া নাহীঁ ঢীলকী দাদূ বেগি ঘর জাহিঁ॥
পংথ দুহেলা দূরি ঘর সংগ ন সাথী কোই।
উস মারগ হম জাহিঁগে দাদূ ক্যোঁ সুখ সোই॥

“এই দেহ কাঁচা ঘট, জলে ভরা ; বিনষ্ট হইতে একটুও হয় না বিলম্ব ; এই ঘট ফূটিল আর জলটুকু গেল, এই কথাটুকুই বুঝিল না নির্বোধ।

সবাই বসিয়া আছে পথের মাথায়, সবাই মুসাফির (পথিক) হইয়াই আছে : যে আসিয়াছে সে-ই যাইবে, এই পথেই যাইবে সবাই।

বেগে চলিয়া আসিতেছে উতলা সন্ধ্যা, পথিক এখনও অরণ্যের মাঝে ; ঢিলামি (শৈথিল্য) করিবার সময় নাই, হে দাদূ শীঘ্র চল ঘরে।

পথ দুর্গম, দূরে ঘর, সঙ্গী সাথী কেহই নাই ; সেই পথেই আমাকে যাইতে হইবে, তবে দাদূ, (এখনও তুমি) কেন সুখে শয়ান ?”

মৃত্যু সর্ব্বগ্রাসী ঃ

ফূটী কায়া জাজরী নব ঠাহর কানী।
তামেঁ দাদূ ক্যোঁ রহৈ জীব সরীখা পানী॥
সব জগ সূতা নীঁদ ভরি জাগৈ নাহীঁ কোই।
আগৈ পীছৈ দেখিয়ে পরতখি পরলৈ হোই॥
সিংগী নাদ ন বাজহীঁ কত গয়ে সো জোগী।
দাদূ রহতে মঢ়ী মৈঁ করতে রস ভোগী॥
কহঁ সো মহম্মদ মীর থা সব নবিয়োঁ সিরতাজ।
সো ভী মরি মাটী হুবা অমর অলহকা রাজ॥
কেতে মরি মাটী ভয়ে বহুত বড়ে বলবংত।
দাদূ কেতে হোই গয়ে দানাঁ দেব অনংত॥
ধরতী করতে এক ডগ দরিয়া করতে ফাল।
হাকোঁ পরবত ফাঁড়তে সোভী খায়ে কাল॥

“এই কায়া ঘটখানি ভাঙ্গা ঠুনকো, নয় স্থানে তার ফুটা, তাহাতে হে দাদূ, কেন জলের মত (তরল ও চঞ্চল) থাকিবে জীবন ?

সমস্ত জগৎ নিদ্রায় মত্ত হইয়া আছে শুইয়া, কেহই জাগে না। আগে পিছে চাহিয়া দেখ, প্রত্যক্ষ প্রলয় হইয়াই চলিয়াছে।

আর তো (যোগীর) শিঙ্গার শব্দ * বাজিতেছে না, সেই যে যোগী

---

* উপক্রমণিকায় (৫৯ পৃষ্ঠায়) এই যোগীর কথা বলা হইয়াছে। যোগীরা তখন গৃহস্থের বাড়ী ভিক্ষা করিতে গিয়া বা ঘরে বসিয়া শিঙ্গা বাজাইতেন। এখনও এইরূপ যোগী উত্তর পশ্চিমে আছেন। তাঁদের মধ্যে কান ছিদ্র করা, কপাল লইয়া ভিক্ষা করা, শিকলের মালা ঝুলান প্রভৃতি নানা প্রথা আছে। কেহ বা বাহ্য মদ খান কেহ বা দেহস্থ রস পান করেন। নগরের বাহিরে মঢ়ী বা সন্ন্যাসীর কুটীরে এঁরা থাকেন।

মঢ়ীতে (সন্ন্যাসীর কুটীর) থাকিয়া রস ভোগ করিতেন তিনিই বা এখন কোথায় ?

কোথায় সেই মহম্মদ যিনি সকল নবী (ভবিষ্যদ্‌বক্তা ঋষি) -গণের ছিলেন নেতা ও প্রধান ? তিনি ও মরিয়া আজ হইয়া গিয়াছেন মাটী, কেবল আল্লার রাজত্বই আছে অমর হইয়া।

কত বড় বড় শক্তিশালী মরিয়া হইয়া গিয়াছেন মাটি, হে দাদূ, কত সব হইয়া গিয়াছেন (চুকিয়া), অনন্ত দেব দানব সব গিয়াছেন হইয়া বহিয়া চলিয়া।

যাঁরা এক পদক্ষেপে পৃথিবী করিতেন পার (পৃথিবী যাঁদের এক পদক্ষেপ মাত্র ছিল), সমুদ্রকে যাঁরা করিয়া যাইতেন লঙ্ঘন, হুঙ্কারে পর্ব্বত ফেলিতেন বিদীর্ণ করিয়া, তাঁদেরও খাইয়াছে কালে।”

কাল হইতে রক্ষা করিতে একমাত্র ভগবান ঃ

মুসা ভাগা মরণ তৈঁ জহঁ জায় তহঁ গোর।
দাদূ সরগ পতাল সব কঠিন কাল কা সোর॥
কাল ঝালমেঁ জগ জলৈ ভাগি ন নিকসৈ কোই।
দাদূ সরনৈঁ সাচকে অভয় অমর পদ হোই॥
য়হু জগ জাতা দেখি করি দাদূ করী পুকার।
ঘড়ী মহূরত চালনাঁ রাখৈ সিরজনহার॥
দাদূ মরিয়ে রাম বিন জীজৈ রাম সঁভাল।
অম্রিত পীবৈ আতমা যোঁ সাধূ বংচৈ কাল॥

“মুসা (ইহুদী, খ্রীষ্টান ও মুসলমানদের এক প্রাচীন ঋষি) মরণ হইতে পালাইলেন, যেখানে তিনি যান সেখানেই দেখেন গোর (মৃতদেহ পুঁতিবার স্থান) ; হে দাদূ, কি স্বর্গে কি পাতালে কালের কঠিন হল্লা। কালের দহন-জ্বালায় জ্বলিতেছে জগৎ, পালাইয়া কেহই পারে না বাহির হইতে। হে দাদূ সত্যকে যে শরণ করে অভয় অমর পদ সে করে লাভ। এই জগৎ (প্রলয়ের দিকে) চলিয়াছে দেখিয়া দাদূ জানাইল চীৎকার করিয়া, প্রতি দণ্ডে প্রতি মুহূর্ত্তেই চলিয়াছে চলা, রাখিতে পারেন একমাত্র সৃজনকর্ত্তা।

হে দাদূ, রাম বিনাই মরণ, রামকে আশ্রয় করিয়াই হও জীবন্ত। (রামকে আশ্রয় করিয়াই) কাল হইতে আত্মা পায় রক্ষা ও সাধক করে অমৃত পান।”

প্রেম দিয়াই মৃত্যু জয়ঃ

প্রেমরস বিন* জীর জে কেতে মুয়ে অকাল।
মীঁচ বিনা জে মরত হৈঁ তাতৈঁ দাদূ সাল॥
পূত পিতা তৈঁ বীছূট্যা ভুলি পড়্যা কিস ঠৌর।
মরৈ নহীঁ উর ফাটি করি দাদূ বড়া কঠোর॥
দাদূ ঔসর চলি গয়া বরিয়াঁ গঈ বিহাই।
কর ছিটকেঁ কহঁ পাইয়ে জনম অমোলিক জাই॥
সূতা আরৈ সূতা জাই সূতা খেলৈ সূতা খাই।
সূতা লেরৈ সূতা দেরৈ দাদূ সূতা জাই॥

“প্রেমরস বিনা কত জীবই যে অকালেই (কালের হাত ছাড়াই) মরিল! মৃত্যু বিনাই যে সবাই মরে, হে দাদূ, তাতেই (হৃদয়) বিদ্ধ হইয়া হইতেছে ব্যথিত। পিতা (জগৎপিতা) হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পুত্র (মানব) কোথায় (আজ) রহিল ভুলিয়া? বুক ফাটিয়া যে মরে না, হে দাদূ, হৃদয় বড় কঠিন!

হে দাদূ অবসর (সুযোগ) গেল চলিয়া। বেলাটুকু গেল বহিয়া। অমূল্য জনম যায় চলিয়া, হাত হইতে (মাণিক) যদি যায় ছিটকাইয়া তবে আর তাকে পাইবে কোথায়?

শুইয়া শুইয়াই আসে (লোক এই জগতে), শুইয়া শুইয়াই যায়, শুইয়াই খেলে, শুইয়াই খায়; শুইয়াই নেয় শুইয়াই দেয়, হে দাদূ, শুইয়া শুইয়াই গেল (এই জনম)। (একবার জাগিয়া সত্যকে, প্রেমকে, প্রেমময় পিতাকে আশ্রয় করিলাম না। যদি তাহা পারিতাম তবে এই অমূল্য জন্ম সার্থক হইত, অভয় অমর স্থিতি পাইয়া অমৃত পান পরিতে পারিতাম)।”

মনের মধ্যেই মৃত্যুঃ

মনহীঁ মাঁহৈঁ মীঁচ হৈ সালৌ কে সির সাল।
জে কুছ ব্যাপৈ রাম বিন দাদূ সোঈ কাল॥

---

* মুদ্রিত পুস্তকে “রাম নাম বিন” পাঠ।

বিষ অম্রিত ঘটমেঁ বসৈ দূনূঁ্য একৈ ঠাৱঁ।
মায়া বিষয় বিকার সব অম্রিত রস হরি নাৱঁ॥
জেতী লহরি বিকারকী কাল কৱল মেঁ সোই।
প্রেম লহরি সো পীৱকী ভিন্ন ভিন্ন য়োঁ হোই॥

"মনেরই মধ্যে যে মৃত্যুর বাসা সেই তো ব্যথার উপরে ব্যথা (বিদ্ধ শূলের উপর বিদ্ধ শূল); রাম বিনা (জীবনে) যাহা কিছু ব্যাপিতেছে, হে দাদূ তাহাই হইল কাল।

বিষ ও অমৃত এই ঘটের মধ্যেই (দেহেই) করে বাস, তুইই থাকে এক ঠাঁই। বিষয় বিকার যত সবই মায়া, অমৃতরস হইল হরিনাম। বিষয়-বিকারের যত তরঙ্গ, সবই কালের কবলে; প্রেম লহর হইল প্রিয়তমের, এমন করিয়াই এই তুয়ের ভিন্নতা।"

প্রভু কালেরও কাল :

পৱনা পানী ধরতী অংবর বিনসৈ রৱি সসি তারা।
পংচ তত্ত্ব সব মায়া বিনসৈ, মানষ কহাঁ বিচারা॥
সব জগ কম্পৈ কাল তৈঁ ব্রহ্মা বিশ্ন মহেশ।
সুরনর মুনিজন লোক সব সরগ রসাতল সেস॥
চংদ সুর ধর পৱন জল ব্রহ্মাণ্ড খণ্ড পরবেস।
কাল ডরৈ করতার তৈঁ জয় জয় তুম্হ আদেস॥

"পবন জল ধরিত্রী অম্বর রবি শশী তারা সবই পাইতেছে বিনাশ। পঞ্চতত্ত্ব মায়া সবারই চলিয়াছে বিনাশ, মানুষ বেচারা আর কোথায়?

ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর, সুরনর, মুনিজন, সব লোক, স্বর্গ, রসাতল, শেষ (অনন্ত), সমস্ত জগতই কালের ভয়ে কম্পমান।

চন্দ্র সূর্য্য ধরিত্রী পবন জল ব্রহ্মাণ্ড খণ্ড (সবই কালের গ্রাসে) প্রবিষ্ট; এমন কালও, হে করতার, তোমার ভয়ে ভীত, জয় জয় তোমার আদেশ।"

তৃতীয় প্রকরণ—তত্ত্ব

তৃতীয় অঙ্গ—সাচ (সত্য) অঙ্গ

সাধনায় তত্ত্বের প্রয়োজন আছে। তত্ত্বের প্রধান কথাই হইল সত্য বা "সাচ"।

সকল সত্যের সার সত্য হইল প্রণতি। তাঁর চরণে যে প্রণাম নিবেদন করিব সে প্রণাম তো আর শেষ হইবার নহে। এই নিশ্চল প্রণতির বাধা হইল অভিমান, তাহাই অসত্য। এই সত্য আমরা বেদ কোরাণে না পাইলেও আপন অন্তরের শাস্ত্র খুলিলেই পাই, সেখানে দয়াময় স্বয়ং নিত্য জীবন্ত সত্য প্রকাশ করিতেছেন।

এই মানব জীবনই হইল ভগবানের মন্দির। যাঁহারা গণ্যমান্য উচ্চ জাতির লোক তাঁহারা হীন জাতিদের মন্দিরের বাহির করিয়া রাখিতে চান। কিন্তু তাঁহারা জানেন না যে ইট কাঠের মন্দির ঝুঠা মন্দির, সত্য মন্দির এই মানব দেহ। এ তাঁর নিজের হাতে রচিত নিবাস, এখানে অপার অগাধ প্রেমেই তিনিই বিরাজিত। এই দেহকে যে নীচ বলে সে ভগবানের বিদ্রোহী। এই মন্দিরের গৌরবেই মানব উচ্চশির। কিন্তু তার দায়িত্বও আছে; মন্দির বলিয়া বুঝিলেই নিত্য ইহাকে পবিত্র ও ভগবানের নিবাসের যোগ্য করিয়া রাখিতে মানুষ বাধ্য।

মানব-অন্তরের নিত্য উদ্ভাসিত সত্যকে স্বীকার না করিয়া লোকে ফাঁকি দিয়া ধর্ম্ম সাধনা শেষ করিতে চায়। তাই যে মুসলমান সে সত্য মুসলমান হয় না, হিন্দু ও সত্য হিন্দু হয় না। অন্তরেই আসল কোরাণ, আসল বেদ।

প্রকৃতির ভূতগণ মহাসেবক। পৃথিবী, জল, পবন, আকাশ, দিন, রাত্রি, চন্দ্র, সূর্য্য, ইহারা নিরন্তর সেবা করিয়া তাদের নিশ্চল প্রণতি জানাইতেছে। মহম্মদ প্রভৃতি ঋষিরাও এই অন্তর-শাস্ত্র দেখিয়াই সত্য দীক্ষা সত্য প্রণতি লাভ করিয়াছেন।

বাহিরের শাস্ত্র লোকাচার বিধি নিষেধ মানাই হইল বাহিরের অধীনতা,

তাহাই দাস্য। আপন অন্তরের সত্যকে পালন করাতেই যথার্থ স্বাধীনতা। কাজেই এই সত্য যে পাইয়াছে সে হয় সর্ব্ববিধ দাসত্ব হইতে মুক্ত।

এই অন্তরশাস্ত্র সকলেরই কাছে সমানভাবে উন্মুক্ত কিন্তু বাহ্যশাস্ত্র উচ্চ জাতির লোকেরই বিশেষ সম্পত্তি। কাজেই অন্তরের সাধনার শাস্ত্রে, স্বাধীন সাচ্চা আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য্যে, কাহারও বঞ্চিত হইবার হেতু নাই। যাহারা হীনবর্ণ, যাহারা মূর্খ, সমাজে যাহাদের স্থান নাই, তাহাদিগকে সবাই করে ঘৃণা কিন্তু দাদূ তাহাদিগেরই দলে বসিতে চান। তিনি বলেন "ইহাদের তোমরা মারিয়াছ, জান না যে ইহারাই তোমাদিগকে মারিবে। ইহাদের যদি মুক্ত কর তবে ইহারাই তোমাদিগকে মুক্তি দান করিবে।"

অপনী অপনী জাতি সোঁ সব কো বৈসেঁ পাঁতি।
দাদূ সেৱক রামকা তাকৈ নহীঁ ভরাঁতি॥

(সাচ অংগ, ১২৩)

জা কোঁ মারণ জাইয়ে সোঈ ফিরি মারৈ।
জা কোঁ তারণ জাইয়ে সোঈ ফিরি তারৈ॥

(সাচ অংগ, ২৬)

উপক্রমণিকাতেও এই সব বিষয় দ্রষ্টব্য।

এই অন্তরের সত্য যে দেখিয়াছে, সে-ই সত্যকে বলিবার সত্যকে প্রকাশ করিবার অধিকারী। স্বয়ং সত্যস্বরূপই সকল সত্যের মূল। তাঁহাকে ছাড়িয়া কোনো সত্যই নাই। সেই সত্য না পাইয়া যে ধর্ম্মের কথা বলিতে গিয়াছে সে স্বয়ং মজিয়াছে অপরকেও মজাইয়াছে।

এই সত্য যে পায় সে শুধু বলিয়াই খালাস হয় না। সত্যকে সে স্বয়ং সাধন করিতে, আপন জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিতেও বাধ্য হয়। কারণ এই সত্যই তার জীবনকে সাধনাতে পূর্ণ করিয়া তোলে। যোগ্য ভূমিতে আপন জীবনে বিকশিত হইয়া চলিলেই বীজের মেলে পরিচয়। সত্য-উপলব্ধিটি ঠিক সাচ্চা মত হইল কি না তারও যথার্থ পরিচয় মেলে সাধনার মধ্যে। এই সত্য যতক্ষণ না পায় ততক্ষণ লোকে সাধনা করিতে গিয়াও সাধনায় অগ্রসর হইতে পারে না, ক্রমাগত সে নিজেকেই প্রকাশ করে, নিজেকেই পূজা করে।

সাধনা অর্থ আপনাকে বড় করা নহে, তাঁহাকে বড় করিয়া নিজে বিনীত

প্রণত হইয়া থাকা। এই সত্য না পাইলে যে বাক্য তাহা মিছা, তাহাতে কিছুই সিদ্ধ হয় না। এমন অবস্থায় পূজা করিতে গিয়া ভগবানকে না পাইয়া অগত্যা মানুষ আপনাকেই অথবা আত্ম-প্রবৃত্তিগুলিকেই পূজা করে। এই দুয়ের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ আর কোথায়?

পণ্ডিত তাঁর শাস্ত্রজ্ঞানের দম্ভে ভরপূর। অথচ যে সত্য মানব জন্মকে সার্থক করে তাহা বেদে বা কোরাণে নাই, তাহা অন্তরেই আছে। তাহা সবারই কাছে উন্মুক্ত। সেই সত্য যে পাইয়াছে ধর্ম্ম উপদেশ দিবার দম্ভও তার থাকে না, অথচ সে মৌনী হইয়াও দম্ভ প্রকাশ করে না, সে ভগবন্ময় হইয়া সহজভাবে জীবন যাপন করে।

এই অন্তরের সত্য যে না দেখিয়াছে বেদ কোরাণে তার কোনো উপকারই হয় না। যে এই সত্য পাইয়াছে সে-ই যথার্থ শাস্ত্রদ্বারা উপকৃত হইতে পারে। নয়ন যে লাভ করে নাই, প্রদীপ দিয়া সে কি করিবে? বাংলায় বাউলরাও বলেন—

“কাজলে আর করবে কত যদি নয়নে নজর না থাকে?
প্রেম যদি না মিল্লো ক্ষ্যাপা তবে ভজন পূজন কদিন রাখে?”

এই সত্য শূন্যময় নহে। প্রেমে রসে জীবন্ত উপলব্ধিতে এই সত্য ভরপূর। শাস্ত্রের ও পণ্ডিতের শূন্যবাদ মানবের চিত্তকে মরুভূমি করিয়া তুলিয়াছে; এই অন্তরসত্যের রসধারা তাহাকে জীবন্ত ও সুন্দর করিবে। প্রেমে ও প্রাণে পূর্ণ করিবে।

এই সত্য যে পাইয়াছে তার কাছে বাহিরের তীর্থ কিছুই নয়, তার অন্তরেই মক্কা অন্তরেই কাশী। কারণ সেখানেই সে অন্তর দেবতার দর্শন লাভ করিয়াছে।

এই সত্যের পথই সরল সহজ। কল্পনাতে ঝুঠা সত্যকে সৃষ্টি করিতে করিতে গিয়া শাস্ত্র দিন দিন কঠিন হইয়া সাধারণের অনধিগম্য হইয়া পড়িয়াছে। এই সত্য আকাশের মত সহজ, প্রাণের মত সহজ, আলোর মত সহজ, নহিলে জীবনই অসম্ভব হইত।

সকল মিথ্যা বিসর্জ্জন দিয়া এই সত্যকে লাভ করিতে হইবে। যতক্ষণ এই সত্য না দেখা যায় ততক্ষণ দৃষ্টিই লাভ হয় নাই। এই সত্য দেখিতেই

হইবে, পাইতেই হইবে। কারণ ইহাকে না পাইয়া যে এই মানবলোক হইতে চলিয়া যায় সে "প্রৈতি কৃপণঃ," সে কৃপার পাত্র হইয়া চলিয়া গেল। জীবন আজ যতই হীন হউক না কেন, এই সত্য পাইবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প করাই চাই।

জগতের সব কলহ সব ভেদ-বুদ্ধির অবসান এই সত্য হইতেই হইবে। যিনি এই সত্য লাভ করেন তিনি সব সম্প্রদায়ের ভেদ ও সীমার অতীত। যে দেশের যে ধর্ম্মের যে সাধকই এই অন্তরের সত্যকে লাভ করিয়াছেন তিনি সেই একই কথা বলিয়া গিয়াছেন। সেই সব সত্যদ্রষ্টাদেরই এক কথা, মাঝে হইতে যাঁরা সত্য পান নাই তাঁরাই নানা ভেদ নানা পন্থ নানা কলহ ও বাদ বিবাদের সৃষ্টি করিয়াছেন।

যে সাধু, যে সত্যপরায়ণ, সে অন্তরের এই আলোকের ভয়ে ভীত নহে। যারা অন্তরের সত্যের আলোককে ভয় করে তারা সাধু নহে। সূর্য্যের আলোকে সাধুর ভয় কি? যে চোর সে-ই শুধু আলোক এড়াইয়া কেবল খোঁজে অন্ধকার।

প্রণতিই সত্য ঃ

নিহ্চল করিলে বংদগী দাদূ সো পরৱান।
দাদূ সাচী বংদগী ঝূঠা সব অভিমান॥

"প্রণতি করিয়া লও নিশ্চল, হে দাদূ, তাহাই (জীবনের একমাত্র) প্রমাণ (সত্য); হে দাদূ, প্রণতিই সত্য আর যত অভিমান সবই ঝূঠা।"

অন্তরেই এই শাস্ত্র ঃ

পোথী অপনী প্যংড করি হরি জস মাহৈঁ লেখ।
পংডিত অপনা প্রাণ করি দাদূ কথহু অলেখ॥
কায়া হমারী কিতাব কহিয়ে লিখি রাখূঁ রহিমান।
মন হমারা মুল্লা কহিয়ে সুরতা হৈ সুবিহান॥

"আপন দেহকেই (হৃদয়কে) কর পুঁথি, শ্রীহরির মহিমা লেখ তাহার মধ্যে; আপন প্রাণকে কর সেই পুঁথির পাঠক পণ্ডিত; এমনভাবে, হে দাদূ, তুমি কহ অলেখ-বাণী।

আমার কায়াকে বলিতে পার (কিতাব কোরাণ, শাস্ত্র), দয়াময়ের নাম তাহাতে লিখা; মনই আমার মোল্লা, পবিত্র স্বরূপ পরমাত্মাই তাহার শ্রোতা।"

দেহই সত্য মন্দির।

কায়া মহলমেঁ নিমাজ গুজারূঁ তহাঁ ঔর ন আৱন পাৱৈ।
মন মনিকে তহঁ তসবী ফেরূঁ তব সাহিবকে মন ভাৱৈ॥
দিল দরিয়া মেঁ গুসল হমারা উজূ করি চিত লাউঁ।
সাহিব আগৈ করূঁ বংদগী বের বের বলি জাউঁ॥

"কায়া মন্দিরে (অন্তরের মধ্যে) পূরা করি আমার নেমাজ, সেখানে আর তো কেহ পারে না আসিতে, সেখানে মনের মানসের মণিকায় করি জপ, তবেই তো প্রভুর মন হয় প্রসন্ন।

হৃদয় নদীতেই আমার স্নান, সেখানেই চিত্তকে ধৌত করিয়া (তাঁর কাছে) আনি, স্বামীর কাছে আমি করি প্রণতি, বার বার তাঁর চরণে নিজেকে করি উৎসর্গ।"

নিত্য ভক্তি।

সোভা কারণ সব করৈ রোজা বাংগ নিমাজ।
কৌন পংথি হম চলৈং কহৌ ধূ সাহিব সেতীঁ কাজ॥
হর রোজ হজূরী হোই রহু কাহে করৈ কলাপ।
মুল্লা তহাঁ পুকারিয়ে অরস ইলাহী আপ॥
হর দম হাজির হোনা বাবা জব লগ জীৱৈ বংদা।
দাইম দিল সাঈঁ সৌঁ সাবিত পাঁচ বখত ক্যা ধংধা॥

"শোভনতার জন্যই সবাই রোজা করে, আজান দেয় ও নেমাজ করে; আমার প্রয়োজন হইল স্বামীর সঙ্গে, বল তো আমি যাই কোন পথে?

কেন বৃথা করিতেছ আক্ষেপ? প্রভুর সম্মুখে নিত্য নিরন্তর (সেবাব্রতে) থাক হাজির; যেখানে মন্দিরে আল্লা স্বয়ং স্বরূপে বিরাজমান, সেখানে, হে মুল্লা, শুনাও তোমার ডাক। যতদিন বান্দা তোমার প্রাণ আছে ততদিন তোমার

হরদম হাজির থাকিতেই হইবে বাবা! মাত্র পাঁচ বখতের (দিনে পাঁচ বারের) ধাংধা (চাকুরী) আবার কেমন কথা? স্বামীর সঙ্গে যোগ হইল অহর্নিশ নিরন্তর চিত্তমনের সমগ্র যোগ।"

মিথ্যা ছাড়িয়া সত্য মুসলমান হওয়া চাই :

গল কাটৈঁ কলমা ভরৈঁ অয়া বিচারা দীন।
পাঁচোঁ বখত নিবাঁজ গুজারৈঁ স্যাবতি নহীঁ অকীন॥
আপন কো মারৈঁ নহীঁ পর কোঁ মারন জাই।
দাদূ আপা মারে বিনা কৈসেঁ মিলৈ খুদাই॥
তন মন মারি রহে সাঁঈ সোঁ, তিনকো দেখি করৈঁ তাজির।
যে বড়ি বূঝ কহাঁ তৈঁ পাঈ ঐসী কজা অউলিয়া পীর॥

"এমন বেচারা ধার্ম্মিক যে জীবের গলা কাটিয়া কলমা (ধর্ম্মের অঙ্গীকার বাণী) করেন পূরা, পাঁচবার করিয়া নেমাজ চালান, অথচ সত্যে নাই আন্তরিক দৃঢ় নিষ্ঠা।"

আপনাকে না মারিয়া যান কিনা অপরকে মারিতে, হে দাদূ, নিজেকে না মারিলে কেমন করিয়া মিলিবেন খোদা? নিজের "তন মন" মারিয়া রহে স্বামীর সঙ্গে যুক্ত, তাঁহাকে দেখিয়া করে তাজির (তহজির = চিত্তসংযম), এমন মহৎ বূঝ পাইবে বা কোথায়? এই ভাবে যে আপনাকে মারিয়াছে সেই তো আওলিয়া, সেই তো পীর!"

কাফের বল কাকে?

সো কাফির জে বোলৈ কাফ।
দিল অপনী নহিঁ রাখৈ সাফ॥
সাঈঁ কো পহিচানৈঁ নাহীঁ।
কূড় কপট সব উনহীঁ মাহীঁ॥
সাঁঈ কা ফুরমান ন মানৈঁ।
কহাঁ পীর ঐসৈঁ করি জানৈঁ॥

মন আপনৈ মৈঁ সমঝত নাঁহীঁ।
নিরখত চলৈ আপনী ছাঁহীঁ॥
জোর করৈ মসকিন সতাৱৈ।
দিল উসকী মৈঁ দরদ ন আৱৈ॥
সাঁঈ সেতী নাঁহীঁ নেহ।
গরব করৈ অতি অপনী দেহ।
ইন বাতন ক্যোঁ পাৱৈ পীৱ।
পরধন উপরি রাখৈ জীৱ॥
জোর জুলম্ করি কুটঁব সুঁ খাঈ।
সো কাফির দোজগ মৈঁ জাঈ॥

"যে মিথ্যা ("কাফ" আরবী ও পারসী ভাষার একটি অক্ষর) বলে আর আপন হৃদয় নির্ম্মল না রাখে সেই তো কাফের। সেই তো কাফের যে স্বামীকে চেনে না, সব কূট কপট যার অন্তরের মধ্যে, স্বামীর আদেশ যে পালন না করে। "প্রিয়তর স্বামী আবার কোথায়?" এমন কথাই যে মনে করে, আপন মনের মধ্যে (তাঁর আদেশ) সমঝিয়া দেখে না, আপনার ছায়া দেখিয়াই আপনার আশ্রয়ে যে চলে, সেই তো কাফের। অন্যের উপর যে জুলুম করে, দীন দুঃখীকে যে নিপীড়িত করে ও এই পীড়া দিতে যার হৃদয়ে দয়াও হয় না, স্বামীর সঙ্গে যার নাই কোনো প্রেম, যে নিজের দেহ লইয়াই অতিমাত্র করে গরব, সেই তো কাফের। এই সব কথায় কেমন করিয়া পায় প্রিয়তমকে? (এই সব কাজ যে করে) পরধনের উপর জীবন যে রাখে ও জোর জুলুম করিয়া কুটুম্বসহ নিজেকে পোষণ যে করে সেই তো কাফের সেই তো নিরয়গামী।"

মিথ্যা দলাদলি ঃ

হিংদূ মারগ কহৈঁ হমারা তুরুক কহৈঁ রাহ মেরী।
কহাঁ পংথ হৈ কহো অলেখ* কা তুম তো ঐসী হেরী॥

---

* "অলহ" অর্থাৎ আল্লা পাঠও আছে।

দাদূ দূণ্যূঁ ভরম হৈ হিংদূ তুরুক গৱাঁর।
জে দুহুঁৱাঁ থৈঁ রহিত হৈঁ সো গহি তত্ত্ব বিচার॥
খংড খংড করি ব্রহ্মকৌঁ পখি পখি লিয়া বাঁটি।
দাদূ পূরণ ব্রহ্ম তজি বংধে ভরম কী গাঁঠি॥

"হিন্দু বলে আমার ধর্ম্মই (সত্যের) পথ, মুসলমান কহে আমার ধর্ম্মই রাস্তা; বল তো অলেখের পথ আছে কোথায়, তুমি তো এমনই দেখিয়াছ।

হে দাদূ, হিন্দু ও মুসলমান এই দুইই ভ্রান্ত, এই দুইই অজ্ঞান (গৱাঁর, গ্রাম্য, সঙ্কীর্ণবুদ্ধি); যে পন্থ, এই দুইএরই অতীত (রহিত) অর্থাৎ হিন্দু মুসলমান এই দুই ভেদ বুদ্ধি যেখানে নাই, সে-ই তত্ত্ববিচারই কর গ্রহণ।

ব্রহ্মকে খণ্ড খণ্ড করিয়া সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে লইল নিজ নিজ অংশ ভাগ করিয়া, হে দাদূ পূর্ণ ব্রহ্মকে ত্যাগ করিয়া সবাই ভ্রমের গাঁঠেই হইল বদ্ধ।"

দলাদলির অতীত সেবক :

য়ে সব হৈঁ কিসকে পংথমেঁ ধরতী অরু অসমান।
পানী পৱন দিন রাতকা চংদ সূর রহিমান॥
ব্রহ্মা বিশ্ন মহেস কা কৌন পংথ, গুরু দেৱ।
সাঁঈ সিরজনহার তূঁ কহিয়ে অলখ অভেৱ॥
মহম্মদ কিসকে দীনমেঁ জবরাঈল কিস রাহ।
ইন্‌হকে মুরসিদ পীর কো কহিয়ে এক অলাহ॥
য়ে সব কিসকে হ্ৱৈ রহে য়হু মেরে মন মাহিঁ।
অলখ ইলাহী জগতগুরু দূজা কৌঈ নাঁহিঁ॥

প্রশ্ন—

"ধরিত্রী, আকাশ প্রভৃতি যে সব সেবকেরা, ইহাঁরা আছেন কার দলে? জল, পবন, দিন, রাত্রি, চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি ইহাঁরা সব, হে পরম-দয়াল, কোন পংথ কোন দলের অন্তর্গত? ব্রহ্মা* বিষ্ণু মহেশের, হে গুরুদেব,

---

* দাদূর মতে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশও পরম দেবতা নহেন। ইহারা তপস্যা

কোন সম্প্রদায় ? তুমি স্বামী, সৃজনকর্ত্তা, তুমি অলখ, তুমি ভেদাতীত, তুমিই বল বুঝাইয়া।

মহম্মদ ছিলেন কাঁর ধর্ম্ম-অবলম্বী, (স্বর্গদূত) জিবরেইল (Gabriel) ছিলেন বা কোন সম্প্রদায়ে, এঁদের গুরুই বা কে, ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকই বা কে ? হে এক অদ্বিতীয় আল্লা, তুমিই ইহা বল বুঝাইয়া। এঁরা আবার ছিলেন কাঁর দলে সেই প্রশ্নই তো আবার মনের মধ্যে।”

উত্তর—

“অলখ, ঈশ্বর, জগতগুরু, তিনি ছাড়া দ্বিতীয় আর কেহই নাই।”

দলের অধীনতা অসহ্য ; আত্মার ক্ষেত্রে সবারই স্বাধীনতা থাকা চাই।

এখানে বৃথা অপরের দাস্য স্বীকার করিলে জীবন ব্যর্থ।

জো হম নহীঁ গুজারতে তুম্হকোঁ ক্যা ভাঈ।
সিরি নাহীঁ কুছ বংদগী কহু ক্যূঁ ফুরমাঈ॥
অপনে অমলোঁ ছূটিয়ে কাহূকে নাঁহীঁ।
সোঈ পীড় পুকারসী জা দূখৈ মাহীঁ।
অপনে সেতী কাজ হৈ ভাৱৈ তিধরি মৈঁ জাই।
মেরা থা সো মৈঁ লিয়া লোগোঁ কা ক্যা জাই॥

“আমি যদি পূজা নেমাজ না করি, তবে হে ভাই, তোমার তাতে কি ? মাথা যদি আপনি প্রণত না হয়, তবে বল, কেন তোমার কথায় করি প্রণাম ?”

আপন তাগিদেই (“অমল” অর্থ নেশাও হয়) ছুটিতে হইবে, অন্য কাহারও তাগিদে নয়। অন্তরের মধ্যে যে বেদনা দিতেছে ব্যথা সে-ই (আমার মধ্যে) করিবে চীৎকার।

যে দিকে আমার খুসী আমি যাইব, আমার সঙ্গেই আমার প্রয়োজন। যা আমার ছিল তা আমি নিলাম, লোকের তাহাতে কি আসে যায় ?”

দ্বারা যোগসম্পদ লাভ করিয়াছেন। পরমেশ্বর এই সব ঐশীশক্তিসম্পন্ন মহাযোগীদের সৃষ্টি পালন সংহারে নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন।

আমি দলের বাহিরে, ভ্রষ্ট পতিতদের সঙ্গে ঃ

আপনী আপনী জাতি সোঁ সব কো বৈসৈঁ পাঁতি।
দাদূ সেৱক রামকা তাকো নহীঁ ভরাঁতি ॥
জা কৌঁ মারণ জাইয়ে সোঈ ফিরি মারৈ।
জা কৌঁ তারন জাইয়ে সোঈ ফিরি তারৈ ॥

"আপন আপন জাতি লইয়াই সবারই বসে পংক্তি; দাদূ যে রামের সেবক, তার এমন ভেদভাব এমন ভ্রান্তি নাই।

যাহাকে তুমি মারিতে যাইতেছে সেই ফিরিয়া তোমাকে মারিবে, যাহাকে তুমি তারিতে যাইতেছে সেই আবার তোমাকে তারিবে (মুক্তি দিবে)।"

আপন বাণীর গর্ব ছাড়, তাঁর বাণী বল ঃ

দাদূ দ্বৈ দ্বৈ পদ কিয়ে সাখী ভী দ্বৈ চারি।
হম কৌঁ অনভৈ উপজী হম জ্ঞানী সংসারি ॥
সুনি সুনি পরচে জ্ঞানকে সাখী সবদী হোই।
তবহীঁ আপা উপজৈ হমসা ঔর ন কোই ॥
পদ জোড়ে কা পাইয়ে সাখী কহে কা হোই।
সত্ত সিরোমণি সাইঁয়াঁ তত্ত ন চীন্‌হা সোই ॥
রাম কহাতেঁ জোড়িবা রাম কহাতেঁ সাখী।
রাম কহাতেঁ গাইবা রাম কহাতেঁ রাখী ॥

"হে দাদূ, গোটা দুই "পদ" করিলাম রচনা, দুই চারটি "সাখী" (যে শ্লোকে কোনো সত্যের সাক্ষ্য দেওয়া হয়) করিলাম রচনা, আর আমার অনুভব জন্মিল যে সংসারের মাঝে আমি জ্ঞানী।

জ্ঞানের পর্চা (পরিচয়, লেখ) শুনিতে শুনিতে হয়তো "সাখী" ও শব্দ কিছু অভ্যস্ত হইয়া গেল, তখনই অহঙ্কার জন্মিল যে আমার সমান বড় আর কেহ নাই।

"পদ" জুড়িয়াই বা কি লাভ, "সাখী" কহিয়াই বা হয় কি, সত্য শিরোমণি যে স্বামী সেই তত্ত্বই যদি না গেল চেনা ?

রাম (অন্তরের মধ্যে) যাহা বলেন তাহাতেই যথার্থ পদ রচনা, রাম যাহা বলেন তাহাতেই যথার্থ "সাখী" বলা, রাম যাহা বলেন তাহাতেই গান করা, রামের কথাতেই চাই সব রাখা।"

কথায় দায়িত্ব; সাধন চাই:

কহিবে সুনিবে মন খুসী করিবা ঔরৈ খেল।
বাতৌঁ তিমির ন ভাজঈ দীৱা বাতী তেল ॥
করিবে ৱালে হম নহীঁ কহিবে কো হম সূর।
তাতৈঁ বচন নিকট হৈ সত্ত হম থৈঁ দূর ॥
কহে কহে কা হোত হৈ কহে ন সীঝৈ কাম।
কহে কহে কা পাইয়ে জব রিদৈ ন আৱৈ রাম ॥

"কহিয়া শুনিয়া মনই হয় খুসী, করাটা যে সম্পূর্ণই আর এক রকম খেলা; কথায় তো যায় না অন্ধকার, বাতী তেলেই জ্বলে দীপ (চাই সত্য দীপ বাতী তেল)।

কাজে করিবার লোক তো আমি নই, কথারই আমি বীর (পণ্ডিত); তাই বচনই আমার সমীপে বিদ্যমান, সত্য আমা হইতে দূরে।

কহিয়া কহিয়া কি হয়? কথায় তো সিদ্ধ হয় না কাজ! হৃদয়ে রামই যদি না আসিলেন তখন কথা কহিয়া আর কি হইল ফল?"

নামেই ভক্ত, কাজে নয়:

সেৱক নাৱ বোলাইয়ে সেৱা সুপিনৈ নাঁহিঁ।
নাৱঁ ধরায়ে কা ভয়া এক নহীঁ মন মাহিঁ ॥
নাৱঁ ধরাৱৈঁ দাস কা দাসাতন থৈঁ দূরি।
দাদূ কারিজ ক্যোঁ সরৈ হরি সোঁ নহীঁ হজূরি ॥
ভগত ন হোই ভগতি বিন দাসাতন বিন দাস।
বিন সেৱা সেৱক নহীঁ দাদূ ঝূঠী আস ॥
রাম ভগতি ভাৱৈ নহীঁ অপনী ভগতি কা ভাৱ।
রাম ভগতি মুখ সোঁ কহৈ খেলৈ আপনা দাৱ ॥

দাদূ রাম বিসারি করি কীয়ে বহুত অপরাধ।
লাজৌঁ মরিগেঁ সংত সব নাৱঁ হমারা সাধ॥

"সেবক নামের পরিচয়ে কি হয়, স্বপ্নেও যে নাই সেবা! সেই "এক"ই যদি মনের মধ্যে না রহিল তবে (শুধু "সেবক") নাম ধরাইয়া কি লাভ?

নাম ধারণ করে দাসের অথচ সেবা ধর্ম্ম হইতে রহে দূরে! যদি হরির নিকট (নিত্য সেবাতে) না থাকে হাজির, তবে কাজ সিদ্ধ হয় কেমন করিয়া?

ওরে দাদু মিথ্যা সেই আশা, বিনা ভক্তিতে তো হয় না ভক্ত। পরিচর্য্যা-ধর্ম্ম ছাড়া হয় না দাস, সেবা বিনাও হয় না সেবক।

রাম ভক্তি তো প্রিয় নয়, প্রিয় হইল আত্ম-ভক্তি! কেবল মুখেই বলে রামভক্তি কিন্তু খেলে শুধু আপন দাঁও বুঝিয়া!

ভগবানকে বিস্মৃত হইয়া, হে দাদূ, বহুত করিয়াছ অপরাধ। সাধু জনেরা (শুনিয়া) লজ্জায় যাইবেন মরিয়া যে আমার নাম আবার সাধু!"

ব্যর্থ বাক্যই মিছা ঃ

মনসা কে পকৱান সৌঁ ক্যৌঁ পেট ভরাৱৈ।
জ্যোঁ কহিয়ে ত্যৌঁ কীজিয়ে তবহীঁ বনি আৱৈ॥
বাতৌঁ হীঁ পহুঁচৈ নহীঁ ঘর দূরি পয়ানা।
মারগ পংথী উঠি চলৈ দাদূ সোঈ সয়ানা॥
সে দারূ কিস কামকী জাতৈঁ দরদ ন জাই।
দাদূ কাটৈ রোগ কো সো দারূ লে লাই॥

"মনের (কল্পনার) পক্বান্নে পেট ভরিবে কেন? যেমন মুখে বল তেমন কাজে কর সম্পন্ন, তবেই উদ্দেশ্য হইবে সফল।

শুধু কথাতেইসেখানে পৌঁছিবে না? ঘর যে দূর-পয়ান (দীর্ঘযাত্রার গম্য! হে দাদু, উঠিয়া পথে যে করিয়াছে যাত্রা, যে যাত্রী, সে-ই তো সুবুদ্ধিমান।

যাতে ব্যথাই দূর হয় না সেই ঔষধ কোন কাজের? হে দাদু, রোগকে দূর করিতে পারে যে ঔষধ, তাহাই এস লইয়া।"

ব্যর্থ পাণ্ডিত্য মিছা ঃ

সূনা ঘট সোধী নহীঁ পংডিত ব্রহ্মা পূত।
আগম নিগম সব কথৈঁ ঘর মৈঁ নাচৈঁ ভূত॥
পঢ়ে ন পারৈ পরমগতি পঢ়ে ন লংঘৈ পার।
পঢ়ে ন পহুঁচৈ প্রাণিয়া দাদূ পীড় পুকার॥
দাদূ নিররে নাঁর বিন ঝূঠা কথৈঁ গিয়ান।
বৈঠে সির খালী করৈঁ পংডিত বেদ পুরান॥
সব হম দেখ্যা সোধি করি বেদ কুরানোঁ মাহিঁ।
জহাঁ নিরংজন পাইয়ে দেস দূরি ইত নাহিঁ॥
পঢ়ি পঢ়ি থাকে পংডিতা কিন্হূঁ ন পায়া পার।
মসি কাগদ কে আসিরে ক্যোঁ ছূটৈ সংসার॥
কাগদ কালে করি মুয়ে কেতে বেদ কুরান।
একই অখির প্রেমকা দাদূ পঢ়ৈ সুজান॥
মৌন গহৈঁ তে বাররে বোলৈঁ খরে অয়ান।
সহজৈঁ রাতে রাম সৌঁ দাদূ সোঈ সয়ান॥

"ব্রহ্মার পূত (ব্রাহ্মণ) পণ্ডিত হইলেই বা হইবে কি ? তাহারা ঘট (দেহ মন্দির) নাকি শূন্য (দেবতা বিহীন) ! (ব্রাহ্মণ) একবার (অন্তরে) খোঁজ করিয়াও দেখিল না ! আগম নিগমের কথা আগাগোড়া সব আওড়ায় অথচ তার ঘরে চলিয়াছে ভূতের নাচন !

(শাস্ত্র) পড়িয়া মেলে না পরমাগতি, (শাস্ত্র) পড়িয়া যায় না পারে উত্তীর্ণ হওয়া, (শাস্ত্র পড়িয়া) প্রাণীরা পৌছায় না (গন্তব্যস্থলে), ওরে দাদূ, অন্তরের বেদনায় (তাঁকে) ডাক্।

হে দাদূ, নাম-বিনা যে জ্ঞান তাহা ব্যর্থ, ঝুঠাই মরে সকলে জ্ঞান ব্যাখ্যা করিয়া ! পণ্ডিত যে বেদ পুরাণ বলেন, সে শুধু বসিয়া বসিয়া মাথার বোঝা নামাইয়া খালি করা !

সব আমি দেখিলাম খোঁজ করিয়া, বেদ কোরাণের মাঝেও করিলাম

খোঁজ, যেখানে নিরঞ্জনকে পাওয়া যায় সেই দেশ এখান হইতে দূরে নহে (অর্থাৎ তাহা অন্তরের মধ্যেই আছে)।

পড়িয়া পড়িয়া হয়রান হইল পণ্ডিত, কেহই তো পাইল না পার! মসী ও কাগজের ভরসায় কেন বৃথা ছুটিয়া চলিয়াছে সংসার?

কত বেদ কত কোরাণ মরিয়াছে শুধু কাগজ কালা করিয়া; হে দাদূ, যে জন প্রেমের একটি অক্ষরও পড়িয়াছে, সেই তো রসিক সুজান (সু-বুদ্ধি)।

যে মৌন গ্রহণ করে সে পাগল, যে বহুত বলে সে আরও অজ্ঞান; যে ভগবানের (রামের) সঙ্গে সহজে প্রেমে যুক্ত হইয়া থাকে, হে দাদূ, সেই হইল যথার্থ জ্ঞানী।"

মিথ্যা চলিবে না:

দাদূ কথনী ঔর কুছ করণী করৈঁ কুছ ঔর।
তিন তৈঁ মেরা জিব্ ডরৈ জিনকৈ ঠীক ন ঠৌর॥
অংতরগতি ঔরৈ কছু মুখ রসনা কুছ ঔর।
দাদূ করণী ঔর কুছ তিনকৌঁ নাহীঁ ঠৌর॥
রাম মিলন কী কহত হৈঁ করতে কছু ঔরে।
ঐসে পীব্ ক্যোঁ পাইয়ে সমুঝি লেহু মন বৌরে॥

"হে দাদূ যাঁরা বলিতে বলেন এক রকম আর করিতে করেন সম্পূর্ণ আর এক রকম, যাঁদের না আছে ঠিক না আছে ঠিকানা, আমার অন্তর তাঁদের কথায় পায় ভয়।

যাঁহাদের অন্তরের ভাব হইল এক রকম, অথচ মুখ রসনা বলে একেবারে আর এক রকম, আবার কাজ সম্পূর্ণ আর এক রকম, তাঁহাদের নাই কোথাও সত্যপ্রতিষ্ঠা।

মুখে বলেন রামের সঙ্গে মিলনের কথা অথচ কাজ করেন সম্পূর্ণ অন্য রকমের, এমন করিয়া কি পায় প্রিয়তমকে? ওরে পাগল মন, এই কথাটাই দেখ বুঝিয়া।"

শাস্ত্রাদি ব্যবহার করিতেও আত্মদৃষ্টি চাই:

অংধে কৌঁ দীপক দিয়া তৌভি তিমির ন জাই।
সোধী নহীঁ অংতর কো তা সনি কা সমঝাই॥
কহিয়ে কুছ উপগার কৌঁ মানৈঁ অৱগুণ দোখ।
অংধে কূপ বতাইয়া সত্ত ন মানৈঁ লোক॥
কংকর পত্থর সেৱিয়া অপনা মূল গঁৱাই।
অলখ দেব অংতরি বসৈ ক্যা দূজী জগহ জাই॥
পত্থর পীৱৈঁ ধোই করি পত্থর পূজৈঁ প্রাণ।
অংতর সৌ পত্থর ভয়ে বহু বূড়ে য়েহি জ্ঞান॥
কংকর বাঁধী গাঁঠড়ী হীরে কে বেসাস।
অংতকাল হরি জৌহরী দাদূ যা জনম নাস॥

"অন্ধের হাতে দিলাম প্রদীপ, তবু তো গেল না অন্ধকার। অন্তর কে যে করিয়া দেখিল না অন্বেষণ, বলনা তাহাকে কি আর সমঝাইব?"

উপকারের জন্যও যদি (তাহাকে) কিছু বল তবে মনে করে খোঁটা, মনে করে দোষ। অন্ধ লোককে যদি (পথে) কূপের কথা বল তবে কখনও সে মনে করিবে না সত্য।

আপন মূল খোয়াইয়া কাঁকর পাথরের করে কিনা সেবা (করে কিনা পূজা)! অলখ দেবতা যখন বাস করেন অন্তরে, তখন কেন বাহিরের জগতে বৃথা যাওয়া?

পাথর ধুইয়া ধুইয়া করে পান, পাথরের পূজা করে প্রাণ! তাইতো অন্তর হইতে হইয়া গেল পাথর, কত লোক এমন জ্ঞানেই মরিল ডুবিয়া!

হীরা মনে করিয়া গাঁঠে বাঁধিলে কাঁকর! অন্তকালে রত্নের জহরি শ্রীহরি (যখন পরখ করিবেন তখন দেখিবে) এই জনমই হইয়াছে নাশ!

কেউ পূজে পাথর কেউ পূজে শূন্য!

দাদূ পৈঁডে উজাড়কে কদে ন দীজৈ পাঁৱ।
জিহিঁ পৈঁডৈঁ মেরা পীর মিলৈ তিহিঁ পৈঁডৈ কা চাৱ॥

কুছ নাহীকা নাঁর ক্যা জে ধরিয়ে সো ঝূঠ।
সুর নর মুনি জন বংধিয়া লোকা আৱট কূট ॥
কুছ নাহীঁ কা নাঁৱ ধরি ভরম্যা সব সংসার।
সাচ ঝূঠ সমঝৈ নহীঁ না কুছ কিয়া বিচার ॥

"হে দাদূ, শূন্যতার মরুভূমির দিকে দিয়া যায় যে পথ তাতে কখনও দিও না পা, যে পথে প্রিয়তম মেলেন সেই পথেরই কর আকাঙ্ক্ষা।

"কিছু নাই" বস্তুর আবার নাম কি? তাহা ধরিতে গেলে যাহাই ধরিবে তাহাই হইবে ঝুটা। অথচ সুর নর মুনিজন তাহাতেই আছেন বদ্ধ হইয়া, লোক ভরিয়া চলিয়াছে আবর্ত্তের মিথ্যা দুঃখ।

"কিছু নার" (শূন্যের) নাম ধরিয়াই সমস্ত সংসার মরিল ভ্রমিয়া! না সমঝিল কিছু সত্য মিথ্যা, আর না করিল কোনো বিচার!" *

অন্তরেই তাঁর বাস ঃ

কেঈ দৌড়ে দ্বারিকা কেঈ কাসী জাঁহি।
কেঈ মথুরা কোঁ চলে সাহিব ঘটহী মাঁহি ॥
পূজনহারে পাসি হৈঁ দেহী মাঁহৈঁ দেৱ।
দাদূ তা কোঁ ছাড়ি করি বাহরি মাঁড়ী সেৱ ॥
উপরি আলম সব কহৈঁ সাধুজন ঘট মাঁহিঁ।
দাদূ এতা অংতরা তাথেঁ বনতী নাঁহিঁ ॥

"কেহ দৌড়ায় দ্বারকায়, কেহ যায় কাশীতে, কেহ চলে মথুরাতে অথচ স্বামী রহিলেন এই ঘটেরই মধ্যে!

পূজনকর্ত্তার কাছেই পূজ্য তিনি বিরাজমান, দেহের মধ্যেই দেবতা বর্ত্তমান, তাঁহাকে ছাড়িয়া, হে দাদূ, সবাই লাগিল কিনা বাহিরের করিতে পূজা!

সবাই বলেন "তিনি জগতের উপরে বাহ্যরূপে", সাধুজন বলেন "তিনি ঘটের মধ্যে"; ওরে দাদূ, তাঁহা হইতে এতখানি ব্যবধান কখনও রাখা কি চলে?"

---

* উপক্রমণিকা ১৮০, ১৮১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সত্যই সরল ঃ

আমি মূর্খ, সরল সত্য পথই বুঝিতে পারি। পাণ্ডিত্যের কৃত্রিম জটিল পথ বুঝিবার শক্তি আমার নাই।

সূধা মারগ সাচকা সাচা হোই সো জাই।
ঝূঠা কোঈ না চলৈ দাদূ দিয়া দিখাই ॥
সাহিব সোঁ সাচা নহীঁ যহু মন ঝূঠা হোই।
দাদূ ঝূঠে বহুত হৈঁ সাচা বিরলা কোই ॥
সাচা সাহিব সেৱিয়ে সাচী সেৱা হোই।
সাচা দরসন পাইয়ে সাচা সেৱগ সোই ॥

"সত্যের পথ সিধা, সত্য যে হয় সে-ই (সে পথে) যায়, কোনো ঝুটাই (মিথ্যা) সে পথে চলে না, হে দাদূ, ইহা তিনিই দিয়াছেন দেখাইয়া।

স্বামীর সঙ্গে যদি সাচ্চা না হয় তবেই তো মন যায় ঝুঠা হইয়া ; হে দাদূ, (এ জগতে) ঝুঠাই বিস্তর, সাচ্চাই ক্বচিৎ কখনও মেলে।

সাচ্চা স্বামীকে কর সেবা, তবেই সাচ্চা হইবে সেবা, সে-ই সাচ্চা সেবক যে পাইয়াছে সাচ্চার (সত্যের) দরশন (বা সাচ্চা দরশন)।"

সত্যকেই গ্রহণ করিতেই হইবে ঃ

একনিষ্ঠ হইয়া সত্যকে গ্রহণ করা ছাড়া আর অন্য পথ নাই। মিথ্যার মধ্যে স্থির আশ্রয় কোথায় ?

দাদূ ঝূঠা বদলিয়ে সাচ ন বদল্যা জাই।
সাচা সির পর রাখিয়ে সাধ কহৈ সমঝাই ॥
সাচ ন সূঝৈ জব লগৈঁ তব লগ লোচন নাহিঁ।
দাদূ নিহবঁধ ছাড়ি করি বঁধ্যা হোই পথ মাহিঁ ॥
কবীর বিচারা কহি গয়া বহুত ভাঁতি সমঝাই।
দাদূ দুনিয়া বাৱরী তাকে সংগি ন জাই ॥
পারহিঁগে উস ঠৌর কো লংঘৈঁগে য়হু ঘাট।
দাদূ ক্যা কহি বোলিয়ে অজহূঁ বিচহি বাট ॥

“হে দাদূ, ঝুঠাকেই লও বদলাইয়া, সাচ্চাকে তো বদলান চলে না ; সত্যকে রাখ মাথার উপরে, এই কথাই সাধুরা বলেন বুঝাইয়া।

সত্যের যতক্ষণ না মেলে সাক্ষাৎকার ততক্ষণ লোচনই নাই ; (এমন অবস্থায় মানুষ) সকল-বন্ধন-মোচনকে (ভগবানকে) ছাড়িয়া সম্প্রদায় বন্ধনের মধ্যে পড়ে বাঁধা।

কবীর বেচারা বহু বহু রকমে (এই কথাটা) বলিয়া গেলেন বুঝাইয়া ; কিন্তু দুনিয়া এমন পাগল যে কিছুতেই যাইবে না তাঁর সঙ্গে (তাঁর কথায় কান দিবে না)।

“সেই প্রতিষ্ঠাকে পাইতেই হইবে। দুরতিক্রম্য এই ব্যবধান পার হইবই হইব। ওরে দাদূ, কি বলিয়া বলিস্ এই কথা? আজও যে তুই পড়িয়া আছিস্ পথেরই মাঝে !”

ভগবানের সেবকের সম্প্রদায় নাই।

দাদূ সব থে এককে সো এক ন জানা।
জনে জনে কা হ্ৱৈ গয়া য়হু জগত দিৱানা॥
সোই জন সাধু সিদ্ধ সো সোই সতবাদী সূর।
সোই মুনিয়র দাদূ বড়ে সনমুখ রহণি হজূর॥
সোই জোগী সোই জংগমাঁ সোই সোফী সোই সেখ।
সোই সংন্যাসী সেৱড়ে দাদূ এক অলেখ।
সোঈ কাজী সোঈ মুল্লাঁ সোঈ মোমিন মুস্লমান।
সোঈ সয়ানে সব ভলে জে রাতে রহিমান॥

“হে দাদূ, সবাই তো ছিলেন সেই একেরই (জন) ; সেই এককেই জানা হইল না বলিয়া এই পাগল জগৎটা নানা জনের নানা সম্প্রদায়ে হইয়া গেল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন।

সে-ই জনই সাধু, সে-ই সিদ্ধ, সে-ই সত্যবাদী, সে-ই শূর, হে দাদূ, সে-ই শ্রেষ্ঠ মুনিবর যে প্রভুর সমক্ষে থাকে নিত্য হাজির।

সে-ই তো যোগী, সেই তো জঙ্গম,* সে-ই তো সূফী, সে-ই তো শেখ, সেই তো সন্ন্যাসী সে-ই তো সেরড়া †, সদাই প্রভুর কাছে যে রহে হাজির, হে দাদূ, এক অলেখ (যার প্রভু)।

সে-ই কাজী, সে-ই মুল্লা, সে-ই মোমিন, ‡ সে-ই মুসলমান, সে-ই তো সুবুদ্ধিমান, সে-ই তো সব রকমে ভাল যে দয়াময়ের সঙ্গে প্রেমে রহে অনুরক্ত।”

সাধকের এক সত্য সাক্ষ্য :

সাচা রাতা সাচসোঁ ঝুঠা রাতা ঝূঠ।
দাদূ ন্যার নবেরিয়ে সব সাধোঁকোঁ পূছ॥
জে পহুঁচে তে কহিগয়ে তিনকী একৈ বাত।
সবৈ সয়ানে একমত উনকী একৈ জাত॥
জে পহুঁচে তে পূছিয়ে তিনকী একৈ বাত।
সব সাধোঁকা একমত বিচকে বারহ বাট॥
সবৈ সয়ানে কহি গয়ে পহুঁচে কা ঘর এক।
দাদূ মারগ মাঁহিলে তিনকী বাত অনেক॥
সূরিজ সাখীভূত হৈ সাচ করৈ পরকাস।
চোর ন ভাবৈ চাঁদিণাঁ জিনি কভী হোই উজাস॥

---

* এক শ্রেণীর শৈব যাঁহারা শিবলিঙ্গ গলায় ঝুলাইয়া চলেন।

† জৈন ধর্ম্মের এক শ্রেণী সাধু। ভেখধারী সাধু ও শৈব এক শ্রেণীর সাধুকেও সেব্রড়া বলে।

‡ কোরাণে “মোমিন” অর্থ বিশ্বাসী। যে নিয়ম পালন করে সে মুসলমান আর বিশ্বাসের উপর যাহার আচার প্রতিষ্ঠিত সে “মোমিন”। বোম্বাই প্রদেশে কচ্ছভুজে এক শ্রেণীর মুসলমান আছেন তাঁহারা মেমনা বা মোমিন। তাঁহারা বিশ্বাসে মুসলমান হইলেও আচারে অনুষ্ঠানে হিন্দুদেরই মত। হিন্দুদের পর্ব্ব উৎসবাদি তাঁহারা পালন করেন। ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ হিন্দুই ছিলেন।

"হে দাদূ, ঝুঠাকেই লও বদলাইয়া, সাচ্চাকে তো বদলান চলে না; সত্যকে রাখ মাথার উপরে, এই কথাই সাধুরা বলেন বুঝাইয়া।

সত্যের যতক্ষণ না মেলে সাক্ষাৎকার ততক্ষণ লোচনই নাই; (এমন অবস্থায় মানুষ) সকল-বন্ধন-মোচনকে (ভগবানকে) ছাড়িয়া সম্প্রদায় বন্ধনের মধ্যে পড়ে বাঁধা।

কবীর বেচারা বহু বহু রকমে (এই কথাটা) বলিয়া গেলেন বুঝাইয়া; কিন্তু দুনিয়া এমন পাগল যে কিছুতেই যাইবে না তাঁর সঙ্গে (তাঁর কথায় কান দিবে না)।

"সেই প্রতিষ্ঠাকে পাইতেই হইবে। দুরতিক্রম্য এই ব্যবধান পার হইবই হইব। ওরে দাদূ, কি বলিয়া বলিস্ এই কথা? আজও যে তুই পড়িয়া আছিস্ পথেরই মাঝে!"

ভগবানের সেবকের সম্প্রদায় নাই।

দাদূ সব থে এককে সো এক ন জানা।
জনে জনে কা হ্ৱৈ গয়া য়হু জগত দিৱানা॥
সোই জন সাধূ সিদ্ধ সো সোই স্তবাদী সূর।
সোই মুনিয়র দাদূ বড়ে সনমুখ রহণি হজূর॥
সোই জোগী সোই জংগমাঁ সোই সোফী সোই সেখ।
সোই সংন্যাসী সেৱড়ে দাদূ এক অলেখ।
সোঈ কাজী সোঈ মুল্লাঁ সোঈ মোমিন মুস্লমান।
সোঈ সয়ানে সব ভলে জে রাতে রহিমান॥

"হে দাদূ, সবাই তো ছিলেন সেই একেরই (জন); সেই এককেই জানা হইল না বলিয়া এই পাগল জগৎটা নানা জনের নানা সম্প্রদায়ে হইয়া গেল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন।

সে-ই জনই সাধু, সে-ই সিদ্ধ, সে-ই সত্যবাদী, সে-ই শূর, হে দাদূ, সে-ই শ্রেষ্ঠ মুনিবর যে প্রভুর সমক্ষে থাকে নিত্য হাজির।

সে-ই তো যোগী, সেই তো জঙ্গম,* সে-ই তো সূফী, সে-ই তো শেখ, সেই তো সন্ন্যাসী সে-ই তো সেব্রড়া †, সদাই প্রভুর কাছে যে রহে হাজির, হে দাদূ, এক অলেখ (যার প্রভু)।

সে-ই কাজী, সে-ই মুল্লা, সে-ই মোমিন, ‡ সে-ই মুসলমান, সে-ই তো সুবুদ্ধিমান, সে-ই তো সব রকমে ভাল যে দয়াময়ের সঙ্গে প্রেমে রহে অনুরক্ত।”

সাধকের এক সত্য সাক্ষ্য ঃ

সাচা রাতা সাচসোঁ ঝুঠা রাতা ঝূঠ।
দাদূ ন্যার নবেরিয়ে সব সাধোঁকোঁ পূছ ॥
জে পহুঁচে তে কহিগয়ে তিনকী একৈ বাত।
সবৈ সয়ানে একমত উনকী একৈ জাত ॥
জে পহুঁচে তে পূছিয়ে তিনকী একৈ বাত।
সব সাধোঁকা একমত বিচকে বারহ বাট ॥
সবৈ সয়ানে কহি গয়ে পহুঁচে কা ঘর এক।
দাদূ মারগ মাঁহিলে তিনকী বাত অনেক ॥
সূরিজ সাখীভূত হৈ সাচ করৈ পরকাস।
চোর ন ভাবৈ চাঁদিণাঁ জিনি কভী হোই উজাস ॥

---

* এক শ্রেণীর শৈব যাঁহারা শিবলিঙ্গ গলায় ঝুলাইয়া চলেন।

† জৈন ধর্ম্মের এক শ্রেণী সাধু। ভেখধারী সাধু ও শৈব এক শ্রেণীর সাধুকেও সেব্রড়া বলে।

‡ কোরাণে “মোমিন” অর্থ বিশ্বাসী। যে নিয়ম পালন করে সে মুসলমান আর বিশ্বাসের উপর যাহার আচার প্রতিষ্ঠিত সে “মোমিন”। বোম্বাই প্রদেশে কচ্ছভুজে এক শ্রেণীর মুসলমান আছেন তাঁহারা মেমনা বা মোমিন। তাঁহারা বিশ্বাসে মুসলমান হইলেও আচারে অনুষ্ঠানে হিন্দুদেরই মত। হিন্দুদের পর্ব্ব উৎসবাদি তাঁহারা পালন করেন। ইহাদের পূর্ব্বপুরুষ হিন্দুই ছিলেন।

"সব সাধুকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ, (তাঁহারা বলিবেন) যে সাচ্চা সে সাচ্চার প্রেমেই অনুরক্ত, যে ঝূঠা সে ঝূঠাতেই অনুরক্ত। হে দাদূ, যাহা যুক্তিযুক্ত ও সত্য, তাহাকে পূর্ণ করিয়া কর স্বীকার।

যাহাঁরা (সেই সত্যে) পৌঁছিয়াছেন তাঁহারা সবাই নিজ নিজ সাক্ষ্য গিয়াছেন বলিয়া, তাঁহাদের সকলেরই এক কথা, সব জ্ঞানীরাই একমত, তাঁহাদের সবারই একই জাত।

যাঁহারাই (সেই সত্যে) পৌঁছিয়াছেন, তাহাঁদিগকে কর জিজ্ঞাসা, তাহাঁদের সবারই একই কথা। সব সাধুরই এক মত, মাঝখানেই (মাঝারীদের) বার রকমের পথ।

মর্ম্মজ্ঞ জ্ঞানীরা সকলেই এই কথা বলিয়া গিয়াছেন যে যাঁহারা সেখানে পৌঁছিয়াছেন তাঁহাদের সবারই ঘর এক। হে দাদূ, যাঁহারা এখনো পথের মাঝেই আছেন পড়িয়া, (সত্যের পরিচয় যাঁহাদের ঘটে নাই) তাঁহাদেরই কথা অনেক রকমের।

সূর্য্য আছে সাক্ষীস্বরূপ, সে সত্যকেই প্রকাশ করে। যে চোর, সে চন্দ্রের চাঁদনী আলোও পছন্দ কয়ে না, সে চায় যেন কখনই না হয় আলোকের প্রকাশ।

তৃতীয় প্রকরণ—তত্ত্ব

তৃতীয় অঙ্গ–বিচার অঙ্গ

তত্ত্ব অর্থ বিচার-সিদ্ধ সত্য। কাজেই "বিচার" জানা সাধনার্থীর একান্ত প্রয়োজন।

ব্রহ্ম বিরাজমান সকল জীবে, এবং সকল জীবের মধ্য দিয়াই ব্রহ্মের উপলব্ধি। ব্রহ্ম অসীম। প্রেমময় তিনি যদি স্বয়ং নিজেকে উপলব্ধি করিতে চাহেন তবে তাঁহাকেও তাঁহার প্রেমের মানুষের মধ্য দিয়াই আপনাকে উপলব্ধি করিতে হইবে। মানবের মধ্য দিয়াই তিনি নিজস্বরূপ ও নিজপ্রেমানন্দ রসের উপলব্ধি করেন। ইহাই মানবের মাহাত্ম্য। বাংলা দেশের সাধকরাও এই তত্ত্বটি জানিতেন।

বিশ্ব সংসার ভগবানের একলার সৃষ্টি নয়। সৃষ্টিতে যেমন ছিল তাঁর শক্তি প্রেমও ছিল তেমনি। নহিলে এই জগৎ এত সুন্দর মধুর ও করুণ হইত না। এই সৃষ্টি প্রেমের সৃষ্টি। মানব না থাকিলে তাঁহার প্রেম শূন্য নিরাধার হইত। প্রেম করিতে হইলে সর্ব্বশক্তিমানেরও প্রেমের পাত্র থাকা চাই। মানব হইল ব্রহ্মের প্রেম সাধনার উত্তর সাধক, তাঁর প্রেমরসদানের পাত্র।

চিত্রকরের মত তিনি বিশ্ব জগৎ চিত্র করিয়াছেন। তিনি সর্ব্বশক্তিমান, সব বর্ণক তাঁর কাছে আছে। কিন্তু সর্বশক্তিমানের বর্ণকও—শুষ্ক বর্ণক। বিনা প্রেমজলে তিনি এই বর্ণক গুলিবেন কেমন করিয়া? মানবের প্রতি তাঁর যে প্রেমরস তাহাতেই তিনি তাঁর শুষ্ক সৃষ্টিবর্ণক গুলিয়া লইয়াছেন। তাই সৃষ্টি বড় মধুর কিন্তু বড় করুণ। হইতে পারেন ব্রহ্ম সর্বশক্তিমান তবু এই সৃষ্টিতে মানবেরও কিছু হাত আছে।

মানবের চারিদিকে সীমা, ব্রহ্ম অসীম। অসীমের কাছে সীমা প্রণত, কিন্তু অসীমও সীমার কাছে প্রণত না হইয়া পারেন না; সীমা ছাড়া অসীম আপনাকে প্রকাশই করিতে পারেন না। আবার অসীম না থাকিলেও সীমার কোনো অর্থ কোনো মাহাত্ম্য নাই। ফুল বিনা গন্ধ আপনাকে প্রকাশ করিবে কিসের

মধ্য দিয়া ? আবার গন্ধ বিনাই বা ফুলের কি অর্থ ! সত্য চাহে প্রকাশের মধ্য দিয়া আপনাকে উপলব্ধি করাইতে,আবার সত্য বিনা প্রকাশও মিথ্যা। ভাবের অসীমতা না থাকিলে রূপ হইল বদ্ধ কারাগার। ভাবও আপনাকে প্রকাশ করিতে অসমর্থ যদি না থাকে রূপ। কাজেই সীমা ও অসীম পরস্পরের মধ্যে একে অন্যকে করে পূজা।*

কবীর বলিয়াছেন, “মানব তোমার দ্বারে করজোড়ে দণ্ডায়মান; আবার হে অসীম, অগাধ, অবর্ণনীয়, তোমাকেও দেখিলাম মানবের দ্বারে, মানব-জীবন-মন্দিরের দ্বারে. যুগযুগান্ত করজোড়ে দণ্ডায়মান! এ এক আশ্চর্য্য অপরূপ রহস্য।” †

মানবের সহিত ভগবানের প্রেমের যোগ। এই মানব দেহ তাঁর আপন হাতের রচিত মন্দির। এই মন্দিরে তিনি বাস করেন। অসীম হইয়াও তিনি মানবের হৃদয়-বিহারী। তাই ক্ষুদ্র মানব এই সসীম সংসারে থাকিয়াও সংসারে নাই, সে আছে অসীম রসস্বরূপেরই সঙ্গে—প্রেমের যোগে। কুমুদ যেমন জলে থাকিয়াও জলে নাই, সে আছে চন্দ্রেরই সঙ্গে ; সেই প্রেমেই তার হৃদয় যায় খুলিয়া। মন যেখানে, প্রেম যেখানে, সেখানেই যোগ ; দেহের সান্নিধ্যে কি আসে যায় ?

সাধনাতে যদি দৃষ্টি লাভ করি তবে দেখিব এই মানব মন্দিরে তাঁর সকল বিশ্ব লইয়া সেই অসীম বিরাজমান। তাই এই “ঘটে” (মানব দেহে) চলিয়াছে মহা মহোৎসব, এখানে সকল বিশ্বের উৎসব হইয়া উঠিয়াছে ভরপুর। থাকুক দুঃখ, থাকুক তাপ, তবু এই “ঘট” (মানব-অন্তর) মহা মহোৎসবের ক্ষেত্র। বিশ্বপতিও যে উৎসবে না আসিয়া পারেন না সে উৎসব কি তুচ্ছ ? সেখানে কিসের অভাব ?

দেহে নানা দৈহিক দুঃখ আছে। দেহের সুবিধা ভোগ করি বলিয়াই নানা দুঃখ ও ভোগ করিতে হয়। কোনো সুখ কোনো সুবিধাই অবিমিশ্র সুখ সুবিধা নহে। সর্বত্রই দুঃখের মূল্যে সুখ কিনিতে হয়। সাধকেরা ক্ষুধা তৃষ্ণা আধি ব্যাধিকে তাই দেহধারণের দণ্ড বা “দেহদণ্ড” বলেন।

---

* “ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে”

(“উৎসর্গ”, ১৭ ; রবীন্দ্রনাথ।)

† সকল অবতার জাকে মহিমংডল অনংত খড়া করজোড়ে। (কবীর)

দেহদণ্ডের দুঃখ ঘোচে কেমন করিয়া! এমন উৎসবক্ষেত্রের মাঝে দুঃখ বেদনাকে স্বীকার করিতে হইবে কেন? এই দুঃখ দূর করিবার উপায় হইল, বাহির হইতে দেহ জগৎ হইতে, মনকে সরাইয়া আনিয়া নিজের কাছে রাখা। মনকে অন্তরের মহোৎসবে যুক্ত কর, আনন্দময়ের কাছে রাখ, সব দুঃখ দূর হইবে। সংসারে যেই মন ভ্রমিয়া বেড়ায় তাহাকে ব্রহ্মযোগে যুক্ত করাই সর্ব্ব দুঃখ জয়ের সাধনা।

অন্তরে যুক্ত হও, দিন দিন ব্রহ্ম-যোগ বাড়িবে, দিন দিন প্রেমরস-পান বাড়িয়া চলিবে, দিন দিন ব্রহ্ম-দরশন নির্বাধ হইবে। দেহগুণ দিন দিন ক্ষয় হইবে, ভগবৎপ্রকাশ দিন দিম উজ্জল হইতে থাকিবে।

বিচার করিয়া সত্যকে প্রত্যক্ষ করাই সব দুঃখের ঔষধ। সত্য পরম রহস্য। মনের সঙ্গে মন মিলিলে সব রহস্য বুঝা যায়। বেদ পড় শাস্ত্র পড়, কোনোই লাভ নাই। তাহাতে কি সৃষ্টির বা বিশ্বের রহস্য বুঝিতে পারিবে?

সৃষ্টিকর্ত্তার অন্তরের প্রেমের ব্যথা বিশ্বে প্রকাশিত, এ এক বিরাট গভীর রহস্য। ব্রহ্মচিত্তে যুক্ত না হইলে কেমনে এই রহস্য বুঝিবে? মনের সঙ্গে মনের যোগ না হইলে তো মানব মনের রহস্যও বুঝা যায় না। ভগবানকে হৃদয় দাও, প্রেম দাও, তাঁর মনের সঙ্গে প্রেমে যুক্ত হও, তবে তাঁর হৃদয়ের রহস্য ক্রমে তোমার কাছে প্রকাশিত হইতে থাকিবে। এমন করিয়াই সৃষ্টির মর্ম্মরস্ পাইবে, নহিলে বেদ কোরাণ মুখস্থ করিয়া মরিলেও তাঁর রসরাজ্যে তোমার প্রবেশ নাই। পণ্ডিতের রাজ্য শাস্ত্রে, রসিকের বিহার প্রেমরাজ্যে, সেখানে পণ্ডিতের স্থান কোথায়?

সুখের মধ্যেও অনেক দুঃখ আছে, দুঃখেও অনেক সুখ আছে। আদি অন্ত সমস্তকে অন্তরের ঐক্যে, রসের ঐক্যে, প্রেমের ঐক্যে যুক্ত করিয়া সমগ্র ভাবে গ্রহণ না করিলে সাধক সুখ দুঃখের মর্ম্ম পায় না। আদি অন্ত লইয়া সমগ্রের মর্ম্ম গ্রহণ করা চাই। আপন কল্পনার দ্বারা সাধক যেন পরিপূর্ণ সত্যকে খণ্ডিত করিতে না চাহেন। বস্তু বিচারে কেবল খণ্ডতা, কেবল বিচ্ছেদ; তাতে প্রাণ মেলে না, মর্ম্মসত্য ধরা পড়ে না। প্রাণবিচারের দ্বারা মর্ম্ম লাভ করিয়া বিশ্বসত্যকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। "জ্যোঁ কা ত্যোঁ" অর্থাৎ ঠিক যেমনটি আছে ঠিক তেমন ভাবেই সত্যকে গ্রহণ করিতে হইবে। আপন

সুবিধা, ইচ্ছা, অভ্যাস বা সংস্কারের খাতিরে সত্যকে কোথাও ক্ষুণ্ণ করিবার অধিকার কাহারও নাই। যে তাহা করিতে গেল সে আপনাকেই ক্ষুণ্ণ করিল, আপন সাধনা ও সত্যকে ক্ষুণ্ণ করিল; সে বস্তুজগতে যতই বুদ্ধিমান ও ঐশ্চর্য্যবান হউক না কেন সে সাধনাতে শাশ্বত জীবনে ও ব্রহ্মযোগলোকে আপনার আত্মঘাত করিল। ইহাই সিদ্ধ বিচার।

জীবদর্পণে ব্রহ্মরূপ ঃ

জ্যূঁ দরপন মৈঁ মুখ দেখিয়ে পানী মৈঁ প্রতিবংব।
ঐসৈঁ আতম রাম হৈ দাদূ সবহী সংগ॥
জব দরপন মাঁহৈঁ দেখিয়ে তব অপনা সূঝৈ আপ।
দরপন বিনা সূঝৈ নহীঁ দাদূ পুনি রূপ আপ॥
যূঁ রবু রুহন্নমেঁ জ্যুঁ গন্ধ ফুলঁন্ন।
জ্যুঁ জেরৌ রহ সূর মাঁ ঠংডো চংদ্র বসন্ন॥

"দর্পণেই যেমন মুখ দেখা যায় (দর্পণ ছাড়া আপন মুখ দেখিবার উপায় নাই), জলে যেমন প্রতিবিম্ব দেখা যায়, তেমনি হে দাদূ, আত্মারাম আছেন সবারই সঙ্গে।

দর্পণ মাঝে দেখিলেই আপনার কাছে আপন প্রকাশ হয় প্রত্যক্ষ। দর্পণ বিনা আবার আপন রূপও আপনি পায় না দেখিতে।

পরমাত্মা তেমনি বিরাজিত সকল আত্মায়, গন্ধ যেমন আছে সকল ফুলে, জ্যোতি যেমন প্রতিষ্ঠিত আছে সূর্য্যে, শীতলতা যেমন অবস্থিত আছে চন্দ্রে।"

অসীম ও অসম্পূর্ণ ঃ

অসীম ঐশ্বর্য্য সত্ত্বেও পরব্রহ্মও মানব রস বিনা অশক্ত। আনন্দ লহরীর "শিবঃ শক্ত্যা যুক্তঃ" শ্লোকটি তুলনীয়।

অরস রংগসেঁৗ সৃষ্টি নহি কহু রস কিত পাই।*
মানুস সরোবর রস ভর্‌্যা প্যাসা তঁহ মিলৈ আই॥

"শুধু অরস রঙ্গ দিয়া তো সৃষ্টি হয না, বল তবে রস মেলে কোথায়? মানুষই হইল রসে ভরপূর সরোবর। যে পিপাসিত তাহাকে এখানে আসিয়া মিলিতেই হইবে।"

---

* প্রিয়জন বিনা প্রেম নিরুপায়, মানব বিনা পরব্রহ্মেরও প্রেম নিরাধার;

মানব প্রেমরসেই যে বিশ্বসৌন্দর্য্যতত্ত্ব, তাহা হইল মধ্যযুগের সাধকদের একটি বড় কথা। ইহার মূলে গভীর বেদনা আছে।

মধ্যযুগের সাধকেরা বলেন "এই বিশ্ব হইল অসীম প্রেম ব্যথার পত্র পট। তিনি প্রেমের অশ্রুতে তাঁর শক্তির শুষ্ক বর্ণগুলি গুলিয়া এই যে বেদনার চিত্র সৃষ্টি করিয়া চালিয়াছেন, ইহাই বিশ্ব। বেদনা মনে না থাকিলে এই পত্রের মর্ম্ম কেহ বুঝিতে পারে না। একই ভাবের ভাবুক না হইলে মরম ধরা পড়িবে কেন?"

সীমা ও অসীমের পরস্পর পূজা।

বাস কহে হম ফূল কো পাউঁ, ফূল কহে হম বাস।
ভাস কহে হম সতকো পাউঁ, সত কহে হম ভাস॥
রূপ কহে হম ভাবকো পাউঁ, ভাব কহে হম রূপ।
আপস মেঁ দউ পূজন চাহৈ, পূজা অগাধ অনূপ॥*

"গন্ধ বলে আহা আমি যেন পাই ফুলকে, ফুল কহে হায় আমি যেন পাই গন্ধকে। ভাস (প্রকাশ বা ভাষা) কহে আহা আমি যেন পাই সৎ (সত্য) কে, সৎ বলে আমি যেন পাই ভাসকে। রূপ বলে আমি যেন পাই ভাবকে, ভাব বলে আহা আমি যেন পাই রূপকে! দুইই পরস্পরে এ ওকে করিতে চাহে পূজা; অগাধ এই পূজা, অনুপম এই পূজা।"

কাজেই মানবকে চাই-ই চাই। মানব প্রেমরসে ব্রহ্মশক্তির শুষ্ক বর্ণকগুলি গুলিয়া তিনি এই সুন্দর বিশ্ব রচনা করিয়াছেন। চিত্রকরের সব আয়োজন প্রস্তুত থাকিলেও একটু জলের অপেক্ষায় চিত্রসৃষ্টি স্থগিত থাকে। ব্রহ্ম তাঁহার রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ প্রভৃতি শুষ্ক বর্ণগুলির তুলি কোন জলে ভিজাইয়াছেন? সেই জল মানব প্রেমরস। এই বিশ্ব সৌন্দর্য্যের মূলেও প্রেমানন্দ রস। আবার প্রেমানন্দ রস না পাইলে বিশ্ব সৌন্দর্য্যের মর্ম্মটিও ধরা যায় না।

* এই বাণীটি "সাধু অঙ্গেও" আছে।

প্রেমযোগেই নিত্য যুক্ত :

জিন্‌হ যহু দিল মংদির কিয়া দিল মংদির মৈঁ সোই।
দিল মাহৈঁ দিলদার হৈ ঔর ন দূজা কোই॥
নাল কমল জল উপজৈ ক্যোঁ সো জুদা জল মাঁহিঁ।
চংদ হি হিত চিত প্রীতড়ী য়োঁ জল সেতীঁ নাহিঁ॥
দাদূ এক বিচার সোঁ সবতৈঁ ন্যারা হোই।
মাহৈঁ হৈ পর মন নহীঁ সহজ নিরংজন সোই॥
গুণ নির্গুণ মন মিলি রহ্যা ক্যোঁ বেগর হোই জাহি।
জহঁ মন নাহীঁ সো নহীঁ জহঁ মন চেতন সো আহি॥

"এই হৃদয় মন্দির রচনা করিলেন যিনি, হৃদয়-মন্দিরে তিনিই বিরাজমান; হৃদয়মাঝেই প্রেমিক হৃদয়েশ্বর বিরাজমান, দ্বিতীয় আর কেহই নাই। (থাকিলে কি হইবে? প্রেম বিনা যোগ হইবে না; প্রেম-যোগের আকাঙ্ক্ষা থাকিলে প্রেম করিতেই হইবে।)

কুমুদিনী যে জলেই উপজিল, সে কেন জলের মাঝে থাকিয়াও জল হইতে বিচ্ছিন্ন? চন্দ্রের সঙ্গে তার যেমন অন্তরে অন্তরে প্রেম তেমন প্রেম যে তার জলের সঙ্গে নাই।

হে দাদূ, সেই একই যুক্তিতে (সব কিছুর মধ্যে থাকিয়াও) সব কিছু হইতে স্বতন্ত্র থাকা চলে। মাঝেই আছে অথচ তাহাতে নাই মন, তাহাই তো সহজ নিরঞ্জন লীলা!

গুণ-নির্গুণের সাথে আছে মন মিলিত হইয়া, তবে কেমন করিয়া সেই মন হইতে পারে স্বতন্ত্র?

যেখানে মন (অন্তরের যোগ) নাই সেখানে সে নাই, যেখানে মন চেতন আছে সেখানে সেও আছে।"

অন্তরে প্রেমানন্দ, অন্তরে অনন্ত লোক :

প্রেম ভগতি দিন দিন বধৈ সোঈ জ্ঞান বিচার।
দাদূ আতম সোধি করি মথি করি কাঢ়্যা সার॥

সহজ বিচার সুখমেঁ রহৈ দাদূ বড়া বমেক।
মন ইন্দ্রী পসরৈঁ নহীঁ অংতরি রাখৈ এক॥
ঘটমৈঁ সুখ আনংদ হৈ তব সব ঠাহর হোই।
ঘটমৈঁ সুখ আনংদ বিন সুখী ন দেখ্যা কোই॥
কায়া লোক অনংত সব ঘটমৈঁ ভারী ভীর।
জহাঁ জাই তহঁ সংগি সব দরিয়া পৈলী তীর॥

"সেই জ্ঞানই যথার্থ বিচার-সিদ্ধ জ্ঞান যাহাতে দিন দিন প্রেম ভক্তি বাড়িতে থাকে। অন্তরের মধ্যে অন্বেষণ করিয়া, অন্তর মন্থন করিয়া, দাদূ এই সার তত্ত্ব বাহির করিয়াছে।

এই সহজ বিচারের আনন্দে যে আছে, হে দাদূ, তারই তো শ্রেষ্ঠ বিবেক। (এই বিচার লইয়া) যে অন্তরে এক (ব্রহ্মকে) রাখিয়াছে তার মন তার ইন্দ্রিয় প্রবল হইয়া তাহাকে কখনও অভিভূত করে না।

এই ঘটেই সুখ ও আনন্দ বিরাজমান। তাই তো সেখানে সবই হয় "ঠাহর" (=অনুভূত, প্রতিষ্ঠিত); ঘটের মধ্যে সুখ আনন্দ বিনা কাহাকেও দেখি নাই সুখী হইতে।

এই কায়ার মধ্যেই অনন্ত লোক, এই ঘটেই লাগিয়াছে ভারী মেলা। সাগরের ঐ পার পর্য্যন্ত যেখানেই যাও সেখানেই সব যায় সঙ্গে সঙ্গে।"

দেহ দুঃখ ঘুচে কিসে?

প্যণ্ড মুক্তি সব কো করে, প্রাণ মুক্তি নহিঁ হোয়।
প্রাণ মুক্তি সতগুর করৈ দাদূ বিরলা কোয়॥
খুধ্যা ত্রিখা ক্যোঁ ভুলিয়ে সীত তপন ক্যোঁ জাই।
ক্যূঁ সব ছূটৈ দেহ গুণ সতগুরু কহি সমঝাই॥
চাহতৈঁ মন কাঢ়ি করি লে রাখৈ নিজ ঠৌর।
দাদূ ভুলৈ দেহ গুণ বিসরি জাই সব ঔর॥

"এই পিণ্ডের (দেহের) মুক্তির জন্যই সবাই করে সাধনা, প্রাণমুক্তি তো তাহাতে হয় না। এই প্রাণমুক্তির সাধনা যিনি দিতে পারেন এমন সদ্‌গুরু বিরল।

প্রশ্ন—হে সদ্‌গুরু, আমার বুঝাইয়া বল, কি করিয়া ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলা যায়, কেমন করিয়া শীত গ্রীষ্ম বোধ যায়, কি উপায়ে দেহগুণ সব যায় মুক্ত হইয়া ?

উত্তর—কামনা হইতে মনকে বাহির করিয়া নিজের ঠিকানায় যদি রাখা যায়, হে দাদূ, তবেই ভুলিবে এই দেহগুণ, আর সব তবে হইয়া যাইবে বিস্মৃত।

তবেই দিনে দিনে ভাগবতসঙ্গ চলে প্রগাঢ় হইয়া।

দিন দিন রাতা রামসৌঁ দিন অধিক সনেহ।
দিন দিন পীবৈ রামরস দিন দিন দরপন দেহ॥
দিন দিন ভূলৈ দেহগুণ দিন দিন ইংদ্রী নাস।
দিন দিন মন মনসা মরৈ দিন দিন হোই প্রকাস॥
দেহ রহৈ সংসার মেঁ জীব পীবকে পাস।
দাদূ কুছ ব্যাপৈ নহীঁ কাল ঝাল দুঃখ ত্রাস॥

"হে দাদূ, দিনের পর দিন ভগবানের সঙ্গে অনুরাগ চলে বাড়িয়া, দিনে দিনে প্রেম থাকে বাড়িতে, দিনে দিনে পান করিয়া চলে ভাগবতরস, দিনে দিনে (ভগবৎস্বরূপ প্রকাশের জন্য) দেহখানি হইয়া উঠে (স্বচ্ছ) দর্পণ।

দিনে দিনে দেহগুণ থাকে ভুলিতে, দিনে দিনে ইন্দ্রিয় (তৃষ্ণা) হয় নাশ, দিনে দিনে মন ও মনের কামনা যায় মরিয়া, দিনে দিনে (জীবনে ব্রহ্মস্বরূপ) হয় প্রকাশ।

দেহ যদি থাকে সংসারে এবং জীবন যদি থাকে প্রিয়তমের কাছে, তবে কালের দাহ দুঃখ ত্রাস কিছুই জীবনে পারে না ব্যাপিতে।"

এই রহস্য বুঝিয়া লওয়াই চাই।

দাদূ সবহীঁ ব্যাধিকী ঔষধি এক বিচার।
সমঝে তৈঁ সুখ পাইয়ে কোই কুছ কহৈ গঁবার,

জব মনহী মেঁ মন মিল্যা তব কুছ পায়া ভেদ।
দাদূ লে করি লাইয়ে কা পঢ়ি মরিয়ে বেদ॥
পানী পাৱক পাৱক পানী জানৈ নহীঁ অজান।
আদি অংতি বিচার করি দাদূ জান সুজান॥
সুখ মাহৈ দুখ বহুত হৈ দুখ মাহৈঁ সুখ হোই।
পহিলে প্রাণ বিচার বিন মরম ন জানৈ কোই॥
আদি অংতি গাহন কিয়া মায়া ব্রহ্ম বিচার।
জহঁকা তহঁ লে দে ধর্য়া দেত ন দাদূ বার॥

"হে দাদূ, সকল ব্যাধিরই একমাত্র ঔষধ হইল বিচার। (বিচারের দ্বারা) যে "সমঝ" (সম্যক বোধ) জন্মে তাহাতেই মেলে আনন্দ, মূর্খ গ্রাম্যেরা বলুক না যাহার যাহা খুসী।

যখন সেই মনের সঙ্গে মিলিল মন, তখন বুঝিলাম কিছু রহস্য; হে দাদূ মন লইয়া আন (মনের সঙ্গে মিলাইয়া), কেন বৃথা মর বেদ পড়িয়া।

জল অগ্নি ও অগ্নি জলের রহস্য তো অজ্ঞান জানে না। আদি অন্ত বিচার করিয়া, হে দাদূ, যথার্থ মর্ম্ম লও জানিয়া।

সুখের মধ্যেও অনেক দুঃখ আছে, দুঃখের মাঝেও সুখ আছে, প্রথমেই প্রাণ-বিচার বিনা এই মরম (রহস্য) কেহ পারে না জানিতে।

মায়া ও ব্রহ্মতত্ত্বে গাহন করিয়া আমি আদি ও অন্ত রহস্যে ডুব দিয়া দেখিলাম, যেখানকার যে সত্য সেখানে তাহা লইলাম ও সেখানে তাহা রাখিলাম, (যেখান হইতে যাহা প্রাপ্য ও যাহার যাহা প্রাপ্য তাহা) লইতে বা দিতে একটুও বিলম্ব করিলাম না।"

তৃতীয় প্রকরণ—তত্ত্ব।

চতুর্থ অঙ্গ—কস্তূরী মৃগ অঙ্গ ঃ

সাধক ভগবানকে বাহ্যজগতে খুঁজিয়া বেড়ায়। অথচ যাঁর খোঁজে সে ব্যাকুল, তিনি অন্তরের মাঝেই আছেন। কস্তুরী মৃগের নাভি যখন পরিণত হইয়া গন্ধে ভরপূর হয়, তখন সে গন্ধে ব্যাকুল হইয়া দশদিকে দৌড়িয়া সন্ধান করিয়া বেড়ায়, এও সেই মত।

সাধক যদি অন্তরের মধ্যে একবার ডুবিয়া দেখে তবেই তার এই সব ছুটাছুটী হইয়া যায় দূর।

বাহিরে দেখাই লোকের অভ্যাস। এই অভ্যাসগত লোকে বাহিরে দৌড়াদৌড়ি করাকেই মনে করে উদ্যম। অথচ আসলে ইহা জড়ত্ব। বাহিরে দেখার অভ্যস্ত পথ ছাড়িয়া অন্তরে প্রবেশ করিবার মত মুক্ত জাগ্রত বুদ্ধি থাকা চাই।

এই জড়তার দোষে আমরা জীবনের পরমানন্দের স্বাদ হারাই। যে সচেতন সে পরমানন্দে সদা ভরপূর থাকে। এই যে জড়ত্বের নিদ্রা ইহা বড়ই লজ্জার কথা। স্বামী জাগিয়া আছেন, এমন সময় ঘুম কি আসা উচিত? স্বামী তো সদাই জাগ্রত, যত জড়ত্ব সে আমারই, এ দুঃখ কি আর রাখিবার ঠাঁই আছে?

বাহিরের বস্তু অন্তরে ঃ

ঘটি কস্তূরী মিরিগকে ভরমত ফিরৈ উদাস।
অংতরগতি জানৈ নহীঁ তাতৈঁ সূঁঘৈ ঘাস॥
জা কারণি জগ ঢুংঢিয়া সো তৌ ঘটহী মাঁহিঁ।
ডূবত নহিঁ অংতরমেঁ তাতৈঁ জানত নাহিঁ॥
দূরি কহৈঁ তে দূরি হৈঁ রাম রহ্যা ভরপূরি।
নৈনহুঁ বিন সুঝৈ নহীঁ তাতৈঁ রবি কত দূরি॥

সদা সমীপ সঁগি সন্‌মুখ রহৈঁ দাদূ লখৈ ন গূঝ।
সুপিনৈঁ হী সমঝৈ নহীঁ কোঁ্যা করি লহৈ অবূঝ॥

“কস্তূরী রহিল মৃগের ঘটে (দেহে), অথচ (তারই খোঁজে) সে উদাস হইয়া বেড়ায় ভ্রমিয়া। অন্তরের মর্ম্ম জানে না, তাতেই বেড়াইতেছে ঘাস শুঁকিয়া শুঁকিয়া।

যার কারণে জগতময় ঢুঁড়িতেছে (খুঁজিয়া বেড়ায়) তাহা তো রহিয়াছে ঘটেরই মধ্যে, অন্তরের মধ্যে ডুবিয়া দেখিল না তাই তো জানে না তার মরম।

ভগবান তো (সর্ব্বত্র) ভরপূর বিরাজমান। “দূরে আছেন” যাঁরা বলেন তাঁহারাই আছেন দূরে। নয়ন অভাবে পায় না দেখিতে, তাতেই (মনে হয়) সূর্য্য কোথায় দূরে।

সদাই আছেন তিনি সমীপে, সঙ্গে সঙ্গে, সম্মুখে; হে দাদূ, এই রহস্যটি বুঝিয়া দেখিল না, স্বপনেও ইহা বুঝিল না; কেমন করিয়া তবে অবুঝ তাঁহাকে পাইবে?”

জড়ত্বই বাধা :

জড়মতি জীব জানৈ নহীঁ পরম স্বাদ সুখ জাই।
চেতনি সমুঝৈ স্বাদ সুখ পীবৈ প্রেম অঘাই॥
জাগত জে আনঁদ করৈ সো পাবৈ সুখ স্বাদ।
সূতৈঁ সুকৃখ ন পাইয়ে প্রেম গবাঁয়া বাদ॥
জিস্‌কা সাহব জাগনা সেবগ সদা সুচেত।
সাবধান সনমুখ রহৈ গিরি গিরি পড়ৈ অচেত॥
দাদূ সাঈঁ সচেত হৈ হমহীঁ ভয়ে অচেত।
প্রাণি রাখ ন জানহী তাথৈঁ নিরফল খেত॥

“জড়মতি জীব জানিলই না যে পরমস্বাদ পরমানন্দ যায় চলিয়া; যে চেতন সে স্বাদ ও আনন্দ জানে, সে প্রাণ ভরিয়া প্রেমরস করে পান।

যে জাগে সে-ই করে আনন্দ, সে-ই পায় আনন্দের স্বাদ ; যে শুইয়া পড়িয়া থাকে সে তো পায় না আনন্দ, হেলায় হারায় সে প্রেমরস।

স্বামী যাহার জাগেন সেই সেবক ও যেন থাকে সদা সচেতন ; সাবধানে সে যেন থাকে সম্মুখে ; যে অচেতন সে যায় বার বার পড়িয়া পড়িয়া।

স্বামী তো সচেতন, হে দাদূ, আমিই হইলাম অচেতন। প্রাণের মধ্যে তাঁহাকে রাখিতে জানি না বলিয়াই (জীবনের) ক্ষেত্র রহিল নিষ্ফল।”

তৃতীয় প্রকরণ—তত্ত্ব।

পঞ্চম অঙ্গ—“সবদ” অঙ্গ।

সাধকদের ভাষায় “সবদ” বা শব্দ অর্থ সঙ্গীত। সাখী হইল সাধকদের সাক্ষ্য শ্লোকাকারে রচিত সত্যের প্রকাশ। “সবদ” সুরে ও তালে পূর্ণাঙ্গ সঙ্গীত।

ভক্তদের মতে এই বিশ্বচরাচর বিধাতার “সবদ”। প্রথম সবদ নাদ ওঁকার। ইহা হইতেই জগতের উৎপত্তি, ইহাতেই স্থিতি ও এই সবদের লয়েই জগতের লয়। তান ও সুর হইল সবদের “বিস্তার” (সুরতি), তাল বা লয় হইল সবদের “নিস্তার” (বিরতি)। শুধু “তানে” সবদ হয় না, “তানে-লয়ে” সবদ হয় পূরা। দিবা-রাত্রি, দুঃখ-সুখ, জনম-মরণ, সৃষ্টি-প্রলয় লইয়াই পূরা গীত। কবীরের বাণীতে এই তত্ত্ব খুব গভীর ভাবে আছে।

যেমন তেমন করিয়া সঙ্গীত থামিয়া গেলেই তানের লয় হয় না, বিস্তারের নিস্তারের জন্য একটি ছন্দে ছন্দে সুষমা ও পরিণতি প্রয়োজন। সেই ছন্দকে না পাইলে মুক্তির সাধনা অসম্ভব। সকল বন্ধনকে সুসঙ্গতরূপে স্বীকার করিতে পারিলেই ছন্দ ও সুর হয় পূর্ণ। মুক্তির সাধনাতেও তাই উচ্ছৃঙ্খলতার স্থান নাই। মঙ্গলময়ী গৃহলক্ষ্মী যেমন প্রেমে সকল বন্ধন স্বীকার করিয়া ধন্য হন ও ধন্য করেন, তাহাই তাঁহার মুক্তি; সাধনাতেও তাই। এখানে স্বৈরাচার চলে না। কিন্তু সে বন্ধন বাহিরের নয়, তাহা অন্তরের প্রেমের, জীবনের সঙ্গে তাহাকে সুসঙ্গত করিয়া তুলিতে হয়, ইহাই মুক্তির সাধনা।

যে জগতে সাধকের সাধনা সে জগতও তো সঙ্গীতের মতই সুষমাময় ও শোভন; যে সাধনা হইতে ভ্রষ্ট বা সাধনাহীন সে এই জগতে ব্রহ্ম-সবদের বাধা। সাধনাতে মানুষ এই সবদের অনুকূল হইয়া ব্রহ্মসবদকে মধুরতর করিয়া দেয়।

এই জগৎ সংসার এই সবদেই আছে সুসংবদ্ধ হইয়া। এই “সবদ”

পাইলেই মুক্তি মিলিল, তখন আর সুরের জন্য কোনো বন্ধনকে বন্ধন মনে হয় না। ইহাতেই পরিপূর্ণ ব্রহ্মরস, সাধক ইহা পান করিয়াই তৃপ্ত।

ওঁকার সবদ হইতেই বিধাতা করিতেছেন সব সৃষ্টি। এখনও সকল ঘটে চলিয়াছে তাঁর সঙ্গীত। যে ঘট এই সঙ্গীত হইতে ভ্রষ্ট সে বিশ্বসঙ্গীতের বাধা। তাই প্রত্যেকের সাধনা চাই।

সাধু নিত্যই এই সবদে থাকেন যুক্ত। ইহাতেই তিনি নিজেকে ও পরকে রাখেন জাগাইয়া। এই "সবদ" হইতে ভ্রষ্ট হইলেই সাধনা হইয়া যায় ভ্রষ্ট। এই সবদকে বাণ করিয়াই সাধুরা সাধকের হৃদয় বিদ্ধ করেন, এই আঘাত যার লাগে সে যায় তরিয়া। এই সবদ যার লাগে তার বড় ব্যথা। এই সবদ অগ্নিময়, বীর সাধক আপনাকে স্বেচ্ছায় সেই অগ্নিতে সমর্পণ করেন, কাপুরুষ যে সে পালায়।

এই সবদেই ভাগবত আনন্দ। এই সবদই সকল ভ্রমতিমিরনাশী প্রদীপ। আদি অন্ত রসে রসময় এই সবদ। বিশ্বের সকল সাধকের ও সকল সাধনার রস এই সবদে, ইহা পান করিলেই হইল বিশ্বরস পান করা। ইহাই প্রেমের বাণী, পঙ্কের গভীর তল হইতে অপ্রত্যাশিত কমল এই সবদের প্রেমবাণীতে আসে বাহির হইয়া। এই সবদই ব্রহ্মবাণী। ইহা জানিলে ব্রহ্মানুভূতি যায় প্রত্যক্ষ হইয়া। অসংখ্য বন্ধন ও সীমা সত্ত্বেও সঙ্গীতের অসীমানন্দ প্রত্যক্ষ দেখিলে জীবনের সীমার মধ্যেও অসীম ব্রহ্মানুভব সহজ হইয়া আসে।

জগৎসংসার ব্রহ্ম-সবদের সুরে তালে:

সবদৈঁ বংধ্যা সব রহৈ সবদৈঁ হী সব জাই।
সবদৈঁ হী সব উপজৈ সবদৈঁ সবৈ সমাই॥
সবদৈঁ হী সচু পাইয়ে সবদৈঁ হী সংতোখ।
সবদৈঁ হী অস্থির ভয়া সবদৈঁ ভাগা শোক॥
সবদৈঁ হী সূখিম ভয়া সবদৈঁ সহজ সমান।
সবদৈঁ হী নিরগুণ মিলৈ সবদৈঁ নিরমল জ্ঞান॥

সবদৈঁ হী মুকতা ভয়া সবদৈঁ সমঝৈ প্রাণ।
সবদৈঁ হী সূঝৈ সবৈ সবদৈঁ সুরঝৈ জান॥
সবদ সরোবর সুভর ভর্য্যা হরি জল নির্ম্মল নীর।
দাদূ পীবৈ প্রীতিসোঁ তিন কে অখিল সরীর॥

"সবদেই (সঙ্গীতেই) বাঁধা হইয়া আছে সব (বিশ্ব), সবদেই সব যায়; সবদেই হইতেছে সব উৎপন্ন, সবদেই আছে সব সামাইয়া (ভিতরে আছে ভরপূর রূপে সমাহিত)।

সবদেই পাওয়া যায় সত্য, সবদেই সন্তোষ, সবদেই হইয়াছে স্থিরতা, সবদেই পালাইয়াছে শোক।

সবদেই (স্থূলতা দূর হইয়া) হইয়াছে সূক্ষ্ম, সবদেই সহজ সমাহিত (ভরপূর বিরাজিত). সবদেই মেলেন গুণাতীত, সবদেই মেলে নির্ম্মল জ্ঞান।

সবদেই হইল মুক্ত, সবদেই সমঝে (সম্যক বোধ, জ্ঞান পায়) প্রাণ, সবদেই সব হয় প্রত্যক্ষ; সবদেই জ্ঞান প্রাণ সকল বন্ধন হইতে হয় মুক্ত।

সবদ সরোবর কূলে কূলে ভরপূর, হরি জল তাহাতে নির্ম্মল নীর। হে দাদূ, যাঁহারা প্রীতির সহিত সেই জল পান করেন, তাঁহাদেরই অখিল শরীর।"

ওঁকারই সর্ব্ব শব্দের মূলবীজ, ওঁকার হইতেই সৃষ্টি।

পহলী কীয়া আপথৈঁ উতপতি ওঁকার।
ওঁকার হী থৈঁ উপজৈ পংচ তত্ত আকার॥
এক সবদ সব কুছ কিয়া ঐসা সমরথ সোই।
আগৈঁ পীছৈঁ তৌ করৈ জে বলহীনা হোই॥*
নিরংজন নিরাকার হৈ ওঁকার হী আকার।
দাদূ সব রংগ রূপ সব সব বিধি সব বিস্তার॥
আদি সবদ ওঁকার হৈ বোলৈ সব ঘট মাহিঁ।
দাদূ মায়া বিস্তরী পরম তত্ত যহু নাহিঁ॥

---

* উপক্রমণিকাতে আকবরের সঙ্গে সংবাদে এই বাণীটির কথা বলা হইয়াছে।

এক সবদ সোঁ ঊনরৈ বরসন লাগে আই।
এক সবদ সোঁ বীখরৈ আপ আপকোঁ জাই॥

“প্রথমে তিনি আপনা হইতে উৎপত্তি করিলেন ওঁকার, এবং ওঁকার হইতেই উপজিতেছে পঞ্চতত্ত্ব ও সকল আকার।

এক সবদেই সব কিছু করিলেন (যুগপৎ সৃষ্টি) এমন সমর্থ তিনি, আগে পিছে করিয়া সে করে সৃষ্টি যাহার সেই সামর্থ্য নাই।

নিরঞ্জন হইলেন নিরাকার, ওঁকারই হইল আকার। হে দাদূ, সকল রঙ্গ সকল রূপ সকল বিধি বিস্তার (সেই এক ওঁকার বীজ হইতেই)।

আদি শব্দ হইল ওঁকার, সকল ঘটেই ধ্বনিতেছে সেই ওঁকার, হে দাদূ, এই যে বিস্তারযুক্ত মায়া, পরম তত্ত্ব ইহা নহে।

এক সবদেই মেঘ কেন্দ্রীভূত জমাট হইয়া ঘনাইয়া আসে, আর আসিয়া লাগে বর্ষিতে। আবার এক সবদেই সব ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায় ছড়াইয়া, (সব কিছু) আপন আপন দিকে যায় চলিয়া।”

সাধ সবদ সোঁ মিলি রহৈ মন রাখৈ বিলমাই।
সাধ সবদ বিন ক্যোঁ রহৈ তবহীঁ বীখরি জাই॥
সবদ বাণ গুর সাধকে দূরি দিসন্তর জাই।
জিহিঁ লাগে সো ঊবরৈ সূতে লিয়ে জগাই॥
সবদ জরৈ সো মিলি রহৈ একরস পূরা।
কাইর ভাগৈ জীব্র লে পগ মাঁডৈ সূরা॥
সবদোঁ মাহৈঁ রামধন সাধূ সবদ সুনাই।
জানৌ কর দীপক দিয়া ভরম তিমর সব জাই॥
সবদোঁ মাহৈঁ রামরস সাধোঁ ভরি দিয়া।
আদি অংত সব সংত মিলি য়োঁ দাদূ পিয়া॥
দাদূবাণী প্রেমকী কমল হোই বিকাস।
দাদূবাণী ব্রহ্মকী অনভয় ঘটি পরকাস॥

“সাধু সবদের সাথেই রহেন মিলিয়া ও (আপন) মনকে রাখেন তাহাতে

যুক্ত করিয়া ! সাধু সবদ বিনা কেন থাকিবেন ? তাহা হইলেই যে সব যোগ যাইবে নষ্ট হইয়া। সব যাইবে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া।

গুরু ও সাধুর এই সবদ বাণই যায় দূর দিগন্তরে (বা দেশান্তরে), (এই বাণ) যাহাকে লাগে সে-ই উদ্ধার পায়, নিদ্রিতকে ইহাই লয় জাগাইয়া।

এই সবদ জ্বলিতেছে. যদি ইহার সঙ্গে মিলিয়া থাকিতে পারে, তবেই হয় পরিপূর্ণ একরস। যে কাপুরুষ সে পালায় তার প্রাণ লইয়া, যে বীর সে-ই আগে রাখে চরণ।

সবদের মাঝেই রামধন, সাধু শোনায় সেই সবদ ; মনে কর যে তিনি হাতে দিলেন প্রদীপ, সব ভ্রম তিমির গেল দূর হইয়া।

সবদের মধ্যেই রামরস, সাধুজন ইহা দিয়াছেন ভরিয়া। আদি অন্ত সব সন্ত (সাধু) মিলিয়া এমন করিয়াই হে দাদূ, সেই রস করিয়াছে পান।

হে দাদূ এই প্রেমের যে বাণী তাহাতে কমল হয় বিকশিত, হে দাদূ, এই ব্রহ্মের যে বাণী তাহাতে জীবনে (ঘটে, অন্তরে) অনুভব (ভগবৎস্বরূপ প্রত্যক্ষের আনন্দ) হয় প্রকাশ।"

চতুর্থ প্রকরণ—সাধনা।

প্রথম অঙ্গ—ভেখ অঙ্গ ঃ

সাধনার মধ্যে ১৪টি অঙ্গ আছে। তার মধ্যে ৭টি অঙ্গ হইল সাধকের “বিঘন” বা বাধা ; তাহা ক্রমে পরিহার করিতে হইবে। এবং ৭টি অঙ্গ হইল “সহারা” বা সহায়ক ; তাহা ক্রমে জীবনে সত্য করিয়া তুলিতে হইবে।

ভগবানকে উপলব্ধি করিতে যাইবার পথে যে সাতটি “বিঘন” বা বাধা সাধনার ক্ষেত্রে সাধক পান, তাহা এই,—(১) “ভেষ” (ভেখ, বাহ্য সাজ সজ্জার বাধা), (২) “মন” (ভিতরে কল্পনা ও মিথ্যা সৃষ্টির বাধা), (৩) “মায়া” (অসত্যের বাধা), (৪) “সূক্ষ্ম জন্ম” (অন্তরের চঞ্চলতার বাধা), (৫) “উপজ” (অহম্ উৎপত্তির বাধা), (৬) “নিরগুণিয়া” (সাধকের নিজ অযোগ্যতার বাধা), (৭) “হৈরান” (অভিভূত হইয়া শক্তি হারাইয়া ফেলার বাধা)।

এই প্রত্যেকটির বাধার সঙ্গে সঙ্গে সেই সেই বাধার প্রতিকারও দেওয়া আছে। সকল স্থলেই দাদূ বাধা এড়াইবার জন্য ভগবানের কৃপা ও সহায়তা প্রার্থনা করিয়াছেন।

এই ৭টি বাধার অঙ্গের পর ৭টি “সহায়া” বা সহায়ক অঙ্গ। (১) “বিনতি” (প্রার্থনা), (২) “বিশ্বাস”, (৩) “মধ্য” (পক্ষপাতহীনতা), (৪) “সারগ্রাহী”, (৫) “সুমিরণ” (স্মরণ বা জপ), (৬) “লয়” (প্রেমের যোগে ভগবানে আপনাকে বিলীন করা), (৭) “সজীবন” (জীবন দিয়া জীবন্ত সাধনা)।

কবীরের প্রবর্ত্তিত সাধনার প্রণালীই অনেক পরিমাণে দাদূ গ্রহণ করিয়াছেন। তবে দাদূর মধ্যে সেবা ও ভগবানের দয়াতে নির্ভরের ভাব বেশী। এই সাধন প্রণালীতে দাদূর নিজস্বও যথেষ্ট আছে। ইহাঁদের মধ্যে তান্ত্রিক যোগী ও সূফীদের মত দেহতত্ত্বেরও সাধনা আছে। তাহা লিখিয়া বুঝান কঠিন, গুরুমুখেই তার পরিচয় হইলে ভাল হয়। যদি সম্ভব হয় তবে

ভবিষ্যতে কোনো সুযোগে সেই সাধনা সম্বন্ধে কিছু লেখা যাইবে। দাদূ-সম্প্রদায়ের যোগগ্রন্থগুলি লইয়া কাজ করিলে এ সম্বন্ধে একটু বিশদ করিয়া বলার সুযোগ হইবে

যাহাকে বাংলাতে বলি ভেখ, হিন্দীতে তাহাকেই অনেক সময়ে বলা হয় "ভেষ"। "ভেষ" অর্থ বেশ অর্থাৎ সজ্জা।

বাহিরের সাজসজ্জাতে লাভ নাই, তাঁর সঙ্গে প্রেমের যোগ চাই। পৃথিবীতে জ্ঞানী পণ্ডিত বহুত বহুত আছে, প্রেমে সদা ভগবানের সঙ্গে যুক্ত সাধকই দুর্লভ। বাহ্য আধারের তো কেহ আদর করে না। তার মধ্যে যে বস্তু আধেয়, আদর তাহারই। ভিতরে যদি সত্য থাকে প্রেম থাকে তবেই ধন্য, নহিলে হাজার বাহ্য সজ্জা থাকিলেই বা লাভ কি? সংসারের ডাল পাতা ত্যাগ করিয়া যে সাধক চলিয়াছে সর্ব্বমূল ভগবানকে পাইতে, সে আবার কি ভেখ দেখাইবে? হরিভজনের প্রধান সাধনাই হইল "আপনাকে" মিটাইয়া ফেলা, ভেখ দিয়া কি আবার সেই "আপনাকেই" দেখাইতে হইবে জাঁকাইয়া?

তখনকার দিনে তথাকথিত নীচজাতীর লোকেরা সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসী হইতে বা ভেখ ধারণ করিতে বা স্বামী উপাধি লইতে পারিতেন না। তাঁরা সাধুমাত্র হইতে পারিতেন। দাদূ বলেন, ভেখধারী স্বামী হইয়া লাভ কি? ভেখধারী স্বামীরা পূজা পান এবং পূজা চান। পূজা লইয়া হইবে কি? হরিকে পাইলেই সব পাওয়া হইল। তাঁহাকে না পাইলে জগতের সব ঐশ্বর্য্য পাইলেও কিছুই পাওয়া হইল না।

কোনো সৌভাগ্যবতী নারী হয়তো আপন প্রিয়তমের ও স্বামীর দেখা পাইয়া সীমন্তে সিন্দুর দিয়া শঙ্খ, বস্ত্র, আভরণ পরিলেন। যে সেই স্বামীর দেখা না পাইয়াই কেবল বাহ্য সিন্দুর ও শঙ্খ বস্ত্রের আড়ম্বরে নিজেকে ভূষিত করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিল সে পাগল, তাকে সবাই পাগল বলে। যে ভগবানের দেখা পাইয়াছে তার বাহ্য ধরণধারণ তার বেশবাস মাত্র যদি আমি ধারণ করি তবে আমাকে পাগল না বলিবে কেন? অথচ ইহাই তো ভেখ।

এই সব ভেখ দেখাইয়া, সাজসজ্জায় আড়ম্বরে পৃথিবীর লোকের চোখে ধূলা দিতে পার কিন্তু ভগবানের কাছে এসব চালাকি চলে না। হৃদয়ের সত্য

প্রেম দিয়াই তাঁর প্রেম মেলে। অন্তর্য্যামী অন্তরের সত্য বস্তুই দেখেন, বাহিরের মিথ্যা সজ্জায় ভোলেন না।

বস্তুই সার, পাত্র সার নহে ঃ

দাদূ বূড়ে জ্ঞান সব চতুরাই জলি জাই।
অংজন মংজন ফূঁকি দে রহৈ রাম লয় লাই॥
রাম বিনা সব ফীকে লাগৈঁ করণী কথণী গিয়ান।
সকল অবিরথা কোট করি দাদূ জোগ ধিয়ান॥
জ্ঞানী পণ্ডিত বহুত হৈঁ দাতা সূর অনেক।
দাদূ ভেখ অনংত হৈ লাগি রহ্যা সো এক॥
কোরা কলস অৱাহকা উপরি চিত্র অনেক।
কা কীজৈ সো বস্ত বিন ঐসে নানা ভেখ॥
বাহরি দাদূ ভেখ বিনা ভীতরি বস্ত অগাধ।
সো লে হিরদৈ রাখিয়ে দাদূ সনমুখ সাধ॥
দাদূ দেখৈ বস্ত কো বাসন দেখৈ নাহিঁ।
দাদূ ভীতরি ভরি ধর্য়া সো মেরে মন মাঁহি॥
জে তূঁ সমঝৈ তৌ কহূঁ সাচা এক অলেখ।
ডাল পান তজি মূল গহি কা দিখলাৱৈ ভেখ॥
সব দিখলাৱৈঁ আপকূঁ নানা ভেখ বনাই।
আপা মেটন হরি ভজন তিহিঁ দিসি কোঈ ন জাই॥
সো দসা কতহূঁ রহী জিহিঁ দিসি পহুঁচে সাধ।
মৈঁ তৈঁ মূরখ গহি রহে লোভ বড়াঈ বাদ॥

"সব জ্ঞান যায় ডুবিয়া, সব চতুরতা যায় জ্বলিয়া; হে দাদূ, অঞ্জন মঞ্জন (বাহিরের সজ্জা চন্দন ফোঁটা তিলকাদি) দে উড়াইয়া, ভগবানের সঙ্গে প্রেমের যোগে থাক্ লাগিয়া।

হে দাদূ, তাঁহাকে ছাড়া ক্রিয়াকর্ম্ম (করণী), কথন ব্যাখ্যান (কথণী),

জ্ঞান, যোগ, ধ্যান, কোটি করিলেও সবই বৃথা ; ভগবান বিনা এই সবই লাগে নীরস।

জ্ঞানী পণ্ডিত আছেন বহুত, দাতা শূর ও অনেক ; ভেখও আছে অনন্ত, হে দাদূ, ঐকান্তিকভাবে তাঁহাতে লাগিয়া থাকে এমন হয়তো ক্বচিৎ কেহ একজন মেলে।

কুম্ভকারের পোয়ানের কোরা (নূতন নিষ্কলঙ্ক) কলস, তার উপরে অনেক চিত্র ; (তেমনি সুচর্চ্চিত এই মানবদেহ) ; কিন্তু সেই (আসল) বস্তু যদি ভিতরে না থাকে তবে (এমন কলস নিয়া) করিবে কি ? ঠিক এমনই হইয়াছে ভেখ।

না-ই থাকিল বাহিরে ভেখ, হে দাদূ, ভিতরে যদি থাকে অগাধ বস্তু ; তাঁহাকে নিয়া সকল সাধকের সমক্ষে রাখ হৃদয়ে (এইভাবে সাধনা যে করিতে পারে সে-ই তো প্রত্যক্ষ সাধু)।

দ'দূ দেখিতে হয় বস্তুকে, বাসন তো দেখিতে নাই ; হে দাদূ, ভিতরে যে বস্তু রহিয়াছে ভরিয়া তাহাই আমার মনের মধ্যে (আমি তাহাকেই অন্তরের সহিত আকাঙ্ক্ষা করি)।

যদি তুই বুঝিস্ তবে বলি সত্য এক অলেখ (অবর্ণনীয়), ডাল পাতা (সংসার) ত্যাগ করিয়া মূলই যদি গ্রহণ করিলি, তবে ভেখ আবার কি দেখাস্ ?

নানা ভেখ বানাইয়া সবাই বেড়ায় নিজেকে দেখাইয়া। আপনাকে মিটাইয়া ফেলাই (তাঁর মধ্যে লয় করিয়া দেওয়া) হইল হরিভজন, সেই দিকে তো যায় না কেহই।

যে দিশায় সাধক (তাঁর কাছে) পৌঁছায় সেইভাব (দশা)* বা রহিল কোথায়! 'তুমি আমি' প্রভৃতি ভেদবুদ্ধি লইয়াই রহিল মূর্খের দল ; লোভ ও বড়াই অর্থাৎ গর্ব্ব, মান, বড় হইবার মোহই সাধিয়াছে বাদ।"

---

* আমাদের দেশের সাধকরা যাহাকে "দশা" বলেন সূফীরা তাহাকেই বলেন "হাল।" উভয়েরই অর্থ, "অবস্থা"। অর্থাৎ অন্তরের যে ভাব বা অবস্থা হইলে আর বাহ্য ভেদ জ্ঞানাদি থাকে না তাহাই সাধকের "হাল" বা "দশা"।

শ্রেষ্ঠতার নির্ণয় সংখ্যায় নহে। স্বামী নাম হইলেই সাধক হয় না।

স্বাংগী* সাধ বহু অংতরা জেতা ধরতি অকাস।
সাধূ রাতা রামসেঁ৷ স্বাংগী জগতকী আস॥
স্বাংগী সব সংসার হৈ সাধূ বিরলা কোই।
জৈসে চংদন বাৱনা বন বন কহীঁ ন হোই॥
স্বাংগী সব সংসার হৈ সাধূ কোই এক।
হীরা দূর দিসংতরা কংকর ঔর অনেক॥
স্বাংগী সব সংসার হৈ সাধূ সমংদা পার।
অনল পংখী কহঁ পাইয়ে পংখী কোটি হজার॥
দাদূ চংদন বন নহীঁ সূরণকে দল নাহিঁ।
সকল সমংদি হীরা নহীঁ ত্যোঁ সাধু জগ মাহিঁ॥

"বাহিরের সাজসজ্জায় ভেখধারীতে ও সাধুতে বহু তফাৎ, যত তফাৎ ধরিত্রী ও আকাশে। সাধু অনুরক্ত আছেন ভগবানে, ভেখধারী (সম্প্রদায়ী প্রতিষ্ঠিত সন্ন্যাসী) ভরসা রাখেন জগতের উপর।

সংসারের সর্ব্বত্রই মেলে ভেখধারী স্বামী, সাধু মেলে ক্বচিৎ কেহ; যেমন চন্দনের চারা বনে বনে সর্ব্বত্র কোথাও যায় না পাওয়া।

সংসারে সর্ব্বত্রই মেলে স্বামী, সাধু মেলে ক্বচিৎ এক আধ জন; হীরা মেলে দূর দূর দেশান্তরে, আর কঙ্কর মেলে অনেক।

সংসারে সর্ব্বত্র মেলে ভেখধারী স্বামী, সাধু মেলে হয়তো এক সমুদ্র পার হইয়া একটি। পক্ষী আছে হাজার কোটি, কিন্তু অনলপক্ষী ** পাইবে কোথায়?

---

* কেহ কেহ "স্বাংগী" স্থানে বলেন স্বামী। স্বাংগী অর্থ হইল বাহ্য ভেখধারী। স্বাংগ অর্থ বাহ্য সাজসজ্জা।

** অনলপক্ষী মাটী স্পর্শ করে না। বহু উচ্চে আকাশে ডিম পাড়ে। অতি উচ্চ হইতে পড়িতে পড়িতে ডিম ফুটিয়া বাচ্চা আকাশে উড়িয়া যায়। মাটীতে এই পাখী বসে না। কবীরেরও ঠিক এমনি বাণী আছে।

হে দাদূ চন্দনের তো বন নাই, শূরের দল নাই, সমুদ্র ভরিয়া হীরা নাই, তেমনি জগতের মধ্যে সাধুও (কোনো দলে স্তূপাকার হইয়া নাই)।”

প্রেমে মেলেন ভগবান, ভেখে নয় ঃ

জে সাঈঁ কা হ্ৱৈ রহৈ সাঈঁ তিসকা হোই।
দাদূ দূজী বাত সব ভেখ ন পাৱৈ কোই॥
মালা তিলকসূঁ কুছ নহীঁ কাহূ সেতী কাম।
অংতরি মেরে এক হৈ অহনিস উসকা নাম॥
কবহূঁ কোঈ জিনি মিলৈ ভগত ভেখসূঁ জাই।
জীৱ জনমকা নাস হৈ কহৈ অম্রিত বিখ খাই॥
দেখা দেখী লোক সব নট জূঁ্য কাছ্যা ভেখ।
খবরি ন পাঈ খোজ কী হম কো মিল্যা অলেখ॥

“যে প্রভুর (আপনার জন) হইয়া রহে প্রভুও রহেন তাহার হইয়া। হে দাদূ, ইহা ছাড়া আর যত কিছু সবই কথার কথা, ভেখে কেহই পায় না তাঁহাকে।

মালা তিলকে আমার কিছুই কাজ নাই, আর কিছুতেই আমার নাই কোনো কাজ ; আমার অন্তরে আছেন সেই এক, অহর্নিশি (চলিতেছে) তাঁর নাম।

ভেখ সহ চলিয়াছেন এমন ভগতের সঙ্গে কাহারও যেন কখনও না হয় সমাগম। (ভেখ হইল) জীবন ও জনমের নাশ (অথবা মানবজন্মের নাশ); (ভেখধারীরা) বলে অমৃত আর খায় বিষ।

দেখাদেখি লোক সব নটের (অভিনয়ের সং) মত পরিল ভেখ (বেশ), (ভগবানের) খোঁজের সন্ধানও পাইল না, (অথচ কহিতে লাগিল) “অলেখ আমাকে মিলিয়াছে” (“ভগবানকে পাইয়াছি”)।”

মিলনের সাজ করিলেই মিলন ঘটে না ঃ

মায়া কারণ মূঁড মুড়ায়া য়হ তৌ জোগ ন হোঈ।
পারব্রহ্ম সূঁ পরচা নাঁহীঁ কপটি ন সীঝৈ কোই॥

প্রেম প্রীতি ঔর নেহ বিন সব ঝুঠে সিংগার।
দাদূ আতম রত নহীঁ কূঁ্য মানৈ ভরতার॥
পীৱ ন পাৱৈ বাৱরী রচি রচি করৈ সিঁগার।
দাদূ ফিরি ফিরি জগতসৌঁ পীৱ সমংদা পার॥
জগ দিখলাৱৈ বাৱরী ষোড়শ করৈ সিঁগার।
তহঁ ন সঁৱারৈ আপকূঁ জহঁ ভীতরি ভরতার॥
জোগী জংগম সেৱড়ে বোধ সন্ন্যাসী সেখ।
ষট্ দরসন দাদূ রাম বিন সবৈ কপট কে ভেখ। *

"মায়ার বশে মুড়াইল মাথা, এ তো আর যোগ নয়; পরব্রহ্মের সহিত নাই পরিচয়, (সেখানে) কপটে কিছুই তো সিদ্ধ হয় না (কপটতা সেখানে চলে না)।

প্রেম প্রীতি ও অনুরাগ বিনা সব সাজ সজ্জাই মিছা, হে দাদূ, আত্মা যদি প্রেমে রত না হয় তবে কেন মানিবেন স্বামী? ("মাননা" অর্থ রাজী হওয়া, গ্রহণ করা, মিলিত হওয়া, শ্রদ্ধা করা, স্বীকার করা, বিশ্বাস করা, কবুল কয়া, সম্মত হওয়া, ইত্যাদি)।

প্রিয়তমকে পাইল না পাগলী, কেবল রচিয়া রচিয়া (কৃত্রিম ও ঝুঠা বানাইয়া) করিতেছে সাজসজ্জা! হে দাদূ, ফিরিয়া ফিরিয়া বেড়ায় সে জগতের সাথে সাথে, অথচ প্রিয়তম রহিলেন সমুদ্রের পার!

ষোল রকমের (পুরাপূরি নিখুঁতভাবে) সাজসজ্জা করিয়া পাগলী ফিরিতেছে সংসারকে দেখাইয়া! অন্তরে যেখানে স্বামী (মিলিবেন), সেখানে তো আপনাকে সাজাইয়া করিতেছে না সুন্দর!

যোগী, জঙ্গম (শৈবপন্থী সাধু, শিবলিঙ্গ লইয়া ইহাঁরা চলেন), সেৱড়া (জৈন সাধু), বৌদ্ধ-সন্ন্যাসী, মুসলমান-সন্ন্যাসী, ষট্ দরশন, ইহাঁরা সবাই ভগবান বিনা শুধু কপটের ভেখমাত্র।"

---

* দ্রষ্টব্য মধ্য-অঙ্গ।

যোগ অন্তরে।

সব দেখৈঁ অস্থূল কৌঁ য়হু ঐসা আকার।
সূখিম সহজ ন সূঝঈ নিরাকার নিরধার॥
বাহরকা সব দেখিয়ে ভীতরি লখ্যা ন জাই।
বাহরি দিখাৱা লোককা ভীতরি রাম দিখাই॥ * *
সচু বিন সাঈঁ না মিলৈ ভাৱৈ ভেখ বনাই
ভাৱৈ করৱত উরধমুখী ভাৱৈ তীরথ জাই॥
ঝূঠা রাতা ঝূঠ সৌঁ সাচা রাতা সাচ।✢
এতা অংধ ন জানহীঁ কহঁ কঁচন কহঁ কাচ॥
হিরদৈকী হরি লেইগা অংতরজামী রাই।
সাচ পিয়ারা রামকূঁ কোটিক করি দিখলাই॥

"সবাই দেখে স্থূলকে যে ইহা এমন আকার; সূক্ষ্ম সহজ তো যায় না দেখা, যে নিরাকার নিরাধার।

বাহিরের সবই দেখে সবাই, অন্তরের বস্তু তো যায় না দেখা; বাহিরে দেখান হইল লোকের জন্য, ভিতর দেখা হইল রামকে।

সত্য বিনা স্বামী মেলেন না, চাই ভেখই বানাও, চাই করপত্রেই আপনাকে দ্বিখণ্ডিত কর, চাই উর্দ্ধমুখীই হও, চাই তীর্থেই ভ্রমিয়া বেড়াও। ‡

যে ঝুঠা সে ঝুঠাতেই অনুরক্ত,. যে সাচ্চা সে সাচ্চারই অনুরক্ত। হায় অন্ধেরা এইটুকুও জানে না যে কোথায় কাঞ্চন আর কোথায় কাচ!

হৃদয়ের ভাবই হরি করিবেন গ্রহণ, তিনি অন্তর্য্যামী স্বামী। সাচ্চাই হইল রামের প্রিয়, চাই কোটি রকম করিয়াই ভেখ দেখাও।"

---

* * দ্রষ্টব্য—"পারিখ" অঙ্গ।

✢ দ্রষ্টব্য—"সাচ" অঙ্গ।

‡ তখনকার দিনে ধর্ম্মের জন্য ঐকান্তিক ব্যগ্রতায় কেহ কেহ কাশীতে গিয়া করাত দিয়া আপনাকে দ্বিখণ্ডিত করাইয়া প্রাণ দিতেন। ভাবিতেন এইরূপ কৃচ্ছ্র করিলেই জীবনের সাধনা পূর্ণ হইবে।

অলেখ-পন্থীর উপযুক্ত মালা উপযুক্ত সাজ কি ?

সবদ সূঈ সূরতি ধাগা কায়া কন্থা লাই।
দাদূ জোগী জুগ জুগ পহিরৈ কবহূঁ ফাটি ন জাই ॥
জ্ঞান গুরূকা গূদড়ী সবদ গুরূকা ভেখ।
অতীত হমারী আতমা দাদূ পংথ অলেখ ॥

"হে দাদূ, "সবদ" (সঙ্গীত) হইল সূচ, প্রেম ধ্যান হইল সূতা, এই কায়াকেই করিলাম কন্থা, যোগী যুগ যুগ এই কন্থাই করেন পরিধান, ইহা কখনও ছিন্ন হইবার নহে।

জ্ঞানই হইল গুরুর (দেওয়া) কাঁথা, "সবদই" (সঙ্গীত) গুরুর ভেখ, আমার আত্মা হইল অতিথি (সন্ন্যাসী), হে দাদূ, পন্থ আমার অলেখ।"

চতুর্থ প্রকরণ—“সাধনা”

দ্বিতীয় (বাধার) অঙ্গ, “মন” অঙ্গ

কবীর হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যযুগের সকল সাধকই মনকে সাধনার প্রধান বাধা বলিয়াছেন। মনকে যদি ভৃত্যের মত চালাইয়া লওয়া যায় তবে সে বেশ কাজ করে, কিন্তু একটু অসামাল হইলেই, একটু প্রশ্রয় পাইলেই সর্ব্বনাশ। সে প্রভুর আসন দখল করিয়া বসিতে চায়। মন চমৎকার সেবক, তাহাকে প্রভু করিলেই সর্ব্বনাশ। কবীরের পূর্ব্বেও মনের এই দুর্ব্বৃত্তপনা সাধকদের জানা ছিল।

মন হইল সীমাযুক্ত, ক্ষুদ্র। অসীমের আসনে সে কি করিয়া বসিবে? কাজেই তখন সে কল্পনার দ্বারা ক্রমাগত হয় আপনাকে আবর্ত্তিত করিতে থাকে নয়তো বার বার রূপ বদলায় নয়তো আপনাকে গুণিত ও স্ফীত করিতে থাকে। এইখানেই সাধকের নিরন্তর অবধান চাই। মনের এই চাতুরী যদি ধরিতে না পারে তবে সাধকের সর্ব্বনাশ। কবীরও বলিয়াছেন “মনকে আঘাত করিয়া নিজ স্থানে রাখ। তাহাকে আপন স্থান ছাড়িয়া উচ্চ আসন অধিকার করিতে দিলেই সাধক মরিবে।” “মনকে মারিয়া হটাইয়া দাও।” ইত্যাদি।

দাদুর মতও প্রায় তাই। তিনি বলেন, “মনকে এই ঘটের মধ্যেই রাখ ঘিরিয়া। এই ঘটের মধ্যেই সে তার কাজ করুক। যদি মন নিজ আসন ছাড়িয়া উঠিতে চায় তবে তাহাকে আবার নিজ স্থানে দেও হটাইয়া। যে মনকে একটুও বিচলিত হইতে না দেয়, বীর হইল সেই। যে মনের আসন জানে ও পঞ্চেন্দ্রিয়ের সঙ্গে মনকে নিজ স্থানে নিযুক্ত রাখিতে পারে, সে আগম নিগম সবই আয়ত্ত করিতে পারে।”

মন যতক্ষণ স্থির না হয় ততক্ষণ ব্রহ্মপরশ হয় না। মনকে বশ করিবার সব উপায় যখন হয়রান হয় তখনও মনকে প্রেম দিয়া বশ করা যায়। মনও আবার যখন আপন চঞ্চলতায় শ্রান্ত হয় তখন চায় আশ্রয় পাইয়া স্থির হইতে; সমুদ্রে জাহাজের সঙ্গে চলিতে চলিতে শ্রান্ত কাক আসিয়া যেমন জাহাজে

বসিতে চায়। মন যেন কাগজের ঘুড়ি, শুষ্ক হইলে উড়ে আকাশে, কিন্তু প্রেমজলে ভিজিয়া আসে নামিয়া। প্রেমজলে ভিজিলে এই মন আর কোথাও দৌড়াইয়া যায় না।

মনের দাসত্ব করিয়া এই জীবন ব্যর্থ করিলাম, ভগবান যাতে প্রসন্ন হন এমন তো কিছুই করি নাই, এই সংসারে আমার আসাই ব্যর্থ হইল। স্বামীর আজ্ঞা অগ্রাহ্য করিয়া দাস মনেরই করিলাম সেবা, স্বামীর কাছে এখন কোন লজ্জায় দেখান যায় মুখ? স্বামীর সেবার আয়োজন যখন অন্যের সেবায় লাগাইলাম তখন সব জীবনই হইল ব্যর্থ? তখন এই জগতে আসিয়া যে খাওয়া দাওয়া সবই হইল ব্যর্থ বিলাসিতা, কারণ তখন যে আত্ম-সাধনা আত্ম-গৌরব হইতে ভ্রষ্ট হওয়ায় স্বাভাবিক সব অধিকার হারাইলাম। অন্যকে আর উপদেশ দিব কি, নিজেরই হইল না সাধনা। যদি তাঁর শরণ পাই তবেই মন স্থির হইবে, শান্ত হইবে। সমুদ্রের মাঝে থাকিয়াও ঝিনুক যেমন লবণাক্ত জল পান করে না, তাই তার অন্তরে হয় মুক্ত; আমিও যদি সংসারে থাকিয়া এই সংসারাতীত সুধারস পান করি তবে অন্তরে মুক্ত (মুক্তি অর্থে) লাভ করিব।

সকল দারিদ্র্য ভঞ্জন হইবে প্রেমে। ইন্দ্রিয়ের বশ হইয়া মন কাঙ্গাল হইয়া জীব জন্তু সবার কাছে বেড়ায় যাচিয়া। মন যদি বশ করি তবে এই কাঙ্গালপনা দূর হয়। অগ্নি ছাড়িয়া ধূম যেমন দশ দিকে ছড়াইয়া শেষ হইয়া যায় তেমনি ভগবান হইতে বিমুক্ত মন আপনাকে দশ দিকে ফেলে হারাইয়া।

মনের মধ্যে আমার বড় বেদনা। যত চেষ্টাই করি ভগবানের সঙ্গ ছাড়িয়া দশ দিকে মন কেবল দৌড়ায়। বৃথা অনেক বকিলে মন যায় বায়ুভূত হইয়া। সহজ হইয়া থাকিতে চাই। মন তো ধুইতে পারি না, কেবল দেহটাকেই জল দিয়া ধুইয়া ধুইয়া মারি। মন যদি নির্ম্মল হইত তবে হরি রঙ্গে মন অনুরক্ত হইত। ধ্যান করিয়াও লাভ নাই, কারণ তাহা হইলে বকেরা সবাই মুক্তিলাভ করিত। দেহের মলিনতা কত ধুইবে? দেহের ধর্ম্মই এই যে মলিন ধারা শত দিক দিয়া চলিবে। আচারেই বা ফল কি? আত্মাই যখন তনুমন ইন্দ্রিয় সহবাস করেন তখন ব্রাহ্মণ দেখিতেছি শূদ্র সঙ্গিনীকে লইয়া করেন ঘর। আচার তবে থাকে কোথায়? স্বামীর সঙ্গে যুক্ত হইয়া "দিল দরিয়াতে" ধুইতে পারিলেই যায় মলিনতা।

মনের এই চপলতাই স্বপ্ন দেখা। নিশ্চল যোগ যদি হয় তবেই সব স্বপ্ন হয় দূর। বাহিরের যা কিছু দেখি যা কিছু ভালবাসি সবই একের পর একে চিত্তের মধ্যে যায় ও মনকে চঞ্চল করিয়া তোলে।

প্রেমেতেও নিত্য নূতন সৃষ্টি কিন্তু তাহা স্বপ্নের মত অলীক চঞ্চল নয়, যদিও তাহা নিত্য নূতন। প্রেম তাহাকে জীবন্ত করিয়াছে, প্রেম তাহাকে সত্য দিয়াছে। প্রেমরস ধারাতে সিক্ত হইয়া সে নিত্য সবুজ হইয়া আছে। যদি প্রেমরস না থাকে তবেই সব শুষ্ক হইয়া যায়। মনে যদি প্রেম না থাকে তবে কায়াতে যৌবন থাকিলেও মন জীর্ণ বুড়া হইয়া যায়। যেখানে যাহার প্রেম সেখানে তাহার বিশ্রাম, সেখানেই তার নিত্যানন্দ। যেখানে প্রেম সেখানেই যোগ। যেখানে প্রেম নাই সেখানে কোনো যোগই নাই। সীমা অসীম যেখানেই প্রেম কর সেখানেই তোমার যোগ, সেখানেই তোমার আনন্দ, সেখানেই তোমার সব ক্লান্তির অবসান।

সাধনাতে সবারই পদস্খলন হয়, অসাবধান হইলেই পা পিছলায়। সবারই মন মাঝে মাঝে আসে নাবিয়া। মোমিন মীর সাধু পীর সবাইকেই মন মাঝে মাঝে মারে। ভয় পাইয়াও সাধনায় অগ্রসর হও, আহত মন আবার জীবন্ত হইয়া উঠিবে। সব সাধকেরই তাই হয়।

মনের বিপদ যে সে পূজা সম্মান পাইলে বড় আনন্দে সেখানে মরিতে যায়। সে তখন ভগবানকেও ছাড়িতে পারে। এইখানে সাধককে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। এই আদর সম্মানের কাছে বহু সাধক প্রাণ দিয়াছেন। যখন ভগবান হইতে আমার স্বতন্ত্র ঘর স্বতন্ত্র স্থিতি ঘুচিবে তখনই এই ভয় ঘুচিবে। তখন ভয়ের মধ্যেই গিয়া বসিতে পারিব। তিনিই আমার অভয় ধাম। তিনি সকল ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয়। সেখানে নত হইল সব জীবন হয় নত। সেখানে বাণী পাইলে সকল জীবন কয় কথা, সেখানে দেখিলে সেখানে শুনিলে সকল জীবন দেখে ও শোনে।

মনেই মরণ আবার মন দিয়াই জীবন লাভের সাধনা। মনই জ্যোতি মনই তেজ। যদি মনকে সাধনায় লাগাইতে জানি তবে মন দিয়াই মন হয় স্থির, মন দিয়াই হয় যোগ লাভ।

মনকে বশ কর।

যহু মন বরজী বাররে ঘটমৈঁ রাখী ঘেরি ।
মন হস্তী মাতা বহৈ অংকুস দে দে ফেরি ॥
জহঁা থৈ মন উঠি চলৈ ফেরি তহঁাহী রাখী ।
তহঁ দাদূ লর লীন করি সাধু কহৈঁ গুরু সাখী ॥
সোই সূর জে মন গহৈ নিমিখ ন চলনে দেই ।
জবহীঁ দাদূ পগ ভরৈ তবহীঁ পকড়ি লেই ॥
জেতী লহরি সমংদকী মনহ মনোরথ মারি ।
বৈসৈ সব সংতোখ করি গহি আতম এক বিচারি ॥
দাদূ জব মুখ মহঁ বোলতা স্রবণহুঁ সুনতা আই ।
নৈনহুঁ মহঁ সো দেখতা সো অংতরি উরঝাই ॥
মনকা আসন জে জির জানৈ ঠৌর ঠৌর সব সূঝৈ ।
পংচৌ আনি এক ঘরি রাখৈ অগম নিগম সব বূঝৈ ॥

"এই মনকে থামা, ওরে পাগল, ঘটের মধ্যেই একে রাখ্ ঘিরিয়া, মন মত্ত হস্তী চলিয়াছে ধাইয়া, অঙ্কুশ মারিয়া মারিয়া তাহাকে আন্ ফিরাইয়া।

যেখান হইতে মন উঠিয়া চলে, ফিরাইয়া তাকে সেখানেই রাখ্, হে দাদূ, তাকে সেখানেই প্রেম যোগে কর্ লীন, গুরুসাক্ষী সাধু এই কথা বলেন।

সে-ই শূর, মনকে যে রাখিতে পারে ধরিয়া, এক নিমেষ যে তাকে দেয় না চলিতে ; যখনই সে এক পা চলিতে হয় প্রবৃত্ত, হে দাদূ, তখনি যে তাকে ফেলে ধরিয়া।

সমুদ্রের যত লহর মনের তত খেয়াল ও কল্পনাকে (সেই শূর) মারিয়া এক আত্মবিচার গ্রহণ করিয়া সব সন্তোষ করিয়া সে বসে।

হে দাদূ, যখন মন মুখে বলিতে শ্রবণে শুনিতে বা নয়নে দেখিতে প্রবৃত্ত হয় তখন তাহাকে অন্তরের মধ্যে রাখ্ দৃঢ় বদ্ধ করিয়া।

যে জন মনের ঠিক আসন জানে, (সব বস্তুকেই যার যার) ঠাঁইয়ে ঠাঁইয়ে সে দেখিতে পায়, সে পাঁচটি ইন্দ্রিয়কেই আনিয়া এক ঘরে রাখে এবং অগম নিগম সব তত্ত্বই পারে বুঝিতে।"

প্রেমেই স্থিরতা পায় ঃ

জব লগ যহু মন থির নহীঁ তব লগ পরস ন হোই ।
দাদূ মনৱাঁ থির ভয়া সহজি মিলৈগা সোই ॥
জব অংতরি উরঝ্যা এক সৌঁ তব থাকে সকল উপাই ।
দাদূ বেধ্যা প্রেমরস তব চলি কহীঁ ন জাই ॥
কউৱা বোহিত বৈসি করি মংঝি সমংদা জাই ।
উড়ি উড়ি থাকা দেখি তব নিহচল বৈঠা আই ॥
যহু মন কাগদকী গুড়ী উড়ি কর চঢ়ী অকাস ।
দাদূ ভীঁগৈ প্রেমজল তব আই রহৈ হম পাস ॥
তব সুখ আনংদ আতমা জে মন থির মেরা হোই ।
দাদূ নিহচল রাম সৌঁ জে করি জানৈ কোই ॥
মন নিরমল থির হোত হৈ রাম নাম আনংদ ।
দাদূ দরসন পাইয়ে পূরণ পরমানংদ ॥
মন সুধ স্যাবত আপনা নিহচল হোৱৈ হাথ ।
তৌ ইহাঁ হী আনংদ হৈ সদা নিরংজন সাথ ॥
জ্যোঁ জল পৈসৈ দূধমৈঁ জ্যোঁ পানীমৈঁ লূণ ।
ঐসৈঁ আতম রাম সৌঁ মন হঠ সাধৈ কূণ ॥

“যে পর্য্যন্ত মন না হয় স্থির সে পর্য্যন্ত (তাঁহার সঙ্গে) হয় নাই পরশ । হে দাদূ, মনটি যখন হইল স্থির, তখন সহজেই আসিয়া তিনি মিলিবেন ।

যখন অন্তর বাঁধা পড়িল সেই একের সঙ্গে, তখন সকল উপায় গেল হয়রান হইয়া ব্যর্থ হইয়া । হে দাদূ, যখন প্রেমরসে হইল বিদ্ধ, তখন আর কোথাও যাইবে না চলিয়া ।

জাহাজে বসিয়া কাক চলিল মধ্যসমুদ্রে, উড়িয়া উড়িয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িল দেখিয়া আবার আসিয়া তখন বসিল তাহাতে নিশ্চল হইয়া ।

এই মন কাগজের ঘুড়ি, উড়িয়া চলিল আকাশে, হে দাদূ, প্রেমরসে যখন ঘুড়ি ভিজিল, তখন আবার আসিয়া রহিল আমার কাছে ।

মন যদি আমার হয় স্থির, তবেই আত্মা সুখময় ও আনন্দময়। হে দাদূ, ভগবানের সঙ্গে এই মনই রহে নিশ্চল হইয়া, যদি কেহ জানে সেই সাধনা।

মন যদি নির্ম্মল ও স্থির হয় তবেই ভগবানের নামে হয় আনন্দ। হে দাদূ, তবেই পাইবে দর্শন, তবেই পূর্ণ পরমানন্দ (অথবা, তবেই পূর্ণ পরমানন্দের পাইবে দরশন)।

তবেই মন হয় শুদ্ধ অখণ্ডিত ও আপন যদি সে হয় "নিশ্চল" শান্ত ও করায়ত্ত; তবে এখানেই নিরঞ্জনের নিত্য সাহচর্য্য, এখানেই নিত্যানন্দ।

জল যেমন দুধে হয় অনুপ্রবিষ্ট, জলে যেমন নুন হয় বিলীন, এমন করিয়া যদি রামের মধ্যে আত্মা হয় প্রবিষ্ট তবে মন আর করিতে পারে কোন্ হঠকারিতা?"

ব্যর্থ জনম।

সো কুছ হমথৈঁ না ভয়া জা পরি রীঝৈ রাম।
দাদূ ইস সংসারমেঁ হম আয়ে বেকাম॥
জা কারনি জগি জীজিয়ে সো পদ হিরদৈ নাহিঁ।
দাদূ হরিকী ভগতি বিন ধ্রিগ জীবন জগ মাহিঁ॥
কীয়া মনকা ভাঁৱতা মেটী আগ্যাকার।
কা লে মুখ দিখলাইয়ে দাদূ উস ভরতার॥
ইংদ্রী স্বারথ সব কিয়া মন মাঁগৈ সো দীন্হ।
জা কারনি জগি সিরজিয়া সো দাদূ কছূ ন কীন্হ॥
কীয়া থা ইস কাম কোঁ সেৱা কারণি সাজ।
দাদূ ভূলা বংদগী সর্‌য়া ন একৌ কাজ॥
দাদূ বিষৈ বিকার সোঁ জব লগ মন রাতা।
তব লগ চীতি ন আৱৈ ত্রিভুৱনপতি দাতা॥
দাদূ সব কুছ বিলসতাঁ খাতাঁ পীতাঁ হোই।
দাদূ মনকা ভাৱতা, কহি সমাঝাৱৈ কোই॥

"সে সব কিছুই আমা হইতে হইল না (কিছুই করা হইল না) যাহাতে রাম হন তুষ্ট ও তৃপ্ত; হে দাদূ, এই সংসারে আমি কেবল বৃথাই আসিলাম।

যে জন্য জগতে বাঁচিয়া থাকা, সেই "পদ" (বস্তু) নাই হৃদয়ে ; হে দাদূ, হরির ভক্তি বিনা ধিক্ জীবন এই জগতের মধ্যে।

মনেরই কেবল মন জোগাইলাম ("মনের ইষ্ট বা প্রিয়ই সাধনা করিলাম" এই অর্থও হইতে পারে) ; (প্রভুর) আজ্ঞা করিলাম লঙ্ঘন, ওরে দাদূ, কেমন করিয়া মুখ দেখাইবি সেই স্বামীকে ?

ইন্দ্রিয় স্বার্থই করিয়াছি সব কিছু, মন যাহা চাহিয়াছে তাহাই তাহাকে দিয়াছি ; যে জন্য আমার এই জগতের (মাঝে) হইল সৃষ্টি, আমি দাদূ তাহার করিলাম না কিছুই।

এই (তাঁর) কাজের জন্যই সেবার জন্যই করিয়াছিলাম সব সাজ ; যেই দাদূ ভুলিল "বন্দগী" (ভক্তি, সেবা, প্রণতি), আর একটি কাজও তার হইল না সিদ্ধ।

হে দাদূ, বিষয়বিকারে যতদিন মন রহিয়াছে মত্ত ততদিন ত্রিভুবনপতি দাতা এই চিত্তে আসেনই না।

(তাঁহার সেবায় বিমুখ হইয়া) হে দাদূ, যে কিছু বিলাস উপভোগ যে কিছু আহার বিহার সে সব যে এই মনেরই ইষ্টসাধনা একথা কে কহিয়া বুঝাইবে ?"

সাচ্চা উপদেশ চাই।

জো কুছ ভাবৈ রামকোঁ সো তত কহি সমঝাই।
দাদূ মনকা ভাৱতা সব কী কহৈ বনাই॥
কা পরমোধৈ আনকো আপন বহিয়া জাত।
ঔরোঁ কোঁ অম্রিত কহৈ আপন হী বিষ খাত॥
পংচৌ যে পরমোধি লে ইনহীঁ কোঁ উপদেস।
যহু মন অপনা হাথি করি তব তেরা সব দেস॥
সহজ রূপ মনকা ভয়া দ্বৈ দ্বৈ মিটী তরংগ।
তাতা সীতা সম ভয়া তব দাদূ একৈ অংগ॥
বহুরূপী মন তব লগৈঁ জব লগ মায়া রংগ।
দাদূ যহু মন থির ভয়া অবিনাসী কে সংগ॥

পাকা মন ডোলৈ নহীঁ নিহচল রহৈ সমাই।
কাচা মন দহ দিসি ফিরৈ চংচল চহুঁ দিসি জাই॥
সীপ সুধারস লে রহৈ পিবৈ ন খারা নীর।
মাহৈঁ মোতী উপজৈ দাদূ বংদ সরীর॥

"হে দাদূ, সকলের মনের পছন্দমত প্রিয়কথা সবাই বলে বানাইয়া বানাইয়া। যাহা কিছু ভগবানের প্রিয় সেই তত্ত্ব বল বুঝাইয়া।

কি প্রবোধ দিস্ অন্যকে, নিজেরটাই যাইতেছে বহিয়া! অন্য সবাইকে বলিস অমৃত, নিজেই কিন্তু খাস্ বিষ!

এই পাঁচটিকে (আপন ইন্দ্রিয়কে) নে প্রবুদ্ধ করিয়া, ইহাদিগকেই দে উপদেশ, এই মনকে কর আপনার হাতে, তবে সব দেশই (সমস্ত পৃথিবী) হইয়া যাইবে তোর আপনার!*

যখন সহজরূপ হইয়া গেল মনের দ্বৈতের সব তরঙ্গ গেল মিটিয়া, তপ্ত ও শীতল হইয়া গেল সমান, তখন দাদূ মন হইয়া গেল তাঁর সঙ্গে এক অঙ্গ।

যতক্ষণ চলিয়াছে মায়ার রঙ্গ ততক্ষণই এই মন বহুরূপী; হে দাদূ, অবিনাশীর সঙ্গলাভ যেই করিল এই মন তখনি (আপনা হইতেই) হইল সে স্থির।

পাকা মন করে না টলমল, সে ডুবিয়া রহে নিশ্চল হইয়া, কাঁচা মন দশদিকে বেড়ায় ঘুরিয়া, চঞ্চল হইয়া ফেরে চতুর্দিকে।

শুক্তি সুধারস গ্রহণ করিয়াই রহে বাঁচিয়া, ক্ষার জল সে কখনই করে না পান; হে দাদূ, তাই তো তার শরীরের মাঝে উপজে মুক্তা।"

ইন্দ্রিয়জয়ে ও প্রেমে দারিদ্র্য ভঞ্জন।

বিনা প্রেম মন রংক হৈ জাচৈ তিনউ লোক।
মন লাগা জব সাঁঈ সৌঁ ভাগে দরিদ্দর শোক॥
ইংদ্রীকা আধীন মন জীব জংত সব জাচৈ।
তিণেঁ তিণেঁ কে আগৈঁ দাদূ তীনোঁ লোক ফিরি নাচৈঁ॥

---

* কেহ কেহ বলেন—"তব চেলা সব দেশ" অর্থাৎ সমস্ত দেশই হইবে তোমার চেলা।

ইংদ্রী অপনে বসি করৈ কাহে জাঁচণ জাই।
দাদূ অস্থির আতমা আসনি বৈসৈ আই॥
অগিনি ধূম জ্যোঁ নীকলৈ দেখত সবৈ বিলাই।
ত্যোঁ মন বিছুট্যা রাম সৌঁ দহ দিসি বীখরি জাই॥

"প্রেম বিনা মন কাঙ্গাল, তিন লোকেই বেড়ায় সে যাচিয়া; মন যেই লাগিল স্বামীর সঙ্গে, অমনি পালাইল যত দারিদ্র্য যত শোক।

ইন্দ্রিয়ের অধীনে মন জীবজন্তু সবার কাছেই বেড়ায় যাচিয়া; "তৃণের তৃণের" (যত হীন ও নীচ তুচ্ছের) আগে তখন, হে দাদূ, তিনলোকে সে ফেরে নাচিয়া (আত্মাকে করে বিড়ম্বিত)।

আপন ইন্দ্রিয়ই যদি কেহ করে বশ তবে কেন আর সে যাইবে যাচিতে? হে দাদূ, স্থির আত্মা তখন আপন আসনে আসিয়া বসে (শান্ত হইয়া)।

অগ্নি হইতে ধূম যেমনই আসে বাহির হইয়া অমনি দেখিতে দেখিতেই সব ধূমটাই যায় দশদিকে ছড়াইয়া বিলীন হইয়া, তেমনি ভগবান হইতে মন যেই হয় বিচ্ছিন্ন অমনি দশদিকে যায় সে ছন্নছাড়া হইয়া!"

বাক্যে, ধ্যানে বা আচারে মন শুদ্ধ হয় না।

দাদূ মেরা জিব দুখী রহৈ ন রাম সমাই।
কোটি জতন করি করি মুয়ে যহু মন দহ দিসি জাই॥
য়হু মন বহু বকবাদ সৌঁ বায়ুভূত হ্‌ৱৈ জাই।
দাদূ বহুত ন বোলিয়ে সহজৈঁ রহৈ সমাই॥
পানী ধোরৈঁ বাৱরে মনকা মৈল ন ধোই।
দাদূ নিরমল শুদ্ধ মন হরি রঁগি রাতা হোই॥
ধ্যান ধরেঁ কা হোত হৈ জে মন নহিঁ নিরমল হোই।
তৌ বগ সবহীঁ উধরৈঁ জে ইহি বিধি সীঝৈ কোই॥
নউ দুৱারে নরককে নিস দিন বহৈ বলাই।
সৌচ কহাঁ লৌঁ কীজিয়ে রাম সুমিরি গুণ গাই॥

প্রাণী তনমন মিলি রহ্যা ইংদ্রী সকল বিকার।
দাদূ ব্রহ্মা সূদ্র ঘরি কহাঁ রহৈ আচার ॥
কালে থৈঁ ধোলা ভয়া দিল দরিয়া মেঁ ধোই।
মালিক সেতী মিলি রহ্যা সহজৈঁ নিরমল হোই ॥

"হে দাদূ, আমার প্রাণ বড় দুঃখী ভগবানে সে রহে না ডুবিয়া। কোটি যতন করিয়া করিয়া মরিলাম তবু এই মন শুধু ধায় দশ দিকে।

বহু বক্ বক্ করিয়া এই মন যায় বায়ুভূত হইয়া; হে দাদূ, অনেক বকিও না, সহজেই থাক সমাহিত হইয়া।

জলেতে ধুইতেছে পাগলেরা, মনের ময়লা যে তাতে যায় না ধোয়া! হরি রঙ্গে অনুরক্ত হইলে, হে দাদূ, মন হয় নির্ম্মল ও শুদ্ধ। (অথবা, নির্ম্মল শুদ্ধ মন হরিরঙ্গে হয় রঞ্জিত)।

ধ্যান ধরিয়া ফল হয় কি, যদি মন না হয় নির্ম্মল? এই উপায়ে যদি কেহ সিদ্ধ হইত তবে সব বকই পাইয়া যাইত উদ্ধার।

(ইন্দ্রিয়ের) নয় দ্বারেই নিশিদিন বহিয়া যাইতেছে নরকের বালাই। কত দূর পর্য্যন্ত শৌচ করিতে পার? ভগবানকে স্মরণ করিয়া তবে কর তাঁর গুণগান।

আত্মা আছে তনুমনের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সকল বিকারের সঙ্গে মিলিয়া। হে দাদূ, ব্রহ্মাই (ব্রাহ্মণ) যদি করিলেন শূদ্র-ঘর, আচার তবে আর রহিল কোথায়?

দিল দরিয়াতে (হৃদয়-সাগরে) ধুইয়া কালো হইতে হইল ধলা; সহজেই নির্ম্মল হইয়া স্বামীর সঙ্গে রহিল মিলিয়া।"

চঞ্চলতার স্বপ্ন।

সুপিনা তব লগ দেখিয়ে জব লগ চংচল হোই।
জব নিহচল লাগা নারসৌঁ তব সুপিনা নাহীঁ কোই ॥
জাগত জহঁ জহঁ মন রহৈ সোরত তহঁ তহঁ জাই।
দাদূ জে জে মনি বসৈ সোই সোই দেখৈ আই ॥
দাদূ মরমি চিতি জে বসৈ সো পুনি আবৈ চীতি।
বাহরি ভীতরি দেখিয়ে জাহী সেতী প্রীতি ॥

"সে পর্য্যন্ত স্বপ্ন যায় দেখা যে পর্য্যন্ত (মন) থাকে চঞ্চল। নিশ্চল হইয়া যেই লাগিল নামের সঙ্গে, সেই আর কোনো স্বপ্নই নাই (জপ সাধনে মন হয় নিশ্চল)।

জাগ্রত অবস্থায় যেখানে যেখানে থাকে মন, সুপ্ত অবস্থায়ও সেখানে সেখানেই সে যায়। হে দাদূ; যাহা যাহা মনে করে বাস, তাহা তাহাই দেখে সে আসিয়া।

হে দাদূ, যাহা যাহা (অচেতন গভীর) মর্ম্মচিত্তে করে বাস তাহা তাহা আবার চেতনায় আসিয়া হয় উপস্থিত; যাহার সঙ্গে মনে মনে আছে প্রীতি, ভিতরে তাকেই যায় দেখা।"

যেখানে প্রেম সেখানেই জীবন্ত মন, সেখানেই জীবন ও বিশ্রাম।

সাৱনি হরিঅরি দেখিয়ে মন চিত ধ্যান লগাই।
দাদূ কেতে জুগ গয়ে তৌভী হরা ন জাই॥
দাদূ মন পংগুল ভয়া সব রস গয়া বিলাই।
কায়া হৈ নৱ জ্বান য়হ মন বূঢ়া হোই জাই॥
জিসকী সুরতি জহাঁ রহৈ তিসকা তহঁ বিস্রাম।
ভাৱৈ মায়া মোহ মেঁ ভাৱৈ আতম রাম॥
জহাঁ সুরতি তহঁ জীৱ হৈ জহঁ নহীঁ তহঁ নাহিঁ।
গুণ নিরগুণ জহঁ রাখিয়ে দাদূ ঘর বন মাহিঁ॥
জহাঁ সুরতি তহঁ জীৱ হৈঁ আদি অংত অস্থান।
মায়া ব্রহ্ম জহঁ রাখিয়ে দাদূ তহঁ বিস্রাম॥
জহঁ সুরতি তহঁ জীৱ হৈ জিৱন মরণ জিস ঠৌর।
বিষ অমৃত জহঁ রাখিয়ে দাদূ নাহীঁ ঔর॥
জহঁ সুরতি তহঁ জীৱ হৈ জহঁ চাহৈ তহঁ জাই।
অগম গম জহঁ রাখিয়ে দাদূ তহাঁ সমাই॥

"(প্রেম থাকিলে) মন চিত্ত ধ্যান লাগাইয়া শ্রাবণের হরিত শোভা দেখ চাহিয়া, হে দাদূ, কত যুগ গেল তবুও তো গেল না সেই হরিত শোভা।

(প্রেমের অভাবে) হে দাদূ, মন হইয়া যায় পঙ্গু, সব রসই যায় বিলয় হইয়া। এই কায়া রহে নব-যৌবন, অথচ মন হইয়া যায় বৃদ্ধ জীর্ণ।

যেখানে যার প্রেম সেখানে তার বিশ্রাম, চাই মায়ামোহেতেই হউক চাই আত্মারামেরই হউক।

যেখানে প্রেম সেইখানেই তার জীবন, যেখানে প্রেম নাই সেখানে জীবনও নাই। হে দাদূ, সে প্রেম সগুণ নির্গুণ সেখানেই কেন না রাখ, ঘরের মাঝে বনের মাঝে যেখানেই তাহাকে রাখ না কেন, সেখানেই যথার্থ জীবন।

আদি অন্ত স্থান যেখানেই প্রেম আছে সেখানেই আছে জীবন। হে দাদূ, মায়া ব্রহ্ম সেখানেই প্রেমকে রাখ, সেখানেই বিশ্রাম।

জীবন মরণ যেখানেই প্রেমকে রাখ, যেখানে প্রেম সেখানেই জীবন। বিষ অমৃত যেখানেই রাখ না কেন, ইহার আর অন্যথা নাই।

যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাও, যেখানে প্রেম সেখানেই জীবন। প্রেমকে অগম্য গম্য যেখানেই রাখ, হে দাদূ, সেখানেই জীবন বহে ভরপূর পূর্ণ হইয়া।"

মন না থাকিলে সকলেরই পদস্খলন হয়।

বরতণি একৈ ভাঁতি সব দাদূ সংত অসংত।
ভিন্ন ভাব্র অংতর ঘণা মনসা তহঁ গচ্ছংত॥
পাকা কাচা হোই গয়া জীতা হারৈ দাব্র।
অংতি কাল গাফিল ভয়া দাদূ ফিসলে পাঁব্র।
য়হু মন পংগুল পংচ দিন সব কাহূকা হোই।
দাদূ উতরি অকাস থৈঁ ধরতী আয়া সোই॥
ঐসা কোঈ নাহিঁ * মন মরৈ সো জীবৈ নাহিঁ।
দাদূ ঐসে বহুত হৈঁ ফিরৈঁ জী মৃতু মাহিঁ॥

"বাহিরের আচার ব্যবহারে (বা বাহ্য আয়তনে, দেহে) তো সবাই দেখিতে একই প্রকারের (সাধু ও অসাধু সকলেরই বাহ্যরূপ ও আচরণ তো একই মত); যেই অন্তরে ঘনায় ভিন্ন ভাব অমনি মন মানস দৌড়াইয়া যায় সেই সেই খানে।

---

* "নাহিঁ" স্থানে "এক" পাঠও আছে। অর্থ "এমন মন ক্বচিত একটি মেলে", ইত্যাদি।

পাকা (গুটি)ও হইয়া যায় কাঁচা। জেতা দাঁওও যায় হারা হইয়া, অন্তকালে একটুখানি গাফিল হইল কি পিছলাইল পা।

সবাকারই এই মন পাঁচ দিন (এক এক সময়) হইয়া যায় পঙ্গু। হে দাদূ, অমনি আকাশ হইতে নাবিয়া সে মাটিতে পড়ে আসিয়া।

এমন কোনো মনই নাই যাহা মরে কিন্তু আর বাঁচে না। হে দাদূ, এমন অনেকেই আছে যাহারা জীবন মৃত্যুতে বেড়ায় ফিরিয়া (অর্থাৎ জীবন হইতে মৃত্যুতে ও মৃত্যু হইতে জীবনে ক্রমাগত করে যাতায়াত)।”

মনের দুর্ব্বলতা ঃ

পূজা মান বড়াইয়াঁ আদর মাঁগৈ মন্ন।
রাম গহৈ সব পরহরৈ সোঈ সাধূ জন্ন॥
জহঁ জহঁ আদর পাইয়ে তহঁ তহঁ মন জাই।
বিন আদরকা রাম রস ছাড়ি হলাহল খাই॥

“মন চায় পূজা, মান, বড়াই (বড় পদ), আদর। এই সব পরিহার করিয়া যে রামকে করে গ্রহণ সে-ই তো সাধুজন।

যেখানে যেখানে পায় আদর সেখানে সেখানেই যায় মন। বিনা-আদরের রাম রস ছাড়িয়াও সে খায় (আদরের) হলাহল।”

তিনিই মনের মন, সর্ব্বজ্ঞ ঃ

অব মন নিরভৈ ঘর নহিঁ ভয় মৈঁ বৈঠা আই।
নিরভয় সংগ থৈঁ বিছুট্যা সোই কায়র হো জাই॥
দাদূ মনকে সীস মুখ হস্ত পাঁৱ হৈ পীৱ।
শ্রবণ নেত্র রসনা রটৈ দাদূ পায়া জীৱ॥
জহঁকে নমায়ে সব নমৈ সোঈ সির করি জাণি।
জহঁকে বোলায়ে বোলিয়ে সোঈ মুখ পরৱাণি॥
জহঁকে সুনায়ে সব সুনৈ সোঈ শ্রবন সয়ান।
জহঁকে দেখায়ে দেখিয়ে সোঈ নৈন সুজান॥

“এখন তো মন নির্ভয়; এখন সে আর ঘর বা আশ্রয় খুঁজিতেছে না, সে

এখন ভয়ের মধ্যেই আসিয়া আছে বসিয়া। এই নির্ভয়-সঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে সেই মনই আবার হইয়া যায় ভীরু।

হে দাদূ, প্রিয় তমই হইলেন মনের মাথা, মুখ, হস্ত, পদ ; (তাঁকে পাইলে) শ্রবণ, নেত্র, রসনা সবাই ঘোষণা করে যে দাদূ পাইয়াছে জীবনকে।

যেখান দিয়া নমিলে সবই তোমার হয় পূর্ণ প্রণত সে-ই তো মাথা বলিয়া জানি। যেখান দিয়া বলিলে তোমার সকল জীবন বলে পূর্ণবাণী সেই তো তোমার সত্য মুখ।

যেখানে, শুনাইলে সব শোনে পূর্ণ বিশ্ববাণী, সেই তো সচেতন' শ্রবণ ; যেখানে দেখাইলে সবই হয় দৃষ্ট, সেই তো সুজ্ঞান নয়ন।"

সহায় করিতে জানিলে মনই সাধনায় মস্ত সহায়ঃ

মনহীঁ মরনা উপজৈ মনহীঁ মরনা খাই।
মন অবিনাসী হ্বৈ রহ্যা সাহিব সৌঁ ল্যৌ লাই ॥
মনহীঁ সনমুখ নূর হৈ মনহীঁ সনমুখ তেজ।
মনহীঁ সনমুখ জ্যোতি হৈ মনহী সনমুখ সেজ ॥
মনহীঁ সৌঁ মন থির ভয়া মনহীঁ সৌঁ মন লাই।
মনহীঁ সৌঁ মন মিলি রহ্যা দাদূ অনত ন জাই ॥

"মনই মরণ করে উৎপন্ন, আবার মনই মরণকে খায় ; স্বামীর সঙ্গে প্রেম-যোগে যুক্ত হইয়া এই মনই আবার হইয়া যায় অমৃত।

মনই প্রত্যক্ষ আলো, মনই প্রত্যক্ষ তেজ ; মনই প্রত্যক্ষ জ্যোতি, মনই প্রত্যক্ষ প্রদীপ।

মন দিয়াই মন হইল স্থির, মন দিয়াই (সেই পরম) মনকে গেল আনা। সেই মনের সঙ্গেই মন রহিল মিলিয়া, হে দাদূ, অন্যত্র (আর কোথাও) সে তো তখন যায় না।"

চতুর্থ প্রকরণ—সাধনা

তৃতীয় অঙ্গ—মায়া অঙ্গ

দাদূর মতে মায়া স্বপনের মত। যতক্ষণ নিদ্রিত আছি ততক্ষণ সে আছে। যথার্থ সত্য আছেন একমাত্র ভগবান। আমিও যে আছি, সে কেবল তাঁর মধ্যেই, তাঁকে ছাড়িয়া আমিও নাই। মৃগতৃষ্ণার মত ঝিলমিলি প্রকাশ দেখিয়া অবোধেরা মায়াকে মনে করে সত্য। মায়া ও প্রকৃতির এই মিথ্যা শক্তিকে যে মিথ্যা ব্যবহারে লাগাইয়াছে সে এই ঝুঠা শক্তির অহঙ্কারেই গর্ব্ব-স্ফীত হইয়া সৃষ্টিকর্ত্তাকে করিয়াছে অস্বীকার, তাহারা শাক্ত, শক্তিকেই তাহারা সত্য বলিয়া জানে, তার চেয়ে বড় সত্যের পরিচয় তাহারা জানে না।

দাদূ অক্ষর-পণ্ডিতদিগকে বেশী আমল দেন নাই। যাঁহারা সাধক, সত্যদ্রষ্টা, রসিক ও মরমলোকে যাঁহাদের যাতায়াত, তাঁহাদেরই তিনি সম্মান করেন। অক্ষর-পণ্ডিতেরা রূপ রাগ গুণ অনুসারে মায়ারই পিছে বেড়ান ঘুরিয়া।

শক্তি বা ঐশ্বর্য্য দেখিয়া সাধক কখনও ভোলেন না। ঐশ্বর্য্যের রাজদ্বার ছাড়িয়া তাঁহারা অন্তরে প্রবেশ করিয়া ব্রহ্মেতে সব অন্বেষণ করেন। মায়া ও ব্রহ্ম, মিছা ও সাচা, এই দুইয়ের সেবা এক সঙ্গে চলে না। দুই রাজার রাজত্বে কোনো কল্যাণ নাই।

মায়ার বিরুদ্ধে যে দাদূ এই অঙ্গে এতখানি লিখিয়াছেন তাহাতে ইহা বুঝিতে পারা যাইবে, যে যে হেতুতে মায়া সাধনাতে বাধা হয় তাহার কথাই এখানে দাদূ লিখিয়াছেন। মায়াকে আমরা তার স্বরূপ ভুল করিয়া ধরিতে যাই বলিয়াই মিথ্যা করি। তাহার আপন ক্ষেত্রে সে-ও সত্য, কিন্তু আমরা তাহার ক্ষেত্র ছাড়াইয়া তাহাকে স্বীকার করিতে গিয়াই তাহাকে মিথ্যা করিয়া তুলি। এই দোষ মায়ার ততটা নহে যতটা আমাদের মিথ্যা জ্ঞানের।

দাদূ বলিতেছেন, "জল স্থল সবই আমি স্বীকার করি এবং গ্রহণ করি তোমার প্রসাদ বলিয়া। মায়া নিত্য সত্য বলিলেই সব হইত মিথ্যা।"

"ভগবানের ইচ্ছাই ভাল। আমাদের সংশয়বুদ্ধির দ্বারা দিনকে করি রাত। এমন করিয়াই আমরা নিজেরা মায়াকে মিথ্যা করিয়া পড়ি বিপদে।"

দাদূ বলিয়াছেন, "ব্রহ্মের রাজত্বে মায়াকে তাঁর শরীক করিও না।"

"স্থূল কামনাই সব আকারকে নষ্ট করে।"

"যোগ, ঐশ্বর্য্য, এমন কি মুক্তিও আমাদের বাঁধে যখন তাহাতে আমাদের লোভ থাকে ; এ সবই হইল মায়ার কাজ।"

"মায়াই বসিল দেবতা হইয়া, লোকে তাহা বুঝিল না।"

ইহাতে বুঝি মায়া তার স্থান ছাড়াইয়াই মিথ্যা হয়। এই মায়ার সম্বন্ধে দাদূর নানাস্থানের লেখা দেখিলে বুঝি দাদূ মায়ায় সত্যদিকটাও জানিতেন। তবে তখনকার দিনের চতুর্দ্দিকের মতবাদের প্রভাব কিছু কিছু দাদূর মধ্যেও থাকার কথা। পারিপার্শ্বিক মতামতের সত্য মিথ্যার হাত হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকা সবার পক্ষেই কঠিন।

দাদূর মতে ভোগ ও কামনা হইল মায়ার দাসী। ঐশ্বর্য্যের লোভেও মায়ার দাস্য করিতে দেখা যায়। ইন্দ্রিয় প্রভৃতি স্বভাবতঃ অপবিত্র নয়। ভোগের দ্বারা কামনার দ্বারা আমরা তাহাদিগকে অপবিত্র করি। নহিলে তাহারাই সাধনাতে মস্ত সহায় হইতে পারিত। এই কাম ও ভোগের দোষেই পুরুষ ও নারী পরস্পরের শত্রু। নহিলে শুদ্ধ যোগ থাকিলে এমন দুর্গতি হইত না। দাদূ প্রভৃতি সাধুরা বিবাহিত জীবনের বিরুদ্ধবাদী ছিলেন না। ইহাঁদের মধ্যে প্রায় সাধুই বিবাহিত ও আদর্শ গৃহী।

কামনা কেবল যে ইন্দ্রিয় ও নরনারীকে নষ্ট করিয়াছে তাহা নহে। এই কামনা সকল আকার (form ও সৌন্দর্য্য) কেও ভোগ ও বিকারের দ্বারা নষ্ট করিয়াছে। দাদূ বড় উঁচুদরের সৌন্দর্য্য-রস-বেত্তা ছিলেন আর রূপ আকার ও সৌন্দর্য্যের মরম জানিতেন। তাহা হইতে সাধনাতেও যে বিপদ কেমন করিয়া ঘটে তাহাও তিনি জানিতেন। কামনাই রূপ ও আকারের এই পতন ঘটাইয়াছে। কামনার আগুনই দিবারাত্রি জগৎ শুদ্ধ সব কিছু জ্বালাইতেছে, নিজেও জ্বলিতেছে।

কামনায় জর্জর জীবের ভরষা প্রিয়তম ভগবানের সঙ্গ। অপবিত্রের সহবাসে যাহা অপবিত্র হইয়াছে পবিত্র সুন্দরের সহবাসে তাহা পরম সুন্দর

হইবে। তিনি ও তাঁহার যোগে বিশ্বজগতের সকলকে তুমি আপনার কর, তবে আর জগতের কাছে কোনো ভয় থাকিবে না। তাহা হইলে তোমার আপনার জগৎ তোমার পক্ষে অমৃতস্বরূপ হইবে। জগৎকে পর রাখিয়া যদি লুব্ধ কামুকের মত ভোগ করিতে যাও তবে তাহাই বিষজাল হইবে। ভগবান রক্ষাকর্ত্তা, প্রেম যোগে তিনি সকলকে রক্ষা করেন, যোগভ্রষ্ট হইলেই মৃত্যু আসিয়া আক্রমণ করে।

যোগের ও সাধনার ভাণ করিলেই কিছু সত্য লাভ হয় না। ভণ্ড সাধকরাও মায়ারই দাস, বাহিরে যদিও তাঁরা ভগবানের দাস বলিয়াই পরিচয় দিতে চান। তাঁহাদের অন্তরে মায়ার রাজত্ব, বাহিরেই তাঁহারা ত্যাগী; ছেঁড়া কাঁথা পরিয়া তাঁহারা এমন দৈন্য দেখাইয়া বেড়ান যে কেহই তাঁদের ঠিক চিনিতে পারে না। কেহ হয়তো অস্বাভাবিক রকমে কায়াকে ক্লিষ্ট করেন অথচ মন তাঁহাদের সব দিকেই বেড়ায় ঘুরিয়া। প্রিয়তমকে দেখাইবার নামে নিজেকেই বেড়ান দেখাইয়া। মুখে বেশ মিষ্ট, সকলেরই পছন্দসই কথা গুছাইয়া গুছাইয়া বলেন, অথচ যশের সুখের জন্য লুব্ধতা মনে মনে বেশ আছে। বাজারী লোকের কাছে এঁরাই মায়াত্যাগী নামে পরিচিত।

দাদূ বলেন, "আমি চাই প্রভুর দরশন, তাঁর সৌন্দর্য্যের রস; কত রং বেরঙ্গের বাজী দেখিতেছি কিন্তু যাহা চাই তাহা মিলিল কৈ? আমি যাহা চাই তাহা তোমরা তুচ্ছ মনে করিয়া দাও ফেলিয়া, আর আমি যাহা ফেলিয়া দিলাম তাহাই তোমরা আদর করিয়া নাও তুলিয়া! পরব্রহ্মকে ছাড়িয়া তোমাদের ক্ষুদ্র অহমিকাকেই তোমরা ভালবাসিলে!"

"মায়ারই দেখিতেছি জয়জয়কার। লোকে সৃষ্টিকর্ত্তাকে ছাড়িয়া তাঁহারই পূজায় করজোড়ে দাঁড়াইয়া। মায়া জগতের ঠাকুরাণী কিন্তু সাধকের কাছে দাসী। সাধকের দাসী মায়াই শক্তিলুব্ধ শাক্তের মাথার মুকুট। শাক্তেরা প্রকৃতি হইতেই সব শক্তি আদায় করিয়া শক্তিশালী হইতে চান কাজেই তাঁহাদের প্রকৃতির দাসত্ব করিতে হয়। মায়া এঁদেরই ভাঁড়াইতে পারে কিন্তু সাধকের কাছে লজ্জা পায়। মায়া জানে যে সে অসীম নহে, তাঁর আসনের দাবী তার নাই। তাই সে ক্রমাগত পরিবর্ত্তনে উজ্জ্বল নাম ধরিয়া ধরিয়া সুরনর সবাইকে মোহিত করিতে চাহে। সাধকদের কাছে এসব প্রবঞ্চনা

চলে না। যত বড় নামই দেওনা কেন তাঁরা সেই নামের মিথ্যা পর্দা সরাইয়া মায়ায় সত্যরূপটি ফেলেন ধরিয়া। আশ্চর্য্যের কথা এই যে লোকে বিষকে অমৃত বলিয়া খায় আর ইহাও বলে না যে এটা বিস্বাদ। মায়া নানা বেশে নানা রকমের লোককেই ঠকায়। যোগ নাম লইয়া মায়াই যোগীকে করে সত্যভ্রষ্ট, ধন নাম লইয়া ধনপতিদের করে সর্ব্বনাশ, মুক্তি নাম লইয়া ঠকায় মুক্তির কাঙ্গালদের।”

“ছদ্মবেশে প্রচ্ছন্ন এই মায়াই আবার বসে উপাস্য ভগবান হইয়া; তাহার এই প্রবঞ্চনা কেহই টের পায় না, তাহাকেই সত্য বলিয়া মানে, এই তো বড় আশ্চর্য্য। রামরূপ ধরিয়া সে বলে, ‘আমিই মোহন রায়।’ জগৎশুদ্ধ ইহাকেই অনন্ত মনে করিয়া করিতে যায় পূজা। মায়ারূপী রামের পিছেই সবাই ছুটিয়াছে। সাধনার নামে সবাই বসিয়া আছেন এই রামরূপী মায়ারই ধ্যানে; দাদূ কিন্তু আদি অনাদি অলখ ভগবানকেই চায়। ব্রহ্মার বিষ্ণুর ও শিবের সেবক আছে, কিন্তু অনাদি অনন্ত দেবতার সেবক কই? অঞ্জনকে নিরঞ্জন বলিলে; গুণকে গুণাতীত বলিলে, সীমাকে অসীম বলিলে মানিব কেন?”

তখনকার দিনে নানা মতের সগুণ দেবপংথী ভক্তেরা নানা যুক্তি ও বিচারে জোরে এই রকম উপদেশ দিতেছিলেন। হয় তো এখানে সে সব কথা দাদূর মনে আসিয়া থাকিবে।

দাদূ বলেন, “কৃত্রিম কাঠের গাই দিয়া কি কামধেনুর কাজ হয়? কাঁকরকে চিন্তামণি করিলে লাভ কি? মূর্খেরাই ইহাতে ঠকিয়া মরে মাত্র। পাষাণকে পরশমণি বলিলে লোহা সোনা হইবে কেন? সূর্য্যের কাজ কি স্ফটিকে করিতে পারে? পাষাণের মূর্ত্তি গড়িয়া কি সৃজনকর্ত্তা ভগবানকে পাইবে? বেদ বিধি ভরম করমে বদ্ধ হইয়া লোকেরা সীমার মধ্যে আটকা পড়িল, ভগবানের সাধনা আর হইল না। এই যে মস্ত ভ্রম ইহা লোকেরা চাহিয়া দেখে না, তাইতো সংসার ডুবিয়া মরিল।”

“ভণ্ড ও মিথ্যা সাধকেরা সত্য লইতে ভ্রষ্ট বলিয়াই নানা অস্বাভাবিক কৃচ্ছ্রাচার করে। যদিও তাহাতে কোনোই লাভ নাই। সত্য সাধকেরা সকল প্রকার লোভ ছাড়িয়াছেন বলিয়াই সব রকম বন্ধন হইতে মুক্ত। তাঁরা ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষও চান না, মুক্তিও চান না, অষ্টসিদ্ধি নবনিধিরও লোভ

তাঁদের নাই। ভগবানের প্রতি ভক্তিই একমাত্র তাঁরা চাহেন, তাই মায়া তাদের উপর কোনো প্রভুতাই করিতে পারে না। তাঁহাদের জীবনযাত্রা একান্ত সহজ ও স্বাভাবিক। মায়াকে তাঁরা একান্ত পরিহারও করেন না। ব্রহ্মকূলে বসিয়া তাঁরা মায়া নদীর প্রবাহ গ্রহণ করেন, অথচ লুব্ধের মত এই নদীর জলধারা বদ্ধ করিয়া নিজস্ব করিয়া সঞ্চয় করিতেও চাহেন না। নদীর মত তাঁহাদের সম্মুখ দিয়া মায়া সদাই চলে বহিয়া, মুক্ত হইয়া তাঁহারা এই নদীর শোভা সৌন্দর্য্য ও সেবা ভগবানের প্রেম মনে করিয়া সহজভাবে গ্রহণ করেন। প্রভুর দান তো নিত্যধারা নদীর মত সদাই বহিয়াই আসিতেছে, এই মর্ম্ম জানেন বলিয়াই দাদূ সঞ্চয় করেন না। তাঁর মধ্যে বসিয়া নিজে ভোগ করেন ও সকলকে ভোগ করিতে দেন।”

“যে সাধক, সে শ্রমের দ্বারা উপার্জ্জিত অন্ন ভগবানেরই দান ও প্রসাদ মনে করিয়া ভক্তির সহিত গ্রহণ করে।”

সত্য তিনিই, মায়ার ভরসা মিথ্যা।

সাহিব হৈ পর হম নহীঁ সব জগ আবৈ জাই।
দাদূ সুপিনা দেখিয়ে জাগত গয়া বিলাই॥
যহু সব মায়া-মিরিগ জল ঝূঠা ঝিলিমিলি হোই।
দাদূ চিলকা দেখি করি সতি করি জানা সোই॥
মায়া কা বল দেখি করি আয়া অতি অহঁকার।
অংধ ভয়া সূঝৈ নহীঁ কা করিহৈ সিরজনহার॥

“স্বামী আছেন, কিন্তু আমি নাই, সব জগৎ আসিতেছে আর যাইতেছে; হে দাদূ, স্বপন দেখিতেছ, জাগিতেই গেল বিলয় হইয়া।

এই সব মায়া মৃগতৃষ্ণার জল, মিথ্যাই দেখা যায় ঝিলিমিলি; হে দাদূ, চকমকানি দেখিয়াই ইহাকে সবাই মনে করিতেছে সত্য।

মায়ার (প্রকৃতির শক্তির) বল দেখিয়াই (সেই বলে বলী শাক্তের) মনে অবশেষে আসিল অতি অহঙ্কার; (অহঙ্কারে) অন্ধ হইল বলিয়া দেখিতেই পাইল না, মনে করিল, সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবান আর করিবেন কি?”

সাধক মায়াকে খাতির করে না ঃ

রূপ রাগ গুণ অনসরে জহঁ মায়া তহঁ জাই।
বিদ্যা অখির পংডিতা তহাঁ রহৈ ঘর ছাই ॥
সাধু ন কোঈ পগ ভরৈ কবহূঁ রাজ দুৱারি।
দাদূ উলটা আপমৈঁ বৈঠা ব্রহ্ম বিচারি ॥
দাদূ নগরী চৈন তব জব ইকরাজী হোই।
দোউরাজী দুখ দুংদ মঁ সুখী ন বৈসে কোই ॥

"রূপ রাগ গুণ অনুসরণ করিয়া যেখানে মায়া সেখানেই দেখি যায় সবাই। বিদ্যা ও অক্ষর-পণ্ডিতেরা সেখানেই ঘর ছাইয়া (বাঁধিয়া) করে বাস।

কোনো সাধু কখনও রাজদ্বারের (কোনো ঐশ্বর্য্যের কাছে কোনো প্রত্যাশায়) দিকে একটিবার পা ও মাড়ান না ; সেদিক হইতে উলটিয়া আপনার অন্তরের মধ্যে বসিয়া তিনি করেন ব্রহ্মবিচার (ব্রহ্ম ধ্যান)।

হে দাদূ, তখনি নগরে আরাম আনন্দ যখন সেখানে চলে এক রাজার রাজত্ব। দুই রাজার রাজত্বের দুঃখ দ্বন্দ্বের মধ্যে কেহই সুখে করিতে পারে না বাস।"

কামনার ও ভোগের দ্বারা সব অপবিত্র ঃ

বিষৈ কারণৈঁ রূপ রাতে রহৈঁ নৈন নাপাক য়োঁ কীন্হ ভাই।
বদী কী বাত সুনত সারা দিন স্রবন না পাক য়োঁ কীন্হ জাঈ ॥
স্বাদ কারণৈঁ লুবধি লাগী রহৈ জিভ্যাঁ নাপাক য়োঁ কীন্হ খাঈ।
ভোগ কারণৈঁ ভূখ লাগী রহৈ অংগ নাপাক য়োঁ কীন্হ লাঈ ॥

নারী বৈরণী পুরুখকী পুরখা বৈরী নারি।
অংত কালি দোনোঁ মুয়ে দাদূ দেখি বিচারি ॥
ভর্ঁরা লুবধী বাসকা কমলি বঁধানা আই।
দিন দস মাহৈঁ দেখতা দোনোঁ গয়ে বিলাই ॥
নারী পীবৈ পুরুখ কো পুরুখ নারি কোঁ খাই।
দাদূ গুরুকে জ্ঞান বিন দোনোঁ গয়ে বিলাই ॥

মাতা নারী পুরুষকী পুরুষ নারী কা পূত।
দাদূ জ্ঞান বিচার করি মুক্ত ভয়ে অবধূত॥

"বিষয়ের (ভোগের) জন্য রূপে হইয়া থাকে অনুরক্ত, এইরূপে নয়নকে করিল ভাই অপবিত্র। "বদী"র (অসৎ প্রবৃত্তির) কথা সারাদিন শুনিতে শুনিতে এইরূপে শ্রবণকে করিল গিয়া অপবিত্র। স্বাদের কারণে লুব্ধ হইয়া (ভোগ্য বস্তুতে) রহিল লাগিয়া, এমন করিয়াই খাইয়া খাইয়া জিহ্বাকে করিল অপবিত্র। ভোগের কারণ ক্ষুধার সম্ভোগে রহিল লাগিয়া, এমন করিয়াই অঙ্গ করিয়া আনিল অপবিত্র।

নারী হইল পুরুষের বৈরী আর পুরুষ হইল নারীর বৈরী, হে দাদূ বিচার করিয়া দেখ, শেষকালে মরিল উভয়েই।

বাসের জন্য লুব্ধ ভ্রমর কমলে আসিয়া হইল বদ্ধ, দিন দশেকের মধ্যে দেখিতে দেখিতে দুই-ই গেল বিলীন হইয়া।

নারী পান করে পুরুষকে, পুরুষও খায় নারীকে। হে দাদূ গুরুর জ্ঞান বিনা দুই-ই গেল বিলীন হইয়া।

নারী হইল পুরুষের মাতা, পুরুষ হইল নারীর পুত্র। এই জ্ঞান বিচার করিয়া, হে দাদূ, অবধূত হইয়া গেল মুক্ত।"

সবাই কামনায় জর্জ্জর। ভরসা তাঁর সঙ্গে যোগ, প্রেম।

জ্যোঁ ঘুন লাগৈ কাঠ কোঁ লোহৈ লাগৈ কাট।
কাম কিয়া ঘট জাজরা দাদূ বারহ বাট॥
জনম গয়া সব দেখতাঁ ঝুঠীকে সঁগ লাগি।
সাচে পীতম কোঁ মিলৈ ভাগি সকৈ তৌ ভাগি॥
আপৈ মারৈ আপকোঁ যহ জীব বিচারা।
সাহিব রাখনহার হৈ সো হিতূ হমারা॥
গংদে সৌঁ গংদা ভয়া যোঁ গংদা সব কোই।
দাদূ লাগৈ খুব সৌঁ খুব সরীখা হোই॥

সাঈঁ অম্রিত সৌঁ অম্রিত সব পর কিয়া বিষজাল ।
রাখনহারা প্রেম হৈ দাদূ জুদাই কাল ॥

“যেমন কাঠে লাগে ঘুণ, লোহায় লাগে মরিচা, তেমনি কাম করিল ঘটকে জর্জ্জর । হে দাদূ, বারো রকমের (সকল) পন্থে (এই একই দশা) ।

ঝুঠায় সঙ্গে লাগিয়া দেখিতে দেখিতেই সব জনম গেল (নাশ হইয়া) ; সাচ্চা প্রিয়তমের সঙ্গে হও মিলিত, যদি (নাশ হইতে) পালাইতে পার তো এখনও পালাও ।

এই জীব বেচারা (নিরুপায়), আপনিই মারে আপনাকে ! প্রভুই রক্ষাকর্ত্তা, তিনিই আমার কল্যাণকারী আপন জন ।

মলিনের সংস্পর্শেই হইল মলিন, এমন করিয়াই সবাই হইয়াছে ঘৃণিত । হে দাদূ, শ্রেয়ের সঙ্গে লাগ, তবেই হইয়া যাইবে শ্রেয়ঃস্বরূপ ।

অমৃতময় স্বামীর অমৃতবোগে (তাঁর সঙ্গে যোগে) সবই আমার অমৃত, পর করিলেই সব হয় বিষজ্বাল । প্রেমই রাখে বাঁচাইয়া, হে দাদূ, বিচ্ছিন্নতাই (যোগেব অভাব) কাল (মৃত্যুস্বরূপ) ।”

কামনাই সব আকারকে বিকার করে ।

বংধ্যা বহুত বিকার সৌঁ সর্ব পাপকা মূল ।
ঢাহৈ সব আকার কৌঁ দাদূ য়হু অস্থূল ॥
রাত দিৱস জরিবৌ করৈ আপা অগিনি বিকার ।
দেখৌ জ্যোঁ জগ পরজলৈ নিমিখ ন হোই ন্যার ॥

“হে দাদূ বহুত বিকারের সহিত সংবদ্ধ, সর্ব্ব পাপের মূল এই স্থূল (কামনাই) সব আকারকে দেয় বিধ্বস্ত করিয়া ।

অহঙ্কারের এই বিকার-অগ্নি আপনার দাহে আপনি দিবা রাত্রি জ্বলিয়াই মরিতেছে ; দেখ জগৎ যেমন করিয়া চারিদিকে যাইতেছে জ্বলিয়া (পরিজ্জ্বলিত) ! এক নিমেষ সেই দাহ হইতে পারিতেছে না সরিতে ।”

ভণ্ড সাধুরা মায়ার দাস :

ঘট মাহেঁ মায়া ঘণী বাহরি ত্যাগী হোই ।
ফাটী কংথা পহরি করি চিহন করৈ সব কোই ॥
কায়া রাখৈ বংদ করি মন দহ দিসি বিকাই ।
পিয় পিয় করতে সব গয়ে আপা রঙ্গ দিখাই ॥*
মুখ সৌঁ মীঠী মন সৌঁ খ্বারী ।
মায়া ত্যাগী কহৈঁ বজারী ॥

"ঘটের (অন্তরের) মধ্যে মায়া আছে স্তূপাকারে জমিয়া, বাহিরে ছেঁড়া কাঁথা পরিয়া ত্যাগী সাজিয়া সবাই আছেন আনন্দে ।

কায়া রাখে বন্ধ করিয়া মন বিকাইয়া বেড়ায় দশদিকে । (মুখে) প্রিয়তম প্রিয়তম করিতে করিতে সবাই গেলেন আপনার রঙ্গ দেখাইয়া ।

"মুখে মিষ্ট মনে নষ্ট" এমন লোককেই বাজারী লোকে বলে মায়াত্যাগী ।"

যাহা চাই তাহা মেলে না :

মৈঁ চাহূঁ সো না মিলৈ সাহিবকা দীদার ।
দাদূ বাজী বহুত হৈ নানা রংগ অপার ॥
হম চাহৈঁ সো না মিলৈ ঔ বহুতেরে আহিঁ ।
দাদূ মন মানৈ নহীঁ কেতে আবৈ জাহিঁ ॥
জে হম ছাড়েঁ হাথথৈঁ সো তুম লিয়া পসারি ।
জে হম লেবৈঁ প্রীতি সৌঁ সো দীয়া তুম ডারি ॥
হীরা পগসৌঁ ঠেলি করি কংকর কৌঁ কর লীন্হ ।
পারব্রহ্ম কৌঁ ছাড়ি করি আপা সৌঁ হেত কীন্হ ॥

"আমি যা চাই তা তো মেলে না ; আমি চাই স্বামীর সাক্ষাৎ দরশন, হে দাদূ, (দেখি) বাজি (খেলা) আছে বহুত রকমের, নানা রঙ্গের অগণিত খেলা ।

আমি যা চাই তা তো মেলে না, তা ছাড়া বহুত রকমই (খেলা) আছে ।

---

* কেহ কেহ বলেন—"অঙ্গ দিখাই ।"

হে দাদূ,—কত রকম (খেলাই) আসিতেছে আর যাইতেছে কিন্তু মন তো মানিতেছে না।

যা আমি ফেলিয়া দিলাম হাত হইতে, তাহা তুমি নিলে হাত পাতিয়া। যা আমি লই প্রীতির সহিত তাহা তুমি দিলে ফেলিয়া।

হীরা পায়ে ঠেলিয়া ফেলিয়া কাঁকর নিলে কিনা হাতে! পর ব্রহ্মকে ফেলিয়া দিয়া "অহমিকার" সঙ্গেই করিলে প্রেম!"

মায়ার খেলা ঃ

মায়া আগৈঁ জীৱ সব ঠাঢ় রহে কর জোড়ি।
জিন সিরজে জল বূদংসৌঁ তাসৌঁ বইঠে তোড়ি ॥
সুর নর মুনিয়র বসি কিয়ে ব্রহ্মা বিশ্ন মহেস।
সকল লোককে সির খড়ী সাধূকে পগ দেস ॥
মায়া চেরী সংতকী দাসী উস দরবার।
ঠকুরাণী সব জগতকী তীনউঁ লোক মঁঝার ॥
মায়া দাসী সংতকী সাকত কী সিরতাজ।
সাকত সেতীঁ ভাঁডনী সংতো সেতীঁ লাজ ॥
সকল ভুৱন ভানৈ ঘনৈ চতুর চলাৱণহার।
দাদূ সো সূঝৈ নহীঁ জিসকা বার ন পার ॥
মায়া মৈলী গুণ মঈ ধরি ধরি উজ্জল নাৱঁ।
দাদূ মোহৈ সবহিঁ কো সুর নর সবহী ঠাৱঁ ॥
বিষকা অম্রিত নাৱঁ ধরি সব কোই খাৱৈ।
দাদূ খারা না কহৈ যহু অচিরজ আৱৈ ॥
জোগ হোই জোগী গহৈ ধন হোই গহৈ ধনেস।
মুকতি হোই মুকতা গহৈ করি করি নানা ভেস ॥

"মায়ার আগে জীব সব দাঁড়াইয়া আছে করজোড়ে! যিনি জলবিন্দু হইতে করিলেন সৃষ্টি, তাঁর সঙ্গে সবাই বসিয়া আছে সব সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া!

সুর নর মুনিবর সে বশ করিয়াছে, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ সে করিয়াছে বশ,

সকল লোকের মাথার উপর সে দাঁড়াইয়া, কেবল সাধুর পদতলে সে দণ্ডায়মান।

সাধকের কাছে মায়া চেড়ী, তাঁর দরবারে সে দাসী, কিন্তু তিন লোকের মাঝারে সকল জগতের সে ঠাকুরাণী।

মায়া হইলেন সাধকের দাসী, কিন্তু শাক্তের (শক্তিবাদীর) তিনি মাথার মুকুট, শক্তি-পন্থীর কাছেই তাঁর অভিনয় খাটে, সাধকের কাছে তাঁর লজ্জা।

মায়া সকল ভুবন ভাঙ্গিতেছেন, গড়িতেছেন, কত চাতুরীই চালাইতেছেন! সে চাতুরীর সীমা পরিসীমাই নাই, অথচ তাহা (কারও চোখে) ধরাই পড়ে না (অথবা, যাঁহার নাই সীমা পরিসীমা তিনিই পড়েন না চোখে)।

মায়া হইল মলিন গুণময়ী, কিন্তু উজ্জ্বল উজ্জ্বল নাম ধরিয়া সবাইকেই করে সে মোহিত। হে দাদূ, সুর নর ও সকল স্থানে (চলে তার এই চাতুরী)।

বিষকে অমৃত নাম দিয়া দেখি খাইতেছে সবাই, হে দাদূ, ইহাই আশ্চর্য্য যে কেহই বলে না ইহা বিস্বাদ।

এইমায়া যোগী কে আয়ত্ত করেন যোগ রূপ হইয়া, (যোগরূপ ধারণ করিয়া,) ধনপতিকে ধরেন ঐশ্বর্য্যরূপ ধরিয়া, মুক্তিপ্রার্থীকে নেন মুক্তিরূপ হইয়া; নানা বেশ করিয়া ইনি (নানা জনকে) আনেন স্ববশে।”

মায়াই উপাস্যদেবতা হইয়া বসে :

মায়া বৈঠী রাম হোই তাকৌঁ লখৈ ন কোয়।
সব জগ মানৈ সত্তি করি বড়া অচংভা মোয়॥
মায়া বৈঠী রাম হোই কহৈ মৈঁ হী মোহন রাই।
ঐসে দেৱ অনংত করি সব জগ পূজন জাই॥
মায়া রূপী রামকৌঁ সব কোই ধ্যাৱৈ।
অলখ আদি অনাদি হৈ সো দাদূ গাৱৈ॥
ব্রহ্মা কা বেদ বিশ্নকী মুরতি পূজৈ সব সংসারা।
মহাদেৱকী সেৱা লাগৈ কহাঁ হৈ সিরজনহারা॥
অংজন কিয়া নিরংজনা গুণ নির্গুণ জানৈ।
ধর‍্যা দিখাৱৈ অধর করি কৈসে মন মানৈ॥

নীরংজনকী বাত কহি আৱৈ অংজন মাহীঁ ।
দাদূ মন মানৈ নহীঁ সরগ রসাতলি জাহিঁ ॥

"মায়াই যে বসিল রাম হইয়া তাহাতো কেহই দেখিল না, সকল জগৎ আবার তাহাই মানে সত্য করিয়া তাই আমার বড় বিস্ময়।

মায়া বসিল রাম হইয়া, বলে যে আমিই মোহন রায় (মনোমোহন জগৎপতি), এমন দেবতাকেই অনন্ত মনে করিয়া সমস্ত জগৎ যায় পূজা করিতে।

মায়ারূপী রামকেই সবাই করিতেছে ধ্যান। আদি অনাদি অলখ দেবতা যিনি আছেন তাঁর গানই করে দাদূ।

ব্রহ্মার বেদ ও বিষ্ণুর মূর্ত্তি পূজা করে সকল সংসার, মহাদেবের সেবাও বেশ চলে, সৃজনকর্ত্তা বিধাতাই শুধু রহিলেন কোথায়!

অঞ্জনকেই মনে করিল নিরঞ্জন, গুণকেই মানিল নির্গুণ বলিয়া, ধরাকে দেখাইল অধর (আকাশ) করিয়া, কেমন করিয়া তবে মন মানে?*

নিরঞ্জনের কথা কহিয়া কহিয়া, আসে অঞ্জনের মধ্যে, হে দাদূ, তাই মন তো মানে না চাই স্বর্গেই যাউক বা রসাতলেই যাউক ("স্বর্গ যাউক রসাতলে, তবু মন তো মানে না" এই অর্থও হয়)।"

মিথ্যাকে সাধনা করাও মিথ্যা:

কামধেনুকে পটংতরৈ করৈ কাঠ কী গাই ।
দাদূ দূধ দূঝৈ নহীঁ মূরখ দেহু বহাই ॥
চিংতামণি কংকর কিয়া মাংগৈ কছু ন দেই ।
দাদূ কংকর ডারি দে চিংতামণি কর লেই ॥
পারস কিয়া পখানকা কংচন কদে ন হোই ।
দাদূ আতম রাম বিন ভূলি পড়্যা সব কোই ॥
সূরিজ ফটিক পখান কা তাসোঁ তিমির ন জাই ।
সাচা সূরিজ পরগটৈ দাদূ তিমির নসাই ॥

---

* দাদূর কেরামতের কথায় উপক্রমণিকাতে এই বাণীটি উদ্ধৃত হইয়াছে। (পৃঃ ৫৩)

মূরতী খড়ী পখানকী কীয়া সিরজনহার।
দাদূ সাচ সূঝৈ নহীঁ য়ূঁ বূড়া সংসার॥
দাদূ বাঁধে বেদ বিধি ভরম করম উরঝাই।
মরজাদা মাহৈঁ রহৈ সুমিরণ কিয়া ন জাই॥

"কামধেনুর স্থলাভিষিক্ত প্রতিমা করিয়া (সবাই) করিল কাঠের গাই ! হে দাদূ, তাহা দুধ তো দেয় না ; হে মূর্খ, তাহা দাও বহাইয়া।

(ইহারা) কাঁকরকে করিল চিন্তামণি, অথচ (সেই চিন্তামণি) মাগিলে দেয় না কিছুই ! হে দাদূ, আসল চিন্তামণি হাতে লইয়া কাঁকর দেও ফেলিয়া।

পাষাণকে করিল ইহারা পরশমণি ! কখনো তাহা হইতে যে হয় না কাঞ্চন ; হে দাদূ, আত্মারাম (আত্মারূপ পরমেশ্বর) বিহনে সবাই পড়িয়া গেল ভ্রমকূপে।

ফটিক শিলাকে করিল ইহারা সূর্য্য ! * তাহাতে তো অন্ধকার দূর হয় না। হে দাদূ, সাচ্চা সূর্য্য যদি প্রকাশিত হয় তবেই পালায় অন্ধকার।

পাষাণের মূর্ত্তি আছেন খাড়া, তাহাকেই মানিল সৃজনকর্ত্তা (ভগবান) ! হে দাদূ, সত্যকে তো কেহ পায় না দেখিতে, এমন করিয়াই ডুবিল সংসার।

ভরম করমে আটকাইয়া বেদ বিধি (সকলকে) করে বন্ধনে বদ্ধ। সীমার মধ্যেই তাই রহিয়া গেল সবাই, (পরমাত্মাকে) স্মরণ সাধন করাই হইল অসম্ভব।"

ভক্ত কোনো ঐশ্বর্য্যই চায় না ঃ

চারি পদারথ মুক্তি বাপুরী আঠ সিধি নব নিধি চেরী।
মায়া দাসী তাকৈ আগৈঁ জহাঁ ভগতি নিরংজন তেরী॥

"হে নিরঞ্জন, যে হৃদয়ে তোমার ভক্তি বিরাজিত তার কাছে মায়া দাসীমাত্র। (ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ) চারি পদার্থ ও বেচারী মুক্তি, অষ্টসিদ্ধি ও নব নিধি তার চেড়ী (দাসীমাত্র)।"

সাধকের সহজ জীবন যাত্রা ঃ

রোক ন রাখৈ ঝূঠ ন ভাখৈ দাদূ খরচৈ খায়।
নদী পূর পরবাহ জ্যোঁ মায়া আবৈ জাই॥

---

* শালগ্রাম যেমন বিষ্ণুর বিগ্রহ তেমনি সূর্য্যের বিগ্রহ হয় স্ফটিক শিলায়।

সদিকা সিরজনহারকা কেতে আবৈ জাই ।
দাদূ ধন সংচৈ নহীঁ বৈঠ খিলাবৈ খাই ॥

"(যে সাধক) সে কিছুই বাঁধিয়া রাখে না ঝুটাও বলে না, মিথ্যাও আচরণ করে না, হে দাদূ, সে অপরকে বিতরণ করে ও নিজে সম্ভোগ করে (খরচ করে ও খায়)। পূর্ণপ্রবাহ নদীর মত (তার সম্মুখ দিয়া) মায়া আসে ও যায় ।

সৃজনকর্ত্তা ভগবানের সত্য দান কতই আসিতেছে ও যাইতেছে; তাই দাদূ ধন কখনও সঞ্চয় করে না, সে বসিয়া খাওয়ায় ও খায় ।"

চতুর্থ প্রকরণ—সাধনা

চতুর্থ অঙ্গ—সূক্ষ্ম জনম।

মরিলে আবার দেহ ধরিয়া নূতন জনম হয় ইহাই সবাই জানে। কিন্তু এই দেহ এই জীবন থাকিতেই প্রতি দণ্ডে প্রতি পলে আমরা কত কত জনম লাভ করিতেছি তাহার খবর তো কেহ রাখে না।

জনম জনমে চৌরাশী লক্ষ জীবনের মধ্য দিয়া এই জীব আসিয়াছে। সেই সব জীবন আজও প্রচ্ছন্ন ভাবে এই জীবের মধ্যে আছে। যখন যে ভাব অন্তরে উপস্থিত, তখন সেই জনমই হইয়াছে বুঝিতে হইবে। জনমের এই নূতন মর্ম্ম মানিয়া লওয়ায় ইঁহারা জাতিভেদের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন। মানুষ হইলে তবে তো ব্রাহ্মণ শূদ্রাদি জাতি। মানুষের চামড়ার মধ্যেই মানুষ যে নিরন্তর হইতেছে ক্ষণে ক্ষণে নানা জীব জন্তু পশু পক্ষী! তবে আর জাতি ভেদ হইবে কাহার? মানুষ তার বাহিরের চামড়ার পরিচয়েই যে সর্ব্বদা মানুষ এই কথাই যাঁরা মানেন না, তাঁরা আবার ভিন্ন জাতিতে কেবলমাত্র একবার জন্ম হইয়াছে বলিয়াই যে সেই সেই জাতিধর্ম্ম জন্মের জোরে চিরদিনের মত মানিয়া লইবেন ইহা অসম্ভব। যাঁহারা এই সব "পতিত" জাতির সাধকদিগকে হীন করিয়া রাখিয়া দিলেন তারা জানিতেন না যে ইহাঁরা জনমের কোন নিত্যগতি সদা সক্রিয় ধারার সন্ধান পাইয়া মাথার উপরের সব অপমানের ভার দূর করিয়া দিয়াছেন।

বাহিরের দেহের পরিবর্ত্তনেই জনমের পরিবর্ত্তন যদি হয়, অন্তরের ভাবের পরিবর্ত্তনে তবে আরও বেশী মূলগত জন্মান্তর ঘটে, যদিও তাহা কারও চোখে ধরা পড়ে না। যত ভাব অন্তরে আসে ততই অন্তরে সূক্ষ্ম ও অন্যের অজ্ঞেয় নব নব জনম নব নব অবতার আমরা লাভ করি। একটু স্থির হইয়া না বসিতে পারিলে কেমন করিয়া এই চিত্তমন দিয়া ব্রহ্ম-যোগ হইবে?

একটি একটি ভাব আসিতেছে, একটি একটি ভাব যাইতেছে; পূর্ব্ব পূর্ব্ববর্ত্তী জনমকে মারিয়া নূতন জনম আসিতেছে, ভিতরেই এই নিরন্তর

আসা যাওয়া মারামারি সূক্ষ্মভাবে অনবরত চলিয়াছে, কেহই তাহা দেখিতে পায় না।

উদ্ধার পাইতে হইলে স্থির হইতে হইবে। মন কখনও হস্তী হয় কখনও হয় কীট, কখনও অগ্নি কখনও জল কখনও পৃথিবী কখনো আকাশ। মনের মধ্যে সিংহও আছে শৃগালও আছে। সব মানুষ অন্তরের মধ্যে ক্রমাগত নানা জীবের স্বরূপ ধরে। সাধক ব্রহ্মকৃপায় এই প্রতি দণ্ডের প্রতি পলের নব নব জন্ম প্রবাহ হইতে রক্ষা পাইয়া স্থির হইয়া তাঁর য়োগ লাভ করিয়া উদ্ধার পান।

চৌরাসী লখ জীৱকী পরকীরতি ঘটমাহিঁ।
অনেক জনম দিনকে করৈ কোঈ জানৈ নাহিঁ॥
জেতে গুণ ব্যাপৈঁ জীৱকোঁ তেতেহী ঔতার।
আৱাগমন য়হ দূরি করৈ সমরথ সিরজনহার॥
সবগুণ সবহী জীৱকে দাদূ ব্যাপৈঁ আই।
ঘট মাঁহেঁ জামৈঁ মরৈঁ কোই ন জানৈ তাহি॥
জীৱ জনম জানৈ নহীঁ পলক পলক মৈঁ হোই।
চৌরাসী লখ ভোগৱৈ দাদূ লখৈ ন কোই॥
অনেক ৰূপ দিনকে করৈ য়হু মন আৱৈ জাই।
আৱাগমন মনকা মিটৈ তব দাদূ রহৈ সমাই॥
নিসবাসর য়হু মন চলৈ সূখিম জীৱ সঁঘার।
দাদূ মন থির কীজিয়ে আতম লেহু উবার॥
কবহূঁ পাৱক কবহুঁ পানী ধর অংবর গুণ বাঈ।
করহূঁ কুংজর কবহূঁ কীড়ী নর পশু হোই জাঈ॥
সূকর স্বান সিয়ার সিংহ সরপ রহৈঁ ঘট মাঁহিঁ।
কুংজর কীড়ী জীৱ সব পণ্ডিত জানৈঁ নাঁহিঁ॥

"এই ঘটের মধ্যেই চৌরাশী লক্ষ জীবের প্রকৃতি, প্রতিদিন তাহারা (মানবের) অনেক জনম (সাধন)করে, কেহই তাহা জানে না।

যত গুণ আসিয়া জীবকে ব্যাপে ততই হয় তার অবতার। এই আসা যাওয়া দূর করিতে পারেন এক সর্ব্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্ত্তা।

সকল জীবের সব গুণই আসিয়া, হে দাদূ, ব্যাপে এই ঘটে ; এই ঘটের মধ্যেই জন্মে ও মরে, কেহই তাহা জানে না।

পলকে পলকে যে তার জন্ম হইতেছে এই তত্ত্ব জীব নিজেই জানে না, (এই জীবনেই) সে চৌরাশী লক্ষ জনম ভোগ করিতেছে, হে দাদূ, ইহা কেহই দেখে না।

এই মন আসে আর যায় আর দিনের মধ্যে অনেকরূপ করে (জনম)। মনের এই আসা যাওয়া যদি মেটে দাদূ তাহা হইলেই (ভগবানে) থাকিতে পারে ভরপূর সমাহিত হইয়া।

নিশিদিন চলিতেছে এই মন আর নিরন্তর চলিয়াছে সূক্ষ্ম জীবনসংহার। হে দাদূ, মন কর স্থির, আপনাকে লও উদ্ধার করিয়া। (মন) কখনও অগ্নি কখনও জল কখনও পৃথিবী কখনও আকাশ গুণ, কখনও বায়ু কখনও হস্তী কখনও কীট কখনও মানুষ কখনও যায় পশু হইয়া।

শূকর, কুকুর, শিয়াল, সিংহ, সর্প ঘটের মধ্যেই থাকে। হস্তী হইতে কীট পর্য্যন্ত সব জীব আছে এখানে, পণ্ডিতও তাহার রাখে না কোনো খবর।”

চতুর্থ প্রকরণ—সাধনা

পঞ্চম অঙ্গ—“উপজ” অঙ্গ।

উপজ অর্থ উৎপত্তি। অহম্‌ভাবের উৎপত্তি, সাধনার একটি মস্ত বাধা। অহম্‌ভাব হইলেই মায়া আসিয়া জোটে আর সত্ত্বরজঃতমঃ প্রভৃতিতে মন হইয়া যায় চঞ্চল।

অহম্‌ভাব হইলেই সাধক বলহীন হইয়া পড়েন আর “সত্ত্বরজঃতমে”র অন্ধকারে তাঁহাকে ঘেরে। সাধনার বল যাহাতে না যায়, এই অন্ধকার যাহাতে না ঘেরে, তাহার ব্যবস্থা করিবে পারেন একমাত্র পরব্রহ্ম ভগবান।

অহম্‌ভাব বা অহমিকা হইল বন্ধ্যার পুত্র। বিশ্বজগৎকে বাদ দিয়া সঙ্কীর্ণ অহমিকা নিরাশ্রয়, কাজেই পরমসত্য এক পরমাত্মা পরব্রহ্ম। গুরুদত্ত জ্ঞানে যদি এই সত্য বোধ জন্মে তবে ইন্দ্রিয়বিক্ষোভ হইতে রক্ষা পাইয়া মন নিশ্চল হইয়া ভগবানের সঙ্গ লাভ করে।

"অহম্" কে বড় জোর বলিতে পার সত্যজ্ঞানের আধারমাত্র। বিশুদ্ধ অহমের কোনো নিজস্ব নাই বলিয়া এই শুভ্র শুদ্ধ ফলকে সত্য জ্ঞান উদ্ভাসিত হয়। এই নিশ্চল জ্ঞান জন্মিবামাত্রই মিথ্যা ও কৃত্রিমকে অতিক্রম করিয়া সাধক নিরঞ্জন স্থানে গিয়া পৌছায়। তখন প্রেম ভক্তি উপজে, আর তাহা হইলেই সহজ সমাধি লাভ হয়, তখন গুরুর কৃপায় ভগবানের প্রেম রস-পান হয় সম্ভব।

ভগবানের প্রতি ভক্তিও নিরঞ্জন, সে ভক্তিও অবিচলিত ও অবিনাশী। ভক্তিতে জীবন্ত আত্মা সকল দিক জীবন্ত করিয়া তোলে।

মধ্য যুগের সাধকেরা বড় বিনয়ী। প্রায় সকলেই বলিতেন, "আমরা গুরু নহি, আমরা ঐ পথের পথিকমাত্র"। যাঁহারা ঝুঠা পথে গিয়াছেন, সেই সব সাধুরা বলিতেন, "আমরা গম্য স্থানে পৌছিয়াছি, আমাদের প্রদর্শিত পথে চল।" ইহাতে লোকের ভুল হইত। তাই দাদূ বলিতেছেন "যাঁরা উড়িয়া চলিয়াছেন সেই সব সাধকরাই বলেন আমরা পথে আছি মাত্র। আর যাঁহারা বলেন, পৌছিয়াছি, তোমরাও চল, তাঁহারা পথের সন্ধানও পান নাই।"

দাদূ সংসারী ছিলেন। তবে কারও কারও মতে তাঁর স্ত্রীর পূর্ব্বেই মৃত্যু হয়, তাহার পর তিনি আর বিবাহ করেন নাই। তখনকার কবীর প্রভৃতি সাধুরা গৃহী হইয়াই সাধনা করিয়াছেন, ইহাই তাঁহাদের ছিল আদর্শ। এখনও তাহাঁদের সেই ধারা চলিয়া আসিতেছে এমনও বহু স্থান আছে।

দাদূ সংসার ও ধর্ম্মসাধন সব রকম করিয়া বুঝিয়াছিলেন যে ভগবানের রঙ্গে মন না রঙ্গিয়া উঠিলে সকল সাধনার মূলীভূত "অনুভব"টি জন্মে না। একবার এই অনুভব হইলে পথ যায় সহজ হইয়া।

মৃত্যু ও অমৃতের তত্ত্ব প্রকাশ হইল কেমন করিয়া? পরব্রহ্ম ইহা প্রাণকে কহিলেন, প্রাণ ইহা ঘটকে কহিল, ঘট ইহা বিশ্বসংসারকে কহিল; মৃত্যু ও অমৃত যে ভিন্নধর্ম্মী বস্তু, তাহা এমন করিয়াই সকলে জানিল।

ব্রহ্মের আদেশবাণী কেমন করিয়া প্রকাশ হইল? প্রভু ইহা আত্মাতে

কহিলেন। আত্মা ইহা সত্তাকে কহিল, সত্তা ইহা সকল স্থান ও কালকে কহিল, এমন করিয়া তাঁর বাণী তাঁর খবর সকল বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হইল।

সকলেই নিজ অনুভবের কথায় ব্রহ্মতত্ত্বের কথা বানাইয়া বলে। ঠিক যেমনটি যেমনভাবে অনুভবে আসিয়াছে তেমনভাবেই বলা উচিত। কিন্তু এই বিষয়ে সাচ্চা থাকা কঠিন। মানুষ প্রায়ই এখানে মাত্রা ছাড়াইয়া বলিতে চায়। কাজেই এখানে আপনার বাক্যকে সংযত করিতে পারে এমন সাধক দুর্ল্লভ।

প্রেমের নিশ্চল বোধেই অহমিকার ক্ষয়ঃ

মায়া কা গুণ বল করৈ আপা উপজৈ আই।
রাজস তামস সাতগী মন চংচল হোই জাই॥
আপা নাহীঁ বল মিটৈ ত্রিবিধি তিমির নহিঁ হোই।
দাদূ য়হু গুণ ব্রহ্মকা সুন্ন সমানা সোই॥
আতম বোধ বাঁঝ কা বেটা গুরুমুখি উপজৈ আই।
দাদূ নিহচল পংচ বিন জহাঁ রাম তহঁ জাই॥
আতম মাঁহৈঁ উপজৈ দাদূ নিহচল জ্ঞান।
কিতম জাই উলংঘি করি জহাঁ নিরংজন থান॥
প্রেম ভগতি জব উপজৈ নিহচল সহজ সমাধ।
দাদূ পীবৈ রামরস সতগুরকে পরসাদ॥

"মায়ার গুণ যদি বলবান হয় তবে অহমিকা আসিয়া হয় উৎপন্ন; রাজস, তামস ও সাত্ত্বিক, (এই সবেতে)—মন হইয়া যায় চঞ্চল।

অহমিকা বশতঃ বল নষ্ট হয় না, (সত্ত্ব রজ তম এই তিন ভাবের) তিন রকম অন্ধকারও হয় না এমন (ব্যবস্থা করিবার মত) গুণ আছে কেবল ব্রহ্মের-ই, হে দাদূ, তিনি শূন্য-সমাহিত।

"অহম্-বোধ" হইল বন্ধ্যার পুত্র। গুরু মুখে (সাধারণ অর্থ-"দীক্ষা-জাত") জ্ঞান আসিয়া উৎপন্ন হইলে, পঞ্চ (ইন্দ্রিয় প্রভাব)-মুক্ত সেই নিশ্চল জ্ঞান সেখানে যায় যেখানে রাম বিরাজমান।

হে দাদূ, আত্মার মধ্যেই উৎপন্ন হয় সেই নিশ্চল জ্ঞান। কৃত্রিমকে অতিক্রম করিয়া যেখানে নিরঞ্জন-স্থান সেখানেই সে যায়।

প্রেম ভক্তি যখন হয় উৎপন্ন তখনই নিশ্চল সহজ সমাধি। তখন সদ্‌গুরুর প্রসাদে দাদূ রাম-রস করে পান।"

ভক্তির বিনয় ঃ

ভগতি নিরঞ্জন রামকী অৱিচল অৱিনাসী।
সদা সজীৱনি আতমা সহজৈঁ পরকাসী॥
মানুস জব উড়* চালতে কহতে মারগ মাঁহিঁ।
দাদূ পহুঁচে পংথ চল কহৈঁ সো মারগি নাহিঁ॥

"নিরঞ্জন রামের প্রতি ভক্তিও নিরঞ্জন। অবিচলিত এবং অবিনাশী এই ভক্তি থাকিলে সজীবন আত্মা সহজেই হয় প্রকাশিত।

মানুষ যখন উড়িয়া চলে, তখন বলে যে, "পথেই আছি (পথিক হইয়া সাধনার পথে চলিতেছি)" ; হে দাদূ, যে বলে,"পহুঁছিয়াছি আমার পথেই চল," সে কখনও পথই পায় নাই।"

তাঁর দয়ায় অনুভব জন্মে ঃ

পহিলে হম সব কুছ কিয়া ধরম করম সংসার।
দাদূ অনভৱ উপজী রাতে সিরজনহার॥

"প্রথমে আমি সব কিছু করিয়াছি, ধরম, করম ও সংসার (কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নাই, যত দিন তাঁহাতে মন না রক্ত হইয়াছে বা অন্তরে অনুভব না হইয়াছে)। হে দাদূ, অনুভব তখন উপজিল যখন মন রক্ত (রঞ্জিত ও অনুরক্ত) হইল ভগবানে।"

তাঁর খবর ও হুকুম কেমন করিয়া আসিল ঃ

পারব্রহ্ম কহ্যা প্রাণ সৌঁ প্রাণ কহ্যা ঘট সোই।
দাদূ ঘট সবসৌঁ কহ্যা মৃত অম্রিত গুণ দোই॥
মালিক কহ্যা অরৱাহ সৌঁ অরৱাহ কহ্যা ঔজূদ।
ঔজূদ আলম সৌঁ কহ্যা হুকম খবর মৌজূদ॥

---

* "উজৱ" পাঠও আছে।

দাদূ জৈসা ব্রহ্ম হৈ অনভৱ উপজী হোই।
জৈসা হৈ তৈসা কহৈ দাদূ বিরলা কোই॥

"পরব্রহ্ম কহিলেন প্রাণের কাছে, প্রাণ কহিল ঘটের (অন্তরের) কাছে, হে দাদূ, ঘট কহিল সবারই কাছে, যে মৃত্যু ও অমৃতের ধর্ম্ম বিভিন্ন।

মালিক কহিলেন আত্মার কাছে, আত্মা কহিল সত্তাকে (কায়া অর্থও হয়)। সত্তা কহিল সকল বিশ্ব ও সকল যুগকে (আলম অর্থ স্থানকালময় সর্ব্ব বিশ্ব), এমন করিয়াই তাঁর বার্ত্তা ও তাঁর হুকুম হইল সর্ব্বত্র বিরাজিত।

হে দাদূ, ব্রহ্ম যেই রকম, যথার্থ অনুভবও যদি সেই রকম হইয়া থাকে উৎপন্ন তবে সাধক ঠিক যেমন তেমনই বলে। এমন সাধক দুর্লভ।"

চতুর্থ প্রকরণ—সাধনা

ষষ্ঠ অঙ্গ—নিগুর্ণ অঙ্গ।

সাধনাতে সাধকের নিজেরও শক্তি থাকা চাই। সাধকের আপনার শক্তি না থাকিলে কিছুতেই কিছু হয় না। ভগবানই বল, গুরুই বল, সৎসঙ্গই বল, সকলেরই মূলে আত্ম-শক্তি। নিজের মধ্যেও বস্তু না থাকিলে কে আমার কি উপকার করিতে পারে?

নিগুর্ণ বাঁশকে চন্দনের নিকট দীর্ঘকাল রাখিলেও সে চন্দনের কোনো গুণই পায় না। পাথরে কি কখনও জল প্রবেশ করে? এমনই সে কঠিন! দুর্ভাগা মলিন লৌহকে যদি পরশমণির কাছে রাখ তবে সে আপন মলিনতার ব্যবধান রাখিয়াই নিজেকে সোনা হইতে দেয় না। ইহারা সকলেই এমন একান্তভাবে স্বধর্ম্ম রক্ষা করার পক্ষপাতী যে কোনো উন্নতি বা উৎকৃষ্ট ভাবান্তরপ্রাপ্তিকে ইহারা সযত্নে পরিহার করে! এমনই ইহারা সনাতন স্বধর্ম্মপরায়ণ! অন্তরের মধ্যে কোনো গুণ না থাকাতেই ইহারা উন্নত অগ্রসর হইতে এমন একান্ত অনিচ্ছুক, তাই ইহারা পুরাতন ধর্ম্মই প্রাণপণ থাকে আঁকড়াইয়া। কামনা-যুক্ত বা একগুঁয়ে মন ভগবানের কাছে রাখিলে কি হইবে? সে কিছুতেই বদলাইবে না, ইহাই তাহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা!

যে গুণহীন সে উপকৃত হইলেও কৃতজ্ঞ হয় না অধিকন্তু উপকারীকেই করে আঘাত। তবু যিনি মহৎ তিনি উপকারই করেন, যে অধম সে অকৃতজ্ঞই থাকে।

নিগুর্ণ কিছুই গ্রহণ করিতে অক্ষম ঃ

কোটি বরস লৌঁ রাখিয়ে বংসা চংদন পাস।
দাদূ গুণ লীয়ে রহৈ কদে ন লাগৈ বাস॥
কোটি বরস লৌঁ রাখিয়ে পত্থর পানী মাঁহিঁ।
দাদূ আড়া অংগ হৈ ভীতর ভেদৈ নাঁহিঁ॥
কোটি বরষ লৌঁ রাখিয়ে লোহা পারস সংগ।
দাদূ ধূরকা অংতরা পলটৈ নাঁহীঁ অংগ॥
কোটি বরস লৌঁ রাখিয়ে জীব ব্রহ্ম সংগি দোই।
দাদূ মাঁহৈঁ বাসনা কদে ন মেলা হোই॥

"কোটি বরস (বৎসর) ধরিয়াও যদি বাঁশকে রাখ চন্দনের পাশে, হে দাদূ, (পুরাতন) স্বধর্ম্ম লইয়াই সে থাকিবে, কখনও তাহাতে সুরভি আসিয়া লাগিতে পারিবে না।

কোটি বরস (বৎসর) ধরিয়াও যদি পাথর রাখ জলের মধ্যে, জলেতে অঙ্গ সে আড়াল করিয়া রাখিবে, হে দাদূ, অন্তর ভেদ করিয়া জল ভিতরে প্রবেশ করিতেই পারিবে না।

কোটি বরস ধরিয়াও যদি লোহাকে রাখ পরশমণির সঙ্গে, সে আপন অঙ্গের ধূলাটুকুর আড়াল করিয়াও (পূর্ব্ব স্বধর্ম্ম অটুট রাখিবে), তবু তাহার স্বরূপ কোনো মতেই বদলাইতে দিবে না।

কোটি বরস ধরিয়াও যদি জীব ও ব্রহ্ম দুইজনকে রাখ একসঙ্গে, হে দাদূ, (জীবের) বাসনা অন্তরে থাকায় কখনও তাহাদের মধ্যে হইবে না মিলন।"

নিগুর্ণ-অকৃতজ্ঞ ঃ

মুসা জলতা দেখি করি দাদূ হংস দয়াল।
মান সরোবর লে চল্যা পংখাঁ কাটৈ কাল॥

সতগুর চংদন বাৱনা লাগে রহৈঁ ভবংগ ।
দাদূ বিষ ছাড়ৈ নহীঁ কহা করৈ সতসংগ ॥
বিনহি পাৱক জলি মুৱা জৱাসা জল মাঁহিঁ ।
দাদূ সূকৈ সীচঁতাঁ জল কৌঁ দূষণ নাঁহিঁ ॥
সুফল বিরখ পরমারথী সুখ দেৱৈ ফল মূল ।
দাদূ ঊপর বৈসি করি নিরগুণ কাটৈ মূল ॥

"মূষিক (দাবানলে) জলিতেছে দেখিয়া, হে দাদূ, দয়াল হংস তাহাকে মানসরোবরে চলিল লইয়া, কাল মূষিক কি না তারই কাটিতে লাগিল সব পাখা !

সদ্গুরু চন্দনের তরুণ তরুতে ভুজঙ্গম রহিল লাগিয়া ; হে দাদূ, সে তার (স্বধর্ম্ম) বিষ তো ছাড়িল না, সৎসঙ্গে তবে তার করিল কি ?

বিনা অগ্নিতেই জলের মধ্যে "জবাসা"* মরিল জ্বলিয়া, হে দাদূ, তাতে যত জলই সেচন কর ততই সে শুকায়, এই দোষ তো জলের নহে ।

সু-ফলন্ত পরসেবাপরায়ণ বৃক্ষ আনন্দে দেয় ফল, ফুল ও আরাম, হে দাদূ, তার উপরে বসিয়াই কি না নির্গুণ (অকৃতজ্ঞ) কাটে তার মূল !"

---

* "যবাসক" বা "সমুদ্রান্ত"—এক প্রকার ক্ষুদ্র ঝোপ, নদীর ধারে জন্মে । বর্ষায় জলবর্ষণে ইহার ইহার সব পাতা ঝরিয়া যায় । শীতকালে নূতন পাতা ফুল হয় । গ্রীষ্মে ও শুষ্কতায় ইহার শ্যামলতা বাড়ে, জল পাইলেই ইহা যায় শুকাইয়া ।

চতুর্থ প্রকরণ—সাধনা

সপ্তম অঙ্গ—হৈরান

(উদ্‌ভ্রান্ত, দিশাহারা)

ব্রহ্ম অসীম, অথচ মানবজীবন সীমাবদ্ধ। তাই সাধনার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষ নির্ব্বিকল্প অসীম স্বরূপের কাছে সাধক বিস্ময়ে দিশাহারা হইয়া যায়। এই একটা মস্ত বাধা। এমন অবস্থায় উপায় কি?

ব্রহ্মকে জীবন্ত বা অমৃত বলিতে পারি না—তাতে পক্ষ-দূষণ হয়। তিনি না আসেন না যান, তিনি না মুক্ত· না জাগ্রত, বুঝাইব কেমন করিয়া? সেখানে চুপ করিয়া থাকাই শ্রেয়, সেখানে "আমি তুমি"র কোনো ভেদ নাই, "এক দুই"য়ের কোনো দ্বন্দ্ব নাই। এক বলিলে দেখি দুই আছে, দুই বলিলে দেখি এক। এ দ্বৈতও নয় অদ্বৈতও নয়, শাস্ত্রের সুবিধার জন্য সিদ্ধান্তকে সত্য হইতে ভ্রষ্ট করা চলিবে না। সত্য ঠিক যেমন আছে তেমন ভাবেই তাহাকে গ্রহণ করিতে হইবে। তথ্যভ্রষ্ট সুবিধামত সিদ্ধান্ত সাধকের পরম শত্রু।

সীমাহারা আনন্দ তাঁহার উপলব্ধি। যাঁহারা তাহাকে জানিয়াছেন তাঁহারা বুঝাইতে গিয়া দিশাহারা হইয়াছেন, তাঁহাদের মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হয় নাই। বড় বড় বুদ্ধিমান লোকেও ব্রহ্ম-উপলব্ধির আনন্দ পাইয়া উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া গিয়াছেন, যদিও অপরকে কিছুই বুঝাইতে পারেন নাই। আনন্দের মধ্য দিয়াই তাঁহার সঙ্গে যোগ হইয়াছে, জ্ঞান ও তথ্যের রাজ্যের মধ্য দিয়া তো তাঁহার সঙ্গে যোগ হয় নাই, কাজেই তাঁহাকে বুঝান যায় কেমন করিয়া?

অবশেষে হার মানিয়া বলিতে হয় "হে স্বামী, তোমাকে জ্ঞানের দ্বারা যে আয়ত্ত করিব এমন সাধ্য আমার কোথায়? তুমি নিজেই নিজেকে জান, আমার সাধ্য কি তোমাকে জানা? আনন্দে যে আমার কাছে একটু ধরা দিয়াছ ইহাতেই আমি তোমার হইয়া গিয়াছি।"

তিনি আপনার যথার্থ পরিচয় দেন সেবকেরই কাছে। ভগবানের কাছে যদি কিছু প্রার্থনীয় থাকে তবে সেই কাম্য বস্তুই পাই, তাঁহাকে পাই না। এই জন্য দাদূ বলেন, "তিনি জ্ঞানের দ্বারা গম্য নহেন, জ্ঞানে জানিতে চাহিও না। সাবধান, তাঁর কাছে কিছু প্রার্থনা করিও না, কারণ দীনের ন্যায় ভিক্ষা চাহিতে গেলে, তিনি তোমাকে ভিক্ষা দিয়াই বিদায় করিয়া দিবেন। কিন্তু আপনাকে দিবেন না। তাঁহার কাছে প্রার্থনা কর—তাঁরই সঙ্গে নিত্য যোগ। তাহা সম্ভব হয় প্রেমে। প্রেম সম্ভব হয় যদি স্বামীর ধর্ম্মের ও সাধনার সঙ্গে নিজের সাধনা এক করা যায়। নারী স্বামীকে পায় স্বামীর সাধনা আপনার করিয়া লইয়া। ভগবানকে বলিতে হইবে, 'তুমি যে জগতের সেবা করিতেছ তাহাতে আপনাকে একেবারে লোপ করিয়া সেবাকেই করাইয়াছ প্রত্যক্ষ, এমন পরিপূর্ণ সেবা আমাকে শিখাও। আমি সেবাতে নিত্য তোমার পাশে পাশে থাকিব। তোমার সেবা তাহাতে উপকৃত হইবে কি না জানি না কিন্তু এই উপলক্ষ্যে আমি তোমার নিত্য যোগ লাভ করিব।' এমন করিয়াই ব্রহ্মের সঙ্গে মিলিতে হইবে। তিনি যদি কৃপা করিয়া তাঁর আপন সাধনাতে (ব্রহ্ম-সেবাতে) অর্থাৎ বিশ্ব চরাচরের সেবায় তোমাকে গ্রহণ করেন তবে বিশ্বচরাচরকে ও সকলকে আপনার জানিয়া সেবা করিতে ও তাঁহার নিত্য যোগ নিত্য সাহচর্য্য লাভ করিতে পারিবে।" এই সব কথা দাদূর "অদ্বৈত যোগে" বিশদ ভাবে বলা হইয়াছে।

যাহা বুঝাইতে পারা যায় না তাহা যে সম্ভোগ করা যায় না এমন নহে। মধ্য যুগের একটি প্রিয় দৃষ্টান্ত ছিল "বোবার গুড় খাওয়া"। বোবা গুড় খাইয়া স্বাদ সুখ বোঝে কিন্তু বুঝাইবার মত শক্তি তাহার নাই। রসনায় দুই গুণ, রস গ্রহণ করা ও ভাব প্রকাশ করা। বোবার স্বাদ গ্রহণের রসনা আছে, রস পায়; কিন্তু ভাব প্রকাশের বাণী তাহার নাই। সাধকের একটি মাত্র রাস্তা আছে তাঁহার আনন্দ প্রকাশের—সেটি হইল সঙ্গীত। যখন তাঁকে জ্ঞানে ধরিতে পারি না, তখন মনের গভীর গোপনে গুঞ্জন বাজিয়া ওঠে। ইহাই হইল বাহিরে আনন্দ প্রকাশের একটি মাত্র পন্থা। তাই সঙ্গীত জ্ঞানের দ্বারা গ্রহণীয় নয়, কারণ সে সেই রাজ্যেরই বস্তু নয়। সে আনন্দলোকের ধন, আনন্দ দিয়াই তাহাকে গ্রহণ করিতে হয়। এই কারণেই অসীমের পরশ

না হইলে সঙ্গীত হয় না। সীমার কাছে ধরা দিতে আসিয়াও অসীম যে ধরা দিতে পারিল না সেই ব্যথাই হইল সঙ্গীতের মূল। যোগের সেই আনন্দকে জ্ঞানে গ্রহণ না করিতে পারার ব্যথাতেই সঙ্গীত হয় উচ্ছুসিত।

এক হইতে বহুধাবিচিত্র সৃষ্টি কেন তিনি করিলেন, দ্বৈত বা অদ্বৈত তত্ত্ব দিয়া সুবিধামত বিশ্বলীলা বুঝিয়া লইবার মত সুযোগ আমাদের জন্য কেন তিনি রাখিলেন না, সে রহস্য আমরা জানি না। এ কথা তিনি ছাড়া আর কেহ বুঝাইয়া বলিতে পারে না। মনোমোহন দেখিতেছি তাঁহার এই সৃষ্টিলীলা কিন্তু তবু বুঝিতে গিয়া হইয়া যাই দিশাহারা। আকারের পরিচয়ে এই সৃষ্টিলীলা দেখিলে আকার বুঝি। প্রাণের পরিচয়ে দেখিলে প্রাণও বুঝি, কিন্তু ব্রহ্মপরিচয় লাভ করিতে গিয়া কূল কিনারা আর পাই না। সমদৃষ্টি দিয়া জগতের বৈচিত্র্য সম্ভোগ করিতে হইবে, আত্মদৃষ্টি দিয়া একের উপলব্ধি লাভ করিতে হইবে। ব্রহ্মদৃষ্টির মধ্যে সমদৃষ্টি ও আত্মদৃষ্টি দুইই যখন এক হইয়া গিয়াছে, তখনই হইল যথার্থ পরিচয়; তখন একও নাই বহুও নাই, তখন আছে শুধু বসিয়া বসিয়া যোগ ও লীলারস-আনন্দ ও সেই পরিচয়ের প্রত্যক্ষরস সম্ভোগ করা। প্রকাশের কোনো বাণী তখন আর নাই।

তবে একটি কথা ধরা পড়িয়া গিয়াছে। নিজের বিশ্বস্বরূপ উপলব্ধি করিতে গিয়া পরব্রহ্মও আমার সহায়তার আবশ্যক বোধ করেন। কারণ এমন একটি সীমার মধ্য দিয়া ছাড়া অসীমের যথার্থ পরিচয় পাওয়া অসম্ভব। আপন আনন্দ উপলব্ধি করিতেও তাই মানবের সীমাবদ্ধ নয়নের প্রয়োজন আবার অন্য দিকে ব্রহ্মকে ছাড়া, অসীমের মধ্য দিয়া ছাড়া শুধু দেহ দিয়াই মানুষ কিছুতেই ঠিক রস, ঠিক রূপটি বুঝিয়া উঠিতে পারে না। তেমনি আমার আনন্দের মধ্য দিয়াই তিনি আত্মস্বরূপের যথার্থ সম্ভোগ পান আবার তাঁহাকে বিনাও আমার আনন্দ নিঃসহায়। তাই আমাকে তাঁহার নয়ন বলা যাইতে পারে। তিনি আমার নয়ন, আমিও তাঁহার নয়ন। আমি সীমান্বিত, তাই তাঁহার অসীমতার মধ্য দিয়া না দেখিলে সত্য পরিচয় পাই না। তিনি অসীম, আমার সীমার মধ্য দিয়া না দেখিলে তিনিও পূর্ণ পরিচয়ের আনন্দে বঞ্চিত। এই তত্ত্বটি বিশদ ভাবে দাদূর রূপমর্ম্ম প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে।

অবর্ণনীয় স্বরূপ ঃ

নহীঁ ম্রিতক নহিঁ জীৱতা নহিঁ আৱৈ নহিঁ জাই।
নহিঁ সূতা নহিঁ জাগতা নহিঁ ভূখ্যা নহি খাই॥
ন তহাঁ চুপ না বোলনাঁ। মৈঁ তৈঁ নাহীঁ কোই।
দাদূ আপা পর নহীঁ তহাঁ এক ন দোই॥
এক কহূঁ তো দোই রহৈ দোই কহূঁ তো এক।
য়োঁ দাদূ হৈরাণ হৈ জ্যোঁ হৈ ত্যোঁ হীঁ দেখ॥

"তিনি মৃতও নন জীবিতও নন, তিনি আসেনও না যানও না, তিনি সুপ্তও নন জাগ্রতও নন, তিনি বুভূক্ষিতও নন খানও না।

সেখানে চুপ করিয়া থাক, কথাটিও কহিও না, সেখানে "আমি তুমি" প্রভৃতির বালাই নাই; হে দাদূ, সেখানে না আছে আপন না আছে পর, না আছে "এক" না আছে "দুই"।

এক বলি তো থাকে দুই, দুই বলি তো থাকে এক, তাইতো দাদূ হইল দিশাহারা; তিনি যেমন আছেন ঠিক তেমনই দেখ। (তত্ত্ববাদীদের সুবিধা করার জন্য সেই লীলার রসটি যে একপেশে হইয়া মাটী হয় নাই, ইহাতে রসিক পরিতৃপ্ত, যদিও দার্শনিক হইলেন হতাশ)।"

তাঁহার আনন্দের কি পরিমাণ আছে?

কেতে পারিখ পচি মুয়ে কীমতি কহী ন জাই।
দাদূ সব হৈরান হৈঁ গূংগে কা গুড় খাই॥
দাদূ কেতে চলি গয়ে থাকে বহুত সুজান।
বাতোঁ নাৱঁ না নীকসৈ দাদূ সব হৈরান॥
দেখি দিৱানে হোই গয়ে দাদূ খরে সয়ান।
বার পরে কোই না লহৈ দাদূ হৈ হৈরান॥

"কত কত জহুরী (পরখ করনেওয়ালা) মরিল পচিয়া, (তাঁহার) মূল্য বলাই যায় না; হে দাদূ, সবাই হইল দিশাহারা, যেন বোবা খাইল গুড়।

হে দাদূ, কত কত জন গেল চলিয়া, কত সুজন হইয়া গেল ক্লান্ত; কথায় কিছুই হইল না প্রকাশ, হে দাদূ, সবাই হইল দিশাহারা।

ভাল ভাল সব বুদ্ধিমান ইহা দেখিয়াই হইয়া গেল পাগল ; বার পার (সীমা সংখ্যা) তো কেহই পায় না, দাদূ তাই হইয়া গেল দিশাহারা।”

হে অগম্য, যেমন বুঝি তেমনই বলি

হস্ত পাৱঁ নহিঁ সীস মুখ স্রবন নেত্র কহুঁ কৈসা।
দাদূ সব দেখৈ সুনৈ কহৈ গহৈ হৈ ঐসা॥
কেতে পারিখ অংত ন পাৱৈ অগম অগোচর মাহীঁ
দাদূ কীমতী কোই ন জানৈ তাতেঁ কহ্যা ন জাহীঁ।
জৈসা হৈ তৈসা নাৱঁ তুম্হারা জ্যোঁ হৈ ত্যোঁ কহি সাঈঁ
তূঁ আপৈ জানৈ আপকো তহঁ মেরী গম নাহীঁ॥

“হাত পা মাথা মুখ তাঁর নাই, শ্রবণ নেত্র বা বল তাঁর কেমন? অথচ তিনি এমন, যে সবই দেখেন শোনেন, বলেন ও গ্রহণ করেন।

কত কত জহরী (পারখী, পরখকরনেওয়ালা) অন্তই পায় না সেই অগম্য অগোচরের মধ্যে। হে দাদূ, কেহই তো বোঝে না তার মূল্য। তাতেই যায় না কিছু বলা।

যেমন আছে ঠিক তেমনই তোমার নাম, ইহার বেশী তো আর বলা চলে না ; যেমন আছে তেমনি কহি, হে স্বামী ; আপনিই তুমি জান আপনাকে। সেই অগম্যের মধ্যে যে আমার প্রবেশই নাই।”

সহ-সেবকের কাছে পরিচয়ঃ

জীৱ ব্রহ্ম সেৱা করৈ ব্রহ্ম বরাবরি হোই।
দাদূ জানৈ ব্রহ্ম কোঁ ব্রহ্ম সরীখা সোই॥*
বার পার কোই না লহৈ কীমতি লেখা নাহিঁ।
দাদূ একৈ নূর হৈ তেজ পূংজ সব মাহিঁ॥

“জীব যদি ব্রহ্ম-সেবা করে তবে ব্রহ্মেরই সমান যায় হইয়া, হে দাদূ, সে ব্রহ্মকে জানে এবং সে ব্রহ্মেরই হয় সমধর্ম্মী।

---

* “ব্রহ্ম শরীকা সোই” পাঠে “সে ব্রহ্মের সরিক হয়।” অর্থাৎ “তাঁর সঙ্গে তার ভাগাভাগীর দাবী চলে। সে ব্রহ্মের সঙ্গে যুক্ত।” এই বিষয়টি দাদূর অদ্বৈত যোগ প্রবন্ধে ভাল করিয়া বলা হইয়াছে।

বার পার (সীমা সংখ্যা) কেহই তো তাঁর পায় না, তাঁর মূল্যও যায় না লেখা ; হে দাদূ, তিনিই এক মাত্র জ্যোতি, সকলের মধ্যে সেই তেজঃপুঞ্জই দেদীপ্যমান ।”

ব্রহ্মানন্দে মনের গভীরে অব্যক্ত গুঞ্জন

গূংগে কা গুড় কা কহূঁ মন জানত হৈ খাই।
রাম রসাইন পীৱতাঁ সো সুখ কহ্যা ন জাই ॥
এক জীভ কেতা কহূঁ পূরণ ব্রহ্ম অগাধ।
বেদ কতেবাঁ মিত নহীঁ থকিত ভয়ে সব সাধ ॥
দাদূ মেরা এক মুখ কীরতি অনঁত অপার।
গুণ কেতে পরমিত নহীঁ রহে বিচারি বিচার ॥
সকল সিরোমণি নাৱঁ হৈ তূঁ হৈ তৈসা নাহিঁ ।
দাদূ কোই না লহৈ কেতে আৱহিঁ জাহিঁ ॥
দাদূ কেতে কহি গয়ে অংত ন আৱৈ ঔর।
হম হূঁ কহতে জাত হৈঁ কেতে কহিসী হোর ॥
মৈঁ কা জানূঁ কা কহূঁ উস বেলা* কী বাত।
ক্যা জানো কৈসে রহৈ মো পৈ লখ্যা ন জাত ॥
পার ন দেৱৈ আপনা গুপ্ত গূংজ মন মাহিঁ।
দাদূ কোই না লহৈ কেতে আৱহিঁ জাহিঁ ॥

“বোবার গুড়! কি আর বলিব? মন জানিতেছে সেই সম্ভোগ। রামরসামৃত পান করার কি আনন্দ তাহা তো যায় না বলা।

এক জিহ্বা, কত আর কহিব ; পূর্ণ ব্রহ্ম অগাধ! বেদ কোরাণ সকল শাস্ত্রে অপরিমেয় সেই আনন্দ ; সকল সাধক হইয়া গেলেন হয়রান।

আমার এক মুখ, অনন্ত অপার তাঁহার কীর্ত্তি, গুণ যে কত তার নাই পরিমাণ, কেবল ভাবিতে ভাবিতেই গেলাম রহিয়া!

---

* “বেলা” স্থলে “বলিয়া” পাঠও আছে। তাহার অর্থ হইবে সমর্থ, বলবান। অর্থাৎ “সেই মহাশক্তিশালীর কথা আমি আর কি জানিব।”

সকল শিরোমণি তোমার নাম, তুমি যেমন আছ এমন আর কিছুই নাই; কেহই তো তাহা পরিপূর্ণভাবে পারিল না লইতে, কত কত জনই তো অনবরত আসিতেছে ও যাইতেছে চলিয়া।

কত কত জনই গিয়াছেন বলিয়া তবু অন্ত কি তার কিছু আছে? আমিও তো আজ যাইতেছি বলিয়া, কত কত জন আরও বলিবেন ভবিষ্যতে।

আমি কি-ই বা বুঝি, কি-ই বা বলি সেই (ব্রহ্মযোগ-রস-সম্ভোগের) সময়ের কথা? কি-ই বা বুঝি কেমন ভাবে রহে তখন সেই আনন্দ ও অনুভব? তাহা লক্ষ্য করিয়া মনের মধ্যে রাখা আমার সাধ্য নহে।

তিনি তো কোথাও দেন না আপন কূল কিনারা? কেবল গুপ্ত গুঞ্জনই * রহিয়া যায় মনের মধ্যে। হে দাদূ, কত জনই যে আসে যায় কেহই তো করিতে পারে না উপলব্ধি।"

সৃষ্টির রহস্য

জিন্হ মোহন বাজী রচী সো তুম্হ পূছৌ জাই।
অনেক একথৈঁ ক্যোঁ কিয়ে সাহিব কহি সমুঝাই॥
ঘট পরচই সব ঘট লখৈ প্রাণ পরচই প্রাণ।
ব্রহ্ম পরচৈ পাইয়ে দাদূ হৈ হৈরান॥
সমদৃষ্টি দেখৈ বহুত আতম দৃষ্টি এক।
ব্রহ্ম দৃষ্টি পরচৈ ভয়া দাদূ বৈঠা দেখ॥
এহী নৈনাঁ দেহকে এহী আতম হোই।
এহী নৈনাঁ ব্রহ্মকে দাদূ পলটে দোই॥

"যিনি এই মোহন লীলা করিয়াছেন রচনা, তাঁর কাছেই গিয়া জিজ্ঞাসা কর, 'হে স্বামী, এক হইতে কেন অনেক করিলে রচনা? এই রহস্যটি বল বুঝাইয়া।'

ঘট পরিচয়ে সব ঘটের মেলে পরিচয় (দেহের পরিচয়ে "দেহজগতের" পরিচয় বুঝা যায়), প্রাণ পরিচয়ে প্রাণ জগতের বুঝা যায় পরিচয়, ব্রহ্ম পরিচয় পাইতেই দাদূ হয় দিশাহারা।

---

* কেহ কেহ অর্থ করেন "গুপ্ত ব্যথা রহিয়া যায় মনের মধ্যে।" "গুংজ" স্থলে "গূঝ" পাঠও আছে, তাহা হইলে অর্থ হইবে "গুহ্য", গোপনীয়।

সমদৃষ্টি দেখে বিচিত্র নানাবিধ, আত্মদৃষ্টি দেখে এক। ব্রহ্ম দৃষ্টি (যাহাতে সমদৃষ্টি ও আত্মদৃষ্টি সবই আছে) দিয়াই হয় যথার্থ পরিচয়, হে দাদূ, বসিয়া বসিয়া দেখ সেই লীলা।”

এই যে আত্মা ইনিই হইলেন এই দেহের নয়ন। আবার এই (আমার) আত্মাই হইল ব্রহ্মের নয়ন; হে দাদূ, দুইই পরস্পরের জন্য যায় পালটিয়া।”

চতুর্থ প্রকরণ—সাধনা

৮ম অঙ্গ (সহায়ক অঙ্গ ১ম) “বিনতী”

মধ্য যুগের সাধকদের ভাষায় “বিনয়” ও “বিনতী” বা বিনতি বলিতে প্রার্থনাই বুঝায়। তুলসীদাসের বিনয় পত্রিকা দেখিলেই কতকটা ইহার পরিচয় মেলে। দাদূ প্রভৃতির “ বিনতী ” প্রার্থনার হিসাবে খুব উচ্চদরের প্রার্থনা।

সাধারণতঃ “বিনয়ের” মধ্যে থাকে নিজের দৈন্য ও অপরাধ স্বীকার করা, ভগবানের উপর রক্ষার ভার দেওয়া, ভগবানই যে ভরসা ইহা স্বীকার করা, নিজের পতনের হেতু নির্দ্দেশ করা, ভগবান ইচ্ছা করিলে যে সব দুর্গতি দূর করিতে পারেন ইহা বিশ্বাস করা এবং সব শেষে ভগবানের কাছে যাহা চাই তাহা প্রার্থনা করা।

১। প্রথমেই দাদূ বলিতেছেন,“আমার মত অপরাধী জগতে কেহই নাই। তিনি আমার স্বামী, তাই বলিয়া আমার দোষে যেন তাঁকে করিও না দোষী।”

“হে স্বামী, তোমাকে সেবা করিব বলিয়া যে সব শক্তি পাইয়াছিলাম তাহাতে যখন নিজের সুখ ও ভোগই খুঁজিয়াছি তখন আমি তোমার সেবা হইতেই চুরি করিয়াছি বলিতে হইবে। আমি ‘সেবা-চোর’। আমার মত অপবিত্র কে!”

তিল তিল করিয়া আমি চুরি করিয়াছি, পলে পলে চুরি করিয়াছি, সবই তুমি জান। কত অপরাধভার আমার মাথায়! শরণ লইতে পারি এমন উদার গভীর স্থান তুমি ছাড়া আর কোথাও নাই।"

২। "জীব বেচারার শক্তি বা কত! অথচ বন্ধনের তাহার নাই সীমা পরিসীমা। তোমার দরবারে আসিলে সবারই সব বন্ধন ঘোচে। তাহারও বন্ধন তবে ঘুচুক।"

"আমার মধ্যে সব দোষই আছে, সব দোষই দিনে দিনে চলিয়াছে প্রবল হইয়া, এমন দোষই নাই যাহা আমাতে নাই। মানুষকে ঠকান যায়, তোমাকে ঠকান অসম্ভব।"

"তোমার কথা যে ভুলি, তুমি রক্ষাকর্ত্তা একথা যে ভুলি, এই বড় দুঃখ। হে স্বামী, তুমি দয়া কর।"

"তোমাকে ছাড়িয়া অন্যত্র গেলাম, কোথায়ও মিলিল না ঠাঁই, এখন অনুতপ্ত হইয়া তোমার কাছেই ফিরিতেছি।"

"প্রেমে ও দয়াতে তুমি সেবক হইয়াছ, আমাকেও গ্রহণ কর তোমার সেবাব্রতে; সেবা আমার সাচ্চা ও দৃঢ় কর, তবেই দর্শন পাইব।"

"তোমাকে যে ছাড়িয়াছে তাকে তুমি ছাড় নাই। যতবার যোগসূত্র যায় ছিঁড়িয়া আবার নূতন করিয়া কর যোগস্থাপন। আমাদের যোগসূত্র কাঁচা সূতার; ছিঁড়িলেও জোড়া লাগে। সূতা পাকাইলে আর তাহা হয় না। সংসারের কোনো পাকেই আমাদের যোগসূত্রকে যে পাক খাইয়া কঠিন হইতে দাও নাই, তাই আজ রক্ষা।"

"কত জায়গায় আমার ফুটা, কত জায়গায় বাঁকা, টোল খাওয়া, পাক খাওয়া; সে সব ত্রুটি সারিয়া আমাকে যথার্থ ঠিকানায় দাও পৌছাইয়া।"

৪। "ভবসাগরের মধ্যে এই জীবনটি যেন একটি ক্ষুদ্র তরীর মত চলিয়াছে ভাসিয়া; সম্মুখে ঘোর অন্ধকার কিছুই যায় না দেখা; কুল কিনারা নাই; হে গভীর অগাধ, তুমি যদি এই নৌকার হাল না ধর তবে কেমন করিয়া আমি হই পার?"

অন্যেরা সামান্য রকম করিতে পারে উদ্ধার, প্রাণ-উদ্ধার তুমি ছাড়া কে আর পারে করিতে?

আকাশ যদি ভাঙ্গিয়া মাথায় পড়ে, পৃথিবীর অণু পরমাণু যদি বিশ্লিষ্ট হইয়া শূন্যীভূত হইয়া যায় তবে কে রাখে? পৃথিবীর চেয়েও তুমি বেশী আশ্রয়, তোমার আশ্রয় গেলে উপরে আশ্রয় কোথায়?

বসন্তের পরশ অমৃতময়। সে বৃক্ষলতার প্রকৃতির উপরকার জড়তার পরদা সরাইয়া কুসুমের তরঙ্গ ফুলের বন্যা আনিয়া দেয়। বসন্তের কাছে আপন পরদা বিসর্জ্জন দিয়া প্রকৃতি ফুলের তরঙ্গময় নবজীবন পায়। আমার যে সব বাধা যে সব আবরণ জমিয়াছে তাহা যদি তুমি দূর কর তবে পুষ্পতরঙ্গময় নবজীবন পাইব।

সকলে আবরণ উন্মোচন করিতে গিয়া প্রাণ হরণ করে, তাই যাহার তাহার কাছে আবরণ বিসর্জ্জন দিতে পারি না। কোনো শাস্ত্রের কোনো সম্প্রদায়ের বা আর কিছুর উপর সেই ভার দিলে চলিবে না। তাহারা প্রাণ নেয়, প্রাণ দেয় না।

৫। সূর্য্য চন্দ্র তারা প্রভৃতি লইয়া যে এই বিশ্ব পৃথিবী তাহা সত্যের দ্বারা হইয়া আছে বিধৃত। এই সত্য এই যোগসূত্র যদি ছিন্ন হয় তবে সব যে যায় স্থানভ্রষ্ট হইয়া; অণু পরমাণু সব ছন্নছাড়া হইয়া মহা প্রলয় হয় উপস্থিত। যে সত্য সকল যোগের মূল আধার সেই সত্য হইতে ভ্রষ্ট হইলে আর রক্ষা নাই।

বাহিরের যোগসূত্রের মত অন্তরের প্রেম সকল বিশ্বের গভীরতম যোগসূত্র। প্রেমসূত্র যদি ছিন্ন হয় তবে তাহার কোথাও রক্ষা নাই।

সত্য যোগসূত্র যদি ছিন্ন হয়, প্রেমসূত্র যদি ছিন্ন হয় তবে জগতে শূরত্ব, বীরত্ব, ধৈর্য্য কিছুই থাকে না। এই কথা সকলে বোঝেন না যে প্রেমই সকল বীরত্বের মূল। প্রেমহীন কখনও মানুষের মত মানুষ বা বীর হইতে পারে না। প্রেম যখন গেল তখন বুঝিতে হইবে মৃত্যু উপস্থিত। মৃত্যুর অধিকারে আসিলেই মানুষ মনে করে বীর হইতে গেলে প্রেমকে ছাড়িয়াই সাধনা চলে।

৬। তাঁহার সৌন্দর্য্য আছে বলিয়াই জগৎ সুন্দর। তিনি অন্তরে প্রেম লইয়া সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়াই জগৎকে এমন সুন্দর করিতে পারিয়াছেন। যেন সৌন্দর্য্যকে প্যালা করিয়া তিনি আপন অন্তরের প্রেমরস সবার কাছে দিয়াছেন ঢালিয়া। এই রহস্য যে জানে সে-ই প্রেম ও সৌন্দর্য্যের তত্ত্ব জানে।

বিশ্বের অন্তরে প্রেম যদি না থাকিত তবে বিশ্বের সৌন্দর্য্য জগৎকে করিত হীন ও পতিত। বাহিরের সৌন্দর্য্য যদি অন্তর-রসের প্রকাশ না হয় তবে সেই ভ্রষ্টতা মানুষকে দিনে দিনে পলে পলে থাকে মারিতে। অন্তরে প্রেম আছে বলিয়াই বিশ্ব সৌন্দর্য্য আমাদিগকে দেয় নব প্রাণ। ভগবান সৌন্দর্য্য-প্যালায় ভরিয়া প্রেম দিয়া জগৎকে দিতেছেন নিত্য নব জীবন। কেবল বাহিরের সৌন্দর্য্য রস পান করাইবার জন্যই বিশ্বে এত আয়োজন! বিশ্ব সৌন্দর্য্যের প্যালা ভরিয়া যে তিনি তাঁহার অন্তরের অসীম প্রেমরস চান পান করাইতে। এই রসে মাতাল হইতেই ভক্তেরা রসিকেরা নিত্য করেন প্রার্থনা।

৭। এই প্রেম রসের উপর কি আমাদের কোনো দাবী আছে? তিনি দয়া না করিলে আমার কোনো দাবীই নাই। শুধু সাধনা করিয়া এই যোগ্যতা লাভ করিতে হইলে কোটি কল্প কালেও সেই যোগ্যতা লাভ করা যাইত না।

৮। কাজেই বলিতে হয়, "হে প্রভু, আমার ইচ্ছাকে তোমার ইচ্ছার পদানত করিতেছি, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক। চাই তুমি আমাকে রাখ বা মার, তোমার ইচ্ছার উপর নিজেকে সমর্পণ করাই একমাত্র কল্যাণ।"

৯। তাই কোনো কিছু বর না চাহিয়া তোমার কাছে নিত্য চাহি -তোমাতে প্রেম ও ভক্তি। সেই প্রেম যেন তাজা জীবন্ত ও নিত্য নূতনতম হয়। যেখানে প্রাণ আছে সেখানে দৈন্য কেন থাকিবে? বসন্ত যখন আসে তখন কি দীনের মত পুরাতন বৎসরের শুষ্ক ফুলের পোঁটলা পুঁটলি লইয়া সে আসে? প্রাণের উপর ভরসা আছে বলিয়াই বসন্ত যখন যায় তখন তাহার সব উৎসব সমারোহ ছড়াইয়া দিয়া যায় চলিয়া। নূতন বৎসরে যখন বসন্ত আসে তখন তাহার "নবতম প্রেম" লইয়া "নূতনতম কুসুম লহর" লইয়া ফুলের বন্যা বহাইয়া সে আসে। প্রাণধর্ম্মে, বিশ্বের অন্তরের প্রেমে বিশ্বাস করে বলিয়াই উৎসবের পর উচ্ছিষ্ট সম্ভার দীনের মত সঞ্চয় করিয়া সে রাখে না।

ভক্তেরা তাই শাস্ত্র ও লোকাচার গ্রাহ্যই করেন না। এই সব হইল পুরাতন উৎসবের উচ্ছিষ্টের সঞ্চয়। কেন পুরাতনের জীর্ণ ভার বৃথা বহন করা? এই পুরাতনের ভার যে নব প্রাণের উৎসমুখে চাপিয়া প্রাণকেই দেয় বাধা।

তাই ভক্ত বলেন, "অন্য কোনো বর চাহি না। চাই প্রাণ, চাই প্রেম। তবেই নিত্য নূতন ঐশ্বর্য্যে হইয়া উঠিব পূর্ণ। ঐশ্বর্য্য না চাহিয়া তাই চাই প্রেম।

সন্তোষ দাও, সত্য দাও, ভাব দাও, ভক্তি দাও, বিশ্বাস দাও,—আর কিছুই চাই না।"

"প্রেমহীন মন নিত্য সংশয়ে শঙ্কায় ভরা। সেই সব সংশয় ও শঙ্কা দূর করিয়া সহজ সমতা কর প্রকাশ। সহজ সমতা পাইলে জগৎ সুদ্ধ আমার আপন হইবে। বিশ্বের সঙ্গে যোগ সহজ হইবে।"

"সংশয় শঙ্কার নাস্তিকতায় আছে জীবন ভরিয়া। তাই মরিতেছি পুরাতনের জীর্ণ বোঝার ভারে। এই ভার সরাও। নাস্তিকতা দূর কর, আস্তিকতা দ্বারা জীবনকে নিত্য নূতন করিয়া নবজীবনে কর পূর্ণ। অন্তর নির্ভয় হইবে।"

৯। দোষের অন্ত নাই আমার।

দাদূ বহুত বুরা কিয়া মুখ সোঁ কহ্যা ন জাই।
নিরমল মেরা সাঈয়াঁ তা কোঁ দোস ন লাই॥
সাঈঁ সেৱা চোর মৈঁ অপরাধী বংদা।
দাদূ দূজা কোই নহীঁ মুঝ সরীখা গংদা॥
তিল তিলকা অপরাধী তেরা রতী রতীকা চোর।
পল পল কা মৈঁ গুণহীঁ তেরা বকসহু অৱগুণ মোর॥
দোষ অনেক কলংক সব বহুত বুরা মুঝ মাঁহিঁ।
মৈঁ কীয়ে অপরাধ সব তুম্ থৈঁ ছানা নাঁহিঁ॥
গুণহগার অপরাধী তেরা ভাগি কহাঁ হম জাঁহিঁ।
দাদূ দেখ্যা সোধি সব তুম্হ বিন কহিঁ ন সমাঁহিঁ॥

"অনেক অনেক অন্যায় করিয়াছে দাদূ, মুখে সে সব যায় না বলা; নির্ম্মল আমার স্বামী, তাঁহাকে দিও না কোনও দোষ।

হে স্বামী, আমি সেবা-চোর (তোমার সেবা হইতে হরণ করিয়া নিজের ভোগে লাগাইয়াছি), আমি অপরাধী দাস; হে দাদূ, আবার সমান মলিন ঘৃণিত অপবিত্র দ্বিতীয় আর কেহই নাই।

প্রতি তিলে তিলে আমি তোমার কাছে অপরাধী, রত্তি রত্তির চোর

আমি, প্রতি পলে পলে তোমার কাছে আমি অপরাধী, আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর।

অনেক আমার দোষ, সব আমার কলঙ্ক, অনেক অনেক অন্যায় আমার মধ্যে, সব অপরাধ আমি করিয়াছি, সে সব কিছু তো তোমার অগোচর নাই।

আমি দোষী, তোমার কাছে অপরাধী; পলাইয়া আর আমি যাইব বা কোথায়? দাদূ সব দেখিয়াছে খোঁজ করিয়া, তোমা বিনা আমার আর আশ্রয়ের ঠাঁই নাই।"

২। অন্তর্য্যামী প্রভু রক্ষা কর।

বহু বংধন সোঁ বংধিয়া এক বিচারা জীর।
অপনে বল ছূটৈ নহীঁ ছোড়নহারা পীর॥
দাদূ বংদীরান হৈ তূ বংদীছোড় দিরান।
অব জিনি রাখহু বংদি মৈঁ মীরাঁ মেহরবান॥
দাদূ অংতরি কালিমাঁ হিরদয় বহুত বিকার।
গরগট পূরা দূরি কর দাদূ করৈ পুকার॥
সব কুছ ব্যাপৈ রামজী কুছ ছূটা নাহীঁ।
তুম্হথৈঁ কহাঁ ছিপাইয়ে সব দেখহু মাঁহিঁ॥
সবল সাল মন মেঁ রহৈ রাম বিসরি ক্যোঁ জায়।
য়হু দুখ দাদূ ক্যোঁ সহৈ সাঁঈঁ করহু সহায়॥

"বহু বন্ধনে বদ্ধ একেলা বেচারা জীব, আপন শক্তিতে বন্ধন তো ছুটিবে না, এক প্রিয়তমই পারেন বন্ধন মুক্ত করিতে।

দাদূ হইল বদ্ধ বন্দী, হে পরমাত্মা, তুমি সকল বন্ধন-মোচন; হে দয়াময় প্রভু, আর বন্দিদশার মধ্যে আমাকে রাখিও না।

দাদূর অন্তরে কালিমা, হৃদয়ে অনেক বিকার; হে ভগবান, আমার লোক-দেখান পূর্ণতা দূর কর।* তাই দাদূ কাতরে তোমাকে ডাকিতেছে।

---

* "অন্তরের সব বিকার করিয়া দাও প্রকটিত, কিছুই গুপ্ত রাখিও না", এই অর্থও হয়।

হে ভগবান, সব কিছু অন্যায়ই প্রবল ভাবে আমার মধ্যে করিতেছে কাজ, কিছুই তো দূর হয় নাই; তোমা হইতে তাহা কোথায় লুকাইব? সবই দেখ বিদ্যমান আমার অন্তরের মধ্যে।

"ভগবানের কথা কেন মন যায় ভুলিয়া?" এই প্রবল ব্যথাই সদাই বিঁধিতেছে মনের মধ্যে। কেন বা আমায় এই দুঃখ হয় সহিতে? হে প্রভু, তুমি হও আমার সহায়।"

৩। দুঃখী তোমার কাছেই ফিরিল।

দাদূ পছতাৱা রহ্যা সকে ন ঠাহর লাই।
অরথি ন আয়া রামকে য়হু তন যোঁহী জাই॥
সাহিব সেৱক দয়াল হৈঁ সেৱা দিঢ় করি লেহু।
পারব্রহ্ম সোঁ বীনতী দয়া করি দরশন দেহু॥
সব জীৱ তোরৈঁ রাম সোঁ পৈ রাম ন তোরৈ।
দাদূ কাচে তাগ জ্যোঁ তোরৈ তোঁ জোরৈ॥
ফূটা ফেরি সৱাঁরি করি লে পহুঁচারৈ ওর।
ঐসা কোই না মিলা দাদূ গয়া বহোর॥

"হে দাদূ, এই অনুতাপ রহিল মনে যে আশ্রয়ের ঠাঁইতে লাগিয়া রহিতে পারিলাম না; ভগবানের কাজে আসিল না বলিয়া এই দেহ এমনই গেল বৃথায়।

স্বামী আমার সেবক-দয়াল, তুমিও সেবাকে লও দৃঢ় করিয়া; পরব্রহ্মকে এই বিনতি (প্রার্থনা), যে দয়া করিয়া দাও দরশন।

সব জীব ভগবানের সঙ্গে (প্রেম বন্ধন) করে ছিন্ন, কিন্তু তিনি (সে বন্ধন) কখনো করেন না ছিন্ন; হে দাদূ, (সে প্রেম সম্বন্ধ) কাঁচা (পাক না খাওয়া) সুতার মত, যেমন সে ছেঁড়ে তেমনই আবার চলে জোড়া।

ফুটা বাঁকান ও টোল-খাওয়া (পাত্র) সারাইয়া সুরাইয়া লইয়া ঠিকানা মত পৌছিয়া দেয় এমন মিলিল না কেহই, তাই দাদূ ফিরিয়া আসিল তোমার কাছে (অথবা সময় গেল বহিয়া)।"

৪। শ্রীহরি ভরসা।

যহু তন মেরা ভৱজলা কোঁ্যা করি লাঁঘৈ তীর।
খেৱট বিন কৈসে তিরৈ দাদূ গহির গঁভীর॥
য়হু ঘট বোহিত ধারমৈঁ দরিয়া বার ন পার।
ভীত ভয়ানক দেখি করি দাদূ করী পুকার॥
আগে ঘোর অংধার হৈ তিসকা বার ন পার।
দাদূ তুম্হ বিন কোঁ্যা তিরৈ সমরথ সিরজনহার॥
আতম জীৱ অনাথ সব উবারৈ করতার।
কোই নহীঁ করতার বিন প্রাণ উধারনহার॥
তেরা সেৱক তুম্হ লগৈঁ তুম্হ হীঁ পর সব ভার।
দাদূ বূড়ত রামজী বেগি উতারৌ পার॥
গগন গিরৈ তব কো ধরৈ ধরতী ধর ছংডৈ।
জো তুম্হ ছাড়হু রামজী কংধা কো মংডৈ॥
তন মন তুম্হ কোঁ সোঁপিয়া সাচা সিরজনহার।
তুম্হ বিচি অংতর জিনি পরৈ তাথৈঁ করূঁ পুকার॥
সকল ভুৱন সব আতমা ইমরিত করি হরি লেই।
পরদা হৈ সো দূরি করি কুস্থুম লহর তহিঁ দেই[*]॥

"ভবই সাগর, এই আমার তনু কেমন করিয়া ভবজল পার হইয়া পাইবে তীর? পারকর্ত্তা কর্ণধার বিনা গভীর গম্ভীর এই সাগর কেমন করিয়া হইবে পার?

এই দেহটি যেন ধারার মাঝে নৌকাখানি, অথচ সমুদ্রের নাই কুল কিনারা, ভয়ানক ভীতি দেখিয়া দাদূ ডাকিতেছে তোমাকে কাতরে।

---

[*] "কসমল রহণ নহি দেই" পাঠ অংগবংধূতে আছে। তাহার অর্থ "পাপ আর থাকিতেই দেয় না।"

সম্মুখে ঘোর অন্ধকার, না আছে তার কূল না আছে তার কিনারা, তোমা বিনা দাদূ কেমন করিয়া তাহা তরিবে? তুমিই সর্ব্বশক্তিমান সৃজনকর্ত্তা।

(তিনি বিনা) সব জীব, সব আত্মা (মানুষ) অনাথ, “করতার”ই (বিশ্বকর্ত্তা) একমাত্র পারেন উদ্ধার করিতে, “করতার” বিনা এমন কেহই নাই যে করিতে পারে প্রাণ-উদ্ধার।

তোমার সেবক তোমার সাথে সাথে, তোমার উপরই সব ভার; হে ভগবান, দাদূ ডুবিতেছে, শীঘ্র তাকে পারে কর উত্তীর্ণ।

আকাশ যদি, (মাথার উপর) ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যায় তবে কে তাকে ধরে? ধরিত্রী যদি তার ধৃতি গুণ ত্যাগ করে তবে কে তাকে রাখে? হে ভগবান, তুমি যদি আমাকে ছাড়, তবে কে আমাকে স্কন্ধ দিবে (কে আমার ভার নিবে, কে আমাকে আশ্রয় দিবে)?

হে সাচ্চা বিশ্ববিধাতা, তনু মন আমার সঁপিলাম তোমাকে; তোমার আমার মধ্যে যেন আর কোনো ব্যবধান না ওঠে ঘটিয়া, তাই তোমাকে আমি কাতরে করি নিবেদন।

সকল ভুবন সকল আত্মাকে হরি লন অমৃত করিয়া। পরদা যাহা আছে তাহা দূর করিয়া কুসুমের লহর সেখানে দেন বহাইয়া।”

৮ঃ সত্যভ্রষ্টের প্রেমভ্রষ্টের পতনঃ

চন্দ্র তপন তার টূটৈ ধর ভূধর টূটি জায়।
সত্য ছূটা সবহি টূটা জক্ত রাখহি কৌন আয়॥
জেঁ্যা রৈ বরত গগনতেঁ টূটৈ কহাঁ ধরণী কহঁ ঠাম।
লাগী সুরতি অংগথৈঁ ছূটৈ সো কত জীরৈ রাম॥
সত ছূটা সুরাতন গয়া বল পৌরুষ ভাগা জাই।
কোঈ ধীরজ না ধরৈ কাল পহুঁচা আই॥

“চন্দ্র তপন তারা যায় টুটিয়া, ধরা ভূধর যায় চূর্ণ হইয়া। সত্য হইতে ভ্রষ্ট হইলে সবই যায় চূর্ণ চূর্ণ হইয়া, তখন কে আসিয়া জগতকে করে রক্ষা?

যেই ডোরে সব কিছু বিধৃত, সেই ডোর যদি গগন হইতে যায় টুটিয়া, তবে কোথায় বা ধরণী আর কোথায় বা কিছু ঠাঁই ঠিকানা? যে প্রেম-যোগে সব যুক্ত সেই প্রেম যদি অঙ্গ হইতে ছোটে, তবে হে ভগবান, কোথায় সে বাঁচে, আর সে বাঁচেই বা কেমন করিয়া?

সত্য যেই গেল ছুটিয়া তখন শূরত্বও গেল বল পৌরুষও গেল পলাইয়া, কোনো ধৈর্য্যই আর তখন টিকিল না, কাল (মৃত্যু) আসিয়া হইল একেবারে উপস্থিত।”

৬। সৌন্দর্য্য-বাহিরের প্যালা, প্রেম অন্তরের রস।

তেরী খূবী খূব হৈ সব নীকা লাগৈ।
সুংদর সোভা কাঢ়ি লে সব কোঈ ভাগৈ॥
তুম্হ হো তৈসী কীজিয়ে তৌ ছূটৈঁগে জীৱ।
হম হৈঁ ঐসী জিনি করৌ কহঁ প্রেম রূপ হৈ পীৱ॥
দাদূ প্যালা প্রেমকা সাহিব রাম পিলাই
পরগট প্যালা দেহু ভরি মিরতক লেহু জিলাই॥
আল্লা আলে নূরকা ভরি ভরি প্যালা দেহু।
হম কূঁ প্রেম পিলাই করি মতৱালা করি লেহু॥

“মনোহর তোমার মনোমোহন সৌন্দর্য্য, তাই সবই লাগে চমৎকার। হে সুন্দর, তোমার শোভা যদি লও বাহির করিয়া (কাড়িয়া) তবে সবই যাইবে পলাইয়া।

তুমি যেমন (প্রেম-সুন্দর , তেমন যদি (জীবকে)কর, তবেই জীব পাইবে উদ্ধার। আমি যেমন, তেমন যেন কাহাকেও করিও না; হে প্রিয়তম কোথায় আছে আমাব প্রেম কোথায় আছে আমার রূপ?

হে ভগবান, হে স্বামী, প্রেমের প্যালা তো করাইলে পান, এখন (তোমার রূপ ও সৌন্দর্য্যের) প্রত্যক্ষ প্যালা দাও ভরিয়া, মৃতকে লও জিয়াইয়া।

হে আল্লা, পরম জ্যোতির প্যালা দাও ভরিয়া ভরিয়া, প্রেম পান করাইয়া আমাকে লও মাতাল করিয়া।”

৭। তোমার দয়াতেই হইবে।

অনাথূঁ কা আসিরা নিরাধার আধার।
অগতি কা গতি রাম হৈ দাদূ সিরজনহার॥
তেরা দর দাদূ খড়া নিস দিন করৈ পুকার।
মীরাঁ! মেরা মিহর করি প্রীত দে দীদার॥
তুম্হ কূঁ হমসে বহুত হৈঁ হমকূঁ তুম্হ সা নাহিঁ।
দাদূকূঁ জিন পরহরৈ তূঁ রহু নৈনহুঁ মাঁহিঁ॥
তুম্হ থৈঁ তবহীঁ হোই সব দরস পরস দরহাল।
হম থৈঁ কবহূঁ ন হোইগা জে বীতহিঁ জুগ কাল॥
তুম্হীঁ তেঁ তুম্হ কূঁ মিলে এক পলক মৈঁ আই।
হম থৈঁ কবহুঁ ন হোইগা কোটি কলপ জে জাই॥

“হে দাদূ, অনাথগণের আশ্রয় ও ভরসা রাম, নিরাধারেরও আধার রাম, অগতির গতিও রাম। রামই সৃজন কর্ত্তা।

তোমারই দ্বারে তোমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া দাদূ নিশি দিন কাতরে ডাকিতেছে তোমাকে, হে আমারপ্রভু, দয়া করিয়া আমায় প্রেম দাও, তোমার সুন্দর রূপ দেখাও।

আমার মত তোমার অনেক আছে, তোমার মত আমার কেহই নাই; দাদূকে যেন কখনো ছাড়িও না, তুমি থাক আমার নয়নে নয়নে।

তোমা হইতেই তবে সব হইবে—দরশ পরশ ও প্রেমের দশা; যুগ যুগ কাল কাটিলেও আমা হইতে কখনই কিছু হইবে না।

তোমা হইতেই (তোমার কৃপাতেই) এক পলকের মধ্যেই তোমাকে পাই, আমা হইতে (আমার শক্তিতে যদি হইবার হইত), কোটি কল্পকাল গেলেও কখনও ইহা নহে হইবার।”

৮। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

তুম্হ কূঁ ভাবৈ ঔর কুছ হম কুছ কীয়া ঔর।
মেহর করৌ তো ছূটিয়ে নহীঁ তো নাহীঁ ঠৌর॥
মুঝ ভাবৈ সো মৈঁ কিয়া তুঝ ভাবৈ সো নাহিঁ।
দাদূ গুনহগার হৈ মৈঁ দেখ্যা মন মাহিঁ॥

খুসী তুম্হারী তূঁ্য করৌ হম তৌ মানী হার।
ভাৱৈ বংদা বকসিয়ে ভাৱৈ গহি করি মার॥

"তোমার পছন্দ আর কিছু আর আমি করিলাম আর কিছু; দয়া কর যদি তবেই হয় মুক্তি, নয় তো আশ্রয় আর নাই।

আমার যা পছন্দ তাই আমি করিয়াছি তোমার যা পছন্দ তাহা তো করি নাই। মনে মনে বিচার করিয়া আমি দেখিলাম, দাদূই অপরাধী।

যেমন তোমার খুসী, তেমনই কর, আমি তো মানিলাম হার; ইচ্ছা হয় তোমার দাসকে তুমি প্রসাদ কর, ইচ্ছা হয় তাহাকে নিয়া মার।"

৯ঃ প্রার্থনাঃ

দিন দিন নৱতম ভগতি দে দিন দিন নৱতম নাঁৱ।
দিন দিন নৱতম নেহ দে মৈঁ বলিহারী জাঁৱ॥
সাঈঁ সত সংতোখ দে ভাৱ ভগতি বিশ্বাস।
সিদক সবূরী সাচ দে মাঁগৈ দাদূ দাস॥
সাঈঁ সংশয় দূর কর করি সংক্যা কা নাস।
ভানি ভরম দুবিধ্যা দুখ দারুণা সমতা সহজ প্রকাস॥
নাঁহীঁ পরগট হ্বৈ রহ্যা হৈ সো রহ্যা লুকাই।
সঁইয়াঁ পরদা দূর কর তূঁ হৌ পরগট আই॥

"দিনে দিনে নবতম দাও ভক্তি, দিনে দিনে নবতম দাও নাম, দিনে দিনে নবতম দাও প্রেম, বলিহারি যাই আমি।

হে স্বামী দাও সত্য সন্তোষ, দাও ভাব ভক্তি বিশ্বাস, দাও সরল অকৃত্রিমতা, দাও ধৈর্য্য (সবূরী), দাও সত্য, দাস দাদূ ইহাই করিতেছে প্রার্থনা।

হে স্বামী, সংশয় দূর করিয়া, শঙ্কার নাশ করিয়া, দুঃখ-দারুণ ভরম ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া সহজ সমতা (আমার জীবনে) কর প্রকাশিত।

"নাহি" টাই হইয়া রহিল (জীবনে) প্রকাশিত, "আছে" টাই রহিল লুকাইয়া। হে স্বামী, পরদা দূর করিয়া তুমিই আসিয়া হও (এই জীবনে) প্রকাশিত।"

চতুর্থ প্রকরণ—সাধনা।

নবম অঙ্গ—বিশ্বাস (দ্বিতীয় সহায়ক অঙ্গ)

১। দাদূ বিশ্বাসী ছিলেন এবং সেবারতও ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে ভগবান তাঁহার আপন কাজ আপনিই সহজে করিয়া লইবেন। তাঁহার বিশ্ব-বিধানের দ্বারাই সব আপনিই সম্পন্ন হইয়া যাইবে, সে জন্ম আমার সহায়তা না হইলেও কোনো কাজ ঠেকিয়া থাকিবে না।

তবে কাজ করিব কেন? কাজ করিব প্রেমের দায়ে। তাঁকে যে প্রেম করিলাম তাহা যদি মুখে বলিতে হয় তবে প্রেমের অপমান। জীবন দিয়া সেবা দিয়া প্রেমকে করিব প্রকাশ। এই ভাবটি দাদূ অনেকবার অনেক ভাবে বলিয়াছেন।

“স্বামীর সঙ্গে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক যোগের পথই হইল তাঁহার সঙ্গে এক যোগে সেবা করায়। এই পথ দিয়াই সংসারেও দেখি পত্নী স্বামীর সঙ্গের আনন্দ যথার্থ ভাবে পান। তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া সেবা করার পরমানন্দ চাই বলিয়াই কাজ করিব, আমার কাজে বিশ্ব রচনার কোনো সুবিধা হইবে মনে করিয়া নহে। কাজেই বিশ্বাস ও কর্ম্মে কোনো বিরোধ নাই। তিনি সব করিতে পারেন, ইহা বিশ্বাস করি, আবার তাঁহার সঙ্গে কাজ করাই আনন্দ, তাই কাজও করি। প্রয়োজনের তাগিদে নহে, প্রেম-যোগের আনন্দে এই সহ-সাধনা।

২। কাজ অগ্রসর হইতেছে না বলিয়া বৃথা ব্যাকুল হইও না। যিনি অতি আশ্চর্য্য রূপে জীব সৃষ্টি ও জীবন রক্ষা করিতেছেন, তাঁহার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নহে। প্রেমের টানে কি সহজ কি কঠিন সকল স্থানেই তিনি আছেন আমার সঙ্গে সঙ্গে। ইহা মনে করিলেই আমাদের সব ভয় ডর পলায়। ইহা যে জানে সে-ই বীর। সকল বীরত্বের মূল এইখানে।

তাঁহার বিশ্বরাজ্য আমার সাধনার জন্যই তিনি রাখিয়াছেন অসম্পূর্ণ, তাই এই যুগেও অনেক কাজ করিবার আছে। এই অসম্পূর্ণতা না থাকিলে আমার গৌরব

করিবার থাকিত কি ? যে সব অসম্পূর্ণ কাজ তিনি এই যুগ পর্য্যন্ত অসম্পূর্ণ রাখিয়া আমাকে তাহা সম্পন্ন করিতে ডাকিতেছেন, সে সব কাজ অসাধ্য মনে করিয়া ভয় পাইও না ; তিনিও আমার হাতে হাত দিয়া সঙ্গে সঙ্গে কাজ করিবেন। ভগবানকে হৃদয়ে রাখিয়া, মনে বিশ্বাস রাখিয়া কাজ কর—তিনি আমার সব আশা পূর্ণ করিবেন, সে সামর্থ্য তাঁহার আছে।”

সে সময়ে ভারতে ধর্ম্মে ধর্ম্মে বিরোধ, জাতিতে জাতিতে বিরোধ, নানা দুঃখ দ্বন্দ্ব চলিয়াছে। তাহার মধ্যেই জাগ্রত সচেতন ধর্ম্মাত্মারা এই সব দুঃখ দূর করিতে দাঁড়াইয়াছেন। দাদূ তাঁহাদেরই মধ্যে একজন। তখন রাজা প্রজা সবারই এই এক সমস্যা। দুঃখ দ্বিধা নৈরাশ্যময় মানবকে দাদূ তখন ভরসার কথা শুনাইতেছেন।

৩। তিনি যদি সর্ব্বশক্তিমান তবে কেন তাঁহার কাজে আমার সহায়তা চান ? এই তাঁহার লীলা। আর তাহা না হইলে আমার গৌরব থাকে কিসে ? তাই তিনি স্বামী হইয়াও সেবক হইয়াছেন। তিনি বিশ্ব জগৎ সৃষ্টি করিয়াও সকলের কাছে ভিক্ষুকের মত প্রেম ও সেবা-সহায়তা ভিক্ষা করিতেছেন। সকলের সেবার পশ্চাতে আপনার সেবাকে তিনি রাখিয়াছেন লুকাইয়া। তাঁহার সেবা অস্বীকার করিলেও কোনো ক্ষতি হয় না, এমন চমৎকার ব্যবস্থা করিয়া তিনি আপনাকে রাখিয়াছেন সকলের পশ্চাতে।

কি এমন সাধনা আছে যাহা দ্বারা তাঁহাকে পাইতে পারি ? পাই যে সে কেবল তাঁহারই কৃপায়। তবে আবার সাধনা কেন ? নহিলে মানবের গৌরব থাকে না। তাঁহারই কৃপা আমাদের সাধনার রূপ ধরিয়া আমাদের লজ্জা রক্ষা করে। কৃষিকার্য্য করিতে গেলে দেখি, মাটীও তাঁহার, বীজও তাঁহার, রসও তাঁহার, প্রাণও তাঁহার, আমাদের শক্তিও তাঁহার, শস্যের পরিণামের অধিকরণ কালও তাঁহার—তবু কৃষি কর্ম্মটুকু আমার। এইটুকু গৌরব ও সার্থকতা যদি আমার ব্যক্তিত্বের না থাকে তবে আর আমার মনুষ্যত্বের মূল্য কি ? এই তত্ত্বই বাংলাদেশে বাউলরা নানা ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন।

এদিকে তিনি যার যা প্রয়োজন তার ব্যবস্থা ঠিক মতই করিয়াছেন। এর বেশী আর চাই না, এবং তার অধিক সংগ্রহ করাও অবিশ্বাস। অবিশ্বাসী শেষে নিজ সঞ্চয়ের ভারেই মরে তলাইয়া। ধনী ব্যক্তির ও লুব্ধজাতির সমস্যাই

হইল এই, "সো তূঁ কাঁই করৈ?" "এত দিয়া তুই করিবি কি?" অবিশ্বাসী মরে সঞ্চয়ের ভারে, অতএব বিশ্বাসী হইয়া তাঁর দান গ্রহণ কর, তাঁর সঙ্গে সঙ্গে সেবা কর। যদি তিনি অধিক দিয়া থাকেন, যদি অধিক সংগ্রহ হইয়া থাকে, তবে তাঁরই সেবায় তাহা ফিরাইয়া দিয়া কর মুক্তি লাভ।

যে তাঁকে ভালবাসে সে তাঁর হাতে বিষ পাইলেও মনে করে অমৃত, আপন প্রেম দিয়া সে সব নেয় অমৃতময় করিয়া। জল স্থল সবই তাঁর প্রসাদ বলিয়া গ্রহণ করেন দাদূ, তখন আর তাহা মায়া নহে। যে পাকা ঝুনা সংসারী সে এইরূপ গ্রহণের মাধুর্য্য বুঝিতেই পারে না।

৪। যাহা নিব তাহা তাঁর কাছেই নিব, শাস্ত্র বা লোকাচারের কাছে নহে। শাস্ত্রে বলে কাশীতে মরিলে মুক্তি। তাই কবীর মৃত্যুকালে গেলেন কাশী ছাড়িয়া। নহিলে ভগবানের হাতেই যে প্রত্যক্ষ মুক্তি পাইতেছেন তাহা বুঝাই যাইত না।

দাদূও ভগবানের দানকে তাঁরই প্রসাদরূপে গ্রহণ করিয়া পরিবার পোষণ করিয়াছেন, তাতে মায়ার দাসত্ব হয় নাই। মায়াকে তাঁর কৃপার অনুগত করিয়া দেখিলে মায়ার দোষ যায় কাটিয়া, মায়া তখন হয় সত্য।

যাহা ভগবানের ইচ্ছা তাহাই ভাল, আমাদের মনের সংশয়বশে আমার দিনকেও মনে করি রাত, ইহাই হইল মায়া। তাঁহার ইচ্ছার শরণ লওয়াই হইল মুক্তি। তিনি যাহা চাহেন তাহাই হউক, সুখ বা দুঃখ নিজে কিছুই নিব না বাছিয়া। যাহা ইচ্ছা তিনি তাহা দিবেন। সুখ চাহিয়া দেখিয়াছি দুঃখই মেলে। সুখই তখন হইয়া উঠে দুঃখময়। প্রার্থিত বস্তু পাইয়াও তার আগুনে অনেক জ্বলিয়া মরিয়াছি। তাঁহার মুখ যেন না ভুলি ইহাই চাই। "স্বর্গও চাই না, নরকও ডরাই না, তোমাকেই চাই। তুমি যেথা ইচ্ছা সেথায় আমাকে রাখ, তাহাই আমার স্বর্গ, তাহাই আমার মুক্তি।"

১। বিশ্বাস কর, উদ্যম কর।

সহজৈঁ সহজৈঁ হোইগা জে কুছ রচিয়া রাম।
কাহে কোঁ কলপৈ মরৈ দুখী হোত বেকাম॥
মনসা বাচা করমনা সাহিব কা বিশ্বাস।
সেৱগ সিরজনহারকা করৈ কৌনকী আস॥

উদিম অৱগুণ কো নহীঁ জে করি জাণৈ কোই।
উদিম মৈঁ আনন্দ হৈ জে সাঁঈঁ সেতী হোই॥

"ভগবানের যাহা কিছু রচনা চলিয়াছে সবই সহজে সহজে যাইবে হইয়া। কেন তবে (লোকে) বিলাপ করিয়া (কল্পনা করিয়া অর্থও হয়) মরে, কেন বৃথা হয় দুঃখী?

মন দিয়া বচন দিয়া কর্ম্ম দিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে স্বামীকে, ভগবানের সেবক হইয়া আবার অপর কাহার কর ভরসা?

উদ্যমও দোষের নহে যদি উদ্যম করিতে কেহ জানে; যদি স্বামীর সঙ্গে থাকিয়া উদ্যম হয় তবে সে উদ্যমেই তো আনন্দ।"

২। তিনি থাকিতে চিন্তা কিসের?

চিন্তা কীয়াঁ কুছ নহীঁ চিংতা জীৱকুঁ খাই।
হূণা থা সো হ্বৈ রহা জানা হৈ সো জাই॥
জিন্হ পহুঁচায়া প্রাণকুঁ উদর উর্ধমুখ খীর।
জঠর অগিনি মেঁ রাখিয়া কোমল কায়া সরীর॥
সমরথ সংগী সংগি হৈ বিকট ঘাট ঘট ভীর।
সো সাঈঁ সূঁ গহগহী জিনি ভূলৈ মন বীর॥
হিরদয় রাম সঁভালি লে মন রাখৈ বিশ্বাস।
দাদূ সমরথ সাঁইয়াঁ সবকী পূরৈ আস॥
পুরা পূরিক পাসি হৈ নাহীঁ দূরি গঁৱাঁর।
সব জানত হৈঁ বাৱরে দেবৈ কোঁ হুসিয়ার॥

"চিন্তা করিয়া কোনো লাভ নাই, চিন্তা শুধু মানুষকে খায়; যাহা হইবার তাহা হইয়াই চলিয়াছে, আর যাহা যাইবার তাহা যাইতেছে চলিয়া।

উদরের মধ্যে প্রাণকে যিনি পৌছাইয়াছেন উর্দ্ধমুখী ক্ষীরধারা, জঠরের অগ্নির মধ্যে যিনি কোমলকায়া শরীরকে করিয়াছেন রক্ষা, সেই সর্ব্বশক্তিমান সঙ্গী কি কঠিন বিপদময় স্থলে (বিকট সঙ্কীর্ণ গিরিপথে), কি (নিভৃত) অন্তরে, কি ভিড়ের মধ্যে আছেন তোমার সঙ্গে সঙ্গেই; হে ভাই (বীর) মন, কখনও তাঁহাকে ভুলিও না, সেই স্বামীর সঙ্গেই পরমানন্দ।

ভগবানকে সযত্নে রাখ হৃদয়ে, মনে রাখ বিশ্বাস, হে দাদূ, সর্ব্বশক্তিমান স্বামী সকলের আশাই করেন পূর্ণ।

পূরা পূরণকর্ত্তা পাশেই আছেন বিরাজিত, ওরে মূর্খ (গ্রাম্য), তিনি নাই দূরে; ওরে পাগল, তিনি সবই জানিতেছেন, আর দিতেই তিনি সদা হুঁসিয়ার (জ্ঞানী, সমঝদার, বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান সাবধান ইত্যাদি অর্থ)।"

৩। প্রভু, সবই লইব তোমার প্রসাদ-রূপে।

দাদূ সাঈঁ সবন কৌঁ সেৱক হ্ৱৈ সুখ দেই।
অয়া মূঢ়মতি জীৱকী তবহুঁ নাঁৱ ন লেই॥
সিরজনহারা সবনকা ঐসা হৈ সমরথ।
সাঈঁ সেৱক হ্ৱৈ রহ্যা সকল পসারৈঁ হত্থ॥
ধনি ধনি সাহিব তূঁ বড়া কৌন অনূপম রীত।
সকল লোক সির সাঁইয়াঁ হ্ৱৈ কর রহ্যা অতীত॥
ছাজন ভোজন সহজমৈঁ সাঈঁ দেই সো লেই।
তাথৈঁ অধিক ঔর কুছ সো তূঁ কাঁই করেই॥
মীঠে কা সব মীঠা লগৈ ভাৱৈ বিখ ভরি দেই।
দাদূ কড়ৱা না কহৈ অম্রিত করি করি লেই॥
দাদূ জল থল রামকা হম লেৱৈঁ পরসাদ।
সংসারী সমুঝৈঁ নহীঁ অবিগত ভাৱ অগাধ॥

"হে দাদূ, সবার তিনি স্বামী অথচ সেবক হইয়া সবাইকে দেন সুখ আনন্দ; এমন মূঢ়মতি জীব, তবু কিনা লইবে না তাঁহার নাম!

সকলের সৃজনকর্ত্তা এমন তিনি শক্তিশালী; স্বামী হইয়াও রহিলেন সবার সেবক হইয়া, সকলের কাছেই পাতিতেছেন হাত।*

ধন্য ধন্য প্রভু তুমিই বড় (শ্রেষ্ঠ); এ কি অনুপম (তোমার) রীতি! সকল লোকের শ্রেষ্ঠ স্বামী হইয়াও রহিলে সকলেরই অতীত!

---

* "জহঁ সকল পসারই হত্থ" পাঠ হইলে "সেখানে সবাইকেই পাতিতে হয় হাত" এই অর্থ হয়।

স্বামী সহজেই যে অন্নবস্ত্র দেন তাহাই নে। তার বেশী আর কিছু আবার কি? তাহা তুই করিবিই বা কি?

চাই তিনি (পাত্র) পূর্ণ করিয়া বিষ দেন, তবু যে তাঁকে ভালবাসে তার কাছে তাহা মিঠাই লাগে; হে দাদূ, সে বলিবে না ইহা কটু, সে ক্রমাগতই ইহা নেয় অমৃত করিয়া করিয়া।

হে দাদূ, এই জল স্থল সবই ভগবানের। যাহা কিছু লইতেছি সবই আমি তাঁহার প্রসাদ (স্বরূপ) লইতেছি, সংসারী লোক এই অনির্ব্বচনীয় (প্রেমের) অগাধ ভাব বুঝিয়াই উঠিতে পারে না।”

৪। নির্ভর কর, ঠকিবে না।

কাসী তজি মগহর গয়া কবীর ভরোসৈ রাম।
সৈঁদেহীঁ সাঈঁ মিল্যা দাদূ পূরে কাম॥
দাদূ রোজী রাম হৈ রাজিক রিজক হমার।
দাদূ উস পরসাদ সোঁ পোষ্যা সব পরিবার॥
জ্যূঁ জানৌ ত্যূঁ রাখিয়ৌ তুমহ সির ঢালী রাই।
দূজা কো দেখোঁ নহীঁ দাদূ অনত ন জাই॥
জ্যূঁ তুম্হ ভাৱৈ ত্যূঁ খুসী হম রাজী উস বাত।
দাদূকে দিল সিদক সূঁ ভাৱৈ দিন ক্যূঁ রাত॥
করণহার জে কুছ কিয়া সো তো বুরা ন হোই।
হোনা থা সো হোই গয়া ঔর ন হোৱৈ কোই॥
হোনা থা সো হ্ৱৈ রহ্যা জিন বাঁছৈ সুখ দুঃখ।
সুখ মাঁগে দুখ আইসী পৈ পিয় ন বিসারী মুক্খ॥
হোনা থা সো হ্ৱৈ রহ্যা সরগ ন বাঁছী ধাই।
নরক কনে থী না ডরী হুরা সো হোসী আই॥

“ভগবানের ভরসায় কবীর কাশী (প্রচলিত মুক্তিধাম) ত্যাগ করিয়া মগহরে গেলেন (দেহত্যাগ করিতে), (তাই সেখানেই) চির পরিচিত পরিপূর্ণ প্রভুর পাইলেন দেখা। হে দাদূ, তিনি হইলেন পূর্ণকাম।

হে দাদূ, ভগবানই আমার পোষণকর্ত্তা, তিনিই আমার বৃত্তি, তিনিই আমার বৃত্তিদাতা, হে দাদূ, তাঁর প্রসাদেই তো আমি সকল পরিবার পোষণ করিয়াছি।

যেমন তোমার খুসী তেমনই আমায় রাখ, হে রাজা, তোমার মাথায়ই (অধীন) রাখিয়া দিলাম এই কথা (সব ভার), দাদূ না দেখে দ্বিতীয় আর কাহাকেও, আর না যায় সে কোথাও অন্যত্র!

যাহা তোমার ভাল লাগে তাতেই আমি খুসী, আমি সেই কথাতেই রাজী; দাদূর চিত্ত কি দিবা কি রাত্রি আনন্দে লাগিয়া রহিল সেই সত্যস্বরূপের সঙ্গে।

করনেওয়ালা (কর্ত্তা) যাহা কিছু করিয়াছেন তাহাতো হইতে পারে না মন্দ, যাহা হইবার তাহাই হইয়া গিয়াছে, আর তো কিছুই পারে না হইতে।

যাহা হইবার তাহাই হইয়া চলিয়াছে, সুখ দুঃখ যেন আর না করিস বাঞ্ছা, সুখ চাহিলে আসিবে দুঃখ, (কেবল দেখিস্) প্রিয়তমের মুখ যেন না হয় বিস্মরণ।

যাহা হইবার তাহাই চলিয়াছে হইয়া; আমি স্বর্গ বাঞ্ছা করিয়াও ধাই না, আবার নরক হইতে ভীত নহি, যাহা হইবার তাহাই হইবে।" *

---

* তুলনীয়—

"স্বর্গের লোভে যদি তোমাকে ডাকিয়া থাকি প্রভো, স্বর্গ আমার হারাম হউক। নরকের ভয়ে যদি তোমায় ডাকিয়া থাকি প্রভো, নরকই আমার গতি হউক।" (রাবেয়া)

চতুর্থ প্রকরণ—সাধনা

দশম অঙ্গ—মধ্যঃ

(তৃতীয় সহায়ক অঙ্গ)

“মধ্য” অর্থে দাদূ উভয় কোটিকে পরিত্যাগ করিয়া সহজ মধ্য ভাব গ্রহণ করা বুঝিয়াছেন। কাজেই “মধ্য”কে তিনি “সহজ”ও বলিয়াছেন। ইহাকে আবার “শূন্য”ও বলিয়াছেন। শূন্য হইল আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে সহজ অবকাশ। ইহা না থাকিলে মানুষ পৃথিবীর মৃৎপাষাণ চাপা পড়িয়া মারা যাইত। মধ্যবর্ত্তী শূন্যই সকলকে বিচরণের সহজ অবকাশ দিয়াছে। ইহাই সহজ মুক্তি। ধরিত্রীতে দাঁড়াইয়া এই শূন্যের সহজ মুক্তির মধ্যে আমরা চলি ফিরি নিশ্বাস লই ও বাঁচি। দাদূপন্থীদের মধ্যে যাঁহারা দেহতত্ত্ববাদী তাঁহারা দেহের মধ্যেও সহজ ধাম, শূন্য ধাম, মধ্যধাম নির্দ্দেশ করিয়া তাহার সাধনা করেন। ইহাঁদের মধ্যে যাঁহারা অধ্যাত্মবাদী তাঁহারা মধ্যকে নির্বাণ ও অদ্বৈত বলেন।

আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে যেমন শূন্য ও সহজ মুক্ত ক্ষেত্র, প্রতি দুই কোটির মাঝখানে তেমনি সেই সেই লোকের মধ্য-ধাম ও সহজ ধাম। কোনো বিশেষ পার্শ্বে বিশেষ কোটিতে সরিলেই বিশেষ পক্ষে গিয়া পড়িলাম। দুই পক্ষ লইয়া পাখী শূন্যে উড়িয়া মুক্তি পায়। সাধক তাই দুই পক্ষের মাঝে অবস্থান করিবে। সুখ দুঃখের মাঝে অনুভবের সহজ লোক। তপ্ত ও শীতলের মাঝখানে স্পর্শের সহজ লোক। দিন ও রাত্রির, জন্ম ও মৃত্যুর মাঝে কালের সহজ লোক। মানুষের ধর্ম্মের দলাদলির মাঝখানে সাধনার সহজ লোক। প্রতি লোকেই তাহার মধ্য ধামে সেই সেই লোকে সহজ মুক্তি।

গুরুর কৃপা ছাড়া এই সহজ লোকে প্রবেশ হয় না। আবার দলাদলির কোনো গুরু এখানে পৌছাইয়া দিতে পারেন না। নির্গুণ নিরাকার সকল পক্ষাপক্ষীর অতীত গুরুই এখানে যাইতে পারেন লইয়া। কাজেই ভগবানের দয়াতেই অন্তরলোকে তাঁহার দর্শন পাই। এই সহজ যোগে হিন্দু বা মুসলমান কোনো বিশেষ পন্থাই চলে না। প্রেমই এখানে সহায়। কোনো দলেরই ইহা নিজস্ব বিশেষ সম্পত্তি নহে।

দুই হাতের মত বিভিন্ন হইলেও হিন্দু মুসলমানকে তবু মিলাইতে হইবে। কেন না এই দুই হাত মিলিলে যে অঞ্জলি হইবে তাহাতেই প্রেমামৃত পান করিয়া ভগবান ও ভক্তেরা হইবেন তৃপ্ত।

১। সুখ-দুঃখ জীবন-মরণের দুই পক্ষের মাঝখানে সহজ পরিপূর্ণ নির্বাণ পদ। সহজই হইল নির্বাণ।

মন যখন সহজ রূপ হয় প্রাপ্ত, তখনই দ্বৈত ভাবের মিটে তরঙ্গ। নহিলে দুই পক্ষ থাকিলে, এক অন্যের উপর ক্রমাগতই চায় জয়ী হইতে। এই যুদ্ধের অবসান প্রেমের সহজ মধ্যলোকে। ইহাই অদ্বৈত।

উভয় দিকের টানাটানি মিটাইয়া ভগবানের চরণ তলে আসিয়া হইবে বসিতে। ইহাই ভক্তিলোক ও প্রেমলোক।

এই প্রেমলোকে ভক্তিলোকে আসিয়া পৌছিলে সাধক আপনাকে আর চায় না দেখাইয়া বেড়াইতে, ভক্ত তখন ভগবানের মধ্যে আপনাকে চায় একেবারে ডুবাইয়া দিতে, কাজেই ইহা "অহম্" লোপের-ক্ষেত্র। দলাদলিতেই মানুষ চায় আপনাকে জাহির করিতে। দলাদলি ছাড়, ভগবানে নিজেকে ডুবাও, ইহাই আত্মবিলয় লোক।

যথার্থ জ্ঞান যখন জন্মে তখন না কাহাকেও তাড়াই না কাহারও পিছে দৌড়াই, এই হইল মুক্তি দ্বার।

এই সহজ "শূন্য" সেই শূন্য নহে যাহাকে সবাই শূন্যতা অর্থাৎ "উজাড়" বলে। ইহা নাস্তি-লোক নয়। এইখানে সমাহিত হইয়া সাধক অমৃতরস করেন পান ও কালকে করেন জয়।

অহম্-ভাব হইতেই আমরা মাটীকে আশ্রয় করিয়া বা আকাশকে আশ্রয় করিয়া ঐশ্বর্য্য খুঁজি। এই দুইয়ের মাঝখানে নিরন্তর "মধ্য লোক" বিরাজমান, সেখানে নিত্য শান্তি নিত্য মুক্তি।

২। স্থূল আকার হইতে যদি সূক্ষ্ম আকারের দিকে যাত্রা কর তবে অনন্ত কাল গেলেও সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতরের দিকেই ক্রমাগত চলিতে থাকিবে, হর্ষশোকও নিরন্তর সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া চলিতে থাকিবে আকারাতীত অসীমলোকে কখনও গিয়া পৌছিবে না।

সীমা ছাড়িয়া আকারাতীত সেই সহজ অসীমে যাও, পক্ষহীন সেই লোকে অদ্বৈত এক ব্রহ্মকে পাইয়া নির্ভয় হইবে। তাঁহাতেই থাক যুক্ত হইয়া।

তাঁহার কাছেই পাইবে সহজ প্রেম ; সেই প্রেম দিয়া মন, চিত্ত, মানস, আত্মা ও পঞ্চেন্দ্রিয় লও পূর্ণ করিয়া। ধরিত্রী দিয়া আকাশ দিয়া পূর্ণ করিয়া কোনো লাভ নাই। তাহারা পক্ষ মাত্র, পক্ষাতীত সহজ এক তাহারা নহে।

তাঁহার কাছে জনম মরণ আসা যাওয়া নাই; সেথায় নিত্য এক রস।

সেই ধাম বাহিরের শূন্য ধাম নয়। সেখানে সূর্য্য-চন্দ্রের রাত্রি-দিবার নাই প্রবেশ। সাধক সাধনা দ্বারা সেই সহজ লোকে প্রবেশ করে।

মায়া-মোহের সুখ-দুঃখের অতীত অমৃতের সেই পূর্ণধাম। সেখানে পক্ষ বিশেষের আধার হইতে মুক্ত হইয়া আত্মানন্দ পাইবে, ভাগবত রস পান করিয়া পরমানন্দের সাক্ষাৎকার পাইবে। অর্থাৎ সেই “শূন্য”-ধাম সকল রস আনন্দ ও প্রেম বিহীন শুষ্ক নীরস নাস্তিলোক নয়।

৩। সেই লোক বাহিরে নয় অন্তরে, ঋতুর পর ঋতু সেখানে আসে যায় না। সেখানে নিত্য এক রস। সাধনার বলে আমি সেখানে পাইয়াছি আশ্রয়।

সেখানে “নিকট বা দূর” নাই। নিত্য নিরন্তর পূর্ণতায় সেই ধামে আমি করি বাস, যদিও আমাকে দেখিতেছ এইখানে।

সেখানে নিশিদিন নাই, ছায়া-আলোক নাই, কেবল আছেন নিরঞ্জন ভগবান। সেখানেই আমার বাস।

এই জগতে বৃক্ষলতা কখনও বাড়ে কখনও শুকায়। সেখানে হাজা শুকা নাই, সেখানে দিন রাত্রি সব কিছু নবজীবনে চলিয়াছে ভরপূর হইয়া।

বেদ কোরাণ সেই ঘরের খবর রাখে না। ইহারা বাহিরের খবর দেয় মাত্র। সে এক আশ্চর্য্য লোক, তার উপমা এখানে মেলে না যে তুলনা দিয়া বুঝাইব। সাধনা করিয়া প্রবেশ করা ছাড়া উপমা দিয়া বা শাস্ত্রে দেখিয়া তাহা বুঝিবার বা বুঝাইবার যো নাই।

৪। সেই প্রেমধাম মুক্তিধাম অন্তরে। কাজেই তাহা পাইতে আমি বনেও যাই নাই, মন্দিরেও যাই নাই, কায়াক্লেশও করি নাই। সদ্‌গুরু অন্তরের মধ্যেই সেই ধাম দেখাইয়া দিয়া বাঁচাইয়াছেন আমাকে বাহিরের টানাটানি হইতে।

ঘরে বা বনে যাওয়া কেন ? সর্ব্বত্র আছেন যিনি, তাঁর সঙ্গেই তো আছি

প্রেমে যুক্ত হইয়া। এই তত্ত্ব জানিয়া ঘরে বনে যে মানুষ একই ভাবে থাকে সেই তো সাধু সেই তো সুজ্ঞান।

তাঁহার সঙ্গ পাইয়া ঘর বন সম্বন্ধে হইয়াছি উদাসীন। তিনি বিনে ঘর বন কিছুই কিছু নয়। বৈরাগী বনের মোহে, গৃহী ঘরের মোহে, তাঁহাকে রাখিল দূর করিয়া। তিনি তো বাহিরে নাই, তিনি আছেন অন্তরে। সেখানে প্রবেশ না করিয়া ঘরেই যাও আর বনেই যাও সবই বৃথা।

৫। দীন দুনিয়া (ধর্ম্ম ও সংসার) সব বিসর্জ্জন দিতে পারি যদি পাই তাঁহার দরশন। তবে কি আর আমি দেহের দুঃখই গ্রাহ্য করি, না স্বর্গ নরকের জন্যই বিচলিত হই! তিনি যে সদা আমার নয়নে নাই এই দুঃখই তো আমার মনে। আমি তাঁহার জন্য তৃষিত। স্বর্গ-নরক সুখ-দুঃখ জীবন-মরণের সব চিন্তা আমার পালাইয়াছে। কে আসে কে যায় তাহার খবর কে রাখে? আমি ব্যাকুল তাঁহার তৃষ্ণায়।

তাঁহাকে যদি চাও তবে হিন্দু হওয়াও বৃথা, মুসলমান হওয়াও বৃথা, দর্শনের মত-বাদের মধ্যে গিয়া পড়াও বৃথা। কারণ ইহারা সবাই পক্ষ দূষণের (abstraction) দ্বারা দুষ্ট। নিজ নিজ ঝোঁক মত একটা না একটা দিকে বা মতে ইহারা গিয়া পড়িয়াছে। তাঁহার জন্য আমাকে আর সব রকমে "নাস্তিক" হইতে হইয়াছে, কারণ তাহা ছাড়া প্রেম-লোকে প্রবেশের আর উপায় নাই।

৬। অন্তরের মধ্যে ভগবানকে যে গুরু দেখাইতে পারেন, ভগবান আল্লা বা রামের দলের মানুষ তিনি নন। সে গুরু নির্গুণ নিরাকার। প্রেমময় ভগবান নিজেই গুরু হইয়া বা অন্যকে উপলক্ষ্য মাত্র করিয়া নিজেই তাঁহার আপন প্রকাশ আমাদের কাছে করেন ব্যক্ত। তাঁহাকে জানিয়া "আমি তুমি"র দলাদলি ছাড়িতে হইবে। সাধুরা এই সব দলাদলি ছাড়িয়া আপন সহজ মধ্য-পথে করেন সাধনা। আমি মন্দির বা মসজিদে যাই না, আমি চাই সেই অলখকে, চাই তাঁহার নিত্য নিরন্তর প্রেম। তাঁহার সেই লোকে মুসলমান বা হিন্দুর রীতি বা পন্থা নাই। সেখানে এক অদ্বিতীয় তিনিই বিরাজিত।

হিন্দু মুসলমান যেন দুইখানি হাত, এই দুই হাত যুক্ত হইয়া এক হইলে অমৃতরস পান করা হইত সম্ভব। তাই সাধকেরা এই দ্বন্দ্ব মিটাইয়া অমৃতরস পান করাইয়া ভগবানকে ও নিজেকে করিতে চান তৃপ্ত।

৭। কোনো পক্ষের গহ্বরে না পড়িয়া, দলাদলির মলিনতা হইতে মুক্ত নির্ম্মল

থাকিয়া, ভগবানের নাম লইয়া যে তাঁহারই সম্মুখে থাকে উপস্থিত, সে সর্ব্বত্রই মুক্ত হইয়া করে বিহার। এই মুক্তির পথে ক্বচিৎ কেহ যদি হইতে চায় অগ্রসর, তবে দলাদলিপ্রিয় সব লোক একেবারে ক্রোধে ওঠে অধীর হইয়া।

ধর্ম্মের দলাদলিতেও এক এক দলের লোকের বড়াই দেখিয়া, আপন ধর্ম্ম ও মতের নামে বিষম অহঙ্কার দেখিয়া, অবাক্ হইয়া গিয়াছি। কাজেই অন্তরেই ভগবানের সঙ্গে খুঁজিতে হইল যোগ। বাহিরে গেলেই দলাদলির আর শেষ নাই। তাহাতে ঝালা-পালা হইয়া গিয়াছি, তাঁহার মধ্যে সমাহিত হইয়া সেই সব দুঃখ জ্বালার এখন করিতে চাই অবসান।

৮। এ সব কথা জগতে বুঝাইয়া বলা কঠিন। যদি বলিতে যাই তবে কেহই চায় না শুনিতে। আবার যদি না বলি তবে ইহারা দোষ দেয় ও বলে, "সকলকে শুনাইয়া এ সব কথা বলে না কেন?" ইহারা আসলে কিছু বোঝেও না অথচ চুপ করিয়া থাকিতেও জানে না।

যত প্রাণী যত পথে ধর্ম্ম সাধন করিয়াছে ততই ধর্ম্মের ও কুল-ব্যবহারের সব পন্থ গিয়াছে দাঁড়াইয়া। অগণিত প্রাণী, অসংখ্য পথ। কত পথে আর মরিব ঘুরিয়া ঘুরিয়া! তাই এক ভগবানকে আশ্রয় করিয়া নানা পন্থার শাসন নানা রাজার জুলুম চাই এড়াইতে। অগণিত নানা ক্ষুদ্র নৃপতির শাসনে সদা শঙ্কা সদা ভয়, এখন চাই নির্ভয় নিঃশঙ্ক হইতে।

লোকেরা বলেন "ভগবানের কাছ হইতে আসিলাম", "ভগবানের কাছে যাই।" এ সব আসা যাওয়া সবই মিছা। যেখানকার সেখানে থাকিয়াই অন্তরে তাঁহার সঙ্গে হইতে হইবে যুক্ত। সেখানেই মধ্য-লোক, তাহাই সহজ শূন্যধাম।

৯। পক্ষ ছাড়িয়া মধ্য পথ।

দ্বৈ পখ রহিতা সহজ সো সুখ দুখ এক সমান।
মরৈ ন জীবৈ সহজ সো পূরা পদ নিরব্বাণ॥
সহজ রূপ মনকা ভয়া দ্বৈ দ্বৈ মিটী তরংগ।
তাতা সীতা সম ভয়া দাদূ এক হী অংগ॥
সুখ দুখ মনি মানৈ নহীঁ রাম রংগি রাতা।
দাদূ দূন্যূঁ ছাড়ি সব প্রেম রসি মাতা॥

কছূ ন কহাবৈ আপ কৌঁ কাহূ সংগি ন জাই।
দাদূ নিহপখ হোই রহৈ সাহিব সৌঁ লব লাই॥
না হম ছাড়ৈঁ না গহৈঁ ঐসা জ্ঞান বিচার।
মধি ভাই সেবৈঁ সদা দাদূ মুক্তি দুবার॥
সহজ সুঁনি মন রাখিয়ে ইন দূন্যূঁ মাঁহিঁ।
লৈ সমাধি রস পীজিয়ে তহাঁ কাল ভয় নাঁহিঁ॥
আপা মেটৈ ম্রিত্তিকা আপা ধরৈ অকাস।
দাদূ জহাঁ দোনোঁ নহীঁ মধি নিরংতর বাস॥

“সেই সহজ হইল দুই পক্ষ রহিত, সুখ দুঃখ তাহার এক সমান, ‘না মরে না জিয়ে’ সেই সহজ পদ, সেই তো পরিপূর্ণ নির্ব্বাণপদ।

মনের যখন হইল সহজরূপ, তখন সর্ব্ববিধ দ্বৈতের তরঙ্গ গেল মিটিয়া, তখন তপ্ত শীতল হইয়া গেল সমান, হে দাদূ, তখন সবই হইল এক-অঙ্গ।

ভগবানের রঙ্গে রঞ্জিত মন না মানে সুখ, না মানে দুঃখ; হে দাদূ, সে সকল প্রকার দ্বৈত ছাড়িয়া মাতিয়া রহে তাঁহার প্রেমরসে।

সে আপনাকে কোনো বিশেষ দলের কোনো নামেই অভিহিত করায় না, কারও (দলেরই) সে যায় না সঙ্গে, সে স্বামীর সঙ্গে ধ্যানে-প্রেমে যুক্ত হইয়া “নিঃপক্ষ” হইয়া রহে।

তখন, আমি না করি ত্যাগ না করি গ্রহণ, এমনই হয় আমার জ্ঞান-বিচার; দাদূ তখন সদা মধ্য-ভাবকেই করে সেবা, তাহাই মুক্তি-দ্বার।

এই দুইয়ের (গ্রহণ বর্জ্জনের) মাঝখানে সহজ শূন্যে (নিরাসক্ত) রাখ মনকে; সেখানে লয়-সমাধি রস কর পান, কাল-ভয় সেখানে নাই।

মৃন্ময় ক্ষেত্রে সাধকেরা চাহেন অহমিকাকে মিটাইতে, আকাশময় ক্ষেত্রে চাহেন অহমিকাকে ধারণ করিতে। মৃৎ ও আকাশের অতীত যে মধ্যধাম সেইখানে, হে দাদূ, কর তুই নিরন্তর বাস।”

২। সহজ ধাম, অসীম আনন্দ লোক।

দাদূ ইস আকার তৈঁ দূজা সূখিম লোক।
তাতৈঁ আগৈঁ ঔর হৈ তহঁবাঁ হরিখ ন সোক॥

হদ্দ ছাড়ি বেহদ্দ মেঁ নিরভয় নিরপখ হোই।
লাগি রহৈ উস এক সোঁ জহাঁ ন দূজা কোই।
মন চিত মনসা আতমা সহজ সুরতি তা মাঁহিঁ।
দাদূ পাঁচো পূরি লে জহঁ ধরতী অংবর নাঁহিঁ॥
চলু দাদূ তহঁ জাইয়ে জহঁ মরৈ ন জীবৈ কোই।
আবাগবন ভয় কো নহীঁ সদা এক রস হোই॥
চলু দাদূ তহঁ জাইয়ে জহঁ চংদ সূর নহিঁ জাই।
রাতি দিবস কী গমি নহীঁ সহজৈঁ রহ্যা সমাই॥
চলু দাদূ তহঁ জাইয়ে মায়া মোহ তৈঁ দূর।
সুখ দুখ কো ব্যাপৈ নহীঁ অবিনাসী ঘর পূর॥
নিরাধার মন রহি গয়া আতম কে আনংদ।
দাদূ পীবৈ রাম রস ভেটৈ পরমানংদ॥

"হে দাদূ, এই (স্থূল) আকার লোক হইতেও অতীত সূক্ষ্ম (আকার) লোক, তার পরে আরও (সূক্ষ্ম) লোক আছে, সেখানে না আছে হর্ষ না আছে শোক।

সীমা ছাড়িয়া অসীমের মধ্যে নির্ভয় ও "নিরঃপক্ষ" হইয়া সেই একের সঙ্গে থাক লাগিয়া, সেখানে দ্বিতীয় আর কিছুই নাই।

মন চিত্ত মানস আত্মা আর তাহার মাঝে সহজ সুরতি; হে দাদূ, ধরিত্রী অম্বর যেখানে নাই সেইখানে এই পাঁচকেই লও পূর্ণ করিয়া।

চল দাদূ চল সেখানে, যেখানে না কেহ মরে, না কেহ জিয়ে; আসা যাওয়ার যেথায় নাই কোনো ভয়, সদা সেখানে বিরাজিত এক রস।

চল দাদূ সেখানে চল, যেখানে চন্দ্র সূর্য্যেরও নাহি প্রবেশ, রাত দিবসেরও যেখানে নাই গমন, সহজের মধ্যে যেই ধাম আছে সমাহিত।

চল দাদূ চল সেখানে, যে স্থান মায়া মোহ হইতে অতীত, সুখ দুঃখের যেখানে নাই কোনো প্রভাব ও প্রসার, যেখানে অবিনাশী অমৃতের পূর্ণ নিবাস।

আত্মার সেই আনন্দের মধ্যে নিরাধার মন গেল রহিয়া, দাদূ সেখানে ভাগবত-রস করে পান আর পায় পরমানন্দের সাক্ষাৎকার।"

৩। অপরূপধাম।

এক দেস হম দেখিয়া রুতি নহিঁ পলটৈ কোই।
হম দাদূ উস দেসকে সদা এক রস হোই॥
এক দেস হম দেখিয়া নহিঁ নেড়ে নহিঁ দূর।
হম দাদূ উস দেসকে রহে নিরংতর পূর॥
এক দেস হম দেখিয়া জহঁ নিস দিন নাহীঁ ঘাম।
হম দাদূ উস দেসকে নিকটি নিরংজন রাম॥
বারহ মাসী উপজৈ তহাঁ কিয়া পরবেস।
দাদূ সূখা না পড়ৈ হম আয়ে উস দেস॥
বেদ কোরান কী গমি নহীঁ তহাঁ কিয়া পরবেস।
তহঁ কুছু অচিরজ দেখিয়া য়হু কুছু ঔরৈ দেস॥

"এক দেশ আমি দেখিয়াছি যেখানে কোনো ঋতুই পালটায় না; হে দাদূ, আমি সেই দেশের, সদা হইয়া আছে যেথায় "এক-রস"।

এক দেশ আমি দেখিয়াছি, সেথায় না আছে নিকট না আছে দূর; হে দাদূ, আমি সেই দেশের, নিরন্তর সেখানে আমি হইয়া আছি পূর্ণ।

এক দেশ আমি দেখিয়াছি, সেখানে নাই নিশি নাই দিন, আর নাই সেখানে রৌদ্র; আমি, হে দাদূ. সেই দেশের, সেখানে নিকটেই বিরাজমান নিরঞ্জন রাম।

সেখানে প্রবেশ করিলে বারমাসই থাকে "উপজিতে" (বৃক্ষাদির ন্যায় জীবন্ত বৃদ্ধি সরস নিত্য সফলতা পাইতে); হে দাদূ, সেখানে কখনও আসিয়া পড়ে না শুষ্কতা, সেই দেশ হইতে আমি আসিয়াছি।

বেদ কোরাণের যেথায় গম্য নাই সেথায় করিয়াছি প্রবেশ, সেখানে কিছু আশ্চর্য্যই দেখিয়াছি, তাহার রকমই কিছু স্বতন্ত্র (আশ্চর্য্য)।"

৪। সে ধাম পাইবে অন্তরে, ঘরে বা বনে নয়।

না ঘরি রহ্যা না বন গয়া না কুছ কিয়া কলেস।
দাদূ মনহীঁ মন মিল্যা সতগুরকে উপদেশ॥

কাহে দাদূ ঘরি রহৈ কাহে বন খংডি জাই।
ঘর বন রহিতা রাম হৈ তাহী সোঁ লব লাই॥
জিন প্রাণী করি জানিয়া ঘর বন এক সমান।
ঘর মাহৈঁ বন জ্যোঁ রহৈ সোঈ সাধ সুজান॥
ঘর বন মাঁহৈঁ সুখ নহীঁ সুখ হৈ সাঁঈ পাস।
দাদূ তাসোঁ মন মিল্যা ইন থৈঁ ভয়া উদাস॥
না ঘর ভলা না বন ভলা জহঁ নহীঁ নিজ নাৱঁ।
দাদূ উনমন মন রহৈ, ভলা ত সোঈ ঠাৱঁ।
বৈরাগী বন মেঁ রহৈ ঘরবারী ঘর মাঁহিঁ।
রাম নিরালা রহি গয়া দাদূ ইন মৈঁ নাঁহিঁ॥

"না রহিলাম ঘরে, না গেলাম বনে, না কিছু করিলাম ক্লেশ; হে দাদূ, সদ্‌গুরুর উপদেশে মনের মধ্যেই মনের সঙ্গে মনের হইল যোগ।

কেন দাদূ, ঘরে থাকা কেনই বা বনভূমিতে যাওয়া? ঘর ও বনের অতীত আমার রাম, তাঁর সঙ্গে প্রেমের ধ্যানে হও যুক্ত।

যেই মানুষ কাজে করিয়া (সাধনার দ্বারা) ঘর বনকে জানিয়াছেন এক সমান, যিনি ঘরের মধ্যেই থাকেন বনের মত, তিনিই সাধু, তিনিই রসিক, "সুজান" (যিনি যথার্থ তত্ত্ব জানেন)।

ঘরের মাঝেও আনন্দ নাই বনের মাঝেও আনন্দ নাই, আনন্দ আছে এক স্বামীর সঙ্গে; তাঁহার সঙ্গে দাদূর মিলিয়াছে মন, তাই সে ঘর বন উভয় হইতেই হইয়া গিয়াছে উদাস।

ঘরও নয় ভাল, বনও নয় ভাল, যেখানে নাই "নিজ" (পরমাত্মার) নাম; হে দাদূ, সেই ঠাঁইই তো ভাল যেখানে মন রহে উনমনা।

বৈরাগী থাকে বনে, গৃহস্থ (সংসারী) থাকে ঘরে, ভগবান রহিয়া গেলেন একেবারে এই সব হইতে নিরালা; হে দাদূ, এই সবের মধ্যে (বনে বা ঘরে) তিনি নাই।"

৫। সব ছাড়িয়া তাঁহাকে চাই।

দীন দুনী সদিকে করূঁ টুক দেখন দে দীদার।
তন মন ভী ছিন ছিন করূঁ ভিস্ত দোজগ ভী ৱার॥

দাদূ জীৱন মরণ কা মুঝ পছিতাৱা নাহিঁ।
মুঝ পছিতাৱা পীৱকা রহ্যা ন নৈনহুঁ মাঁহিঁ ॥
স্বরগ নরক সংসয় নহীঁ জীৱন মরণ ভয় নাহিঁ।
রাম বিমুখ জে দিন গয়ে সো সালৈঁ মন মাঁহিঁ ॥
স্বরগ নরক সুখ দুখ তজে জীৱন মরণ নসাই।
দাদূ প্যাসা রামকা কো আৱৈ কো জাই ॥
হিংদূ তুরুক ন হোইবা সাহিব সেতীঁ কাম।
ষট দরসন সংগি ন জাইবা নিরপখ কহিবা রাম ॥
না হম হিংদূ হোহিঁগে না হম মুসলমান।
ষট দরসন মৈঁ হম নহীঁ হম রাতে রহিমান ॥

"দীন ও দুনিয়া (ধর্ম্ম ও সংসার) সব করিলাম উৎসর্গ, একটুকু তাঁর দরশন দাও দেখিতে ; সেজন্য আমার তনু মনকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া পারি ফেলিতে, স্বর্গ নরকও করিতে পারি সমানভাবে উৎসর্গ।

হে দাদূ, জীবন মরণের জন্য আমার নাই কোনোই অনুতাপ, আমার অনুতাপ এই যে প্রিয়তম আমার নাই নয়নে নয়নে।

স্বর্গ নরকের সংশয় আমার নাই, জীবন মরণের ভয় আমার নাই ; দিন যে যায় রাম বিমুখ, সেই ব্যর্থ দিনের বেদনা মনের মধ্যে থাকে বিঁধিতে।

স্বর্গ নরক সুখ দুঃখ সব ছাড়িয়াছি, জীবন মরণ উড়াইয়া দিয়াছি ফুঁকিয়া ; দাদূ হইল রামের জন্য পিপাসিত ; কে আসে কে যায় (তার খবর বা কে রাখে) ?

না হইতে হইবে হিন্দু আর না হইতে হইবে মুসলমান, স্বামীকে দিয়াই হইল প্রয়োজন ; ষট্ দর্শনের সঙ্গে ও হইবে না যাইতে, নিঃপক্ষ (সকল দলের বাহিরে থাকিয়া) হইয়া ঘোষণা করিতে হইবে—ভগবানের নাম।

আমি হিন্দুও হইব না, মুসলমানও হইব না, ষট্‌দর্শনের দলেও আমি নাই ; প্রেমরঙ্গে রঙ্গিয়া আমি অনুরক্ত হইয়া আছি এক দয়াময় ভগবানের সঙ্গে।"

৬। দলাদলি ছাড়িয়া স্বামীর সঙ্গে থাক।

দাদূ অল্লহ রামকা দোনোঁ পখ তৈঁ ন্যারা।
রহিতা গুণ আকার কা সো গুরূ হমারা ॥

মেরা তেরা বাররে মৈঁ তৈঁ কী তজ বাণী।
জিন যহু সব কুছ সিরজতা করি তাহী কা জানি॥
করণী হিংদূ তুরককী অপনী অপনী ঠৌর।
দোনো বিচ মগ সাধকা সংতোঁ কী রহ ঔর॥
দাদূ হিংদূ তুরুককা দ্বৈ পখ পংথ নিরারি।
সংগতি সাচী সাধুকী সাঈঁ কৌঁ সংভারি॥
হিংদূ লাগে দেরহরা মুসলমান মহজীতি।
হমলাগে এক অলখ সোঁ সদা নিরংতর প্রীতি॥
ন তহঁা হিংদূ দেরহরা নহীঁ তুরুক মহজীতি।
দাদূ আপৈ আপ হৈ তঁহা নহীঁ রহ রীতি॥
দূন্যূঁ হাথোঁ দ্বৈ রহে মিলি রস পিয়া ন জাই।
দাদূ আপা মেটি করি দূন্যূঁ রহে সমাই॥

"আল্লা ও রামের দুই পক্ষ হইতে যিনি অতীত, যিনি গুণ ও আকার রহিত, তিনিই আমার গুরু।

ওরে পাগল, "আমার তোমার", "আমি তুমি", ছাড়্ এই সব বাণী; যিনি এই সব কিছু করিতেছেন সৃষ্টি, যুক্ত হইয়া সেই তাঁহাকে কর্ অনুভব।

হিন্দু ও মুসল্মানের কাজ কর্ম্ম আপন আপন ঠাঁই ঠিকানায় থাকিয়া, সাধুর পথ হইল এই দুইয়েরই মাঝখান দিয়া; সাধকদের (সন্তদের) পথই হইল স্বতন্ত্র (অর্থাৎ উভয়কে আপনার মধ্যে গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের পথ)।

হে দাদূ, সাচ্চা সাধুর সঙ্গতি হইল হিন্দু ও মুসলমানের দুই পক্ষ দুই পংথ সব ঠেলিয়া ফেলিয়া স্বামীকে স্থির-আশ্রয় করিয়া থাকা।

হিন্দু লাগিয়া রহিল তাহার দেবালয়ে, মুসলমান লাগিয়া রহিল তাহার মসজিদে; আমি গিয়া লাগিয়া রহিলাম এক অলখের সঙ্গে, সদা নিরন্তর প্রীতি (আমার সেই অলখেরই সঙ্গে)।

সেখানে না আছে হিন্দুর দেবালয় না আছে মুসলমানের মসজিদ; হে দাদূ, এক অদ্বিতীয় তিনিই সেখানে বিরাজমান, সেখানে না আছে বাঁধা পথ না আছে বাঁধা রীতি।

দুই হাত যদি দুই দিক হইয়া থাকে তবে মিলিয়া (অঞ্জলি করিয়া) করা যায় না রস পান। তাই দাদূ "অহংভাব" মিটাইয়া দিয়া দুইয়েতেই আছে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া (যুক্ত করিয়া)।"

৭। মুক্তির উপায়ঃ

পখ কাহূ কে না মিলৈ নিরপখ নিরমল নাৱঁ।
সাঈঁ সোঁ সনমুখ সদা মুক্তা সব হীঁ ঠাঁৱ॥
জব থৈঁ হম নিরপখ ভয়ে সবৈ রিসানে লোক।
সতগুরকে পরসাদ থৈঁ মেরে হরষ ন সোক॥
অপনে অপনে পংথকী সব সব কোই কহৈ বঢ়াই।
তা থৈঁ দাদূ এক সোঁ অংতর গতি লৱ লাই॥

"কাহারও পক্ষেতে (দলে) যাইয়া হইবে না মিলিতে, নিঃপক্ষ নির্ম্মল তাঁহার নাম ; স্বামীর সাক্ষাতে সদা হইবে তোমার থাকিতে, সকল ঠাঁইয়ে সদা থাকিতে হইবে মুক্ত।

যখন হইতে আমি হইলাম নিঃপক্ষ (সব দলাদলি ছাড়িয়া দিলাম), সব লোকই গেল রুষ্ট হইয়া ; সদগুরুর প্রসাদে না হইল আমার হর্ষ না হইল আমার শোক।

আপন আপন পক্ষের (দলের) সবাই করেন বড়াই, তাই দাদূ সেই একের সঙ্গেই অন্তরে অন্তরে প্রেমে রহিল যুক্ত।"

৮। সংসারের অদ্ভুত ধারাঃ

জে বোলোঁ তো চুপ কহৈঁ চুপ তো কহৈঁ পুকার।
দাদূ ক্যোঁ করি ছূটিয়ে ঐসা হৈ সংসার॥
পংথি চলৈঁ তে প্রাণিয়া তেতা কুল ব্যৱহার।
নিরপখ সাধূ সো সহী জিন কৈ এক অধার॥
জাগে কো আয়া কহৈঁ সূতে কো কহৈঁ জাই।
আৱণ জাৱণ ঝূঠ হৈ জহঁ কা তহাঁ সমাই॥

"(সংসারের এমনই ধারা) যদি আমি কিছু বলি তবে বলে "চুপ কর,"

যদি আমি থাকি চুপ করিয়া তবে বলে "ঘোষণা কর"; হে দাদূ, কেমন করিয়া (এই সব সমালোচনা হইতে) তবে পাবি ছুটি? এমনই এই সংসারের ধারা!

যত মানুষ কোনো না কোনো পংথ অবলম্বন করিয়া চলে, ততই চলে কুল ব্যবহার। দলাদলির অতীত তিনিই সাচ্চা সাধু যাঁহার সেই একই আশ্রয়, তিনিই আছেন ঠিক।

ইহাঁরা জাগ্রত অবস্থাকে বলেন "আসা", সুপ্ত অবস্থাকে বলেন "যাওয়া"; আসা যাওয়া সবই ঝুটা, যেখানকার সেখানেই হইতে হইবে সমাহিত।"

চতুর্থ প্রকরণ—সাধনা

একাদশ অঙ্গ—সারগ্রাহী

(চতুর্থ সহায়ক অঙ্গ)

বিশ্বজগতে সাচ্চার সঙ্গে ঝুটা আছে মিলিয়া। সাধক তাহার মধ্য হইতে সার গ্রহণ করিবেন। আসলে মিথ্যা কিছুই নাই, তবে সাধক আপনার লক্ষ্য মত সকল বস্তু লইবেন বাছিয়া। গরুর পুচ্ছ ও পা ও সিং সবই আসলে সত্য তবে বাছুরের পক্ষে স্তন ও স্তন্যই হইল সাচ্চা। সাচ্চা পাওয়ার অর্থ নিজকে সাচ্চা করা, তবেই সব হইয়া যায় সাচ্চা। এক সত্যে গিয়া পৌছান চাই, নানাত্বের মধ্য হইতে সত্য এককে লইতে হইবে বাছিয়া তবেই "নানানখানার" দুঃখ আপনি ঘুচিবে। হৃদয় যার যেমন সে তেমনই পায়, হৃদয় শুদ্ধ করাই হইল আসল কথা।

১। হংস যেমন নীর হইতে ক্ষীর বাছিয়া লয় সাধক (পরমহংস) তেমনি তেমনি বিষ (বিশ্ব) হইতে অমৃত লইবে বাছিয়া।

মনকে (মল হইতে) লও বাছিয়া, তাহা হইলে শরীরও হইবে নির্ম্মল। তবেই হংসের মত করা হইবে সার গ্রহণ।

এই জগতে যার যেমন হৃদয় সে তেমন বস্তু যায় লইয়া। তুমি যদি নির্দ্দোষ হও তবে নির্দ্দোষ বস্তুই পাইবে। ভগবানের নাম লইয়া হও নির্দ্দোষ।

২। মিথ্যাকে দূর করিবার উপায়ই হইল সত্যকে পাওয়া। পরম পদার্থ পাইলে কাঁকর সবাই দেয় ফেলিয়া। সাঁচকে পাইলে কাচ কে রাখে? জীবনপ্রদ মূল যদি মেলে তবে মরিতে চায় কে? মানস সরোবর পাইয়া কে খানা ডোবাতে মরে জল ছিটাইয়া? ভগবানকে যদি পাই তবে মিথ্যা আপনি পালাইবে।

৩। সত্য থাকিলে মিছা থাকিবে না ইহা নিশ্চয়। সূর্য্য যদি থাকে তবে রাত্রি নাই, রাত্রি থাকিলে সূর্য্য নাই। একই আছেন দুই নাই,একথা সব সাধুই বলেন। দুই ঘোড়া থাকিলেও এক কালে একটির বেশী ঘোড়া চড়িয়া যাওয়া চলে না। দুই ঘোড়ায় চড়িতে গিয়া প্রাণ হয় হারাইতে। সাধক ও সার্থক হয় এককে আশ্রয় করিয়া। নানাদিকে ছুটিতে গেলে সাধনা হইয়া যায় বৃথা।

৯। সাধক সারগ্রাহী।

হংসা জ্ঞানী সো ভলা অংতরি রাখৈ এক।
বিষ মৈঁ অম্রিত কাঢ়ি লে দাদূ বড়া বমেক॥
পহিলে ন্যারা মন করৈ পীছে সহজ সরীর।
দাদূ হংস বিচার সোঁ ন্যারা কীয়া নীর॥
গউ বচ্ছকা জ্ঞান গহি দুধ রহৈ লব লাই।
সীগঁ পূঁছ পগ পরহরৈ অস্তন লাগৈ ধাই॥
কাম গায় কে দুধ সৌঁ হাড় চাম সৌঁ নাহিঁ।
জেহি বিধি অম্রিত পাইয়ে সো হৈ অংতর মাহিঁ॥
হিরদৈ জৈসা হোইগা সো তৈসা লে জাই।
দাদূ তূঁ নিরদোষ রহু নাঁৱ নিরংতর গাই॥

"হংসের মত জ্ঞানীই ভাল যে (নানার মধ্য হইতে বাছিয়া) অন্তরে এককেই রাখে। বিষের মধ্য হইতেও অমৃত লও বাহির করিয়া, এই সাধনা করা বড়ই বিবেকের কথা।

প্রথমে স্বতন্ত্র করিতে হয় মনকে, তারপর সহজ হয় এই শরীর। দাদূ হংস-বিচারের দ্বারা (ক্ষীর হইতে) নীরকে নিয়াছে স্বতন্ত্র করিয়া।

গো বৎসের জ্ঞান গ্রহণ করিয়া (সর্ব্বাঙ্গ বাদ দিয়া) প্রেমের ধ্যানের সহিত স্তনেই থাক লাগিয়া। শিং লেজ ও পা পরিহার করিয়া স্তনে গিয়া লাগ ধাইয়া।

গরুর দুধের সঙ্গেই হইল প্রয়োজন, অস্থি চর্ম্মের সঙ্গে তো নয়। যেই বিধিতে অমৃত করিবে লাভ তাহা আছে অন্তরেরই মধ্যে।

যাহার হৃদয় যেমন সে (এই বিশ্বচরাচর হইতে) তেমনটিই যাইবে লইয়া। হে দাদূ, তুই নিরন্তর নাম গাইয়া হইয়া থাক নির্দ্দোষ।”

২। সাচ্চা আসে তো ঝুটা পলায়

জব পরম পদারথ পাইয়ে তব কংকর দিয়া ডারি।
দাদূ সাচা সো মিলে কূড়া কাচ নিৱারি॥
জব জীৱনমূরী পাইয়ে তব মরনা কৌন বিসাহি।
দাদূ অম্রিত ছাড়ি করি কৌন হলাহল খাহি॥
জব মান সরোৱর পাইয়ে তব ছিলর কৌন ছিটকাই।
দাদূ হংসা হরি মিলে কাগা গয়ে বিলাই॥

“যখন পরম পদার্থ যায় পাওয়া তখন কাঁকর দেয় ফেলিয়া; হে দাদূ, “কূড়া” (ঝূটা, আবর্জ্জনা, আস্তাকুড়) কাঁচ তখন দেয় ফেলিয়া যখন সাচ্চার সঙ্গে হয় মিলিত।

জীবনের মূল (অমৃতবল্লী) পাইলে মরণ আর কে চাহিবে কিনিতে? হে দাদূ, অমৃত ছাড়িয়া দিয়া কে আর খায় হলাহল?

মান সরোবর পাইলে অগভীর খানা ডোবার জল আর কে করে ছিটাছিটি! হে দাদূ, হরিরূপ হংস মিলিলে কাকের দল আপনিই হইয়া যাইবে বিলয়।”

৩। একমেবাদ্বিতীয়ম্

জহঁ দিনকর তঁহ্ নিস নহীঁ নিস তহঁ দিনকর নাঁহিঁ।
দাদূ একহী দুই নহীঁ সাধন কে মত মাহিঁ॥
একৈ ঘোড়া চঢ়ি চলৈ দূজা কোতিল হোই।
দোনোঁ ঘোড়াঁ বৈঠতাঁ পারি ন পহুঁচা কোই॥

“যেখানে দিবাকর সেখানে নাই নিশা, যেখানে রাত্রি সেখানে নাই সূর্য্য; হে দাদূ, একই আছেন, দুই নাই, সাধুদের সাধনার মতে এই একই কথা।

একই ঘোড়া চড়িয়া (লোক) চলে, দ্বিতীয় ঘোড়া থাকিলেও তাহা সাথে সাথে বিনা-আরোহী চলিতে থাকে। দুই ঘোড়াতে বসিয়া এ পর্য্যন্ত কেহই গিয়া পৌছায় নাই (পথের) পারে।”

চতুর্থ প্রকরণ—সাধনা

দ্বাদশ অঙ্গ—সুমিরণ

(নামস্মরণ বা জপ)

(পঞ্চম সহায়ক অঙ্গ)

এই অঙ্গের অনেক স্থলে "নাম আছে। কোনো কোনো পাঠান্তরে এইস্থলে "রাম" আছে। অনেকে মনে করেন "রাম-পন্থী" দের প্রভাবে দাদূর পরবর্ত্তী শিষ্যরা নামকে রাম করিয়া ফেলিয়াছেন। নহিলে "সুমিরণ" অঙ্গে নামই বেশী থাকার কথা। "রাম" শব্দ ভগবান অর্থে সচরাচরই দাদূ ব্যবহার করিয়াছেন, আর সেই রাম যে সগুণ মানব অবতার অযোধ্যার রাম নহেন ইহা বারবারই জানাইয়াছেন। তিনি সম্প্রদায়ের সঙ্কীর্ণতা মানেন নাই, তবে সম্প্রদায় প্রচলিত—রাম-হরি-আল্লা প্রভৃতি নাম, সাহিব-স্বামী-প্রভু প্রভৃতি প্রেমবাচক প্রচলিত পদ সর্ব্বদাই ব্যবহার করিয়াছেন।

সব দেশে ও সব ধর্ম্মেই নাম-স্মরণকে সাধনার একটি প্রধান অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। ভারতবর্ষে বৈষ্ণবাদির মধ্যে "নাম-তত্ত্ব"টি একটি স্বতন্ত্র ধর্ম্ম তত্ত্বই দাঁড়াইয়া গিয়াছে। মধ্য যুগের সাধকদের মধ্যেও নাম জপ খুব প্রচলিত ছিল। মুসলমানী সাধনা হইতেও নাম জপের অনেক ভাব তাঁহারা সংগ্রহ করিয়াছেন। শ্বাসে শ্বাসে নামজপ ভারতে প্রচলিত প্রাচীন অজপাজাপ, প্রতি শ্বাসের সঙ্গে নাম করা, মুসলমান সাধকদের মধ্যেও অতিশয় প্রচলিত ছিল। করধৃত জপমালার বদলে মধ্য যুগের সাধকরা এই "শ্বাসমালাতে" জপ করার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। এই শ্বাসের মালা সদাই চলিতেছে, যদি ইহাকে জপমালা বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় তবে নিরন্তর নাম করিতে হয়। একটি গুটিও নাম বিনে বৃথা গেলে জপের "ব্যভিচার" হয়, তাই সাধকেরা সব শ্বাসে "সুমিরণ" করিতেন, শয়নকালে এই জপের ভার দিতেন ভগবানের হাতে। কিন্তু কাজ করিতে গেলে "সুমিরণ" হয় কেমন করিয়া? তাই কাজকেও তাঁরা "সেবা"

করিয়া লইয়া তাহাকেও স্থমিরণেরই অর্থাৎ "জপেরই" সমান, করিয়া লইয়াছেন (১৫শ বাণী দেখ)। যে বাক্য প্রেম হইতে উৎপন্ন বা যে কাজ প্রেম হইতে উৎপন্ন সে বাক্যও জপ, সেই সেবাও জপ। তাহাতে "স্থমিরণের" ভঙ্গ হয় না।

কবীর এই জপের এত পক্ষপাতী ছিলেন যে তিনি বলিতেন, "শ্বাসগুটিকায় পবনের চলিয়াছে জপমালা; এই মালায় না আছে কোনো গাঁঠ না আছে কোনো "মেরু" (যে বড় গুটিকাতে মালার আরম্ভ হয় তাহার নাম মেরু; জপ করিতে করিতে অচেতন মন "মেরু"-গুটি স্পর্শেই ওঠে সচেতন হইয়া)। এই মালাতে নাম জপ নিরন্তর অন্তরে চলুক। এ মালা দেখাইবার নহে, কাজেই ইহা লইয়া কেহ গর্ব্ব করিতে পারিবে না।"

মধ্য যুগের "নাম তত্ত্ব" এক বিস্তৃত বিষয়। অতি সংক্ষেপে বলিতে গেলে বলিতে হয় যেমন মানুষের দুইটি স্বরূপ আছে তেমনি ব্রহ্মের ও দুইটি স্বরূপ আছে। মানুষ এক দিকে আপনার মধ্যে নানা আকৃতি প্রকৃতি গুণ ও বিশেষণকে একত্র করিয়া একটি বিশেষ ব্যক্তিরূপে প্রকটিত। আর সেই মানুষই নানা জনের হৃদয়ে নানা ভাবে বিরাজমান। সেই সেই হৃদয়ে ঐ একই মানুষেরই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ভিন্ন ভিন্ন "নাম।" প্রত্যেকেই তাহার নিজের অন্তরের ভাব-নামে তাহার মানুষকে ডাকিলে সে সাড়া দেয়। মানুষ তার আপনার কাছে "স্বাধীন স্থিত", পরের হৃদয়ে সে "ভাবাধীনস্থিত।" ভাবাধীন স্থিতিকে পরাধীন স্থিতিও বলা যাইতে পারে। মানুষ পরিমিত ও সীমাবদ্ধ হইলেও তার গুণ ও বিশেষণের অন্ত নাই। কাজেই সেই সব একত্র করিয়া তাহাকে ডাকা অসম্ভব। তাই তাহার প্রেমী জনেরা তাহাদের অন্তরে অন্তরের ভাবাধীন স্বরূপ বা "নাম" লইয়া ডাক দিলেই তার সাড়া পায়। এই নাম যদি না থাকিত তবে না যাইত তাকে অন্যের কাছে বুঝান, না যাইত তাকে সোজাসুজি ডাকা।

ভগবান অপরিমিত। তাঁহার অনন্ত গুণ ও বিশেষণ। তাঁহাকে কেমন করিয়া মানুষ তবে পায়? যে তাঁকে ভালবাসে তার অন্তরে ভগবানের যে ভাবাধীনস্থিতি বা ভক্তাধীন স্বরূপ আছে সে-ই হইল তাঁর "নাম।" এই "নাম"ই সাধকের আয়ত্ত, অসীমের অনন্তত্ব তার আয়ত্ত হইবে কেমন করিয়া?

তাই সাধক তার "নাম" দিয়া তাঁকে ডাকিলেই সাড়া পায়। এই "নাম" ক্রমশঃ সাধনাতে এত বড় স্থান অধিকার করিল যে অনেক সাধক মনে করিলেন "ভগবান" হইতেও তাঁর "নাম" বড়। অন্ততঃ তাঁর প্রেমী জনের কাছে বড়, আসলে তিনি যাহাই হউন না যত বড়ই হউন না কেন। বৈষ্ণবরা বলেন, "তুলাদণ্ডে তাঁকে ও তাঁর নামকে তৌল করিয়া নামই ভারী হইল দেখা গিয়াছে।" কারণ "নাম" দিয়াই তিনি আমার, স্ব-তত্ত্বে তিনি তো আমার নহেন। সেখানে তিনি সর্ব্বাতীত।

"নাম" হইল প্রেমীর কাছে। এ হইল "প্রেমাধীন স্বরূপ।" কাজেই "নাম" তত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গে প্রেম ও ভাবের সাধনাও চলিল অগ্রসর হইয়া। এই হইল আর এক পথ।

ব্রহ্মধ্যানপরায়ণ উপনিষদের ঋষিরা জ্ঞানে ধ্যানে মননে ও নিদিধ্যাসনে বিশ্বব্যাপ্ত চিন্ময় তাঁহাকেই খুঁজিতেন। তাহাও আবার আর এক পথ। এখানেও প্রেম আছে কিন্তু জ্ঞান ধ্যানের চেয়ে বড় হইয়া নাই। প্রেমপথে প্রেমই হইল সব চেয়ে বড় কথা। এই দুই পথে গোলমাল করিলে চলিবে না। উপনিষদের ঋষিদের পক্ষে নাম কীর্ত্তন করিয়া প্রেমানন্দে আকুল হইয়া ওঠা অস্বাভাবিক। তাঁদের ধ্যান জ্ঞানের মহাযোগের আনন্দও অপরিসীম আনন্দ। কিন্তু সে ভিন্ন পথ।

মধ্যযুগের সাধকদের মধ্যে উভয় ভাবই দেখি। কিন্তু তাঁরা সাধারণতঃ এই দুইটিকে দুই ভিন্ন পন্থা বলিয়াই জানিতেন, কখনো একটার সঙ্গে আর একটার গোল করিতেন না। দুই-ই পথ, তবে দুইয়ের প্রকারের ভিন্নতা আছে। তাঁহারা কখনও এইভাবে কখনও ওই ভাবে ভগবানকে সম্ভোগ করিতে চাহিতেন।

কেহ কেহ মনে করেন নামপন্থীদের সুন্দর সুন্দর গান লইয়া তাঁদের কোনো প্রিয় নামের স্থলে জ্ঞানপন্থীদের অসীম অনন্তত্ব সূচক নাম বসাইয়া দিলেই তাহা উত্তম গানে পরিণত হয়। কিন্তু যাঁহারা এই সব বিভিন্ন পথের বৈচিত্র্যের রসজ্ঞ তাঁহাদের কাছে এমন ব্যাপার অত্যন্তই বিসদৃশ মনে হয়। "সখিরে, কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।" এখানে শ্যামের বদলে "ব্রহ্ম"

বসান চলিবে না। এমন স্থলে গানটিকে হয় আগাগোড়া বদলাইতে হইবে অথবা যেমন আছে ঠিক তেমনিই রাখিতে হইবে।

কবীর খুব বড় সাধক হইলেও তিনি সাধনার পথ বলিতে পারিতেন না। তিনি বলিতেন, "আমি কোনো পথ জানি না, ভগবান স্বয়ং আমাকে লইয়া তাঁর কাছে উপস্থিত করিয়াছেন।" বাস্তবিক তিনি অসামান্য প্রতিভাশালী; ভগবানের প্রেম ও দয়া তিনি অনায়াসেই লাভ করিয়াছেন। কাজেই পথের কথা তিনি বলিতেই পারিতেন না। পথের কথা হইলেই তিনি বলিতেন, "পথ জানেন রবিদাস"। "সংতন মেঁ রবিদাস সংত হৈ", "সাধকদের মধ্যে রবিদাসই শ্রেষ্ঠ সাধক।" রবিদাসের সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ "অষ্টাঙ্গ সাধন" এখন দুর্ল্লভ, কিন্তু তাহা পাওয়া গেলে সাধকদের অপরূপ সামগ্রী হইবে। তাহা গুরুপরম্পরাতে অতি গুহ্য ভাবে চলিয়া আসিতেছে।

রবিদাসের মতে অষ্ট অঙ্গ এই—(১) গৃহ, (২) সেবা, (৩) সঙ্গ, এই তিনটি বাহ্য অঙ্গ। (৪) নাম, (৫) ধ্যান, (৬) প্রণতি, এই তিনটি অন্তর অঙ্গ। (৭) প্রেম, (৮) বিলয় বা সমাধি, অর্থাৎ ব্রহ্মে ডুবিয়া যাওয়া এই হইল চরম আনন্দ বা সর্ব্বাতীত অবস্থা।

রবিদাসের চতুর্থ অঙ্গ "নাম"ই হইল আসলে জপ। ইন্দ্রিয়াদিকে তো অনেক সাধক অনেক স্থলেই শত্রু মনে করিয়াছেন। কিন্তু মধ্য যুগের ভারতীয় সাধকরা দেখিলেন জপে আমরা এই সব শত্রুকেও মিত্র করিয়া তাহাদের সহায়তা পাই। পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে ও মনকেও সাধনাতে ব্যবহার করিতে পারি। মুখে নাম বলি, কর্ণে নাম শুনি, নয়নে যে পবিত্র শোভা দেখি তাহাকেও জপের সহায় করি; স্পর্শেও সব পবিত্র ও পূজাসহায়ক বস্তু দিয়া স্পর্শকেও লই সহায় করিয়া, পবিত্র গন্ধ দিয়া ঘ্রাণকেও লই সহায় করিয়া, মনও সেই মননই করে। এমন করিয়াই প্রতি শক্তি পরস্পরকে সহায়তা করিয়া সাধনাকে আনে সহজ করিয়া।

অন্তরঙ্গ সাধনাতে সব চেয়ে সহজ পথ হইল এই জপ। আসলে গৃহধর্ম্ম, সেবা, সঙ্গ, সবই বাহ্য জপ। প্রথমে প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়কে লইয়া গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া জপ সাধনা আরম্ভ করিতে হয়। শেষে নিশ্বাস প্রশ্বাসের মত জপ সহজ হইয়া যায়, তখন নিরন্তর অন্তরের মধ্যে বিনা আয়াসে জপ চলে। তখন সদাই সহজে

নামে (শ্রবণে বা উচ্চারণে), স্পর্শে বা গন্ধে মন আপনিই নিরন্তর হইয়া উঠিতে থাকে ভরপূর।

এখন এই পথে বিপদও আছে, যদি ভুলিয়া যাই যে ইহা পথমাত্র, আর যদি পথটাকেই মনে করি আসল। অসীম অনন্তকে লাভ করিবার এই সমস্তই পথ। পথকেই কখনও তাঁর স্থান যেন না দেই। এরা সব তাঁর কাছে দিবে পৌছাইয়া। যে তাঁর কাছে পৌছাইয়া দিবে তার গলায়ই যদি বরমাল্য দেই তবে কত বড় ভয়ঙ্কর কথা! রবিদাস বলেন, "সুবিধার জন্য যাহাকে আশ্রয় করিলাম, শেষে সে-ই আমার সর্ব্বস্ব দাবী করিয়া আমার সর্বনাশ করিল, এমন যেন না হয়। সাধনার পথে এর চেয়ে বিপদ আর নাই। আর সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর কথা এই, যে যার সর্বনাশ হইল সে মনে করে ইহাতেই ঘটিল তার চরম সিদ্ধি। কত বড় সর্বনাশ যে তাহার ঘটিল তাহা সে বুঝিতেই পারিল না।"

দাদূ এখানে জপ সাধনায় প্রবৃত্তির ক্রমটি লিখিয়াছেন। প্রথমে "নাম" শুনিয়া মনে রসের সঞ্চার হয়, তার পর হৃদয়ের মধ্যে নাম গান হইতে থাকে, তাতেই নামরসে ডুবিয়া গিয়া মন উঠে পূর্ণ হইয়া।

এই "নামে"র প্রেম আছে অন্তরে, প্রতিশ্বাসে তাহা জপ করিয়া সযত্নে এই রসটিকে একভাবে রাখিতে হইবে ধরিয়া।

এই রস এই "নাম" যত্নে রাখ, সাধন কর। একদিন তিনি আসিয়া মিলিবেন। এই পথই সহজ পথ।

সাধনার জন্য, প্রেমরস সাধনার জন্য, আত্মা আশ্রয় ও সহায়তা খোঁজে। নাম জপের মত আশ্রয় ও সহায় আর তো দেখি না।

কর্ম্ম করিয়া বা বিশেষ কোনো উপায় অবলম্বন করিয়া বন্ধন নাশ করা কঠিন। নামরস যদি জন্মে, দেখিবে সব বন্ধন খসিয়া গিয়াছে, ইহাই হইল মুক্তি। ইহা শুনিতে নাস্তিধর্ম্মাত্মক হইলেও আসলে ইহা নাস্তিধর্ম্মাত্মক নহে। কাজেই "নাস্তি"র পথে এই মুক্তি তো মিলিবে না। নাম নিরঞ্জনের সঙ্গলাভ করিলে সব বাঁধন সহজে যাইবে মুক্ত হইয়া। নিরঞ্জনের স্ব-নিষ্ঠ স্বরূপের কথা বলিতে পারি না, তাঁর ভক্তাধীনস্বরূপ হইল "নাম"। এই "নাম" নিরঞ্জনকে পাইলে হৃদয়ের প্রেমরসে সব বাঁধন আপনিই যাইবে খসিয়া। জীবনের সর্ব্ববিধ জ্বালার হইবে অবসান।

বিশ্বময় অসীম যে ভগবৎতত্ত্ব তাহা অগাধ অপার। তাহা বর্ণনীয় কি অবর্ণনীয় তাহাও জ্ঞানের অবিষয়। অতএব নামকে আশ্রয় করাই একমাত্র উপায়, নাম হইল আমার অন্তরের ধন। প্রেমযোগে তাহারই সঙ্গে আমার পরিচয়।

সর্ব্বাতীত অলখ্য অগাধ সেই ভগবৎতত্ত্ব; তাহাকে কেহ বা বলে সগুণ কেহ বা বলে নির্গুণ, কাজেই অবিলম্বে নামকেই আশ্রয় করা প্রয়োজন।

অসীম অনন্ত ভগবৎতত্ত্ব জ্ঞানের অতীত, কিন্তু তাঁর নামের সঙ্গে তো নিরন্তর আমাদের গান দিয়া পারি যুক্ত থাকিতে, অসীম আকাশের সঙ্গেও তো পাখীর নিরন্তর সঙ্গীতেই যোগ।

সেই অগাধ এক-তত্ত্ব সবারই অগোচর; কাজেই সাধকরা বার বার বলেন নামকেই অবলম্বন করিতে।

ধর্ম্ম বা দেশভেদে, সাধকদের রুচিভেদে অসংখ্য তাঁর নাম। তোমার হৃদয় পরিপূর্ণ হয় যে নামের রসে, সেই নামটিই কর জপ।

৩। নাম ছাড়িয়া এমন কিছুই নাই যে করিবে আশ্রয়। বিশ্বজগতে এমন এক তিল স্থান নাই যেখানে নামকে ছাড়াইয়া পার থাকিতে।

শরীর সবল থাকিতেই নাম অভ্যাস কর। যখন দেহ শক্তিহীন হইবে, সাধন অভ্যস্ত হইয়া সহজ হইলে তখনও বিনা ক্লেশে চলিতে থাকিবে "নাম"। তখন নূতন করিয়া আর নাম-স্মিরণ আরম্ভ করিবার সময় থাকিবে না। তেমন শক্তি তেমন ধৈর্য্য কি বৃদ্ধকালে থাকে?

দাদূ নীচবংশের। তিনি মূর্খ নিরক্ষর। সংসারে এমন কোনো সার্থকতাই নাই যাহাতে নিজেকে তিনি সার্থক মনে করিতে পারেন। বড়দের ঘৃণায় তলে পড়িয়া থাকিতে থাকিতে মন হইয়া যায় দুঃখী অবসন্ন। তখনও "নাম" আশ্রয় করিলেই সব দুঃখ সব অপমান হইতে মেলে মুক্তি।

আপনাকে বড় বলিয়া পরিচয় দিবার জন্য নাম জপ করিতে বলি না, অন্তরের সব দৈন্য দুঃখ ঘুচিবে বলিয়াই নাম আশ্রয় করিতে বলি।

এই স্মিরণ যেন বাহিরের দেখাইবার জন্য না হয়, স্মিরণ চলুক অন্তরে অন্তরে। ইহা গর্ব্ব করিবার নীচ উপায়মাত্র যেন না হইয়া ওঠে।

যেখানেই থাক যেমন ভাবেই থাক, অন্তরে "নাম"কেই রাখ। স্থানের ও ভাবের সব অপূর্ণতা নামেই উঠিবে পূর্ণ হইয়া।

৪। নাম বিনা জীবনের সব সার্থকতাই যায় চলিয়া, অতএব হও সচেতন, "নাম" কর আশ্রয়।

আবার সেবাবিমুখ নাম করায়ও সাধনা হয় না। পরোপকার ব্রতে প্রবেশ করাই এক মহা সাধনা। এমন কি দেহ দিয়াও যদি পশুপক্ষীকে তৃপ্ত করা যায় তবে মরিলেও দুঃখ নাই। হয়তো পারসীদের মৃতদেহ পক্ষীদের দেওয়ার কথা জানিয়া, মরিলে আত্মদেহ দ্বারা পশুপক্ষীর সেবার কথা তাঁর মনে জাগিয়াছে। পরে দাদূপন্থীদের মধ্যে পশুপক্ষীদের সেবায় আপন মৃতদেহ উৎসর্গ করাই প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

৫। নাম লইয়া কাজ করাই আস্তিকতা। "নাম" যদি জীবনে না থাকে, প্রেমে ভাবে যদি মন পূর্ণ না থাকে, তবে কেবল কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে কাজ করিতে গেলে আমাদের কাজও হয় শুষ্ক কাজ, সেবাও হয় না সরস। সেই "নাই"র উপর প্রতিষ্ঠিত নীরস কাজকেই নাস্তিকের কাজ বলিতে পার। এমন কাজ করায় জীবনের কোনো সার্থকতা নাই, ইহাতে কখনও ভগবানকে পাই না। কারণ তাঁর প্রেম হইতে এই কাজ উচ্ছ্বসিত হয় নাই, ইহা উৎপন্ন নিজের বুদ্ধি বা শক্তির বোধ হইতে।

নিত্যজীবনলাভ করিতে হইলে নামই করা দরকার। মৃত্যু সত্য নহে। যে "নাম"-আশ্রয় করে, মৃত্যু তাহাকে জীর্ণ করিতে পারে না। প্রেমের জীবন সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য দিয়া নিরন্তর মৃত্যুকে করিতেছে পরাজিত। ইহাই বিশ্বশোভার মূল।

মন দিয়া, পবনমালা (শ্বাসে শ্বাসে) প্রেম দিয়া কর তাঁহার নাম, তবেই তো নামামৃতের স্বাদ পাইবে। নহিলে বাহ্যমালা ফিরাইয়া, মন-প্রেম না দিয়া যে জপ, তাহাতে কোন্ সুখ?

প্রেম ভক্তিসহ নাম যদি কর তবে এমন কোনো দুঃখই নাই যাহা অনায়াসে বহিতে না পার। সকল-দুঃখ-জয়ী এই নামের সুমিরণ। ভগবানের ভক্তেরা নামের রসে ভরপূর হইয়া যত দুঃখ সহিয়াছেন এত দুঃখ বীরেরা কখনও সহিতে পারেন নাই।

জলহীন সরোবরের শূন্য গহ্বরটা যেমন একান্ত শোচনীয়, তেমনি শোচনীয় "নাম" হীন এই জীবন। এই জীবন সরোবরের "নাম"ই জল। তাই ভক্তেরা প্রেম দিয়া চতুর্দ্দিককে রাখেন জিয়াইয়া। তাঁহারা "শুচি-বায়ু" বা বাহ্যআচারের দ্বারা পবিত্র হইতে চাহেন না। "নামে"ই তাঁহারা সদা পবিত্র। কোনো অপবিত্রতা তাঁহাদের স্পর্শ করেনা বলিয়া কৃত্রিম কোনো উপায়ে তাঁহারা নিজেদের পবিত্র রাখিতে চাহেন না। এই প্রেমরস জীবনে না থাকিলে সহস্র কৃত্রিম আচারেও নিজেকে পবিত্র জীবন্ত রাখা অসম্ভব।

৬। মনের সহিত শ্বাস যোগে "নাম" বল, প্রাণ-কমলের মুখ নামের স্পর্শে হউক বিকশিত। প্রেম-কমলের মুখ নামের গুণে যাউক খুলিয়া।* তবে নিজধামে শূন্যরূপ ব্রহ্মের হইবে অনুভব।

অন্তরের মধ্যে নামের যে স্থান, এমন নির্জ্জন স্থান আর নাই। এমন একান্ত স্থান ছাড়িয়া সাধক বাহিরের নির্জ্জন সাধন-স্থান খোঁজে কেন? আত্ম-কমলের মধ্যে "নাম"-রসে ডুবিয়া দেখুক, অনন্ত বিশ্রাম মিলিবে।

৭। "নাম" আনন্দের সমান আনন্দ আর নাই।

জাতি পংক্তি ও সম্প্রদায়ের সঙ্কীর্ণতার মধ্যে থাকিয়া "নামের" তেমন আনন্দ মেলে না যেমন মেলে অসীম "নামের" রসাস্বাদে।

শাস্ত্র দিয়া কে তাঁহাকে পারিয়াছে জানিতে? প্রেমের যোগে একটি নামকেও যদি সাধন কর অনন্ত শাস্ত্র জানার ফল হয়। যে একটি নামও সাধিয়াছে সে-ই প্রকৃত "হাফিজ", সকল কোরাণ সে বুঝিয়াছে। তখন বুঝিব নাম-স্মিরণ হইয়াছে সার্থক, যখন ভগবানের প্রেমে থাকিব ডুবিয়া। আদ্যন্তমধ্য প্রেমে থাকিব সদাই পূর্ণ।

কবে এমন স্মিরণ হইবে? কবে ইন্দ্রিয়ের সহায়তা বিনা অন্তরের মধ্যে নিরন্তর চলিতে থাকিবে নাম? কবে বিনা আয়াসে সর্ব্ববিধ বিষয়-বিকার হইতে পাইব মুক্তি?

---

* দেহতত্ত্বের সাধনাতে ইহার অর্থ, শরীরের বিভিন্ন কমলস্থান, নামের গুণে খুলিয়া যাইবে।

৮। সচেতন হও, প্রেম রস পান কর, দেহ গুণ আপনি ভুলিবে; নিত্য জীবন লাভের ইহাই উপায়।

“নামের” জন্যই নাম কর। ইহাই পরমাগতি। ভক্তির জন্য, সেবার জন্য, নাম কর। সেবককে নামই নিত্য রাখে জীবন্ত, সেবা হয় সহজ।

আমি যত হীনই হই না কেন, অন্তরে যদি “নাম” থাকে, তবে সব ঐশ্বর্য্যই আমার দ্বারে, আমাকে হীন বলে কে? বাহিরের সব ঐশ্বর্য্য, অন্তরের সব আনন্দ, এই নামের সাথে সাথেই আছে। এই ঐশ্বর্য্য পাইলে দাদূ সব অপমানকে অগ্রাহ্য করিতে পারে, সে যে তখন মহানন্দে ভরপূর।

৯। “নামে”র জ্যোতিতে যে জীবন আলোকিত, তাহাকে কে আর রাখে লুকাইয়া? সকল কালের সকল স্থানের বাধা অতিক্রম করিয়া, এমন জীবন, নিখিল মানবের সম্মুখে সদা দীপ্যমান। কালের হিসাবে অতীত হইয়া গিয়াছেন বলিয়াও এমন সব সাধকেরা আজও ফুরাইয়া যান নাই, এখনও তাঁহারা সাধনার পথে দেখাইতেছেন আলো। সকল লোকের উপরে সেই সাধনার জ্যোতি দেখা যাইতেছে দীপ্যমান।

১০। এই দুঃখ রহিল যে এমন নামরসও নিঃশেষে জীবন ভরিয়া পান করি নাই। কি দুঃখ আমার হইতেছে তাহা বুঝাই কেমন করিয়া? অন্তরে হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হইতেছে, দেহ যেন করাতে দ্বিখণ্ডিত হইতেছে।* বাহিরে তো সেই দুঃখ দেখান যায় না। তাঁকে ভুলিয়া যাই, তাঁর আলিঙ্গন নিত্য জীবনে পাই না, তাঁকে নিরন্তর নয়নের মাঝে দেখি না, এই সব বেদনা মনেই গেল রহিয়া, ইহা বুঝাইবার উপায় নাই।

১১। “নাম” যদি নিতে পারিতাম তবে তাহাতেই ভাব ভক্তি বিশ্বাস প্রভৃতি সবই পাইতাম। মতি বুদ্ধি জ্ঞান বিচার ও প্রেম প্রীতি স্নেহ সবই নামে সহজে মিলিত। তাঁর “নামে” সব ঐশ্বর্য্য আছে ভরিয়া। এই “নামে” সবই

---

* কাশীতে গিয়া তখন অনেকে মুক্তি হইবে এই বিশ্বাসে করাত দিয়া দেহ দ্বিখণ্ডিত করিয়া চিরাইয়া ফেলিতেন। এই সব বাহ্য উপায়ে যে মুক্তি মেলে না ইহা দাদূ বারবার বলিয়াছেন। তবে সাধনা বিহীন জীবনে করাত কাটার চেয়ে বেশী দুঃখ হয় যখন মনে হয় এমন জীবন বৃথায় গেল।

আছে। “নাম যদি যথার্থভাবে নিয়া থাক তবে সাথে সাথে সবই হইয়াছে। তাহা হইলে জীবন যে ধন্য হইয়াছে, তাহাতে আর সংশয় নাই।

১২ হইতে ১৫ পর্য্যন্ত বাণী অংগবংধূ-সংগ্রহে সাধারণতই “পরচা” অঙ্গের মধ্যে পাওয়া যায়। যদিও এখানে ইহা “সুমিরণ” অঙ্গমধ্যেই আছে।

১২। হৃদয়ের কোমল চিৎকমলে প্রবেশ করিয়া মন স্থির করিলে, আপনিই “সুমিরণ” হইবে অর্থাৎ “নাম জপ” চলিতে থাকিবে।

জপকে যদি সহজ করিয়া নেওয়া যায় তবে পায়ের নখ হইতে মাথার শিখা পর্য্যন্ত সমগ্র শরীর ভরিয়া নিরন্তর জপই থাকিবে চলিতে। সকল ইন্দ্রিয় ভরিয়াই চলিবে জপ। অন্তরাত্মা হইবে বিকশিত, পরমাত্মা স্বয়ং হইবেন প্রকাশিত। শরীরের প্রতি অণু পরমাণু যখন নাম জপিবে, যখন আমার চিত্ত তাঁহার চিত্ত এক হইবে, তখন বুঝিব জপ জীবনের মধ্যে হইয়াছে প্রতিষ্ঠিত। এমন করিয়াই লইতে হইবে হরিনাম।

জপ যখন এমন সহজ হইবে তখন বিনা ঘাতে বিনা প্রযত্নে শুনিব চলিয়াছে অনাহত সেই “নাম”, আমার শরীরের নখ হইতে শিখা পর্য্যন্ত সকল শরীরময় শুনিব সেই নামেরই ধ্বনি। তখন দেখিব বিশ্বের সর্ব্ব ঘটে, নিত্যকালে কেবল ধ্বনিত হইতেছে তাঁরই নাম।

তার পর এই জপে আর ইন্দ্রিয়েরও প্রয়োজন থাকিবে না। ইন্দ্রিয়ের সহায়তা বিনাই চলিবে তাঁহার দরশন পরশন। ইন্দ্রিয় বিনাই হইবে শ্রবণ মনন ও সমাগম। এতই সহজ হইবে সুমিরণ।

১৩। ফকীরেরা নামজপের জন্য কেন বৃথা তস্‌বী (জপমালা) লইয়া চলেন? হে ভ্রান্ত, শরীরকেই তো বহন করিতেছ, তবে আর কেন ব্যর্থ জপমালা বহিয়া বেড়াইবে? জপ যদি সত্য হয়, তবে সকল তনুই কহিবে “করীম” (দয়াময়), তিনিই হইবেন তখন জপের মন্ত্র, তোমাতে তাঁহাতে কোনো ভেদই তখন আর থাকিবে না। এমন সহজ হউক সাধনা যেন দিবারাত্রি অষ্টপ্রহর চলিতে থাকে জীবন-মরণ পূর্ণ করা প্রণতি। প্রভুর কাছে অষ্টপ্রহরই চালাইতে হইবে এই প্রণতি। তখনই বুঝিব জীবনে জপ হইয়াছে সহজ ও সত্য।

১৪। সুস্থ শরীরের শক্তি ও আনন্দ থাকিতে থাকিতে শরীর দিয়া

"সুমিরণ" লও সহজ করিয়া। তার পর আত্মার প্রণতি অভ্যাস হইলে এই শরীরের প্রণতিও আর ভাল লাগিবে না।

আত্মা দিয়া সুমিরণ করিতে করিতে এক সময় তোমাতে তাঁহাতে সব ভেদ যাইবে চলিয়া, উভয়ে হইবে "এক-রস"। সেই রসের তত্ত্ব বুঝান বড় কঠিন, বড় গভীর সেই তত্ত্ব।

"এক-রস" অবস্থা হইলে শরীরের ভাব ও রূপ সবই ব্রহ্মভাবে ও ব্রহ্মরূপে সহজেই ডুবিয়া হইবে ধন্য। বদ্ধ সঙ্কীর্ণ সংসারের কথাও আর মনে থাকিবে না। সকল আশ্রয় ঘুচাইয়া দিয়া সাধক তখন ব্রহ্মের সঙ্গে থাকিবে এক হইয়া।

প্রিয়তমের সঙ্গে একাত্মা হইয়া সেবা করাই তো ভাল, লোকে কেন চায় বৃথা স্বতন্ত্র থাকিয়া সেবা করিতে?

প্রিয়তম যদি প্রেমভরে এই দেহ পরশ করেন তবে এই দেহ আর অস্থি মাংসের দেহ থাকে না, এই দেহ হইয়া যায় প্রেমময়। তিনি যে পরশমণি, পরশমণির পরশ তো ব্যর্থ হইবার নহে। সাধক যখন তাঁহার মধ্যে ডুবিয়া আপনাকে দেয় লোপ করিয়া, কেবল তিনিই থাকেন বাকী, তখনই বুঝিব সুমিরণ হইয়াছে পূর্ণ।

১৫। তার পর আয়ত্ত করিতে হইবে বিশ্বের সব রূপের মালা। এই যে (স্থানে) গ্রহ চন্দ্র তারা আকাশের মধ্যে ঘুরিতেছে, এও কি জপ মালা নয়? এই যে (কালে) একই স্থানে থাকিয়া বীজ হইতে বৃক্ষ,বৃক্ষ হইতে চলিয়াছে বীজ,ইহাও যেন চলিয়াছে কালের মধ্যে জপ মালার মত। কোনো বস্তু আজ আছে কাল নাই, পরন্তু আবার সে-ই হইল ভিন্নরূপ বস্তু, এও যেন চলিয়াছে কালের মধ্যে রূপেরই জপমালা। এই সকল আকারের জপমালা কি ব্যর্থ থাকিবে ফিরিতে? ভগবান এই সব মালা ফিরাইয়া চলিয়াছেন জপ করিয়া (পরচা অঙ্গ, ১৭শ বাণী দেখ)। সাধনায় তুমি তাঁর শরীক (পরচা অঙ্গ, ১৪শ, ১৫শ, বাণী দেখ), তাঁর জপ চলিবে আর তোমার ধ্যান চলিবে না? জপের সঙ্গে সঙ্গে ধ্যান চলুক সমানে সমান। নহিলে কিসের "শরীক", কিসের সহ-সাধনা?

এই যে কর্ম্মের পর কর্ম্ম করিতেছ এও কি মালা নয়? এই সব "করণী"র মালা দিয়া করিবে না তাঁর নাম? প্রত্যেকটি কর্ম্মও যেন জপমালার গুটি হইয়া তাঁর নাম স্মরণ করায়।

মালায় যেমন গুটি থাকে, তেমনি প্রত্যেকটি রূপের গুটি দিয়া করিতে হইবে ব্রহ্ম-জপমালা। এক একটি গুটি ফিরিলে যেমন এক একবার নাম করিতে হয়, তেমনি এক একটি আকার অনুভবের সঙ্গে সঙ্গে চলিবে নামজপ। পরব্রহ্ম স্বয়ং ফিরাইতেছেন বিশ্বরূপের মালা (পরচা অঙ্গ, ১৭শ বাণী)। তাঁর মনে মনে আশা আছে যে আমিও সাথে সাথে চালাইব আমার জপ-ধ্যান। আমিও যে তাঁর "সরীক"। তিনি ফিরাইতেছেন তাঁর মালা অথচ আমার জপ-ধ্যান চলিতেছে না, ইহা তো আমার অপরাধ, সাধনায় "ব্যভিচার"!

কি মধুর তাঁর নাম! তবে সকল কর্ম্মকে গুটি করিয়া কেন কর্ম্মমালাতেও এই নাম জপ না করি? এমন করিলে আকার ও কর্ম্মের কোন বন্ধন তো আমাদের বাঁধে না। কর্ম্মমালা চলিবে অথচ জপ চলিবে না, এ যে জপাপরাধ। তাই দাদূ বলিতেছেন, "করণী করতে ক্যা কিয়া?" অর্থাৎ কাজ করিয়া লাভ হইল কি, যদি সাথে সাথে নামই না জপিলাম?

সকল ঘট হইতে যেন দেখি তাঁহারই নাম হইতেছে উচ্চারিত। যখন চারিদিকে ঘানি চলে, তখন মধ্যস্থানে তেল পড়ে চুয়াইয়া। তেমনি সাধকের বাহিরে সর্ব্ববিধ মালা থাকিবে চলিতে, আর আত্মার অগম্য অগোচর স্থানে ক্রমাগত রামরস থাকিবে ঝরিতে, সাধক তাহাই ক্রমাগত করিবেন পান।

আমি যেমন আমার অন্তরে তাঁহাকে চাই, তিনিও তেমনি তাঁহার অন্তরে আমাকে চাহেন। তাই এই সুমিরণ এত সহজ হইয়াছে। তিনিও আমার সহায়। নহিলে আমার একার সাধনাতেই যদি পাইতে হইত তবে কি আর আমার ছিল কোনো আশা? দোঁহেই দোঁহাকে এমন করিয়া চাহে বলিয়াই এই সুমিরণ হইয়াছে সহজ, সুমিরণ হইয়াছে মধুর, সুমিরণ হইয়াছে সুন্দর।

৯। নাম-জপের ক্রম।

পহলী স্রবন দুতী রসন তৃতীয়ে হিরদৈ গাই।
চৌথী মন মগন ভয়া রোম রোম লব লাই॥
দাদূ নীকা নাউঁ হৈ হরি হিরদৈ ন বিসারি।
সুরতি মন মাহৈঁ বসৈ সাসৈঁ সাঁস সঁভারি॥

সাসৈঁ সাঁস সঁভারতা এক দিন মিলিহৈ আই।
সুমিরণ পৈঁড়া সহজকা সতগুর দিয়া দিখাই॥
ছিন ছিন নাম সঁভারতাঁ জে জিৱ জাই ত জাউ।
আতম কে আধার কৌঁ নাঁহীঁ আন উপাউ॥
এক মহূরত মন রহৈ নাউঁ নিরংজন পাস।
দাদূ তব হীঁ দেখতাঁ সকল করমকা নাস॥
এক রামকে নাউঁ বিন জীৱকী জরনি ন জাই।
দাদূ কেতে পচি মুয়ে করি করি বহুত উপাই॥

"প্রথমে ঘটে শ্রবণ, দ্বিতীয়ে উপজে নামে রস, তৃতীয়ে চলে হৃদয়ের মধ্যে নাম গান, চতুর্থে যায় মন মগ্ন হইয়া, রোমে রোমে ভক্তি ও প্রেমরস উঠে ভরিয়া।

হে দাদূ, বড় উত্তম বড় সুন্দর এই নাম, হরিকে হৃদয় যেন কখনও না ভোলে; মনের মধ্যে আছে যে প্রেম, প্রতি শ্বাসে শ্বাসে তাহাকে রাখ সামলাইয়া।*

শ্বাসে শ্বাসে (এই নাম) অন্তরের মধ্যে যত্নে রক্ষা করিতে করিতে একদিন আসিয়া মিলিবেন তিনি "স্বয়ম্"। সদ্‌গুরুই দেখাইয়া দিয়াছেন যে সুমিরণই (নাম স্মরণ, নাম জপই) হইল সহজের পথ।

প্রতি ক্ষণে ক্ষণে অন্তরের মধ্যে নাম যত্নে রক্ষা করিতে করিতে যদি জীবন যায় তো যাউক, আত্মার আশ্রয়ের ও আধারের আর অন্য উপায় তো নাই।

এক মুহূর্ত্ত যদি মন থাকে নাম নিরঞ্জনের পাশে, তবেই দাদূ, দেখিতে দেখিতেই সকল করমের হয় নাশ।

এক ভগবানের নাম বিনা জীবনের জ্বালা হয় না দূর। হে দাদূ, কত শত জন বহু বহু উপায় করিয়াও (এই নাম বিনাই) মরিল পচিয়া পচিয়া।"

২ঃ নামের মহিমাঃ

দাদূ রাম অগাধ হৈ পরিমিতি নাঁহীঁ পার।
অবরণ বরণ ন জানিয়ে দাদূ নাউঁ আধার॥

---

* "সুরতি" স্থলে "মূরতি" পাঠও আছে। তাহা হইলে অর্থ হইবে "মনের মধ্যে যে নাম-মূর্ত্তি আছে, শ্বাসে শ্বাসে তাহাকে হইবে সামলাইতে।"

দাদূ রাম অগাধ হৈ অবিগত লখৈ ন কোই।
নিরগুণ সরগুণ কা কহৈ নাউঁ বিলম্ব ন হোই॥
দাদূ রাম অগাধ হৈ বেহদ লখ্যা ন জাই।
আদি অংত নহিঁ জানিয়ে নাউঁ নিরংতর গাই॥
দাদূ রাম অগাধ হৈ সকল অগোচর এক।
দাদূ নাউঁ বিলংবিয়ে সাধূ কহৈঁ অনেক॥
দাদূ সিরজনহার কে কেতে নাম অনংত।
চিত আৱৈ সো লীজিয়ে য়োঁ সাধূ সুমিরৈঁ সংত॥

"হে দাদূ, অগাধ সেই ভগবান, তাঁর না আছে পরিমাণ না আছে পার; "অবরণ" (অবর্ণনীয়, বর্ণশূন্য অর্থও হয়) কি "বরণ" তিনি, নাই তো তাহা জানা; হে দাদূ, নামই আশ্রয় ও আধার।

হে দাদূ, অগাধ সেই ভগবৎতত্ত্ব, তাহা অনির্ব্বচনীয়, তাহা কেহই পায় না দেখিতে; "নির্গুণ সগুণ" কি বৃথা এ সব বল? নামে (নাম লইতে) যেন না হয় বিলম্ব (অথবা নামই একমাত্র অবলম্বন)।

হে দাদূ, অগাধ সেই রাম, দেখাই যায় না এমন অসীম তাঁহার স্বরূপ; আদি-অন্ত অজ্ঞেয় তত্ত্ব তাঁর নাই-বা গেল জানা, নিরন্তর গাও সেই নাম।

হে দাদূ, অগাধ সেই পরমেশ্বর, সকল ইন্দ্রিয়ের অতীত তিনি এক অগোচর (ব্রহ্ম স্বরূপ)। হে দাদূ, নাম অবলম্বন কর, সাধকগণ বার বার ইহাই বলেন।

হে দাদূ, সৃজনকর্ত্তার কত কত অনন্ত নাম; যে নাম তোমার মনে লাগে তাহাই তুমি লও, সাধু সন্ত সবাই এমন করিয়াই স্মরণ করেন নাম।"

৩। নাম সর্ব্বব্যাপী নাম সর্ব্বাশ্রয়।

ঐসা কৌন অভাগিয়া কছূ দিঢ়াৱৈ ঔর।
নাউঁ বিনা পগ ধরণ কূঁ কহৌ কহাঁ হৈ ঠৌর॥
মেরা সংসা কো নহী জীৱন মরণ কে রাম।
নিমিখ ন ন্যারা কীজিয়ে অংতর থৈঁ উর নাম॥
দাদূ নাম সংভারি লে জব লগ সুস্থ সরীর।
ফিরি পিছৈঁ পছিতাহিগা তন মন ধরৈ ন ধীর॥

দাদূ দুখিয়া তব লগৈ জব লগ নাউ ন লেহি।
তব হীঁ পাৱন পৱম সুখ মেরী জীৱন এহি ॥
কছু ন কহাৱৈ আপকৌ সাঁই কূঁ সঁভাল।
দাদূ পীৱকে নাউ লে তৌ মিটৈ সির সাল ॥
অহ নিস সদা সরীর মৈঁ হরি চিংতত দিন জাই।
প্রেম মগন লয় লীন মন অংতর গতি লৱ লাই ॥
জহাঁ রহূঁ তহঁ রামসৌঁ ভাৱৈ কংদলি জাই।
ভাৱৈ গিরি পৱৱত রহূঁ ভাৱৈ গ্রেহ বসাই ॥
ভাৱৈ জাই জলহিঁ রহূঁ ভাৱৈ সীস নৱাই।
জহাঁ তহাঁ হরি নাউ সৌঁ হিরদৈ হেত লগাই ॥

"এমন আছে কোন্ অভাগা যে (নাম ছাড়া) আর কিছুকে ধরে দৃঢ় করিয়া ? বল দেখি, নাম বিনা পা রাখিবার মত স্থানটুকুও বা সংসারে আছে কোথায় ?

আমার কোনো সংশয়ই নাই, জীবন মরণের আশ্রয় ও অবলম্বন আমার রাম, নিমিষের তরেও অন্তর হইতে হৃদয়ের সেই নামটি রাখিও না দূরে।

হে দাদূ, যে পর্য্যন্ত শরীর সুস্থ থাকে, যত্নে নামটি রাখ সামলাইয়া (আশ্রয় কর), নহিলে শেষে মরিবে আপশোষ করিয়া, যখন তনু মনে আর থাকিবে না ধৈর্য্য (নাম করিবার শক্তি থাকিবে না)।

যতক্ষণ এই নাম না লইতে পারি ততক্ষণ নিজেকে বড় দুঃখীই বোধ হয়, নাম নিলেই পরম সুখ যায় পাওয়া ; এই-ই যে আমার জীবন।

আপনাকে কিছু (সাধু-বা সন্ন্যাসী প্রভৃতি) বলিয়া পরিচয় দিবার নাই কোনই প্রয়োজন ; স্বামীকে কর অবলম্বন, ওরে দাদূ, নে তোর প্রিয়তমের নাম। তবেই তোর সকল ব্যথার উপরে ব্যথা (মাথা ব্যথা) যাইবে মিটিয়া।

অহর্নিশি যেন অন্তরে হরির ধ্যানেই যায় দিন, প্রেমে মগ্ন ধ্যানে লীন মন যেন অন্তরের ভাবে-ধ্যানে-প্রেমে তাঁহার সঙ্গে রহে সদা যোগযুক্ত।

যেখানে থাকি সেখানে যেন রামের সঙ্গেই থাকি, চাই পর্ব্বত কন্দরেই যাই, চাই গিরি পর্ব্বতেই থাকি, আর চাই গৃহেই করি বাস।

চাই জলেই গিয়া করি বাস, চাই মাথা নীচে (হেঁটমুণ্ড) করিয়াই থাকি ঝুলিয়া, যেখানেই থাকি সেখানেই যেন হরিনামের সঙ্গে হৃদয় সদা প্রেমে রহে যোগ-যুক্ত।”

৪। নাম বিনা সবই যায়।

নাম * কহে সব রহত হৈ লাহা মূল সহেত।
নাম কহে বিন জাত হৈ মূরখ মনরাঁ চেত॥
নাম কহে সব রহত হৈ আদি অংত লৌ সোঈ।
নাম কহে বিন জাত হৈ য়হু মন বহুরি ন হোই॥
নাম কহে সব রহত হৈ জীব ব্রহ্ম কী লার।
নাম কহে বিন জাত হৈ রে মন হো হুসিয়ার॥
হরি ভজি সাফিল জীবনা পর উপগার সমাই।
দাদূ মরনা তহঁ ভলা জহঁ পসু পংখী খাই॥

“নাম লইলে সবই তো যায় রহিয়া, মূল সমেত লাভ যায় থাকিয়া; নাম না লওয়ায় (সবই) যে যায় চলিয়া, ওরে মূর্খ মন, হ’ সচেতন।

নাম লইলে সবই তো যায় রহিয়া, আদি অন্ত লইয়াই যে তিনি, নাম না বলায় (সবই) যে যায় চলিয়া; আর তো ফিরিয়া হইবে না এই মন, এমন সুযোগ!

নাম লইলে সবই তো যায় রহিয়া, জীব যে ব্রহ্মের প্রেমাস্পদ; নাম না লওয়ায় (সবই) যে গেল চলিয়া, ওরে মন হ’ সাবধান।

পরোপকার ব্রতে ডুবিয়া গিয়া হরি ভজিয়া ওরে মন হ’ সফল। হে দাদূ, মরণও সেখানে ভাল যেখানে পশু পাখী খায় তোর দেহ।”

৫। নামেই সব, নাম ছাড়া কিছুই নাই।

হৈ সো সুমিরণ হোতা নহীঁ নহীঁ সো কীজৈ কাম।
দাদূ য়হ তন য়োঁ গয়া কূঁ্য কর পইয়ে রাম॥

---

* এখানে প্রত্যেকটি “নাম” স্থলে “রাম” পাঠও আছে। তখন অর্থ হইবে “ভগবান”।

নির্বিকার নিজ নাউঁ লে জীৱন ইহৈ উপাই।
দাদূ ক্রিত্রিম কাল হৈ তাকৈ নিকটি ন জাই ॥
মন পৱনা গহি সুরতি সৌঁ দাদূ পাৱৈ স্বাদ।
সুমিরণ মাঁহৈঁ সুখ ঘণা ছাড়ি দেহু বকৱাদ ॥
নাঁৱ সপীড়া লীজিয়ে প্রেম ভকতি গুণ গাই।
দাদূ সুমিরণ প্রীতি সৌঁ হেত সহিত লৱ লাই ॥
সরীর সরোবর নাম জল মাঁহৈ সজীৱন সার।
দাদূ সহজৈঁ সব গয়ে মনকে মৈল বিকার ॥

"অস্থির পথে যদি নাম স্মরণ (জপ) (ঠিক মত) না হয়, তবে "নাহী"র ("নাস্তি"র) সঙ্গেই করিতে হয় কাজ। হে দাদূ, এমন করিয়াই বৃথা গেল এই জীবন, কেমন করিয়া পাইবি তবে ভগবানকে?

বিকার রহিত হইয়া লও পরমাত্মার নাম, ইহাই জীবনের উপায়; হে দাদূ, কাল হইল কৃত্রিম (তৈয়ারী করা মিথ্যা বস্তু), কাল তার নিকট যায় না (যে নির্ব্বিকার হইয়া নাম নেয়)।

মন ও পবনকে (মন দিয়া প্রতি শ্বাসযোগে) প্রেমের সহিত লইলে (জপ করিলে), হে দাদূ পাইবে অমৃতের স্বাদ; নাম স্মরণের মধ্যেই প্রভূত আনন্দ, বৃথা বাগ বিতণ্ডা দাও ছাড়িয়া।

প্রেম ভক্তি গুণ গাহিয়া বেদনার সহিত গ্রহণ কর এই নাম; হে দাদূ, প্রীতিতে, ব্যাকুলতায়, প্রেমধ্যানে কর এই নামের স্মরণ (জপ)।

(সাধকের) শরীর হইল সরোবর, নামই তাহাতে হইল জল, তাহাতেই সার জীবন্ত ধন; হে দাদূ, মনের মলিন বিকার সহজেই গেল সব চলিয়া।"

৬। সব ভাবে কর নাম।

প্রাণ কমল মুখি নাম কহি মন পৱনা মুখি নাম।
দাদূ সুরতি মুখি নাম কহি ব্রহ্ম সুঁনি নিজ ধাম ॥
কহতা সুনতাঁ নাম কহি লেতাঁ দেতাঁ নাম।
খাতাঁ পীতাঁ নাম কহি আতম কৱঁল বিশ্রাম ॥

জ্যূঁ জল পৈঠৈ দূধ মৈঁ জ্যূঁ পাণী মৈঁ লোণ।
ঐসৈঁ আতমরাম সোঁ মন হঠ সাধৈ কোণ ॥*
রাম নাম মৈঁ পৈঠি করি রাম নাম লৱ লাই।
য়হু ইকংত ত্রিয় লোক মৈঁ অনত কাহি কোঁ জাই ॥

“প্রাণ কমলের মুখে নাম কহ, মন পবন মুখে বল নাম, হে দাদূ, প্রেমের মুখে নাম বল, তবে নিজধামেই ব্রহ্ম-অনুভূতি। এই ব্রহ্ম (শান্ত আনন্দঘন) শূন্যরূপ।

কহিতে কহিতে শুনিতে শুনিতে বল নাম, নিতে নিতে দিতে দিতে কহ নাম, খাইতে খাইতে পান করিতে করিতে জপ নাম, ইহাই আত্ম কমলের বিশ্রাম।

জল যেমন হয় দুধের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট, লবণ যেমন হয় জলের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট, এমন যদি মন অনুপ্রবিষ্ট হয় ভগবানে, তবে মন আর করিতে পারে কোন্ হঠকারিতা ?

রাম নামের মধ্যে ডুবিয়া মিলাইয়া গিয়া, রাম নামে প্রেমের ধ্যানের যোগ হও প্রাপ্ত ; ত্রিলোকের মধ্যে ইহাই অতিশয় একান্ত স্থান (নির্জন শান্ত স্থান), অন্যত্র আর তবে কেন বৃথা যাও ?”

৭। তুলনা নাই নামের।

সব সুখ সরগ পাতাল কে তৌলি তরাজূ বাহি।
হরি সুখ এক পলক কা তাসমি কহ্যা ন জাহি ॥
অপনী অপনী হদ্দ মৈঁ সব কোই লেৱৈ নাউঁ।
জে লাগে বেহদ্দ সোঁ তিন কী মৈঁ বলি জাউঁ ॥
পঢ়ি পঢ়ি থাকে পংডিতা কিনহূঁ ন পায়া পার।
কথি কথি থাকে মুনি জনা দাদূ নাৱঁ অধার ॥
নিগমহি অগম বিচারিয়ে তউ পার নহিঁ আৱৈ।
তাথৈঁ সেবক ক্যা করৈ সুমিরণ লৱ লাৱৈ ॥

---

* “মন” অঙ্গেও এই বাণীটি আছে !

অলিফ এক অলাহ্‌কা জে পঢ়ি জানৈ কোই।
কুরান কতেবাঁ ইলম সব পঢ়ি করি পূরা হোই॥
দাদূ য়হ তন পিংজরা মাহীঁ মন সূৱা।
এক নাউঁ অলাহ কা পঢ়ি হাফিজ হূৱা॥
নাৱঁ লিয়া তব জানিয়ে জে তন মন রহৈ সমাই।
আদি অংতি মধি এক রস কবহূঁ ভুলি ন জাই॥
কা জাণৌঁ কব হোইগা হরি সুমিরণ ইকতার।
কা জাণৌঁ কব ছাড়িহৈ য়হ মন বিষয় বিকার॥

“স্বর্গ পাতালের সকল সুখ যদি তুলাদণ্ডে যায় তৌল করা, এক পলকের যে হরি-সুখ, তার সমান তো তবু ইহা যায় না বলা।

আপন আপন সীমাতে থাকিয়াই সবাই নেয় নাম; অসীমের সঙ্গে যুক্ত হইয়া নাম লইতে যে জন পারে, আমি বলিহারি যাই তার।

পড়িয়া পড়িয়া ক্লান্ত হইল পণ্ডিত, কেহই তো পাইল না পার; কহিয়া কহিয়া ক্লান্ত সব মুনিজন, হে দাদূ, নামই দেখা গেল মূল আধার।

নিগম কি আগম যাহাই কেন কর না বিচার, তবু তো কভু মিলিবে না পার; তাই সেবক করে কি, নাম স্মরণ (জপ) দিয়া প্রেমযোগই করে সাধন।

এক আল্লা নামের আদ্য-অক্ষর এক “অলিফ”ই যদি কেহ যথার্থভাবে জানিত পড়িতে, তবে কোরাণ কেতাব সকল শাস্ত্রের সকল জ্ঞান সে পড়িয়া হইত পূর্ণ।

হে দাদূ, এই তনু পিঞ্জরের মধ্যে মন হইল শুক পাখী, আল্লার একটি নাম পড়িয়াই সে হইয়া গেল ‘হাফিজ’ (সমগ্র কোরাণ-বেত্তা)।

নাম লইয়াছি জানিবে তখন, যখন তনু মন থাকে (তাঁহাতে) ডুবিয়া পূর্ণ হইয়া; আদি-অন্ত-মধ্য মনের যখন সেই এক রস, যখন কখনও মন তাঁহার নাম যায় না ভুলিয়া।

কি জানি কবে হইবে “একতার” (বরাবর সমানভাবে অবিচ্ছিন্ন-গতি) হরি-স্মরণ, কি জানি কবে এই মন ছাড়িবে সকল বিষয়বিকার।”

৮। সর্ব্বসিদ্ধি তাঁর নাম।

আতম চেতন কীজিয়ে প্রেম রস পীৱৈ।
দাদূ ভূলৈ দেহ গুণ ঐসৈঁ জন জীৱৈ॥

মিলৈ তো সব সুখ পাইয়ে বিছুরে বহু দুখ হোই।
দাদূ সুখ দুখ রাম কা দূজা নাহীঁ কোই॥
দাদূ হরিকা নাউঁ জল মৈঁ মীন তা মাহিঁ।
সংগি সদা আনঁদ করৈঁ বিছুরত হী মরি জাহিঁ॥
নাউঁ নিমিত্ত হরি ভজৈ ভগতি* নিমিত্ত ভজি সোই।
সেৱা নিমিত্ত সাঁই ভজৈ সদা সজীৱনি হোই।
হিরদৈ রাম রহৈ জা জন কৈ তা কোঁ উনা কৌন কহৈ।
অঠ সিধি নৱ নিধি তাকৈ আগৈ সন্মুখ ঠাঢ়ী সদা রহৈ॥
সংগ হী লাগা সব ফিরৈ রাম নাম কে সাথ।
চিংতামণি হিরদৈ বসৈ সকল পদারথ হাথ॥
দাদূ আনংদ আতমা অৱিনাসী কে সাথ।
প্রাণনাথ হিরদৈ বসৈ সকল পদারথ হাথ॥

"আত্ম-চেতনা কর, প্রেমরস পান কর; হে দাদূ, (নামরসে) দেহগুণ যে যায় ভুলিয়া এমন জনই তো (যথার্থ) জীবন্ত।

(তাঁহার সহিত) মিলনেই পাইবে সব সুখ, বিচ্ছেদেই বহু দুঃখ; হে দাদূ, সব সুখ দুঃখ রামের (মিলনে বিচ্ছেদে), অন্য আর কিছু (সুখ দুঃখ) নাই।

হে দাদূ, হরির নামই জল, আমি তার মধ্যে নিমজ্জিত মীন; ডুবিয়া তাঁহাতে থাকিলেই সদা করি আনন্দ, বিচ্ছেদ ঘটিলেই যাই মরিয়া।

নামের নিমিত্ত ভজনা করিতে হইবে হরিকে, ভক্তির নিমিত্তও তাঁকেই করিতে হইবে ভজন, সেবার নিমিত্ত স্বামীকেই করিতে হইবে ভজনা; তিনিই যে সদা-সঞ্জীবন নিত্য জীবনের মূল আধার ও উৎস।

যাহার হৃদয়ে রাম আছেন বিরাজমান তাকে কে বলিবে কোনো ভাবে উন? অষ্টসিদ্ধি নবনিধি তার সম্মুখে সদা (আজ্ঞাবহের মত) আছে দাঁড়াইয়া।

---

* "ভগতি" স্থলে "গতি" পাঠও আছে।

রাম নামের সাথে যুক্ত হইয়াই সব কিছু সাথে সাথে বেড়ায় ফিরিয়া, চিন্তামণি যাহার হৃদয়ে করে বাস সকল পদার্থই তাহার করতলে।

হে দাদূ, অবিনাশী ভগবানের সাথে সাথেই আত্মার সদা আনন্দ, প্রাণনাথ যদি হৃদয়ে করেন বাস, তবে সকল পদার্থ ই করতল-গত।”

৯ঃ বিশ্বময় দীপ্যমান এই নামঃ

ভাৱৈ তঁহা ছিপাইয়ে সাঁচ ন ছানা হোই।
সেস রসাতলি গগন ধূ পরগট কহিয়ে সোই॥
দাদূ কহঁ নারদ জনা কহাঁ ভক্ত প্রহলাদ।
পরগট তিনূঁ্য লোক মৈঁ সকল পূকারৈঁ সাধ॥
কহঁ সির বৈঠা ধ্যান ধরি কহাঁ কবীরা নাম।
সো ক্যোঁ ছানা হোইগা জো রে কহৈগা রাম॥
কহাঁ লীন সুকদের থা কহঁ পীপা রৈদাস।
দাদূ সাঁচা ক্যোঁ ছিপৈ সকল লোক পরকাস॥
কহঁ থা গোরখ ভরথরী অনঁত সিধোঁ কা মংত।
পরগট গোপীচংদ হৈ দত্ত কহৈঁ সব সংত॥
অগম অগোচর রাখিয়ে করি করি কোটি জতন।
দাদূ ছানা ক্যোঁ রহৈ জিস ঘটি রাম রতন॥
দাদূ সরগ পাতাল মৈঁ সাঁচা লেৱৈ নাউঁ
সকল লোক সিরি দেখিয়ে পরগট সবহী ঠাউঁ॥

“যেখানে ইচ্ছা রাখ লুকাইয়া, সত্য কিছুতেই যায় না লুকান, রসাতলের অনন্ত (নাগ) হইতে গগনের ধ্রুবতারা পর্য্যন্ত সবাই বলিবে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রত্যক্ষ প্রকাশমান।

হে দাদূ, কোথায় সেই নারদ আর কোথায় ভক্ত প্রহ্লাদ! তিন লোকেই তাঁহারা দীপ্যমান, সকল সাধুই ইহা উচ্চকণ্ঠে করেন ঘোষণা।

কোথায় শিব বসিয়া আছেন ধ্যানমগ্ন, কোথায় নামদেব ও কবীর! সে কেমন করিয়া থাকিবে লুকাইয়া, যে জন ভগবানের নাম করিবে উচ্চারণ!

কোথায় শুকদেব ছিলেন ধ্যানে লীন, কোথায় ছিলেন পীপা ও রইদাস! হে দাদূ, সত্য কেমনে রহিবে গোপন, সকল লোকে তাহা দীপ্যমান।

কোথায় ছিলেন গোরক্ষনাথ ও ভর্ত্তৃহরি, আর কোথায় ছিল অনন্ত সিদ্ধগণের মত ? গোপীচন্দ্র ও দত্তাত্রেয় তো সদাই আছেন জাজ্বল্যমান, সকল সাধকেরাই বলিতেছেন এই একই কথা ।

কোটি কোটি যতন করিয়াও (সত্যকে ও সাধককে) যদি রাখ অগম্য অগোচর, তবু হে দাদূ, সে কেমন করিয়া রহিবে গোপন যে ঘটে দীপ্যমান স্বয়ম্ রামরতন ।

হে দাদূ, স্বর্গ পাতাল যেখানেই কেহ নেয় এই সত্যনাম, তাহাকেই দেখিবে সকল লোকের উপরে বিরাজিত, সকল ঠাইই সেই জন ও তাহার সাধনাই প্রত্যক্ষ ও জাজ্বল্যমান ।”

১০। অন্তরের ব্যথা

সুমিরন কা সংসা রহ্যা পছিতাৱা মন মাঁহি ।
দাদূ মীঠা রাম রস সগলা পীয়া নাহিঁ ॥
দাদূ জৈসা নাউঁ থা তৈসা লীয়া নাহিঁ ।
হোঁস রহী য়হ জীৱ মেঁ পছিতাৱা মন মাঁহি ॥
দাদূ সির করৱত বহৈ বিসরৈ আতম রাম ।
মাঁহি কলেজা কাটিয়ে জীৱ নহীঁ বিশ্রাম ॥
দাদূ সিরি করৱত বহৈ অংগ পরস নহিঁ হোই ।
মাঁহি কঁলেজা কাটিয়ে বিথা ন জানৈ কোই ॥
দাদূ সিরি করৱত বহৈ নৈনহুঁ নিরখৈ নাহিঁ ।
মাহিঁ কলেজা কাটিয়ে সাল রহ্যা মন মাহিঁ ॥

“নাম স্মরণেই ছিল (আমার) সংশয়, এই অনুতাপই রহিয়া গেল মনের মধ্যে ; হে দাদূ, এমন যে সুমিষ্ট রামরস, তাহাও ভরপূর করি নাই পান ।

হে দাদূ, যেমন (অমৃতময়) তাঁর নাম তেমন করিয়া তো সেই নাম লই নাই, এই জীবনে সেই আকাঙ্ক্ষা (অতৃপ্তই) গেল রহিয়া, মনের মধ্যে রহিয়া গেল জ্বলন্ত আপশোষ ।

দাদূ মাথায় বহিতেছে করাতে কাটার যন্ত্রণা, সে আত্মারামকে রহিয়াছে ভুলিয়া ! অন্তরে হৃৎপিণ্ড হইতেছে বিদীর্ণ, প্রাণে নাই বিশ্রাম (শান্তি) ।

দাদূ মাথায় বহিতেছে করাত-কাটার অসহ্য যাতনা,(তাঁর অঙ্গে যে) আমার অঙ্গের হইতেছে না পরশ (আলিঙ্গন)! অন্তরে হৃৎপিণ্ড হইতেছে বিদীর্ণ। অথচ কেহই জানে না সেই ব্যথা।

দাদূর মাথায় করপত্র-বিদারণের চলিয়াছে বেদনা, নয়নে যে দেখিতেছি না তাঁহাকে! অন্তরে হৃৎপিণ্ড হইতেছে বিদীর্ণ। হায়রে, এই বেদনাই শুধু রহিয়া গেল মনের অন্তরে!”

১১। নামেই সব আছে

সাহিব জী কে নাউঁমাঁ ভার ভক্তি বেসাস।
লৈ সমাধি লাগা রহৈ দাদূ সাঈঁ পাস॥
সাহিব জী কে নাউঁমাঁ মতি বুধি জ্ঞান বিচার।
প্রেম প্রীতি সনেহ সুখ দাদূ জোতি অপার॥
সাহিব জী কা নাউঁমাঁ সব কুছ ভরে ভংডার।
নূর তেজ অনংত হৈ দাদূ সিরজনহার॥
জিস মৈঁ সব কুছ সো লিয়া নিরংজন কা নাউ।
দাদূ হিরদৈ রাখিয়ে মৈঁ বলিহারী জাউঁ॥

“প্রভুজীর নামের মধ্যেই ভাব ভক্তি ও বিশ্বাস, হে দাদূ, প্রেম ধ্যানে যুক্ত হইয়া যে থাকে তাহাতে সমাহিত হইয়া সে-ই রহে স্বামীর পাশে।

প্রভুজীর নামের মধ্যেই মতি, বুদ্ধি, জ্ঞান বিচার ; হে দাদূ, প্রেম, প্রীতি, স্নেহ, সুখ, অপার জ্যোতি (সেই নামেরই) মধ্যে।

প্রভুজীর নামের মধ্যেই সব কিছুতে ভরা ভাণ্ডার ; অনন্ত জ্যোতি, অনন্ত তেজ অসীম অনন্ত স্বয়ং বিধাতা, হে দাদূ, (বিরাজমান এই নামে)।

যাহার মধ্যে সব কিছুই ভরপূর সেই নিরঞ্জনের আমি লইয়াছি নাম ; হে দাদূ, হৃদয়ে রাখ এই নাম, আমি বলিহারি যাই ও জয়জয়কার করি সেই নামের।”

১২। সহজ সুমিরণ

কোরঁল করঁলা পৈসি করি জহাঁ ন দেখৈ কোই।*
মন থির সুমীরণ কীজিয়ে তৌ দাদূ দরসন হোই॥

নখ সিখ সব সুমিরণ করৈ ঐসা করিয়ে জাপ।
অংতরি বিগসৈ আতমা তৌ দাদূ প্রগটৈ আপ॥
মন চিত অস্থির কীজিয়ে নখসিখ সুমিরণ হোই।
স্রবণ নেত্র মুখ নাসিকা পাঁচৌঁ পূরে সোই॥
সহজৈঁ সুমিরণ হোত হৈ রোম রোম রট রাম।
চিত্ত চহূঁট্যা চিত্ত সেঁৗ য়েঁৗ লীজে হরিনাম॥
সবদ অনাহদ হম সুন্যা নখসিখ সকল সরীর।
সব ঘটি হরি হরি হোত হৈ সহজৈঁ হী মন থির॥
নৈন বিন দেখিবা অংগ বিন পেখিবা
রসন বিন বোলিবা ব্রহ্ম সেতী।
স্রবন বিন সুনিবা চরণ বিন চালিবা
চিত্ত বিন চিত্যবা সহজ এতী॥

"যেখানে কেহই দেখিতে পায় না সেই কোমল (হৃৎপদ্মে বা বিশ্বকমলে) কমলে প্রবেশ করিয়া মন-স্থির কর "সুমিরণ", তবেই হে দাদু, হইবে তোমার দরশন।

এমন জাপ কর জপ যেন (পায়ের) নখ হইতে (মাথার) শিখা পর্য্যন্ত সব করে সুমিরণ (নাম জপ); তবে তো অন্তরে আত্মা হয় বিকশিত, হে দাদূ, তবেই তো তিনি আপনিই হয় প্রকাশিত।

মন চিত্ত কর স্থির, তবেই নখ হইতে শিখা পর্য্যন্ত সহজেই চলিবে সেই "সুমিরণ" (জাপ); শ্রবণ নেত্র মুখ নাসিকা ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে পরিপূর্ণ করিয়া তিনিই বিরাজমান।

এমন করিয়া লও হরিনাম যে সহজেই হয় "সুমিরণ", প্রতি রোমে রোমে যেন ধ্বনিত হয় তাঁর নাম, (আমার) চিত্ত যেন (তাঁর) চিত্তের সঙ্গে আঁটিয়া যায় মিলিয়া।

নখ হইতে শিখা পর্য্যন্ত সকল শরীরে আমি শুনিয়াছি সেই অনাহত শব্দ (বিশ্ব আকাশে ও অন্তরাকাশে বিনা আঘাতে বিনা প্রযত্নে সদা উচ্চারিত

---

* এই বাণীগুলি লিখিত গ্রন্থে অনেক স্থলে "পরচা" অঙ্গে আছে।

সহজধ্বনি) সর্ব্ব ঘটে নিরন্তর হইতেছে ধ্বনিত, সহজেই মন হইয়াছে শান্ত স্থির।

বিনা নয়নে হইবে দেখিতে, বিনা-অঙ্গ হইবে পেখিতে, বিনা রসনায় বলিতে হইবে সেই ব্রহ্মনাম ; বিনা শ্রবণে হইবে শুনিতে, বিনা চরণে হইবে চলিতে, বিনা চিত্তে (শরীরস্থ চিত্তেন্দ্রিয়) হইতে হইবে সচেতন, ইহাই তো হইল সহজ।”

১৩। তনু-মালা।

সব তন তসবী কহৈ করীম ঐসা করি লে জাপ।
রোজা এক দূরি করি দূজা কলিমা আপৈ আপ॥
অঠে পহর ইবাদতী জীৱন মরণ নিবাহি।
সাহিব দরি সেৱৈ খড়া দাদূ ছাড়ি ন জাহি॥

“এমন সহজ করিয়া লও তোমার জপ, যেন সব তনু জপমালা হইয়া সদা উচ্চারণ করিতে থাকে “করীম” (দয়াময়) ; সকল দ্বৈতকে দূর করিয়া যেন নিত্যই চলে এক রোজা, পরমাত্মা স্বয়ম্-ই যেন হ’ন নিত্য জপমন্ত্র।

জীবন মরণকে পূর্ণ করিয়া অষ্টপ্রহর চলুক সেখানে প্রণতি। প্রভুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া নিত্যই কর সেবা, হে দাদূ, কোথাও যাইও না আর তাঁহাকে ছাড়িয়া।”

১৪। আত্মার সুমিরণ

তন সৌঁ সুমিরণ কীজিয়ে জব লগ তন নীকা।
আতম সুমিরণ উপজৈ তব লাগৈ ফীকা॥
তন সৌঁ সুমিরণ সব করৈঁ আতম সুমিরণ এক।
আতম আগৈঁ এক রস দাদূ বড়া বমেক॥
জব নাহীঁ সুরতি সরীর কী বিসরৈ সব সংসার।
আতম ন জানৈ আপকৌঁ তব এক রহ্যা নিরধার॥
দাদূ জল পাষাণ জ্যূঁ সেৱৈ সব সংসার।
দাদূ পাণী লূণ জ্যূঁ বিরলা পূজনহার॥
সুরতি রূপ সরীরকা পীৱকে পরসৈঁ হোই।
আপ বিসরজি রাম রহ্যা দাদূ সুমিরণ সোই॥

"যতদিন এই স্থন্দর কুশল তনুতে আছে আনন্দ ততদিন তনু দিয়াই কর "স্থমিরণ" (নাম জপ), যখন আত্মার "স্থমিরণ" উপজিবে তখন (এই তনু দিয়া জপও) লাগিবে নীরস।

তনু দিয়াই করে সবাই স্থমিরণ, আত্মা দিয়া স্থমিরণ করে ক্বচিৎ কেহ। আত্মারও আগে (সম্মুখে, পরে) এক রস, হে দাদূ, সে বড় গভীর জ্ঞানের কথা।

যখন আর নাই আশক্তি (রূপ অর্থও হয়) শরীরের, চিত্ত যখন সব সংসার যায় ভুলিয়া, যখন আপনিই আর আপনাকে জানে না, তখন বুঝিবে নিরাধার (নিরবলম্ব) সেই এক ব্রহ্ম হইয়াছে জীবনে প্রতিষ্ঠিত।

জলের মধ্যে পাষাণ ডুবিয়া থাকিলেও যেমন থাকে স্বতন্ত্র, তেমন ভাবেই সকল সংসার করে তাঁর সেবা। জলের মধ্যে যেমন বিগলিত হইয়া থাকে লবণ, তেমন করিয়া পূজা করিবার সাধক ক্বচিতই কেহ আছে।

প্রিয়তম পরশ করিলে এই শরীরেরই হইয়া যায় প্রেমরূপ, (সাধক) আপনাকে করিল বিসর্জ্জন আর রামই রহিলেন বাকি, হে দাদূ, সে-ই তো হইল স্থমিরণ।" *

১৮। রূপমালা ও কর্ম্ম-জাপ

মালা সব আকারকী কোই সাধু সুমিরৈ রাম।
করণীগর তৈঁ ক্যা কিয়া ঐসা তেরা নাম॥
সব ঘট মুখ রসনা করৈ রটৈ রামকা নাম।
দাদূ পীবৈ রামরস অগম অগোচর ঠাম॥
আতম আসন রাম কা তহাঁ বসৈ ভগবান।
দাদূ দূনূঁ্য পরসপর হরি আতম কা থান॥

"অনন্ত-বৈচিত্র্যে সর্ব্ব আকারের চলিয়াছে মালা; ক্বচিতই কোন সাধু তার সাথে সাথে ভগবানের নাম করিতেছে স্থমিরণ। হে অপূর্ব্ব শিল্পী, কি বিশ্বমালা করিলে তুমি রচনা, এই মালারই সমতুল্য অপূর্ব্ব তোমার নাম!

---

* "আপ বিসরজি রাম রহ্যা" স্থলে, "দাদূ তন মন একরস" পাঠ হইলে অর্থ হইবে, "তনু মন যদি তাঁর সঙ্গে হয় একরস, তবে সে-ই তো স্থমিরণ।"

সর্ব্ব আকার ও রূপকে (ঘটকে) কর মুখ ও রসনা, ভগবানের নাম কর (সর্ব্ব ঘটে) জপ, হে দাদূ, অগম অগোচর ধামে উচ্ছ্বসিত যে রামরস, নিরন্তর তাহা কর পান।

আত্মাই রামের আসন, সেখানে বাস করেন ভগবান, হে দাদূ, হরির ও আত্মার এই দুইয়ের স্থান পরস্পরে হইয়া যায় অদল বদল।" (অর্থাৎ কখনও এই আত্মাতে বিহার করেন পরমাত্মা শ্রীহরি, আবার কখনও পরমাত্মা শ্রীহরিতে বিহার করে এই জীবাত্মা)।

চতুর্থ প্রকরণ—সাধনা

ত্রয়োদশ অঙ্গ—"লয়" "লৈ" বা "ল্যৌ"

(ষষ্ঠ—সহায়ক অঙ্গ)

"লয়" "লৈ" বা "ল্যৌ" কথাটির বাংলা অনুবাদ করা করা বড় কঠিন। "লয়" সেই অবস্থাকে বুঝায় যখন ব্রহ্মের মধ্যে সাধক আপনাকে ফেলে হারাইয়া। আবার "ল্যৌ" বা লর" বলিতে বুঝায় ভক্তি, একাগ্রতা, ব্যাকুলতা, অনন্যচিত্ততা, প্রবল ইচ্ছা, অগ্নিশিখা ইত্যাদি। "লয়" ও "ল্যৌ" বা "লর" ক্রমাগতই দাদূর বাণীর মধ্যে গিয়াছে ওলট পালট হইয়া। প্রাচীন ভক্তদের ও লেখকদের কহার ও লেখার দোষেই এইরূপ হইয়াছে, না দাদূর নিজেরও এই বিষয়ে একটু গোলমাল ছিল তাহা বলা কঠিন। মোট কথা "লয়" শব্দ থাকিলেও কোথাও অর্থ হয় ব্যাকুলতা, কোথাও প্রেমধ্যান, কোথাও একাগ্র অগ্নিশিখার মত দাহ আর কোথাও বা যোগের সমাহিত অবস্থা।

এই অঙ্গে একটি প্রশ্নোত্তর আছে যাহা তখনকার দিনের যোগপন্থী, শূন্যবাদী প্রভৃতিদের মধ্যে সর্ব্বত্রই দেখা যাইত। বাংলাদেশেও এমন

প্রশ্নোত্তর পুরাতন পুঁথিতে অনেক পাই। এইরূপ কয়েকটি প্রশ্নোত্তর গ্রন্থের শেষভাগে থাকিবে।

সঙ্গীতে সকল বিচ্ছিন্ন স্বর ঐক্য ও সার্থকতা প্রাপ্ত হয় লয়ের মধ্যে আপনাদিগকে সমাহিত করিয়া দিয়া। বিশ্বেরও সকল বৈচিত্র্যের ঘটে সার্থকতা যখন ব্রহ্মানন্দের মধ্যে ঘটে তাহাদের লয়।

জগদ্‌গুরু আছেন আমাদের অন্তরেই, তাঁর সঙ্গে আমার যদি ভাবের যোগ হয় তবে তিনিও আমার মধ্য দিয়া পা'ন বিশ্বের স্বাদ, আর আমিও সব কিছু তবে দেখিতে পারি অসীমের দৃষ্টি দিয়া; তাহা হইলে এই বিশ্ব পরিচয়ের জন্য আমাদের দৃষ্টির নূতন দ্বার যায় খুলিয়া। যে সব জিনিষ অভ্যস্ত বলিয়া দেখিতেই পাই না তাহাই আবার অপরূপ নূতন হইয়া, বিধাতার আর একলীলা হইয়া, আমাদের কাছে দেয় দেখা। এই একই বিশ্বকে নূতন নূতন দৃষ্টির দ্বারা দেখিতে জানিলে এই একই বিশ্বের মধ্যে পাই অনন্ত বিশ্ব-রস। অনন্ত বিশ্বের উপলব্ধির জন্য নূতন নূতন লোকে যাইবার প্রয়োজন নাই। দৃষ্টির অনন্তবৈচিত্র্যে এখানেই ঘটে উপলব্ধির অনন্তত্ব।

বিশ্বের মধ্যে ভাবের যোগই সব চেয়ে বড় কথা। স্বামীর সঙ্গ লাভ করিয়া সহজ ভাবরসে আপনাকে হয় পূর্ণ করিতে। পুণ্যলোভাতুরেরা প্রেমরাজ্যের এই সব মর্ম্ম জানে না। পুণ্যের লোভে তারা ধর্ম্মের ক্ষেত্রেও করে বৈষয়িকতা। তাদের দলে মিশিয়া এই প্রেমযোগের যেন অযোগ্য না হইয়া যাই।

১। লয় হইল এমন একটি যোগ যাহার আর নাই অবসান। অচেতন আত্মা যদি হয় সচেতন তবেই সে খুঁজিবে পরমাত্মার সঙ্গ, তাঁর প্রেমরসের জন্য হইবে পিপাসিত। তার আগে তাকে উপদেশ দিয়া পিপাসিত করার চেষ্টা বৃথা।

পরমাত্মাকে পাওয়াই চরম সার্থকতা। আর সব অনুষ্ঠান যদি তাঁহা হইতে আমাকে দূরে যায় লইয়া, তবে সেই সব অনুষ্ঠানই হয় মহা অনর্থ। প্রেমই সাধনার সহজ পথ। ইহাতে সব বদ্ধ দ্বার যায় খুলিয়া। হাজার চেষ্টায় যে দ্বার খুলিত না, প্রেমে অনায়াসে সে দ্বারও যায় খুলিয়া।

তীর্থে যাওয়া সহজ, কারণ পায়ে হাঁটিয়া সেখানে যায় পৌছান; অন্তরের প্রেম-মিলন-মন্দিরে যাওয়া তো পায়ে হাঁটিয়া চলিবে না, আর ভাব-দূরত্ব অতিক্রম করা অতিশয় কঠিন, পথে বাধার আর অন্ত নাই।

২। প্রেম ভাবের প্রথম সোপানই হইল আত্ম-চেতনা জাগ্রত হওয়া। পরব্রহ্মের এই ব্যবস্থা যে প্রেমের পিপাসা জন্মিলে তবেই পথ হইয়া আসে সহজ। একাকী যাইবার ভয় যদি মনে উদিত হয় তবে মনে রাখিতে হইবে তিনি সকল সাধকেরই সাধনা-পথের সহযাত্রী। সাবধান! মনকে যেন পথের সাথী না করি, কারণ সে অল্প দূর পর্য্যন্তই পারে যাইতে। সেখানেই তার ঘর। তার বেশী যাইবার ভাণ যদিও সে করিবে, কিন্তু তাহার সামর্থ্য নাই যে বেশী দূর সে যায়।

৩। অন্তরে আছেন জগদ্গুরু, ভাব যোগে লও তাঁর সঙ্গ। তাঁর দৃষ্টিতে তুমি দেখ, তোমার দৃষ্টিতে তিনি দেখুন; উভয়েরই নব নব লীলা হইবে প্রত্যক্ষ।

যে প্রেম মুকুল কখন ফোটে নাই তাকে তাড়ার চোটে কৃত্রিম তাপ দিলে সে ফুটিবে না। তাকে ফিরাইয়া লইয়া আইস সদ্গুরুর প্রেমে, সেখানে সে সহজেই হইবে বিকলিত।

তাঁর সঙ্গ লাভ করিলে নৃত্য, গীত, বাণী সকলেরই সহজ উৎস যায় খুলিয়া।

পুণ্যলোভী হইয়া তাঁর সঙ্গে প্রেমযোগের সুযোগ হারাইও না, এমন দুর্ল্লভ জন্ম যাইবে অকৃতার্থ হইয়া।

৪। প্রেম যখন মেলে তখন সাধনা অতি সহজ। যার প্রেম হইয়াছে তার কি আর মালা ফিরাইয়া, ইন্দ্রিয়গণের প্রতিকূলতা দূর করিয়া, তাহাদিগকে অনুকূল করিয়া, "জপ" ও "স্মরণ" করিতে হয়। "স্মরণ" তখন এতই সহজ হয় যে তখন ভোলাই হয় কঠিন। যোগও তার পক্ষে হয় সহজ, সে ধ্যানেই থাকে ডুবিয়া। সর্ব্বত্র সে ঐ ভাবেই পারে ডুবিয়া থাকিতে।

প্রেমেই সেবা সহজ। স্বামীর সঙ্গে যে যোগ তাহাতেও দেখি প্রেমকে সেবাতে পরিণত করিতে পারিলেই সেই যোগ হইয়া যায় সহজ। প্রেম না থাকিলে শুষ্ক নীরস সেবা লইয়া তাঁর ভাবের মধ্যে কি পৌছান যায়? দাস্যের স্থান আর প্রেমের স্থান কি এক?

৫। জল যেমন জলধিতে মিলিয়া পরমাশান্তি লাভ করে, তেমনি তাঁর মধ্যে তুমি ডুবিয়া গেলে তোমার কিছুই ক্ষয় ক্ষতি বা নাশ হইবে না; শুধু তুমি অসীম বিশ্রাম লাভ করিবে।

৬। ভয় নাই, যতটুকু শক্তি তোমার, ততটুকু লইয়াই তাঁহার দিকে চল অগ্রসর হইয়া। প্রেমের দায় উভয়েরই। তোমার সাধ্যমত তুমি হও অগ্রসর, রাত্রির

অন্ধকারে অবসন্ন হইয়া হতাশ হইও না। দেখিবে তিনিই অগ্রসর হইয়া তোমাকে নিতে আসিয়াছেন। তাঁর সেই প্রেম-পরশখানি বুঝিতে পারিবার জন্য থাক সদা সচেতন আর প্রেমের পথে যথাশক্তি চল অগ্রসর হইয়া। আশা হারাইও না, হইবেই হইবে।

প্রেমেই সব দ্বৈতাদ্বৈতের অবসান। তিনিই আছেন, আমি কি তবে নাই? আমিও আছি, তিনিও আছেন, সেই বা কেমনতর? দুইয়ের স্থান হয় কেমন করিয়া? প্রেমে তাঁর মধ্যে যাও ডুবিয়া। মিলনে "দুই" "এক" হইয়া হইবে সার্থক। দুইকে এক করিবার জন্যই প্রেম; তাহাতেই প্রেম, তাহাতেই রস, তাহাতেই পরমানন্দ, পরম স্বাদ। সেই মহা সার্থকতা এই সব তুচ্ছ "বিরোধ-নির্বিরোধ" তত্ত্বের চেয়ে অনেক বেশী সত্য।

১। লয় লাগী তব জানিয়ে জৈ কবহূঁ ছূটি ন জাই।
জীৱত য়োঁ লাগী রহৈ মূৱা মংঝি সমাই॥
সব তজি গুন আকার কা নিহচল মন লৱ লাই।
আতম চেতন প্রেম রস দাদূ রহৈ সমাই॥
অরথ অনূপম আপ হৈ ঔর অনরথ হৈ ভাই।
দাদূ সব আরংভ তজি জিনি কাহূ সংগি জাই॥
জোগ সমাধি সুখ সুরতি সোঁ সহজৈঁ সহজৈঁ আৱ।
মুকতা দ্বারা মহলকা ইহৈ ভগতি কা ভাৱ॥
বিন পায়ন কা পংথ হৈ ক্যোঁ করি পহুঁচৈ প্রাণ।
বিকট ঘাট অৱঘট খরে মাহিঁ সিখর অসমান॥

"তখনই জানিবে লাগিয়াছে "লয়" (ধ্যানে ডুবিয়া যাওয়া), যখন সেই অবস্থা আর যাইবে না ছুটিয়া। যতদিন জীবন ততদিন এমনিই রহিবে যোগযুক্ত হইয়া, আর মরিলে তাঁরই মাঝে যাইবে ডুবিয়া।

সব গুণ ও আকারকে ত্যাগ করিয়া নিশ্চল মনকে লইয়া যাও "লয়ে"। আত্ম চেতনার প্রেম রসে দাদূ থাক ডুবিয়া।

পরমাত্মা স্বয়ম্ই অনুপম অর্থ অর্থাৎ সার্থকতা, হে ভাই, আর সবই অনর্থ। হে দাদূ, সকল আচার অনুষ্ঠান কর ত্যাগ, আর কাহারও করিও না ব্যর্থ অনুসরণ।

যোগে সমাধিতে আনন্দে প্রেমে সহজে সহজে আইস চলিয়া, ইহাই হইল মন্দিরের দ্বার মুক্ত হওয়া; ভক্তিরও ইহাই ভাব, অর্থাৎ ভক্তির দ্বারাও দ্বার এমন ভাবেই হইয়া যায় মুক্ত।

বিনা চরণের এই পথ, কেমন করিয়া পৌছিবে তবে প্রাণ! পথের মাঝে যে সত্যই আছে বিকট সঙ্কীর্ণ দুর্গম গিরিপথ; গগন (-চুম্বী) শিখর।”

২। চেতনাই ভাবের পথ।

কিহিঁ মারগ হ্বৈ আইয়া কিহিঁ মারগ হ্বৈ জাই।
দাদূ কোঈ না লখৈ কেতে করৈঁ উপায়॥
সূনহিঁ মারগ আইয়া সূনহিঁ মারগ জাই।
চেতন পৈঁড়া সুরতিকা দাদূ রহু লর লাই॥
পারব্রহ্ম পৈঁড়া দিয়া সহজ সুরতি লৈ সার।
মনকা মারগ মাহিঁ ঘর সংগী সিরজনহার॥

“কোন পথ হইয়া (দিয়া) বা আসিলে কোন পথে বা যাইবে? হে দাদূ, যত যত উপায়ই করুক না কেন, কেহই তাহা পায় না দেখিতে।

শূন্যমার্গেই আসিলাম শূন্যমার্গেই যাইব, চেতনাই হইল প্রেম ধ্যানের পথ, হে দাদূ, প্রেম-ধ্যানে থাক ডুবিয়া।

পরব্রহ্ম দিয়াছেন পথ, সহজ প্রেমভাবই হইল সার, মনের ঘর হইল পথের মাঝে, সঙ্গী হইলেন সৃজনকর্ত্তা ভগবান।”

৩। পরমাত্মার মধ্যে আত্ম-ভাব ডুবাইয়া দেখ লীলা।

সুরতি সমাই সনমুখ রহৈ জুগি জুগি জন পূরা।
দাদূ প্যাসা প্রেমকা রস পীবৈ সূরা॥
জহাঁ জগতগুর রহত হৈ তহাঁ জে সুরতি সমাই।
তৌ ইন নৈনহুঁ উলটি করি কৌতিগ দেখৈ আই॥
সুরতি অপূঠী ফেরী করি আতম মাহৈঁ আন।
লাগি রহৈ গুরদেৱ সৌঁ দাদূ সোই সয়ান॥

জহঁ রাম তহঁ সুরতি হৈ সকল রহ্যা ভরপূর।
অংতরগতি লৱ লাই রহু দাদূ সেৱগ সূর॥
দাদূ গাৱৈ সুরতি সৌঁ বাণী বাজৈ তাল।
য়হু মন নাচৈ প্রেম সৌঁ আগৈঁ দীন দয়াল॥
সব বাতনি কী এক হৈ পুণ্য থৈঁ দিল দূরি।
সাঈঁ সেতী সংগ করি সহজ সুরতি লৈ পূরি॥

"(প্রেমের) ভাবরসে ডুবিয়া যে রহে (তাঁর) সম্মুখে, যুগে যুগে সে জন রহে ভরপূর; দাদূ সেই রসের পিয়াসী, যে বীর সে-ই সেই রস করিতে পারে পান।

যেখানে জগদ্‌গুরু বিরাজমান সেখানে যদি ভাব-রসকে ভরপূর করিয়া পার রাখিতে (ডুবাইতে পার আপনাকে সেই রসে), তবে এই নয়ন (দৃষ্টি) উল্টাইয়া অপরূপ খেলা দেখিবে আসিয়া।

অবিকল্পিত প্রেম-ভাবকে পিছে ফিরাইয়া আন আত্মার মাঝে, গুরুদেবের (পরমাত্মার) সঙ্গে যে থাকে সেথায় যুক্ত হইয়া, হে দাদূ, সে-ই তো সুজ্ঞান। *

যেখানে ভগবান সেখানেই প্রেমভাব, সেথায় সকলই হইয়া রহে ভরপূর; অন্তরের ভাবকে ধ্যানে থাক পূর্ণ করিয়া, হে দাদূ, তবেই তো সেবক বীর!

দাদূ ভাবরসে পূর্ণ হইয়া গাহিতেছে গান, তালে তালে বাজিতেছে বাণী, প্রেমভরে নাচিতেছে এই মন, সম্মুখে বিরাজমান দীনদয়াল।

সকল বাণীর বাণী সকল কথার এক সার কথা এই, যে, পুণ্যলাভ হইতে হৃদয়কে রাখ দূরে; স্বামীর সঙ্গে যোগানন্দ লাভ করিয়া সহজ ভাব-রসে ধ্যান-লয়ে আপনাকে করিয়া লও পূর্ণ।"

৪। ভাবই সুমিরণ, ভাবই সাধনা।

সুরতি সদা সনমুখ রহৈ জহাঁ তহাঁ লৱ লীন।
সহজ রূপ সুমিরণ করৈ নিকরম দাদূ দীন॥
দাদূ সেবা সুরতি সৌঁ প্রেম প্রীতি সৌঁ লাই।
জহঁ অবিনাসী দেৱ হৈ সুরতি বিনা কো জাই॥

---

* জয়পুরী ভাষাতে "অপূঠী" অর্থে, পিছে, উল্টা দিকে।

"যেখানে সেখানে ভাবরসে মগ্ন থাকিয়া (তাঁর) সম্মুখে প্রেম-ভাবই সদা রহে হাজির, হে দাদূ, সে দীন নিষ্কর্ম হইয়া, সহজ রূপ করে "সুমিরণ" (স্মরণ)।

হে দাদূ, ভাবরসের সহিত, প্রেমের সহিত, প্রীতির সহিত, তোর সেবা (তাঁর কাছে) কর্ উপস্থিত, যেখানে অবিনাশী দেবতা বিরাজমান, সেখানে ভাব-রস বিনা কে পারে যাইতে?"

৫। তাঁহার মধ্যে আপনাকে ডুবাও।

দাদূ ঐসেঁ মিলি রহৈ জ্যোঁ জল জলধি সমাই।
জো কুছ থা সোঈ ভয়া কছু ন ব্যাপৈ আই॥
ছাড়ৈ সুরতি সরীর কোঁ তেজ পুংজ মৈঁ আই।
দাদূ ঐসেঁ মিলি রহৈ জ্যোঁ জল জলহি সমাই॥
তা সৌঁ মন লাগা রহৈ অংতি মিলৈগা সোই।
দাদূ জাকৈ মনি বসৈ তাকৌঁ দরসন হোই॥

"হে দাদূ, এমনভাবে থাক মিলিয়া, যেমন জল সমাহিত হইয়া জলধিতে যায় মিশিয়া; যাহাই কিছু ছিল সবই হইয়া গেল সেই জলধি, আর কিছুই আসিয়া প্রসার ও প্রভাব করিতে পারিল না বিস্তার ("ব্যাপৈ" অর্থে হইল ব্যাপ্ত হইয়া প্রবল হইয়া থাকা)।

তেজঃপুঞ্জের মধ্যে আসিয়া সকল স্মৃতি এই স্থূল শরীরকে (শারীরভাব) করে পরিহার। দাদূ, এমন করিয়া হইবে মিলিয়া থাকিতে যেমন করিয়া জলের মধ্যে গিয়া জল যায় মিশিয়া।

তাঁর সঙ্গে যদি মন নিরন্তর থাকে লাগিয়া, তবে অন্তে পাইবে তাঁহাকেই। হে দাদূ, যার মনে যাহা করে নিরন্তর বাস, তাহারই তো মেলে দরশন।"

৬। ধৈর্য্য ধরিয়া চল, হইবেই হইবে।

দাদূ নিবহৈ ত্যূঁ চলৈ ধরি ধীরজ মন মাহিঁ।
পরসৈগা পিয় একদিন দাদূ থাকৈ নাহিঁ॥

জহঁ রাম তহঁ সুরতি হৈ সকল রহ্যা ভরপূর।
অংতরগতি লৱ লাই রহু দাদূ সেৱগ সূর॥
দাদূ গাৱৈ সুরতি সৌঁ বাণী বাজৈ তাল।
য়হু মন নাচৈ প্রেম সৌঁ আগৈঁ দীন দয়াল॥
সব বাতনি কী এক হৈ পুণ্য থৈঁ দিল দূরি।
সাঈঁ সেতী সংগ করি সহজ সুরতি লৈ পূরি॥

"(প্রেমের) ভাবরসে ডুবিয়া যে রহে (তাঁর) সম্মুখে, যুগে যুগে সে জন রহে ভরপূর; দাদূ সেই রসের পিয়াসী, যে বীর সে-ই সেই রস করিতে পারে পান।

যেখানে জগদ্‌গুরু বিরাজমান সেখানে যদি ভাব-রসকে ভরপূর করিয়া পার রাখিতে (ডুবাইতে পার আপনাকে সেই রসে), তবে এই নয়ন (দৃষ্টি) উল্টাইয়া অপরূপ খেলা দেখিবে আসিয়া।

অবিকল্পিত প্রেম-ভাবকে পিছে ফিরাইয়া আন আত্মার মাঝে, গুরুদেবের (পরমাত্মার) সঙ্গে যে থাকে সেথায় যুক্ত হইয়া, হে দাদূ, সে-ই তো সুজ্ঞান। *

যেখানে ভগবান সেখানেই প্রেমভাব, সেথায় সকলই হইয়া রহে ভরপূর; অন্তরের ভাবকে ধ্যানে থাক পূর্ণ করিয়া, হে দাদূ, তবেই তো সেবক বীর!

দাদূ ভাবরসে পূর্ণ হইয়া গাহিতেছে গান, তালে তালে বাজিতেছে বাণী, প্রেমভরে নাচিতেছে এই মন, সম্মুখে বিরাজমান দীনদয়াল।

সকল বাণীর বাণী সকল কথার এক সার কথা এই, যে, পুণ্যলাভ হইতে হৃদয়কে রাখ দূরে; স্বামীর সঙ্গে যোগানন্দ লাভ করিয়া সহজ ভাব-রসে ধ্যান-লয়ে আপনাকে করিয়া লও পূর্ণ।"

৪। ভাবই সুমিরণ, ভাবই সাধনা।

সুরতি সদা সনমুখ রহৈ জহাঁ তহাঁ লৱ লীন।
সহজ রূপ সুমিরণ করৈ নিকরম দাদূ দীন॥
দাদূ সেবা সুরতি সৌঁ প্রেম প্রীতি সৌঁ লাই।
জহঁ অবিনাসী দেৱ হৈ সুরতি বিনা কো জাই॥

---

* জয়পুরী ভাষাতে "অপূঠী" অর্থে, পিছে, উল্টা দিকে।

"যেখানে সেখানে ভাবরসে মগ্ন থাকিয়া (তাঁর) সম্মুখে প্রেম-ভাবই সদা রহে হাজির, হে দাদূ, সে দীন নিষ্কর্ম হইয়া, সহজ রূপ করে "সুমিরণ" (স্মরণ)।

হে দাদূ, ভাবরসের সহিত, প্রেমের সহিত, প্রীতির সহিত, তোর সেবা (তাঁর কাছে) কর্ উপস্থিত, যেখানে অবিনাশী দেবতা বিরাজমান, সেখানে ভাব-রস বিনা কে পারে যাইতে ?"

৫। তাঁহার মধ্যে আপনাকে ডুবাও।

দাদূ ঐসেঁ মিলি রহৈ জ্যোঁ জল জলধি সমাই।
জো কুছ থা সোঈ ভয়া কছু ন ব্যাপৈ আই॥
ছাড়ৈ সুরতি সরীর কৌঁ তেজ পুংজ মৈঁ আই।
দাদূ ঐসেঁ মিলি রহৈ জ্যোঁ জল জলহি সমাই॥
তা সৌঁ মন লাগা রহৈ অংতি মিলৈগা সোই।
দাদূ জাকৈ মনি বসৈ তাকৌঁ দরসন হোই॥

"হে দাদূ, এমনভাবে থাক মিলিয়া, যেমন জল সমাহিত হইয়া জলধিতে যায় মিশিয়া ; যাহাই কিছু ছিল সবই হইয়া গেল সেই জলধি, আর কিছুই আসিয়া প্রসার ও প্রভাব করিতে পারিল না বিস্তার ("ব্যাপৈ" অর্থে হইল ব্যাপ্ত হইয়া প্রবল হইয়া থাকা)।

তেজঃপুঞ্জের মধ্যে আসিয়া সকল স্মৃতি এই স্থূল শরীরকে (শারীরভাব) করে পরিহার। দাদূ, এমন করিয়া হইবে মিলিয়া থাকিতে যেমন করিয়া জলের মধ্যে গিয়া জল যায় মিশিয়া।

তাঁর সঙ্গে যদি মন নিরন্তর থাকে লাগিয়া, তবে অন্তে পাইবে তাঁহাকেই। হে দাদূ, যার মনে যাহা করে নিরন্তর বাস, তাহারই তো মেলে দরশন।"

৬। ধৈর্য্য ধরিয়া চল, হইবেই হইবে।

দাদূ নিবহৈ ত্যূঁ চলৈ ধরি ধীরজ মন মাহিঁ।
পরসৈগা পিয় একদিন দাদূ থাকৈ নাহিঁ॥

আদি অংতি মধি এক রস টূটৈ নহিঁ ধাগা।
দাদূ একৈ রহি গয়া তব জানী জাগা॥
জব লগ সেৱক তন ধরৈ তব লগ দূসর আহি।
একমেক হ্বৈ মিলি রহৈ তৌ রস পীৱত জাহি॥
যে দোনৌঁ ঐসী কহৈঁ কীজৈ কৌন উপাই।
না মৈঁ এক ন দূসরা দাদূ রহু লৱ লাই॥

"হে দাদূ, মনের মধ্যে ধৈর্য্য ধরিয়া যেমন করিয়া পারিস, থাক্ চলিতে; প্রিয়তম একদিন না একদিন (আসিয়া) করিবেনই পরশ, ওরে দাদূ, ইতিমধ্যে অবসন্ন হইয়া যেন না পড়িস্।"

আদি অন্ত মধ্য যেন থাকে এক রস, সূত্র কোথাও যেন না হয় ছিন্ন; হে দাদূ যখন "একই" রহিবে বাকী (দ্বৈত ঘুচিয়া), তখনই (বুঝিব) চৈতন্য-ময় জাগিয়াছেন (অন্তরে)।

যতক্ষণ সেবক (ভিন্ন-) শরীর আছে ধরিয়া, ততক্ষণই সে স্বতন্ত্র (বিচ্ছিন্ন); যখন উভয়ে এক হইয়া রহে মিলিয়া, তখনই নিরন্তর রস পান থাকে চলিতে।

এমনই সবাই বলে, "ইহারা দুইজন"; এখন বলতো ইহার কি উপায় যায় করা? আমি একও নহি, ভিন্ন (দ্বিতীয়) ও নহি; হে দাদূ, প্রেম যোগে থাক সমাহিত হইয়া।"

চতুর্থ প্রকরণ—সাধনা

চতুর্দ্দশ অঙ্গ—"সজীবন"

(সপ্তম সহায়ক অঙ্গ)

সজীবন অর্থ যাহা স্বয়ম্ জীবন্ত এবং যাহা অন্যকেও জীবন দেয়, মৃত্যুকে যাহা পরাহত করে। এই অর্থেই ভক্তগণ সজীবন শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

ভগবান এবং তাঁর প্রতি সাধকের যে প্রেম তাহাই সজীবন। তাঁর পরশ ভক্তকে নিত্য নূতন জীবনে জীবন্ত করিয়া তোলে। বসন্তের স্পর্শে দেখি প্রকৃতি নবজীবন পায়; তাঁর পরশের সঙ্গে কি বসন্ত-পরশের তুলনা?

মানুষের বহির্মুখ মন ও ইন্দ্রিয়, ভোগ-লালসার চারিদিকে ছুটিয়াছে মরিতে; যাহাকে ভগবান দয়া করেন তাহাকেই দেন প্রেমের ব্যথা। সে প্রেমের এই ইঙ্গিত পাইয়া অন্তরের দিকে ফিরিয়া আসে ও তাঁর পরশ পাইয়া নিত্য জীবন লাভ করে। কামনার ভোগে যে মৃত্যু তাহা হইতে তাঁর প্রেম ছাড়া রক্ষা কেহই আর করিতে পারে না। ভগবানের পরশ পাইলে আর ভয় নাই, তখন দুঃখ মরণ সবই দেয় নূতন ও গভীরতর জীবন। জীবন থাকিতেই তাঁর প্রেম পরশ লাভ করিয়া যাইতে হইবে; নহিলে জগতে আসিয়া বৃথাই গেলাম চলিয়া। (তুলনীয়, "প্রৈতি স কৃপণঃ," বৃহদা, উ,-৩,৮,১০)।"

তিন-কালই এক সূত্রে গ্রথিত। ভবিষ্যতের আশা করিয়া যে জন বর্ত্তমানকে হারায় সে মূর্খ। বর্ত্তমানকে যে জন সাধনা দিয়া আপন করিয়া লইয়াছে, সে নিত্য থাকে বর্ত্তমান। অতীত তো আর আসিবে না, ভবিষ্যতের কথাই বা কে জানে! বর্ত্তমানেই ভরপূর তাঁর সঙ্গ চাই।

তাঁর প্রেম পাইলে শাখা-মূল আদি-অন্ত সবই থাকে। কিন্তু সেই লোভেই কি সাধক তাঁকে চায়? কিছু হিসাব না করিয়া সব হিসাব উড়াইয়া দিয়াই ভক্ত তাঁর মধ্যে আপনাকে ফেলে হারাইয়া। তার পর তিনি জানেন তাঁর ভক্তকে তিনি পূর্ণ করিবেন কিনা। বসন্তের আগমনে প্রকৃতি তার সব পত্র পল্লব নিঃশেষে করে উৎসর্গ। প্রকৃতিকে আবার সর্ব্ব আভরণে সাজান হইবে কি না তাহা বসন্তই জানে; সে হিসাব প্রকৃতির নয়, সে দায় বসন্তের।

ভগবান নিত্য সেবক। নিত্য সেবার দীক্ষাতেই ধরিত্রী রবি শশীকে তিনি লইয়াছেন আপন সহচর করিয়া। তাহাদের সেবা তাহাদের প্রেম সব তিনি আপন রঙ্গ দিয়া করিয়া লইয়াছেন পূর্ণ। সাধক তাঁর কাছে তেমনতর দীক্ষাই চায়।

১। ভগবানের সঙ্গে যোগই সকল সাধুর আকাঙ্ক্ষিত। তাঁর সেবা যে করিল, তাঁহাকে যে প্রেম করিল, তাহাকে ভগবান নেন নিজেরই মত করিয়া। তাঁর সাহচর্য্য এমনই নিবিড়! তাই তো ভক্তের মন তাঁকে ছাড়া আর কিছুই জানে না। এমন যোগ সাধন করিতেই জগতে আসা, তাহাই যদি না হইল তবে বৃথাই আসা যাওয়া। তাঁকে যে পাইয়াছে সে অমৃতত্ব লাভ করিল; সে জগৎ হইতে চলিয়া গেল এমন কথা বলা যায় না। বরং বলিতে হয় সে নিত্য জীবন লাভ করিয়া রহিল বিশ্বের নিত্য সম্পদ হইয়া। বিধাতার যত ভক্ত ও সেবক, রবি-শশী-ধরিত্রী, পবন-জল, চিরদিন ইহারা বিশ্বের সম্পদ।

জীবন থাকিতেই এই সাধনা পূরা করিতে হইবে, এই প্রতিষ্ঠা যে না পাইয়া এখান হইতে গেল চলিয়া, সে অপ্রতিষ্ঠ হইয়া গেল; বিশ্বের সত্যে ও সাধনায় তার আর ঠাঁই নাই। সে বিলয়ের তলায় গেল তলাইয়া।

এই জীবনে তো সাধনা হইল না; মৃত্যুর পরে তাহা হইবে, এমন যদি মনে কর তবে তবে বিষম ভুল। কালের সঙ্গে কাল যুক্ত, তিন কালই এক ঐক্য-সূত্রে গ্রথিত। বর্ত্তমানকে উপেক্ষা করিলেই যে ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইবে ইহা মূর্খ ছাড়া কেহই ভাবিতে পারে না। অতীতকেই প্রত্যক্ষ দেখিতেছি বর্ত্তমানে, এবং বর্ত্তমানই সফল হইবে ভবিষ্যতে। যিনি ত্রিকালের এই যোগ জানেন তিনিই তো যোগী। বর্ত্তমানের সুখ ভোগের জন্য যে ভবিষ্যৎ ও অনন্ত জীবন হারায় তাহাকে বলিতে হয় যোগভ্রষ্ট। কবীর এই তত্ত্বটি নানা গল্পের মধ্যে নানা ভাবে নানা প্রসঙ্গে চমৎকার বুঝাইয়াছেন।

ভোগের জন্য লুব্ধ মন দৌড়িয়াছে নানা দিকে, এমন সময় ভগবান যাহাকে প্রেমের ব্যথা দিয়া সচেতন করিয়া ঘরে আনেন ফিরাইয়া সে পরম সৌভাগ্য-শালী। সে সচেতন হইয়া আপনার অন্তরে প্রবেশ করিয়া তাঁর সঙ্গ পাইবে ও অনন্ত জীবন লাভ করিবে।

২। যে তাঁর পরশ পাইয়া নিত্যজীবন না পাইয়াছে তার পক্ষে জীবনও কাল-স্বরূপ, মরণও কাল-স্বরূপ। সে জীবনের মধ্যে রহিয়াও দিন দিন থাকে ক্ষয়প্রাপ্ত

হইতে; মরণে সে যায় নিঃশেষ হইয়া। জনম মরণের বিনাশ হইতে রক্ষা পাইতে হইলে ভক্তিতে প্রেমেতে ভগবানের সঙ্গে হও যুক্ত। তখন মরণ হইতে মরণ পলাইবে, দুঃখকেও আর তখন দুঃখ বলিয়া গ্রাহ্য করিবে না। সুখও আর তখন মারিবে না, ভয়ও আর তখন ভীত করিবে না।

জীবনে মরণে যেখানে তাঁহাকে পাই সেখানেই আমি যাইতে প্রস্তুত। তাঁহাকে পাইলে আর কোন্ সাধনা রহিল বাকী? নিত্য জীবন তো তাহা হইলেই হইল করায়ত্ত।

যোগীরা নাদ দিয়া বিন্দু দিয়া (ঁ, ং, এবং তৎসূচক ধ্বনি) জীবনকে চাহেন পূর্ণ করিতে। ওসব দিয়া ভক্তের হৃদয় পূর্ণ হয় না। ভক্ত চাহে ভগবানের প্রেম রস দিয়া নিজেকে অনন্ত কালের জন্য ভরপূর করিয়া রাখিতে।

৩। তিনি "সদা-বর্ত্তমান।" যে সেই "সদা-বর্ত্তমানের" সঙ্গ পাইয়াছে সে নিত্যকাল বর্ত্তমান থাকিবে, কখনও সে মৃত বা "ভূত" হইবে না। তাঁর সঙ্গে যাহার বিচ্ছেদ হইল, কে আর তাহাকে নিত্য জীবন দিয়া অনন্তকাল রাখিবে জীবন্ত?

সংসারে যখন ভক্তের দেহ কাজ করে তখনও তার হৃদয় থাকে ভগবানের কাছে। নারীরা যেমন সখীদের সঙ্গে গল্প করিবার সময়ও ঘটটি ঝরণার জলধারার নীচে ধরিয়া গল্প করে আর তাই ঘটটি ধীরে ধীরে থাকে ভরিয়া উঠিতে, তেমনি হৃদয়-ঘট তাঁর নিত্য করুণা ধারার তলে রাখিয়া চাই সংসারের কাজ করা।

সকল জীবন লইয়া সাধনা না করিলে মৃত্যু জয় করা যায় না, জীবনের যে অংশে সাধনা হইল না সেই দিক দিয়াই মৃত্যুর পথ গেল রহিয়া।

৪। জীবন-মৃত্যু উভয়কে পূর্ণ করিয়াই তিনিই বিরাজমান, কাজেই কোনো ভয় নাই।

সর্ব্বস্ব উড়াইয়া দিয়া প্রেমিক প্রেমের মধ্যে পড়ে ঝাঁপ দিয়া, কিন্তু তাতে কিছুই লোকসান হয় না। লোকসান হয় না বলিয়াই যে সে উড়াইয়া দিতে সাহস করে, তা নয়। প্রেমের মজাই এই যে সর্ব্বস্ব না ফেলিয়া দিলে মনই শান্তি মানে না।

"খেয়াতে", "শুভক্ষণ" কবিতায় রবীন্দ্রনাথ দেখাইয়াছেন যে রাজার পুত্র যখন দুয়ারে আসেন তখন কণ্ঠের হার তাঁর সম্মুখে না ফেলিলে মন মানে না, যদিও

প্রবীণ বুদ্ধি মনে করে এই সব বাড়াবাড়ির মানে কি? প্রেমের এই সব মরমের কথা হিসাবী সংসারী লোকের বুদ্ধির অগম্য।

৫। জীবন থাকিতেই সাধনা লইতে হইবে পূরা করিয়া। তবেই হইল মুক্তি। যে তাহা না করিল সে ভবসাগরে মরিল ডুবিয়া, ইহাই বুঝিতে হইবে। শূন্যতার মধ্যে গণ্ডির মধ্যে, সে গেল বিলয় হইয়া।

৬। মরণের পর মুক্তি হইবে মনে করিতে করিতে মানুষ মরণের মধ্যেই আসিয়া পড়িয়াছে। এমন জীবনই তো মরণ যাহাতে প্রেমের মুক্তির ও যোগের সাধনার সম্ভাবনাই নাই। মরিবার পর অমৃতত্ব লাভ হইবে একথা মনে করাও পাগলামী। যত সব ধর্ম্ম-ব্যবসায়ীরা মরিবার পর বৈকুণ্ঠ স্বর্গ ও মুক্তির লোভ দেখাইয়া মানুষকে দিয়াছেন পাগল করিয়া। এই সব উপদেশকেরা জীবন থাকিতে কিছুই পারেন না করিতে। তাই সর্ব্বপ্রকারে তাঁহারা চাহেন মারিতে। আর মারিবার নৈপুণ্যও তাহাদের চমৎকার! এইখানেই তাঁদের কৃতিত্ব! এমন করিয়াই ইহারা ধর্ম্মের ব্যবসাটা ঠিক মত চালাইতেছেন!

৭। ভক্ত চায় নিত্য সেবার দীক্ষা। বিধাতা যেই দীক্ষায় দীক্ষিত করিয়া, ধরিত্রী অম্বর রবিশশীকে তাঁর নিত্য সেবায় নিত্য সাধনায় লইয়াছেন সঙ্গী বানাইয়া, সে চায় সেই দীক্ষা। আপনার প্রেম দিয়া লীলা দিয়া, তিনি এই সব সাধককে পূর্ণ করিয়া, নিত্য পাশে পাশে দিয়াছেন রাখিয়া; নহিলে এরা এত প্রেম এত ঐশ্বর্য্য এত অক্লান্ত সেবা ও সাধনা পাইত কোথায়? সেই দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া তাঁর সেবার সহচর হইয়া, নিত্য তাঁর সঙ্গী হইতেই ভক্ত চায়।

৯। প্রেমেতে যুক্ত হও, জীবন লাভ কর

সাধু জনকী বাসনা সবদ রহৈ সংসার।
দাদূ আতম লে মিলৈ অমর উপজাবনহার॥
জো কোই সেবৈ রামকোঁ রাম সরীখা হোই।
দাদূ নাম কবীর জ্যূঁ সাখী বোলৈ সোই॥
অরথি ন আয়া সো গয়া আয়া সো ক্যোঁ জাই।
দাদূ তন মন জীবতাঁ আপা ঠৌর লগাই॥

পহিলে থা সো অব ভয়া অব সো আগৈঁ হোই।
দাদূ তীন্যূঁ ঠৌরকী বিরলা বূঝৈ কোই॥
জে জন বেধে প্রীতিসোঁ তে জন সদা সজীৱ।
উঁলটি সমানা আপ মৈঁ অংতর নাহীঁ পীৱ॥

"হে দাদূ, সাধক জনের মনের মধ্যেও এই বাসনা, এই সংসারেও এই সঙ্গীতই হইতেছে ধ্বনিত, "এই আত্মা লইয়া অমৃতময় জীবনদাতার সঙ্গে হও মিলিত।"

যে কেহ ভগবানকে সেবা করে, সে হইয়া ওঠে তাঁরই অনুরূপ, হে দাদূ, সেও নামদেব বা কবীরের মত 'সাখী' (সত্যের সাক্ষ্য)-পদ থাকে বলিতে।

যে কোনো ইষ্টসাধনে আসে নাই, সে (ব্যর্থসাধন, বৃথাই) গিয়াছে চলিয়া; যে ইষ্টসাধনে আসিয়াছে (যে সিদ্ধসাধন, সার্থক) সে কেন ব্যর্থ যাইবে? হে দাদূ, তনু মন সহ নিজে জীবিত থাকিতে থাকিতে, আপনাকে আপন ঠিকানায় (প্রতিষ্ঠাভূমি ভগবানে) কর প্রতিষ্ঠিত।

যাহা প্রথমে ছিল তাহাই হইল এখন, যাহা এখন আছে তাহাই হইবে ভবিষ্যতে; হে দাদূ, তিনকালের এই তিনটি প্রতিষ্ঠার এই যোগ-রহস্য ক্বচিতই কেহ বোঝে।

যেজন প্রীতিতে বিদ্ধ হইয়াছে (যে প্রেমের আঘাত খাইয়াছে) সে সদা সজীব; সে যখন উলটিয়া আপনার মধ্যে যায় ডুবিয়া, তখন প্রিয়তম আর তাহার দূরে নহেন (নিকটেই)।" (প্রেমের আঘাতে সাধক অন্তর্মুখী হইলেই প্রিয়তমের সাহচর্য্য পান)।

২। মৃত্যুকে জয়।

জুরা কাল জনম্ম মরণ জহাঁ জহাঁ জিৱ জাই।
ভগতি পরায়ণ লীন মন তাকোঁ কাল ন খাই॥
মরনা ভাগা মরণ তৈঁ দুঃখৈঁ নাঠা দুক্খ।
দাদূ ভয় সোঁ ভয় গয়া সূখৈঁ ছূটা সুক্খ॥
জীৱত মিলৈ সো জীৱতে মুয়েঁ মিলৈ মরি জাই।
দাদূ দূন্যূঁ দেখি করি জহঁ জানৈ তহঁ লাই॥

দাদূ সাধন সব কিয়া জব উন মনি লাগা মন্ন।
দাদূ অস্থির আতমা যোঁ জুগ জুগ জীবৈ জন্ন॥
নাদ বিংদ সোঁ ঘট ভরৈ সো জোগী জীবৈ।
দাদূ কাহে কোঁ মরৈ রাম রস পীবৈ॥

"যেখানে যেখানেই জীব যায় সেখানেই বিদ্যমান জরা কাল জীবন মরণ; ভক্তি পরায়ণ এবং ভগবানে লীন যাহার মন, তাহাকে কাল কখনও খায় না।

(যখন ভগবানে মন প্রেমে লীন হইল তখন) মরণ হইতে পলাইল মরণ, দুঃখ হইতে পলাইল দুঃখ, হে দাদূ, ভয় হইতে দূরে গেল ভয়, সুখ হইতে ছুটিল সুখ।

জীবন থাকিতে জীবিত পরব্রহ্মের সহিত যে যুক্ত সে-ই যথার্থ জীবিত; মরণের পরে বা মৃতের সহিত যাহার যোগ সে তো রহিয়াছে মরিয়াই। হে দাদূ, এই দুইটিই দেখিয়া যেখানে ভাল বোঝ সেখানেই লইয়া যাও আপনাকে।

হে দাদূ, যদি তাঁহাতে মনের-সহিত-মন থাকে লাগিয়া, তবে সব সাধনাই হইয়াছে পূর্ণ; হে দাদূ, (তাঁহাতে) যাহার আত্মা হইয়াছে স্থির, সে যুগ যুগ থাকে জীবন্ত।*

নাদ বিন্দুতে† যদি এই ঘট ভরে তবেই যোগী থাকেন জীবন্ত। আর, হে দাদূ, যে জন রামরস পান করে সে মরিতে যাইবে কোন দুঃখে?"

৩। তাঁহার সঙ্গই অমৃত।

রহতে সেতী লাগী রহু তৌ অজরামর হোই।
দাদূ দেখ বিচার করি জুদা ন জীবৈ কোই॥
দেহ রহৈ সংসার মৈঁ জীব রামকে পাস।
দাদূ কুছ ব্যাপৈ নহীঁ কাল ঝাল দুখ ত্রাস॥

---

* "তাঁহার মনের সহিত মন লাগিয়া থাকে", এইস্থলে কেহ কেহ "উন্মনে যদি মন লাগিয়া থাকে" এইরূপ ব্যাখ্যা করেন।

† যোগশাস্ত্রের মতে "নাদবিন্দু" = "৺" ও "ং" এবং সেই ধ্বনি। যোগীরা নাদ বিন্দুতেই নিজেকে পূর্ণ করেন। দাদূর তাহাতে হৃদয় পূর্ণ হয় না। সে চায় ভগবানের প্রেমরস।

জাগহু লাগহু রাম সৌঁ রৈন বিহাঙ্গী জাই।
হেরো সনেহী আপনা দাদূ কাল ন খাই॥
সাহিব মিলৈ তো জীৱৈ নহিঁ তো জীৱৈ নাহিঁ।
সব জীৱন সাধৈ নহীঁ তাতৈঁ মরি মরি জাহিঁ॥

"বর্ত্তমানের (যিনি সদা-বর্ত্তমান) সঙ্গে থাক লাগিয়া, তবে তো হইবে অজর অমর, হে দাদূ, বিচার করিয়া দেখ (বর্ত্তমানের সঙ্গে) বিচ্ছিন্ন কেহই পারে না জীবিত থাকিতে।

(যদি) দেহ থাকে সংসারে আর জীবন থাকে ভগবানের কাছে, তবে কাল জালা দুঃখ ত্রাস কিছুতেই কিছু পারে না করিতে।

জাগ, ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হও, রাত্রি যে যায় পোহাইয়া। প্রেমময় পরমাত্মাকে লও দেখিয়া, হে দাদূ, কাল তবে তোমাকে খাইবে না।

স্বামী যদি মেলেন তবেই "জিয়ে" (জীবন্ত থাকে) নয়তো জিয়ে (জীবন্ত থাকে) না, সমগ্র জীবন লইয়া সাধন করে না বলিয়াই যায় কেবল মরিয়া মরিয়া।"

৪ ঃ মৃত্যু তাঁর কাছে পরাজিত ঃ

মরৈ তো পাৱৈ পীৱকৌঁ জীৱত বংচৈ কাল।
দাদূ নিরভয় নাৱঁ লে দূন্যৌঁ হাথি দয়াল॥
দাদূ মরণে কোঁ চল্যা সব জীৱন কে সাথি।
দাদূ লাহা মূল সৌঁ দূন্যৌঁ আয়ে হাথি॥
দাদূ জাতা দেখিয়ে লাহা মূল গঁৱাই।
প্রেম গতি অগম হৈ সো কুছ লখী ন জাই॥
জো জন রাখে রামজী অপনে অংগি লগাই।
দাদূ কুছ ব্যাপৈ নহিঁ কোটি কাল ঝখি জাই॥

"মরিলেই পাইবে প্রিয়তমকে, বাঁচিলেও কালকে করিবে বঞ্চিত; হে দাদূ, নির্ভয় নাম লও, উভয় দিকেই দয়াল (বিরাজমান)।

দাদূ সব জীবন সঙ্গে লইয়া মরিতেই তবে চলিল, হে দাদূ, (মরিয়া দেখি) মূল এবং লাভ দুইই হইল করায়ত্ত।

হে দাদূ, দেখ, লাভ ও মূল দুইই উড়াইয়া দিয়া চলিয়াছে প্রেম ; প্রেমের মর্ম্মই অগম্য, কেহই তাহা পারে না বুঝিতে।

শ্রীভগবান যে জনকে (অথবা যে জন শ্রীভগবানকে) আপন অঙ্গে করিয়া রাখেন আলিঙ্গন, তাহাকে কেহই কিছুতেই কিছু পারে না করিতে ; কোটি কালও যদি (একত্র হইয়া) আসে, তবে (আপন ব্যর্থতার) দুঃখে মুহ্যমান হইয়া যায় চলিয়া।"

৮ঃ জীবন থাকিতেই সাধনা ঃ

জীৱত পায়া জগত গুর জীৱত মুকতা হোই।
জীৱত কাটৈ করম সব মুকতি কহাৱৈ সোই॥
জীৱত জগপতি কোঁ মিলে জীৱত আতম রাম।
জীৱত দরসন দেখিয়ে দাদূ মন বিসরাম॥
জীৱত পায়া প্রেমরস জীৱত পিয়া অঘাই।
জীৱত পায়া স্বাদ সুখ দাদূ রহে সমাই॥
জীৱত ভাগে ভরম সব ছূটে করম অনেক।
জীৱত মুকতা সদগতী দাদূ দরসন এক॥
জীৱত মেলা না ভয়া জীৱত পরস ন হোই।
জীৱত জগপতি না মিলৈ দাদূ বূড়ে সোই॥
জীৱত পরগট না ভয়া জীৱত পরচা নাহিঁ।
জীৱত ন পায়া পীৱ কোঁ বূড়ে ভর জল মাহিঁ॥
জীৱত পদ পায়া নহীঁ জীৱত মিলে ন জাই।
জীৱত জে ছূটে নহীঁ দাদূ গয়ে বিলাই॥

"জীবন্তেই যদি (হিন্দী "জীবিত" অর্থে জীবন্ত, জীবন থাকিতে) পাইল জগদ্‌গুরু, তবে জীবন্তেই হইল মুক্ত ; জীবন্তেই যদি কাটিল সব করম, তবে তাকেই বলা যাইতে পারে মুক্ত।

জীবন্তেই জগৎপতির সঙ্গে হইল মিলন, জীবন্তেই মিলিল আত্মারাম ; জীবন্তেই তাঁর দরশন গেল দেখা (মিলিল), হে দাদূ, ইহাই মনের বিশ্রাম।

জীবন্তেই পাইলাম প্রেমরস, জীবন্তেই ভরপূর করিলাম পান, জীবন্তেই পাইলাম স্বাদ সুখ, দাদূ রহিল তাহাতে ডুবিয়া সমাহিত হইয়া।

জীবন্তেই পলাইল সব ভ্রম, অনেক কর্ম্ম (বন্ধন) গেল ছুটিয়া ; হে দাদূ, জীবন্তেই মুক্তি হইল সদ্গতি, সেই একের দরশন।

জীবন্তেই যদি না হইল মিলন, জীবন্তেই যদি না হইল পরশ, জীবন্তেই যদি না মিলিল জগৎপতি, তবে হে দাদূ, সে মরিল তলাইয়া।

জীবন্তেই যদি না হইল প্রত্যক্ষ, জীবন্তেই যদি না হইল পরিচয়, জীবন্তেই যদি না পাইল প্রিয়তমকে, তবে সে জন ডুবিল ভব জলের মধ্যে।

জীবন্তেই যদি না পাইল সে পদ, জীবন্তেই যদি যাইয়া না মিলিল (সাক্ষাৎ করিল), জীবন্তেই যদি না হইল মুক্ত, তবে, দাদূ, সে হইয়া গেল বিলয় (বিনাশ)।”

৬ মৃত্যুর পরে যে হইবে, সে আশা বৃথা ;

দাদূ ছূটৈ জীৱতাঁ মূৱা ছূটৈ নাঁহি ।
মূৱাঁ পীছৈঁ ছূটিয়ে তৌঁ সব আয়ে উস মাহিঁ ॥
মূৱাঁ পীছৈঁ মুকুতি বতাৱৈ মূৱাঁ পীছৈঁ মেলা ।
মূৱাঁ পীছৈঁ অমর অভয় পদ দাদূ ভূলে গহিলা ॥
মূৱাঁ পীছৈঁ বৈকুণ্ঠ বাসা মূৱাঁ স্বরগ পঠাৱৈঁ ।
মূৱাঁ পীছৈঁ মুকতি বতাৱৈঁ দাদূ জগ বৌরাৱৈঁ ॥
মূৱাঁ পীছৈঁ পদ পহুঁচাৱৈঁ মূৱা পীছৈঁ তাৱৈঁ ।
মূৱাঁ পীছৈঁ সতগতি হোৱৈঁ দাদূ জীৱত মাৱৈঁ ॥
মূৱাঁ পীছৈঁ ভগতি বতাৱৈঁ মূৱাঁ পীছৈঁ সেৱা ।
মূৱাঁ পীছৈঁ সংজম রাখৈঁ দাদূ দোজগ দেৱা ॥

“হে দাদূ, যে জন মুক্তিলাভ করে সে জীবন্তেই করে, মৃতের আবার কিসের মুক্তি ? মরিবার পর মুক্তি হইবে বলিয়া সবাই আসিয়া পড়িয়াছে তাহারই মধ্যে (মরণের মধ্যে)।

(এই সব ঝুঠা উপদেশদাতারা) বলেন, মরিবার পরই মুক্তি, মরিবার

পরই (ভগবানের সঙ্গে) মিলন! হে দাদূ, মরিবার পরে হয় অভয় অমরত্ব পদ! পাগলেরাই এই সব কথায় ভোলে।

মরিবার পর (হইবে) বৈকুণ্ঠবাস! মরিলে পাঠাইবেন স্বর্গে! মরিবার পর (ইঁহারা) বানাইয়াছেন মুক্তি! হে দাদূ, (এমন করিয়া ইঁহারা) জগৎ সুদ্ধ বানান পাগল।

মরিবার পর (ইঁহারা) সেই পদে (ব্রহ্মপদে বা অমৃতপদে) দেন পৌছাইয়া! মরিবার পিছে (ইঁহারা) তারেন (ত্রাণ করেন)! মরিবার পর হইবে সদ্‌গতি! হে দাদূ, জীবন্তে (ইঁহারা) কেবল পারেন মারিতেই!

মরিবার পর (ইঁহারা) বলেন ভক্তি! মরিবার পরে বলেন সেবা। মরিবার পর ইঁহারা রাখেন সংযম! হে দাদূ, ইঁহারা মৃত্যু লোকেরই উপাসক।”

৭। জীবন্ত থাকিয়াই বিশ্বের সাধনা।

ধরতী ক্যা সাধন কিয়া অংবর কৌন সন্ন্যাস।
রবি সসি কিস আরংভ থৈঁ অমর ভয়ে নিজ দাস॥
সব রংগ তেরে, তৈঁ রংগে, তূঁ হী সব রংগ মাহিঁ।
সব রংগ তেরে, তৈঁ কিয়ে, দূজা কোঈ নাহিঁ॥

“ধরিত্রী করিল কি সাধনা, অম্বর করিল কোন সন্ন্যাস? রবি-শশী, কোন আরম্ভ (দীক্ষা, উদ্যম)-হইতে হইল তোমার দাস, হইল অমর?

সকল রঙ্গই তোমার, তুমিই রঙ্গিয়াছ, তুমিই আছ সব রঙ্গের মধ্যে। সকল রঙ্গই তোমার, তোমারই কৃত, তোমা ছাড়া আর নাই কিছুই।”

পঞ্চম প্রকরণ—পরিচয়

জাগরণের পর উপদেশ লাভ করিয়া সাধনার সময় আসে। সাধনাতেও প্রতিকূল যাহা কিছু তাহা পরিহার করিয়া, অনুকূলকে গ্রহণ করিয়া, সাধক করেন পরিচয় লাভ। তার পর আসে প্রেমের পালা। অবশ্য গুছাইয়া সাজাইয়া বৈজ্ঞানিকভাবে অগ্র-পশ্চাৎ রক্ষা করিয়া বলিতে হইলেই এমনভাবে সাজাইয়া বলা চলে। নচেৎ জীবনে নানা ভাবেই ওলট পালট হইয়া এই সব ঘটনা আসে।

“পরিচয়,” প্রকরণে সাধকরা প্রথমেই উল্লেখ করেন “জরণা”র। অর্থাৎ, তখন অন্তরের দারুণ বেগ, ভাবের ভীষণ জালা। অথচ বাহিরে প্রকাশ না করিয়া সে সব চাই অন্তরেই জীর্ণ করা। কুম্ভকারের অগ্নি যেমন পোয়ানের ভিতরে ধরিয়া না রাগিলে কলসী পাকা হয় না, তেমনি প্রেমের আগুন যদি বাহিরে প্রকাশ করিতে দেই, তবে সেই ভাব-বিলাসে অন্তরের পরিণতিটি পায় বাধা।

যখন সাধক অন্তরে আনন্দ পাইয়াছেন, আর সেই উপলব্ধির আনন্দ চাহিতেছে আপনার প্রকাশ, অথচ তখন প্রকাশের কোনো উপায় নাই; “জরণা” অঙ্গে এই ভাবটিই বিশেষ করিয়া বলা হইবে।

আত্ম-সমাহিত সংযমের দ্বারাই বুঝি সাধনার প্রবীণতা। তাহার পরও অন্তরের ভাব যদি বাহিরে কিছু প্রকাশ পাইতে চায়, তবে তাহারও পথ সহজ নয়।

তার পরই হইল যথার্থ পরিচয়। অন্তরের সমাহিত আনন্দকে বাহিরে প্রকাশ করিতে গিয়া যে দুঃখ, তাহা অনুভব করার পর, ভাবকে রূপে সৃষ্টি করার তীব্র দুঃখ অনুভব করার পর, বলা যায় হইয়াছে যথার্থ পরিচয়।

পরিচয় হইলে দেখি সর্ব্বকালে সর্ব্বস্থানে তিনিই বিরাজমান,যেখানে চাহিয়া দেখি সেখানেই পাই তাঁহাকে। বিশ্বের মূলে ও আমার অনুভবের মূলে, সর্ব্বত্রই তিনি। তাঁকে লইয়াই নিরন্তর আনন্দ-উৎসব। তাঁর জ্যোতিই আকাশে ঝরে অমৃতরূপে, অসীমস্বরূপ সেই জ্যোতি সর্ব্বত্র দীপ্যমান। তাঁর সঙ্গে মিলনেতে সব বাঞ্ছার ঘটে পূর্ণতা, রূপ-উৎসবে নয়ন হইয়া যায় ভরপূর। অন্তর

ভরপূর হয় তাঁর স্মরণে, তাঁর ভাবে। তখন আমার নখ হইতে শিখা পর্য্যন্ত বিনা প্রয়াসে সহজে তাঁর নাম করিতে থাকে জপ, তখন চাহিয়া দেখি বিশ্বজগতের সব আকার চলিয়াছে তাঁরই জপমালার মত।

আমাকেও তিনি চাহেন, তাই তো এই আনন্দ-অনুভব এত গভীর। হৃদয় কমলে দেখি চলিয়াছে তাঁরই স্মরণ। তাঁহার সঙ্গে একযোগে চলে সেবা ও সাধনা, আরতির জন্য বাহিরে হয় না যাইতে, আমার হৃদয়েই চলে আরতি।

আমি ছোট হইলেও আমার প্রেম ক্ষুদ্র নয়। আমার প্রেমের অসীমতা দিয়াই অসীমস্বরূপ তাঁহাকে পাই। এমন করিয়া যখন পরিচয় হয় পূর্ণ, তখন মুক্তি আপনিই আসিয়া হয় উপস্থিত।

পরিচয় হইলে দেখি সর্ব্বত্র বিরাজমান তিনি অখণ্ড অবিনশ্বর, আমি আছি সুধু সাক্ষীভূত হইয়া। এই হইল "অবিহড" ও "সাখীভূত" অঙ্গ। সাধকের মধ্যেই অমৃতবল্লী বিরাজমান ("বেলী" অঙ্গ); ব্রহ্মের সামর্থ্যের অন্ত নাই ("সমর্থাই" অঙ্গ), তখনই গিয়া যথার্থরূপে প্রিয়তমকে গেল চেনা ("প্রিয় পিছানন" অঙ্গ)।

তার পর আরম্ভ হইল শেষ প্রকরণ প্রেমের।

পরিচয় প্রকরণের "জরণা" অঙ্গটি তিনিই ঠিক বুঝিবেন যিনি নিজের জীবনে ইহা করিয়াছেন প্রত্যক্ষ। যিনি কখনও কোনো আনন্দকে অন্তরে ধারণ করিতে, সমাহিত করিতে, চেষ্টা করিয়াছেন ও সেই চেষ্টায় অতীত মহানন্দ হইতে কিছু সৃষ্টিও করিয়াছেন, তিনিই এই "জরণা" বা অন্তরের ভাবকে অন্তরের মধ্যে জীর্ণ করা বিষয়টি কি, তাহা বুঝিয়াছেন।

"জরণা" অঙ্গের আর একটি অর্থ আছে, দেহতত্ত্বের সাধনার দিক দিয়া। অন্তরের মধ্যে যে রস উপজে তার যেমন দীপ্তি তেমনি জ্বালা, অথচ তাহা ঝরিতে দিলেই সাধকের সব গেল রসাতলে। যাক্, দেহতত্ত্বের সাধনার কথাটি এখানে আর বলার প্রয়োজন নাই, এই অঙ্গের সাধারণভাবে বোধগম্য স্বরূপটিই এখানে করা যাউক আলোচনা।

দেহতত্ত্বের সাধনার দিক দিয়া যাঁহারা এই অঙ্গকে বুঝিতে চাহেন, তাঁহারা আবার এই "নিখিলায়ত" অর্থেতে তুষ্ট নহেন। যাহা হউক তাহার আর

কোনো উপায় নাই। তাঁহারা বিশ্ব-গত এই অর্থ স্বীকার করিয়াও বলেন "ইহার দেহগত অর্থই আমাদের বেশী প্রয়োজন।" "নিখিলায়ত" সেই অর্থ স্বীকার না করিয়া যদিও তাঁহারা পারেন না, তবু সাধনার জন্য সেই দেহতত্ত্বগত অর্থই তাঁহারা সমধিক করেন আদর।

পঞ্চম প্রকরণ—পরিচয়

প্রথম অঙ্গ—"জরণা" (জ্বালা)ঃ

জরণা অর্থ হইল জীর্ণ করা। সাধনায় ভক্তিতে ও প্রেমে আনন্দ আছে, দীপ্তি আছে, তাহা বাহিরে প্রকাশ চাহে; কিন্তু তাহা আবার প্রকাশ করিতে গেলেই সাধনার ক্ষতি। সেই আনন্দ অসীম, প্রকাশ মাত্রেই আছে সীমা। কাজেই অসীমকে সীমার মধ্যে প্রকাশ করাও দায়; এই এক মহাজ্বালা।

"জরণা" একদিকে হইল জীর্ণ করা, আনন্দ রসকে অন্তরে শান্ত সমাহিত রাখা। অন্যদিকে "জরণা" হইল জ্বালা, দাহ। জরণা কথাটিরও এই দুই অর্থই আছে। গুজরাতী ও রাজস্থানীতে "জরবূঁ" ধাতুর ইহাই অর্থ। আবার সাধারণ হিন্দী অর্থ জ্বলন, জ্বালা। ভক্তেরা দুই অর্থেই "জরণা"কে গ্রহণ করিয়া "জরণা" অঙ্গের অর্থের পূর্ণ বৈচিত্র্য ও ঐশ্বর্য্য সম্ভোগ করেন। এই জরণা অঙ্গের তাই এই দুই ভাবেই অর্থ করা চলে। দুই দিকেই তাহার ভাব-ঐশ্বর্য্য অপরিমেয়।

অন্তরে আনন্দের উপলব্ধি হইয়াছে, সেই উপলব্ধিকে প্রকাশ করিতে প্রাণ চাহে, অথচ প্রকাশ করা চলিবে না—এই এক বিষম জ্বালা। যদি

সেই সৃষ্টি সত্য হইয়া থাকে, অর্থাৎ যদি অন্তরের আনন্দই সৃষ্টিতে প্রকাশিত হইয়া থাকে তবে সকল সৃষ্টির মূলেই এই জ্বালা আছে।

মনের মধ্যে আসিল এমন এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ যার না আছে সীমা না আছে অন্ত, না আছে তল না আছে মূর্ত্তি! এই অমূর্ত্ত আনন্দকে মূর্ত্তি দেওয়া চাই। অসীমকে সীমায়, অগাধকে প্রত্যক্ষের মধ্যে করিতে হইবে প্রকাশ। নিত্য যে আনন্দ, তাহার প্রকাশ হইবে এমন তরল রূপ ও রঙ্গের মধ্যে, যাহা প্রতিমুহূর্ত্তেই সন্ধ্যার মেঘের মত জীবন্ত অপরূপ ও পরিবর্ত্তনশীল।

ইচ্ছা করিলে ইহাকে মায়া বলিয়া মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায়, কিন্তু ইহা মায়া বা মিথ্যা হয় আমাদেরই গ্রহণ করিবার দোষে। আসলে তাহা মিথ্যা নয়। অপার সৃষ্টির অপরূপ মাধুর্য্যই তাহার ক্ষণিকতায়, তার টলটলায়মান তরল স্বরূপে। বাংলায় বাউলেরা বলেন, “যখন দুঃখ হইল কমলের উপর শিশির বিন্দুর মত টল্‌টলায়মান, তখনই তো অপূর্ব্ব স্বরূপ হইল মধুর রূপ।”

এই অপরিসীম ব্রহ্মানন্দকে অন্তরে শান্তভাবে রাখিতে হইবে ধরিয়া; তবু ঘট ছাপাইয়া উদ্বেল যেই রস, সর্ব্ব প্রয়োজনের অতীত যে রসপ্রবাহ, সব সৃষ্টির মূলে আনন্দরূপে তাহাই বিরাজিত।

আনন্দকে মূর্ত্তিতে প্রকাশ করিবার জ্বালা জানেন গুণী, জানেন কবি। ব্রহ্মই হইলেন আদি কবি, আদি গুণী; কাজেই তাঁহার এই জ্বালাও অসীম। তাঁহার এই দুঃখ তাঁহার সৃষ্টি ভরিয়াই রহিয়াছে, কাজেই বিশ্বচরাচর ব্যাপিয়া একটি অনির্ব্বচনীয় ব্যথা বিরাজমান।

কবির ভাব যখন সঙ্গীতে ব্যক্ত হইতে চাহে, তখন তাহার ভাষা ছন্দ ও সুর, কি কম দুঃখেই মেলে? কবির ভাবের ভাবুক না হইলে, কবির “সরীখা” (সদৃশ) না হইলে তাঁর কাব্য বুঝাই যায় না।

বিশ্ব চরাচর হইল তাঁহার কাব্য। বিশ্ব জগৎকে বুঝিতে হইলেও ব্রহ্মের সরীখা হইতে হয়। সাধক তাই ব্রহ্মের সরীখা হইয়াই বিশ্বজগতের সকল আকারে সকল রূপে ব্রহ্মানন্দ করেন সম্ভোগ। ব্রহ্মের সৃষ্টির এই আনন্দ যথার্থভাবে বুঝিতে হইলে তাঁহার সৃষ্টির মূলের জ্বালাটিও হইবে বুঝিতে। “নাঋষিঃ কুরুতে কাব্যং নারুদ্রোরুদ্রমর্চতে”, পুরাণের এই মহাবাক্যটি এক অপরূপ মহাসত্য।

ভাব হইতে কবি আসেন রূপে, অসীম নিরাকার হইতে জ্বলিতে জ্বলিতে আসেন সীমায় ও আকারে। তাঁহাকে যিনি বুঝিতে চাহেন তাঁহাকে আবার জ্বলিতে জ্বলিতে যাইতে হয় রূপ হইতে ভাবে, আকার ও সীমা হইতে নিরাকার ও অসীমে! তবেই তাঁহার সৃষ্টি হইতে তাঁহার আনন্দে পৌছিয়া তাঁহার সঙ্গে ভাব-যোগ করা যায় উপলব্ধি।

ব্রহ্মের সঙ্গে যোগ চাহিলেও এই একই ধারা। কত দুঃখে কত জ্বালায় আপন অন্তরের অসীম ভাবকে নানা রূপে নানা আকারে তিনি গলাইয়া গলাইয়া করিয়াছেন প্রকাশ। তিনি যেমন অরূপ হইতে রূপের দিকে, “গাঁঠ বাঁধিতে বাঁধিতে”, করিয়াছেন যাত্রা; তেমনি তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইলে আবার আমাদিগকে “গাঁঠ খুলিতে খুলিতে”, সীমা হইতে অসীমে রূপ হইতে ভাবে পৌছিয়া, তাঁহার সঙ্গে যোগকে করিতে হইবে পূরা। সৃষ্টিতে ব্রহ্ম যে ধারাতে নামিয়াছেন তাহার ঠিক উল্টা ধারাতে গেলেই তো তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে। নহিলে একই পথে একই দিকে উভয়েই চলিতে থাকিলে অনন্তকালই আমরা চলিব, অথচ দেখাই হইবে না। দেখা হইবার পদ্ধতিই হইল যাঁর দেখা চাই তাঁর দিকে, অর্থাৎ তাঁর চলার উল্টা দিকে যাওয়া। দেহতত্ত্ব সাধনাতেও আছে যে “ধারা উলটাইয়া হয় দেখা”, কিন্তু সে হইল দেহের মধ্যের ধারার। *

ব্রহ্ম জ্বলিতে জ্বলিতে আসিতেছেন আকারের দিকে, রূপের দিকে। অরূপ অলখ অসীমকে সংহতরূপ সংলক্ষ্য ও সসীম করিতে করিতে, চলিয়াছে তাঁহার যাত্রা। সাধকও যদি আবার সীমা ও রূপ হইতে অসীম অরূপের দিকে “সরীখা” ভাবে জ্বলিতে জ্বলিতে যাত্রা না করেন, তবে কেমন করিয়া ব্রহ্মের সঙ্গে হইবে ভাবের যোগ, কেমন করিয়া শ্রুত হইবে ব্রহ্ম-সঙ্গীত, বিশ্বরস হইবে পান? এই যোগ না হইলে ব্রহ্মের সৃষ্টির সঙ্গীতও বৃথা, সাধকের রসগ্রাহী এই মানব-জনমও বৃথা, সবই বৃথা। মানুষের পক্ষে সীমা ও রূপ সহজ একথা বলিলে তো চলিবে

---

* রাধাস্বামী-সম্প্রদায়ীরা বলেন, কবীর যে বলিয়াছেন, “ধারা”-উল্টাইয়া “স্বামীর” দেখা পাইবে, তার অর্থ “ধারা”-উল্টাইলে “রাধা” হইবে। অতএব “রাধাস্বামী” মতের কথা কবীর পূর্ব্ব হইতে জানিতেন। তাঁহারা তাই বলেন, কবীর বুঝিয়াছিলেন ভবিষ্যতে রাধাস্বামী মত আসিবে, তাই প্রচ্ছন্নভাবে এই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছেন।

না, ব্রহ্মের পক্ষেও তো অসীম অরূপ সহজ ; তিনি তবে কেন রূপ ও সীমার দিকে আপনার সৃষ্টি আপনার সঙ্গীতকে প্রকাশ করিবার জন্য জলিতে জলিতে করিয়াছেন যাত্রা ? তাঁর প্রিয় সাধকের সঙ্গে মিলিবার জন্য যদি এত দুঃখ করিয়া তিনি আসিতে থাকেন, তবে সাধকের পক্ষেও কি কঠিন হইলেও অরূপ অসীমের দিকে যাত্রা করা উচিত নয় ?

ব্রহ্মের সঙ্গে যোগ, ব্রহ্মের প্রেমের সাধনার অনুরূপ প্রেম-সাধনা সাধকের যদি বাঞ্ছিত হয়, তবে সাধককেও সহজ পথ ছাড়িয়া জলিতে জলিতে, ব্রহ্মের দুঃখের দুঃখী হইয়া, "সরীখা" হইয়া, যাত্রা করিতেই হইবে। নহিলে তিনিও জলিতে জলিতে আসিবেন মূর্ত্তির ও রূপের লোকে, আর সাধকও "অনায়াসের" বলিয়া সেই দিকেই, অর্থাৎ সেই রূপ ও আয়তনেরই দিকেই থাকিবেন চলিতে ! তবে ব্রহ্মের প্রেম, ব্রহ্মের দুঃখ, ব্রহ্মের এই অসহ জ্বালা সার্থক হইবে কিসে ? অতএব তিনি যেমন তোমার প্রেমে তোমার সঙ্গে মিলনের জন্য দুঃসহ জ্বালা বরণ করিয়া আসিতেছেন তোমার দিকে, তুমিও তেমনি তাঁহার প্রেমের দায়ে অতি দুঃখ হইলেও তীব্র জ্বালা সহ্য করিয়া যাত্রা কর তাঁর দিকে। তাঁর দুঃখের তাঁর প্রেমের তাঁর সাধনার, "সরীখ" হও ; তাহাকে ধন্য কর, নিজেও ধন্য হও।

এই জ্বালা প্রেমিকের বড় আদরের ধন। ইহা দেখাইবার জন্য তো নয়। যে এই জ্বালা লইয়া লোক দেখাইতে গেল, প্রেমের রাজ্যে তার আর স্থান নাই। কবি যদি অন্তরের এই জ্বালা লইয়া সৃষ্টি করিতে চাহেন তবে তিনি ইহা লইয়া লোকের মধ্যে দেখাইয়া বেড়াইলে চলিবে না। কারণ সেই ভাবে যদি অগ্নিময় ধারাকে ঝরিয়া যাইতে দেওয়া যায়, তবে সবই বৃথা, কোনো সৃষ্টিই তাহাতে সত্য হইয়া ওঠে না। কুম্ভকার যে আগুন দিয়া তার কাঁচা ঘটকে পাকা করে, সে আগুনকে সে কাদা দিয়া লেপিয়া ভিতরে রাখে প্রচ্ছন্ন করিয়া। সাধকের এই অন্তরতম জ্বালা শিখা-রূপে যদি বাহিরে হইয়া ওঠে প্রত্যক্ষ, তবে তার কাঁচা সাধনা আর কিছুতেই হয় না পাকা। অতএব সাবধান, দেখাইবার লোভ পরিহার করিতেই হইবে। প্রেমের জ্বালা দেখাইতে গেলেই প্রেমের সাধনার সর্ব্বনাশ, সবই তাহার হইয়া যায় বিলয়। সেবার দ্বারাই প্রেমকে রাখ সদা সংবৃত করিয়া।

১। অন্তরে ভগবানের প্রেমরসকে রাখ, কারণ অন্তরের নির্জ্জন ধামে

বাহিরের লোকের যাতায়াত নাই। মনের মধ্যের রস মনেই রাখ পূর্ণ করিয়া, দেখাইবার চেষ্টা করিয়া প্রেমের আত্মঘাত ঘটিতে দিও না। “লোক দেখানো” প্রেম তো প্রেমই নয়। স্বামীকেও তাহা দেখাইবার দরকার নাই। তিনি নিজেই প্রেমিক, কাজেই প্রেমের জ্বালা তাঁর জানা আছে। অতএব নিঃশব্দে এই জালায় জ্বলিতে থাক; সাধনা অগ্রসর হউক। যাহা বুঝিবার তাহা তিনি আপনিই লইবেন বুঝিয়া।

২। সেই রস যে পাইয়াছে সে-ই জ্বলিয়াছে। অন্তরে এই রস যে গুঞ্জন করিয়া ওঠে, সেই গভীরের গুঞ্জনকে পরিপূর্ণ সঙ্গীতে প্রকাশ করা যায় কিসে? অসীমকে যে দেখিয়াছে, সে জ্বলিয়াই তার সেই দেখার মূল্য দিয়াছে। “অনুভবী” সাধকরা বলেন জ্বালা স্বীকার করিয়াছে বলিয়াই দীপ জ্যোতিকে পাইয়াছে। সাধক এই জ্বালা যত্ন করিয়া অন্তরের মধ্যে রাখে গোপনে, কারণ ইহা দিয়াই তাহাকে আপন রচনা তুলিতে হইবে সৃষ্টি করিয়া। ইহা দেখাইতে গেলেই বা ঝরিয়া যাইতে দিলেই, সর্ব্বনাশ। অন্তরের নির্জ্জন একান্ত ধামে ব্রহ্মের সঙ্গে প্রেম যোগের যে আনন্দ, তাহা কি বাক্যে বুঝান যায়? তার জ্বালা অন্তরে লইয়া ধীরে ধীরে সাধনাকে নূতন সৃষ্টিতে তুলিতে হয় প্রকাশ করিয়া।

৩। এই প্রেমের খেলায় যেমন জ্বলিতেছি আমি, তেমনই জ্বলিতেছেন তিনি যিনি সকল জরা মরণের অতীত। অসীম অজর (অজ্বল) বলিয়া প্রেমের ক্ষেত্রে তাঁরও নিস্তার নাই, কারণ প্রেমে সবাই সমান। প্রেমে যে উভয়ে জ্বলিতেছি তাহাতেই সকল রসের উৎস গিয়াছে খুলিয়া; কিন্তু সেই রসকে সাবধানে অন্তরের মধ্যেই রাখিতে হইবে সম্বরণ করিয়া। ঘট পূর্ণ করিয়া রাখিতে হইবে এই রস; জ্বালা যেন কিছুতেই বাহিরে না যায় জানা।

৪। ব্রহ্মের সঙ্গে যাঁর হইয়াছে প্রেমের যোগ, তিনিই তো যোগী। সেই যোগেরও জ্বালা আছে। অথচ এই জ্বালা ও এই যোগকে স্বীকার না করিলে সাধক নিত্যজীবন পাইতেই পারে না। এই রসকে যে বাহিরে ঝরিয়া যাইতে দিল, যে ইহা লইয়া ধর্ম্মের কোনরূপ ব্যবসা ফাঁদিতে বসিল, যশ মান ও সংসারের উদ্দেশ্যে যে এই জ্বালার অপ-প্রয়োগ (Exploitation) করিল, সে নিত্য-জীবনে হইল বঞ্চিত। গুরুর কৃপায় জ্ঞান হইলে, সাধক এই সহজ প্রেম-লোকে গিয়া ভগবানের সঙ্গে সমান জ্বালা নিঃশব্দে গ্রহণ করিতে শেখে। যে

এই রসকে বাহিরে ঝরিয়া যাইতে দেয়, তার এই কায়াও ফুটা ঘটের মত যায় বৃথা হইয়া, এই জন্য তার হইয়া যায় বৃথা ও নিষ্ফল।

৫। বিশ্বের আদি অন্ত লইয়া এই জ্বালা। ব্রহ্ম হইতে আরম্ভ করিয়া সাধক পর্য্যন্ত সবারই এই জ্বালা। এই জ্বালাতে জ্বলিয়াই তিনি সৃষ্টিকে সঙ্গীতের মত সুন্দর মধুর ও করুণ করিয়া পূর্ণ করিয়া তুলিতেছেন,আমার প্রাণও জ্বলিতেছে তাহার সঙ্গে সঙ্গে। যেখানে তিনি প্রত্যক্ষ জ্যোতির লহরীতে প্রকাশমান, সেখানেও তিনি জ্বলিতেছেন; আর যেখানে বিশ্বের মূলে তিনি সকল জ্যোতির সকল প্রকাশের অপ্রত্যক্ষ মূলাধার হইয়া "কারণ-সংহত" ও "পুঞ্জীভূত" হইয়া আছেন, সেখানেও তিনি জ্বলিতেছেন।

তিনি যেখানে সৃষ্টিতে পরম প্রকাশরূপে দীপ্যমান, সেখানেও তিনি জ্বলিতেছেন; আর যেখানে তিনি গভীরের গভীরে মূলাধার হইয়া সকল ইন্দ্রিয়ের বাক্য-মনের ধ্যান-ধারণার অগোচর হইয়া বিশ্বের মূল আশ্রয় "পরম নিবাস" হইয়া আছেন, সেখানেও তিনি জ্বলিতেছেন। তাঁর এই উভয়-বিধ স্বরূপকে এক করিয়া রাখিয়াছে যে পরমানন্দ, সেই পরমানন্দধামে তাঁর "পরম বিলাস লীলাতেও" নিরন্তর চলিতেছে সেই অপার অনন্ত জ্বালা।

৩। বিশ্বজগতের পেয়ালা ভরিয়া ভরিয়া তিনি যে প্রেম-রস আমাকে দিতেছেন ঢালিয়া ঢালিয়া, তাহাও দেখি জ্বলন্ত! পবন, জল, আকাশ, ধরিত্রী, চন্দ্র, সূর্য্য, পাবক সবই যে দেখিতেছি জ্বলিতেছে আগুনের মত। জ্বলিতেছে বলিয়াই কি আমি এই জ্বালাকে দূরে করিব পরিহার! পেয়ালা ভরা বিধাতার এই দান আমি এক চুমুকে করিব পান। এই সব একত্র করিয়া মহা অগ্নিময় রস পান করিব এক গণ্ডুষে। সবই আমি অন্তরে সমাহিত করিয়া শান্ত করিয়া রাখিব ধরিয়া। আমিও কি তাঁর যোগ্য "সরীখা" প্রেমিক নহি?

চতুর্দ্দশ লোক, তিন ভুবন, সকল লোক, ভরপূর করিয়া চলিয়াছে নিরন্তর এই আগুনের প্রবাহ। তবু আমি কিছুমাত্র ভয় করি না, তাঁর প্রেমের ভরসায় আমি সকল লোক সকল ভুবন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের জ্বালা প্রতি শ্বাসে শ্বাসে করিয়া চলিব পান। আমি যে তাঁর প্রেমের "সরীখা"! বীর না হইলে বীরের সঙ্গে যোগ হইবে কেমন করিয়া?

১। আনন্দের জরণ, প্রকাশ করিবার নহে।

জিনি খোরৈ দাদূ রামরস হৃদয় রাখি জিনি জাই।
জরণ জতন করি রাখিয়ে তহঁ না কো আরৈ জাই॥
মনহীঁ মাহেঁ উপজৈ মনহীঁ মাহিঁ সমাই।
মনহীঁ মাহেঁ রাখিয়ে বাহরি কহি ন জনাই॥
কহি কহি কা দিখলাইয়ে সাঈঁ সর জানে।
দাদূ পরগট কা কহৈ কছু সমঝ সয়ানে॥
লৈ বিচার লাগা রহৈ দাদূ জরতা জাই।
দাদূ সমঝি সমাই রহু বাহর কহি ন জনাই॥

"রামরস (ভগবানের সঙ্গে যোগের আনন্দ) যেন হারাইয়া না ফেলিস্, হৃদয়েই তাহা রাখ্, তাহা যেন চলিয়া না যায় ("যদি হৃদয়ে রাখা নাও যায়"— এই অর্থও হয়)। এই (ভগবানের প্রেমযোগের) জালা যতন করিয়া রাখ সেখানে, যেখানে না কেহ আসে, না কেহ যায়।

মনের মধ্যেই ইহা (এই আনন্দ-জালা) হয় উৎপন্ন, মনের মধ্যেই হইয়া থাকে ভরপূর ; মনের মধ্যেই ইহা রাখ, বাহিরে কোথাও কহিয়া জানাইও না।

কহিয়া কহিয়া কি আর দেখাও ? স্বামী সবই জানেন। হে দাদূ, প্রকাশ করিয়া কি কহিতে চাও ? তুমি বুদ্ধিমান, দেখ বুঝিয়া।

এই লয় সমাধির অনুভব-রসে থাক লাগিয়া, হে দাদূ, জলিতে জলিতে চল অগ্রসর হইয়া।* হে দাদূ, ভালরূপে বুঝিয়া (এই রসে) থাক ভরপূর হইয়া, বাক্যে তাহা জানাইও না প্রকাশ করিয়া।"

২। ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগের জরণ।

সোঈ সেরগ সব জরৈ জেতা রস পীয়া।
দাদূ গুঁজ † গংভীর কা পরকাস ন কীয়া॥

---

* "হে দাদূ, আপনার মধ্যে রাখ শান্ত সমাহিত করিয়া" এই অর্থও হয়।

† "গূঝ" পাঠ হইলে অর্থ হইবে "গুহ্য, গোপন"।

সোঈ সেৱগ সব জরৈ জিন কঁূ অলখ লখায়া।
দাদূ রাখৈ রামধন জেতা কুছ পায়া॥
সোঈ সেৱগ সব জরৈ প্রেমরস খেলা।
দাদূ সো সুখ কস কহৈ জহঁ আপ অকেলা॥
সোঈ সেৱগ সব জরৈ জেতা ঘটি পরকাস।
দাদূ সেৱগ সব লখৈ কহি ন জনাৱৈ দাস॥

"সেই সেবকেরা সবাই জ্বলিতেছেন (অথবা জীর্ণ করিতেছেন) যাঁহারা সেই রস করিয়াছেন পান। গভীরের গুঞ্জনকে, হে দাদূ, কেহই করে নাই প্রকাশ।

সেই সেবকেরা সবাই জ্বলিতেছেন (বা জীর্ণ করিতেছেন) অলখ ঈশ্বর যাঁহাদিগকে দেখাইয়াছেন (আত্মস্বরূপ); হে দাদূ, যা কিছু তাঁহারা পাইয়াছেন রামধন, তাহাই রাখিয়াছেন (অন্তরে) (যদিও জ্বালার অন্ত নাই)।

সেই সেবকেরা সবাই জ্বলিতেছেন (বা জীর্ণ করিতেছেন) যাঁহারা খেলিয়াছেন প্রেমরসে; হে দাদূ, যেখানে তিনি একেলা বিরাজমান, সেই (স্থানের) আনন্দ আর বলিবে কাহাকে?

সেই সেবকেরা সবাই জ্বলিতেছেন, (বা জীর্ণ করিতেছেন) যত ঘটেই হইয়াছে (তাঁর) প্রকাশ। সেবক দাদূ দেখে সবই, কিন্তু দাস আর তাহা কহিয়া (কাহাকেও) জানায় না।"

৩। জরণ-রস।

অজর জরৈ রস না ঝরৈ ঘট মাহিঁ সমাৱৈ। *
দাদূ সেৱগ সো ভলা জো কহি ন জনাৱৈ॥
অজর জরৈ রস না ঝরৈ ঘট অপনা ভরি লেই।
দাদূ সেৱগ সো ভলা জারৈ জান ন দেই॥
অজর জরৈ রস না ঝরৈ পীৱত থাকৈ নাহিঁ।
দাদূ সেৱগ সো ভলা ভরি রাখৈ ঘট মাহিঁ॥

"যাহা অজর তাহা জরিতেছে, অথচ সাধক রস দিতেছে না ঝরিতে। আর

---

* যেখানে "জরনা" আছে, সেখানে জ্বলন ও জীর্ণকরণ এই দুই অর্থই হইবে। তাই অনুবাদেও "জরন" কথাই রাখা হইল। ইহার দুই অর্থই যুগপৎ বুঝিয়া লইতে হইবে।

ঘটের মধ্যে সেই রস ভরিয়া রাখিতেছে সমাহিত করিয়া ; হে দাদূ, সেই সেবকই ভাল যে কহিয়া কিছু আর জানায় না বাহিরে।

অজর জরিতেছেন, আর সাধক রস দিতেছে না ঝরিতে, এবং (সাধক) আপন ঘট লইতেছে ভরিয়া ; হে দাদূ, সেই সেবকই ভাল যে অন্তরের এই জরণ (কাহাকেও) দেয় না জানিতে।

অজর জরিতেছেন আর রস ঝরিতেছে, পান করিয়া (সাধক) ক্লান্তই হইতেছে না : হে দাদূ, সেই সেবকই ভাল যে (আপন) ঘটের মধ্যেই ভরিয়া রাখে (সেই রস)।"

৪। এই রস ঝরিতে দিলেই বিনাশ।

জরনা জোগী জুগ জুগ রহৈ ঝরণা পরলৈ হোই :
দাদূ জোগী গুরুমুখী সহজ সমানা সোই ॥
জরনা জোগী থির রহৈ ঝরণা ঘট ফূটৈ।
দাদূ জোগী গুরুমুখী কাল তৈঁ ছূটৈ ॥
জরনা জোগী জুগ জুগ জীৱৈ ঝরণা মরি মরি জাই।
দাদূ জোগী গুরুমুখী সহজৈঁ রহৈ সমাই ॥

"জরন্ত যোগী জুগ জুগ রহে জীবন্ত, ঝরিলেই হয় প্রলয় ; গুরুর উপদেশ প্রাপ্ত যে যোগী, সহজের মধ্যে রহে সেই ডুবিয়া।

জরন্ত যোগী রহে স্থির, ঝরিলেই বুঝিতে হইবে ঘট গিয়াছে ফুটিয়া ; হে দাদূ, গুরুর উপদেশ প্রাপ্ত যোগীই কাল হইতে পায় রক্ষা।

জরন্ত যোগী জুগ জুগ রহে জীবন্ত, ঝরিলেই যায় সে মরিয়া। হে দাদূ, গুরুর উপদেশপ্রাপ্ত যোগী সহজের মধ্যেই রহে সমাহিত হইয়া।"

৫। বিশ্বব্যাপী "জরণ"।

জরৈ সো নাথ নিরংজন বাবা জরৈ সো অলখ অভেৱ।
জরৈ সো জোগী সবকা জীৱনী জরৈ সো জগমেঁ দেৱ ॥
জরৈ সো আপ উপাৱনহারা জরৈ সো জগপতি সাঁঈ।
জরৈ সো অলখ অনূপ হৈ জরৈ সো মরনা নাঁহীঁ ॥

জরৈ সো অবিচল রাম হৈ জরৈ সো অমর অলেখ।
জরৈ সো অৱিগতি আপ হৈ জরৈ সো জগমেঁ এক ॥
জরৈ সো অৱিগতি আপ হৈ জরৈ সো অপরংপার।
জরৈ সো অগম অগাধ হৈ জরৈ সো সিরজনহার ॥
জরৈ সো পূরণ ব্রহ্ম হৈ জরৈ সো পূরণহার।
জরৈ সো পূরণ পরমগুরু জরৈ সো প্রাণ হমার ॥
জরৈ সো জোতি সরূপ হৈ জরৈ সো তেজ অনংত।
জরৈ সো ঝিলমিলি নূর হৈ জরৈ সো পুংজ রহংত ॥
জরৈ সো পরম প্রকাস হৈ জরৈ সো পরম উজাস।
জরৈ সো পরম নিৱাস হৈ জরৈ সো পরম বিলাস ॥

"জরন্ত তিনি নাথ নিরঞ্জন বাবা, জরন্ত তিনি অলখ ভেদাতীত এক; জরন্ত সে যোগী সবাকার জীবন-স্বরূপ, জরন্ত তিনি জগতে জগদীশ্বর।

জরন্ত যিনি আপনাকেই করিতেছেন নব নব রূপে প্রকাশ, জরন্ত সেই জগৎপতি স্বামী; জরন্ত তিনি যিনি অলখ অনুপম, জরন্ত যাঁর নাই মরণ।

জরন্ত তিনি যিনি অবিচল ভগবান, জরন্ত তিনি অমর অবর্ণনীয়; জরন্ত যিনি সকলের অতীত আত্মস্বরূপ, জরন্ত তিনি যিনি জগতে একমাত্র।

জরন্ত আপনি সেই পরমাত্মা যিনি সকলের অতীত, জরন্ত যিনি অসীম-অপার; জরন্ত যিনি অগম্য অগাধ, জরন্ত তিনি যিনি করিয়াছেন সৃষ্টি।

জরন্ত তিনি যিনি পূরণ ব্রহ্ম, জরন্ত তিনি যিনি পূরণকর্ত্তা; জরন্ত তিনি যিনি পূর্ণ পরমগুরু, জরন্ত সে আমার প্রাণ।

জরন্ত তিনি যিনি জ্যোতিস্বরূপ, জরন্ত তিনি যিনি অনন্ত তেজ; জরন্ত তিনি যিনি কম্পমান আলোকরূপে (সর্ব্ব দিকে) দীপ্যমান, জরন্ত তিনি যিনি সংহত জ্যোতিরূপে মূলাধার আদি হেতু হইয়া বর্ত্তমান।

জরন্ত তিনি যিনি পরমপ্রকাশ, জরন্ত তিনি যিনি পরমা দীপ্তি; জরন্ত তিনি যিনি পরম নিবাস, জরন্ত তিনি যিনি পরম বিলাস।"

৬ঃ বিশ্ব-রস ভরপূর পান করিলাম ঃ

পৱনা পাণী সব পিয়া ধরতী অরু আকাস।
চংদ সূর পাৱক মিলে পংচৌ এক গরাস ॥

চৌদহ তীনূঁ্য লোক সব ঠূঁগে সাসৈ সাস।
দাদূ সাধূ সব জরৈ সতগুরকে বিশ্বাস॥

“পবন জল সব আমি করিলাম পান ; ধরিত্রী আকাশ, চন্দ্র, সূর্য্য, পাবক মিলিয়া পাঁচটাই হইল আমার একটি গ্রাস।

চৌদ্দ লোক তিন ভুবন সকল লোক প্রতি শ্বাসে শ্বাসে (আমার ভিতরে) আমি লইতেছি ভরিয়া ভরিয়া, হে দাদূ, সাধকেরা সবাই যে জরন্ত! ভরসা এক সদ্‌গুরুর।”

পঞ্চম প্রকরণ—পরিচয়

(দ্বিতীয় অঙ্গ—“পরচা” (পরিচয়)

সাধনার “সুমিরণ” অঙ্গের সঙ্গে এই অঙ্গের অনেক পরিমাণে যোগ আছে। “সুমিরণে” হইল প্রয়াস এবং “পরিচয়ে” হইল সেই প্রয়াসের ফল। “সুমিরণ” অঙ্গের ১২শ, ১৩শ, ১৪শ, ১৫শ বাণী অনেকে “পরচা” অঙ্গেরই বাণী মনে করেন। আবার এই অঙ্গের ২১শ বাণী অনেকে “সুমিরণ” অঙ্গের অন্তর্গত মনে করেন।

এই অঙ্গট অতিশয় বৃহৎ। ব্রহ্ম স্বরূপের পরিচয় অতিশয় গভীর তত্ত্ব, কাজেই এই অঙ্গটিকে একটু বিস্তৃত করিয়া বলিতে হইয়াছে।

ব্রহ্মের দুই স্বরূপ। তিনি যেখানে আত্মস্বরূপে “তেজ পুংজ” অর্থাৎ সংহত জ্যোতি হইয়া বিরাজ করেন সেখানে তিনি বাক্য মন ইন্দ্রিয়ের অতীত। আবার যখন সেই পরিচয়ের অতীত “পুংজতেজ” প্রকাশের জন্য বাহিরে “ঝিলমিল” হইয়া চঞ্চল জ্যোতি ধারারূপে পড়ে ঝরিয়া তখন তাহা হইতেই হয় নানা রূপ ও আকারের উৎপত্তি। ইহাই হইল ব্রহ্মের প্রকাশস্বরূপ। এই স্বরূপেই হয় পরিচয়। আত্মস্বরূপ হইল সকল পরিচয়ের অতীত। সেখানে কেবল আপন আত্মাকে ডুবাইয়া দিয়া ব্রহ্মের মধ্যে সমাহিত হইয়া থাকা যায়। সেই সমাহিত মিলনের রসই হইল “এক রস”। এক রসের স্বরূপ ও আনন্দ বর্ণনা করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া কোনো মতেই সম্ভব নহে।

অসীম যখন সীমার মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করিতে চাহেন তখন তাঁর

অসীম স্বরূপের ভার সীমা আর ধারণ করিতে পারে না। তাই অসীম অরূপের প্রকাশের ভারে রূপের পর রূপ চলিয়াছে চূর্ণ চূর্ণ হইয়া।

আপন পরিচয় মিটাইয়া দিলে তবে তাঁর পরিচয় মিলিবে। দিবস আপনাকে আলোকে আলোকিত রাখে তাই সে অনন্তকে প্রকাশ করিতে পারে না। যেই রাত্রি আপনার আলোকটি নিবাইয়া দেয় তখনি আকাশ ভরিয়া গ্রহ তারকার অসীম লোক হয় প্রকাশিত।

সৃষ্টির মধ্যে তিনি আপনাকে দান করিয়া নিজেকে মিটাইয়া ফেলিয়া আছেন শূন্য হইয়া। সাধক যদি তাঁকে ধরিতে চায় তবে নিজেকে সেবায় নিঃশেষে দান করিতে হইবে। সাধককেও শূন্য হইয়াই সেই পরম শূন্যকে ধরিতে হইবে। শূন্য হইয়া শূন্যকে ধরাই সহজ। শূন্য সহজ তত্ত্বে এই সব আলোচনা আছে। সেবায় পরিপূর্ণ বিসর্জ্জন করিয়া নিজেকে ফুরাইয়া ফেলা যদি সহজ না মনে কর, তবে আর উপায় নাই। তাহাই আপনাকে মিটাইয়া ফেলিবার একমাত্র পথ। নিজেকে যদি নিজে শূন্য করিতে না পার, তবে মৃত্যু আসিয়া শূন্য করিবে, শেষ করিবে। তাহাই হইল "মহতী বিনষ্টিঃ"। "জীবত মৃতক" অঙ্গে এই তত্ত্বটি ভাল করিয়া বুঝান হইয়াছে।

বাহিরের জ্যোতিটুকু নিবাইয়া দিলেই সেই পরম জ্যোতির রহস্যটি ধরা পড়ে। তাই রজ্জব বলিলেন, "বাহরা জোত বুঝায়কে ভেদী পাবৈ ভেদ"। এই সংসার হইতে বিদায় লইবার পূর্ব্বে তাঁহাকে উপলব্ধি করিয়া যাইতেই হইবে, নহিলে বৃথা এই জীবন।

প্রত্যক্ষ-"অনুভব" যতদূর গভীর তত্ত্বের মধ্যে লইয়া যাইতে পারে ততখানি গভীরে বেদ কোরাণাদি শাস্ত্রের পৌছিবার সাধ্য নাই। "অনুভবই" গুরুর মত সেখানে সঙ্গে করিয়া লইয়া যায়, এবং অনুভবই হইল ব্রহ্মের বাণী। কাজেই ইহাই মন্ত্র ইহাই গুরু। এই "অনুভব" জীবনে উপজিলে সকল কর্ম্ম-বন্ধন আপনি যায় খসিয়া। "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে"। ইহা তো হইল নিষেধাত্মক ফলের কথা, কিন্তু অনুভবের ভাবাত্মক শক্তিও অপরিসীম। এই অনুভব হইলে সব রূপ সব আকার হইয়া যায় অমৃতে পরিণত।

যাহার আছে সেই পাইবে। যোগ্য না হইলে সে যোগ লাভ করিবে না।

রসের মধ্যেই রসের হয় বর্ষণ (Parable of Talents)। জ্যোতির্ম্ময় না হইলে পরম জ্যোতির্ম্ময়ের সঙ্গে হয় না মিলন। যোগ দুইকে এক করে, কিন্তু দুইয়ের মধ্যেও একটি সমরূপতা থাকা চাই। তাহাই যোগ্যতা। যোগ্যতা দ্বৈতের মধ্যেও অদ্বৈত তত্ত্ব (১১শ বাণী দেখ)। একান্ত অনৈক্য যেখানে সেখানে কিছুতেই মিলন হয় না। ব্রহ্মের সঙ্গে মানবের এক রকম নিগূঢ় মিলও আছে, যদিও তাহারা বিভিন্ন। এই ঐক্যটুকু না থাকিলে মিলন একেবারেই অসম্ভব হইত। প্রেমেরও স্বরূপ কহিতে গিয়া তাই সাধকেরা বলিয়াছেন—"দ্বৈতের মধ্যে যে অনুপম অদ্বৈত তাহাই প্রেম।"

বাণীর মূল হইল জ্ঞানে, সঙ্গীতের মূল হইল অনুভবে। তনু মনের মূলস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে উঠিতেছে যে ওঁকার, তাহাই প্রকাশ, তাহাই সৃষ্টি।

অনুভবের রসে যদি মাতাল হইতে পার তবে সব দ্বৈত আপনিই যাইবে মিটিয়া। আনন্দের এই অসীমতার মধ্যে ডুবিয়া যাওয়াই চাই। এই আনন্দে যে মাতাল হইয়াছে তাহার জাতি কুল সমাজের সব বাঁধন হইয়া যায় মুক্ত। আসলে মুক্তি একটা শূন্য অবস্থা নয়। ফল পাকিলে রসে ভরিলে যেমন আপনিই গাছ হইতে মুক্তি হয় তেমনি সাধকের আনন্দরস পূর্ণ হইলে ব্রহ্মের তৃপ্তি হইবে ও সাধকের মুক্তি আপনিই হইবে।

১। সেই অসীমের প্রকাশ কি রকম? সেই অনন্তের প্রকাশের তো কোনো কুল কিনারা নাই, অমূল্য নিধি সেই ভগবান। যদিও বস্তুমাত্রের মধ্যেই সীমা ও খণ্ডতা আছে কিন্তু তাঁহার প্রকাশের মধ্যে কোনো খণ্ডতা বা জোড়াতাড়া নাই, তাহা অপার অখণ্ড "নিরসন্ধি" প্রকাশ। নিখিল খণ্ডতার মধ্যে তিনি অনন্ত "সংহত তেজ" হইয়া বিরাজমান। "তেজপুংজ" রূপে তাঁর আর নাই আগে পিছে, নাই আদি অন্ত। এই অনন্ত "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ভরপূর স্বরূপকে প্রকাশ করিতে গিয়া রূপের পর রূপ যাইতেছে চূর্ণ চূর্ণ হইয়া। অনন্তের অসীম আনন্দকে কোনো সসীম রূপই ধারণ করিয়া পারিতেছে না টিকিয়া থাকিতে। ইহাকে "মায়া ক্ষণিকতা" প্রভৃতি বলিয়া গালি দিলে চলিবে কেন? ইহাতেই প্রকাশপ্রার্থী অসীমের অপরিসীম লীলা রহস্য পড়িতেছে ধরা। কোনো রূপই সেই অরূপের ভার সহিতে পারিতেছে না। অসীম আনন্দে রূপের পর রূপ চলিয়াছে চূর্ণ হইয়া। রূপের তরঙ্গের পর তরঙ্গে উচ্ছ্বসিত

হইয়া উঠিতেছে এই অপরূপ আনন্দ-সাগর। এই আনন্দসাগরের তরঙ্গের উপরই দাদূ হংস হইয়া করিতেছে খেলা।

২। তিনি সকল ঘটে সকল রূপ ও আকারে আপনাকে নিঃশেষে দান করিয়া নিরঞ্জন হইয়া শূন্য হইয়া আনন্দে করিতেছেন বিহার। আপনার ঐশ্বর্য্য, আপনার স্বরূপের ভার তিনি কোথাও জমাইয়া রাখেন নাই। সব ঠাঁই নিজেকে বিতরণ করিয়া তিনি আছেন সহজ হইয়া শূন্য হইয়া। তাই তিনি সদাই মুক্ত, কোনো গুণ তাঁহাকে বাঁধিতে পারে নাই।

ইনি প্রেমে আপনাকে নিঃশেষে দান করিয়া শূন্য নিরঞ্জন হইয়া খেলিতেছেন প্রেমের সব লুটাইয়া দিবার খেলা। যদি ইঁহার এই প্রেম-খেলায় যোগ দিতে চাও, তবে আপন সাংসারিকতায়, নিজ ঐশ্বর্য্যে, নিজ সঞ্চয়ের মধ্যে, পুঞ্জীভূত সংস্কারে আচারে বিচারে, দাও আগুন লাগাইয়া। আপনাকে সকলের মধ্যে বিসর্জ্জন দিয়া, "নাহি" হইয়া, আপনার সব পরিচয় ও অভিমান ফেলিয়া দিয়া হও শূন্য; শূন্য যদি হইতে পার তবেই শূন্যকে পারিবে ধরিতে, তাঁহার সঙ্গে পারিবে প্রেমের খেলা খেলিতে।

৩। আপনাকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিয়া শূন্য হওয়া কঠিন। কিন্তু তাহা না হইলে তাঁহাকে দেখাও অসম্ভব। তাঁহাকে দেখিতেই হইবে। জাগরণে শয়নে সর্ব্বতোভাবে তাঁহাকে দেখাই তো জীবনের পরমানন্দ। তিনিও আমার এই আনন্দের সহায়। আমার সাথী হইয়া তিনি সদা আমার আছেন সাথে, নয়নে বচনে হৃদয়ে সর্ব্বত্র আছেন আমার মধ্যে, বিশ্বের সর্ব্ব দিক আপন প্রকাশে আছেন ভরপূর করিয়া, ইহাই তো পরমানন্দ।

সেই ইন্দ্রিয়াতীত "তেজঃপুঞ্জ" স্বরূপই চঞ্চল জ্যোতির্ম্ময় প্রকাশের ধারায় ঝিল মিল করিয়া পড়িতেছে ঝরিয়া। ইহাই তো অমৃতের নির্ঝর, এই রস পান কর। আকাশের অমৃত বল্লী হইতে নিরন্তর এই অমৃতের রস ঝরিতেছে। সেই প্রকাশের মধ্যে সেই রসের সাগরে আমার নয়ন ডুবিয়া গিয়াছে। নিশি দিন তাঁহার রূপ দেখিতেছি। নয়নেও দেখি তিনি অন্তরেও দেখি তিনি। অরূপ তেজঃপুঞ্জ তিনি প্রকাশের অমৃত নির্ঝর হইয়া ঝিলমিল ঝিলমিল করিয়া ঝরিতেছেন। এই নির্ঝরে ডুবিয়াই আমি অরূপের রূপ-অমৃত পান করিয়াছি।*

---

* এই বাণীটির ও পরচা অঙ্গের আরও কয়েকটি বাণীর দেহতত্ত্ব দিয়াও অর্থ হয়। এবং অনেক সাধক সেই অর্থ ছাড়া অন্য অর্থ করিতে চাহেন না।

৪। অসীম অখণ্ড তিনি আপনার স্বরূপকে প্রকাশের ঝরণায় দিয়াছেন ঝরাইয়া। সেই ঝরণা দিয়াই বিশ্বের সব প্রকাশ চলিয়াছে ঝরিয়া। ঝরণা এক স্থানে জমিয়া যেমন সরোবর হয়, তাঁর প্রকাশের ঝরণা তেমনি বিশ্ব চরাচরে জমিয়া হইয়াছে ব্রহ্মাণ্ড সরোবর। তিনি আপনাকে শূন্য সহজ করিয়া ঝরাইয়া দিয়াছেন বলিয়াই বিশ্ব সরোবর উঠিয়াছে ভরিয়া। ইহার অগাধ জলে হংস (সাধক) করেন বিহার। ভগবানও পরমহংস (পরম সাধক) হইয়া নাচিতেছেন ইহারই তরঙ্গের দোলায়। হংস ও পরমহংস দুইই তরঙ্গে তরঙ্গে নাচিতেছে, এই তো অনুপম রসের দোল লীলা।

৫। লোকের কথায় ভাবিয়াছিলাম না জানি কত খুঁজিয়া কত দূরে কোন দুর্ল্লভ ধামে প্রিয়তমকে হইবে পাইতে। এখন দেখিতেছি তিনি ছাড়া কোথাও কিছুই নাই। সর্ব্বত্রই তিনি। ভিতরেও তিনি বাহিরেও তিনি, কোনো দিকে তিনি ছাড়া আর কিছুই নাই। সব কিছুকে ভরপূর ঠাসিয়া ভরিয়া প্রত্যেক রূপের মধ্যেই দয়াময় করিতেছেন বিহার। সকল দিকে তিনিই সব স্থান দখল করিয়া আছেন ভরিয়া, আর কারও জন্য এক তিলমাত্র স্থান নাই। তিনি ছাড়া আর কিছুই নাই। না আছে তনু, না আছে মন, না আছে মায়া না আছে জীব, না আছি আমি; একমাত্র তিনিই দশ দিক ঠাসিয়া পূর্ণ করিয়া বিরাজমান। এমন করিয়া যে তাঁহাকে দেখিয়াছি ইহাই যোগ। আর কোনো যোগ নাই।

৬। তিনি কামধেনু, আমি তাঁহার বৎস। তাঁর দুগ্ধ স্রাব আমারই জন্য। আমার দিকে চাহিয়া তাঁর স্নেহ দুগ্ধরূপে ঝরে। এই দুগ্ধ পান করিলেই আমি কৃতার্থ। তিনি কল্পবৃক্ষ, প্রাণের তরু; প্রেম তাহার মূল, ব্রহ্মানন্দ তার ফল। ইহার রস যে পান করে সে নিত্য জীবন পায়।

৭। ব্রহ্ম রস দিনে দিনে পান করি আর আনন্দ বাড়িতে থাকে আর দিনে দিনে আমি যেন বিকশিত হইতে থাকি। এই রস পানেরও অন্ত নাই (১৭, ২৩, ২৪ বাণী, পরচা অঙ্গ, দেখ), আর আমার বিকাশেরও অন্ত নাই। তাঁহাকে দেখিয়া দেখিয়াই জপ ধ্যান সমাধি করিব, তবে তো জীবন্ত সাধনা! তাঁহাকে দেখিয়া দেখিয়াই আনন্দ প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে করিতে রস লাভ করিব, তাঁহার সঙ্গে যুক্ত হইব; তবেই জীবন হইবে আনন্দময়।

৮। তাঁহাকে সাক্ষাৎ অনুভব না করিলে আনন্দ কোথায়? তাঁহাকে অনুভব করিয়াই সব ভয় হইতে মুক্ত হইয়া নিশ্চল নির্ম্মল নির্ব্বাণ পদ লাভ করি।

অগম্য তিনি অনুভবের মধ্য দিয়াই তাঁর বাণী আমার মধ্যে প্রেরণ করেন। এই বাণীই আমাকে তাঁহার কাছে লইয়া যায়, অতএব ইহাই সিদ্ধ মন্ত্র। ইহাই গুরুর মত তাঁহার কাছে পৌছায়, শাস্ত্র যে অগম্য অনির্ব্বচনীয় তত্ত্ব পারে না কহিতে, অনুভব তাহা অনায়াসে পারে বলিতে। অনুভব হইলেই কর্ম্মের সর্ব্ববিধ বন্ধন যায় দূর হইয়া। ভগবানের আনন্দ প্রত্যক্ষ হইলে সকল কায়াও হইয়া যায় অমৃতময়। কাজেই অনুভবই হইল মন্ত্র, শাস্ত্র, গুরু, সাধনা ও মুক্তি। এই ব্রহ্মানুভবই হইল সার সত্য।

৯। কেবল জড়তার জন্য আমরা আমাদের অন্তরের ঐশ্বর্য্য প্রত্যক্ষ করিতে পারি না, জড়তা ত্যাগ করা মাত্রই দেখি অন্তরেই প্রিয়তম প্রেমময় আপন প্রেম মন্দিরে বিরাজমান, ভগবান তাঁহার সিংহাসনে অন্তরেই বিরাজিত। আত্মার জ্যোতির্ম্ময় ধামে ভগবানকে দেখিতে পাই, যদি প্রাণ প্রেমে সিক্ত থাকে। সেইখানেই ভগবানের কাছে প্রণতি করিতে পারিলে জীবন হয় ধন্য।

১০। মৃন্ময় ও চিন্ময় হৃদয়ের এই দুই স্বরূপ। মৃন্ময় হৃদয় মাটীর জগতে সংসারী লইয়াই আছে, তার দেখিবার শক্তি নাই। নয়নে এমন আলো তাহার নাই যে সম্মুখে সে দেখিতে পারে। চিন্ময় জ্যোতির্ম্ময় হৃদয়ই ভগবানকে পায় দেখিতে, তার অন্তরে ভগবান বিরাজমান। এই দ্বৈত আরও অনেক ক্ষেত্রে আছে। প্রাণ পাশবও হয় মানবও হয়; পাশবকে মানব করিতে হইবে ইহাই সাধনা। মিথ্যাকে সত্য করিলে, অনীতিকে নীতি করিলে মন্দকে ভালো করিলেই সাধনা হয় পূরা। আমাদের মধ্যেই এই সব দ্বৈত আছে বলিয়াই জগতে সাধনার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

১১। তিনি জ্যোতির্ম্ময় স্বামী, জ্যোতির্ম্ময় না হইলে স্বামীর সঙ্গে বধূর মিলন হইবে না। জ্যোতির্ম্ময় ক্ষেত্রেই হইবে মিলন। পরব্রহ্ম হইতে যে জ্যোতির্ম্ময় প্রকাশের নির্ঝরধারা ঝরিতেছে তাহাই সাধকেরা করেন পান।

রসেই হয় রসের বর্ষণ। নীরস ক্ষেত্রে রস বর্ষণের কোনো সম্ভাবনা নাই। রস ধারার নীচে মনকে নিশ্চল কুম্ভের মত রাখিয়া কাজ কর্ম্ম কর, তোমার

কাজও চলিতে থাকবে আর ধীরে ধীরে তোমার মনও দিনে দিনে ভরিয়া উঠিতে থাকিবে।

১২। অন্তরের মধ্যে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া যে কাজ করিবে তাহাই হইবে যথার্থ সেবা। নহিলে যন্ত্রের মত প্রাণহীন শত প্রযত্ন করিলেও সে সব ব্যর্থ। অন্তরে দেবতা থাকিতে কেন বাহ্য প্রয়াসে আপনাকে ব্যর্থ কর? অন্তরেই সদ্‌গুরু বিরাজমান, তাঁর সেবা কর? বিশ্বদেবতা নিত্যকাল নিখিল মানবের হৃদয় সিংহাসনে বিরাজিত, সকল দেশের সকল যুগের সকল সাধকের সাধনা অগণিত আরতি-প্রদীপের মত তাঁহার চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাঁহার বিশ্বারতিকে পূর্ণ করিতেছে।

১৩। ভক্তি বাহিরে নহে, অন্তরে। অন্তরের মধ্যে শ্রবণ করিয়া পরমাত্মার সঙ্গীতের সুরে তোমার সুর লও বাঁধিয়া। তাঁহার মন, চিত্ত, সহজ, জ্ঞান, দৃষ্টি, ধ্যান, ভক্তি, প্রেম প্রভৃতির সঙ্গে তোমারও সে সব এক সুরে লও বাঁধিয়া।

১৪। সেই সেবাই তো পরিপূর্ণ সেবা যাহাতে সেবাই দেখিতে পাই, সেবককে দেখি না। মূলই তো নিরন্তর সাধনা করিয়া বৃক্ষের ফল, পুষ্প, পল্লব, কাণ্ড, শাখাকে জীবন্ত করিয়া রাখিয়াছে, অথচ সেই মূলকেই যায় না দেখা! মাটির নীচে নিভৃতে নিরন্তর যে করিতেছে সে সাধনা।

ভগবানও তেমনি এমন ভরপূর সেবা এই বিশ্বজগতে করিয়াছেন যে তাঁহাকে দেখাই যায় না, অথচ তাঁর সেবাই সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষ। তিনি এমন আশ্চর্য্য সেবক যে আমরা ইচ্ছা করিলে ইহাও বলিতে পারি যে তিনি নাই। নাস্তিকতা যে সম্ভব হইয়াছে তাহাতেই তাঁহার সেবার পূর্ণতার পরিচয়! তাঁর এই পরিপূর্ণ সেবার সাধনাটি শিখিয়া লইবে কি? তাঁর কাছে এমন সাধনার উপদেশই চাও। আমরা যে সেবাকে ফেলিয়া দিয়া নিজকেই জাহির করিতে চাই, এই দোষ দূর হইবে কবে?

সেবা করিয়াই তাঁর আনন্দ। সেই সেবার অখণ্ড রসের আনন্দ আমরাও কবে লাভ করিব? তাঁর সমান, তাঁর "সরীখা" হইয়াই সেবা করিব, তবে সেবানন্দ এবং তাঁর নিত্য সাহচর্য্যের মহানন্দ করিব লাভ।

তুমি ক্ষুদ্র বলিয়া ভয় পাইও না। যেমন তোমার শক্তি, ঠিক তেমন সেবা কর। কোথাও ফাঁকি দিও না; তবেই তোমার সেবা সত্য হইল।

সেবা দ্বারাই সেই মহাসেবককে বশ করিবে। সর্ব্বস্ব দিয়া যদি সেবা করিতে পার তবে সেই দৈন্যই তোমার মহৈশ্বর্য্য হইবে, কারণ চরাচরের অধীশ্বর তবে তোমারই দরবারে হাজির থাকিয়া তোমার সেবা করিবেন।

১৫। সাধক যেমন তাঁহাকে পাইয়া পূর্ণ হয়, তিনিও তেমন সাধককে পাইয়াই পূর্ণ। নহিলে প্রেমময় যে থাকেন অপূর্ণ। যদি আপনাকে বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহার হইয়া যাও তবে বিশ্বচরাচর ভগবানের সব কিছুই হইবে তোমার আপনার।

মানবের সব তুচ্ছতা সব দৈন্য তাঁর যোগে হইবে ঐশ্বর্য্যময়। মিশ্রীর মধ্যে যে বাঁশের কাঠি থাকে সেও মিশ্রীর সঙ্গে এক মূল্যেই বিকায়।

১৬। আমি ক্ষুদ্র তিনি অসীম, তবে এমন অসমান ক্ষেত্রে মিলন হইবে কেমন করিয়া? অযোগ্য তো যোগ লাভ করে না, তবে ক্ষুদ্র আমি তাঁকে কেমন করিয়া পাই?

আমি ক্ষুদ্র হইলেও আমার প্রেম ক্ষুদ্র নয়। প্রেম ও ভক্তি যে অসীম। এই প্রেমে আমি সেই অসীমেরই সমান। তাই প্রেম দিয়াই তাঁহাকে পাইব। জ্ঞান ও কর্ম্ম অসীম নহে বলিয়াই সেই পথে তাঁকে কখনো এমন করিয়া পাইতে পারি না।

১৭। একা আমার সাধনাতেই যদি মিলন হইবার হইত তবে মিলন ছিল অসম্ভব। তিনিও যে আমাকে চাহেন। এই চরাচরই তো তাঁর সাধনা। এই সাধনা দিয়া তিনি চাহেন আমাকে পাইতে। তাই আমি যখনই সাধন করিতে যাইব অমনি নিখিল সাধনা আমার অনুকূল হইবে।

তিনিও আমাকে চাহেন বলিয়াই তিনি আমার অন্তরের এত প্রিয়। নহিলে যদি আমিই তাঁহাকে চাহিতাম আর তিনি না চাহিতেন তবে কি আমার সকল প্রাণ সকল ইন্দ্রিয় তাঁকে সর্ব্বভাবে নিঃশেষে চাহিত লাভ করিতে? তাই তাঁহার প্রেমরস পানে কখনই হয় না অরুচি।

১৮। খুঁজিলেই অন্তরের মধ্যে তাঁকে পাইবে। একবার দয়াময়ের সঙ্গে মিলিলেই সব বাধা যায় হইয়া দূর, প্রেম যোগের পথে মুক্তি একেবারে অনায়াসেই হয় লাভ।

১৯। তাঁর সঙ্গে প্রেমের এমন খেলা খেলিব যে সে খেলার আর অবসান

হইবে না। যুগ যুগ চলিবে "বসন্ত", যুগ যুগ মিলিবে তাঁর দরশন, এ কি কম ভাগ্যের কথা ?

২০। নিগম আগম বেদ যেই প্রেমধামে পৌছায় না সেই ধামে প্রিয়তমের পাইয়াছি নিত্য সঙ্গ। তিন-লোক ভরপূর করিয়া আছেন তিনি, লোকে কেন তাঁকে বলে দূরে ? সেবক ও স্বামী, সাধক ও মহাসাধক আজ মিলিয়াছে। এখন নিত্যকাল চলিবে আনন্দের মিলন।

২১। [এই বাণীটির দেহতত্ত্বের অর্থও আছে] যদি ভ্রমরকে খুঁজিয়া পাইতে হইত তবে কমলের ভাগ্যে আর ভ্রমরের সঙ্গে যোগ সম্ভবই হইত না। আমার হৃদয় কমলের রসের লোভে তিনিও যে ভ্রমর হইয়াছেন, তাই তো সহজেই তাঁহাকে পাইয়াছি। বাউলের গানে আছে—

"হৃদয় কমল চল্‌ছে গো ফুটে কত যুগ ধরি !
তাতে তুমিও বাঁধা আমিও বাঁধা, উপায় কি করি ?
ফোটে ফোটে ফোটে কমল, ফোটার না হয় শেষ,
এই কমলের যে এক মধু, রস যে তার বিশেষ ;
তাই ছেড়ে যেতে লোভী ভ্রমর পার না যে তাই,
তুমিও বাঁধা আমিও বাঁধা মুক্তি কোথাও নাই।" ইত্যাদি

২২। বাণীর মূলে হইল জ্ঞান, আর সঙ্গীতের মূলে হইল অনুভব (feeling এবং আরও কিছু, কারণ অনুভবে সেই "রসানন্দে" তদ্‌ভাব প্রাপ্তিও বুঝায়)। তনুমনের যেখানে মূল সেখানেই হইল ওঁকারের উৎপত্তি।

২৩। পান করিতে করিতে সেই রসের আনন্দে আনন্দময় হইয়া ভুলিবে আপনাকে। তবেই সব দ্বৈত হইবে দূর। তিনিই এই সকল ভেদ-লোপ-করা রসের পেয়ালা ভরিয়া ভরিয়া সেই রস করাইতেছেন পান। এক মুহূর্ত্ত এই রস না হইলে চলে না। মাছ যেমন জল ছাড়া বাঁচে না তেমনি এই রস ছাড়া সাধক বাঁচে না। এই রসে আপনাকে সহজে আনন্দে হারাইয়া ফেলাই হইল যে রসিকের মুক্তি। অন্য কোনো মুক্তি সে মনে করে বালাই।

২৪। প্রেমরস ঝর ঝর করিয়া বহিয়া চলিয়াছে, যে পান করিয়া মাতাল হইল সে কালের হাত এড়াইল। এই রস পান করিয়া এই রসে আপনাকে

বিসর্জ্জন দিতে পারিলে তবেই যথার্থ সার্থকতা, এই রসের আস্বাদ পাইলে কেমন করিয়া নিজেকে বিসর্জ্জন না দিয়া থাকা যায় ?

এই রসে মত্ত হইলে জাতি কুল সমাজের সব বাঁধন, আচার, অনুষ্ঠান, শিক্ষা দীক্ষার সব বাঁধন আপনি যায় খসিয়া। সঙ্কীর্ণ "অহমের" চৈতন্য থাকিতে সহস্র চেষ্টার সাধনায়ও এই বাঁধন ঘোচে না। প্রেমরসে আপনাকে হারাইয়া ফেলাই দেখিতেছি মুক্তির সহজ পন্থা।

২৫। মুক্তি একটা অভাব বস্তু নয় যে আপনাকে শুকাইয়া বঞ্চিত করিয়া জীর্ণ করিয়া, নীরস নিরানন্দ একটা শূন্যতার মধ্যে নিজেকে ফেলিলেই হইবে মুক্তি লাভ। রসে বর্ণে গন্ধে মাধুর্য্যে ফল যখন সহজ পরিণতি লাভ করে তখন সহজেই সে বৃক্ষ হইতে পায় মুক্তি। সাধকও তেমনি আনন্দে রসে সর্ব্ব প্রকার সহজ স্বাভাবিক পরিণতির পথে যদি অগ্রসর হয় তবে এক দিন সে মাধুর্য্যে পূর্ণ হইয়া আপনিও ভরপূর হইবে ভগবানকেও তৃপ্ত করিবে। সে-ই হইল মুক্তি। এই মুক্তি নীরস নহে। রসে, আনন্দে অশেষবিধ পূর্ণতায় এই মুক্তি ভরপূর।

৯। অসীম প্রকাশের স্বরূপ কি ?

দাদূ অলখ অলাহকা কহু কৈসা হৈ নূর।
বেহদ তাকো হদ নহীঁ রূপ রূপ সব চূর॥*
বার পার নহিঁ নূরকা দাদূ তেজ অনংত।
কীমতি নহিঁ করতারকী ঐসা হৈ ভগবংত॥
নিরসন্ধি নূর অপার হৈ তেজপুংজ সব মাহিঁ।
দাদূ জোতি অনংত হৈ আগে পীছে নাহিঁ॥
খংড খংড নিজ না ভয়া ইকলস একই নূর।
জ্যোঁ থা ত্যোঁ হি তেজ হৈ জোতি রহী ভরপূর॥
পরম তেজ পরকাস হৈ পরম নূর নিবাস।
পরম জোতি আনন্দ মেঁ হংসা দাদূ দাস॥

---

* "সকল রহা ভরপূর" পাঠও আছে।

"বল দেখি দাদূ সেই অলখ আল্লার প্রকাশ (প্রভা) কি প্রকার? অসীম তাঁহার কোনো সীমা নাই, রূপের পর রূপ (সেই প্রকাশের ভারে) যায় সব চূর্ণ হইয়া।

কূল কিনারা নাই সেই প্রকাশের, হে দাদূ, অনন্ত সেই তেজ; মূল্য হয় না সেই "করতারের" এমন তিনি ভগবান!

অপার "নিঃসন্ধি" (যার মধ্যে জোড়া তাড়া নাই) সেই প্রকাশ। সকলেরই মাঝে তাহা তেজপুঞ্জ (সংহত তেজ); হে দাদূ, অনন্ত সেই জ্যোতি, তাহার পূর্ব্বে পরে কিছুই নাই।

(এই প্রকাশে) তাঁহার স্বরূপ খণ্ড খণ্ড হয় নাই, বরাবর এক-ভাব এক-রস সেই এক প্রকাশ; যেমন ছিল (সেই স্বরূপ) তেমনই এই প্রকাশ, ভরপূর সেই জ্যোতি বিরাজমান।

পরম তেজ এই প্রকাশ, এখানেই পরম দীপ্তির নিবাস; পরম জ্যোতির আনন্দের মধ্যে দাস দাদূ আছে হংস হইয়া।"

২। সেই পরিচয় চাও তো আপন পরিচয় মিটাইয়া ফেল। শূন্য হইয়া শূন্যকে ধর।

সহজ সূন্ন সব ঠৌর হৈ সব ঘট সবহী মাহিঁ।
তহাঁ নিরংজন রমি রহা কৌই গুণ ব্যাপৈ নাহিঁ॥
খেলা চাহৈ প্রেমরস আলম আগি লগাই।
নাহীঁ হোই করি নাউঁ লে কুছ না আপ কহাঈ॥

"সব ঠাঁইতেই, সর্ব্বঘটে ও সব কিছুতেই, সেই সহজ শূন্য বিরাজমান; সেখানেই নিরঞ্জন করেন বিহার, কোনো গুণেরই সেখানে নাই কোনো একাধিপত্য।

খেলিতে যদি চাও সেই প্রেম রসে, তবে সংসারেতে লাগাও আগুন; কিছু না হইয়া নেও তাঁহার নাম, আপনাকে (সন্ন্যাসী সাধু প্রভৃতি কোনো নামে) কোনো পরিচয়ের দ্বারা করাইও না অভিহিত।"

৩। তাঁহাকে দেখিয়া লও ঃ

জাগত জগপতি দেখিয়ে পূরণ পরমানংদ।
সোরত ভী সাঈঁ মিলৈ দাদূ অতি আনংদ॥
জহঁ তহঁ সাথী সংগ হৈঁ মেরে সদা অনংদ।
নৈন বৈন হিরদৈ রহৈ পূরণ পরমানংদ॥
জ্যোঁ রবি এক আকাস হৈ ঐসে সকল ভরপূর।
দহ দিসি সূরজ দেখিয়ে অল্লা আলে নূর॥
জোতি চমক্কই ঝিলমিলৈ তেজ পুংজ পরকাস।
অমৃত ঝরৈ রস পীজিয়ে অমর বেলি আকাস॥
নৈন হমারে নূরমেঁ সদা রহৈ লব্ব লাই।
দাদূ উস দীদার কোঁ নিস দিন নিরখত জাই॥
নৈনহুঁ আগে দেখিয়ে আতম অংতরি সোই।
তেজ পুংজ সব ভরি রহ্যা ঝিলিমিলি ঝিলিমিলি হোই॥

"জাগিয়া জাগিয়া দেখ জগৎপতিকে, ইহাই পূর্ণ পরম আনন্দ; ঘুমাইয়া ঘুমাইয়াও স্বামীর সঙ্গে হও মিলিত, তাহাও হে দাদূ, অতি আনন্দ।

যেখানে-সেখানে সাথী সঙ্গী হইয়া তিনি আছেন,আমার সদাই এই আনন্দ। নয়নে বচনে হৃদয়ে তিনি বিরাজিত, এই তো পূর্ণ আনন্দ।

যেমন এক রবি (সমগ্র) আকাশে বিরাজিত এমন সকলই (তাঁহাতে) ভরপূব, দশ দিকেই দেখ সেই সূর্য্যকে। পরম জ্যোতি সেই আল্লা।

সেই তেজপুঞ্জের (সংহত জ্যোতির) প্রকাশই চমকাইতেছে কম্পমান ঝিলমিল জ্যোতিরূপে। আকাশই অমৃতবল্লী, অমৃত ঝরিতেছে, সেই রস কর পান।

আমার নয়ন সেই জ্যোতিতে সদাই রহে প্রেমে ডুবিয়া, দাদূ সেই প্রত্যক্ষরূপ নিশিদিন করিয়া চলিয়াছে দর্শন।

নয়নের সম্মুখেও দেখ তিনিই, আত্মার অন্তরেও দেখ তিনিই, তিনিই তেজঃপুঞ্জ হইয়া সব আছেন পূর্ণ করিয়া, ঝিলিমিলি ঝিলিমিলি হইয়া তিনিই সবদিকে জাজ্জ্বল্যমান।"

৪। যোগ সরোবর।

অখংড সরোৱর অথগ জল হংসা সরৱর ন্হাহিঁ।
সুন্ন সরোবর সহজকা হংসা কেলি করাঁহিঁ ॥
দাদূ দরিয়া প্রেমকা তাঁমৈঁ ঝূলৈঁ দোই।
এক আতম এক পরমাতমা অনুপম রস হোই ॥

"অখণ্ড সরোবর, অগাধ জল, হংসেরা সরোবরে করিতেছে স্নান ; শূন্য হইল সহজ (রসের) সরোবর, হংসেরা করে সেথায় কেলি।

হে দাদূ, সেই সমুদ্র প্রেমের, তাহাতে দোল খাইতেছে দুই জনা। এক জনা আত্মা আর এক জনা পরমাত্মা, অনুপম রস (সেই খেলায়)।"

৫। দৃষ্টি যোগ দিয়া দেখ, তিনি ছাড়া কিছু নাই।

দাদূ দেখৌঁ নিজ পীৱ কৌঁ ঔর ন দেখৌঁ কোই।
পূরা দেখৌঁ পীৱকৌঁ বাহরি ভীতরি সোই ॥
দাদূ দেখৌঁ নিজ পীৱ কৌঁ দেখত হী দুখ জাই।
হূঁ তো দেখৌঁ নিজ পীৱকৌঁ সবমেঁ রহ্যা সমাই ॥
দাদূ দেখৌ নিজ পীৱ কৌঁ সোই দেখন জোগ।
পরগট দেখৌঁ পীৱকৌঁ কহাঁ বতাৱৈ লোগ ॥
দাদূ দেখু দয়াল কৌঁ সকল রহ্যা ভরপূর।
রূপ রূপ মৈঁ রমি রহ্যা তূঁ জিনি জানৈ দূর ॥
দাদূ দেখু দয়াল কৌঁ বাহর ভীতর সোই।
সব দিসি দেখৌঁ পীৱ কৌঁ দূসর নাঁহীঁ কোই ॥
দাদূ দেখু দয়াল কৌঁ সনমুখ সাঁঈঁ সার।
জীধর দেখৌঁ নৈন ভরি দীপৈ* সিরজনহার ॥
দাদূ দেখু দয়াল কৌঁ রোকি রহ্যা সব ঠৌর।
ঘট ঘট মেরা সাইয়াঁ তূঁ জিনি জানৈ ঔর ॥

---

* "তীধৱি" পাঠও আছে।

তন মন নাহীঁ মৈঁ নহীঁ নহীঁ মায়া নহীঁ জীব।
দাদূ একৈ দেখিয়ে দহ দিসি মেরা পীব॥

"হে দাদূ, আমি দেখিতেছি নিজ প্রিয়তমকে, আর তো দেখিতেছি না কাহাকেও; ভরপূর দেখিতেছি প্রিয়তমকে, বাহিরে ভিতরে বিরাজিত তিনিই।

হে দাদূ, আমি দেখিতেছি নিজ প্রিয়তমকে, দেখা মাত্রই সব দুঃখ যায় দূরে; আমি তো দেখিলাম প্রিয়তমকে, সব কিছু ও সকলের মধ্যে আছেন তিনি পূর্ণ সমাহিত হইয়া।

হে দাদূ, আমি দেখিতেছি নিজ প্রিয়তমকে, সেই দেখাটাই তো হইল যোগ, প্রত্যক্ষ দেখিতেছি প্রিয়তমকে, আর লোকেরা বলে কিনা তিনি আছেন কোন ঠিকানায়! (দূরে, অনুভবের বাহিরে, সকলের অতীত ঠিকানায় ইত্যাদিতে)।

হে দাদূ, চাহিয়া দেখ্ দয়ালকে, সকল ভরপূর করিয়া তিনিই বিরাজমান; প্রতি রূপে রূপে তিনিই করিতেছেন বিহার, তুই মনে করিস্ না তিনি দূরে।

হে দাদূ, চাহিয়া দেখ্ দয়ালকে, বাহিরে ভিতরে তিনিই বিরাজিত, সকল দিকেই দেখিতেছি প্রিয়তমকে, দ্বিতীয় আর তো কেহই নাই।

হে দাদূ, চাহিয়া দেখ্ দয়ালকে, সম্মুখেই প্রত্যক্ষ স্বামী (জীবনের) সার, যে দিকেই চাহি সে দিকেই নয়ন ভরিয়া দেখি সৃজনকর্ত্তা বিধাতা দীপ্যমান।

হে দাদূ, চাহিয়া দেখ্ দয়ালকে সব ঠাঁই রহিয়াছেন তিনি ঠাসিয়া অধিকার করিয়া (অবরুদ্ধ করিয়া); ঘটে ঘটেই আমার স্বামী, তুই যেন আবার অন্য রকম কিছু মনে না করিস্!

তনু নাই, মন নাই, আমি নাই, নাই মায়া, নাই জীব; হে দাদূ দেখ একমাত্র তিনিই (আছেন) বিরাজিত, দশদিকেই রহিয়াছেন আমার প্রিয়তম।"

৬। তিনি কামধেনু, তিনি কল্পবৃক্ষ।

কামধেনু করতার হৈ অম্রিত সরবৈ সোই।
দাদূ বছরা দূধ কোঁ পীবৈ তো সুখ হোই॥

তরবর সাখা মূল বিন ধর অম্বর ন্যারা।
অবিনাসী আনংদ ফল দাদূ কা প্যারা॥
প্রাণ তরোবর সুরতি জড় ব্রহ্ম ভোমী তা মাহিঁ।
রস পীৱৈ ফূলৈ ফলৈ দাদূ সুখৈ নাহিঁ॥

““করতার” (বিশ্বরচয়িতা) ই কামধেনু, অমৃত নির্ঝর ঝরিতেছে তাঁহা হইতে। দাদূ তাঁর সেই দুধের বৎস, সেই অমৃত পান করিলেই তো হয় আনন্দ।

শাখা বিনা সেই তরুবর, ধরিত্রী আকাশ হইতে সে স্বতন্ত্র; অনন্ত আনন্দ তাহারই ফল, সেই ফলই তো দাদূর প্যারা (প্রিয়)।

প্রাণ সেই তরুবর, প্রেম তাহার মূল, ব্রহ্মই হইলেন তার মধ্যে আধারভূমি; হে দাদূ সেই রস পান করিলে (সাধক নিত্য) থাকে পুষ্পিত ও ফলন্ত হইতে, কখনও সে যায় না শুকাইয়া।”

৭। দরশনের উৎসব।

বিগসি বিগসি দরসন করৈ পুলকি পুলকি রস পান।
মগন গলিত মাতা রহৈ অরস পরস মিলি প্রাণ॥
দেখি দেখি সুমিরণ করৈ দেখি দেখি লৱ লীন।
দেখি দেখি তন মন বিলৈ দেখি দেখি চিত দীন॥
নিরখি নিরখি নিজ নাউঁ লে নিরখি নিরখি রস পীৱ।
নিরখি নিরখি পীৱ কৌ মিলৈ নিরখি নিরখি সুখ জীৱ॥

“বিকশি’ বিকশি’ করিতেছে দরশন। পুলকে পুলকে চলিয়াছে রসপান। সেই রসে মগন হইয়া বিগলিত হইয়া রহিয়াছে মত্ত হইয়া, প্রাণের মধ্যেই চলিয়াছে নিবিড় দর্শন-স্পর্শন।

তাঁহাকে দেখিয়া দেখিয়াই করিতেছি সুমিরণ (জপ), দেখিয়া দেখিয়াই হইতেছি যোগানন্দে লীন, দেখিয়া দেখিয়াই তনু মন হইতেছে বিলীন। দেখিয়া দেখিয়াই চিত্ত হইতেছে দীন।

নিরখি’ নিরখি’ পরমাত্মার লও নাম, নিরখি নিরখি রস কর পান। নিরখি নিরখি গিয়া মেল প্রিয়তমের সঙ্গে, নিরখি’ নিরখি’ আনন্দে হও জীবন্ত।”

৮। অনুভবই জীবন্ত গুরু, শাস্ত্র, ও সাধনা।

অনুভব় তৈঁ আনঁদ ভয়া পায়া নিরভয় নাউঁ ।
নিহচল ন্রিমল ন্রিবান পদ অগম অগোচর ঠাউঁ ॥
অনুভব় বাণী অগম কৌঁ লে গই সংগি লগাই ।
অগহ্ গহৈ অকহ কহৈ ভেদ অভেদ লহাই ॥
জো কুছ বেদ কেরাণ তৈঁ অগম অগোচর বাত ।
সো অনুভব় সাচা কহৈ দাদূ অকহ্ কহাত ॥
দাদূ বাণী ব্রহ্মকী অনুভব় ঘটি পরকাস ।
জব ঘটি অনুভব় উপজৈ কিয়া করমকা নাস ॥
জে কবহূঁ সমঝৈ আতমা তো দৃঢ় গহি রাখৈ মূল ।
দাদূ সেঝা রামরস অমৃত কায়া কূল ॥

"অনুভব হইতেই হইল আনন্দ, নির্ভয় পাইলাম নাম; অনুভবই অগম্য অগোচর ধাম; অনুভবই নিশ্চল, নির্ম্মল, নির্ব্বাণ পদ।

অনুভবই অগম্যের বাণী, (সে) লইয়া গেল (আমাকে) সঙ্গে যুক্ত করিয়া; অনুভবই গ্রহণের অতীতকে করে গ্রহণ, বাক্যের অতীতকে কহে (প্রকাশ করিয়া), ভেদকে দেয় অভেদ করিয়া।

যাহা কিছু বেদ কোরাণেরও অগম্য অগোচর কথা, অনুভবই তাহা বলে সত্য করিয়া; হে দাদূ, অনুভবই বাক্যের অতীতকে পারে কহিতে।

হে দাদূ, ব্রহ্মের যে বাণী, অনুভবের ঘটেই হয় তাহার প্রকাশ (অথবা অনুভবই হইল ঘটে প্রকাশিত ব্রহ্মবাণী)। যখনই ঘটে সেই অনুভব হইল উৎপন্ন অমনি সব করমের করিল বিনাশ।

যদি কখনও কিছু সমঝিয়া থাক তবে দৃঢ় করিয়া মূলকে করিয়া থাক আশ্রয়। হে দাদূ, রামরসের ঝরিতেছে ঝরণা, সকল কায়া হইয়া উঠিয়াছে অমৃতময়।"

৯। হৃদয়ের দীপ্ত কমলের মিলন।

দাদূ গাফিল ছো রতৈঁ আহে মংঝি অলাহ ।
পিরী পাঁণ জো পাণসৈঁ লহৈ সভোঙ্গী সার ॥

দাদূ পস্থ পিরঁনিকে পেহি মংঝি কলূব।
বৈঠৌ আহে বিচমৈঁ পাণ জো মহবূব ॥*
নূরী দিল অরৱাহ কা তহঁা বসৈ মাবূদ।
তহঁ বংদে কী বংদগী জহঁা রহৈ মৌজূদ ॥
নূরী দিল অরৱাহ কা তহঁ খালিক ভরপূর।
আলী নূর অলাহ কা খিদমদগার হজুর ॥
নূরী দিল অরৱাহ কা তহঁ দেখ্যা করতার।
তহঁ সেৱক সেৱা করৈ অনঁত কলা রৱি সার ॥
তেজ কমল দিল নূরকা তহঁা রাম রহিমান।
তহঁ কর সেৱা বংদগী জো তূঁ চতুর সয়ান ॥
তহঁ হজুরী বংদগী তহঁা নিরংজন সোই।
তহঁা দাদূ সিজদা করৈ জহঁা ন দেখৈ কোই ॥
হৌদ হজূরী দিলহী ভীতরি গুসল হমারা সার।
উজু সাজি অল্লহকে আগৈ তহঁা নিমাজ গুজার ॥

"হে দাদূ, কেন অচেতন হইয়া বেড়াও ঘুরিয়া ? আল্লা আছেন তোমারই অন্তরের মাঝে। আপনার স্বামী যে আছেন আপনারই মধ্যে, আপনিই তিনি লইতেছেন সর্ব্ব স্বাদ।

চাহিয়া দেখ তোমার পরমেশ্বর, অন্তরের মাঝে হৃদয়-মন্দিরেই বিরাজিত প্রিয়তম! আপন প্রিয়তম যে অন্তরের মধ্যেই, সেখানেই আসিয়া বস।

অধ্যাত্ম হৃদয় হইল জ্যোতির্ম্ময়, সেখানে পরিপূর্ণ জগন্নাথ বিরাজিত; সেই তো আল্লার পরমতম জ্যোতি; (সাধক) সেই মহাসত্তার সম্মুখে সেবার জন্য সদা হাজির।

অধ্যাত্ম হৃদয় জ্যোতির্ম্ময়, সেখানে দেখিলাম "করতার"; সেইখানে সেবক করে সেবা যেখানে অনন্তকলার সার রবি (প্রভা)।

---

* এই দুইটি বাণীর ভাষা সিন্ধী।

জ্যোতির অন্তরে দীপ্ত কমল, সেখানে দয়াময় ভগবান বিরাজিত, যদি তুই চতুর ও সুবুদ্ধিমান হ'স, তবে সেখানেই কর সেবা প্রণতি।

সেখানেই বিরাজমান প্রভু পরমেশ্বরের প্রতি প্রণতি, সেখানেই বিরাজিত স্বয়ং নিরঞ্জন, সেখানেই দাদূ করে প্রণাম যেখানে কেহই পায় না দেখিতে।

হৃদয়ের মধ্যেই ভাগবত ধারা-সরোবর, সেখানেই আমার আসল স্নান। সেখানেই "উজু" সারিয়া তাঁর কাছে নেমাজ করা চাই উপস্থিত।"

১০। মৃণ্ময় চিন্ময় দুই হৃদয়।

দেহী মাঁহৈ দোই দিল এক খাকী এক নূর।
খাকী দিল সূঝৈ নহীঁ নূরী মংঝি হজূর॥
পহলী প্রাণ পসূ নর কীজৈ ঝূঠ সাচ নিবের।
অনীতি নীতি বুরা ভলা অসুভ সুভমৈঁ ফের॥

"এই দেহের মধ্যেই দুই হৃদয়, এক মৃণ্ময় (ধূলিময়) আর এক জ্যোতির্ম্ময় ; মৃণ্ময় হৃদয় দেখিতে পায় না (অন্ধ), জ্যোতির্ম্ময়ের মধ্যে প্রভু বিরাজমান।

প্রথমে পশুপ্রাণকে কর নরপ্রাণ, মিথ্যাকে করিয়া তোল সত্য। অনীতিকে নীতিতে, মন্দকে ভালতে অশুভকে শুভতে কর পরিবর্ত্তিত।"

১১। যোগ্য হইলে তবে যোগ হয়। যোগই উৎসব।

তেজ পুংজকী সুন্দরী তেজপুংজকা কংত।
তেজপুংজকী মিলন হৈ দাদূ বন্যা বসংত॥
পহুপ প্রেম বরিসৈ সদা হরিজন খেলৈঁ ফাগ।
ঐসা কৌতিগ দেখিয়ে দাদূ মোটে ভাগ॥
অম্রিতধারা দেখিয়ে পার ব্রহ্ম বরিসংত।
তেজপুংজ ঝিলিমিলি ঝরৈ সাধূ জন পীবংত।
রসহী মেঁ রস বরসিহৈ ধারা কোটি অনংত॥
তহঁ মন নিহচল রাখিয়ে দাদূ সদা বংসত॥
ঘন বাদল বিন বরসিহৈ নীঝর নিরমল ধার।
তহঁ চিত চাতিগ হ্‌বৈ রহ্যা ধনি ধনি পীবনহার॥

"তেজঃপুঞ্জেরই সুন্দরী (এই জীবাত্মা), তেজঃপুঞ্জেরই কান্ত (পরমাত্মা)। তেজঃপুঞ্জে তেজঃপুঞ্জে চলিয়াছে মিলন, হে দাদূ, কি বসন্ত পাইতেছে শোভা!

প্রেমপুষ্পের সদা চলিয়াছে বরিষণ, হরিজন খেলিতেছেন ফাগের খেলা; এমন আনন্দলীলা যে দেখিতেছ, হে দাদূ, তোমার ধন্য ভাগ্য।

চাহিয়া দেখ পরব্রহ্ম বর্ষিতেছেন অমৃতধারা। তেজঃপুঞ্জই চঞ্চল হইয়া ঝরিতেছে ঝিলমিলি করিয়া, সাধকজন করিতেছেন তাহা পান।

রসের মধ্যেই হইবে রসের বর্ষণ, অনন্তকোটিধারায় চলিয়াছে সেই বর্ষণ; সেখানে মন রাখ নিশ্চল করিয়া, হে দাদূ, সদাই তবে বসন্ত।

মেঘ বাদল বিনাই বরষে নির্ঝর নির্ম্মলধারা; সেখানে চিত্ত রহিয়াছে চাতক হইয়া, ধন্য ধন্য সে যে ইহা করিতে পারে পান।"

১২। প্রত্যক্ষ আরতি কর অন্তরে। অনন্ত হউক সেই আরতি।

ঘট পরচৈ সেৱা করৈ পরতখ দেখৈ দেৱ।
অৱিনাসী দরসন করৈ দাদূ পূরী সেৱ॥
পূজনহারে পাস হৈঁ দেহী মাঁহৈঁ দেৱ।
দাদূ তাকৌঁ ছাড়ি করি বাহর মাঁড়ী সেৱ॥
মাঁহৈঁ কীজৈ আরতী মাঁহৈঁ সেৱা হোই।
মাঁহৈঁ সতগুরু সেইয়ে বূঝৈ বিরলা কোই॥
দাদূ অবিচল আরতি জুগ জুগ দেৱ অনংত।
সদা অখংডিত একরস সকল উতারৈঁ সংত॥

"এই ঘটের পরিচয় করিয়া যদি সেবা করে, যদি (ঘটের মধ্যে) দেবতাকে প্রত্যক্ষ দেখে, অবিনাশী ব্রহ্মের যদি দরশন করে, তবে হে দাদূ, পূর্ণ হয় সেবা।

ওরে পূজক, পাশেই তিনি আছেন, দেহের মধ্যেই দেবতা বিরাজমান; হে দাদূ, তাঁহাকে ছাড়িয়া কিনা বাহিরে করিতে গেল সেবা!

অন্তরের মধ্যেই কর আরতি, অন্তরেই হইবে সেবা, অন্তরের মধ্যেই সদ্‌গুরুকে কর সেবা, কচিতই কেহ বুঝে এই তত্ত্ব।

হে দাদূ, যুগে যুগে (চলিয়াছে) তাঁর অবিচল আরতি, যুগে যুগে বিরাজমান অনন্ত দেবতা। সদা অখণ্ডিত একরস সেই আরতির, (যুগে যুগে সকল জগতের) সকল সন্ত সাধক মিলিয়া ভগবানের চারিদিকে করিয়া চলিয়াছেন এই আরতি।”

১৩ঃ যথার্থ ভক্তি ও অন্তরেঃ

ভগতি ভগতি সব কোই কহৈ ভগতি ন জানৈ কোই।
দাদূ ভগতি ভগবংতকী দেহ নিরংতর হোই॥
সবদৈঁ সবদ সমাই লে পরমাতম সৌঁ প্রাণ।
য়হু মন মন সৌঁ বাঁধি লে চিত্তৈঁ চিত্ত সুজাণ॥
সহজৈঁ সহজ সমাই লে জ্ঞানৈঁ বঁধ্যা জ্ঞান।
মর্মৈঁ মর্ম সমাই লে ধ্যানৈঁ বঁধ্যা ধ্যান॥
দৃষ্টৈঁ দৃষ্টি সমাই লে সুরতৈঁ সুরতি সমাই
সমঝৈঁ সমঝ সমাই লে লৈ সৌঁ লৈ লে লাই॥
ভারৈঁ ভার সমাই লে ভগতৈঁ ভগতি সমান।
প্রেমৈঁ প্রেম সমাই লে প্রীতৈঁ প্রীতি রস পান॥
সুরতৈঁ সুরতি সমাই রহু অরু বৈনহুঁ সৌঁ বৈন।
মনহী সৌঁ মন লাই রহু অরু নৈনহুঁ সৌঁ নৈন॥

“ভক্তি ভক্তি বলে সবাই, অথচ ভক্তি (ভক্তির তত্ত্ব) জানে না কেহই। হে দাদূ, ভগবানের প্রতি ভক্তি নিরন্তর হয় এই দেহের মধ্যেই।

(তাঁহার) ‘সবদেই’ (সঙ্গীতেই) করিয়া নে তোর ‘সবদ’ সমাহিত, পরমাত্মাতেই সমাহিত কর তোর প্রাণ। এই মন (তাঁর) মনের সঙ্গেই নে (এক সুরে) বাঁধিয়া, এই চিত্ত বাঁধিয়া নে সেই চিত্তেরই, সঙ্গে তবে তো বুঝিব তুই রসিক সুজান।

(সেই) সহজেই করিয়া নে (তোর) সহজ সমাহিত, (সেই) জ্ঞানেই সমাহিত কর (তোর) জ্ঞান; (তাঁর) মর্ম্মেই সমাহিত কর তোর মর্ম্ম, (তাঁর) ধ্যানের সঙ্গেই (এক সুরে) বাঁধিয়া নে তোর ধ্যান।

তাঁর দৃষ্টিতে সমাহিত করিয়া নে তোর দৃষ্টি,তাঁর প্রেমধ্যানে সমাহিত করিয়া

নে তোর প্রেমধ্যান। তাঁর সমঝে সমাহিত কর তোর সমঝ, তাঁর লয়ে সমাহিত কর তোর লয়।

(তাঁহার) ভাবেই তোর ভাব করিয়া নে সমাহিত, (তাঁহার) ভক্তিতেই সমাহিত কর তোর ভক্তি, (তাঁর) প্রেমেই প্রেমকে তোর নে সমাহিত করিয়া, তাঁর প্রীতির সঙ্গে প্রীতি মিশাইয়া কর প্রীতি রস পান।

(তাঁর) প্রেমানন্দে থাক (তোমার) প্রেমানন্দ সমাহিত করিয়া, আর (তাঁর) বাণীতে থাক করিয়া (সমাহিত) (তোমার) বাণী; (তাঁর) মনের মধ্যে রহ (তোমার) মন আনিয়া ডুবাইয়া দিয়া, আর তাঁর নয়নে ডুবাইয়া রহ তোমার নয়ন।"

১৪। সেবার রহস্য।

সেৱক বিসরৈ আপকোঁ সেৱা বিসরি ন জাই।
দাদূ পূছৈ রামকোঁ সো তত কহি সমঝাই॥
দাদূ জবলগ রাম হৈ তবলগ সেৱক হোই।
অখংডিত সেৱা একরস দাদূ সেৱক সোই॥
সাঈঁ সরীখা সুমিরণ কীজৈ সাঈঁ সরীখা গাৱৈ।
সাঈঁ সরীখা সেৱা কীজৈ তব সেৱক সুখ পাৱৈ॥
সেৱক সেৱা করি ডরৈ হমতৈঁ কছূ ন হোই।
তূঁ হৈ তৈসী বংদগী করি নহিঁ জানৈ কোই॥
জহঁ সেৱক তহঁ সাহিব বৈঠা সেরক সেৱা মাহিঁ।
দাদূ সাঈঁ সব করৈ কোঈ জানৈ নাহিঁ॥
সেৱক সাঈঁ বস কিয়া সৌঁপ্যা সব পরিবার।
তব সাহিব সেৱা করৈ সেৱক কে দরবার॥

"দাদু জিজ্ঞাসা করেন রামকে, "সেই তত্ত্বটি বল বুঝাইয়া যাহাতে "সেবক আপনাকে ফেলে হারাইয়া অথচ সেবা কিছুতেই হারায় না।"

হে দাদূ, যতক্ষণ রাম আছেন ততক্ষণ সেবক হইয়াই আছেন। অখণ্ডিত সেবায় যাহার এক রস, তাহাকেই হে দাদূ, বলা যায় সেবক।

স্বামীর সাথে সমানে সমান হইয়া (শরীক হইয়া) কর "সুমিরণ", স্বামীর "শরীক" হইয়া কর গান, স্বামীর "শরীক" হইয়া কর সেবা, তবেই তো সেবক পাইবে আনন্দ।

ওরে সেবক, "আমা হইতে কিছুই হইবে না" মনে করিয়া সেবা করিতে তুই পাস্ ভয়? তুই যে আছিস্ ঠিক তেমনতর প্রণতি (বংদগী-সেবা) টুকুই কর, (না হয়) আর কেহই না জানুক, না হয় তুইও আর কিছু না-ই জানিলি।

যেখানে সেবক সেখানেই স্বামী বিরাজমান, সেবার মধ্যেই সেবক সত্য; হে দাদূ, স্বামীই তো করেন সব, কেহই তাহা পারে না বুঝিতে।

সেবক যেই সব-পরিবার স্বামীকে সঁপিল অমনি করিল তাঁহাকে বশ; তখন সেবকের দরবারে (হাজির থাকিয়া) স্বামীই করিতে থাকেন সব সেবা।"

১৫। জীবকে পাইয়া ভগবান ধন্য, ভগবানকে পাইয়া জীব ধন্য।

সাধ সমানা রামমেঁ রাম রহা ভরপূর।
দাদূ দূন্যূঁ এক রস ক্যোঁ করি কীজৈ দূর॥
সেৱক সাঈঁ কা ভয়া তব সেৱককা সব কোই।
সেৱক সাঈঁ কো মিলা সাঈঁ সরীখা হোই॥
মিসিরি মাহৈঁ মেলি করি মোলি বিকানা বংস।
য়োঁ দাদূ মহঁগা ভয়া পারব্রহ্ম মিলি হংস॥

"সাধক যেই ভরপূর ডুবিলেন রামের মধ্যে অমনি রামও উঠিলেন ভরপূর হইয়া, হে দাদূ, দুইই যে এক-রস ("রসে দুই জনই এক"—এই অর্থও হয়), কেমন করিয়া তবে কর দূর?

সেবক যেই হইল স্বামীর আপন, তখন সবাই হইল সেবকের আপনার, স্বামীর সমধর্ম্মা (সরীখ) হইয়াই তো সেবক স্বামীর সঙ্গে পারিল মিলিতে।

মিছরির মধ্যেই মিলিয়া বেশী মূল্যে বিকাইল বাঁশ, এইরূপেই পরব্রহ্মের সঙ্গে মিলিয়া হংস (সাধক) হইল মহামূল্য!"

১৬। ভক্তিতে তাঁর সঙ্গে সমান।

জৈসা রাম অপার হৈ তৈসী ভগতি অগাধ।
ইন দোনোঁকী মিত নহীঁ সকল পুকারৈঁ সাধ॥

জৈসা অবিগত রাম হৈ তৈসী ভগতি অলেখ।
ইন দোনোঁকী মিত নহীঁ সহসমুখীঁ কহে সেখ॥
জৈসা নিরগুণ রাম হৈ ভগতি নিরংজন জানি।
ইন দোনোঁকী মিত নহীঁ সংত কহৈঁ পরৱাণি॥
জৈসা পূরা রাম হৈ পূরণ ভগতি সমান।
ইন দোনোঁকী মিত নহীঁ দাদূ নাহীঁ আন॥

"যেমন অপার আমার রাম, তেমনই অগাধ আমার ভক্তি; এই দুইয়ের মধ্যে (কোথায়ও) নাই টানাটানি (সীমা), সকল সাধুই ইহা উচ্চকণ্ঠে করেন ঘোষণা।

যেমন অবর্ণনীয় আমার রাম, তেমনি "অলেখ" (অবর্ণনীয়) আমার ভক্তি; এই দুইয়ের মধ্যে (কোথাও) নাই টানাটানি, সহস্রমুখে শেষ (অনন্ত) ইহা করেন ঘোষণা।

গুণাতীত যেমন আমার রাম, আমার ভক্তিকেও তেমনি জানিও নিরঞ্জন; এই দুইয়ের মধ্যে (কোথাও) নাই কিছুই টানাটানি, সাধকেরাই কহিবেন ইহার প্রামাণ্যতা।

পরিপূর্ণ যেমন আমার রাম, সমান পূর্ণ (আমার) ভক্তি; এই দুইয়ের মধ্যে (কোথাও) নাই টানাটানি, হে দাদূ, কোথাও ইহার আর নাই অন্যথা।"

১৭। সাধুর রুচি রামের সুমিরণে, রামের রুচি সাধুর সুমিরণে।

রাম জপৈ রুচি সাধুকো সাধু জপৈ রুচি রাম।
দাদূ দোনোঁ এক টগ সম আরংভ সম কাম॥
জৈসে স্রবঁনা দোই হৈঁ ঐসে হোহিঁ অপার।
রামকথারস পীজিয়ে দাদূ বারংবার॥
জৈসে নৈঁনা দোই হৈঁ ঐসে হোহিঁ অনংত।
দাদূ চংদ চকোর জ্যোঁ রস পীরৈ ভগবংত॥
জ্যোঁ রসনা মুখ এক হৈ ঐসে হোহিঁ অনেক।
তৌ রস পীরৈ সেস জ্যোঁ য়োঁ মুখ মীঠা এক॥

জ্যোঁ ঘটি আতম এক হৈ ঐসে হোহিঁ অসংখ।
ভরি ভরি রাখৈ রামরস দাদূ একৈ অংক ॥
দাদূ হরিরস পীৱতাঁ কবহূঁ অরুচি ন হোই।
পীৱত প্যাসা নিত নৱা পীৱনহারা সোই ॥

"সাধুর রুচি রামজপে, রামের রুচি সাধুজপে ; হে দাদূ, এই দুইজনাই এক ভাবের ভাবুক। দুইএরই সম-আরম্ভ দুইজনেরই সম-কাম।

যেমন শ্রবণ মাত্র দুইটিই আছে এমন যদি শ্রবণ হয় অপার, তবে, হে দাদূ, বারম্বার (সর্ব্বশ্রবণে) কেবল রাম-কথা-রসই কর পান।

যেমন নয়ন দুইটিই আছে এখন যদি হয় অনন্ত নয়ন, হে দাদূ, চকোর যেমন চন্দ্রের (রূপ) পান করে, তেমন ভগবানের (রূপ) রস পার পান করিতে।

যেমন একটিমাত্র মুখ একটিমাত্র রসনা এমন যদি অনেক হয় মুখ রসনা তবে হয়তো অনন্ত নাগের মত করা যাইত সেই রস পান, এখন এমনি তো একটিমাত্র মুখই হয় মিঠা।

যেমন একটিমাত্র আত্মার ঘট এমন যদি অসংখ্য হইত আত্মার ঘট। তবে ভরিয়া ভরিয়া রাখা যাইত রামরস, হে দাদূ, একথা নিশ্চয় (এই কথা এক আঁচড়ে লিখিয়া দেওয়া যায়)।

হে দাদূ, হরি রস পান করিতে করিতে কখনই হয় না অরুচি। পান করিতে করিতে নিত্য নূতন হয় যার পিপাসা সে-ই তো হইল পান-রসিক।"

১৮। খুঁজিলেই পাইবে।

খোজি তহাঁ পিৱ পাইয়ে সবদ উপনৈ পাস।
তহাঁ এক একাংত হৈ তহাঁ জোতি পরকাস ॥
খোজি তহাঁ পিৱ পাইয়ে চংদ ন উগৈ সূর।
নীরংতর নিরধার হৈ তেজ রহ্যা ভরপূর ॥
খোজি তহাঁ পিৱ পাইয়ে অজরা অমর উমংগ।
জরা মরণ ভও ভাজসী রাখৈ অপনে সংগ ॥

জব দিল মিলা দয়াল সেঁৗ তব সব পরদা দূর।
ঐসে মিলি একৈ ভয়া অংতর বাহর পূর॥

“(অন্তরের মধ্যে) খুঁজিলেই পাইবে প্রিয়তমকে, তার পাশেই সবদ (সঙ্গীত) হয় উৎসারিত, একমাত্র সেখানেই একেবারে নিভৃত, সেখানেই জ্যোতির প্রকাশ।

খুঁজিলেই সেখানে পাইবে প্রিয়তমকে সেখানে না চন্দ্রের না সূর্য্যের হয় উদয়, সেখানে নিরন্তর নিরাধার ভরপূর হইয়া বিরাজমান সেই জ্যোতি।

খুঁজিলেই সেখানে প্রিয়তমকে পাইবে, সেখানে অজর অমর আনন্দ-উচ্ছ্বাস। যদি আপন সঙ্গে তাঁহাকে রাখিতে পার তবে জরা মরণের ভয় করিবে পলায়ন।

যখন দয়াময়ের (হৃদয়ের) সঙ্গে মিলিল হৃদয় তখন সব পরদা হইয়া গেল দূর, এমন করিয়া (হৃদয়ে হৃদয়ে) মিলিয়া দুই হইয়া গেল এক, অন্তর বাহির হইল পূর্ণ।”*

১৯। প্রিয়তমের সঙ্গে নিত্য খেলা।

রংগ ভরি খেলৌঁ পীর সৌঁ তহঁ বাজৈ বেন রসাল।
অকল পাট পরি বৈঠা স্বামী প্রেম পিলাবৈ লাল॥†
রংগ ভরি খেলৌঁ পীর সৌঁ কবহুঁ ন হোই বিয়োগ।
আদি পুরুষ অংতরি মিল্যা কছু পূরবলে সংজোগ॥
রংগ ভরি খেলৌঁ পীর সৌঁ বারহ মাস বসংত।
সেবগ সদা আনংদ হৈ জুগি জুগি দেখৌঁ কংত॥

“রঙ্গ ভরি খেলিতেছি প্রিয়তমের সঙ্গে, বাজিতেছে রসাল বেণু; অখণ্ড সিংহাসনে উপবিষ্ট প্রেমব্যাকুল স্বামী, প্রিয়তম পান করাইতেছেন প্রেম।

রঙ্গভরি খেলিতেছি প্রিয়তমের সঙ্গে, সে মিলনে কখনও হইবার নহে

---

* “অন্তর বাহর পূর” স্থানে—“বহু দীপক পাবক পূর” পাঠও আছে। তাহার অর্থ হইবে “বহু দীপ যেমন অগ্নিতে দেয় আপনাকে ভরপূর মিশাইয়া।”

† এখানে “লাল” অর্থে প্রিয়তম ও রক্তবর্ণ প্রেম-সুরা উভয় অর্থই ধ্বনিত হয়।

জ্যোঁ ঘটি আতম এক হৈ ঐসে হোহিঁ অসংখ।
ভরি ভরি রাখৈ রামরস দাদূ একৈ অংক ॥
দাদূ হরিরস পীৱতাঁ কবহূঁ অরুচি ন হোই।
পীৱত প্যাসা নিত নৱা পীৱনহারা সোই ॥

"সাধুর রুচি রামজপে, রামের রুচি সাধুজপে ; হে দাদূ, এই দুইজনাই এক ভাবের ভাবুক। দুইএরই সম-আরম্ভ দুইজনেরই সম-কাম।

যেমন শ্রবণ মাত্র দুইটিই আছে এমন যদি শ্রবণ হয় অপার, তবে, হে দাদূ, বারম্বার (সর্ব্বশ্রবণে) কেবল রাম-কথা-রসই কর পান।

যেমন নয়ন দুইটিই আছে এখন যদি হয় অনন্ত নয়ন, হে দাদূ, চকোর যেমন চন্দ্রের (রূপ) পান করে, তেমন ভগবানের (রূপ) রস পার পান করিতে।

যেমন একটিমাত্র মুখ একটিমাত্র রসনা এমন যদি অনেক হয় মুখ রসনা তবে হয়তো অনন্ত নাগের মত করা যাইত সেই রস পান, এখন এমনি তো একটিমাত্র মুখই হয় মিঠা।

যেমন একটিমাত্র আত্মার ঘট এমন যদি অসংখ্য হইত আত্মার ঘট। তবে ভরিয়া ভরিয়া রাখা যাইত রামরস, হে দাদূ, একথা নিশ্চয় (এই কথা এক আঁচড়ে লিখিয়া দেওয়া যায়)।

হে দাদূ, হরি রস পান করিতে করিতে কখনই হয় না অরুচি। পান করিতে করিতে নিত্য নূতন হয় যার পিপাসা সে-ই তো হইল পান-রসিক।"

১৮। খুঁজিলেই পাইবে।

খোজি তহাঁ পিৱ পাইয়ে সবদ উপনৈ পাস।
তহাঁ এক একাংত হৈ তহাঁ জোতি পরকাস ॥
খোজি তহাঁ পিৱ পাইয়ে চংদ ন উগৈ সূর।
নীরংতর নিরধার হৈ তেজ রহ্যা ভরপূর ॥
খোজি তহাঁ পিৱ পাইয়ে অজরা অমর উমংগ।
জরা মরণ ভও ভাজসী রাখৈ অপনে সংগ ॥

জব দিল মিলা দয়াল সৌঁ তব সব পরদা দূর।
ঐসে মিলি একৈ ভয়া অংতর বাহর পূর ॥

"(অন্তরের মধ্যে) খুঁজিলেই পাইবে প্রিয়তমকে, তার পাশেই সবদ (সঙ্গীত) হয় উৎসারিত, একমাত্র সেখানেই একেবারে নিভৃত, সেখানেই জ্যোতির প্রকাশ।

খুঁজিলেই সেখানে পাইবে প্রিয়তমকে সেখানে না চন্দ্রের না সূর্য্যের হয় উদয়, সেখানে নিরন্তর নিরাধার ভরপূর হইয়া বিরাজমান সেই জ্যোতি।

খুঁজিলেই সেখানে প্রিয়তমকে পাইবে, সেখানে অজর অমর আনন্দ-উচ্ছ্বাস। যদি আপন সঙ্গে তাঁহাকে রাখিতে পার তবে জরা মরণের ভয় করিবে পলায়ন।

যখন দয়াময়ের (হৃদয়ের) সঙ্গে মিলিল হৃদয় তখন সব পরদা হইয়া গেল দূর, এমন করিয়া (হৃদয়ে হৃদয়ে) মিলিয়া দুই হইয়া গেল এক, অন্তর বাহির হইল পূর্ণ।"*

১৭। প্রিয়তমের সঙ্গে নিত্য খেলা।

রংগ ভরি খেলৌঁ পীব সৌঁ তহঁ বাজৈ বেন রসাল।
অকল পাট পরি বৈঠা স্বামী প্রেম পিলাবৈ লাল ॥†
রংগ ভরি খেলৌঁ পীব সৌঁ কবহুঁ ন হোই বিয়োগ।
আদি পুরুষ অংতরি মিল্যা কছু পূরবলে সংজোগ ॥
রংগ ভরি খেলৌঁ পীব সৌঁ বারহ মাস বসংত।
সেবগ সদা আনংদ হৈ জুগি জুগি দেখৌঁ কংত ॥

"রঙ্গ ভরি খেলিতেছি প্রিয়তমের সঙ্গে, বাজিতেছে রসাল বেণু; অখণ্ড সিংহাসনে উপবিষ্ট প্রেমব্যাকুল স্বামী, প্রিয়তম পান করাইতেছেন প্রেম।

রঙ্গভরি খেলিতেছি প্রিয়তমের সঙ্গে, সে মিলনে কখনও হইবার নহে

---

* "অন্তর বাহর পূর" স্থানে—"বহু দীপক পাবক পূর" পাঠও আছে। তাহার অর্থ হইবে "বহু দীপ যেমন অগ্নিতে দেয় আপনাকে ভরপূর মিশাইয়া।"

† এখানে "লাল" অর্থে প্রিয়তম ও রক্তবর্ণ প্রেম-সুরা উভয় অর্থই ধ্বনিত হয়।

৬০

বিয়োগ; আদি পুরুষ মিলিলেন আসিয়া অন্তরে, ইহা কিছু প্রাক্তন সৌভাগ্যের সংযোগ।

রঙ্গ ভরি খেলিতেছি প্রিয়তমের সঙ্গে, বারমাসই (সেই লীলারসের) বসন্ত, সেবকের সদাই এই আনন্দ যে যুগ যুগ দেখিতেছি কান্তকে।”

২০। নিরন্তর খেলা।

নীরংতর পিৱ পাইয়াঁ জহঁ নিগম ন পহুঁচৈ বেদ।
তেজ সৱূপী পিৱ বসৈ বিরলা জানৈ ভেদ॥
নীরংতর পিৱ পাইয়াঁ তীনি লোক ভরপূরী।
সব সৌঁ জো সাঈঁ বসৈ* লোক বতাৱৈ দূরি॥
নীরংতর পিৱ পাইয়াঁ জহঁ আনঁদ বারহ মাস।
হংস সৌঁ প্রমহঁস খেলৈ তহঁ সেৱগ স্বামী পাস॥

“নিরন্তর পাইতেছি প্রিয়তমকে, যেখানে না নিগম না বেদ পারে পৌঁছিতে; তেজঃস্বরূপ প্রিয় যেখানে করেন বাস, সেখানকার মর্ম্ম ক্বচিতই কেহ জানে।

নিরন্তর পাইতেছি প্রিয়তমকে, তিন লোক ভরপূর করিয়া তিনি বিরাজমান। সবার সঙ্গে সঙ্গে যে স্বামী করেন বাস, লোকে কিনা বলে তাঁকে দূরে!

নিরন্তর পাইতেছি প্রিয়তমকে। যেখানে বার মাসই আনন্দ। হংসের (সাধকের) সঙ্গে পরমহংসের চলিয়াছে খেলা; সেখানে সেবক আছে স্বামীরই পাশে।”

২১। ভ্রমর মজিয়াছে এই কমল-রসে।

ভৱঁর কৱঁল রস বেধিয়া সুখ সরৱর রস পীৱ।
সহজৈঁ আপ লখাইয়া পিৱ দেখে সুখ জীৱ॥
ভ্ৱঁব কৱঁল রস বেধিয়া গহে চরণ কর হেত।
পিৱ জী পরসত হী ভয়া রোম রোম সব সেত॥
ভৱঁর কৱঁল রস বেধিয়া অনত ন ভরমৈ জাই।
তহঁা বাস বিলম্বিয়া মগন ভয়া রস খাই॥

---

* “সব সেজৌঁ সাঈঁ বসৈ” পাঠও আছে।

"ভ্রমর হইল কমল রসে বিদ্ধ, আনন্দ-সরোবরের রস কর পান ; সহজেই তিনি দেখাইলেন আপনাকে, প্রিয়তমকে দেখিয়া থাক আনন্দে।

ভ্রমর হইল বিদ্ধ কমলরসে, চরণ ধরিয়া জানাও ব্যাকুলতা ; প্রিয়তম এই জীবন পরশ করিবামাত্রই (এ দেহের) অণু পরমাণু (রোম রোম) সব হইয়া গেল শুভ্র নির্ম্মল।

কমলরসে বিদ্ধ হইল ভ্রমর, অন্যত্র যাইয়া আর সে বেড়ায় না ভ্রমিয়া ; সেখানেই বাস অবলম্বন করিয়া মগ্ন হইয়া সেই রস করে চির সম্ভোগ।"

২২। বাণী সঙ্গীত ও ওঁকারের মূল।

জ্ঞান লহরী জহঁ তৈঁ উঠৈ বাণী কা পরকাস।
অনভৱ জহঁ তৈঁ উপজৈ সবদ কিয়া নিবাস॥
জহঁ তন মনকা মূল হৈ উপজৈ ওঁকার।
তহঁ দাদূ নিধি পাইয়ে নিরংতর নিরাধার॥

"জ্ঞান লহরী যেখান হইতে উঠে সেখানেই বাণীর প্রকাশ ; অনুভব যেখান হইতে উপজিতেছে সেইখানে "সবদের" (সঙ্গীত) হইল নিবাস।

যেখানে তনু মনের মূল সেখানেই উপজিতেছে ওঁকার ; সেখানেই, হে দাদূ, পাইবে নিরন্তর নিরাধার সেই নিধি।"

২৩। রসের মাতাল রস ছাড়া কিছুই জানে না।

জ্যোঁ রসিয়া রস পীৱতাঁ আপা ভূলৈ ঔর।
য়োঁ দাদূ রহি গয়া এক রস পীৱত পীৱত ঠৌর॥
মহারস মীঠা পীজিয়ে অৱিগত অলখ অনংত।
দাদূ নিরমল দেখিয়ে সহজৈ সদা ঝরংত॥
প্রেম পিয়ালা নূরকা আসিক ভরি দীয়া।
দাদূ দর দিদার মৈঁ মতৱালা কীয়া॥
দাদূ অমলী রামকা রস বিন রহ্যা ন জাই।
পলক এক পীৱৈ নহীঁ তলফি তলফি মরি জাই॥

দাদূ রাতা রামকা পীবৈঁ প্রেম অঘাই।
মতৱালা দীদারকা মাঁগৈ মুকুতি বলাই॥

"রসের রসিক যেমন রস পান করিতে করিতে আত্ম-পর সব যায় ভুলিয়া; তেমনি, হে দাদূ, পান করিতে করিতেই এক-রস যায় রহিয়া, পান করিতে করিতেই গিলিয়া যায় সেই ঠিকানায়।

মিষ্ট মহারস কর পান, অনির্ব্বচনীয় অলখ অনন্ত সেই রস। হে দাদূ, দেখ নির্ম্মল সেই রস সহজেই নিরন্তর চলিয়াছে ঝরিয়া।

আলোকের পেয়ালায় প্রেমময় দিলেন প্রেম ভরিয়া* হে দাদূ, সাক্ষাৎরূপ দেখাইয়া রূপ-রসে তিনি করিয়া দিলেন মাতাল।

দাদূ হইল রামের মাতাল, রস বিনা সে (ক্ষণমাত্র) পারে না থাকিতে, এক পলক যদি সেই রস সে না পান করে তো ছটফট করিয়া করিয়া যায় মরিয়া।

রামের সঙ্গে দাদূ হইয়াছে অনুরক্ত, সে ভরপূর করিতেছে প্রেমরস পান; যে তাঁর প্রত্যক্ষরূপে হইয়াছে মাতাল, সে কি আর কখনো মুক্তির বালাই বেড়ায় মাগিয়া?"

২৪। প্রেমের মাতাল রসে ডুবিল।

পরচৈ কা পয় প্রেমরস পীবৈঁ হিত চিত লাই।
মতৱালা মাতা রহৈ দাদূ কাল ন খাই॥
দাদূ দরিয়াৱ প্রেমরস তামৈঁ মিলন তরংগ।
ভরপূর খেলৈ রৈন দিন অপনে পীতম সংগ॥
চিড়ী চঃচ ভরি লে গঙ্গ নীর নিঘটি নহিঁ জাই।
ঐসা বাসন না কিয়া সব দরিয়া মাহিঁ সমাই॥
দাদূ মাতা প্রেমকা রস মৈঁ রহ্যা সমাই।
অংত ন আৱৈ জব লগি তব লগি পীৱত জাই।
সংগত পংগত ধরম ছাড়ৈ জব রসি মাতা হোই।
জব লগি দাদূ সাবধাঁ কধীঁ ন ছাড়ৈ কোই॥

---

* অথবা "প্রেম হইল জ্যোতির পেয়ালা।"

"প্রিয়তমের সঙ্গে প্রত্যক্ষ মিলনের রস হইল প্রেমরস, প্রেম ও হৃদয় দিয়া কর এই রস পান; এই রসেই মাতাল হইয়া থাক নিরন্তর মত্ত, তবে তোমাকে কখনো কাল পারিবে না খাইতে।

হে দাদূ, প্রেমের রসের সেই সাগর, তাহাতে চলিয়াছে মিলনের তরঙ্গ। আপন প্রিয়তমের সঙ্গে সেখানে দিবানিশি খেল ভরপূর খেলা।

ক্ষুদ্র পক্ষী চঞ্চু ভরিয়া (সেই রস) লইয়া গেলে তো আর (সমুদ্রের) জল কিছু যাইবে না কমিয়া; এমন কোনো বাসন করাই অসম্ভব যাহাতে সেই অসীম সাগর পারে আঁটিতে।

দাদূ প্রেমের মাতাল, সেই রসেই সে আছে ভরপূর ডুবিয়া; যতক্ষণ পর্য্যন্ত অন্ত আসিয়া না উপস্থিত ততক্ষণ পর্য্যন্ত করিয়া চল পান।

যখন কেহ রসে হইয়া যায় মত্ত তখন, সমাজ (সঙ্গতি), জাতি কুল (পংক্তি), ধর্ম্ম সবই দেয় সে ছাড়িয়া; হে দাদূ, যতক্ষণ পর্য্যন্ত কেহ সাবধান (সচেতন) থাকে ততক্ষণ কিছুতেই কেহই কিছু দেয় না ছাড়িয়া। (তাহাকেও কেহ ছাড়ে না। মুক্তির একমাত্র উপায়ই হইল ব্রহ্মরসে মত্ত হওয়া)।

২৮। মুক্তি।

ফল পাকা বেলী তজী ছিটকায়া সুখ* মাহিঁ।
সাঈঁ আপনা করি লিয়া সো ফিরি ঊগৈ নাহিঁ॥

ফল পাকিল, শাখা ত্যাগ করিয়া আনন্দের মাঝে পড়িল ঝাঁপ দিয়া, স্বামী সেই ফল করিয়া লইলেন স্বীকার, সে ফল তো আর কখনও হইবে না অঙ্কুরিত।"

---

* "ছিটকায়া মুখ মাহিঁ" পাঠও আছে। অর্থ—"তাঁহার মুখে পড়িল ছিটকাইয়া।"

পঞ্চম প্রকরণ—পরিচয়

তৃতীয় অঙ্গ—“অবিহড়”

(অখণ্ড, অনশ্বর, যাহার সঙ্গে কখনো ঘটে না বিচ্ছেদ)

যিনি জীবন মরণের সাথী, যাঁর খণ্ডতা ও বিনাশ নাই, যাঁর পরিবর্ত্তন নাই যিনি অমৃত-উৎস, যিনি সত্য-বিধাতা, যিনি অবিচল সর্ব্বব্যাপী তাঁহারই উপর নির্ভর কর। আর যাহা কিছুর উপর নির্ভর করিতে যাইবে দেখিবে কোনোটাই নির্ভরের যোগ্য নহে, কারণ সবই নশ্বর ও খণ্ডিত।

সংগী সোঈ কীজিয়ে সুখ দুখকা সাথী।
দাদূ জীৱন মরণকা সো সদা সঁঘাতী॥
সংগী সোঈ কীজিয়ে কবহূঁ পলটি ন জাই।
আদি অংতি বিহড়ৈ নহীঁ তা সন য়হু মন লাই॥
দাদূ অবিহড় আপ হৈ অমর উপাৱনহার।
অবিনাসী আপৈ রহৈ বিনসৈ সব সংসার॥
দাদূ অবিহড় আপ হৈ সাচা সিরজনহার।
আদি অংত বিহড়ৈ নহীঁ বিনসৈ সব আকার॥
দাদূ অবিহড় আপ হৈ অবিচল রহ্যা সমাই।
নিহচল রমিতা রাম হৈ জো দীসৈ সো জাই॥

“সঙ্গী কর তাঁহাকেই যিনি সুখ দুঃখের সাথী; হে দাদূ, তিনিই জীবনের মরণের নিত্য সঙ্গী;

সঙ্গী কর অটল অবিকার তাঁহাকেই যাঁহার সাথে কখনও হয় না বিচ্ছেদ। আদি অন্ত যাঁর সঙ্গে ঘটে না বিচ্ছেদ তাঁর সঙ্গেই এই মন কর ধ্যান-যুক্ত।

হে দাদূ, পরমাত্মাই অবিচ্ছিন্ন অবিনশ্বর, তিনিই অমৃত-উৎস সৃষ্টির মূলাধার; সব সংসারই হইবে বিনষ্ট, কেবল থাকিবেন শুধু অবিনাশী স্বয়ম্।

হে দাদূ, তিনিই নিত্যযুক্ত অবিচ্ছিন্ন তিনিই সাচ্চা সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতা,

তিনি অটল অবিকার, আদি অন্ত কোথাও তাঁর সঙ্গে ঘটে না বিচ্ছেদ ; সকল আকারের হয় বিনাশ ও বিলয় ।

হে দাদূ, তিনিই বিচ্ছেদহীন নিত্যযুক্ত তিনি অবিচল, তিনি আছেন (সব কিছু) ভরপূর করিয়া ; তিনি নিশ্চল, তিনিই পরমানন্দবিহারী ভগবান, (আর) যাহা কিছু বাহ্য দৃশ্য সবই যায় চলিয়া ।"

পঞ্চম প্রকরণ—পরিচয়

চতুর্থ অঙ্গ—সাষীভূত (সাক্ষীভূত)

আমাদের মধ্য দিয়া ভগবানই সব করিতেছেন। আমরা যে কাজ করি, আমাদেরও তো অন্তরাত্মা তিনিই। কাজেই তিনিই যন্ত্রীরূপে আসল কর্ত্তা, আমরা কেবল যন্ত্রমাত্র। লোকে তো বলে না যে হাত বা পা ইহা করিয়াছে, মালিকেরই সব কর্ত্তৃত্ব। আমরা সেই পরম মালিকের যন্ত্র-স্বরূপ। তিনিও অন্তরে থাকিয়া এই উপদেশ দিতেছেন যে, "আমাকেই কর্ত্তা জানিয়া সদা স্মরণ কর, তবেই তোমার মাথায় আর কোনো ভার থাকিবে না।"

আমরা ঈশ্বরকে এতদূর ছোট করিয়া ফেলিয়াছি যে আমরা তাঁহাকে নাওয়াই, খাওয়াই, পান করাই। যিনি বিশ্বের ও আমাদের সত্তা প্রতিমূহূর্ত্তে দান করিতেছেন তাঁকে কিনা আমরা দেই খাওয়াইয়া! আমাদের ক্ষুদ্র পূজার এই খেলায় তাঁর যে কত বড় অপমান তাহা সাধারণ বুদ্ধিতেই বোঝা যায়।

রাজা যেমন মহলে (প্রাসাদে) সবার অলক্ষ্যে বসিয়া সব কাজ চালান এই বিশ্বে তেমনি তাঁর কাজ। মহলের ভিতরে বাহিরে ক্ষুদ্র দাসদের বিষম হাঁকাহাঁকিতে মোহগ্রস্থ হইয়া যে তাহাদিগকেই স্বামী বলিয়া স্বীকার করিল সে নিজের জীবনটাকেই গেল করিয়া ব্যর্থ। প্রভুকে হাঁকাহাঁকি করিতে দেখিনা বলিয়া যে তাঁহাকে স্বীকারই করিব না আর শুধু হাঁকাহাঁকির চোটে দাসদেরই করিব স্বীকার, ইহা অতি জঘন্য নাস্তিকতা।

খেলার একটা বয়স আছে। বৃদ্ধেরা যখন শিশু হইয়া খেলে তখন তাহা

হইয়া ওঠে প্রহসন। তারপর ভগবানকেই যখন পুতুল বানাইয়া খাওয়াই পরাই ও চালাই তখন সেই বালসুলভ প্রহসন হইয়া ওঠে মারাত্মক খেলা। এমন জীবন-দাতাকে যাহারা বানায় নির্জীব পুতুল তাহারা আর জীবন পাইবে কোথায়?

এই সব নির্বোধের দল আবার নানারূপ সূক্ষ্ম বুদ্ধির চাতুরীকে করিতে চায় আপন সহায়। এইরূপ নির্বোধ অথচ চতুরের দলের কি আর কোনো উপায় আছে? এইরূপ চাতুরীর মধ্যে যে কত বড় নাস্তিকতা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে তাহা কি কেহ ইহাদের বুঝাইয়া দিতে পারে? এই সব নির্বোধ-চতুর নাস্তিকদের কে দিতে পারে মনুষ্যত্ব?

৯। কর্ত্তা তিনিই, জীব সাক্ষীভূত-মাত্র।

আপ অকেলা সব করৈ ঘটমেঁ লহর উঠাই।
দাদূ সির দে জীৱকে যুঁ ন্যারা হৱৈ জাই॥
আপ অকেলা সব করৈ ঔরোঁ কে সিরি দেই।
দাদূ সোভা দাস কূঁ অপনা নাৱ ন লেই॥
ব্রহ্ম জীৱ হরি আতমা খেলৈঁ গোপী কান।
সকল নিরংতরি ভরি রহ্যা সাষীভূত সুজাণ॥

"আপনি একাই সব করেন, ঘটের মধ্যে তোলেন লহর, হে দাদূ, জীবের মাথায় (জীবের নামে) সব (কর্ত্তৃত্বের নাম) দিয়া এমনই হইয়া যান স্বতন্ত্র।

আপনি একাই করেন সব, অথচ অপর সকলের মাথায় তাহার কর্ত্তৃত্বের ভাণ (অন্যের নামে) দেন সব চালাইয়া; হে দাদূ, সব শোভা (মাহাত্ম্য) দাসকে দিয়া আপন নামটিও তিনি দেন না লইতে।

(প্রতি) জীবের সঙ্গে ব্রহ্মের, (প্রতি) আত্মার সঙ্গে হরির চলিয়াছে খেলা, গোপীর সঙ্গে কৃষ্ণের (প্রেমের) খেলার মত সকল (সংসার) তিনিই নিরন্তর আছেন ভরিয়া, যে জন রসিকসুজান (সে জানে যে সে নিজে) সাক্ষীভূতমাত্র।"

২। অন্তরের সাক্ষ্য।

জনম মরণ সানি করি য়হু পিংড উপজায়া।
সাঈঁ দীয়া জীর কূঁ লে জগমেঁ আয়া॥
মাহীঁ তৈঁ মুঝকোঁ কহৈ অংতরজামী আপ।
দাদূ দূজা ধুংধ হৈ সাচা মেরা জাপ॥

"জনম মরণ ছানিয়া এই দেহ করিলেন তিনি উৎপন্ন, তাহার মধ্যে প্রভু দিলেন জীবন, * তার পর তাহাকে লইয়া আসিলেন এই জগতে।

অন্তর্য্যামী পরমাত্মা আমার অন্তরের মধ্যে থাকিয়া নিজেই বলিতেছেন আমাকে, "আমি ছাড়া আর যত কিছু সবই ধুন্ধুকার অন্ধকার, সাচ্চা কেবল আমার জাপ।"

৩। মিথ্যা পূজার নামে খেলা করিতে পারিব না।

কেঈ আই পূজা করৈঁ কেঈ খিলাবৈঁ খাহিঁ।
কেঈ আই দরসন করৈঁ হম তৈঁ হোতা নাহিঁ॥
না হম করৈঁ করাবৈঁ আরতী না হম পিয়ৈঁ পিলাবৈ নীর।
করৈ করাবৈ সাইঁয়াঁ দাদূ সকল সরীর॥
করৈ করাবৈ সাইঁয়াঁ জিন্‌হ দীয়া ঔজূদ।
দাদূ বংদা বীচিমেঁ সোভা কূঁ মৌজূদ॥
দেবৈ লেবৈ সব করৈ জিন্‌হ সিরজে সব লোই।
দাদূ বংদা মহলমেঁ সোর করৈঁ সব কোই॥ †

"কত বা লোক আসিয়া করেন পূজা, কত না জন (তাঁহাকে) খাওয়ান, খান ; কত না লোক আসিয়া করেন দর্শন, এসব তো আমার দ্বারা হইবে না।

না আমি করি করাই কোন আরতি, না করি আমি নীর পান না করাই (তাঁহাকে) নীর পান ; হে দাদূ, সকল শরীরকে (ঘট ও রূপ) সৃষ্টি করেনও স্বামী এবং সকল শরীরের দ্বারা কাজ করানও স্বামী।

---

* অথবা "দিলেন জীবকে"।

† "সোভা করৈঁ সব কোই" পাঠও আছে।

সবই করেন করান সেই স্বামী যিনি দিয়াছেন আমাদের সত্তা, হে দাদূ, এই দাস কেবল মাঝখানে শোভার জন্য মাত্র আছে হাজির।

যিনি সকল লোক করিতেছেন সৃষ্টি তিনিই (মহলের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রহিয়া) সব দেন ও নেন, তিনিই সব করেন ; এই (বিশ্ব) মহলে (মন্দিরে) দাদূ দাস মাত্র, এবং সব দাসের দলই যত করিতেছে শোর গোল।”

পঞ্চম প্রকরণ—পরিচয়

পঞ্চম অঙ্গ—বেলী (অমৃতবল্লী)

বিশ্বাত্মার সঙ্গে যদি জীবাত্মার যোগ থাকে তবেই চরাচরব্যাপী যে ভগবদ্‌রসের বর্ষণ হইতেছে প্রেমের প্রবাহ চলিয়াছে তাহার সঙ্গে আমাদের যোগ হয় সহজ ও অবিচ্ছিন্ন। এই সহজ যোগ থাকিলেই জীবন সহজ আনন্দে ভরপূর হয়, কালের গতির সঙ্গে ফুলে ফলে জীবন্ত হইয়া সহজ পূর্ণতার দিকে জীবন অগ্রসর হইয়া চলে। আর এই যোগ না থাকিলে জীবনলতা কালের সঙ্গে সঙ্গে শুকাইতে থাকে, মরিতে থাকে। কাল জয় করিবার উপায়ই হইল বিশ্বের যোগে জীবনকে লাভ করা। বীজ যদি রস পায় তবে অঙ্কুর হইয়া বৃক্ষ হইয়া পল্লব ফুল ফল হইয়া ক্রমাগতই কালকে অতিক্রম করিয়া চলে। সদ্‌গুরু বিশ্বের সঙ্গে যোগ বা “সঙ্গতি” দিয়া জীবন্ত প্রেমরসে জীবনবীজকে অঙ্কুরিত করেন ও সেই অঙ্কুরকে নিত্য ভবিষ্যতের দিকে অক্ষুণ্ণভাবে অগ্রসর করিয়া দিয়া তাহার দ্বারা কালকে জয় করান। এই যে সহজে বিশ্বজীবনের সঙ্গে যুক্ত হইয়া জীবনের পথে অগ্রসর হইয়া কালকে জয় করা, ইহাই হইল “সহজপংথ”।

সদা জীবন্ত ফুলন্ত ফলন্ত হইয়া এই ভাবে বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত হইয়া চলাই যে সহজ, সেইকথা মানুষকে কিছুতেই বুঝান যায় না। তাহারা কৃত্রিম কথা বুঝিবে কিন্তু নেহাৎ সহজ সত্যও বুঝিতে পারিবে না। সদ্‌গুরু যদি দয়া করিয়া বিশ্বের সঙ্গে এই যোগ এই “সঙ্গতিটি” করাইয়া দেন তবে বিশ্বসত্যে বিশ্বপ্রেমের যোগে এই জীবনলতায় অমৃত ফল ফলে, জীবন ধন্য হয়।

১। বিশ্বব্যাপী সহজ সত্যের যোগে যে জীবনলতা ফুলে ফলে পূর্ণ হইয়া ওঠে এই কথাই সদ্গুরু কহিতেছেন, কিন্তু একথা বুঝিবার মত লোক যে দেখা যায় না ইহাই বড় দুঃখ।

এই সহজ যোগ হইতে ভ্রষ্ট হইলে ভগবদ্রসপ্রবাহ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া জীবনলতা যায় শুকাইয়া, এই যোগ থাকিলে জীবন দিনে দিনে পূর্ণ হইতে থাকে, কাল তবে তাহাকে ক্ষয় না করিয়া দিনে দিনে জীবনকে ক্রমাগত সকল ভাবে পূর্ণ করিয়াই চলিতে থাকে।

যে তাপে জীবন্ত গাছ বৃদ্ধি পায় সেই তাপেই ছিন্নমূল জীবন-হীন গাছ যায় শুকাইয়া জীর্ণ হইয়া। মূলে যুক্ত থাকিয়া তাঁহার অমৃত ধারা যদি গ্রহণ কর তবে এই জীবনবৃক্ষ কখনই শুকাইবে না, তবে শুষ্ক না হইয়া সদাই তাজা সবুজ রহিবে এবং কোনো তাপেই তোমার কোনো ক্ষতি হইবে না। সকল তাপেই সকল দুঃখ আঘাতেই জীবন তোমার চলিবে অগ্রসর হইয়া।

এই কায়া (ঘট) বৃক্ষ তাঁহার আপন হাতে রোপণ করা, প্রেমবশতঃ ভরপূর করিয়া ইহাতে তিনিই অমৃত রস নিত্য সেচন করিতেছেন। সেই অমৃত ধারার সঙ্গে যদি যোগ না হারাই তবে জীবন নিত্যই থাকে তাজা, তবে জীবনে অমৃতের ফল ফলে।

২। ভগবদ্-রস চলিয়া যাইতেছে বহিয়া, অন্তর তাহা পারিতেছে না গ্রহণ করিতে। বিশ্বের সঙ্গে যোগ হারাইয়াছি, কাজেই বিশ্বের সহজ রস জীবনের বাহিরেই যাইতেছে রহিয়া, বাহিরেই যাইতেছে বহিয়া। যদি এই রস জীবনে গ্রহণ করিতে পারি তবে জীবন হইয়া যাইবে তাজা। কারণ যিনি এই রস বর্ষণ করিতেছেন তিনি সদা সচেতন সদা জীবন্ত।

এই যোগ নষ্ট হওয়াতেই বিশ্ব গিয়াছে নীরস হইয়া। "অহং রস" হইল ক্ষার রস। বিশ্বরস প্রাণ দেয়; "স্বার্থরস" "অহংরস", ক্ষার জলের মত প্রাণ নেয়। যোগভ্রষ্টজীবনে কেবল "অহংরস" "স্বার্থরস" লাগিতেছে, তাই জীবন ক্রমাগতই যাইতেছে শুকাইয়া, কিছুতেই ফল ধরিতেছে না।

৩। সদ্গুরু যদি জীবনে মেলে তবেই এই যোগহীন জীবনকে বিশ্বের সঙ্গে করিতে পারেন যুক্ত। সকলের সঙ্গে যথার্থ যোগই হইল "সঙ্গতি"। সদ্গুরু এই "সঙ্গতি" যদি জীবনে দেন তবেই ভগবানের রস বর্ষণ এই জীবনে

পাই, তবেই প্রাণবৃক্ষ সেই অমৃতধারা পান করিয়া অপার অনন্ত ফলে ওঠে ফলবান হইয়া।

প্রেম অর্থই হইল সবার সঙ্গে যোগ। এই জীবন বৃক্ষকে সকলের সঙ্গে যোগ হইতে বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র বলিয়া যেন মনে না করি। এই জীবন আসলে প্রেম যোগেরই বৃক্ষ, সহজ সত্য যোগেই ইহার বৃদ্ধি। "সঙ্গতি"র প্রসাদেই ইহাতে ফুল ফল ধরে, কাজেই "সঙ্গতি" বা সবার সঙ্গে যোগ হইলেই অমৃত ফল করা যায় সম্ভোগ।

৯। আত্মা অমৃতবল্লী, ভগবদ্রসেই বাঁচে।

দাদূ বেলী আতমা সহজ ফূল ফল হোই।
সহজি সহজি সত গুর কহৈ বূঝৈ বিরলা কোই ॥
জে সাহিব সীঁচৈ নহীঁ তৌ বেলী কুম্হিলাই।
দাদূ সীঁচৈ সাঁইয়াঁ তৌ বেলী বধতী জাই ॥
হরি তরবর তত আতমা বেলী করি বিস্তার।
দাদূ লাগৈ অমর ফল সাধূ সীঁচনহার ॥
কদে ন সূখৈ রূখড়া জে অম্রিত সীঁচ্যা আপ।
দাদূ হরিয়া সো ফলৈ কছূ ন ব্যাপৈ তাপ ॥
জে ঘট রোপৈ রামজী সীঁচৈ অমী অঘাই।
দাদূ লাগৈ অমর ফল কবহূঁ সূখি ন জাই ॥

"হে দাদূ, আত্মাই বল্লী, সহজ ফুল ফল তাহাতে ধরে, সহজে সহজেই কহেন সদ্গুরু, কিন্তু ক্বচিতই কেহ (সেই সহজবাণী) বোঝে।

যদি স্বামী না করেন সেচন তো এই বল্লী যায় শুকাইয়া, আর স্বামী যদি করেন সেচন, তবে সে বল্লী দিনে দিনে চলে বাড়িয়া।

যথার্থ-অধ্যাত্ম-তত্ত্ব হরি তরুবরে যদি কেহ এই বল্লী করিয়া দিতে পারে বিস্তার, হে দাদূ, তবেই তাহাতে ধরে অমৃত ফল; ক্বচিৎ কোন সাধকই জানে তাহা সেচন করিয়া সরস রাখিতে।

পরমাত্মা স্বয়ং যখন সে বল্লীতে করেন অমৃত রস সেচন তখন সে তরু

কখনই যায় না শুকাইয়া, হে দাদূ, সেই জীবন্ত তাজা সবুজ তরু নিত্যই রহে ফলন্ত, ও কোন তাপই তাহাকে কিছুই করিতে পারে না শুষ্ক সন্তপ্ত।

যে ঘট (শরীররূপী তরু) ভগবান স্বয়ং করিলেন রোপণ তাহাতে ভরপূর করিয়া করেন তিনি অমৃতসেচন, হে দাদূ, তাহাতে যে অমৃতফল ধরে, তাহা কখনও যায় না শুকাইয়া।"

২। ব্যর্থ বর্ষণ।

হরিজল বরষে বাহিরা সূখে কায়া খেত।
দাদূ হরিয়া হোইগা সীঁচনহার সচেত॥
অমর বেলী হৈ আতমা খার সমুংদর মাহিঁ।
সূখৈ খারে নীর সৌঁ অমর ফল লাগৈ নাহিঁ॥

"বৃথা বাহিরে যায় বরষিয়া হরিজল (অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করে না), তাই দিনে দিনে শুকাইয়া যায় কায়া ক্ষেত্র। (অন্তরে যদি সেই বর্ষণ নিতে পার) তবেই হইবে সবুজ তাজা, সেচনকর্ত্তা যে "সচেত" (সদা সচেতন)।

ক্ষার সমুদ্রের মাঝে আত্মাই হইল অমৃত বল্লী, ক্ষার জলেই সে যাইতেছে শুকাইয়া, তাই তো তাহাতে ধরিতেছে না অমৃত ফল।"

৩। বিশ্বের সঙ্গে যোগের রসে জীবনলতায় অমৃত ফল ফলে।

সতগুরু সংগতি উপজৈ সাহিব সীচঁনহার।
প্রাণ বিরিখ পীরৈ সদা দাদূ ফলৈ অপার॥
জোগ প্রেম কা রূখড়া সত সৌঁ বধতা জাই।
সংগতি সৌঁ ফূলৈ ফলৈ দাদূ অমর ফল খাই॥

"প্রভু স্বামী তো আছেনই সেচনকর্ত্তা তার পর সদ্গুরুর "সঙ্গতি" বিশ্বের সঙ্গে যোগ) যদি জীবনে হয় উৎপন্ন তবে প্রাণ বৃক্ষ সদাই পান করিতে পারে সেই ভাগবত রস ; হে দাদূ, তবে এই জীবনলতায় ফলে অপার ফল।

---

* কোনো কোনো মতে "সংগতি" স্থানে (দ্বিতীয় শ্লোকের) "সংতোখ" পাঠ আছে। প্রথম শ্লোকের "সংগতি" সব পাঠেই আছে।

যোগ ও প্রেমের এই বৃক্ষ, সত্যের দ্বারা তাহা চলে বাড়িয়া; "সঙ্গতির" দ্বারা সেই বৃক্ষ ফুলে' ফলে', তবেই দাদূ সেই অমৃত ফল করা যায় সম্ভোগ।"

পঞ্চম প্রকরণ—পরিচয়

ষষ্ঠ অঙ্গ—সমর্থাই (ভগবানের সামর্থ্য)

তিনি সর্ব্বশক্তিমান, তাঁহাকে পাইলে জীবনে আর কিছু প্রার্থনীয় থাকিতে পারে না। মানুষের কোনো শক্তি নাই, সবই তাঁরই মহিমা। তিনি দয়া করিয়া মানবের সাথী হইয়াছেন, তাঁর শক্তি ছাড়া কে জীবন পায়? এক দিকে তিনিই খণ্ডরূপে প্রত্যক্ষ, অথচ প্রতি রূপেই তিনি পরিপূর্ণ মহিমায় বিরাজমান। তিনিই পারেন তাঁর মহিমা বুঝাইতে, আর কে তাহা পারে? কর্ত্তা হইয়াও তিনি অকর্ত্তার মত শান্ত স্থির। সব কিছু সদা পূর্ণ করিয়া তিনিই বিরাজিত, এমন মহিমা আর কাহার?

তিনি পুণ্য পাপ প্রভৃতির অতীত হইয়া এই সৃষ্টির মধ্যে করিতেছেন প্রেমের খেলা। এই সৃষ্টিতে তাঁর কোনো প্রয়াসই নাই, এ যেন তাঁর সহজ লীলা, এমনই তাঁর সামর্থ্য! দিয়াই যথার্থ আনন্দ, নিয়া নহে; আপনাকে নিঃশেষে দিবার এই আনন্দের খেলাই তিনি খেলিতেছেন তাঁর বিশ্বরচনায়। আপনাকে এই খেলায় তিনি ভরপূর করিয়া দিয়াছেন বিলাইয়া।

বিশ্ব যেন তাঁর বীণা, পঞ্চ তত্ত্বের পঞ্চ তন্ত্রীতে সুর বাঁধিয়া নিরন্তর তিনি বাজাইতেছেন তাঁর সুর। তিনি যে গুণী! মানবও পঞ্চ ইন্দ্রিয় রসে সাথে সাথে চাহিতেছে বাজিতে। সঙ্গীত হইতেই উৎপন্ন এই বিশ্বতত্ত্ব এবং বিশ্বতত্ত্ব দিয়াই আবার এই সঙ্গীতই তিনি তুলিতেছেন বাজাইয়া।

এই বিশ্ব জগৎ তাঁহার খেলামাত্র। তাঁহার সুরের সঙ্গীতই এই চরাচর বিশ্বজগৎ। তাঁর মহিমা কে করিতে পারে বর্ণনা? কেবল তাঁর খেলায় যোগ দিয়া তাঁর সঙ্গীতের সুরে মন প্রাণ হৃদয় দিয়া বাজিয়া উঠিতে পারিলেই মানব হইয়া যায় ধন্য।

১। তিনি ইচ্ছা মত সব কখনও করেন পূর্ণ, কখনও করেন শূন্য। তাঁহাকে পাইলে আর কিছুই পাইতে বাকী থাকে না। তিনি যাহাকে ইচ্ছা রাখেন যাহাকে ইচ্ছা না রাখেন, অপার তাঁহার মহিমা! তাঁহার ইচ্ছাতেই আছি, তাঁহাকে এড়াইয়া যাইবার আর ঠাঁই কোথায়?

২। তিনি দয়া করিয়া, আমাকে স্পর্শ করিয়া, আছেন আমার সাথে সাথে। শূন্য হইতে আপন ইচ্ছায় তিনি গড়েন, আবার আপন ইচ্ছা মতই ভাঙ্গেন; এই তো তাঁর খেলা।

৩। তিনিই খণ্ড সীমান্বিত হইয়া প্রকাশিত, আবার তাঁর প্রতি খণ্ডতার মধ্যে তাঁর অসীম অখণ্ড ভরপূর সত্তা বিরাজমান। আমি কি-ই বা পারি করিতে? অথচ লোকে আমার কাছেই চাহে কিনা তাঁর শক্তির পরিচয়! ইচ্ছা হইলে তাঁহার পরিচয় তিনিই দিবেন। কর্ত্তা হইয়াও যে তিনি অকর্ত্তা হইয়া আছেন এই তো তাঁর মহিমার পরিচয়। প্রতি খণ্ডরূপে যে তাঁহার অসীম অখণ্ড সত্তা বিরাজিত ইহাই তাঁহার মহিমা।

৪। গুণাতীত তিনি, রসের খেলা খেলিতে খেলিতে এই সৃষ্টি করিয়াছেন রচনা, এই তো তাঁর সহজ লীলা। পুণ্য পাপের তিনি অতীত। আপনাকে দিয়াই তাঁর আনন্দ, নিয়া আনন্দ নহে। তাই এই বিশ্ব রচনার মধ্যে তিনি পরিপূর্ণ ভাবে আপনাকে দান করিবার লীলাই করিতেছেন খেলা। খেলায় যাঁর সৃষ্টি, বিশ্ব যাঁর লীলামাত্র, কে কহিবে তাঁর মহিমা?

৫। পঞ্চ তত্ত্বের পঞ্চ তন্ত্রী দিয়া বিশ্ব বীণা বাজাইতেছেন সেই গুণী, পঞ্চ-ইন্দ্রিয় রসে যদি আমরা ও সঙ্গে সঙ্গে বাজিতে পারি তবেই আমরা ধন্য। বিশ্ব তাঁর সঙ্গীত হইতে উৎপন্ন, বিশ্ব দিয়াই তাঁর সঙ্গীত। এই রহস্য কে বুঝিবে? সঙ্গীতে যাঁর বিশ্ব রচনা, কে করিবে তাঁর মহিমা-বর্ণনা?

১। তাঁহার শক্তিতেই সবঃ

করতা করৈ ত নিমেষ মেঁ ঠালী ভরৈ ভংডার।
ভরিয়া গহি ঠালী করৈ ঐসা সিরজনহার॥
সমরথ সব বিধি সাঈয়াঁ তাকী মৈঁ বলি জারঁ।
অংতর এক জো সো বসৈ ঔরাঁ চিত্ত ন লারঁ॥

দাদূ জে হম চিতরৈঁ সো কছু ন হৌরৈ আই ।
সোঈ করতা সতি হৈ কুছ ঔরৈ করি জাই ॥
কাহুক লেই বুলাই করি কাহুক দেই পঠাই ।
দাদূ অদ্‌ভুত সাহিবী ক্যোঁ হী লখী ন জাই ॥
জ্যূঁ রাখৈঁ ত্যূঁ রহৈঁগে অপণৈঁ বলি নাহীঁ ।
সবই তুম্‌হারৈ হাথি হৈ ভাজি কত জাহীঁ ॥

"করিতে যদি চান তবে কর্ত্তা (সব) করেন নিমিষের মধ্যে ; খালি ভাণ্ডার দেন ভরিয়া, ভরিয়া নিয়া করেন আবার খালি, এমনই তিনি (সমর্থ) বিধাতা (সৃষ্টিকর্ত্তা) !

সব বিধিতেই সমর্থ আমার স্বামী, আমি তাঁহার যাই বলিহারী ! (আমার) অন্তরে এক তিনি যদি বাস করেন, তবে অপর কাহাকেও বা অপর কিছুই আনিব না (আমার) চিত্তে ।

হে দাদূ, আমি যাহা ভাবিতেছি চিত্তে তাহার কিছুই নহে সফল হইবার, সেই কর্ত্তাই হইলেন সত্য, তিনি হয়তো করিয়া যাইবেন একেবারে আর এক রকম কিছু ।

কাহাকেও তিনি নেন ডাকিয়া, কাহাকেও দেন পাঠাইয়া, হে দাদূ, অদ্ভুত তাঁহার প্রভুত্ব (মহিমা), কোনো মতেই তাহা যায় না বুঝা !

যেমন তিনি রাখেন তেমনই আমি রহিব, আপন শক্তিতে তো কিছুই নহে হইবার ; হে প্রভু, সবই তোমার হাতে, পলাইয়া আর যাইব কোথায় ?"

২। সর্ব্বক্ষেত্রেই তাঁর শক্তি

মীরাঁ মুঝ সৌঁ মিহর করি সির পর দীয়া হাথ ।
সবহী মারগ সাইঁয়াঁ সদা হমারে সাথ ॥
গুপ্ত গুণ পরগট করৈ পরগট গুপ্ত সমাই ।
পলক মাহিঁ ভানৈ ঘড়ৈ তাকী লখী ন জাই ॥
নহীঁ তহাঁ থৈঁ সব কিয়া আপৈ আপ উপাই ।
নিজ তত ন্যারা না কিয়া দুজা আবৈ জাই ॥

জে সাহিব সিরজৈ নহীঁ আপৈ ক্যোঁ করি হোই।
জে আপৈ হী উপজৈ তো মরি করি জীৱৈ কোই॥

"প্রভু আমাকে দয়া করিয়া আমার মাথায় রাখিয়াছেন তাঁর প্রসন্ন হাতখানি; সব পথেই আমার স্বামী, সদাই তিনি আমার সাথে সাথে।

অপ্রকটকে তিনিই করেন প্রকট, প্রকটকে আবার তিনিই অপ্রকটের মধ্যে দেন ডুবাইয়া; পলকের মধ্যেই তিনি ভাঙ্গেন ও পলকের মধ্যেই তিনি গড়েন, তাঁর মর্ম্মই কিছু যায় না বুঝা।

নিজে নিজেই আপনা হইতেই নিখিল উৎপন্ন করিয়া তিনি "নাই কিছু" হইতেই "সব কিছু" করিলেন সৃষ্টি, অথচ নিজের তত্ত্বরূপ সব কিছু হইতে করিলেন না স্বতন্ত্র; তাঁহা ছাড়া আর যাহা কিছু তাহা সবই আসে ও যায় (ক্ষণ স্থায়ী)।

যদি প্রভুই না করিয়া থাকেন সৃষ্টি তবে কেমন করিয়া (কেহ বা কিছু) নিজেই হইতে পারে উৎপন্ন? যদি আপনা হইতেই উৎপন্ন হওয়া হইত সম্ভব, তবে মরিয়া গিয়া কেহ কেন আবার উঠে না বাঁচিয়া (হয়না উৎপন্ন)?"

৩। তাঁর পরিচয় তিনিই দিতে পারেন।

খণ্ড খণ্ড পরকাস হৈ জহাঁ তহাঁ ভরপূর।
দাদূ করতা করি রহ্যা অনহদ বাজৈ তূর॥
হম তৈঁ হুৱা ন হোইগা না হম করনে জোগ।
জ্যূঁ হরি ভাৱৈ ত্যূঁ করৈ দাদূ কহৈঁ সব লোগ॥
পরচা মাগৈঁ লোগ সব হমকো কুছ দিখলাই।
সমরথ মেরা সাইয়াঁ সমঝৈঁ ত্যূঁ সমঝাই॥
সম্রথ সো সেরী সমঝাইনৈঁ করি অণকরতা হোই।
ঘটি ঘটি ব্যাপক পূরি সব রহৈ নিরংতর সোই॥

"খণ্ড খণ্ড তাঁর প্রকাশ অথচ যেখানে সেখানে তিনি ভরপূর, হে দাদূ, কর্ত্তাই (সব) চলিয়াছেন করিয়া। অনাহত অসীম বাজিতেছে তূরী।

আমা হইতে না কিছু হইয়াছে না কিছু হওয়া সম্ভব, না আমি কিছু করিবার যোগ্য। যেমন হরির ইচ্ছা তেমনই তিনি করেন। সকল লোকে শুধু বলে "দাদূ-দাদূ" (অর্থাৎ তিনি ছাড়া দাদূরও যেন কিছু শক্তি আছে)।

লোকেরা সব (তাঁর সামর্থ্যের) চাহে পরিচয়, বলে "আমাকে কিছু প্রত্যক্ষ দেখাও"; সমর্থ আমার স্বামী, যেমন করিয়া লোকে বুঝিতে পারে তেমন করিয়াই তিনি দিবেন বুঝাইয়া।

"সব কিছু করিয়াও যে অকর্ত্তা হইয়া থাকিতে পার" হে সমর্থ আমার প্রভু, সেই রহস্যটি (পথ) দাও বুঝাইয়া।" ঘটে ঘটে ব্যাপিয়া সব কিছু পূর্ণ করিয়া নিরন্তর তিনিই বিরাজমান।"

৪। ভরপূর-দিবার-খেলার পরিচয়।

লিপৈ ছিপৈ নহীঁ সব করৈ গুণ নহিঁ ব্যাপৈ কোই।
দাদূ নিহচল একরস সহজৈঁ সব কুছ হোই॥
বিন গুণ ব্যাপে সব কিয়া সমরথ আপৈ আপ।
নিরাকার ন্যারা রহৈ দাদূ পুন্য ন পাপ॥
খালিক খেলৈ খেল করি বূঝৈ বিরলা কোই।
লে করি সুখিয়া না ভয়া দে করি সুখিয়া হোই॥

"লিপ্তও তিনি হন না প্রচ্ছন্নও তিনি রাখেন না অথচ সব কিছুই তিনি করেন সম্পন্ন, তাঁহাতে কোনো গুণই করিতে পারে না প্রভাব; হে দাদূ, তিনি নিশ্চল এক রস; (তাঁর সৃষ্টিলীলায়) সহজেই সব কিছু হয় সম্পন্ন।

নিজে নিজেই যে সমর্থ তিনি, কোনো গুণের প্রভাব ছাড়াই তিনি সব করিলেন সৃষ্টি; নিরাকাররূপে তিনি রহেন স্বতন্ত্র; হে দাদূ, না পুণ্য না পাপ করে (তাঁহাকে) স্পর্শ।

এই খেলা রচনা করিয়াই খেলার সৃষ্টিকর্ত্তা করিতেছেন তাঁহার খেলা, ক্বচিতই কেহ বুঝিতে পারে ইহার মর্ম্ম; (এই খেলার মর্ম্ম এই) "নিয়া কেহই হয় নাই সুখী, দিয়াই সবাই হয় সুখী।"

৮। সৃষ্টিবীণা

জংত্র বজায়া সাজি করি কারীগর করতার।
পংচোঁ কা রস নাদ হৈ দাদূ বোলণহার॥
পংচ উপনা সবদ থৈঁ সবদ পংচ সোঁ হোই।
সাঈঁ মেরা সব কিয়া বূঝৈ বিরলা কোই॥

"যন্ত্রকে সুরে বাঁধিয়া গুণী বিশ্বকর্ত্তা বাজাইতেছেন (তাঁর সুর), পঞ্চেরই (পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও তত্ত্ব) রস হইল সঙ্গীত, দাদূও তাহাতে বাজিতেছে সাথে সাথে।

পঞ্চ (তত্ত্ব ও ইন্দ্রিয়) সঙ্গীত হইতেই হইল উৎপন্ন, আবার সেই পাঁচ হইতেই বাজিতেছে তাঁর সঙ্গীত। স্বামী আমার (সঙ্গীত দিয়াই) সব করিয়াছেন রচনা, ক্বচিতই কেহ বুঝিতে পারে এই রহস্য।"

পঞ্চম প্রকরণ—পরিচয়

সপ্তম অঙ্গ—পীব পিছাণ

(প্রিয়তমকে চেনা)

এই জগতে আসিয়া জনম মরণের সাথী প্রিয়তম নিত্য কালের স্বামীকে চিনিয়া লইয়া তাঁর গলায় এই জগতের সব ঐশ্বর্য্য সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের মালা দিতে হইবে, তাঁহাকে বরণ করিয়া যাইতে হইবে। যে ইহা করিতে পারিল সে ধন্য, আর এই বরণ যে পূরা করিতে না পারিল সে হতভাগ্য।

প্রিয়তম স্বামীকে চিনিয়া লইয়া বরণ করিতে হইবে। এই চিনিয়া লওয়ার মধ্যে, বরণ করার মধ্যে একটুও ভুল থাকিলে লজ্জা ও ক্ষোভের আর সীমা নাই। এমন স্থলে ভুল হইলে কি লজ্জা কি ভীষণ ভুল! তখন সকল

জীবন দগ্ধ করিয়া ফেলিলেও এই গ্লানি এই অপমান আর কিছুতেই যায় না।

১। সত্য স্বামীকে বরণ করিতে হইবে, অথচ তিনি নিরঞ্জন নিরাকার। পরিমিত সাকার দেবতাকে বরণ করিতে গিয়া দেখি তাহার বিনাশ আছে, সে ঝুঠা। যাঁহারা এই উপমা দেন যেমন রাজার কাছে যাইতে হইলে তাঁর ভৃত্যের পরম্পরাকে সেবা করিতে করিতে তবে পৌঁছিতে হয়, তেমনি দেবতার পর দেবতা পার হইয়া পরমেশ্বরের কাছে পৌঁছিতে হয়, তাঁদের উপদেশ যদি গ্রহণ করি তবে তো অপমানের ও অকৃতার্থতার আর অন্ত নাই!

এ হইল স্বামীর কাছে যাওয়া। প্রেমের ক্ষেত্রে সেই দাসজনোচিত বিধি চলিবে কেন? তাঁর ভৃত্যের পরম্পরাকে বরণ করিয়া স্বামী পাইব না স্বামী হারাইব? এই যদি পাওয়ার পথ হইত তবে না হয় স্বামী না-ই পাইলাম তবু আত্মার অমূল্য সতীত্ব কিছুতেই নষ্ট করিতে পারি না।

২। জগদ্‌গুরু তিনি, জন্ম মরণাদি বিকারের তিনি অতীত, এই তাঁর পরিচয়। তিনিই আমার স্বামী, অন্য কেহ নয়।

৩। সত্য ব্রহ্ম অকৃত্রিম, হ্রাসবৃদ্ধিহীন, পূর্ণ, নিশ্চল, একরস। জগতে যাহা চঞ্চলতার অধীন, যাহা জন্মে মরে তাহা মায়া। অবতার তো কখনও ব্রহ্ম নহেন; চঞ্চল ও অনিত্যরূপ অবতারকে বরণ করিব তবে কেমনে?

৪। সকলের শিরোমণি তিনি, সব দিক দিয়াই তিনি শ্রেষ্ঠ। লোহা যেমন পরশমণির পরশ বিনা মাটী হইয়া যায় তেমনি দিনে দিনে চলিয়াছি মাটী হইতে, তাঁর পরশ পাইয়া চাই বাঁচিয়া যাইতে। তাঁর প্রেম এই জীবনে চাই, তাঁর সঙ্গে নিখিলকে সেবা করার কঠিন অধিকার চাই। সহজ সোহাগ ক্ষুদ্র সুখ তাঁর কাছে চাহি না। তাঁর সাথে সাথে আমি নিত্য সেবা করিব ও তাঁর সাহচর্য্য লাভ করিব ইহাই আমার জীবনের সর্ব্বস্ব। এ ছাড়া জীবনে আর যত সুখ যত সৌভাগ্য সবই আমি তুচ্ছ করিতে পারি। ইচ্ছা হয়তো তিনি সে সব হইতে আমাকে বঞ্চিত করুন তবু সেবায় সদাই তাঁর পাশে পাশে চাই থাকিতে। তাঁর হাতে হাত মিলাইয়া একত্র করিতে চাই সেবা। একত্র সেবাই হইল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বরণ। সেই বরণ দিয়াই স্বামীকে পাইয়া যাইতে চাই এই জীবনে।

১। সত্য স্বামীকেই বরণ করিব।

সাচা সাঈঁ সোধি করি সাচা রাখী ভাৱ।
দাদূ সাচা নাঁৱ লে সাচে মারগ আৱ॥
সাচা সতগুরু সোধি লে সাচে লীজৈ সাধ।
সাচা সাহিব সোধি করি দাদূ ভগতি অগাধ॥
সাঈঁ মেরা সত্য হৈ নিরংজন নিরকার।
দাদূ বিনসৈ দেৱতা* ঝূঠা সব আকার॥
জে থা কংত কবীরকা সোঈ বর বরিহূঁ।
মনসা বাচা করমনা মৈঁ ঔর ন করিহূঁ॥

"সত্য স্বামীকে অন্বেষণ করিয়া ও (অন্তরে) ভাব সত্য রাখিয়া, হে দাদূ, লও সত্য নাম, আইস সত্য পথে।

সত্য সদ্‌গুরুকে লও খুঁজিয়া, সত্যকে লও সাধন করিয়া; হে দাদূ, সত্য প্রভুকে খুঁজিয়া পাইলেই ভক্তি হয় অগাধ।

স্বামী আমার সত্য, তিনি নিরঞ্জন নিরাকার; হে দাদূ, আকার সব ঝুঠা, দেবতা সব ঝুঠা, তাহাদের বিনাশ আছে।

কবীরের যিনি ছিলেন কান্ত সেই বরকেই করিব বরণ; মন বচন ও কর্ম্মে অন্যের সঙ্গে আমার নাই কোনো কাজ।"

২। সত্যগুরু জনম মরণের অতীত।

উঠৈ ন বৈঠৈ এক রস জাগৈ সোৱৈ নাহিঁ।
মরৈ ন জীৱৈ জগতগুরু সব উপজি খপৈ উস মাহিঁ॥
জামৈঁ মরৈ সো জীৱ হৈ রমিতা রাম ন হোই।
জনম মরণ তৈঁ রহিত হৈ মেরা সাহিব সোই॥

---

* "দেখতা" পাঠও আছে। তবে অর্থ হইবে "মিথ্যা সব আকার দেখিতে দেখিতে যায় বিনষ্ট হইয়া।"

"যিনি জগদ্‌গুরু তাঁর নাই উঠা বসা, তিনি না করেন শয়ন না তিনি জাগেন, না তিনি মরেন না বাঁচেন ; তিনি এক রস, তাঁহারই মধ্য হইতেই সব কিছু উপজে এবং তাঁহাতেই সব কিছু পায় বিনাশ।

জন্মে মরে সে তো জীব, লীলাময় রাম তো সে নয়। জনম মরণ হইতে রহিত যিনি তিনিই আমার স্বামী।"

৩। অবতার ব্রহ্ম নহেন।

ক্রিত্রিম নহীঁ সোঁ ব্রহ্ম হৈ ঘটৈ বধৈ নহিঁ জাই।
পূরণ নিহচল একরস জগতি ন নাচৈ আই॥
উপজৈ বিনসৈ গুণ ধরৈ য়হু মায়া কা রূপ।
দাদূ দেখত থির নহীঁ ছিন ছাহীঁ ছিন ধূপ॥
জে নাহীঁ সো উপজৈ হৈ সো উপজৈ নাহীঁ।
অলখ আদি অনাদি হৈ উপজৈ মায়া মাহিঁ॥
জে য়হু করতা জীব থা সঁপুটি কূ্যঁ আয়া।
করমোঁ কে বসি কূ্যঁ ভয়া কূ্যঁ আপ বঁধায়া॥
কূ্যঁ সব জোনী জগত মেঁ ঘর বার নচায়া।
কূ্যঁ য়হ করতা জীব হ্‌বৈ পর হাথ বিকায়া॥
দাদূ ক্রিত্রিম কাল বস জো বংধ্যা গুণ মাহিঁ।
ঔপজৈ বিনসৈ দেখতাঁ সো য়হু করতা নাহীঁ॥

"যিনি কৃত্রিম নহেন, যাঁহার হ্রাস বৃদ্ধি হইতে পারে না তিনিই তো ব্রহ্ম। তিনি পূর্ণ নিশ্চল একরস, তিনি জগতে আসিয়া নাচিয়া বেড়ান না।

উৎপন্ন হয়, বিনষ্ট হয়, গুণাধীন হয় এ সব তো মায়ারই রূপ ; দাদূ দেখিতেছে এই মায়া কখনও স্থির নহে, ইহা ক্ষণে ছায়া ক্ষণে রৌদ্র।

যে নাই সে-ই আসিয়া হয় উৎপন্ন, যে নিত্য-বিরাজমান সে তো কখনও উৎপন্ন হইতেই পারে না। তিনি অলখ আদি-অনাদি, উৎপন্ন যাহা হয় তাহা তো মায়ারই অধীন।

যদি এই জীব (অবতার) কর্ত্তাই ছিলেন তবে কেন তিনি আসিলেন

গর্ভবন্ধনের মধ্যে? কেন তবে তিনি কর্ম্মের হইলেন বশ, কেন তিনি তবে আপনাকে করিলেন বদ্ধ?

কেন জগতে সব যোনিতে তিনি আসিলেন? কেন বৃথা সংসারীর মত সংসারের সব নাচ তিনি গেলেন নাচিয়া? কেন সেই জীব কর্ত্তা হইয়াও পরের হাতে বৃথা বিকাইলেন আপনাকে?

হে দাদূ, যে কৃত্রিম, কালবশ, যে গুণের দ্বারা বদ্ধ, যে দেখিতে দেখিতে উৎপন্ন ও বিনষ্ট হয়, সে তো কখনও কর্ত্তা নহে।"

৪। তুমি ও তোমার সেবাই আমার সব।

সারৌঁ কে সিরি দেখিয়ে উস পরি কোই নাহিঁ।
দাদূ জ্ঞান বিচার করি সো রাখ্যা মন মাহি ॥
সব লালৌঁ সিরি লাল হৈ সব খূবৌঁ সিরি খূব।
সব পাকৌঁ সিরি পাক হৈ দাদূ কা মহবূব ॥
আনহু পুরুষ রহ নহীঁ পরম পুরুষ ভরতার।
হূঁ অবলা সমঝৌ নহীঁ তূঁ জানৈ করতার ॥
লোহা মাটী মিলি রহ্যা দিন দিন কাঈ খাই।
দাদূ পারস রাম বিন কতহূঁ গয়া বিলাই ॥
সেৱা সুখ প্রেমরস সহজ সোহাগ নতি দেহু।
বাঁহ বল দে দাস কৌঁ দাদূ তুজা সব লেহু ॥

"চাহিয়া দেখ, তিনি সকল সারেরও শির (সার), তাঁহার উপর আর কেহ নাই। দাদূ জ্ঞান বিচার করিয়া তাঁহাকেই রাখিয়াছে মনের মধ্যে।

সকল প্রিয় হইতে তিনি প্রিয়, সকল শ্রেয়ঃ হইতে তিনি শ্রেয়ঃ, সকল পবিত্র হইতে তিনি পবিত্র, তিনিই তো দাদূর প্রেমাস্পদ।

অন্য পুরুষ তো তিনি নহেন, তিনি পরমপুরুষ স্বামী। আমি অবলা কিছুই তো বুঝি না, হে কর্ত্তা, যাহা জানিবার তুমিই জান।

"যিনি জগদ্‌গুরু তাঁর নাই উঠা বসা, তিনি না করেন শয়ন না তিনি জাগেন, না তিনি মরেন না বাঁচেন ; তিনি এক রস, তাঁহারই মধ্য হইতেই সব কিছু উপজে এবং তাঁহাতেই সব কিছু পায় বিনাশ।

জন্মে মরে সে তো জীব, লীলাময় রাম তো সে নয়। জনম মরণ হইতে রহিত যিনি তিনিই আমার স্বামী।"

৩। অবতার ব্রহ্ম নহেন।

ক্রিত্রিম নহীঁ সোঁ ব্রহ্ম হৈ ঘটৈ বধৈ নহিঁ জাই।
পূরণ নিহচল একরস জগতি ন নাচৈ আই॥
উপজৈ বিনসৈ গুণ ধরৈ য়হু মায়া কা রূপ।
দাদূ দেখত থির নহীঁ ছিন ছাহীঁ ছিন ধূপ॥
জে নাহীঁ সো উপজৈ হৈ সো উপজৈ নাহীঁ।
অলখ আদি অনাদি হৈ উপজৈ মায়া মাহিঁ॥
জে য়হু করতা জীব় থা সঁপুটি কূ্যঁ আয়া।
করমৌঁ কে বসি কূ্যঁ ভয়া কূ্যঁ আপ বঁধায়া॥
কূ্যঁ সব জোনী জগত মেঁ ঘর বার নচায়া।
কূ্যঁ য়হ করতা জীব় হ্বৈ পর হাথ বিকায়া॥
দাদূ ক্রিত্রিম কাল বস জো বংধ্যা গুণ মাহিঁ।
ঔপজৈ বিনসৈ দেখতাঁ সো য়হু করতা নাহীঁ॥

"যিনি কৃত্রিম নহেন, যাঁহার হ্রাস বৃদ্ধি হইতে পারে না তিনিই তো ব্রহ্ম। তিনি পূর্ণ নিশ্চল একরস, তিনি জগতে আসিয়া নাচিয়া বেড়ান না।

উৎপন্ন হয়, বিনষ্ট হয়, গুণাধীন হয় এ সব তো মায়ারই রূপ ; দাদূ দেখিতেছে এই মায়া কখনও স্থির নহে, ইহা ক্ষণে ছায়া ক্ষণে রৌদ্র।

যে নাই সে-ই আসিয়া হয় উৎপন্ন, যে নিত্য-বিরাজমান সে তো কখনও উৎপন্ন হইতেই পারে না। তিনি অলখ আদি-অনাদি, উৎপন্ন যাহা হয় তাহা তো মায়ারই অধীন।

যদি এই জীব (অবতার) কর্ত্তাই ছিলেন তবে কেন তিনি আসিলেন

গর্ভবন্ধনের মধ্যে ? কেন তবে তিনি কর্ম্মের হইলেন বশ, কেন তিনি তবে আপনাকে করিলেন বদ্ধ ?

কেন জগতে সব যোনিতে তিনি আসিলেন ? কেন বৃথা সংসারীর মত সংসারের সব নাচ তিনি গেলেন নাচিয়া ? কেন সেই জীব কর্ত্তা হইয়াও পরের হাতে বৃথা বিকাইলেন আপনাকে ?

হে দাদূ, যে কৃত্রিম, কালবশ, যে গুণের দ্বারা বদ্ধ, যে দেখিতে দেখিতে উৎপন্ন ও বিনষ্ট হয়, সে তো কখনও কর্ত্তা নহে।”

৪। তুমি ও তোমার সেবাই আমার সব।

সারৌঁ কে সিরি দেখিয়ে উস পরি কোই নাহিঁ।
দাদূ জ্ঞান বিচার করি সো রাখ্যা মন মাহি॥
সব লালৌঁ সিরি লাল হৈ সব খূবৌঁ সিরি খূব।
সব পাকৌঁ সিরি পাক হৈ দাদূ কা মহবূব॥
আনহু পুরুষ রহ নহীঁ পরম পুরুষ ভরতার।
হূঁ অবলা সমঝৌঁ নহীঁ তূঁ জানৈ করতার॥
লোহা মাটী মিলি রহ্যা দিন দিন কাঈ খাই।
দাদূ পারস রাম বিন কতহূঁ গয়া বিলাই॥
সেরা সুখ প্রেমরস সহজ সোহাগ নতি দেহু।
বাঁহ বল দে দাস কৌঁ দাদূ তুজা সব লেহু॥

“চাহিয়া দেখ, তিনি সকল সারেরও শির (সার), তাঁহার উপর আর কেহ নাই। দাদূ জ্ঞান বিচার করিয়া তাঁহাকেই রাখিয়াছে মনের মধ্যে।

সকল প্রিয় হইতে তিনি প্রিয়, সকল শ্রেয়ঃ হইতে তিনি শ্রেয়ঃ, সকল পবিত্র হইতে তিনি পবিত্র, তিনিই তো দাদূর প্রেমাস্পদ।

অন্য পুরুষ তো তিনি নহেন, তিনি পরমপুরুষ স্বামী। আমি অবলা কিছুই তো বুঝি না, হে কর্ত্তা, যাহা জানিবার তুমিই জান।

লোহা রহিল মাটিতে মিশাইয়া, দিন দিন মরিচাই খাইয়া ফেলিল যে তাহাকে, পরশমণি রাম বিনা কোথায় যে গেল দাদূ বৃথা বিলয় হইয়া!

সেবার আনন্দ প্রেমরস সহজ সৌভাগ্য ও প্রণতি আমাকে দাও; দাসকে দাও আপন বাহুতে শক্তি। দাদূ বলেন, বাকি আর যা কিছু, সে সব তুমিই যাও লইয়া অর্থাৎ তাহা তোমারই থাকুক।”

ষষ্ঠ প্রকরণ—প্রেম

প্রথম অঙ্ক—“বিরহ”

ভগবানের সঙ্গে মানবের যেমন সম্বন্ধ এমন সম্বন্ধ আর কিছুর সঙ্গেই নয়। তাঁকে দেখিতে তাঁকে পাইতে তাঁর প্রেম অনুভব করিতেই এই জগতে আসা। জীবনে যদি তাঁর সঙ্গ না লাভ হইল তবে বৃথাই এই জীবন। এই ব্যর্থতার দুঃখের চেয়ে বেশী দুঃখ ও অকৃতার্থতা মানবজীবনে আর নাই। তাঁর বিরহের অনুভব যার অন্তরে হইয়াছে তার আর দিনে সুখ নাই রাত্রে “সোয়াস্তি” নাই। কিন্তু এই ব্যথা এই বিরহ যার হয় নাই সে আরও হতভাগ্য। জগতে আসিয়া সে যে কি অকৃতার্থ হইয়া গেল কি বঞ্চিতই রহিয়া গেল, তাহা সে বুঝিলই না।

তাঁহার বিরহে যে ব্যাকুল হইয়াছে সে তাঁকে পাইবার জন্য সবই ছাড়িতে পারে কাজেই এই বৈরাগ্য হইল প্রেমের। এই বৈরাগ্য নাস্তি-ধর্ম্মাত্মক (negative) নয় ইহা অস্তি-ধর্ম্মাত্মক (Positive)।

এই বেদনার মধ্য দিয়া ছাড়া তাঁহাকে পাইবারও কোন পথ নাই। এই দুঃখের মধ্য দিয়াই সেই দরদীকে যায় পাওয়া। তবে দুঃখ যেন লোক-দেখান ঝুঠা দুঃখ না হয়, সাচ্চা দুঃখ হওয়া চাই। তাঁহাকে পাইলে তখন সব আবরণ যায় দূর হইয়া। তাঁহাকে পাইবার জন্য বিরহ ভাব জন্মিলে মানুষ আর সব উপায় আর সব পথকে দেয় দূরে ফেলিয়া।

তাঁহাকে না পাইলে আর কোনো উপায়ে বা আর কিছু দিয়া এই বিরহ বেদনার অবসান হয় না। কাজেই এই বিরহ যাহার হইয়াছে তাহার আর দুঃখের অবধি নাই। সবাই যখন সুখী তখনও বিরহীর কোনো আনন্দ নাই। বাহিরেও সে এই দুঃখ প্রকাশ করিয়া জানাইতে পারে না, কারণ অন্তরের এই পবিত্র মহাভাবকে লোক-দেখান বস্তু করিতে গেলে প্রেমের অপমান ঘটে। প্রেমের যে অপমান করে সে কেমন করিয়া প্রেমাস্পদকে পায়?

অন্তরের সব সঙ্কীর্ণতা ক্ষুদ্রতা ও মলিনতা মুহূর্ত্তে সহজে দূর করিয়া দেয় এক এই বিরহ। কিন্তু সেই বিরহ সাচ্চা হওয়া চাই। কথার কথা যে বিরহ

তাহাতে কোনো ফলই নাই। এই বিরহ এই ঝুঠা জীবনকে মারিয়া সাচ্চা নবজীবন দেয়। মানব অনায়াসে এই মৃত্যুকে স্বীকার করে। কারণ নবজীবন না পাইলে ভগবানকে পাওয়া যায় না।

বিরহ হইল তাঁহাকে পাওয়ার ইচ্ছা। আকাঙ্ক্ষা ও ব্যাকুলতা না হইলে কিছুই পাওয়া যায় না এবং পাইলেও সেই পাওয়ার আনন্দটি মেলে না। এই বিরহ জন্মিলে তাঁহাকে ছাড়া জীবনধারণ করাই হয় আশ্চর্য্য ব্যাপার। বিরহ হইলে মানুষ সকল অঙ্গ দিয়া নিঃশেষে তাঁহার মাধুর্য্য অনুভব করিতে ও তাঁহাকে পাইতে চায়।

ক্ষুধার দুঃখ অতি দারুণ দুঃখ। অথচ এই দুঃখ-বিনা ভোজনের কোনো সুখই নাই। ক্ষুধার দুঃখের মধ্য দিয়াই মেলে ভোজনের আনন্দ।

বিরহ বিনা প্রেম-স্বরূপের কাছে পৌঁছিবার কোনোই পথ নাই। প্রেম-স্বরূপকে পাইতে হইলে আপনাকে নিঃশেষে তাঁর চরণে বিসর্জ্জন দেওয়া চাই, সব পথ ছাড়িয়া প্রেমপথই গ্রহণ করিতে হয়। এই প্রেমে এককে আর করে। প্রেমের পরশমণিতে প্রেমিক হইয়া যায় প্রেমাস্পদ, প্রেমাস্পদ হইয়া যায় প্রেমিক। এই তত্ত্বটি সুফীদের মধ্যে খুবই প্রচলিত। বাংলায় মহাপ্রভু চৈতন্যের মধ্যে যে শ্রীমতীর ভাবগ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অবতরণ, তাহার মধ্যেও প্রেমের এমনই একটি রহস্য নিহিত ছিল। কবিরাজ গোস্বামীর চৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থের "শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা" প্রভৃতি শ্লোক পড়িলে তাহা বেশ বোঝা যায়। বাউলদের মধ্যে তো এই ভাব অতিশয় প্রবল।

প্রেমযোগে ভক্ত তাঁহাতে যায় বিলীন হইয়া। প্রেমে আত্ম বিসর্জ্জন দিয়া ভক্ত সেই প্রেমাস্পদের মহাসত্তায় ফেলে আপনা হারাইয়া। ইহাই প্রেমযোগ, প্রেম-সমাধি, প্রেম-মুক্তি ও প্রেম-নির্ব্বাণ। প্রেমের সাধনা বড় কঠিন সাধনা। এই সাধনা একেলা যদি সাধকেই করিতে হইত তবে সিদ্ধকাম হইবার কোনো উপায়ই ছিল না, কিন্তু ভগবানই ইহার প্রধান সহায়।

না বুঝিয়াও এই যে প্রেমেতে আপনাকে প্রেমময়ের রসে মজাইয়া দেওয়া তাহাই অনন্ত ও অপার সৌন্দর্য্যের মূল। প্রেমেরই প্রকাশ সৌন্দর্য্য। যে সহজ প্রেম নিঃশেষে না জানিয়াও আপনাকে পরিপূর্ণ ভাবে সমর্পণ করিতে পারে সে-ই অনন্ত সৌন্দর্য্যের অধিকারী হয়। এই বিশ্বপ্রকৃতি তাঁহাকে

ভাল করিয়া না বুঝিয়াও তাঁর প্রেমে মজিয়াছে, তাই সকল আকাশব্যাপী স্বামীর জন্য তার হরিত পট্টাম্বরের অনন্ত শোভা। তার ফলফুলের অন্ত নাই, তার রসের ও বর্ষণের ভরপূর ভাণ্ডার সদাই উচ্ছ্বসিত।

বিরহেতেই প্রেম মেলে, প্রেমে সৌন্দর্য্য মেলে, আবার বিরহে আপনার সকল ক্ষুদ্রতার ও সঙ্কীর্ণতার অবসান হইয়া প্রেমময়ের সঙ্গে নিত্য যোগ ও তাঁহাতে সদা আনন্দময় বিলয় মেলে, কাজেই ধন্য ধন্য এই বিরহ।

১। প্রেমিকের জন্য প্রেমিকার সদাই কাতরতা, সদাই তাঁর দরশনের জন্য অবসর করিয়া প্রেমিকা আছে প্রতীক্ষা করিয়া।

তাঁর বিরহে যে কত দুঃখ তাহা তাঁহাকে জানাইবার উপায় কোথায়? তিনি যদি দেখা না দেন তবে কে তাঁকে খবর দেয়? আর তিনি যদি আসেন তবে আর দুঃখ থাকে কোথায়? তাঁহার বাণী শোনে নাই বলিয়া বিরহী তাঁহার ফিরিতেছে ব্যাকুল হইয়া। যথার্থ মিলনের আশা কোথায়?

২। দাদূ বড় দুঃখী। তাঁর বিরহে যে বেদনা, তাঁহাকে না পাইলে তাহার তো কোনো প্রতীকার নাই! মন তাঁর জন্য ব্যাকুল, কেবল তাঁর পথ চাহিয়া আছে। তাঁহাকে ভুলিতে পারিলে দুঃখ হয়তো যায়। কিন্তু তাহাও প্রাণে সহে না; আবার তিনি দেখাও দেন না। দাদূর বড়ই বিপদ হইয়াছে।

৩। তাঁহাকে পাইবার জন্য যে আকাঙ্ক্ষা তাহার অপেক্ষা বড় আকাঙ্ক্ষা জগতে কাহারও কোনো কিছুর জন্যই নাই। নেশাখোর চায় নেশা, বীর চায় বীরত্বের পরীক্ষার জন্য যুদ্ধ, দরিদ্র চায় ধন, চাতক চায় ধারার জল, মীন চায় জলাশয়, চকোর চায় চন্দ্র। কিন্তু দাদূর ভগবদাকাঙ্ক্ষার মত কি এইগুলি এত তীব্র?

ভ্রমর সুগন্ধের জন্য, হরিণ মধুর ধ্বনির জন্য, পতঙ্গ শিখার জন্য প্রাণ পারে দিতে। দাদূ পারে না? প্রতি ইন্দ্রিয় যেমন তাহার বিষয় ছাড়া আর কিছুই চেনে না, তাহাতেই থাকে মজিয়া, দাদূর অন্তরাত্মা তেমনি মজিয়াছে তাঁহাতে।

দেহ যেমন আত্মার প্রিয়, আত্মাকে দেহ যেমন নিত্য সেবা করে, তেমনি

কবে পরমাত্মার প্রেম পাইয়া দাদূ তাঁহার সঙ্গে নিত্য সেবার প্রেমযোগ লাভ করিবে?

৪। দাদূকে একটুকু দরশন দিলে ক্ষতি কি ছিল? তাঁহাকে না পাইয়া দাদূ আছে বেহাল হইয়া? তাঁর সঙ্গে যোগ নাই এমন জীবনকে কি জীবন বলা চলে?

হৃদয়ে বিরহের ব্যথা, দরশন না পাইলে যাইবে না। দেখা পাইলে সে সুখ রাখিবার স্থান নাই।

তাঁহার রূপ তিনি ছাড়া কেহই দেখাইতে পারে না। একবার সেই অনন্ত অসীম রূপ দেখিলে তাহাতে আমাকে "লয়" করিয়া পরমানন্দ করিব লাভ।

৫। তাঁর দরশন চাই, আর কিছুই চাই না। "হে প্রভু, আর সব যাহা দিয়াছ, তুমি ফিরাইয়া নিতে পার। তুমি যদি নিকটে থাক তবে তোমার দরশনের মহানন্দ ছাড়া আর কিছুই চাহিব না। যেই ভাবের মধ্যে আছি সেইভাবের মধ্যেই আসিয়া দেখা দাও। আমি যে আর প্রতীক্ষা করিতে পারিতেছি না। তোমাকে না পাইলে আর সব বস্তুতে লাভ কি? আর তোমাকে পাইলে আর সব বস্তুতে প্রয়োজন কি?

৬। প্রেমের দুঃখবেদনাকেও ভয় করি না যদি বুঝি তোমাকে পাইব। এই বেদনা না হইলে তো কোনো আশাই নাই। পিপাসা নাই অথচ অস্থিরতা জানাইতেছি তাহাতে কি ভগবদ্রস সম্ভোগ হয়? আমাকে প্রেমের বেদনা দাও, সহজ প্রেম দাও, সব পরদা জলিয়া যাউক। মন যদি প্রেমে সদা ব্যাকুল থাকে তবেই তো তোমাকে পাওয়া যাইবে।"

৭। সব সাধনা সব ভোগ ছাড়িয়া তাঁহার বিরহই সার করিয়া থাকিতে হইবে। বিরহীর কি বুদ্ধিশুদ্ধি জ্ঞান, সমাজ শাস্ত্র সম্প্রদায় প্রভৃতি কিছু থাকিতে পারে? শাস্ত্রের লেখা দেখিয়া প্রেম করিয়াছি এমন কথা যেন কেহ না, বলিতে পারে? প্রেমের এত বড় অপমান আর নাই। সত্য প্রেম যদি পাই তবে এই সব মিথ্যা আবরণ জলিয়া শেষ হইয়া যাইবে। শুধু এই সব কেন, আপনাকেও সুদ্ধ প্রেমের কাছে বলি দিতে হইবে। মরিয়াও যেদিন মরিব না সেদিন বুঝিব প্রেমরসের পেয়ালা সত্যই হইয়াছে পান করা।

৮। বিরহ আগুনে যদি জলি তবে এই আশাতেই সুখ যে তিনি কোন-

দিন আসিয়া স্বয়ং এই দাহ নিবাইবেন। আর কাহাকেও বা আর কিছুকে দিয়া এই আগুন নিবাইবার চেষ্টা করিয়া যেন প্রেমকে অপমান না করি। কাজেই বিরহী প্রাণ গেলেও বিরহকে ছাড়িতে চাহে না, তাঁর নামই সদা থাকে জপিতে। অন্তরের ব্যথাই যেন তাঁহাকে ডাকিয়া আনে, পরকে দিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠান কোনো কাজের কথা নয়। আমার ব্যথা ছাড়া কে তাঁহাকে বলিবে যে তাঁর জন্য সদাই আছি ব্যাকুল হইয়া,এক পলকের জন্যও শান্তি নাই?

৯। তিনি ছাড়া এ জালা অন্য আর কিছুতে যাইবার নয়। অথচ এই জালা ছাড়া প্রেমেরও সম্ভাবনা নাই। এই ব্যথা না হইলে জীবনটাই ব্যর্থ গেল। ব্যথাও আবার সাচ্চা অন্তরের ব্যথা হওয়া চাই, ভাণ-ভণ্ডামি প্রেমের জগতে চলে না। কাজেই বাহিরে যেন এই জালা কেহ না দেখায়। সব দুঃখ অন্তরে রাখিবে তবেই পাইবে প্রেমময়কে। এই দুঃখের আগুনেই সব মলিনতা দূর হইয়া অন্তর হইবে নির্ম্মল। তখন সেই নির্ম্মল আদর্শে তাঁহার রূপ দেখা দিবে। ইহাই হইল এই বিরহ দহনের সার্থকতা। এই দাহ যদি বাহিরে প্রকাশ কর, তবে অন্তরের “কশ্‌মল” (পাপ বন্ধন) কেমন করিয়া দগ্ধ হইবে? সব অগ্নি যে বাহিরেই যাইবে চলিয়া। অন্তরের মধ্যেই যদি ব্যথা রাখ তিনিও অন্তর দিয়া বুঝিয়া ব্যথা দূর করিবেন। “জরণা অঙ্গে” আগাগোড়াই এই তত্ত্বটি বলা হইয়াছে।

১০। সবাই সুখে দিন কাটায়। যাহাদের বিরহ হয় নাই, মনে হয় তাহারা সুখে আছে। কিন্তু আসলে তাহারা হতভাগ্য, তাহাদের জীবনে কোনো আশা কোনো সম্ভাবনা নাই। প্রেম যাহার হইয়াছে তাহার দুঃখের অবধি নাই, কিন্তু তবু তার ভরসা আছে। সে সার্থক হইবে।

১১। বাক্যে কিছু হইবে না। প্রেমের উপযুক্ত সেবা কর, সাধনা কর। এই প্রেমের ক্ষেত্রে ব্যথাই একমাত্র সাধনা। দরদ দিয়াই দরদী তোমাকে লইবেন চিনিয়া।

১২। ব্যথাই সাচ্চা সাধনা। ব্যথা হইতে উপজে প্রেম-ব্যাকুলতা, তবেই মিলনের আশা। নিকটে জল থাকিলে কি হয়? তৃষ্ণা ছাড়া জল গ্রহণ করা যায় কি? ক্ষুধা হইলে তবেই খাদ্যকে যথার্থ লাভ করি। সম্মুখে খাদ্য থাকিলেও ক্ষুধা না থাকিলে তাহা না থাকারই সমান। দেহ সন্তপ্ত না হইলে

নিকটস্থ ছায়াকে লাভ করা যায় না। ব্রহ্মকে পাইতে হইলেও ব্রহ্মতৃষ্ণা চাই। বিরহই এই ব্রহ্মতৃষ্ণা। বিশ্বচরাচর তিনি আছেন ভরিয়া। বিরহ যোগেই তাঁহাকে যথার্থভাবে পাইব।

১৩। এই তত্ত্ব বেদে কোরাণে নাই, আছে প্রেমের শাস্ত্রে। তাহা পড়িতে জানে না বলিয়াই লোকে বিরহকে ভয় পায় এবং প্রেমের জন্য সব ছাড়িতে হইলে করে হাহাকার। প্রেমের শাস্ত্র না জানিলে, প্রেমের রহস্য না বুঝিলে, অন্য শাস্ত্রের তত্ত্ব জানিয়া প্রেমের পথে চলিতে পারিবে না। প্রেম-জগতের রহস্য অতুলনীয়; প্রেমের সেই শাস্ত্র জানিতে হইবে।

১৪। প্রেমের আঘাত যার লাগিয়াছে সে-ই ইহার মর্ম্ম জানে। মর্ম্মে দারুণ আঘাত লাগিয়াছে, জানে সে মরিবে, তবু রণক্ষেত্রের মুমূর্ষু বীরের মত একটু মুচকিয়া সে হাস্য করে।

বিরহ অর্থই বেদনা। বেদনাতে জীবন জাগে, জীবন জাগিলে প্রেম জাগে, প্রেম হইলে সর্ব্ব ইন্দ্রিয় প্রেমের সাধনাতে হয় প্রবৃত্ত। তখন মন পবন ইন্দ্রিয় সবই সহজে হয় স্থির। তাই প্রেমকে বলে সহজ সাধনা।

কি পরিমাণ দিলাম তাহা দিয়া প্রেমের জগতের হিসাব নয়। সর্ব্বস্ব দিলাম কিনা তাহাই দেখিবার। সূর্য্যকে দেখিয়া এক বিন্দু ফুল যে তার সকল জীবন বিকশিত করিয়া দিল তাই তো তাহার পূজা পরিপূর্ণ। প্রেমে, অনুরাগে, ভক্তিতে কল্যাণে সর্ব্বস্ব দিতে হইবে, তা সে যতটুকুই হউক। বঞ্চনা না করিয়া সব দিলেই প্রেম-সাধনা হইবে সাচ্চা।

১৫। তাঁহাকে না দেখিলে দারুণ দুঃখ। এত দুঃখেও জীবন যে থাকে তাই আশ্চর্য্য। "আমার জীবন ভরা পিপাসা, প্রভু, ভগবদ্‌রসের মেঘ বর্ষণ কর।" এই জপই নিরন্তর চলিয়াছে জীবনের মধ্যে। পাঁজরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সকল জীবন ভরিয়া প্রীতি "প্রিয় প্রিয়" জপ করিতেছে। সকল জীবন প্রেমে যখন শ্রবণ-ইন্দ্রিয় হইয়া তাঁর ধ্বনি শুনিতে চায়, যখন রসনা হইয়া তাঁর রস পাইতে চায়, যখন বাণী হইয়া তাঁহার মহিমা প্রকাশ করিতে চায়, যখন নয়ন হইয়া তাঁহার রূপ দেখিতে চায়, তখনই বুঝিব যথার্থ প্রেম হইয়াছে।

১৬। রাত্রি দিনের এই কান্না। কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁর মধ্যে হইবে ডুবিয়া যাইতে। তাঁহাতে লীন হইয়া যাইতে হইবে। ইহাই প্রেমের ব্রহ্ম-বিলয়

ও ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ। এই অগ্নিতে সব মলিনতা দূর হইলে মন হইবে নির্ম্মল। নির্ম্মল মনে তাঁর রূপ হইবে উদ্‌ভাসিত। তাঁর রূপ-যোগের যোগ্যতা না হইলে দেখাও হইবে না, বাঁচিবও না।

১৭। এক ভরসা, আমার সাধনাতে তিনিও আছেন সহায়। সকলে যখন সুখে ঘুমায় তখন ব্যথিতের সঙ্গে জাগেন একমাত্র দরদী জগদ্‌গুরু।

১৮। প্রেমই তাঁর স্বরূপ, প্রেমই তাঁর পরিচয়। তাঁর চরণ ধরিয়া প্রেমেই জীবনকে করিতে হইবে নত। প্রেমের পথ আশ্রয় করিলে শাস্ত্র-ধর্ম্ম সমাজ-ধর্ম্ম প্রভৃতি আর সব পথ হয় বৃথা; সে সব ছাড়িতে হইবে।

১৯। বিরহ ছাড়া আর কেহ তাঁর কাছে পৌছাইয়া দিতে পারে না। তিনি প্রেমময়। প্রেমের চোটে প্রেমিক হইয়া যায় প্রেমাস্পদ প্রেমাস্পদ হয় প্রেমিক। স্বরূপের হয় অদল বদল। তার পর তাঁর মধ্যে প্রেমিক আপনাকে করিয়া দেয় প্রেমে বিলীন। একমাত্র পরিপূর্ণ তিনিই থাকেন।

২০। না জানিয়াও প্রেম যে আপনাকে সহজে সঁপিয়া দেয় তাহাতেই সব সৌন্দর্য্য সব রস। বিশ্বপ্রকৃতি তাঁহার প্রেমে মজিয়া আপনাকে ভরপূর সঁপিয়াছে, তাই তাহার হরিত পট্টাম্বরের শোভার আর অবসান নাই। ফুলে ফলে তাই প্রকৃতি ভরপূর। গগনভরা রসে জগতের ভাণ্ডার ভরপূর। তাই এই প্রেমের সদাই জয়জয়কার।

কালের হস্তে সব কিছুরই ক্ষয়। কিন্তু প্রেম পাইয়াছে বলিয়া বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্য্য কালজয়ী। কালের মুখ কালা করিয়া জগৎপতি জগতে রচনা করিয়াছেন মহোৎসব। তাঁর প্রেম-মেঘে নিরন্তর হইতেছে সৌন্দর্য্য বৃষ্টি। ইহাই প্রেমের সৃষ্টি। প্রেমে এই সৃষ্টি নিরন্তর চলিয়াছে, এই সৃষ্টিতে প্রয়াস নাই ক্লান্তি নাই। তাই নিরবসান এই আনন্দের সৃষ্টি লীলা।

৯। বিরহিণীর বেদনা।

রতিবংতী আরতী করৈ রাম সনেহী আৱ।
দাদূ অৱসর অব মিলৈ য়হ বিরহিনী কা ভাৱ॥
বিরহিনী দুখ কা সনি কহৈ কা সনি দেই সঁদেস।
পংথ নিহারত পীৱকা চিত নাহিঁ সুখ লেস॥

বিরহিনী দুখ কা সনি কহৈ জানত হৈ জগদীস।
দাদূ নিসদিন বিরহী হৈ বিরহা করৱত সীস॥
সাহিব মুখি বোলৈ নহীঁ সেৱক ফিরৈ উদাস।
য়হু বেদন জিৱ মৈঁ রহৈ ঐন পরস নহিঁ আস॥

"প্রেমে ব্যাকুলা ("রতিবংতী"="আর্ত্তিবন্তী") আর্ত্তি (মনের বেদনা) জানাইতেছে. "হে প্রেমিক রাম তুমি আইস, এই তো উপযুক্ত অবসর, এখন আসিয়া হও মিলিত", এই হইল বিরহিণীর ভাব।

বিরহিণী দুঃখ কহে বা কাহার কাছে, কাহার সনে বা দেয় সে সন্দেশ? বিরহিণী আছে প্রিয়তমের পথ চাহিয়া, চিত্তে নাই তার সুখলেশ।

বিরহিণী দুঃখ কহে আর কাহার কাছে? জগদীশই তাহা জানেন, নিশিদিন দাদূ বিরহেই আছে ডুবিয়া, করাতের মত বিরহ কাটিতেছে মাথা।

মুখে কথাটিও বলিলেন না স্বামী, সেবক তাই ফিরিতেছে উদাস হইয়া, এই বেদনাই অন্তরে গেল রহিয়া যে যথার্থভাবে মিলনের (পরশের) আর আশাও নাই।"

২। দাদূর দুঃখের অবধি নাই।

দাদূ ইস সংসার মৈঁ মুঝসা দুখী ন কোই।
পীৱ মিলন কে কারনৈ মৈঁ জল ভরিয়া রোই॥
না ৱহ মিলৈ না মৈঁ সুখী কহু ক্যোঁ জীৱন হোই।
জিন মুঝকোঁ ঘায়ল কিয়া মেরী দারু সোই॥
জব লগি সুরতি মিটৈ* নহীঁ মন নিহচল নহিঁ হোই।
তব লগি পিয় পরসৈ নহীঁ বড়ী বিপতি য়হ মোই॥
দরসন কারনি বিরহিনী বৈরাগিন হোৱৈ।
দাদূ বিরহ বিয়োগিনী হরি মারগ জোৱৈ॥

---

* "জবলগি সুরতি সমিটৈ নহীঁ" পাঠ হইলে অর্থ হইবে "যতদিন না ধ্যান হয় ঘনীভূত ও পরিপূর্ণ।"

হে দাদূ, এই সংসারে আমার মত দুঃখী আর কেহই নাই; প্রিয়তমের সঙ্গে মিলনের জন্য আমি কাঁদিয়া জল ভরিয়াছি (ধারা বহাইয়াছি)।

না তাঁকে পাইলে না হই আমি সুখী, বল, এই জীবন আছে কি লাগিয়া? যিনি আমাকে করিয়াছেন "ঘায়েল" (আহত) তিনিই তো আমার ঔষধ।

যে পর্য্যন্ত স্মৃতিটুকু না যায় মুছিয়া তাবৎ মন তো হয় না স্থির। সে পর্য্যন্ত প্রিয়তমও করেন না পরশ (যে পর্য্যন্ত মন স্থির না হয়), এই তো আমার বড় বিপদ। দরশনের জন্যই বিরহিণী হইয়াছে বৈরাগিণী, বিরহ-বিয়োগিনী দাদূ হরির "পংথ" আছে চাহিয়া।"

৩। তাঁহাতেই সকল আকাঙ্ক্ষা।

জ্যূঁ অমলীকৈ চিত অমল হৈ সূর কৈ সংগ্রাম।
নিরধন কৈ চিত ধন বসৈ য়োঁ দাদূ মন রাম॥
জ্যূঁ চাতৃগ চিতি জল বসৈ জ্যূঁ পানী চিত মীন।
জৈসৈ চংদ চকোর হৈ ঐসৈঁ হরি সৌঁ কীন॥
ভরঁরা লুবধী বাসকা মোহ্যা নাদ কুরংগ।
যৌঁ দাদূ কা মন রাম সৌঁ জ্যোঁ দীপক জ্যোতি পতংগ॥
স্রবনা রাতে নাদ সৌঁ নৈনাঁ রাতে রূপ।
জিভ্যা-রাতী স্বাদ সৌঁ ত্যৌঁ দাদূ এক অনূপ॥
দেহ পিয়ারী জীৱ কৌঁ নিসদিন সেৱা মাহিঁ।
দাদূ জীৱন মরণ লৌঁ কবহূঁ ছাড়ী নাহিঁ॥
দেহ পিয়ারী জীৱ কৌঁ জীৱ পিয়ারা দেহ।
দাদূ হরিরস পাইয়ে জৈ ঐসা হোই সনেহ॥

"পানাসক্তের চিত্তে যেমন সদা রহিয়াছে পানের আকাঙ্ক্ষা, শূরের চিত্তে যেমন সদাই আছে সংগ্রামের জন্য ব্যাকুলতা, নির্ধনের চিত্তে যেমন সদাই ধনের বাসনা আছে (ভরিয়া), তেমনই দাদূর মনে (ভরিয়া আছে) ভগবানের জন্য ব্যাকুলতা।

যেমন চাতকের চিত্তে বসিয়া আছে জলের বিরহ, মীনের চিত্তে যেমন

জলের জন্য ব্যাকুলতা, চন্দ্রের জন্য যেমন চকোরের আকাঙ্ক্ষা, এমনই (প্রেম করিয়াছে দাদূ) হরির সঙ্গে।"

ভ্রমর যেমন গন্ধে লুব্ধ, কুরঙ্গ যেমন নাদে মুগ্ধ, পতঙ্গ যেমন দীপশিখায় (আকৃষ্ট), তেমনি দাদূর মন ভগবানের জন্য (লুব্ধ মুগ্ধ ও আকৃষ্ট)।

শ্রবণ অনুরক্ত নাদে, নয়ন অনুরক্ত রূপে, জিহ্বা অনুরক্ত স্বাদে, তেমনি দাদূ অনুরক্ত এক অনুপমে।

নিশিদিন সেবার মধ্যে যুক্ত দেহই আত্মার প্রিয়, জীবনে মরণে দাদূ কখনও তাঁহাকে পারে না পরিত্যাগ করিতে।

দেহও আত্মার প্রিয়, আত্মাও দেহের প্রিয়, যদি এইরূপ স্নেহ তোমার হয় তবেই দাদূ পাইলে হরিরস।"

৪। তোমা বিনা ব্যর্থ জীবন।

হম দুখিয়া দীদারকে মিহরবান দিখলাই।
দাদূ থোড়ী বাত থী জে টুক দরস দিখাই॥
ক্যা জীৱে মৈঁ জীৱণাঁ বিন দরসন বেহাল।
দাদূ সোই জীৱণাঁ পরগট দরসন লাল॥
বিথা তুম্হারে দরসকী মোহি ব্যাপৈ দিন রাত।
দুখী ন কীজৈ দীন কৌঁ দরসন দীজে তাত॥
ইস হিয়ড়ে য়ে সাল পিয় বিন ক্যোঁহি ন জাইসী।
জব দেখৌঁ মেরা লাল তব রোম রোম সুখ আইসী॥
তূঁ হৈ তৈসা প্রকাস করি অপনাঁ আপ দিখাই।
হৌঁ দেখৌঁ দেখত মিলৌঁ তৌ জীৱ সুখ পাই॥

"আমি ঐ রূপের কাঙ্গাল, হে দয়াময়, (ঐ রূপ) দেখাও, হে দাদূ, এই তো ছিল সামান্য কথা (প্রার্থনা) যে একটু দরশন দেখাও।

কি জীবন লইয়াই থাকা বাঁচিয়া! বিনা দরশনে যে (আমি) "বেহাল" (অতিশয় দুর্দশাগ্রস্ত); হে দাদূ, সেই তো জীবন যাহাতে বল্লভের সঙ্গে হয় প্রত্যক্ষ দরশন।

তোমাকে দরশনের জন্য বেদনা দিন রাত আছে আমাতে প্রবল হইয়া; দীনকে আর করিও না দুঃখী, হে তাত, দরশন দাও।

এই হৃদয়ের মাঝে এই তো শাল (বিদ্ধশল্যের যাতনা), প্রিয়তম বিনা কিছুতেই তো তাহা যাইবে না। যখন দেখিব আমার বল্লভকে, তখনই শরীরের প্রতি অণু পরমাণুতে (রোমে রোমে) আসিবে আনন্দ।

তুমি যে আছ সেই অনুরূপ (সত্তার অনুরূপ) প্রকাশ করিয়া আপনাকে আপনি দেখাও; আমি দেখি, আর দেখিতে দেখিতে তোমার মধ্যে যাই মিলিয়া, তবেই জীবন পায় তার পরমানন্দ।”

৮। তোমা ছাড়া কিছুই চাই না।

জে কুছ দিয়া হমকোঁ সো সব তুম হীঁ লেহু।
ভাবৈঁ হমকোঁ জালি দে দরস আপনা দেহু॥
দীন দুনী সদকৈ করৌঁ টুক দেখণ দে দীদার।
তন মন ভী ছিন ছিন করৌঁ ভিস্ত দোজগ ভী ৱার॥
দূজা কুছ মাঁগৈঁ নহীঁ হমকোঁ দে দীদার।
তূঁ হৈ তব লগ এক টগ দাদূকে দিলদার॥
দাদূ দরসন কী রলী হমকোঁ বহুত অপার।
ক্যা জানৌঁ কবহীঁ মিলৈ মেরা প্রাণ অধার॥
দাদূ কারণি কংতকে খরা দুখী বেহাল।
মীরাঁ মেরা মিহর করি দে দরসন দরহাল॥

“দাদূ কহিতেছে, যাহা কিছু (আমাকে) দিয়াছ সব তুমিই লও ফিরাইয়া, চাও তো আমাকে ফেল দগ্ধ করিয়া, শুধু দাও তোমার দরশন।

আমার দীন-দুনিয়া (ইহলোক-পরলোক) সব করিব আমি উৎসর্গ, একটুকু দর্শন দিও আমায় প্রেমময়ের। তনু মন ও আমার করিব ছিন্নভিন্ন, স্বর্গ নরকও আমি দিব উৎসর্গ করিয়া।

আর কিছুই আমি চাহি না, আমাকে দাও স্বধু দরশন, তুমি যতদিন (নয়নের কাছে) আছ, ততদিন অনিমেষ থাকিব চাহিয়া, তুমি যে দাদূর প্রেমের ধন!

দাদূ দরশনের জন্য ব্যাকুল, অপার প্রভূত আমার ব্যাকুলতা ; কেমন করিয়া জানিব কবে আসিয়া মিলিবেন আমার প্রাণাধার ?

কান্তের জন্য দাদূ সত্য সত্যই বিষম বেহাল দুঃখী, প্রভু আমার দয়া করিয়া এই অবস্থাতেই আসিয়া দাও দরশন।”

৬। প্রেমের ব্যথা গ্রন্থ।

তালা বেলী প্যাস বিন কোঁ রস পীয়া জাই।
বিরহা দরসন দরদ সোঁ হম কোঁ দেহু খুদাই॥
তালা বেলী পীড়সোঁ বিরহা প্রেম পিয়াস।
দরসন সেতী দীজিয়ে বিলসৈ দাদূ দাস॥
হমকোঁ অপনা আপ দে ইস্ক মুহব্বত দর্দ।
সহজ সুহাগ সুখ প্রেম রস মিলি খেলৈঁ লা-পর্দ॥
প্রেম ভগতি মাতা রহৈ তালা বেলী অংগ।
সদা সপীড়া মন রহৈ রাম রমৈ উন সংগ॥

“পিপাসা নাই বলিয়াই তো এই ব্যাকুলতা অস্থিরতা, কেমন করিয়া (প্রেম) রস তবে করা যায় পান ? বিরহ ব্যথার মধ্য দিয়াই তো দরশন, হে খোদা, শুধু সেই (মহা) বস্তুটি আমাকে দাও।

ব্যথাতেই তো ব্যাকুলতা, প্রেমের পিপাসাই হইল বিরহ ; নিজের সঙ্গে দাও দরশন, তবেই দাস দাদূর পরমানন্দ।

নিজেই নিজেকে তুমি দাও আমাকে, দাও অনুরাগ প্রেম ও (বিরহের) বেদনা, দাও সহজ সৌভাগ্য সহজ সুখ, দাও প্রেমরস ; সকল বাধা (পর্দা) দূর করিয়া খেলিব তোমার সঙ্গে।

সদা প্রেম ভক্তিতে যে জন থাকে মত্ত, যাহার শরীর সদা ব্যাকুল, যার মন প্রেমের বেদনায় সদাই ব্যথিত, তার সঙ্গেই রাম করেন বিহার।”

৭। সব ছাড়িলে তবে মিলিবে।

জ্ঞান ধ্যান সব ছাড়ি দে জপ তপ সাধন জোগ।
দাদূ বিরহা লে রহৈ ছাড়ি সকল রস ভোগ॥

জহাঁ বিরহ তহঁ ঔর ক্যা সুধি বুধি নাঠে জ্ঞান।
লোক বেদ মারগ তজে দাদূ একৈ ধ্যান ॥
দাদূ ইশ্‌ক অল্লাজসেঁী ঐসেঁ কহৈ ন কোই।
দর্দ মোহব্বতি পাইয়ে সাহিব হাসিল হোই ॥
দাদূ ইশ্‌ক অলাহকা কবহূঁ প্রগটৈ আই।
তন মন দিল অরল্লাহকা সব পরদা জলি জাই ॥
জব লগ সীঁস ন সৌঁপিয়ে তব লগ ইশ্‌ক ন হোই।
আসিক মরণৈ না ডরৈ পিয়া পিয়ালা সোই ॥

"জ্ঞান ধ্যান জপ তপ সাধন যোগ সব দাও ফেলিয়া, হে দাদূ, সকল রস ভোগ ছাড়িয়া দিয়া এক বিরহ লইয়াই থাক।

যেখানে বিরহ সেখানে আর কিছু কি থাকে? বুদ্ধিশুদ্ধি জ্ঞান সবই (বিরহ) ফেলে নষ্ট করিয়া; লোক (লোকাচার সম্প্রদায়-ধর্ম্ম প্রভৃতি) বেদ (শাস্ত্র উপদেশাদি) মার্গ (ধর্ম্ম সাধনা প্রভৃতি) সব ছাড়িয়া দিয়া, হে দাদূ, সে রহে এক বিরহেরই ধ্যানে।

সেই ধ্বনিতেই নিত্যযুক্ত প্রেম, প্রেম কথাটি তো এমন করিয়া কেহ বলে না। (যদি বলিত), তবে প্রেম ও বিরহ-বেদনা প্রাপ্ত হইয়া পরমাত্মাকে জীবনেই করিত উপলব্ধি।

হে দাদূ, আল্লার প্রতি প্রেম যদি কোনো দিন আসিয়া এমন করিয়া জীবনে হয় প্রকটিত, তবে তনু মন হৃদয় প্রভৃতি আধ্যাত্মিক সকল পরদা যায় জলিয়া।

যে পর্য্যন্ত মাথা (জীবন) না সঁপিবে ততদিন প্রেম হয় নাই (ইহাই হইবে বুঝিতে)। প্রেমের পেয়ালা পান যে করিয়াছে সেই প্রেমিক মরণেও আর ডরায় না।"

৮। ভগবানের বিরহ দগ্ধ করে।

বিরহ অগ্নি তন জালিয়ে জ্ঞান অগ্নি দৌঁ লাই।
দাদূ নখ সিখ পরজলৈ রাম বুঝাবৈ আই ॥
জে কবহূঁ বিরহিনি মরৈ তৌ ভী বিরহী হোই।
দাদূ পিউ পিউ জীবতাঁ মুয়ে ভী টেরৈ সোই ॥

অপনী পীড় পুকারিয়ে পীড় পরাঈ নাহিঁ ।
পীড় পুকারৈ সো ভলা করক কলেজে মাহিঁ ॥
বিরহ বিয়োগ ন সহি সকৌঁ নিসদিন সালৈ মোঁহি ।
কোই কহৌ মেরে পীর কৌঁ কব মুখ দেখৌঁ তোহি ॥
বিরহ বিয়োগ ন সহি সকৌঁ তন মন ধরৈ ন ধীর ।
কোই কহৌ মেরে পীর কৌঁ মেটৈ মেরী পীর ॥
দাদূ দুঃখী সংসার মেঁ তুম্হ বিন রহা ন জাই ।
ঔরোঁ কে আনংদ হৈ সুখ সোঁ রৈনি বিহাই ॥
জিস ঘটি বিরহা রামকা উসে নীঁদ ন আবৈ ।
দাদূ তলফৈ বিরহিনী উস পীড় জগাবৈ ॥

"বিরহ অগ্নিতে তনু (জীবন) দেও জ্বালাইয়া, জ্ঞানের অগ্নির জ্বলন্তশিখা আন জীবনে। হে দাদূ, নখ হইতে শিখা পর্য্যন্ত যখন হইবে প্রজ্বলিত তখন ভগবান আপনি আসিয়া তাহা দিবেন নিবাইয়া।

বিরহিণী যদি কখনও মরে তবে আবারও সে বিরহীই হয়। হে দাদূ, বাঁচিয়া থাকিতেও (পাপিয়ার মত) সে "পিউ পিউ" (প্রিয়তম, প্রিয়তম) করে, মরিলেও সে সেই ধ্বনিই করে।

আপনার ব্যথাতেই ডাক' (পুকার') পরের (কাছে শোনা) ব্যথায় নয়; ব্যথাই ("ব্যথায়" ও অর্থ হয়) যে ডাকে সে-ই ভাল, হৃদয়ের মধ্যে যে আছে দারুণ বেদনা।

বিরহ বিয়োগ আর তো সহিতে পারি না, নিশিদিন যে আমায় করে শেলবিদ্ধ। কেহ গিয়া বল আমার প্রিয়তমকে—"কবে দেখিব তোমার মুখ?"

বিরহ ব্যথা আর তো পারিতেছি না সহিতে, তনু মনে আর থাকিতেছে না ধৈর্য্য; কেহ গিয়া কহিবে আমার প্রিয়তমকে যে তিনি যেন আমার বেদনা দেন মিটাইয়া।

সংসারে দাদূ বড় দুঃখী, তোমা বিনা যে যায় না রহা। অন্যদের তো দেখি বেশ আনন্দ, তারা বেশ সুখেই পোহায় রজনী।

অন্তরে যার ভগবানের বিরহ তার নয়নে আর আসে না নিদ্রা। হে দাদূ, বিরহিণী করে ছটফট, সেই ব্যথাই তাহাকে রাখে জাগাইয়া।”

৯। তাঁহাকে না পাইলে শান্তি নাই, বিরহ ছাড়া তিনি মেলেন না।

দাদূ সুখ হৈ সাঈ সৌঁ ঔর সবৈ হী দুক্খ।
দেখৌঁ দরসন পীৱকা তিসহী লাগে সুক্খ॥
চংদন সীতল চংদ্রমা জল সীতল সব কোই।
দাদূ বিরহী রামকা ইন সৌঁ কদে ন হোই॥
প্রীতি ন উপজৈ বিরহ বিন প্রেম ভগতি ক্যোঁ হোই।
সব ঝূঠে দাদূ ভাৱ বিন কোটি করৈ জে কোই॥
চোট ন লাগী বিরহকী পীড় ন উপজী আই।
জাগি ন রোৱৈ ধাহ দে সোৱত গঈ বিহাই॥
অংদরি পীড় ন উভরৈ বাহরি করৈ পুকার।
দাদূ সো ক্যোঁ করি লহৈ সাহিব কা দীদার॥
মনহীঁ মাহেঁ ঝূরনা রোৱৈ মনহীঁ মাহিঁ।
মনহীঁ মাহেঁ ধাহ দে দাদূ বাহরি নাহীঁ॥
দাদূ তৌ পিৱ পাইয়ে কসমল হৈ সো জাই।
নির্মল মন করি আরসী মূরতি মাহিঁ লখাই॥
দাদূ তৌ পিয় পাইয়ে করি মংঝে বীলাপ।
সুনিহৈঁ কবহূঁ চিত্ত ধরি পরগট হোৱৈ আপ॥

“হে দাদূ, সুখ হইল একমাত্র স্বামীর সঙ্গে, আর সবই দুঃখ; প্রিয়তমের রূপ যখন দেখি তখনই তাহাতে লাগে আনন্দ।

সবাই বলেন চন্দন শীতল, চন্দ্রমা শীতল, জল শীতল; হে দাদূ, ভগবানের বিরহী যে জন, তার এসবে কখনই কিছু হয় না।

বিরহ বিনা প্রীতিই (মানবে) হয় না উৎপন্ন, প্রেম ভক্তি (ভগবানে) আর হইবে তবে কেমন করিয়া? হে দাদূ, কোটি চেষ্টাই কেন কেহ না করুক, ভাব বিনা সবই ঝুঠা।

বিরহের আঘাত যদি না লাগিয়া থাকে, যদি বেদনা না উপজিয়া থাকে, যদি রাত্রি জাগিয়া জাগিয়া হাহাকার করিয়া না কাঁদিয়া থাকে, তবে শুইয়া শুইয়াই সে (জীবন বৃথায়) দিল কাটাইয়া।

অন্তরে যদি ব্যথা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়া না থাকে, বাহিরেই যদি শুধু করে সে চীৎকার, হে দাদূ, তবে সে কেমন করিয়া স্বামীর দরশন করিবে লাভ ?

মনের মধ্যেই চলিবে "ঝুরণ" (অশ্রু ঝরিয়া শুষ্ক হওয়া), মনের মধ্যেই চলিবে কান্না, মনের মধ্যেই করিবে হাহাকার, হে দাদূ বাহিরে তো সে সব নহে।

হে দাদূ, তবেই পাইবে প্রিয়তমকে, যদি অন্তরের সব কশ্‌মল (মলিনতা মোহ-পাপ) যাহা আছে তাহা যায় চলিয়া ; মনকে নির্ম্মল করিয়া স্বচ্ছ দর্পণের মত করিতে পারিলে তাহার মাঝেই তাঁর মূরতি যাইবে দেখা।

হে দাদূ, যদি অন্তরের মাঝে কর বিলাপ তবেই পাইবে প্রিয়তমকে, কখনও না কখনও চিত্ত ধরিয়া (মন লাগাইয়া) তিনি শুনিবেন ও আসিয়া স্বয়ং হইবেন প্রত্যক্ষ।"

১০। বিরহ ব্যথার প্রতিকার নাই।

সারা সূরা নীঁদ ভরি সব কোই সোৱৈ।
দাদূ ঘাইল দরদৱংদ জাগৈ অরু রোৱৈ॥
পীড় পুরাণী না পড়ৈ জে অংতর বেধ্যা হোই।
দাদূ জীৱন মরণ লৌঁ পড়্যা পুকারৈ সোই॥
জিস ঘটি ইশ্‌ক অলাহকা তিস ঘটি লোহী ন মাস।
দাদূ জিয়রে জক নহীঁ সসকৈ সাঁসৈ সাঁস॥

"সারিয়া সুরিয়া গভীর নিদ্রায় আছে সবাই শুইয়া, হে দাদূ, যে "ঘায়েল" ও ব্যথা-পীড়িত, সে জাগে আর করে সুধু রোদন।

অন্তর যদি (প্রেমে) বিদ্ধ হইয়া থাকে তবে ব্যথা আর হয় না পুরাতন, হে দাদূ, জীবন হইতে মরণ পর্য্যন্ত সে পড়িয়া পড়িয়া (প্রেমাস্পদের জন্য) শুধু করে আর্ত্তনাদ।

যেই ঘটে (দেহে) থাকে আল্লার প্রেম সেই ঘটে না থাকে রক্ত না থাকে মাংস ; হে দাদূ, তার জীবনে না থাকে সোয়াস্তি না থাকে আরাম, সে শ্বাসে শ্বাসে ভিতরে ভিতরে (রুদ্ধপ্রকাশ দুঃখে) থাকে কাঁদিতে ও ঝুরিতে।"

১১। বাক্যে হইবে না।

বাতোঁ বিৱহ ন উপজৈ বাতোঁ প্রীতি ন হোই।
বাতোঁ প্রেম ন পাইয়ে জিন ৱু পতীজৈ কোই ॥
দাদূ তৌ পিৱ পাইয়ে করি সাঈঁকী সেৱ।
কায়া মাহিঁ লখায়সী ঘটহি ভীতরি দেৱ ॥
দরদ হি বূঝৈ দরদৱংদ জাকে দিল হোৱৈ।
ক্যা জানৈ দাদূ দরদকী নীদঁ ভরি সোৱৈ ॥

"বাক্যে বিরহ ভাবও হয় না উৎপন্ন বাক্যে প্রীতিও হয় না উপজিত ; বাক্যে প্রেমও মেলে না, কেহ বিশ্বাস করিও না যে বাক্যে এসব হয়।

হে দাদূ, স্বামীর সেবা কর, তবেই প্রিয়তমকে পাইবে ; কায়ার মধ্যেই (নিজেকে) তিনি দেখাইবেন, ঘটেরই ভিতরে যে দেবতা বিরাজমান।

যাহার হৃদয় আছে এমন দরদীই বোঝে দরদ। হে দাদূ, দরদের তুই কি জানিস্ ? ভরপূর নিদ্রায় থাকিস্ তুই শুইয়া !"

১২। বিনা বিরহে প্রেম হয় না।

পহিলা আগম বিৱহকা পীছৈ প্রীতি প্রকাস।
প্রেম মগন লৱ লীন মন তহাঁ মিলন কী আস ॥
ত্রিখা বিনা তনি প্রীতি ন উপজৈ সীতল নিকটি জল ধরিয়া।
জনম লগৈঁ জীৱ পুণগ ন পীৱৈ নির্মল দহদিসি ভরিয়া ॥
ক্ষুধ্যা বিনা তনি প্রীতি ন উপজৈ বহুবিধি ভোজন নেরা।
জনম লগৈঁ জীৱ রতী ন চাখৈ পাক পূরি বহু তেরা ॥
তপতি বিনা তন প্রীতি ন উপজৈ সংগ হী সীতল ছায়া।
জনম লগৈঁ জিৱ জানৈ নাহীঁ তরৱর ত্রিভুৱন রায়া ॥

"প্রথমে হয় বিরহের আগম পরে হয় প্রীতির প্রকাশ ; প্রেমে মগন ধ্যানে লীন যেখানে মন, সেইখানে মিলনের আশা।

তৃষ্ণা বিনা একটুও উপজে না প্রীতি যদিও শীতল জল নিকটেই থাকে রক্ষিত ; নির্ম্মল জল দশদিশি ভরিয়া থাকিলেও, জনমেও জীবন তাহা একবিন্দু করে না পান (যদি তৃষ্ণা না থাকে)।

বহুবিধ ভোজন নিকটে থাকিলেও ক্ষুধা বিনা একটুও উপজে না প্রীতি। পাক ও পূর (ভাজা ও ভিতরে ভরা পিঠা প্রভৃতি) বহুবিধ থাকিলে ও জনম ভরিয়া জীব এক রতিও তাহা চাখে না (যদি ক্ষুধা না থাকে)।

সঙ্গেই যদি শীতল ছায়া থাকে তবু (দেহের) সন্তাপ বিনা তাহাতে একটুও উপজে না প্রীতি ; জনম ভরিয়া জীবন জানেও না যে ত্রিভুবনপতিই সেই তরুবর (যাহার শীতল ছায়ায় অঙ্গ জুড়ায়)।"

১৩। প্রেমের শাস্ত্র, প্রেমের পত্র।

দাদূ অখ্যর প্রেমকা কোঈ পঢ়েগা এক।
দাদূ পুস্তক প্রেম বিন কেতে পঢ়েঁ অনেক॥
দাদূ পাতী প্রেমকী বিরলা বাঁচৈ কোই।
বেদ পুরান পুস্তক পঢ়েঁ প্রেম বিনা ক্যোঁ হোই॥

"হে দাদূ, প্রেমের অক্ষর ক্বচিতই কেহ পারে পড়িতে, হে দাদূ, প্রেম বিনা বহু পুস্তকই পড়িল কত শত জনে।

হে দাদূ, প্রেমের পত্র ক্বচিতই কেহ পারে পড়িতে। বেদ পুরাণ পুস্তক পড়িয়াও যদি প্রেম না জীবনে থাকে তবে কেমন করিয়া তাহা হইবে সিদ্ধ (বুদ্ধির অধিগম্য)?"

১৪। বিরহ দিয়াই সব সাধনা।

জিহি লাগী সো জানিহৈ বেধ্যা করৈ পুকার।
দাদূ পাঁজর পীড় হৈ সালৈ বারংবার॥
বিরহী মুসকৈ * পীর সৌঁ জ্যোঁ ঘায়ল রণ মাহিঁ।
প্রীতিম মারে বান ভরি দাদূ জীরৈ নাহিঁ॥

---

* "সুসকই" পাঠও আছে। অর্থ, "ভিতরে ভিতরে চাপা কান্না কাঁদে।"

বিরহ জগাবৈ দরদ কৌঁ দরদ জগাবৈ জীব।
জীব জগাবৈ সুরতি কৌঁ পংচ পুকারৈঁ পীব॥
সহজৈ মনসা মন সধৈ সহজৈ পবনাঁ সোই।
সহজৈ পংচৌ থির ভয়ে জে চোট বিরহকী হোই॥
তূঁ হৈ তৈসী ভগতি দে তূঁ হৈ তৈসা প্রেম।
তূঁ হৈ তৈসী সুরতি দে তূঁ হৈ তৈসা খেম॥

"যাহার লাগিয়াছে সেই তো বুঝে। বিদ্ধ হইয়া মরে সে ডাকিয়া ডাকিয়া। হে দাদূ, পাঁজরের মধ্যেই ব্যথা, বারম্বারই বিঁধিতেছে সেই শল্য।

"ঘায়েল" (অস্ত্রাহত) যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে (মারাত্মক) ব্যথায় একটু মুচকিয়া হাসে, তেমনি বিরহীও মুচকিয়া একটু হাসে প্রাণান্তক ব্যথায়। প্রিয়তম যাহাকে বাণ ভরিয়া মারেন, হে দাদূ, সে আর তো বাঁচে না।

বিরহ জাগায় দরদকে, দরদ জাগায় জীবনকে, জীবন জাগায় প্রেমকে, পঞ্চ (ইন্দ্রিয় ও তত্ত্ব) তখন পুকারে (কাতরভাবে ডাকে) প্রিয়তমকে।

আঘাতটা যদি বিরহেরই হয় তবে সহজেই মন দিয়াই মন করে সাধনা, সহজেই পবন দিয়া করে পবন সাধনা (শ্বাসরূপ জপ), সহজেই পঞ্চ (ইন্দ্রিয়) হইয়া যায় স্থির।

তুমি যে আছ তাহার উপযুক্ত দাও ভক্তি, তুমি যে আছ তাহার উপযুক্ত কর প্রেম, তুমি যে আছ তাহার উপযুক্ত দাও অনুরাগ, তুমি যে আছ তাহার উপযুক্ত দাও ক্ষেম।"

১৫। যথার্থ বিরহ।

কায়া মাহেঁ ক্যোঁ রহ্যা বিন দেখে দীদার।
দাদূ বিরহী বাবরা মরৈ নহীঁ তিহি বার॥
রোম রোম রস প্যাস হৈ দাদূ করৈ পুকার।
রাম ঘটা দিল উমংগি করি বরসহু সিরজনহার॥
প্রীতি জো মেরে পীবকী পৈঠী পংজর মাহিঁ।
রোম রোম পিব পিব করৈ দাদূ দূসর নাহিঁ॥

সব ঘট স্রবনা সুরতি সোঁ সব ঘট রসনা বৈন।
সব ঘট নৈনা হ্‌ৱৈ রহৈ দাদূ বিরহা ঐন॥

"(এই প্রাণ) তাঁহার রূপ না দেখিয়া কেমন করিয়া রহিল কায়ার মধ্যে? বিরহী পাগল দাদূ তখনই কেন গেল না মরিয়া?

(আমার অঙ্গের) অণুতে অণুতে (রোমে রোমে) রসের পিপাসা, তাই দাদূ ডাকিতেছে কাতরে। হে সৃজনকর্ত্তা, আমার চিত্তে রাম-ঘটা (ভাগবত-রসের মেঘ) উদয় করিয়া তুমি কর বরষণ।

আমার প্রিয়তমের প্রীতি যখন আমার পঞ্জরের মধ্যে করিল প্রবেশ, তখন অঙ্গের "রোম রোম" (অণু-পরমাণু) প্রিয় প্রিয় লাগিল জপিতে, হে দাদূ, অন্য আর কিছুই রহিল না তাহার (জপনীয়)।

তাঁহার অনুরাগে সকল ঘট (দেহ) হইল শ্রবণ (তাঁহার ধ্বনি শুনিতে), সকল ঘট হইল রসনা ও বাণী (তাঁর স্বাদ পাইতে ও তাঁর কথা কহিতে), সকল ঘট হইয়া রহিল নয়ন (তাঁহার রূপ দেখিতে)। এই তো যথার্থ বিরহ ("বিরহেই তো মিলিল এই দরশন" এই অর্থও কেহ কেহ করেন)।"

১৬। বিরহ যোগ, বিরহ পাবক।

রাতি দিৱসকা রোৱণা পহর পলককা নাহিঁ।
রোৱত রোৱত মিলি গয়া দাদূ সাহিব মাঁহিঁ॥
বিরহ অগিনি মেঁ জরি গয়ে মনকে মৈল বিকার।
দাদূ বিরহী পীৱকা দৈখৈগা দীদার॥
দাদূ লাইক হম নহীঁ হরিকে দরসন জোগ।
বিন দেখে মরি জাঁহিঁগে পিৱকে বিরহ বিৱোগ॥

"রাত্রি দিনের এই কান্না, প্রহর পলকের তো নয়; হে দাদূ, কাঁদিতে কাঁদিতে (বিরহী) মিলিয়া গেল স্বামীরই মধ্যে।

বিরহ-অগ্নিতে যখন জ্বলিয়া গেল মনের মালিন্য বিকার, হে দাদূ, তখনই তো প্রিয়তমের বিরহী দেখিবে তাঁহার রূপ।

হে দাদূ, আমি উপযুক্ত অধিকারী নই, হরি দরশনের নই আমি যোগ্য। আমি প্রিয়তমের বিরহে ও বিয়োগে দরশন বিনাই যে যাইব মরিয়া।"

১৭ঃ এক ভরসা তিনি ঃ

জে হম ছাড়ৈঁ রাম কৌঁ তৌ রাম ন ছাড়ৈ।
দাদূ অমলী অমল থৈঁ মন কূঁ্য করি কাঢ়ৈ ॥
বিরহী জাগৈ পীড় সোঁ জে ঘায়ল হোৱৈ।
দাদূ জাগৈ জগতগুর জগ সগলা সোৱৈ ॥

"আমি যদিও রামকে ছাড়ি তবু রাম ছাড়েন না (আমাকে)। হে দাদূ, যাহার মন (যাহাতে) আসক্ত (নেশা লাগিয়াছে), সে সেই আসক্তির পাত্র হইতে মনকে কেমন করিয়া আনিবে বাহির করিয়া ?

হে দাদূ, যে ঘায়েল (প্রেমের আঘাতে আহত) হইয়াছে সেই বিরহীই জাগে ব্যথার চোটে, আর জাগেন জগদ্‌গুরু, সকল জগৎ থাকে ঘুমাইয়া।"

১৮ঃ বিরহই প্রেম-স্বরূপের নাম ঃ

ইশ্‌ক অলহকী জাতি হৈ ইশ্‌ক অলহকা অংগ।
ইশ্‌ক অলহ ঔজূদ হৈ ইশ্‌ক অলহকা রংগ ॥
প্রীতমকে পগ পরসিয়ে মুখ দেখণ কা চাৱ।
তহঁা লে সীস নৱাইয়ে জহঁা ধরে থে পাৱ ॥
বাট বিরহ কী সোধি করি পংথ প্রেমকা লেহু।
লৱ কে মারগ জাইয়ে দূসর পাৱ ন দেহু ॥

"প্রেমই আল্লার জাতি, প্রেমই আল্লার দেহ, প্রেমই আল্লার সত্তা, প্রেমই আল্লার রঙ্গ।

মুখ দেখিবার আকাঙ্ক্ষা যদি থাকে তো প্রিয়তমের চরণ কর পরশ, যেখানে ছিল তাঁর চরণখানি সেখানে গিয়া নোয়াও তোমার মাথাটি।

বিরহের পথে খুঁজিতে খুঁজিতে বাহির করিয়া ধর প্রেমের পথ, প্রেমধ্যানের পথেই হও অগ্রসর, অন্য পথে করিও না একটিবারও পদক্ষেপ।"

১৯ঃ প্রেমে স্বরূপ বদল ঃ

বিরহ বিচারা লে গয়া দাদূ হমকৌঁ আই।
জহঁ অগম অগোচর রাম থা তহঁ বিরহ বিনা কো জাই ॥

আসিক মাস্থক হোই গয়া ইস্‌ক কহাবৈ সোই।
দাদূ উস মাস্থককা অল্লহি আসিক হোই॥
মারণহারা রহি গয়া জিহি লাগী সো নাঁহি।
কবহূঁ সো দিন হোইগা য়হু মেরে মন মাহিঁ॥

"হে দাদূ, বিরহ বেচারাই আমাকে আসিয়া গেল লইয়া; অগম অগোচর ছিলেন যে রাম তাঁর কাছে বিরহ-বিনা কে পারে যাইতে?

তাহাকেই তো বলি প্রেম যাহাতে প্রেমিক হইয়া গেল প্রেমাস্পদ। হে দাদূ, সেই (এমন) প্রেমাস্পদের আল্লাও হইতে চাহেন প্রেমিক।

"যিনি (প্রেমের) মার মারিলেন তিনিই গেলেন রহিয়া, যাহাকে লাগিল সেই মার, সে আর নাই (আঘাতকারী ভগবানেই গেল মিলাইয়া)" কবে (আমার) সেই দিন হইবে? এই কথাই তো চলিতেছে আমার মনের মধ্যে।"

২০। ধরিত্রীর প্রেম সজ্জা।

অজ্ঞা* অপরংপারকী বসি অংবর ভরতার।
হরে পটংবর পহিরি করি ধরতী করৈ সিংগার॥
বসুধা সব ফূলৈ ফলৈ পিরথি অনংত অপার।
গগন গরজি জল থল ভরৈ দাদূ জয়জয়কার॥
কালা মুঁহ করি কালকা সাঈঁ সদা সুকাল।
মেঘ তুম্‌হারে ঘরি ঘণাঁ বরিষহু দীনদয়াল॥

অম্বরে বসিয়া আছেন স্বামী, আর অসীম অপারের তত্ত্ব (জ্ঞানে) না বুঝিয়াও হরিত পট্টাম্বর পরিধান করিয়া (প্রেমে) ধরিত্রী করিতেছে প্রেমের প্রসাধন ও সাজসজ্জা (শৃঙ্গার)।

অপার অনন্ত পৃথিবী, সকল বসুধা, ফুলে ফলে উঠিতেছে ভরিয়া ভরিয়া, গগন গরজিয়া ভরিতেছে জলস্থল; হে দাদূ, জয়জয়কার (এই জ্ঞানে-না-বুঝিয়া প্রেমে-মজিয়া এই শোভার)।

কালের মুখে কালি দিয়া স্বামী আমার সদাই সুকাল (পরিপূর্ণ উৎসব কাল), তোমার ঘরে (প্রেমের) মেঘ রহিয়াছে ঘনাইয়া, ভরপূর হইয়া, হে দীনদয়াল, কর বর্ষণ।"

---

* "আজ্ঞা" পাঠও আছে।

ষষ্ঠ প্রকরণ—প্রেম

দ্বিতীয় অঙ্গ—"সুন্দরী"

মানব ভগবানের প্রিয়তমা, সুন্দরী। ভগবানকে না পাইলে মানবের জন্মই বৃথা। এই সম্বন্ধ প্রেমের। কাজেই ভগবানের আসন যদি আর কাহাকেও দেওয়া যায় তবে মানব-আত্মার লজ্জার ও অপমানের আর সীমা নাই। না বুঝিয়া মানুষ শাস্ত্র, আচার, সম্প্রদায়, পদ্ধতি, Creed, গুরু প্রভৃতিকে ভগবানের আসন দিয়া আপন আত্মাকে নিদারুণ অপমানিত করিয়াছে। লোভে, চেতনার অভাবে, সুখ্যাতির জন্য, শিশুজনোচিত খেলার ভাবের বশেও মানুষ জীবনস্বামীকে হারায়। অথচ তাঁহাকে যে হারাইয়াছে ইহা সে বুঝিতেও পারে না।

তিনি আসিয়া তাঁর পরশেও আমার নিদ্রা যে ভাঙ্গিতে পারেন না ইহাই দুঃখ। যখন জাগিয়া দেখি তিনি চলিয়া গিয়াছেন তখন দুঃখের আর সীমা থাকে না। যৌবনের অনুভব যে পর্য্যন্ত মনে না জাগে সে পর্য্যন্ত তাঁর জন্য মনে ব্যাকুলতা জাগানই অসম্ভব। কিন্তু যৌবন আসিলেও যে আমরা বাল্যের "সখী-খেলা" লইয়া দিন কাটাই এবং "সখী-সোহাগিনী" নামের গৌরবে তাঁকে ভুলিয়া থাকি সে দুঃখ আর রাখিবার ঠাঁই নাই। খেলা শিশুকেই সাজে।

সুধু মুখের কথায় তাঁহাকে স্বীকার করিলে চলিবে না, আপনাকে নিঃশেষে বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহাকে করিতে হইবে আপনার। সেবায় সৌন্দর্য্যে অনন্ত কলায় তাঁহাকে করা চাই তৃপ্ত। তিনি মহা সেবক, পরম সুন্দর, অনন্ত কলাবান্, তাঁহার যোগ্য হও, তিনি তোমার গুণের কদর করিবেন।

সব বাধা অতিক্রম করিয়া সব মলিনতা দূর করিয়া, সেবায় যে তাঁকে তৃপ্ত করে, সে-ই ধন্য। কুলশীলের দ্বারা কেহ ধন্য হয় না। (দাদূ প্রভৃতি) ভক্তেরা নীচকুলের ছিলেন বলিয়া ক্রমাগত যে অপমান পাইয়াছেন সে দুঃখ ঘুচাইবার চেষ্টা করিয়াছেন ভগবানের প্রেমে। যে সব বাধার তরঙ্গ অতিক্রম করিয়া সুন্দরী তাঁর সঙ্গে মিলিতে যায়, প্রেমের স্পর্শে তাহাই হইয়া যায় প্রেম-তরঙ্গ

আনন্দলহরী। ভগবানের কাছে সেই প্রেমতরঙ্গের দোল-লীলা উপহার দিলে তিনি তাহা পাইয়াই হন তৃপ্ত।

তাঁহাকে না পাইয়া ভুলিয়া সুখে দিন কাটাইবার উপায় নাই। প্রত্যেকটি আকার যে রূপ-পরিগ্রহ করিয়া অরূপের দিকে যাত্রা করিয়া চলিয়াছে ইহাকেই লোকে বলে ক্ষয় ও বিনাশ। প্রেমের মর্ম্মজ্ঞ বলেন ইহাই আমার প্রিয়তমকে স্মরণ করাইয়া দিবার জপমালা। রূপ যখন অরূপে যায় তখন আমাকেও যায় ডাক দিয়া। বলিয়া যায়,"অসীম রস সাগরে পূর্ণ হইতে চলিলাম। সেখান হইতে পূর্ণ হইয়া রূপ হইয়া জগতে আসিয়া সেবা করিয়া এখন রিক্ত হইয়াছি এখন শূন্য ঘটের মত আবার তাঁরই রসের অতলে, মুল উৎসে, যাইব নাবিয়া। আবার পূর্ণ হইয়া নব রূপ লাভ করিয়া, নূতনভাবে আসিব সেবা করিতে।"

পশ্চিমে পাঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশে যাঁহারা কূপ ও জলাশয়াদি হইতে ঘটীচক্রের (Persian wheel) দ্বারা জলসেচনের ব্যবস্থা দেখিয়াছেন তাঁহারা বুঝিবেন দাদূ এখানে কি বলিতে চাহেন। ঘটীচক্রের ঘটীগুলি উপরে উঠিতেই তাহাদের সব জল দেয় ঢালিয়া, এবং তখনই আবার পূর্ণ হইবার জন্য ও আবার উঠিয়া জল ঢালিবার জন্য নামিতে থাকে নীচে। এইরূপেই ক্রমাগত চলিতে থাকে ঘটীর মালা। অরূপসাগর হইতেও রূপের ঘটমালা ক্রমাগত উঠিতেছে, তাহার যাহা দিবার তাহা দিয়া আবার নামিয়া যাইতেছে অরূপে আবার পূর্ণ হইয়া আসিতে। যাঁহারা রূপের মরম না জানেন তাঁহারা বলেন রূপ চলিয়াছে বিনাশের দিকে। কিন্তু সাধক জানেন ইহা নিত্য রসের সাধনায় সদা-চলন্ত মালা। স্থির হইতে গেলেই রূপ হয় মিথ্যা। সদা-সচল থাকিয়া সে চিন্ময় রসের জপমালার চালায় কাজ। তাই সাধকের কাছে চলন্ত রূপের মালা হইল সদা সচল রসের মালা।

নব নব রূপের আসা-যাওয়াতে ক্ষণস্থায়িত্বের জন্য দুঃখ করিবার কোনো হেতু নাই। অতল অসীম রসের প্রবাহ এমন করিয়াই বিশ্বচরাচরকে রাখিয়াছে নিত্য সুন্দর শোভন ও প্রাণময় করিয়া। এই রূপ হইতে অরূপে যাত্রার মর্ম্ম যে হৃদয় বুঝিয়াছে সে প্রত্যেকটি রূপের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকুল হইয়া অরূপে অসীমে অতল-রস-সাগরে চায় ঝাঁপাইয়া পড়িতে। রূপের সেই হৃদয়-হরা ডাক শুনিলে প্রেমে-আত্মহারা সুন্দরীর হৃদয়ও সঙ্গে সঙ্গে ধাইতে চায় ব্যাকুল হইয়া।

১। সব চেয়ে সুন্দর আসন স্বামীর জন্য রচনা করিয়া রাখিল নারী; তাহাতে দেখি পর-পুরুষেরা সব আছে বসিয়া, সুন্দরী জাগিলেই এই দুর্গতি পড়িবে ধরা। প্রিয়তমের সঙ্গে সদাই যদি সে থাকে সচেতন তবে আর এমন দুর্গতির থাকিবে না সম্ভাবনা।

নিত্যকালের স্বামীকে ছাড়িয়া যে জীবন করিতেছ ব্যর্থ, আর কে হইবে তোমার নিত্য সাথী? অমূল্য জীবন যে ব্যর্থই যাইতেছে চলিয়া।

২। প্রিয়তম, তুমি কি এই অপরাধেই রহিয়াছ দূরে? তাই কি আসিতে চাও না আমার কাছে? আমার অন্তরাত্মা তো তোমারই আসন। তোমার আসন তুমিই কর অধিকার।

৩। তুমি আসিলেও যে আমার ঘুম ভাঙ্গিল না তাই তো হইল না মিলন। তুমি পাশে বসিয়া পরশ করিয়াও যে আমার ঘুম ভাঙ্গাইতে পারিলে না, এই দুঃখ আর রাখি কোথায়? শিশুর মত খেলা করিবার ও শিশুর মত ঘুমাইয়া থাকিবার সময় কি আর আছে? যৌবন আসিয়াছে, এখন প্রিয়তমের সঙ্গে মিলনের জন্য নিদ্রা, জড়তা, অচৈতন্য সব করিতে হইবে জয়।

৪। "সখী-সোহাগিনী" নামের জন্য তো তাঁহাকে হারাইতে পারি না। সখীদের সঙ্গে খেলিয়া কাটাইবার সময় আর নাই। যৌবন আসিল, তবু স্বামীর সঙ্গে মিলিলাম না! তাঁহার কথা বুঝিলাম না! তাঁর পরশ অনুভব করিলাম না! এই ব্যথা আর কিছুতেই যায় না। মোহে মূরছিয়া তাই বহিয়া যাইতেছে ব্যর্থ জীবন।

৫। নাম লওয়াটাই কি স্বীকার করার প্রকৃষ্ট পন্থা? স্ত্রী কি কখনও স্বামীর নাম নেয়? সেবার দ্বারা আপন সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াই সে তাঁহাকে করে স্বীকার। সে স্বামীকে সব দিয়াই স্বামীকে পায়। কথাতে স্বীকার স্বীকারই নহে।

৬। কুলের আবার সমাদর কিসের? সেবাই হইল আসল কথা। অনন্ত কলার কর্ত্তাকে অনন্তকলাতেই কর তৃপ্ত। সব বাধা অতিক্রম করিয়া সেই বাধা অতিক্রমের আনন্দ লইয়াই তাঁহার সঙ্গে হও মিলিত। নির্ম্মল হইয়াই পরম নির্ম্মলের সঙ্গে হও যুক্ত। সুন্দরী এমন করিয়াই পরমসুন্দরকে করে তৃপ্ত।

৭। প্রত্যেক মূর্ত্তি অরূপে যাইবার সময় যায় ডাক দিয়া। কবে অন্তরাত্মা

এই মন-প্রাণ-চিত্ত-হরণ ডাক শুনিয়া প্রত্যেক রূপের সঙ্গে ধাবিত হইয়া সহজে অরূপ অনন্ত স্বামীর সঙ্গে গিয়া বারবার মিলিবে? সুন্দরী কবে হইবে ধন্য?

১। জাগিয়া স্বামীকে লও চিনিয়া।

সাঈঁ কারণ সেজ সৱাঁরী সব থৈঁ সুদংর ঠৌর।
দাদূ নারী নীঁদ ভরী আই বৈঠা হৈ ঔর ॥
পরপুরুষা সব পরম হৈঁ* সুন্দরি দেখৈ জাগি।
আপনা পীৱ পিছাণি করি দাদূ রহিয়ে লাগি ॥
পুরুষ সনাতন ছাড়ি করি চলী আন কে সাথ।
পরম সংগ থৈঁ বিছট্যা জনম অমোলিক জাত ॥

"স্বামীর জন্য সব চেয়ে সুন্দর ঠাঁইয়ে সাজাইল শয্যা। হে দাদূ, নারী তো নিদ্রায় অচেতন, এদিকে অন্য (পুরুষ) সেখানে বসিয়াছে আসিয়া!

হে সুন্দরী, জাগিয়া দেখ পরপুরুষেরাই সব পরম স্থান করিয়া আছে অধিকার। হে দাদূ, আপন প্রিয়তমকে চিনিয়া লইয়া তাঁহার সঙ্গে থাক যুক্ত হইয়া।

হায়, সনাতন স্বামীকে (পুরুষকে) ছাড়িয়া চলিয়াছ অন্যের সঙ্গে! পরম-সঙ্গ হইতে হইলে পরিভ্রষ্ট! অমূল্য জনম যে (বৃথায়) যায়!"

২। তুমি এস।

কাহে ন আৱহু কংত ঘরি ক্যোঁ তুম রহে রিসাই।
পীৱ ন দেখ্যা নৈন ভরি জনম আমোলিক জাই।
আতম অংতরি আৱ তূঁ য়াহী তেরী ঠৌর।
দাদূ সুন্দর† পীৱ তূঁ দূজা নাহী ঔর ॥

---

* "পরহরৈ" পাঠও আছে। তাহা হইলে অর্থ হইবে "পরপুরুষ সব পরিহার কর।"

† দাদূ অনেক সময় তাঁর গুরুকে "সুন্দর" নামে অভিহিত করিতেন। যদিও সুন্দর নামে তাঁর প্রখ্যাত এক শিষ্যও ছিলেন। তাঁহার রচিত "সুন্দর বিলাস" বিখ্যাত রচনা। এই স্থলে ভক্তদের কেহ কেহ মনে করেন তিনি ব্যক্তি-গুরুকেই সম্বোধন করিয়াছেন। তিনি এখানে সনাতন পরমগুরু ভগবানকেই ডাকিয়াছেন, ইহাই মনে করা বেশী সঙ্গত।

"হে কান্ত, কেন এই ঘরে এস না, কেন রহিলে বিরূপ (রুষ্ট) হইয়া ?" হায় নয়ন ভরিয়া দেখিলাম না প্রিয়তমকে, অমূল্য জনম যে বৃথায় যায় চলিয়া!

আত্মার অন্তরে তুমি এস, ইহাই তো তোমার আপন ঠাঁই। দাদূর তুমি সুন্দর প্রিয়তম, তাহার আর তো কেহই নাই।"

৩। তাঁহার পরশেও কেন জাগি নাই?

হূঁ সুখ সূতী নীদঁ ভরি জাগৈ মেরা পীর।
ক্যোঁ করি মেলা হোইগা পরস জাগা ন জীর॥
সখী ন খেলৈ সুংদরী অপনে পির সোঁ জাগ।
স্বাদ ন পায়া প্রেমকা রহী নহীঁ উর লাগ॥

"আমি সুখে শুইয়াছিলাম গভীর নিদ্রায়, আর জাগিয়া বসিয়া ছিলেন আমার প্রিয়তম! কেমন করিয়া হইবে তবে মিলন, তাঁর পরশেও জীবন যে আমার জাগিল না?

"সখী-সখী" খেলা আর সুন্দরীর পক্ষে তো সাজে না; জাগ আপন প্রিয়তমের সঙ্গে। প্রেমের স্বাদও পাইলে না তাঁহার বক্ষেও রহিলে না লাগিয়া?"

৪। তাঁহাকে ছাড়িয়া কিসে জীবন হয় সার্থক?

সখী সুহাগনি সব কহৈ ঔর দুর্ভর জোবন আই।
পির কা মহল ন পাইয়ে কহাঁ পুকারেঁ জাই॥
সখী সোহগিন সব কহৈঁ বূঝৈ ন পির বাত।
মনসা বাচা করমণা মুরুছি মুরুছি জির জাত॥
সখী সুহাগনি সব কহৈঁ পির সোঁ পরস ন হোই।
নিস বাসর দুখ পাইয়ে বিথা ন জানৈ কোই॥

"সবাই তো বলে সখী-সোহাগিনী আর দুর্ভর যৌবন আসিয়া হইল উপস্থিত; প্রিয়তমের মন্দিরের দেখাও তো পাইলাম না, কোথায় গিয়া করি তবে ডাকাডাকি?

সবাই তো তোমাকে বলে সখী-সোহাগিনী! কিন্তু কথাটুকুও তো বুঝিলে না প্রিয়তমের? মনে বচনে ও কর্ম্মে মুরছিয়া মুরছিয়া যাইতেছে এই জীবন।

সখী-সোহাগিনী তো বলে সবাই, প্রিয়তমের পরশও তো হইল না (এই জীবনে)! নিশিবাসর পাও দুঃখ পাও ব্যথা, কেহই তো জানে না এই ব্যথার কথা।”

৫ঃ প্রিয়তমকে বরণঃ

সুংদরী কবহূঁ কংতকা মুখ সোঁ নারঁ ন লেই।
অপনে পির কে কারণৈঁ দাদূ তন মন দেই॥
নৈন বৈন করি বারণৈঁ তন মন পিংড পরান।
দাদূ সুংদরি বলি* গঈ তুম পরি কংত সুজান॥
তনভী তেরা মনভী তেরা তেরা পিংড পরান।
সব কুছ তেরা তূঁ হৈ মেরা য়হু দাদূ কা জ্ঞান॥

“সুন্দরী কখনও কান্তের নামটিও নেয় না মুখে, অথচ আপন প্রিয়তমের কারণে, হে দাদূ, তনু মন সব দেয় সে সমর্পণ করিয়া।

নয়ন, বচন, তনু, মন, দেহ, প্রাণ সব তোমায় উৎসর্গ করিয়া দিয়া করিতেছে বরণ। দাদূ কহেন, “হে কান্ত সুজান (সুজ্ঞান, সহৃদয়), সুন্দরী তাহার সর্ব্বস্ব সঁপিয়া তোমাতেই (এখন), হইয়া গেল বৃতা উৎসর্গীকৃতা।

(এখন) এ তনুও তোমার, মনও তোমার, তোমারই এই শরীর ও প্রাণ; (আমার) সব-কিছুই তোমার, কিন্তু তুমি হইলে আমার, ইহাই তো দাদূর মনের কথা।”

৬ঃ অনন্তকলায় স্বামীর সেবাঃ

সুংদরী মোদৈ পীর কোঁ বহুত ভাঁতি ভরতার।
ত্যোঁ দাদূ রিঝবৈ রামকোঁ অনংত কলা করতার॥
নীঁচ উচ কুল সুংদরী সেরা সারী হোই।
সোঈ সুহাগনি কীজিয়ে রূপ ন পীরৈ ধোই॥

---

* “বরি” পাঠও আছে।

নদী নীর উলংঘি করি দরিয়া পৈলী পার।
দাদূ সুংদরী সো ভলী জাই মিলৈ ভরতার॥
প্রেমলহর গহি লে গঈ অপনে প্রীতম পাস।
আতম সুংদরি পীৱ কৌঁ বিলসৈ দাদূ দাস॥
দাদূ নিরমল সুংদরী নিরমল মেরা নাহ।
দূন্যোঁ নিরমল মিলি রহে নিরমল প্রেম প্রৱাহ॥

“সুন্দরী বহু বহু প্রকারে বিবিধ বিধানে প্রিয়তম ভর্ত্তাকে আনন্দ দিয়া করে পরিতৃপ্ত, হে দাদূ, ভগবানকেও সেই রকমে কর আনন্দ-পরিতৃপ্ত, কর্ত্তাও যে অনন্তকলায় কলাবান্ (তিনি গুণী, তোমার গুণের সমাদর বুঝিবেন)।

নীচকুলেরই হউক, উচ্চকুলেরই হউক, সেবাই হইল সুন্দরীর আসল শ্রেষ্ঠতা ; হে সোহাগিনী, (নিজেকে) সেবায় কর সৌভাগ্যবতী, রূপ তো আর কেহ ধুইয়া করে না পান !

নদীর নীর উল্লঙ্ঘন করিয়া, সাগর সাঁতারিয়া, পার হইয়া যে যাইয়া মিলে স্বামীর সঙ্গে, হে দাদূ, সেই সুন্দরীই তো ধন্য।

প্রেমলহরই ধরিয়া লইয়া গেল আপন প্রিয়তমের কাছে, আত্মা-সুন্দরীকে লইয়া গেল প্রিয়তম পরমাত্মার কাছে ; তাই তো দাস দাদূ বিলসে পরমানন্দে।

দাদূ, নির্ম্মল এই সুন্দরী, নির্ম্মল আমার নাথ ; দুই নির্ম্মলে যদি রহে যুক্ত হইয়া, তবেই নির্ম্মল চলিতে থাকে প্রেমপ্রবাহ।”

৭ঃ মূর্ত্তির ঘোষণাঃ

মূরতি* পুকারৈ সুংদরী অগম অগোচর জাই।
দাদূ বিরহণী আতমা উঠি উঠি আতুর ধাই॥ †

“মূর্ত্তি ডাকিয়া বলে, “সুন্দরী, অগম্য অগোচরে করিয়াছি যাত্রা”। হে দাদূ, বিরহিণী আত্মা (তাই) উঠিয়া উঠিয়া (সাথে সাথে) ধায় আতুর হইয়া।”

---

* “সুরতি” পাঠও আছে। তবে অর্থ হইবে “প্রেম-স্মরণ।”

† কেহ কেহ এই বাণীটি সুমিরণ-অঙ্গের “মালা সব আকারকী” বাণীর পর ব্যবহার করেন।

ষষ্ঠ প্রকরণ—প্রেম

তৃতীয় অঙ্গ—“নিহকরমী পতিব্রতা”

প্রেমের আসল কথাই হইল সেবা ও কল্যাণব্রত। স্বার্থত্যাগ ও আত্মবিলয়ই হইল প্রেমের যথার্থ পরিচয়। কাজেই, ভোগ আকাঙ্ক্ষা স্বার্থ প্রভৃতির স্থান প্রেমের জগতে নাই। “সুন্দরী” যখন পতিব্রতা” হইল, তাহার সকল কামনা যখন ঘুচিয়া গিয়া সে নিষ্কামকর্ম্মী বা “নিহকরমী” হইল, তখনই প্রেমের সাধনা হইল পূরা। নিষ্কামকর্ম্মী অর্থেই দাদূ “নিহকরমী” শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

প্রেমে দেখি সকলে আপনার পরিচয় লোপ করিয়া প্রিয়তমের পরিচয়ই গ্রহণ করে। দাদূ প্রভৃতি সাধকেরা ছিলেন দীনহীন বংশের। প্রেমময়ের পরিচয় ছাড়া দিবার মত আর কোনো নিজের বংশাদিগত পরিচয় তাঁহাদের তো ছিল না। কাজেই এই প্রেমের পথই তাঁহাদের পক্ষে অপেক্ষাকৃত ছিল সহজ।

এক ভগবানে নির্ভর করিয়া সব কামনা হইবে ছাড়িতে, এমন কি সাধনার অভিমানও হইবে ছাড়িতে। কারণ সব দিক দিয়া অহঙ্কারকে ছাড়িলেও দেখা যায় সাধনা ও ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়াও নানা ছদ্মবেশে অবশেষে অহঙ্কার আসিয়া হয় উপস্থিত। সে বড় কঠিন অবস্থা।

ভগবান ছাড়া অন্য কাম্য থাকিলেই বিপদ। কারণ, সেই কাম্যকে পাইয়াই ভগবানকে হয় হারাইতে। এই জন্য বিশেষ সাবধান হইতে হইবে যেন তাঁর কাছেও তাঁহাকে ছাড়া আর কিছুরই জন্য না করা হয় প্রার্থনা।

সকল বিশ্বকেই হইবে প্রেম করিতে ও হইবে সেবা করিতে। কিন্তু অনন্ত রূপে ও নামে যে বিশ্বের বিস্তার। কি করিয়া অনন্ত এই সর্ব্ব বিস্তারকে করা যায় সেবা? মূলকে সেচন করিলে যেমন ফল ফুল পাতা সবই হয় সিক্ত তেমনই মূলাধার ভগবানকে প্রেম ও সেবা করিলে সকলকেই করা হয় সেবা।*

---

* তরো মূর্লাভিষেকেণ যথা তদ্‌ভুজপল্লবাঃ।
তৃপ্যন্তি তদনুষ্ঠানাৎ তথা সর্ব্বেঽমরাদয়ঃ॥
মহানির্বাণ তন্ত্র, ২য় উল্লাস, ৪৮ শ্লোক।

“বৃক্ষের মূলে জল অভিষেক করিলে যেমন তাহার শাখা পল্লব সবই অভিষিক্ত হয়, তেমনি পরব্রহ্মের আরাধনা দ্বারা দেবগণ হইতে আরম্ভ করিয়া সকল চরাচরই তৃপ্ত হয়।”

প্রত্যেকটি পাতাতে সেচন করার উদ্যোগ যে করে সে অসম্ভব প্রয়াস করে। ভগবানকে ছাড়িয়া যে নানা স্থানে সেবা চায় পৌছাইতে, তাহার প্রয়াস আরও অসম্ভব। তাঁহাকে গ্রহণ করার অর্থ তো আর সকলকে পরিহার করা নহে। আর সকলকে গভীরতমভাবে যথার্থভাবে গ্রহণ করিতে হইবে বলিয়াই মূলাধারকে এত গভীরভাবে ও একান্তভাবে গ্রহণ করা।

তাঁহাকে প্রেম করিতে পারিলেই যথার্থ মুক্তি। নহিলে কর্ম্ম দিয়াই কর্ম্মবন্ধন হইতে কেমন করিয়া হয় উদ্ধার? প্রেমেই সব কর্ম্মের ও ফলের বিসর্জ্জন, এমন কি প্রেমে আপনাকেও করা যায় বিসর্জ্জন। কাজেই প্রেমই হইল সাধনার সার, প্রেমই যথার্থ বৈরাগ্যের মূল, প্রেমই যথার্থ মুক্তি। প্রেম আপনাকে দিয়াই তৃপ্ত, সে তাহার বিনিময়ে তো কিছুই চাহে না। এমন প্রেমকে পাইলে সব বিসর্জ্জন দিয়া সব বোঝা মাথা হইতে নাবাইয়া হওয়া যায় হাল্‌কা। একটু অগ্নি স্ফুলিঙ্গ যেমন পর্ব্বতপ্রমাণ কাষ্ঠকে নিঃশেষ করিতে পারে তেমনি জীবন্ত সত্য প্রেমের এক কণা জীবনে আসিলে সব বন্ধনের ও সব ভার রাশির মধ্যে যায় আগুন লাগিয়া। প্রেমেতে মানুষ আপন ইচ্ছা পর্য্যন্ত দেয় বিসর্জ্জন। যখন স্বামীর ইচ্ছার মধ্যে নারী আপন ইচ্ছাকে বিলয় করিয়া স্বামীর ভাবে আপন ভাব বিলয় করে তখনই তো তাহার পাতিব্রত্য হয় সত্য। কাজেই "অহম্" হইতে মুক্তির পথ একমাত্র প্রেমের কাছেই পারে মিলিতে।

বিধাতাকে পুরুষ মনে করিলে নিজেকে নারী ভাবিয়া প্রেম করা হয় সহজ। তাঁহাকে নারী ভাবিলে নিজেকে মনে করিতে হইবে পুরুষ। আসল কথা, প্রেম চাই জীবনে। তিনিই জগৎপতি ও প্রাণকান্ত, তাঁহার কাছেই আপনাকে করিতে হইবে উৎসর্গ।

নারীর বহুমুখী নারীভাব ও মাধুর্য্য আছে। পতির কাছে তার আপন সার ধন পাতিব্রত্য দিয়া আর নানাভাবে নানা জনের সঙ্গে চলে তাহার মেলা। নানাজনকে নানাভাবেই যায় সেবা করা। প্রেমের মধুর ভাবের সাধনাতে ভগবানকে পতিরূপে মনে করিয়া তাঁহাকে দিতে হয় পাতিব্রত্য, তার পর আর নানাবিধ মাধুর্য্যে ও কল্যাণে নানাদিকে পতির সকল পরিজনকেই সেবা ও কল্যাণ করিতে হয় বিতরণ।

সহজ সাধনাতেও এমন অনেক কথা আছে যাহার ঠিক অর্থ লোকে গ্রহণ না করিতে পারিয়া নানা বিকৃত ভাবে তাহাকে গ্রহণ করিয়াছে ও তাই সেই সাধনাকে নানা অযোগ্য নিন্দার ভাজন করিয়া তুলিয়াছে।

মানুষকে যখন ভগবানের অর্থাৎ স্বামীর স্থান দেওয়া যায় তখন পতির প্রাপ্য নারীর যাহা সর্ব্বস্ব তাহাও যদি তাহাকে দেওয়া যায় তবেই তো সর্ব্বনাশ! তখনকার দিনে নানা দেশে এই বিপদের বন্যা গিয়াছে, সাধনার জগৎ হইতে এখনও সেই বিপদ কাটিয়া যায় নাই। যাঁহারা বোম্বাইর বিখ্যাত ভাটিয়া মোকদ্দমার বিবরণ জানেন তাঁহারা এই কথাটি ঠিক বুঝিবেন। চেষ্টা করিলে অন্যান্য অনেক স্থানেও এই বিপদের পরিচয় পাইতে পারা যায়।

দাদূ তাঁহার আপন যুগে এই বিপদের কথা অতিশয় জোরের সহিত স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। দাদূ প্রেমের অনুরাগী ছিলেন বলিয়াই ছিলেন অতিশয় বিশুদ্ধ নীতির পক্ষপাতী। তাঁহার চরিত্রও ছিল স্ফটিকের মত স্বচ্ছ।

ধর্ম্মের জগতেও বিষয়-লোভীর মত একান্ত অসঙ্গত কামনাই হইল এই সব বিপদের মূল। সেই কামনাকে যে জন জয় না করিল প্রেমের জগতে তাহার আর স্থান নাই। দেহের কামনা হইতে আরম্ভ করিয়া ঋদ্ধি সিদ্ধি অমরত্ব মুক্তি প্রভৃতি সব কামনাই বিশুদ্ধ প্রেমের সাধনায় করিতে হইবে ত্যাগ। সগুণ নির্গুণ সর্ব্ববিধ কামনা ছাড়িলেই মানব তাহার জীবভাব পরিহার করিয়া ব্রহ্মভাব হয় প্রাপ্ত। ব্রহ্মভাব হইলেই সাধক তখন যথার্থ প্রেমের হয় অধিকারী। তখন প্রেম-পেয়ালাতে ব্রহ্ম-রস পান করিয়া সাধক সাধনার পরম ও চরম সার্থকতা করে লাভ। তখনই সে পরম পুরুষকে এই কথা বলিতে পারে, "তুমিই আমার সব, আমার সর্ব্বস্ব, আমার জ্ঞান ধ্যান পূজা, আমার বেদ পুরাণ রহস্য, যোগ বৈরাগ্য সাধনা, আমার শীল সন্তোষ মুক্তি। তুমিই শিবশক্তি আগম-উক্তি, তুমিই নিত্য সত্য অপার অনন্ত নিরাকার-নাম, তুমিই দাদূ আত্মার পরম বিশ্রাম।"

১। হে সৃজনকর্ত্তা তুমিই আমার জাতি কুল, তুমিই আমার ঋদ্ধি সিদ্ধি, তুমিই আমার সকল শক্তি, অন্য পরিচয় আমার কিছুই নাই।

২। জীবন মরণ সবই আমার তোমারই সম্মুখে, তুমি মিলাইলেই সব মিলে, তুমি রাখিলেই সব থাকে।"

নানা জাতি ও নানা ধর্ম্মের মিলনের চেষ্টা করিয়া দাদূ বুঝিয়াছেন যে মানুষের শক্তি বড় কম। ভগবান যখন মিলন করান তখনই হয় মিলন। মিলন হইলে হইবেও তাঁহারই কাছে, যদিও তাঁর নামেই এখন চলিয়াছে যত ঝগড়া।

ভগবান হইলেন যোগেশ্বর, অথচ তাঁর নামেই মানবে মানবে নিত্য বিরোধ নিত্য কলহ! সকল দুঃখের উপর এই দুঃখই নিদারুণ।

দাদূ বলেন, "আমার জীবনে তুমি ছাড়া এতটুকু স্থান নাই যাহাতে আর কেহ বা আর কোনো কিছু পারে বসিতে।" দ্বৈত ও ভেদের আর স্থান কোথায়?

৩। এদিকে ওদিকে লক্ষ্যকে চঞ্চল না করিয়া নিত্যধনকে করিতে হইবে আশ্রয়। সকল দ্বৈতের অবসান যেখানে সেই ব্রহ্মের মধ্যেই মনকে নিরন্তর হইবে রাখিতে। নহিলে মন হইয়া যায় ছন্ন-ছাড়া।

৪। (প্রেমহীন) কার্য্য-করণে হয় অহঙ্কার, আচারে প্রথায় হয় রাজসভাবের চাঞ্চল্য। ভগবানের-প্রেম-সমুদ্ভুত সেবা-রূপ স্মরণই সর্ব্বদোষ হইতে বিমুক্ত। তাঁহাতে সব লয়-লীন করিয়া দিয়া সেই সহজ নির্ম্মলতার মধ্যে অহঙ্কারকে করিতে হইবে ক্ষয়। এক পলকও স্বামীর নিকট হইতে দূরে না থাকিয়া নিষ্কামভাবে নিরন্তর সেই জীবনস্বরূপকে হইবে দেখিতে।

৫। সেবা করিতে গিয়া বহুধা বিভক্ত সৃষ্টিকে স্বীকার করাবড় কঠিন, গাছের প্রতি পল্লবে ফুলে ফলে শাখাতে সেবা পৌঁছান তো সম্ভব নহে, অতএব সাধক মূলকে স্বীকার করিয়াই সমগ্রকে করেন গ্রহণ। অনেককে নানারূপে গ্রহণ করার চাতুরী পরিত্যাগ করিয়া আপনাকেও সেই মূলাধারে কর সমর্পণ। "গতি, মুক্তি, অমরতা প্রভৃতি সম্পদ চাই না, সেই এককেই চাই।" নানাকে নানাভাবে চিনিতে গিয়া চাতুরী যখন হার মানে তখনই আমরা তাঁহার চরণে সব বুদ্ধির অভিমান দিতে পারি বিসর্জ্জন।

৬। দীপ বিনা আঁধার যায় না, যত প্রয়াসই কেন না করি। সকল ভ্রম অন্ধকারের প্রতিকার হইল ব্রহ্ম-দীপ। অন্তরে এই প্রদীপ জ্বালিলে সব অন্ধকার আপনিই যায় দূর হইয়া।

হৃদয়ের বেদনার তিনিই একমাত্র ঔষধ। শাস্ত্রে, আচারে, সম্প্রদায়-ধর্ম্মে যায় না এই বেদনা। এই সব ব্যর্থ প্রয়াস হইবে ছাড়িতে।

ডালে ডালে ফিরিয়া হয়রান না হইয়া তোমার কাছে বসিব, তবেই সকল দুঃখ হইবে দূর, অন্তরের ও বাহিরের সব অন্ধকার যাইবে ঘুচিয়া।

৭। বৃক্ষের মূলে সেচন করিলেই বৃক্ষের সর্ব্বত্র সেই রস জীবন সঞ্চার করে। বিশ্বের মূলে সেচন কর প্রেমরস। ব্রহ্মই সেই বিশ্বের মূলাধার। তবেই তাঁহা হইতে বিশ্বচরাচরে যত কিছু হইয়াছে বিস্তার সবই তোমার কাছে হইবে জীবন্ত ও তোমার কাছে হইবে সত্য। তাঁকে গ্রহণ করিলে সকলকেই হইবে গ্রহণ করা। তাঁহাকে গ্রহণ করার অর্থ সকলকে পরিহার করা নহে। সকলকে আরও গভীরভাবে যথার্থভাবে গ্রহণ করা হয়, যদি তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারি। প্রেমের বৈরাগ্যে ও শুষ্ক বৈরাগ্যে এইখানেই পার্থক্য।

৮। তাঁহাকে পাইলেই সব দুঃখ হয় দূর। তাঁহাকে পাইলেই ঘোচে সব বন্ধন। কর্ম্ম দিয়া কি কখনো কর্ম্ম ক্ষয় হয়? কর্ম্মবন্ধন মোচন হয় একমাত্র তাঁর প্রেমে, তাঁর দয়ায়। অনেক চেষ্টা করিয়া অনেকে দেখিয়াছে, তিনি ছাড়া আর কোনো গতি নাই।

৯। ভগবানকে সেবাই হইল মুক্তির উপায়। কিন্তু স্বার্থের জন্য যদি তাঁহাকে সেবা করি, তবে তো নিজেকেই করা হইল সেবা। স্বার্থ ও অহঙ্কার হইল মরুভূমির মত। ইহাতে ফুল ফোটে না, ফল ফলে না। এই মরুতে বীজ বপন করিয়া কোনোদিন ভাণ্ডার ভরে না। স্বার্থের সাধনায় কোন লাভই নাই। তাঁহার সঙ্গ পাইয়া লোকে কেমন করিয়া আবার তুচ্ছ ধন জন চায়? এরূপ স্বার্থ সাধনও কি আবার ভগবানের সেবা? সে তো হইল সংসার-চতুরের মত দাঁও বুঝিয়া দাঁও মারা!

এই সব কামনা হইতে মুক্ত, সাচ্চা প্রেমের একটি কণাও জীবনে যদি লাভ কর, তবে সব বন্ধন যাইবে জ্বলিয়া। অগ্নির কণা যেমন কাঠের পর্ব্বতও করিতে পারে নিঃশেষ তেমনি সাচ্চা প্রেমের একটি কণারও শক্তি অসীম।

নিষ্কাম সঙ্গতিই সত্য সঙ্গতি। তাঁহার ও আমার মাঝখানে যদি স্বার্থ ও কামনা থাকে তবে যোগ ও সঙ্গতি হয় কেমন করিয়া?

নিষ্কাম যোগ হইলেই সাধক হয় ব্রহ্মের সরূপ ও সমধর্ম্মী, তবেই সে তাঁহার সঙ্গে সব রসভোগের সমান অধিকারী হইয়া যথার্থ প্রেমযোগে হয় যোগী।

১০। প্রিয়তমের শোভায় ও কল্যাণে ডুবিয়া নিজেকে করিতে হইবে সুন্দর ও কল্যাণময়, তাঁহার ইচ্ছায় নিজ ইচ্ছা হইবে ডুবাইতে। এমন করিয়াই সুন্দরী নিষ্কাম পতিব্রতার সাধনা ও সার্থকতা লাভ করে।

১১। তাঁহাকে পুরুষভাবে গ্রহণ করিয়াছি, তাই আমি নারীভাবেই তাঁর সেবা করি, তাঁহাকে নারীভাবে গ্রহণ করিলে পুরুষভাবেই তাঁহার সেবা করিতাম। তিনি স্বামী, তাঁকে ছাড়া আর কাহাকেও তো আমার পাতিব্রত্যটি দিতে পারি না। তিনি এক অসীম, পুরুষ, অরূপ; আমি নারী, সীমার বিচিত্র ঐশ্বর্য্যে আমি ঐশ্বর্য্যবতী। আমার নানা ঐশ্বর্য্য দিয়া নিরন্তর তাঁর অপার অরূপকে আমি দেই ভরিয়া ভরিয়া।

অনন্ত ঐশ্বর্য্যে আমি ঐশ্বর্য্যবতী। সেই সব নানাবিধ ঐশ্বর্য্যের দ্বারা জগতে আমি নানাভাবে সকলের সঙ্গে মিশিব, সকলকে সুখী করিব। সংসারের সকলকে নানাভাবে সেবা করিয়া নদী আপনাকে উৎসর্গ করে অপার সাগরে। সাগরের সঙ্গে নদীর যে সম্বন্ধ, তাহার আর তুলনা নাই।

স্বামীর সেই স্থান একমাত্র তাঁরই। সেইখানে যদি আমি অন্যকে লইয়া আসি, তবে আপনাকে নানাখানা করিয়া টুকরা টুকরা করিয়া জগতে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলে, কি নিদারুণ আধ্যাত্মিক আত্মঘাত!

১২। তখনকার দিনে মধুরভাবে সেবা করিতে গিয়া লোকের নানাভাবের ঘটিত ব্যভিচার। সব দেশে সব কালেই এই সব ত্রুটি ঘটে। তাহা যে ধর্ম্ম নহে, তাহা যে নিদারুণ আধ্যাত্মিক আত্মঘাত, দাদূ উচ্চকণ্ঠে তাহা ঘোষণা করিয়া সকলকে করিয়াছেন সাবধান। মধুর ভাবের সাধনা সহজ ও স্বাভাবিক বটে; কিন্তু মধুরভাবের সাধনায় এই বিপদ আছে বলিয়াই বিশেষভাবে সেই ক্ষেত্রে হইতে হইবে সাবধান।

১৩। জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে কামনাই বাধা। সগুণ নির্গুণ সব কামনা বিসর্জ্জন দিয়া স্বামীর মধ্যে আপনাকে দাও ডুবাইয়া।

অমরতা, ঋদ্ধি, সিদ্ধি, এই সব কিছুই নয়, তিনিই সব। প্রেম পেয়ালায় ভগবদ্‌রস অমৃতরস পাইলেই জীবন হইল সফল।

১৪। তখনই এই কথা বলিয়া স্তব করা চলে যে "তুমিই আমার সব, তোমা-বিনা আমার কিছুই নাই।"

১। তুমিই আমার পরিচয়।

কুল হমারে কেসৱা সগা ত সিরজনহার।
জাতি হমারী জগতগুর পরমেস্থুর পরিৱার॥
এক সংগ সংসার মেঁ মোহিঁ জে সিরজে সোই।
মনসা বাচা করমনা ঔর ন দূজা কোই॥
সিধি হমারে সাইয়াঁ করামতি করতার।
রিধি হমারে রাম হৈঁ অগম অলখ অপার॥

"কেশব আমার কুল, সৃজনকর্ত্তা বিধাতা আমার আপন জন (অথবা সহোদর ভাই), জগদ্‌গুরু আমার জাতি, পরমেশ্বর আমার পরিবার।

সংসারে যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই আমার একমাত্র সাথী; মনে বচনে ও কর্ম্মে আমার দ্বিতীয় আর কেহই নাই।

স্বামীই আমার সিদ্ধি, "করতার"ই (প্রভুই) আমার "করামাত"*, অগম্য, অলখ্য, অপার সেই রামই আমার ঋদ্ধি।"

২। তিনি একাই আমার সব।

সাঈঁ সনমুখ জীবতাঁ মরতাঁ সনমুখ হোই।
দাদূ জীৱণ মরণকা সোচ করৈ জিনি কোই॥
সহিব মিল্যা ত সব মিলে ভেঁটৈ ভেটা হোই।
সাহিব রহ্যা তৌ সব রহে নহীঁ তো নাহীঁ কোই॥
সব সুখ মেরে সাঁইয়াঁ মংগল সোঈ জন্ন।
দাদূ রীঝৈ রাম পরি অনত ন রীঝৈ মন্ন॥
মেরে হিরদৈ হরি বসৈ দূজা নাহীঁ ঔর।
কহৌ কহাঁ ধোঁ রাখিয়ে নহীঁ আন কোঁ ঠৌর॥
এক হমারে উরি বসৈ দূজা করি সব দূরি।
দূজা দেখত জাঈগা এক রহ্যা ভরপূরি॥

---

* আশ্চর্য্যশক্তিসম্পন্ন লোকেরা যে সব অদ্ভুতকার্য্য করেন তাহাকে বলে "করামাত" (Mirracle)।

“স্বামীর সম্মুখেই বাঁচন, মরণও তাঁহারই সম্মুখে ; হে দাদূ, জীবন মরণের জন্য যেন কেহ দুশ্চিন্তায় না হয় ব্যাকুল।

স্বামীর মিলনেই সকলের সঙ্গে হয় মিলন। স্বামীর সাক্ষাৎকারেই সকলের সাক্ষাৎ হয় করা, স্বামী রহিলেই সব রহে, (তিনি) না রহিলে নাই আর কেহই।

সব সুখ আমার স্বামী, সেই জনই (তিনিই) আমার সব মঙ্গল, ভগবানেই মজিয়াছে আমার মন, অন্যত্র আর কোথাও তো মন আমার মজে না।

আমার হৃদয়ে আছেন হরি, তাঁহা ছাড়া আর তো সেখানে কেহই নাই ; বল তো, (অপর কাহাকেও) রাখিই বা কোথায় ? অন্যের তো ঠাঁই-ই সেখানে নাই।

সব দ্বৈত দূর করিয়া সেই একই আমার হৃদয়ে করেন বাস। (তাঁহাকে) দেখিলেই (তাঁহা ছাড়া আর সব) দ্বৈত আপনিই যাইবে চলিয়া, একই রহিয়াছেন যে আমার অন্তরে ভরপূর হইয়া।”

৩। এক তাঁহাকেই নির্ভর।

দাদূ রহতা রাখিয়ে বহতা দেই বহাই।
বহতে সংগি ন জাইয়ে রহতে সৌঁ লব্র লাই ॥
বাৱৈঁ দেখি ন দাহিনৈঁ তন মন সনমুখ রাখি।
দাদূ নিরমল তত্ত গহি সংত* সবদ য়হ সাখি ॥
দূজা নৈন ন দেখিয়ে স্রবণহুঁ সুনৈঁ ন জাই।
জিভ্যা আন ন বোলিয়ে অংগি ন ঔর সুহাই ॥
দূজৈ অংতৃর হোত হৈ জিনি আনৈ মন মাহিঁ ॥
তহঁ লে মন কোঁ রাখিয়ে জহঁ কুছ দূজা নাহিঁ ॥

“যাহা স্থায়ী (রহন্ত) তাহাই রাখ, যাহা অস্থায়ী (বহন্ত) তাহা দেও ভাসাইয়া, “বহন্তের” সঙ্গে যাইও না বহিয়া, রহন্তের সঙ্গেই ধ্যানে প্রেমে থাক যুক্ত।

---

* “সত্য” পাঠও আছে।

তনু মন (তাঁর) সম্মুখে রাখিয়া না দেখিও দাহিনে না দেখিও বাঁয়ে। হে দাদূ নির্ম্মল তত্ত্ব কর গ্রহণ, ইহাই সাধকদের "শব্দ" (সঙ্গীত) ও "সাখি" (সাক্ষ্য)।

(তাঁহা ছাড়া) অপর আর কাহাকে নয়নেও দেখিবে না, শ্রবণেও শুনিবে না, রসনায় ও বলিবে না। (এই) অঙ্গে অপর (কিছুরই বা অপর কাহারও সংস্পর্শ) পায় না শোভা।

অপর কিছু থাকিলেই যায় ব্যবধান হইয়া, তাই মনেও আনিও না অপর কিছু। যেখানে অপর আর কিছুই (দ্বৈত) নাই, সেখানেই নিয়া রাখ এই মনকে।"

৪ঃ নিষ্কাম হইয়া তাঁহাতে থাক যুক্তঃ

করণী আপা উপজৈ রহণী রাজস হোই।
সব থৈঁ দাদূ নির্মলা সেৱা সুমিরণ সোই॥
মন অপনা লৱ লীন করি করণী সব জংজাল।
দাদূ সহজৈঁ নির্মলা আপা মেটি সঁভাল॥
নিহচল তো নিহচল রহৈ চংচল তো চলি জাই।
দাদূ চংচল ছাড়ি সব নিহচল সৌঁ লৱ লাই॥
সাহিব রহতাঁ সব রহ্যা সাহিব জাতাঁ জাই।
দাদূ সাহিব রাখিয়ে দূজা সংগ ন সমাই॥
মন চিত মনসা পলক মৈঁ সাঈঁ দূরি ন হোই।
নিহকামী নিরখৈ সদা দাদূ জীৱন সোই॥

"(প্রেমহীন) ক্রিয়াকর্ম্মে অহঙ্কার হয় উৎপন্ন, রীতিতে আচারে রজোগুণ হয় সঞ্জাত, হে দাদূ, সব হইতে নির্ম্মল হইল (প্রেমযুক্ত) সেবারদ্বারা তাঁহার "সুমিরণ" (নাম স্মরণ)।

আপন মনকে প্রেমে ধ্যানে কর মগ্ন, বাহ্য ক্রিয়া-কর্ম্ম সব জঞ্জাল। হে দাদূ, "অহম্"কে মিটাইয়া (ক্ষয় করিয়া) সহজেই যত্নে সামলাও নিজ নির্ম্মলতা।

নিশ্চল তো নিশ্চলই থাকে, চঞ্চল তো চলিয়াই যায়, হে দাদূ, সব চঞ্চলতা ছাড়িয়া নিশ্চলের সঙ্গে প্রেমধ্যানে রহ যুক্ত।

স্বামী রহিলে সবই রহে, স্বামী গেলেই সবই যায়, হে দাদূ, স্বামীকেই রাখ, অপরের সঙ্গের মধ্যে যেন করিও না প্রবেশ।

এক পলকের জন্যও যেন মন চিত্ত মানস হইতে স্বামী না রহেন দূরে। হে দাদূ, নিষ্কাম হইয়া সদাই দেখ (নিষ্কাম সদাই দেখে), তিনিই জীবনস্বরূপ।"

৮। তিনি ছাড়া সবই মিথ্যা।

সাধু রাখৈ রামকোঁ সংসারী মায়া।
সংসারী পালর গহৈ মূল সাধুঁ পায়া॥
সব চতুরাঈ দেখিয়ে জো কুছ কীজৈ আন।
দাদূ আপা সৌঁপি সব পীৱ কোঁ লেহু পিছান॥
দাদূ দূজা কুছ নহীঁ এক সওি করি জান।
দাদূ দূজা ক্যা করৈ জিন এক লিয়া পহিচান॥
কোঈ বাংছৈ মুক্তি ফল কোই অমরাপুরি বাস।
কোঈ বাংছৈ পরমা গতি দাদূ রাম মিলনকী প্যাস॥
তুম হরি হিরদৈ হেত সোঁ প্রগটহু পরমানংদ।
দাদূ দেখৈ নৈন ভরি তব কেতা হোই অনংদ॥

"সাধু জন হৃদয়ে রাখে রামকে, সংসারী জন রাখে মায়াকে। সংসারী জন গ্রহণ করে পল্লব, সাধু জন গ্রহণ করে মূল।

(মূল-গ্রহণ ছাড়া) অন্য যাহা কিছু কর, ভাবিয়া দেখ সেই সবই চতুরতা; হে দাদূ, সব অহমিকা উৎসর্গ করিয়া প্রিয়তমকেই লও চিনিয়া।

হে দাদূ, "দ্বিতীয়"* আর কিছুই নাই, এককেই তুমি জান সত্য বলিয়া; যে এককে চিনিয়াছে, "দ্বিতীয়" (তাহার) আর করিবে কি?

কেহ বাঞ্ছা করে মুক্তিফল, কেহ চায় অমরাপুরে বাস, কেহ বাঞ্ছে পরমাগতি, দাদূর শুধু ভগবানের সঙ্গে মিলনেরই ব্যাকুল পিপাসা।

---

* দূজা অর্থ দ্বিতীয়। অর্থাৎ তিনি ছাড়া আর যাহা কিছু। এই অঙ্গে বারবার "দূজা" কথাটি ব্যবহার করা হইয়াছে।

পরমানন্দ তুমি হে হরি, আমার হৃদয়ে প্রেমভরে হও প্রকাশিত প্রকটিত; দাদূ যদি তোমাকে দেখে নয়ন ভরিয়া, তবে কতই না হয় তার আনন্দ!”

৬। সকল ব্যথার তিনিই প্রতিকার।

ভরম তিমর ভাজৈ নহীঁ রে জিয় আন উপাই।
দাদূ দীপক সাজি লে সহজৈঁ হীঁ মিটি জাই॥
সো বেদন নহিঁ বাৱরে আন কিয়ে জে জাই।
সব দুখ ভংজন সাঈয়াঁ তাহী সৌঁ লৱ লাই॥
ঔষধি মূলী কুছ নহীঁ য়ে সব ঝূঠী বাত।
জো ওষধি হী জীৱিয়ে তৌ কাহে কোঁ মরি জাত॥
সাহিব কা দর ছাড়ি করি সেৱগ কহীঁ ন জাই।
দাদূ বৈঠা মূল গহি ডালোঁ ফিরৈ বলাই॥

“ওরে জীব, ওরে জীবন, আর কোনও উপায়েই তো ভ্রম-তিমির যায় না দূরে। হে দাদূ, (ব্রহ্ম) প্রদীপ লও সাজাইয়া, সহজেই অন্ধকার যাইবে মিটিয়া।

এ সেই বেদনা নয়, ওরে পাগল, যে যাইবে আর কোনো উপায়ে! সকল-দুঃখ-ভঞ্জন (আমার) স্বামী, তাঁহার সঙ্গেই ধ্যানযুক্ত থাক প্রেমযোগে।

ঔষধ মূল ওসব কিছুই নয়; এ সবই মিথ্যা কথা। ঔষধেই যদি বাঁচিত তবে আর লোক যায় কেন মরিয়া?

স্বামীর দ্বার ছাড়িয়া সেবক আর তো কোথাও যায় না। দাদূ এই বসিয়াছে মূল গ্রহণ করিয়া, যত বালাই এখন ফিরিয়া বেড়ায় ডালে ডালে।”

৭। মূলাধারকে আশ্রয় কর।

জব লগ মূল ন সীঁচিয়ে তব লগ হর্যা ন হোই।
সেৱা নিহফল সব গঈ ফিরি পছিতাৱা সোই॥
দাদূ সীঁচৈ মূল কোঁ সব সাঁচা* বিস্তার।
সব আয়া উস এক মেঁ পাত ফূল ফল ডার॥

---

* “সীঁচ্যা বিস্তার” পাঠ হইলে অর্থ হইবে “সব বিস্তার হইবে সিক্ত।”

দেৱ নিরংজন পূজিয়ে সব আয়া উস মাহিঁ ।
ডাল পাত ফল ফূল সব দাদূ ন্যারে নাহিঁ ॥

“যে পর্য্যন্ত মূলে না কর সেচন সে পর্য্যন্ত কিছুই হয় না তাজা ও সবুজ ; (মূল সেবা বিনা) সব সেবাই হইয়া গেল নিষ্ফল ; পরে হইল সেই অনুতাপ।

হে দাদূ, মূলকে কর সেচন, (মূলকে সেবা করিলেই) সব বিস্তার হইবে সত্য (তোমার কাছে), পাতা ফুল ফল ডাল সবই আসিল সেই একেরই মধ্যে ।

দেব নিরঞ্জনকেই কর পূজা, সবই তবে আসিল তার মধ্যে। ডাল পাতা ফল ফুল সবই (বিরাজিত সেই মূলে), হে দাদূ, সে সব তো কিছুই মূল হইতে নহে বিভিন্ন ।”

৮। কর্ম্ম দিয়া হয় না কর্ম্ম ক্ষয়, মুক্তি তাঁহারই কৃপায়।

মনসা বাচা করমনা অংতরি আৱৈ এক ।
তাকৌঁ পর্তখি রামজী বাতৈঁ ঔর অনেক ॥
মনসা বাচা করমনা হিরদৈ হরি কা ভাৱ ।
অলখ পুরিষ আগৈ খড়া তাকৈ ত্রিভুৱন রাৱ ॥
মনসা বাচা করমনা হরিহী সৌঁ হিত হোই ।
সাহিব সনমুখ সংগি হৈ আদি নিরংজন সোই ॥
মনসা বাচা করমনা আতুর কারণি রাম ।
সম্রথ সাঈঁ সব করৈ পরগট পূরৈ কাম ॥
এক রামকে নাম বিন জীৱকী জরণী ন জাই ।
দাদূ কেতে পচি মুয়ে করি করি বহুত উপাই ॥
করমৈ করম কাটৈ নহীঁ করমৈ করম ন জাই ।
করমৈ করম ছূটৈ নহীঁ করমৈ করম বঁধাই ॥

“মনসা বাচা কর্ম্মণা অন্তরে যাহার এক (স্বামী) আসিয়া হন বিরাজিত,

তাহার কাছেই ভগবান প্রত্যক্ষ, কথাতে বলিতে গেলে আর কত কিছুই যায় বলা।

মনসা বাচা কর্ম্মণা হৃদয়ে যদি থাকে হরির ভাব, তবে অলখ পুরুষ তাহার (সেই সাধকের) সম্মুখেই বিরাজিত, ত্রিভুবনপতি তবে তাহারই।

মনসা বাচা কর্ম্মণা হরির সঙ্গেই যদি হয় প্রেম, তবে স্বামী সম্মুখেই আছেন সাথে সাথে; তিনিই তো আদি নিরঞ্জন।

মনসা বাচা কর্ম্মণা রামের জন্য যদি (মন) হয় ব্যাকুল আতুর, সমর্থ স্বামীই তবে সবই করেন পরিপূর্ণ, প্রত্যক্ষই সব কামনা হয় পূর্ণ।

এক রামের নাম বিনা জীবের জ্বালার হয় না শান্তি, হে দাদূ, কত কত জন কত কত না উপায় করিয়া মরিয়াছেন পচিয়া পচিয়া।

কর্ম্ম কখনও কর্ম্মকে পারে না কাটিতে, কর্ম্মে কখনো যায় না কর্ম্ম চলিয়া, কর্ম্মে কখনো ছুটে না কর্ম্ম, কর্ম্মেই বদ্ধ হয় কর্ম্মবন্ধনে।”

৯। নিষ্কাম যোগই সত্য যোগ।

স্বারথ সেৱা কীজিয়ে তাথৈঁ ভলা ন হোই।
দাদূ ঊসর বাহি করি কোঠা ভরৈ ন কোই॥
সুত বিত মাঁগৈঁ বাৱরে সাহিব সৌঁ নিধি মেলি।
দাদূ ৱৈ নিহফল গয়ে জৈসৈঁ নাগর বেলি॥
ফল কারণি সেৱা করৈ জাচৈ ত্রিভুৱন রাৱ।
দাদূ সো সেৱগ নহীঁ খেলৈ অপনা দাৱ॥
তন মন লে লাগা রহৈ রাতা সিরজনহার।
দাদূ কুছ মাংগৈ নহীঁ তে বিরলা সংসার॥
সাঁঈ কৌঁ সঁভালতাঁ কোটি বিঘন টলি জাহিঁ।
রাই সমান বসংদরা কেতে কাঠ জরাহিঁ॥
নিহকাম সনমুখ রহৈ সত্য* সংগতি সোই।
সোহী জুক্ত অরু মুক্ত সদা প্রেমী সোহী হোই॥

---

* “সাঁঈ” পাঠও আছে, অর্থ স্বামীর সঙ্গতি।

"স্বার্থে সেবা যে কর তাহাতে কোনোই শ্রেয়ঃ নাই, হে দাদূ, মরুভূমিতে বীজ বপন করিয়া কেহ কখনো ভরে নাই আপন গোলা।

স্বামীর মত নিধিকে পাইয়াও পাগলেরা করে কিনা সুত-বিত্তের প্রার্থনা! হে দাদূ, তাঁহারা পানের লতার মতই রহিয়া গেলেন নিষ্ফল।

ফলের কারণ যে করে সেবা, আর ত্রিভুবনপতির কাছে যে করে যাচনা, হে দাদূ, সে তো সেবক নহে; সে আপন দাঁও-মত (অবসর বুঝিয়া) খেলে (দাঁও মারে) আপন খেলা!

সৃজনকর্ত্তা বিধাতার অনুরাগে অনুরক্ত হইয়া তনু মন লইয়া থাকে তাঁরই সঙ্গে লাগিয়া এবং আর কিছুই চাহে না, হে দাদূ, তেমন সেবক সংসারে বিরল।

স্বামীকে যদি আশ্রয় ও অবলম্বন কর তবে (সহজেই) কোটি বিঘ্ন যাইবে দূরে চলিয়া, সর্ষপের মত অগ্নি স্ফুলিঙ্গ কত কাঠই করিয়া ফেলে দগ্ধ!

নিষ্কাম হইয়া তাঁর সম্মুখে থাকাই হইল যথার্থ সত্য সঙ্গতি। সে-ই হইল সদা যুক্ত আর সে-ই হইল সদা মুক্ত, সে-ই তো হইল প্রেমী!"

১০। পতিপ্রাণা সুন্দরীর এই ব্রত।

জিসকী খূবী খূব সব সোই খূব সঁভারি।
দাদূ সুংদর খূব সৌঁ নখ সিখ সাজ সবাঁরি॥
আজ্ঞা মাহৈঁ উঠে বৈসে আজ্ঞা আবৈ জাই।
আজ্ঞা মাহৈঁ লেবৈ দেবৈ আজ্ঞা পহিরৈ খাই॥
আজ্ঞা মাহৈঁ বাহরি ভিতরি আজ্ঞা রহৈ সমাই।
আজ্ঞা মাহৈঁ তন মন রাখৈ দাদূ রহ লব লাই॥
পতিব্রতা গ্রিহ আপনৈ করৈ খসমকী সেব।
জ্যোঁ রাখৈ ত্যোঁ হী রহৈ আজ্ঞাকারী টেব॥

"যাঁহার সৌন্দর্য্যে ও বিশিষ্ট শ্রেষ্ঠতায় সবই সুন্দর বিশিষ্ট ও শ্রেষ্ঠ, সেই

পরম সুন্দরকে কর আশ্রয়। হে দাদূ, সেই সুন্দরের বিশিষ্ট শ্রেষ্ঠতার সৌন্দর্য্যে আপন আপাদ মস্তক কর সুশোভিত।*

(তাঁহার) আজ্ঞাতেই (পতিব্রতা) সে উঠে বসে, তাঁর আজ্ঞাতেই আসে যায়, তাঁহার আজ্ঞাতেই নেয় দেয়, তাঁহার আজ্ঞাতেই সে খায় পরে।

তাঁহার আজ্ঞাতেই (পরিপূর্ণ তাহার) বাহির ও ভিতর, তাঁহার আজ্ঞাতেই রহে সে ডুবিয়া, তাঁহার আজ্ঞার মধ্যেই সে রাখে আপন মনকে, হে দাদূ, প্রেম ধ্যানসহ তাঁহার আজ্ঞাতেই সে সদা থাকে অধিষ্ঠিত।

পতিব্রতা আপন গৃহে স্বামীর করে সেবা, যেমন তিনি রাখেন তেমনই সে রহে, তাহার স্বভাবই যে আজ্ঞাকারী। [তেমনি জগতে জগৎপতির সহজ অনুবর্ত্তিতা করিয়াই নিষ্কাম পতিব্রতার সাধনা হয় সম্পূর্ণ]।”

১১। সহজ সাধন, মধুর সাধন।

নারী পুরিষা দেখি করি পুরিষা নারী হোই।
দাদূ সেৱগ রামকা সীলৱংত হৈ সোই॥
পুরিষ হমারা এক হৈ হম নারী বহু অংগ।
সো জৈসা হৈ তাহি সোঁ খেলৈঁ তিসহী সংগ॥†
দাদূ নখ সিখ সোঁপি সব জিনি বাঁঝ জাই পরাণ।
জো দিল বংটৈ আপনী নাসৈ জন্ম অজান॥

“(ভগবানকে) নারী দেখিয়া যে হয় পুরুষ, পুরুষ দেখিয়া যে হয় নারী, হে দাদূ, সে-ই তো ভগবানের সেবক, সে-ই তো যথার্থ শীলবন্ত।

পুরুষ (স্বামী) আমার এক, বহু অঙ্গ (বহু উপকরণ ভাব ও ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যবতী) আমি নারী। তিনি যেমন তাঁর সঙ্গে আমি তেমন সঙ্গী

---

* এই “খূব ও খূবী” কথার বাংলা করা কঠিন। ইহাতে সৌন্দর্য্য মনোহারিত্ব বিশিষ্টতা শ্রেষ্ঠতা প্রভৃতি অনেক কিছুই বুঝায়।

† “জ্যে জে জৈসী তাহি সৌ খেলৈঁ তিসহী রংগ” পাঠও আছে। তাহাতে অর্থ হইবে “তিনি এক পুরুষ, আমরা নারী বহুমূর্ত্তি। আমরা যে যেমন, তার সঙ্গে তিনি তেমনই করেন লীলা।”

হইয়াই করি লীলা। (অন্য সবার সঙ্গেও তাঁহাদের অনুরূপই করি আমি সেবা ও পরিচারণা)।

(সাবধান), হে দাদূ, নখ শিখ (আপাদ মস্তক) সব (যা'কে তা'কে) সঁপিয়া এই প্রাণ যেন না হইয়া যায় বন্ধ্য ও নিষ্ফল ; যে আপন চিত্তকে (নানানখানা) করিয়া দেয় ভাগ করিয়া (বাঁটিয়া) সে অজ্ঞান, না জানিয়া সে (আপন) জনমকেই করে বিনাশ।"

১২। মধুর সাধনা ভগবানেরই সঙ্গে। মানুষের সঙ্গে হইলেই সর্ব্বনাশ।

পর পুরিষা রতি বাঁঝণী জানৈ জো ফল হোই।
জনম বিগোৱৈ আপনা ভীত ভয়ানক সোই॥
দাদূ তজি ভরতার কোঁ পর পুরিষা রতি হোই।
ঐসী সেৱা সব করৈ রাম ন জানৈ সোই॥
নারী সেৱক তব লগৈঁ জব লগ সাঈঁ পাস।
দাদূ পরসৈ আন কোঁ তাকী কৈসী আস॥
কাম ভর সেৱা করৈ কামিনী নারী সোই।
পরম পুরুষ কো মিলিহৈ জানে ন কেতিগ ৱোই॥

"পর পুরুষের আসক্তি বন্ধ্যা (নিষ্ফলা), জানাই তো আছে তাহাতে যে ফল হয়। এমন করিয়াই জনম দেয় উচ্ছন্ন করিয়া ; আর একি ভয়ঙ্কর সর্ব্বনাশের কথা!

হে দাদূ, স্বামীকে ছাড়িয়া পরপুরুষে হয় আবার রতি! এমন সেবাই দেখি সবাই করে, ভগবানকে তো সে জানিলই না (ভগবানও তাহাকে করিতে পারিলেন না স্বীকার)!

ততক্ষণই নারী হয় সেবক যতক্ষণ সে থাকে স্বামীর পাশে, হে দাদূ, যদি অন্য পুরুষকেই সে করিল স্পর্শ তবে তাহার আবার কিসের ভরসা?

কামনা করিয়া (স্বার্থ বুদ্ধিতে) যে করিল সেবা সে তো হইল কামিনী

নারী। হে দাদূ, জানে না তো* কত কান্না কাঁদিয়াই পরম পুরুষের সঙ্গে তাহাকে আবার হইবে মিলিতে।”

১৩। কামনা নহে প্রেমরসই চাই।

কছূ ন কীজৈ কামনা সরগুণ নিরগুণ হোই।
পলটি জীৱতৈঁ ব্রহ্ম গতি সব বিধি মানী সোই॥
কোটি বরস ক্যা জীৱনা অমর ভয়ে ক্যা হোই।
প্রেম ভগতি রস রাম বিন ক্যা দাদূ জীৱন সোই॥
প্রেম পিয়ালা রামরস হম কোঁ ভাৱৈ এহ।
রিধি সিধি মাঁগৈঁ মুক্তি ফল চাহৈঁ তিন্ কোঁ দেহ॥

“সগুণ নির্গুণ যাহাই হৌক না কেন, কোনো কামনাই করিও না; তবেই জীবগতি হইতে পালটিয়া হইবে ব্রহ্মগতি, সর্ব্বভাবে তাঁহাকেই মান।

প্রেম ভক্তি রস বিনা, রাম বিনা, কোটি বৎসর আয়ুতেই বা কি ফল? অমর হইয়াই বা কি ফল? হে দাদূ, এইরূপ জীবন কি আবার একটা জীবন!

প্রেম পিয়ালা, রামরস, ইহাই তো আমার লাগে ভাল, ইহাই তো আমি চাই। ঋদ্ধি সিদ্ধি যাঁহারা মাগেন, মুক্তিফল যাঁহারা চান, তাঁহাদিগকেই না হয় সে সব দাও।”

২৪। পরমপুরুষের স্তব।

তুমহী গুরু তুমহী জ্ঞান।
তুমহী দেৱ সব তুমহী ধ্যান॥
তুমহী পূজা তুমহী পাতী।
তুমহী তীরথ তুমহী জাতী॥
তুমহী গাথা তুমহী ভেদ।
তুমহী পুরাণ তুমহী বেদ॥

---

* (“না জানি” অর্থও হয়)।

তুমহী জুগুতি তুমহী জোগ ।
তুমহী বৈরাগ তুমহী ভোগ ॥
তুমহী জীৱনী তুমহী জপ্‌প ।
তুমহী সাধন তুমহী তপ্‌প ॥
তুমহী সীল তুমহী সংতোখ ।
তুমহী মুকুতি তুমহী মোখ ॥
তুমহী সিৱ তুমহী সকতি ।
তুমহী আগম তুমহী উকতি ॥
তূঁ সত অৱিগত তূঁ অপরংপার ।
তূঁ নাম, দাদূ কা বিস্রাম, তূঁ নিরাকার ॥*

"তুমিই গুরু তুমিই জ্ঞান ; তুমিই সর্ব্বদেবতা তুমিই ধ্যান । তুমিই পূজা তুমিই পাতি ; তুমিই তীর্থ তুমিই জাতি । তুমিই গাথা তুমিই ভেদ (দুর্জ্ঞেয় রহস্য) ; তুমিই পুরাণ তুমিই বেদ । তুমিই যুক্তি তুমিই যোগ ; তুমিই বৈরাগ্য তুমিই ভোগ । তুমিই জীবন তুমিই জপ ; তুমিই সাধন তুমিই তপ । তুমিই শীল তুমিই সন্তোষ ; তুমিই মুক্তি তুমিই মোষ (মোক্ষ) । তুমিই শিব তুমিই শক্তি ; তুমিই আগম তুমিই উক্তি ।*

তুমি সত্য, তুমি নিত্য (অনির্বচনীয়), তুমি অনন্ত অপার ; তুমি নাম, তুমি দাদূর বিশ্রাম, তুমি নিরাকার ।"

---

* এই স্তবটির একটি মহারাষ্ট্রী রূপও আছে ।

"তুম্হেঁ অম্হঁচা হে গুরু তুম্হেঁ অম্হঁচা জ্ঞান ।
তুম্হেঁ অম্হঁচা দেৱ সব তুম্হেঁ অম্হঁচা ধ্যান ॥ ইত্যাদি

"তুমিই আমার হে গুরু, তুমিই আমার জ্ঞান । তুমিই আমার সর্ব্বদেবতা, তুমিই আমার ধ্যান" এইভাবে "অম্হঁচা" অর্থাৎ "আমার" সর্ব্বত্র এই কথাটি যোগ করিয়া আগাগোড়া এই একই ভাবে মহারাষ্ট্রীতে স্তব রচিত হইয়াছে ।

দাদূ সবদ

(শব্দ, সঙ্গীত)

রজ্জবজীকৃত "অংগবধূ" সংগ্রহে প্রাপ্ত সঙ্গীত সংগ্রহের কথা উপক্রমণিকাতেই লেখা হইয়াছে। তাহাতে যতগুলি সুরের উল্লেখ আছে তাহাও দেওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়াও দাদূর খুব ভাল সঙ্গীত মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। দাদূর খুব ভাল সঙ্গীতের একটি সংগ্রহ আমার কাছে ছিল তাহার অনেক গানই জৌনপুরে, বুন্দেলখণ্ডে, আজমীরের নিকটস্থ প্রদেশে রোহতক নারনৌল প্রভৃতি স্থানে, আবু পর্ব্বতে, কাঠিয়াওয়াড়ে, গুজরাতে, কচ্ছে ও সিন্ধুপ্রদেশে সংগ্রহ করা। তাহার মধ্যে সব চেয়ে মধুর সঙ্গীত পাওয়া গিয়াছিল জৌনপুরের ও কচ্ছ এবং সিন্ধু প্রদেশের কাছাকাছি কোনো কোনো স্থানে। এই সব সিন্ধুদেশের সমীপস্থ স্থানে লাড়কানায় সাধু ধরমদাসের অনুরাগী, সিন্ধুর দরাজের সচল শাহের অনুরাগী, কুতুব ও দলপত সাহেবের অনুরাগী কয়েকটি সুফী সাধুর দেখা পাই যাঁহারা চিকারা নামক যন্ত্র বাজাইয়া অতি মনোহর ভাবে দাদূর গান করেন। সীঁধড়া, সৌরঠ, কাফী, সুহৌ, মালীগৌড় প্রভৃতি রাগই তাঁহারা বেশি গাহিয়া থাকেন। জৌনপুরে দাদূর উৎকৃষ্ট রামকেলী টোড়ী ও আসাব্বরী শুনা যায়। সেই গানগুলি আমার ও আমার দুইটি সাধু বন্ধুর সংগ্রহ করা। সেই সংগ্রহের সঙ্গে দাদূর জীবনীর উপকরণও কিছু কিছু ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে আমার সাধু বন্ধু দুইটির হাত হইতে একদল ভক্তের হাতে ঐ সংগ্রহটি যায়। এখনও তাহা ফিরিয়া পাই নাই। পাইলে ভবিষ্যতে প্রকাশ করা যাইবে। কিন্তু সেই কারণে "বাণী"গুলি প্রকাশ করাতে বিলম্ব করা অন্যায় হইবে মনে করাতে এখন অন্ততঃ বাণীর অংশটাই প্রকাশ করা গেল। আর সাদাসিধা রকমের কিছু "সবদ" বা গানও এখানে প্রকাশ করা গেল।

বাণী অপেক্ষা গান হাতে হাতে ঘুরিয়া বেড়ায় বেশি। কাজেই বাণী অপেক্ষা গানে আরও অদল বদল ঘটে। তবু তাই বলিয়া ভক্তপরম্পরাতে

প্রাপ্ত সব উত্তম গান তো উপেক্ষা করা চলে না। অনেক গানে আমার পুঁথিতে লেখা সুরের সঙ্গে ভক্তদের গীত সুরে মেলে না। "অংগবংধূ"তে লেখাও অনেক গান আছে। তবে আমরা ভক্তদের কাছে গান যে ভাবে শুনিয়াছি সেইভাবেই এখানে আজ প্রকাশ করিতেছি। এইরূপ গান "অংগবংধূ" সংগ্রহের মধ্যেও আংশিকভাবে আছে। "অংগবংধূ"তে যাহার একটু অংশও নাই এমন গান এখন প্রকাশ করা সম্ভব হইল না। সম্ভব হইলে ও সব উপকরণ পাওয়া গেলে অন্য কোনো সময়ে দাদূর গানের একটি বিস্তৃততর সংগ্রহ প্রকাশের চেষ্টা করা যাইবে।

রাগ গৌড়ী

(১)

তুম বিন ব্যাকুল কেসরা নৈন রহে জল পূরি।
অংতরজামী ছিপ রহে হম ক্যোঁ জীবৈ দূরি॥
আপ অপরছন হোই রহে হম ক্যোঁ রৈন বিহাই।
দাদূ দরসন কারণে তলফি তলফি জির জাই॥

"হে কেশব, তুমি বিনা আমি ব্যাকুল, নয়ন আছে জলে ভরিয়া। হে অন্তর্য্যামী, তুমি প্রচ্ছন্ন থাকিলে আমি কেমন করিয়া বাঁচি দূরে? নিজে রহিলে প্রচ্ছন্ন হইয়া, আমি কেমন করিয়া কাটাই রজনী? দরশনের কারণে ছটফট করিয়া যায় দাদূর প্রাণ।"

(২)

অজহূঁ ন নিকসৈঁ প্রাণ কঠোর।
দরসন বিনা বহুত দিন বীতে সুংদর প্রীতম মোর।
চার পহর চারোঁ জুগ বীতে রৈন গবাঁঈ ভোর।
অবধি গঈ অজহূঁ নহি আয়ে কতহূঁ রহে চিতচোর।
কবহূঁ নৈন নিরখি নহিঁ দেখে মারগ চিতবত তোর।
দাদূ ঐসৈ আতুর বিরহিণী জৈসৈ চংদ চকোর॥

"কঠোর প্রাণ আজিও তো হয় না বাহির! হে মোর সুন্দর প্রিয়তম, দরশন বিনা বহুত দিন তো গেল অতীত হইয়া; রাত্রি যে ভোর করিলাম, চারিটি প্রহর গেল যেন চারিটি যুগ। ফিরিয়া আসিবার নির্দ্দিষ্ট কাল তো হইল অতীত, আজও তো আসিলে না, কোথায় রহিলে. হে মোর চিতচোর? নয়ন তো কখনও তোমায় দেখিল না নিরখিয়া, তাই তোমার পথপানেই আছে চাহিয়া। দাদূ এমনই হইয়াছে ব্যাকুলা বিরহিণী, যেমন চন্দ্রের জন্য ব্যাকুল চকোর।"

(৬)

ঐসা জনম অমোলিক ভাঈ।
জা মৈঁ আই মিলৈ রাম রাঈ॥
জা মৈঁ প্রাণ প্রেম রস পীবৈ।
সদা সুহাগ সহজ সুখ জীবৈ॥
আতম আই রাম সৌঁ রাতী।
অখিল অমর ধন পাবৈ থাতী॥
পরগট দরসন পরসন পাবৈ।
পরম পুরুষ মিলি মাহিঁ সমাবৈ॥
ঐসা জন্ম নহীঁ নর আবৈ।
সো কুঁ্য দাদূ রতন গঁবাবৈ॥ *

"এমন অমূল্য এই জীবন রে ভাই, যাহাতে আসিয়া মেলেন প্রভু ভগবান। যাহাতে প্রাণ প্রেমরস করে পান; সদাই সৌভাগ্য সহঙ্গ আনন্দে রহে জীবন্ত। আত্মা আসিয়া ভগবানের সহিত হয় প্রেম-রত। অখিল অমর ঐশ্বর্য্যে পায় স্থিতি। পরমপুরুষের পায় প্রত্যক্ষ দর্শন স্পর্শন, তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইয়া অন্তরে রহে সমাহিত হইয়া।

---

* এই গান শুনিয়াই নাকি রজ্জবজী তাঁর পূর্ব্ব জীবন ছাড়িয়া ধর্ম্মজীবনে চলিয়া আসেন।

এমন মানবজন্ম আর কি হইবে? হে দাদূ, এমন রত্ন কেন বৃথা হারাইলে হেলায়?"

(৪)

মন অরসণ[ক] তৈঁ ক্যা কীয়া ॥
রে তৈঁ জপ-তপ সাধী ক্যা দীয়া।
কুছ পীৱ কারনি বৈরাগ ন লীয়া ॥
রে তূঁ পালৈ পর্ৱত না গল্যা।
রে তৈঁ আপৈ আপণী না দহ্যা
রে তৈঁ বিরহিণী জ্যোঁ দুঃখ না সহ্যা ॥
হোই প্যাসে হরি জল না পীয়া।
রে তূঁ বজর, ন ফাটৌ রে হীয়া।
ধ্রিগ জীৱন দাদূ যে জীয়া ॥

"অলস অরসিক মন তুই এই জীবনে করিলি কি? ওরে তুই জপ তপ সাধনাতেই বা দিলি কতটুকু? প্রিয়তমের কারণেও তুই কিছু নিস্ নাই বৈরাগ্য!

ওরে তুই পর্ব্বতের তুষারের মতও তো যাস্ নাই গলিয়া! তুই আপনাতে আপনি ও যাস্ নাই দগ্ধ হইয়া! ওরে বিরহিণীর উপযুক্ত দুঃখও সহিস্ নাই (এই জীবনে)!

ওরে তুই পিপাসিত হইয়া হরি-জলও করিস্ নাই পান; ওরে তুই বজ্র-কঠোর, তোর হৃদয়ও যায় নাই ফাটিয়া! ওরে ধিক তোর জীবন যে এমন জীবনেও রহিলি বাঁচিয়া!"

(৫)

তূঁ হৈ তূঁ হৈ তূঁ হৈ তেরা।
মৈ নহিঁ মৈ নহিঁ মৈ নহিঁ মেরা ॥
তূঁ হৈ তেরা জগত উপায়া।
মৈঁ মৈঁ মেরা ধংধৈ লায়া ॥

[ক] "মূরখ" ও কেহ কেহ গান করেন।

তূঁ হৈঁ তেরা খেল পসারা।
মৈঁ মৈঁ মেরা কহৈ গঁৱারা॥
তূঁ হৈ তেরা রহ্যা সমাই।
মৈঁ মৈঁ মেরা গয়া বিলাই॥

"তুমিই আছ, তুমিই আছ, তোমারই সব আছে। আমি নই, আমি নই, আমি নই; কিছুই নাই আমার।

তুমি আছ, তোমার জগৎ করিলে প্রকাশ, "আমি আমি, আমার আমার" করিয়া আমি সুধু ধন্ধই আসিলাম লইয়া।

তুমি আছ, তাই প্রসারিত করিলে তোমার সৃষ্টিলীলা, "আমি আমি" "আমার আমার" বলে শুধু মূর্খ গ্রাম্য।

তুমি আছ তোমার সত্তা আছে সর্ব্বত্র ভরপূর প্রসারিত, "আমি আমি" "আমার আমার" গেল বিলয় হইয়া।"

(৬)

ভেখ ন রীঝৈ মেরা নিজ ভর্ত্তার।
তা থৈঁ কীজৈ প্রীতি বিচার॥
দুরাচারণী রচি ভেখ বনাৱৈ।
সীল সাঁচ নহিঁ পিৱ কোঁ ভাৱৈ॥
কংত ন ভাৱৈ করৈ সিংগার।
ডিংভপণৈ রীঝৈ সংসার॥
পীৱ পহিচাঁনৈ আন নহিঁ কোই।
দাদূ সোই সুহাগণি হোই॥

"স্বামী আমার তো ভোলেন না ভেখে (সাজ সজ্জায়), তাই সাবধানে বিচার করিয়া প্রেমকেই কর আশ্রয়।

দুরাচারিণী, মিছা ভেখ করে রচনা! নাই শীল নাই সত্য, অথচ প্রিয়তমকে চায় পাইতে!

কান্তের তোঁ লাগে না ভাল, অথচ সে করে শৃঙ্গার (সাজসজ্জা ভূষণাদি রচনা)! এই সব ছেলেমানুষী আড়ম্বরেই ভোলে সংসার !

দাদূ বলেন, সেই তো সৌভাগ্যবতী যে স্বামীকেই জানে, আর কিছুই যে জানে না।”

(৭)

সো ধনি পিৱজী সহজ* সঁৱারী।
অব বেগ মিলহু তন জাই বনৱারী॥
জতন জতন করি পংথ নিহারৌঁ।
পিয় ভাৱৈ ত্যোঁ আপ সঁৱারৌঁ॥
ইব মোহিঁ লীজৈ জাউঁ বলিহারী।
কহৈ দাদূ সুনী বিপতি হমারী॥

“সে-ই ধন্য যে প্রিয়তমের জন্য সহজ শোভায় সাজাইল আপনাকে ; এখন শীঘ্র আসিয়া হও মিলিত, হে বনোয়ারী (বনমালী), জীবন যে যায়।

কত ভাবে কত যতন করিয়া, আছি তোমার পথ পানে চাহিয়া, প্রিয়তম যেমনটি চাহেন তেমন ভাবেই সাজাইতেছি নিজেকে।

এখন তুমি লহ আমায় লহ, তোমার মধ্যে আমি আপনাকে করিতেছি উৎসর্গ। দাদূ কহেন, আমার এই সঙ্কটকালের প্রার্থনা শোনো।”

(৮)

ইব তো মোহিঁ লাগী বাই।
ৱ্যাকুল চিত লিয়ো চুরাই॥
আন ন রুচৈ ঔর নহিঁ ভাৱৈ
অগম অগোচর তহঁ মন জাই।
রূপ ন রেখ বরন কহোঁ কৈসা
তিন্হ চরনৌঁ চিত রহ্যা সমাই॥

---

* “সেজ” ও “সাজি” পাঠও আছে।

পল এক দাদূ দেখন পাবৈ
জনম জনম কী ত্রিখা বুঝাই ॥

"এখন তো আমি হইয়াছি পাগল (আমাতে বায়ু লাগিয়াছে), ব্যাকুল চিত্ত তিনি লইয়াছেন চুরি করিয়া।

অন্য কিছু ("অন্ন" ও হয়) আর রুচে না, আর কিছু লাগেও না ভাল; অগম্য অগোচরের কাছেই মন চায় যাইতে।

না জানি কেমন তার রূপ, না জানি কেমন তার রেখা, কি জানি কেমন তার বরণ। তবু তাঁহার চরণেই যে চিত্ত রহিল ডুবিয়া।

একটি পলের জন্যও যদি দাদূ পায় দেখিতে তবে জনম জনমের তৃষ্ণা তাহার যায় পরিতৃপ্ত হইয়া।"

(৯)

পৈরত থাকে কেসৃৱা সূঝৈ বার ন পার ॥
বিষম ভয়ানক ভৱ জলা রে তুম্হ বিন ভারী হোই।
তূঁ হরি তারন কেসৃৱা দূজা নাহিঁ কোই ॥
তুম্হ বিন খেৱট কোই নহীঁ রে অতির তির্যো নহীঁ জাই।
অৱঘট বেড়া ডূবি হৈ নহীঁ আন উপাই ॥
যহু ঘট অৱঘট বিষম হৈ রে ডুবত মাহিঁ সরীর।
দাদূ কায়র রাম বিন মন নহীঁ বাঁধৈ ধীর।

"হে কেশব, ভাসিতে ভাসিতে গেলাম হয়রান হইয়া। কুল কিনারা কোন দিকেই তো যায় না দেখা।

বিষম ভয়ানক এই ভবজল, তুমি বিনা হইতেছে আরও যেন প্রবল। হে হরি, হে কেশব, তুমিই তো তারণ কর্ত্তা, আর তো আমার কেহই নাই।

তুমি বিনা খেয়ার মাঝী আর তো কেহই নাই, অপার অলঙ্ঘ্য সাগর তো যায় না পার হওয়া। আ-ঘাটাতেই ডুবিতেছে এই ভেলা, নাই আর অন্য উপায়।

এই আঘাটার ঘাট (ঘটের মাঝে) বড় বিষম, তার মাঝে ডুবিতেছে শরীর, রাম বিনা দাদূ হইয়াছে শক্তিহীন, মন আর মানিতেছে না ধৈর্য্য।"

(১০)

জো রে রাম দয়া নহিঁ করতে ॥
নাৱ কেৱট কূল হরি আপৈ,
সো বিন ক্যোঁ নিসতরতে।
পিতা ক্যোঁ পূত কঁ, মারৈ দাদূ য়োঁ জন তরতে ॥

"যদি রে রাম নাহি করিতেন দয়া! নিজেই তিনি নৌকা, নিজেই তিনি মাঝি ও নিজেই তিনি কূল, তিনি বিনা কেমন করিয়া হয় নিস্তার? পিতা কেমন করিয়া আর পুত্রকে মারে? তাই হে দাদূ, মানুষ পারে তরিতে।"

(১১)

তৱ লগ তূঁ জিনি মারৈ মোহিঁ।
জৱ লগ মৈঁ দেখহুঁ নহিঁ তোহিঁ ॥
দীন দয়াল দয়া করি জোই।
সব সুখ আনংদ তুম্‌হ তৈঁ হোই ॥
জনম জনম কে বংধন খোই।
দেখন দাদূ অহ নিস রোই ॥

"যে পর্য্যন্ত তোমায় আমি দেখিতে নাহি পাই সে পর্য্যন্ত আমায় তুমি মারিও না (ততদিন যেন আমার মরণ না হয়)।

হে দীন দয়াল, দয়া করিয়া লও আমার খবর ("দেখ" অর্থও হয়)। তোমা হইতেই হইবে সব সুখ ও আনন্দ।

জনম জনমের বন্ধন যাউক ঘুচিয়া। তোমাকে দেখিবার জন্যই দাদূ কাঁদিতেছে অহর্নিশি।"

রাগ মালী গৌড় (মালব গৌড়)

(১২)

যে সব চরিত তুম্‌হারে মোহনাঁ
মোহে সব ব্রহ্মংড খংডা।
মোহে পৱন পানী পরমেস্বর
সব মন মোহে রৱি চংডা ॥

সায়র সপ্ত মোহে ধরণী ধরা
অষ্টকুলা পরৱত মের মোহে।
তীন লোক মোহে জগ জীৱন
সকল ভুৱন তেরী সেৱ সোহে॥
অগম অগোচর অপার অপরংপার
কো য়হু তেরে চরিত ন জানৈঁ।
য়ে সোভা তুম্‌হকো সৌহৈ সুংদর
বলি বলি জাউঁ দাদূ ন জানৈঁ॥

"হে মোহন, এই সব তোমারই লীলা, যে সকল ব্রহ্মাণ্ড-খণ্ড মন করিতেছে মোহিত। হে পরমেশ্বর, পবন জল করিতেছে সকলকে মোহিত, রবি চন্দ্র মোহিত করিতেছে সবার মন।

সপ্তসাগর, ধরিত্রী বসুন্ধরা, অষ্ট কুলপর্ব্বত মেরু সবই মুগ্ধ করে মন। হে জগজীবন, তিন লোকই সকল জীবনকে করিতেছে মুগ্ধ, সকল ভুবনে শোভা পায় তোমারই সেবা।

অগম্য অগোচর অপার অসীম অনন্ত তোমার লীলা, কেহই ইহা (জ্ঞানের দ্বারা) পারে না জানিতে। হে সুন্দর, এইসব সৌন্দর্য্য তোমাকেই পায় শোভা; দাদূ ইহার বোঝে না কিছুই, (আমি কেবল) ধন্য ধন্য যাই তোমার এই লীলায়।"

(১৩)

গোবিন্দ কৈসেঁ তিরিয়ে।
নাৱ নাহীঁ খেৱ নাহীঁ রাম বিমুখ মরিয়ে॥
গ্যান নাহীঁ ধ্যান নাহীঁ লয় সমাধি নাহীঁ।
বৈরহা বৈরাগ নাহীঁ পংচৌ গুণ মাহীঁ॥
প্রেম নাহীঁ প্রীতি নাহীঁ নাৱঁ মাহীঁ তেরা।
ভাৱ নাহীঁ ভগতি নাহীঁ কাইর জীৱ মেরা॥
ঘাট নাহীঁ পাট নাহীঁ কৈসে পগ ধরিয়ে॥
বার নাহীঁ পার নাহীঁ দাদূ বহু ডরিয়ে॥

"হে গোবিন্দ, কেমন করিয়া তরে আমি তরি? নাই নৌকা নাই খেয়ার মাঝি, রাম-বিমুখ আমাকে দেখিতেছি মরিতেই হইবে।

জ্ঞান নাই, ধ্যান নাই, নাই লয় সমাধি; বিরহও নাই বৈরাগ্যও নাই, পঞ্চেরই (পঞ্চইন্দ্রিয় ও পঞ্চতত্ত্ব) প্রভাব ও বন্ধন রহিয়াছে অন্তরে।

প্রেম নাই, প্রীতি নাই, তোমার নামও নাই আমার অন্তরে; ভাবও নাই ভক্তিও নাই তাই ভয়-ভীত আমার জীবন।

ঘাটও নাই বাটও নাই কেমনে কোথায় বা রাখি চরণ (চলি)? না আছে পার ও কূল, না আছে সীমা; মনে বড়ই ভয় পাইতেছে দাদূ।"

রাগ কান্‌হড়া

১৪

তূঁ হী তূঁ গুরুদেব হমারা।
সব কুছ মেরে নাউঁ তুম্‌হারা॥
তূঁ হী পূজা তূঁ হী সেবা।
তূঁ হী পাতী তুঁ হী দেবা॥
জোগ জগ্য তূঁ সাধন জাপ।
তূঁ হী মেরে আপৈ আপ॥
তপ তীরথ তূঁ ব্রত অসনানাঁ।
তূঁ হী জ্ঞানাঁ তূঁ হী ধ্যানাঁ॥
বেদ ভেদ তূঁ পাঠ পুরানাঁ।
দাদূকে তূঁ পিংড পরানাঁ॥

"তুমিই আমার সর্ব্বময়, তুমিই আমার গুরুদেব, তোমার নামই আমার সব কিছু।

তুমিই পূজা তুমিই সেবা, তুমিই পত্র (-পুষ্প) তুমিই দেব; তুমিই যোগ যজ্ঞ সাধন জাপ, তুমিই আমার আপন হইতে আপন।

তুমিই তপ তুমিই তীর্থ তুমিই ব্রত, তুমিই স্নান তুমিই জ্ঞান তুমিই ধ্যান।

তুমিই বেদ তুমিই ভেদ (রহস্য) তুমিই পাঠ ও পুরাণ, তুমিই দাদূর কায়া ও প্রাণ।”

১৫

তূঁ হী তূঁ আধার হমারে।
সেৱগ সুত হম রাম তুম্হারে॥
মাই বাপ তূঁ সাহিব মেরা।
ভগতি হীন মৈঁ সেৱগ তেরা॥
মাত পিতা তূঁ বংধৱ ভাঈ।
তুম্হ হীঁ মেরে সজন সহাঈ॥
তুম্হ হীঁ তাত তুম্হ হীঁ মাত।
তুম্হ হীঁ জাত তুম্হ হীঁ ন্যাত॥
কুল কুটুংব তূঁ সব পরিৱারা।
দাদূ কা তূঁ তারণহারা॥

“তুমিই আমার একমাত্র সর্ব্বস্ব, তুমিই আমার আধার। হে রাম, আমি তোমারই সেবক আমি তোমারই সুত।

তুমি আমার মাতা তুমি আমার পিতা তুমিই আমার স্বামী ; আমি তোমার ভক্তি-হীন সেবক।

তুমিই আমার মাতা-পিতা তুমিই আমার ভাই বান্ধব, তুমিই আমার স্বজন সহায়।

তুমি আমার তাত তুমিই আমার মাতা, তুমিই আমার জাতি তুমিই আমার জ্ঞাতি।

তুমিই আমার কুল কুটুম্ব তুমিই আমার সব পরিবার ; দাদূর তো তুমিই তারণকর্ত্তা।”

রাগ কেদারা

১৬

পীর ঘরি আৱৈ রে বেদন মারী জাণীঁ রে।
বিরহ সংতাপ কোণ পর কীজৈ কহূঁছূঁ দুখ নী কহাণী রে॥

অংতরজামী নাথ ম্হারো তুঝ বিন্ হূঁ সীদাণী রে।
মংদির ম্হারে কেম ন আৱৈ
রজনী জাই বিহাণী রে।
থারী বাট হূঁ জোই জোই থাকী
নৈণ নিখূট্যা পাণী রে।
দাদূ তুঝ বিণ দীন দুখী রে
তূঁ সাথী রহ্যৌ ছে তাণী রে॥

"প্রিয়তম, আমার অন্তরের বেদনা বুঝিয়া এস আমার ঘরে। বিরহ সন্তাপ আমার প্রকাশ করি বা কাহার কাছে? তাই কহিতেছি আমার দুঃখের কাহিনী।

হে অন্তর্য্যামী আমার নাথ, তোমা বিনা যাইতেছি মুরঝিয়া। মন্দিরে আমার আসিতেছ না কেন, রজনী যে যায় পোহাইয়া।

তোমার পথ প্রতীক্ষা করিতে করিতে হইয়া গেলাম অবসন্ন, নয়নের জলও গেল শুখাইয়া। তোমা বিনা দাদূ বড় দীন ও দুঃখী, হে বন্ধু তুমি যে আমার সাথী, তুমি যে সদাই টানিতেছ আমার মন।"

১৭

সজনী রজনী ঘটতী জাঈ॥
পল পল ছীজৈ অৱধি দিন আৱৈ
অপনৌ লাল মনাঈ॥
প্রাণ পতি জাগৈ সুংদরী ক্যোঁ সোৱৈ
য়হ অউসর চলি জাই॥
দাদূ ভাগ বড়ে পিয় পাৱৈ
সকল সিরোমণি রাঈ॥

"হে সখি, রজনী আসিতেছে অবসান হইয়া, পলে পলে কাল হইতেছে ক্ষয়, নির্দ্দিষ্ট (চরম) দিন আসিল ঘনাইয়া, নিজ বল্লভকে এখন কর প্রসন্ন।

প্রাণপতি জাগেন, সুন্দরী কেন থাকে তবে শুইয়া ? এই সুযোগ যে যায় চলিয়া ! হে দাদূ, বড় ভাগ্য যে সকল শিরোমণি প্রভুকে পাইয়াছ তোমার প্রিয়তম।”

১৮

মন বৈরাগী রামকৌ সংগ রহে সুখ হোই হো ॥
হরি কারনি মন জোগিয়া ক্যোঁ হী মিলৈ মুঝ সোই হো ॥
নিরখন কা মোহি চাৱ হৈ এ দুখ মেরা খোই হো ॥
দাদূ তুম্হারা দাস হৈ নৈন দেখন কৌঁ রোই হো ॥

“রামের জন্য মন বৈরাগী, সঙ্গে তিনি থাকিলে তবে হয় সুখ। হরির কারণে মন হইয়াছে যোগী, কেমনে আমার সঙ্গে তাঁর হয় মিলন ?

নিরখিতে আমার বড় সাধ, এই বিচ্ছেদ-দুঃখ আমার কর দূর। দাদূ তোমার দাস, দেখিবার জন্য কাঁদিতেছে আমার নয়ন।”

রাগ মারু

১৯

ক্যোঁ বিসরৈ মেরা পীৱ প্যারা
জীৱ কা জীৱনি প্রাণ হমারা ॥
বরসহু রাম সদা সুখ অম্রিত
নীঝর নিরমল ধারা।
প্রেম পিয়ালা ভরি ভরি দীজৈ
দাদূ দাস তুম্হারা ॥

“হে জীবনের জীবন, আমার প্রাণ, হে প্রিয়তম প্রেমাস্পদ, কেন আছ তুমি ভুলিয়া ? হে রাম, সদা-সুখ (নিত্যানন্দ) অমৃতের নির্ঝর নির্মল ধারা কর বর্ষণ, প্রেম প্যালা দাও ভরিয়া, দাদূ যে তোমারই দাস।”

২০

অম্‌হা ঘরি পাহুনাঁ য়ে
আব্যা আতম রাম।
চহুঁ দিসি মংগলচার
আনংদ অতি ঘণাঁ য়ে।
বরত্যা জয়জয়কার
বিরধ ব্ধাব্রণাঁ য়ে।
কনক কলস রস মাঁহি
সখী ভরি ল্যাব্জ্যো য়ে ॥
গাব্হু মংগলচার
মংগল ব্ধাব্রণাঁ য়ে ॥

“আমার ঘরে আত্মারাম আসিয়াছেন অভ্যাগত অতিথি। চারিদিকে মঙ্গলাচার, অতি আনন্দ আসিল ঘনাইয়া। জয়জয়কার বিরাজিত, ঋদ্ধির মহোৎসব উপস্থিত। কনক কলসে ভরিয়া সখীগণ আজ আনহ আনন্দ-রস ধারা। মঙ্গলাচার কর গান, আজ যে ঋদ্ধি ও মঙ্গলের মহোৎসব!”

২১

পংথীড়া, পংথ পিছাণীঁ রে পীব্কা,
গহি বিরহে কী বাট।
জীব্ত মৃতক হ্ব্‌ৈ চলৈ, লংঘৈ ঔঘট ঘাট, পংথীড়া ॥
তালাবেলী উপজৈ, আতুর পীড় পুকার।
সুমিরি সনেহী আপণাঁ, নিসদিন বারংবার, পংথীড়া ॥
দেখি দেখি পগ রাখিয়ে, মারগ খাংডে ধার।
মনসা বাচা করমণাঁ, দাদূ লংঘৈ পার, পংথীড়া ॥

“ওরে পরবাসী পথিক, বিরহের বাট ধরিয়া প্রিয়তমের পথ লও চিনিয়া। “জ্যান্তেমড়া” হইয়া চল এই পথে, আঘাট-ঘাটা চল পার হইয়া, হে পরবাসী পথিক।

অস্থির ব্যাকুলতা উপজুক অন্তরে, বেদনায় আতুর হইয়া কাতরে তাঁহাকে ডাক ; আপন প্রেমময়কে নিশিদিন বারম্বার কর স্মরণ, হে পরবাসী পথিক।

দেখিয়া দেখিয়া রাখ পা, পথ যে তীক্ষ্ণ অসিধার। মনসা বাচা কর্ম্মণা, হে দাদূ, পারে হও উত্তীর্ণ, হে পরবাসী পথিক।”

১২

সাধ কহৈঁ উপদেস, বিরহণীঁ।
তন ভূলৈ তব পাইয়ে, নিকটি ভয়া পরদেস, বিরহিণীঁ ॥
তুমহী মাহৈঁ তে বসৈঁ, তহাঁ রহে করি বাস।
তহঁ ঢূংঢৌ পির পাইয়ে, জীৱনি জীৱকে পাস, বিরহিণীঁ ॥
পরম দেস তহঁ জাইয়ে আতম লীন উপাই।
এক অংগ ঐসৈঁ রহৈ, জ্যোঁ জল জলহি সমাই, বিরহিণীঁ ॥
সদা সংগাতী আপণাঁ, কবহূঁ দূরি ন জাই।
প্রাণ সনেহী পাইয়ে, তন মন লেহু লগাই, বিরহিণীঁ ॥
জাগৈ জগপতি দেখিয়ে, পরগট মিলি হৈ আই।
দাদূ সনমুখ হ্ৱৈ রহৈ, আনংদ অংগি ন মাই, বিরহিণীঁ ॥

“সাধু কহে উপদেশ, হে বিরহিণী। নিকটই হইয়াছে তোমার পরদেশ, তনু ভুলিতে পারিলে তবেই তাহা পাইবে, হে বিরহিণী।

তোমার মাঝেই তিনি করেন বাস, সেখানেই রহেন তিনি করিয়া বসতি ; সেখানেই খুঁজিলেই পাইবে তাঁহাকে, জীবনের পাশেই পাইবে জীবনময়কে, হে বিরহিণী।

আত্মার মধ্যে লীন হইয়া যে পরম দেশ, সেখানে যাও ; জলের মধ্যে যেমন জল যায় মিশিয়া, তেমন অঙ্গে অঙ্গে একাঙ্গ হইয়া থাক উভয়ে মিলিয়া, হে বিরহিণী।

সদাই আপন প্রেমময় সাথী তিনি, কখনও যান না তিনি দূরে ; প্রাণের প্রেমিক তাঁহাকে পাইয়া তনু মন লও যুক্ত করিয়া, হে বিরহিণী।

জাগিয়া দেখ জগপতি, প্রত্যক্ষ আসিয়া তিনি মিলিয়াছেন ; হে দাদূ, তিনি সম্মুখেই আছেন বিরাজমান, আনন্দ আর অঙ্গে ধরে না, হে বিরহিণী।”

২৩

আদি কাল অংতি কাল মধি কাল ভাঈ।
জন্ম কাল জুরা কাল কাল সংগি সদাঈ॥
জাগত কাল সোৱত কাল কাল ঝংপৈ আঈ।
কাল চলত কাল ফিরত, কবহূঁ লে জাঈ॥
আৱত কাল, জাত কাল, কাল কঠিন খাঈ।
লেত কাল দেত কাল, কাল গ্রসৈ ধাঈ॥
কহত কাল সুনত কাল করত কাল সগাঈ।
কাম কাল ক্রোধ কাল কাল জাল ছাঈ॥
কাল আগৈঁ কাল পীছৈঁ কাল সংগি সমাঈ।
কাল রহিত রাম গহিত দাদূ ল্যো লাঈ॥

“আদিতেও কাল অন্তেও কাল, মধ্যেও হে ভাই কালই বিরাজমান। জন্মেও কাল, জরাতেও কাল, সদাই কালই সঙ্গী।

জাগিতেও কাল, শুইতেও কাল, কালই আসিয়া পড়ে ঝাঁপাইয়া। চলিতেও কাল, ফিরিতেও কাল, কি জানি কখন লইয়া যায় কাল।

আসিতেও কাল যাইতেও কাল, নির্ম্মম কালই তো খায়। নিতেও কাল দিতেও কাল, কালই ধাইয়া করে গ্রাস।

কহিতেও কাল, শুনিতেও কাল, কালের সাথেই প্রেমের বিবাহ-বন্ধন। কামও কাল ক্রোধও কাল, কাল জালই সব ছাইয়া।

আগেও কাল পাছেও কাল, কালই সঙ্গে সঙ্গে আছে সব ভরপূর করিয়া। কাল-রহিত শুধু সেই জন যে রামকে করিয়াছে আশ্রয়, হে দাদূ, যে তাঁহাতে হইয়াছে লয়-লীন।”

২৪

ভাৱ কলস জল প্রেমকা
সব সখিয়নকে সীস।
গাৱত চলীঁ বধাৱণাঁ।
জয় জয় জয় জগদীস॥
পদম কোটি রৱি ঝিলমিলৈ
অংগি অংগি তেজ অনংত।
বিগসি বদন বিরহনি মিলী
ঘরি আয়ে হরি কংত॥
সুংদরি সুরতি সিংগার করি
সনমুখ পরসে পীৱ।
মো মংদির মোহন আৱিয়া
ৱারূঁ তন মন জীৱ॥
বর আয়ৌ বিরহনি মিলি
অরস পরস সব অংগ।
দাদূ সুংদরি সুখ ভয়া
জুগ জুগ য়হু রস রংগ॥

"সকল সখীগণের মাথায় ভাব-কলসে প্রেমের জল, সবাই গাহিয়া চলিয়াছে উৎসব-সঙ্গীত, "জয় জয় জয় জগদীশ"।

পদ্ম কোটি রবি ঝলিতেছে ঝিলমিল করিয়া, অঙ্গে অঙ্গে অনন্ত তেজ। কান্ত হরি আসিয়াছেন ঘরে, প্রসন্ন বদনে বিরহিণী গিয়া মিলিল তাঁহার সাথে।

সুন্দরী প্রেমের সজ্জায় সাজিয়া প্রিয়তমের পাইল প্রত্যক্ষ পরশ (আলিঙ্গন)। আমার মন্দিরে আসিয়াছেন মোহন, তনু মন জীবন করিলাম তাঁহাকে উৎসর্গ।

বর আসিয়াছেন, বিরহিণী (তাঁর সঙ্গে) মিলিয়াছে, সকল অঙ্গে অঙ্গে (চলিতেছে) "অরস-পরস" আলিঙ্গন। হে দাদূ, সুন্দরীর হইল মহানন্দ, উভয়ের মধ্যে নিত্যকাল চলিয়াছে এই রস রঙ্গ।"

রাগ রামকলী

২৫

সরনি তুম্‌হারে কেসৱা
মৈঁ অনংত সুখ পায়া।
ভাগ বড়ে তূঁ ভেটিয়া হৌ চরনোঁ আয়া।
মেরী তপতী মিটী তুম দেখতাঁ
সীতল ভয়ো ভারী।
ভৱবংধন মুক্তা ভয়া
জব মিল্যা মুরারী॥
ভরম ভেদ সব ভূলিয়া
চেতনি চিত লায়া।
পারস সূঁ পরচৈ ভয়া
উরি সহজ লখায়া॥
চংচল চিত নিহচল ভয়া
ইব অনত ন জাঈ।
মগন ভয়া সর বেধিয়া
রস পীয়া অঘাঈ॥

"হে কেশব, তোমারই শরণে আসিয়া আমি পাইলাম অনন্ত আনন্দ। বড় ভাগ্য পাইলাম তোমার দেখা, আমি আসিলাম তোমার চরণে।

তোমাকে দেখিতেই আমার সব দুঃখ সন্তাপ গেল মিটিয়া, একেবারে

জুড়াইয়া গেল সকল জ্বালা। হে মুরারি, যেই তুমি মিলিলে, অমনি ভববন্ধন গেল মুক্ত হইয়া।

ভরম ভেদ সকলি গেলাম ভুলিয়া, চৈতন্যময়ের মধ্যে আনিলাম আমার চিত্ত। পরশমণির সঙ্গে হইল পরিচয়, হৃদয়ের মধ্যে সহজের পাইলাম দেখা।

চঞ্চল চিত্ত হইল নিশ্চল, এখন অন্যত্র আর কোথাও সে যাইবে না। (তাঁর প্রেম)-বাণে বিদ্ধ হইয়া চিত্ত আমার হইল সেই রসে মগ্ন। পরিপূর্ণ প্রেমরস ভরপূর করিয়া করিলাম পান।"

২৬

জৈ জৈ জৈ জগদীস তূঁ
তূঁ সমরথ সাঁঈ।
জুরা মরণ তুম্হ থৈঁ ডরৈ
সোঈ হম মাহীঁ॥
সব কংপৈ করতার থী
ভব্ব বংধন পাসা।
নিরভয় সেব্বক রামকা
সব বিঘন বিনাসা॥

"জয় জয় জয় জগদীশ তুমি, তুমি সর্ব্বশক্তিমান স্বামী। জরা মরণ তোমার ভয়ে ভীত, সেই তুমি বিরাজিত আমারই মধ্যে।

প্রভু, তোমার নামে (তোমা হইতে) সবাই কম্পমান, ভব-বন্ধন পাশ (তোমার ভয়ে কম্পমান)। সকল বিঘ্ন বিনাশন রামের যে সেবক, সে সকল ভয়ের অতীত।"

২৭

দাদূ মোহিঁ ভরোসা মোটা।
তারণ তিরণ সোঈ সংগী মেরে
কহা করৈ ভয় খোটা॥

দোঁ লাগী দরিয়া থৈঁ ন্যারী
দরিয়া মংঝি ন জাহীঁ।
জিনকা সম্রথ রাখনহারা
তিন্কূঁ কো ডর নাহীঁ॥

"হে দাদূ, আমার তো বিরাট ভরসা। সকল তারণেরও যিনি তারণকর্ত্তা তিনিই আমার সদা সঙ্গী, হতভাগা ভয় আর আমার করিবে কি?

তাহাদেরই লাগে দাবানলের দাহ যাহারা সেই সাগর হইতে দূরে, যাহারা যাইতে চায় না সেই সাগরের মাঝে। সমর্থ (সর্ব্বশক্তিমান) রক্ষাকর্ত্তা যাহাদের রক্ষক, তাহাদের কিছুতেই নাই ভয়।"

২৮

ভগতি মাংগৌঁ বাপ ভগতি মাঁগৌ,
মুনৈঁ তাহরা নাউঁ নৌঁ প্রেম লাগৌঁ।
সিরপুর ব্রহ্মপুর সর্ব শৌঁ কীজিয়ে,
অমর থৱা নহীঁ লোক মাঁগৌঁ॥
আপি অৱলংবন তাহরা অংগনৌঁ
ভগতি সজীৱনী রংগি রাচৌ।
দেহ নৌঁ গ্রেহ নৌঁ বাস বৈকুণ্ঠ তনৌঁ,
ইংদ্রআসন নহীঁ মুকতি জাচৌ॥
ভগতি ৱাহলী খরী আপি অবিচল হরী,
নির্মলৌ নাউঁ রস পান ভাৱৈ।
সিধি নৈঁ রিধি নৈঁ রাজ রূড়ৌ নহীঁ,
দেৱপদ মাহরৈ কাজি ন আৱৈ॥

আতমা অংতরি সদা নিরংতরি,
তাহরী বাপজী ভগতি দীজৈ।
কহৈ দাদূ হীরেঁ কোড়ী দত্ত আপৈ,
তুম্হ বিনা তে অম্হে নহীঁ লীজৈ ॥*

"ভক্তি মাগি বাপ, ভক্তিই মাগি। তোমার নামের প্রেমই আমাকে লাগিয়াছে। শিবপুর ব্রহ্মপুর এই সব দিয়া আমি করিব কি? অমরত্ব লাভ করিবার লোকও আমি চাহিনা।

তোমার (আপন স্বরূপের) অবলম্বন আমাকে অর্পিয়া জীবন্ত ও সঞ্জীবন ভক্তির রঙ্গেই আমাকে কর নূতন করিয়া রচনা। দেহবাসও নয়, গেহবাসও নয়, বৈকুণ্ঠবাসও নয়, ইন্দ্র আসন এমন কি মুক্তিও আমি যাচি না।

হে হরি, সাচ্চা অবিচল প্রিয়তম ভক্তিই আমাকে দাও; নির্ম্মল নাম রস পানই আমার লাগে ভাল। সিদ্ধিও নয় ঋদ্ধিও নয় রাজ ঐশ্বর্য্যও প্রার্থনীয় নয়, দেবপদেও আমার কোনো কাজ নাই।

আমার অন্তরে সদা নিরন্তর তোমার প্রতি ভক্তিই দাও, হে পিতা। দাদূ কহেন, এখন যদি আমাকে কোটি ঐশ্বর্য্যও দান কর, তবু তোমা বিনা সে সব আর চাই না লইতে।"

২৯

নিরংজন নাউঁকে রসি মাতে,
কোই পূরে প্রাণী রাতে ॥
সদা সনেহী রামকে, সোঈ জন সাচে।
তুম্হ বিন ঔর ন জানহীঁ, রংগি তেরে হী রাচে ॥
আন ন ভাবৈ যেক তূঁ, সতি সাধু সোঈ।
প্রেম পিয়াসে পীরকে, ঐসা জন কোঈ ॥

---

* এই ভজনটি গুজরাতী ভাষায় রচিত। ভক্ত নরসী মেহতার "প্রভাতী" সুর ও এই সুর একই।

তুমহীঁ জীৱনি উরি রহে, আনংদ অনুরাগী।
প্রেম মগন পিৱ প্রীতড়ী, লৌ তুমহ সূঁ লাগী॥
জে জন তেরে রংগি রংগে, দূজা রংগ নাহীঁ।
জনম সুফল করি লীজিয়ে, দাদূ উন মাহীঁ॥

"নিরঞ্জনের নামের রসে মত্ত তাহাতেই রত অনুরক্ত, ক্বচিতই কেহ (মেলে) এমন পূর্ণ মানব!

ভগবানের সঙ্গে নিত্য প্রেমে বদ্ধ, সেই জনই তো সাচ্চা। তোমা বিনা আর তো কিছু সে জানে না, তোমার রঙ্গেই সে অনুরক্ত ও তন্ময়।

একমাত্র তুমি, আর কেহই যাহার মনে ধরে না, সে-ই তো সত্য সাধু। প্রিয়তমের প্রেমেরই পিয়াসী এমন জন তো ক্বচিতই কখনো মেলে।

তুমিই আছ যার জীবনে ও হৃদয়ে, তোমার আনন্দেরই যে অনুরাগী, প্রিয়তমের প্রীতিরসেই যে প্রেমমগ্ন, তোমার সঙ্গেই লাগিয়াছে যাহার প্রেমের দীপ্ত ধ্যান, এমন জন তো দুর্লভ।

তোমারই রঙ্গে রঙ্গিয়াছে যে জন, অন্য রঙ্গ যার জীবনে আর নাই; হে দাদূ, তাহাদের মধ্যে থাকিয়া আপন জনম করিয়া লও সফল।"

৩০

পীরী তূঁ পাঁণ পসাইড়ে,
মূঁ তনি লাগী ভাহিড়ে॥
পাংধী বীংদো নিকরিলা,
অসাঁ সাণ গল্হাইড়ে।
সাঈঁ সিকাঁ সড়কেলা
গুঝী গালি সুনাইড়ে॥
পসাঁ পাক দীদার কেলা
সিক অসাঁ জী লাইড়ে।
দাদূ মংঝি কলূব মৈলা,
তোড়ে বীয়াঁ ন কাইড়ে॥

"হে প্রভু, আপনার রূপ তুমি দেখাও, আমার তনুতে লাগিয়াছে অগ্নির দাহ।

তোমার দাস বাহির হইয়াছে পথে, আমার সনে কও কথা। হে স্বামী, বড় ব্যাকুল বাসনা তোমার বাণী শুনিতে, তোমার অন্তরের গোপন কথা দাও আমায় শুনাইয়া।

তোমার পবিত্র রূপ চাই দর্শন করিতে, মনের বাসনা আমার কর পূর্ণ। অন্তরের মধ্যে আসিয়া হও মিলিত, তোমা ছাড়া আর কাহাকেও চায় না আমার চিত্ত।" *

রাগ আসাবরী

৩১

হাঁ মাঈ,
মহারো লাগি রাম বৈরাগী
তজা নহীঁ জাঈ।
প্রেম বিথা করত উর অন্তর
বিস্থরি সুখ নহীঁ পাঈ॥
জোগিনী হ্‌ৱৈ ফিরূঁগী বিদেসা
জীৱকী তপনী মিটাঈ।
দাদূ কৌ স্বামী হৈ রে উদাসী
ঘর সুখ রহা কিমি জাঈ॥

"ওগো হায়, আমারই লাগিয়া রাম বৈরাগী, তাঁহাকে তো যায় না ছাড়া। অন্তরের মধ্যে চলিয়াছে প্রেমের বেদনা, তাঁহাকে পাসরিয়া সুখ তো নাহি পাই।

যোগিনী হইয়া, দেশে দেশে ফিরিব জীবনের জ্বালা দূর করিতে। ওরে দাদূর স্বামী যে উদাসী, ঘরের সুখে তবে আর কেমন করিয়া যায় থাকা?"

---

* এই গানটির ভাষা সিন্ধী।

৩২

মেরা গুরু আপ অকেলা খেলৈ।
আপৈ দেবৈ আপৈ লেবৈ আপৈ দোই কর মেলৈ॥
চংদ সূর দোই দীপক কীন্‌হা, রাতি দীবস করি লীনহা।
রাজিক রিজক সবনি কূঁ দীন্‌হাঁ, দীনহাঁ লীন্‌হাঁ কীনহাঁ॥
পরমগুরু সো প্রাণ হমারা, সব সুখ দেবৈ সারা।
দাদূ খেলৈ অনত অপারা, অপারা সারা হমারা॥*

"আমার গুরু আপনি একেলা করেন খেলা। আপনি তিনি দেন আপনি তিনি নেন, আপনি তিনি মিলান দুই হাত।

চন্দ্র সূর্য্য রচনা করিলেন তিনি দুই দীপক, রাত্রি দিবস তাই করিয়া লইলেন রচনা। প্রতিপালক তিনি সকলেরই করিয়াছেন বৃত্তি-বিধান; দেন নেন ও করেন তিনি রচনা।

পরমগুরু আমার প্রাণ, তিনি দেন পরিপূর্ণ অখিল আনন্দ। দাদূ বলেন, তিনি খেলেন অনন্ত অপার খেলা; অপার আমার সর্ব্বস্ব ও সর্ব্ব পরিপূর্ণতা।"

রাগ গূজরী (দেবগন্ধার)

৩৩

সরণি তুম্হারী আই পরে। **
জহাঁ তহাঁ হম সব ফিরি আয়ে,
রাখি রাখি হম দুখিত খরে॥
কসি কসি কায়া তপব্রত করি করি
ভর্মত ভর্মত হম ভূলি পরে।

---

* উপক্রমণিকা, ১২১ পৃষ্ঠায় ইহার অন্তিম দুই পংক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে।

** ইহার প্রথম দুই পংক্তি উপক্রমণিকা ২১১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে।

কহুঁ সীতল কহুঁ তপতি দহে তন
কহুঁ হম করৱত সীস ধরে ॥
কহুঁ বন তীরথ ফিরি ফিরি থাকে
কহুঁ গিরি পর্বত জাই চঢ়ে।
কহুঁ সিখির চঢ়ি পরে ধরণি পর,
কহুঁ হতি আপা প্রাণ হরে ॥
অংধ ভয়ে হম নিকটি ন সূঝৈ
তাথৈঁ তুম্হ তজি জাই জরে।
হা হা হরি অব দীন লীন করি,
দাদূ বহু অপরাধ ভরে ॥

"তোমার শরণে এখন পড়িলাম আসিয়া। যেখানে সেখানে গিয়া গিয়া আমি ব্যর্থ কেবল আসিলাম ফিরিয়া ফিরিয়া, সত্যকার দুঃখ মনের মধ্যেই দিলাম রাখিয়া (কেহ অর্থ করেন, "আমি অতি দুঃখী, আমাকে রক্ষা কর রক্ষা কর)।"

কায়া-কর্ষণ করিয়া করিয়া তপব্রত করিয়া করিয়া, ভ্রমিতে ভ্রমিতে আমি ভুলের মধ্যেই গেলাম পড়িয়া। কোথাও শীতে তনু করিলাম জর্জর, কোথাও তাপে তনু করিলাম দগ্ধ, কোথাও বা আমি মাথায় করপত্র করিলাম ধারণ।†

কোথাও বা আমি তীর্থে বনে ফিরিয়া ফিরিয়া হইলাম হয়রান। কোথাও বা গিরি পর্ব্বতে গিয়া করিলাম আরোহণ। কোথাও বা পর্ব্বত-শিখরে উঠিয়া ধরণীর উপর পড়িলাম ঝাঁপাইয়া।†† কোথাও বা আত্মঘাত করিয়া মারিলাম প্রাণকে।

অন্ধ হইলাম আমি, নিকটেই বস্তু, একবার দেখিলাম না চাহিয়া। তাই তোমাকে ত্যজিয়া মরিলাম দগ্ধ হইয়া। বহু বহু অপরাধে ভরিয়া উঠিয়াছে দাদূ, হা হা হরি, এখন আমাকে করিয়া লও তোমাতে দীন লীন (অকিঞ্চন তন্ময়)।"

---

† তখনকার দিনে, মুক্তির আশায় ধর্ম্মের তীব্র ব্যাকুলতায়, কাশী প্রভৃতি তীর্থে যাইয়া কেহ কেহ করাত দিয়া আপনাকে দ্বিখণ্ডিত করাইয়া ফেলিতেন।

†† মুক্তির আশাতে কেহ কেহ এইভাবে "ভৃগুপাতে" প্রাণ দিতেন।

রাগ ঝাঁপমলী

৩৪

তে কেম পামিয়ে রে দুর্লভ জে আধার।
তে বিনা তারণ কো নহীঁ, কেম উতরিয়ে পার॥
কেব়ী পেরেঁ কীজৈ আপণো রে; তত্ব তে ছে সার।
মন মনোরথ পূরে মারা, তনঁ নো তাপ নিব়ার॥
সংভার্যো আব়ে রেঁ ব়াহলা, ব়েলায়ে অব়ার।
ব়িরহণী ব়িলাপ করে, তেম দাদূ মন ব়িচার॥

"কেমন করিয়া পাইব রে তাঁহাকে, দুর্লভ যিনি আধার? তিনি বিনা তারণ আর তো নাহি কেহ, কেমন করিয়া পারে হইব উত্তীর্ণ?

যেমন করিয়া হউক, যে কোনো মতে আমাকে করিয়া লও আপন, সেই তো সার তত্ত্ব; তবেই আমার মন মনোরথ হয় পূর্ণ, আমার তনুর তাপ কর নিবারণ।

স্মরণ করা মাত্রেই সময়ে হোক অসময়ে হোক অবিলম্বে যথাকালে আসিয়া উপস্থিত হন প্রিয়তম। বিরহিণী করিতেছে বিলাপ, হে দাদূ, সেই ভাবে আপন মন লও বুঝিয়া।"

৩৫

এ হরি মলূঁ ম্হারো নাথ
জোব়া নে মারো তন তপৈ,
কেব়ী পেরেঁ পামূঁ সাথ॥
তে কারনি হূঁ আকুল ব্যাকুল
উভী করূঁ বিলাপ।
স্বামী মারৌ নৈণেঁ নিরখূঁ
তে তণো মনে তাপ॥

এক ব্রার ঘর আৱৈ ব্রাহলা
নব্র মেলূঁ কর হাথ।
যে বিনংতী সাঁভল স্বামী
দাদূ তারো দাস॥

"হে হরি আমার নাথ, তোমার সাথে চাই মিলিত হইতে; তোমাকে দেখিতে দহিতেছে আমার তনু, কোন পথে পাই তোমার সঙ্গ?

সেই জন্যই তো আমি আকুল ব্যাকুল, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া করিতেছি বিলাপ। স্বামী আমার, নিরখিব তোমায় নয়নে, সেই তাপই আমাকে করিতেছে সন্তপ্ত।

একবার যদি আমার ঘরে আসেন বল্লভ, তবে (তাঁর) হাত হইতে (আমার) হাত আর করিব না বিচ্ছিন্ন। হে স্বামী, এই প্রার্থনা আমার শোন, দাদূ যে তোমারই দাস।"

রাগ নটনারায়ণ

৩৬

নীকে মোহন সৌঁ প্রীতি লাঈ॥
তন মন প্রাণ দেত বজাঈ।
রংগ রস কে বনাঈ॥
য়ে হীঁ জীয় রে বৈ হীঁ পীর রে,
ছোড়্যো ন জাঈ মাঈ।
নির্ম্মল নেহ পিয়সৌঁ লাগৌ
বিন দেখত মুরঝাঈ॥

"মনোহর সুন্দর মোহনের সঙ্গে লাগিল প্রীতি। তাঁর সঙ্গে প্রীতি যদি হয়, তবে রঙ্গ রসে মধুর করিয়া (সাজাইয়া) তনু মন প্রাণ আমার দেন তিনি বাজাইয়া।

এই জীবনের তিনিই তো প্রিয়তম, তিনিই তো জীবন-স্বরূপ, তাই তো তাঁহাকে যায় না ছাড়া। নির্ম্মল প্রেমভরে প্রিয়তমের সঙ্গে হইব যুক্ত, তাঁহাকে না দেখিলে যে এই জীবন যায় মুরঝিয়া।”

৬৭

নমো নমো হরি নমো নমো ॥
তাহি গোসাঈঁ নমো নমো।
অকল নিরংজন নমো নমো ॥
সকল বিয়াপী জিহি জগ কীন্‌হা
নারাইণ নিজ নমো নমো ॥
জিন সিরজে উর সীস চরণ কর
অৱিগত জীৱ দিয়ৌ।
স্রবন সৱাঁরি নৈন রসনা মুখ
ঐসৌ চিত্র কিয়ৌ ॥
ধরতী অংবর চংদ সূর জিন
পানী পৱন কিয়ে।
ভানণ ঘড়ণ পলক মৈঁ কেতে
সকল সৱাঁরি লিয়ে ॥
আপ অখংডিত খংডিত নাহীঁ
সব সমি পূরি রহে।
দাদূ দীন তাহি নই বংদতি
অগম অগাধ কহে ॥
নমো নমো হরি নমো নমো।
নারাইণ নিজ নমো নমো ॥

“নমো নমো হরি নমো নমো, তোমাকে হে গোঁসাই নমো নমো। অখণ্ড নিরঞ্জন নমো নমো, সকল ব্যাপী যিনি রচিলেন এই জগৎ সেই নারায়ণ নিজ

নমো নমো। (মানব) রচনায় যিনি বক্ষ, মস্তক, চরণ, কর ও অনির্বচনীয় জীবন দিলেন, যিনি শ্রবণে নয়নে রসনায়-মুখে সাজাইয়া তাঁর রচনাটি করিলেন এমন সুন্দর (সেই নারায়ণকে বার বার নমস্কার)।

ধরিত্রী অম্বর সূর্য্য চন্দ্র পৃথিবী জল পবন যিনি করিলেন সৃষ্টি, পলকের মধ্যে কত ভাঙ্গন গড়ন সমাধা করিয়া সকল সৃষ্টি-সৌন্দর্য্য যিনি নিলেন সাজাইয়া!

নিজে তিনি অখণ্ডিত, তাঁর নাই খণ্ডতা, সর্ব্ব সময় তিনি রহিলেন পূর্ণ হইয়া। অগম্য অগাধ কহিয়া দীন দাদূ তাঁহাকেই করে প্রণতি বন্দনা।

নমো নমো হরি নমো নমো, নারায়ণ নিজ নমো নমো॥"

৩৮

হম থৈঁ দূরী রহী গতি তেরী।
তুম হো তৈসে তুমহীঁ জানৌঁ কহা বপরী মতি মেরী॥
মন থৈঁ অগম দৃষ্টি অগোচর, মনসা কী গমি নাহীঁ।
সুরুত * সমাধি বুধি বল থাকে, বচন ন পহুঁচৈ তাহীঁ॥
জোগ ন ধ্যান গ্যান গমি নাহীঁ সমঝি সমঝি সব হারে।
উনমনী রহত প্রাণ ঘট সাধে, পার ন গহত তুম্হারে॥
খোজি পরে গতি জাই ন জানীঁ, অগহ গহন কৈসৈঁ আবৈ।
দাদূ অবিগতি দেই দয়া করি, ভাগ বড়ে সো পাবৈ॥

"তোমার রহস্য আমার অগম্যই গেল রহিয়া। তুমিই জান কেমন তোমার তত্ত্ব, কোথায় লাগে বা আমার দীন বেচারা মতি!

মনের অগম্য, দৃষ্টির অগোচর, মানসেরও গম্য নহে সেই স্থান, শ্রুতি সমাধি বুদ্ধি বল সব যায় হইয়া হয়রান, বচনও সেখানে গিয়া না পারে পৌছিতে।

যোগের নয় ধ্যানের নয় জ্ঞানেরও নহে গম্য, ভাবিয়া ভাবিয়া সব যায় হারিয়া। "উনমুনী" (ধ্যানে লয়-লীন) থাকিয়া শ্বাস ও ঘট-সাধন যাহারা করে, তাহারাও পায় না তোমার পার।

খুঁজিতে খুঁজিতেও তোমার রহস্য যায় না জানা, ধারণার যাহা অতীত কেমন করিয়া তাহা যাইবে ধরা? দাদূ কহেন, সর্ব্বাতীত তিনি যাহাকে (আপন তত্ত্ব) দেন দয়া করিয়া, সেই মহাভাগ্যই তাহা পায়।"

---

* "সুরতি" পাঠও আছে।

রাগ গুংড

৩৯

দরসন দে দরসন দে
হৌঁ তো তেরী মুকতি ন মাঁগৌ রে।
সিধি ন মাঁগৌ রিধি ন মাঁগৌ
তুম্হহীঁ মাঁগৌ গোবিংদা।
জোগ ন মাংগৌ ভোগ ন মাংগৌঁ
তুম্হহীঁ মাংগৌ রামজী।
ঘর নহিঁ মাংগৌঁ বন নহিঁ মাংগৌঁ
তুম্হহী মাংগৌ দেৱজী॥
দাদূ তুম্হ বিন ঔর ন জানৈ
দরসন মাঁগৌ দেহু জী।

"দরশন দাও, দরশন দাও, আমি তো তোমারই *; তোমার কাছে আমি মুক্তিও চাই না।

সিদ্ধিও চাই না ঋদ্ধিও চাই না। তোমাকেই চাই, হে গোবিন্দ।

যোগও চাই না ভোগও চাই না, তোমাকেই চাই হে আমার রাম।

ঘরও চাই না বনও চাই না, তোমাকেই চাই হে আমার দেব।

দাদূ তোমা বিনা আর আর কিছুই জানে না, দরশনই আমি চাই, দেও প্রভু আমকে দরশন।"

---

* তোমার দাস যদি তোমার কাছে আসিয়া মুক্তি চাহে তবে তাহাতে তোমারই অপমান। যে তোমার প্রেম পাইয়াছে সে চাহিবে তোমার নিত্য সেবার অধিকার। এই পদটির খানিকটা উপক্রমণিকার ১১৬ পৃষ্ঠায়ও আছে।

৪০

মেরা মনকে মনসৌঁ মন লাগা।
সবদ কে সবদ সৌঁ নাদ বাগা॥
স্রবণ কে স্রবণ সুনি সুখ পায়া।
নৈন কে নৈন সৌঁ নিরখি রায়া॥
প্রাণ কে প্রাণ সৌঁ খেলি প্রাণী।
মুখ কে মুখ সৌঁ বোলি বাণী॥
জীৱকে জীৱ সৌঁ রংগি রাতা।
চিত্তকে চিত্ত সৌঁ প্রেম মাতা॥
সীসকে সীস সৌঁ সীস মেরা।
দেখিরে দাদূ ৱা ভাগ তেরা॥*

“মনের যিনি মন তাঁর সঙ্গে লাগিয়াছে আমার মন। “শবদের” যিনি “শবদ” তাঁহার সঙ্গে ধ্বনিয়াছে আমার নাদ।

শ্রবণের শ্রবণে শুনিয়া পাইয়াছি আনন্দ; নয়নের নয়নে নিরখিয়া হইয়াছি প্রেমাসক্ত।

প্রাণের প্রাণের সঙ্গে খেলিয়াছে আমার প্রাণী, মুখের মুখের সঙ্গে বলিয়াছি বাণী।

জীবনের জীবনের সঙ্গে রঙ্গে হইয়াছি অনুরক্ত, চিত্তের চিত্তের সঙ্গে প্রেমে হইয়াছি মত্ত।

শীর্ষের শীর্ষের সঙ্গে মিলিল আমার শীর্ষ, দেখরে দাদূ চাহিয়া, সেই তো তোর সৌভাগ্য।”

---

* ইহার সহিত কেনোপনিষদের “শ্রোত্রস্য শ্রোত্রম্” ইত্যাদি বাণী তুলনীয়।

রাগ বিলাৱল

৪১

সোঈ রাম সঁভালি৷ জিয়রা প্রাণ প্যংড জিন দীন্‌হা রে।
অংবর আব উপজাৱনহারা মাহিঁ চিত্র জিন কীন্‌হা রে॥
চংদ সূর জিন্‌হ কিয়ে চিরাগা চরণৌঁ বিনা চলাৱৈ রে।
ইক সীতল এক তাতা ডোলৈ অনংত কাল* দিখলাৱৈ রে॥
ধরতী ধরণি বরণি বহু বাণী রচিলে সপ্ত সমংদা রে।
জল থল জীৱ সগালনহারা পূরি রহ্যা সব সংগা রে॥
গগন পৱন পানী জিন কীন্‌হা বরিখাৱৈ বহু ধারা রে।
নিহচল রাম জপী মেরে জিয়রা সবকা জীৱনহারা রে॥

"হে জীবন, সেই রামকে কর আশ্রয় যিনি দিয়াছেন প্রাণ ও তনু; যিনি অম্বর ও অভ্রশোভা করিলেন উৎপন্ন, তার মধ্যে নানা চিত্র (মেঘের বর্ণ ও নক্ষত্রে খচিত মহাচিত্র) যিনি করিলেন রচনা।

চন্দ্র সূর্য্য দুই প্রদীপ যিনি সৃষ্টি করিয়া বিনা চরণে তাহাদিগকে দিলেন চালাইয়া, একটি শীতল একটি তপ্ত পরিভ্রমণ করিয়া দেখাইতেছে অনন্ত কালকে। * *

যিনি রচনা করিলেন বহু বর্ণের বহু বাণীর ধারিণী ধরিত্রীকে, যিনি রচিলেন সপ্ত সমুদ্র; জল স্থল জীবের যিনি রক্ষাকর্ত্তা, যিনি সবার সঙ্গে থাকিয়া সকল মিলনকে করিয়া আছেন পরিপূর্ণ।

গগন পবন জল যিনি করিয়াছেন সৃষ্টি, যিনি বহু ধারার করান বর্ষণ; সকলের যিনি জীবনদাতা, সেই রামকে নিশ্চল কর জপ, হে আমার জীবন।"

---

* "কলা" পাঠও আছে।

* * "কলা" পাঠে অর্থ হইবে অনন্ত কলা।

৪২

আজি পরভাতি মিলে হরি লাল ॥
দিল কী বিথা পীড় সব ভাগী
মিট্যো জীৱ কৌ সাল ।
দেখত নৈন সংতোষ ভয়ো হৈ
তুম হৌ দীন দয়াল ॥

“আজ প্রভাতে মিলিয়াছেন বল্লভ হরি। হৃদয়ের ব্যথা পীড়া সবই হইয়াছে দূর, জীবনের বিদ্ধ শেল গভীর ব্যথা হইল অপগত। তোমার দরশন মাত্রেই জুড়াইয়াছে আমার নয়ন, তুমি যে দীন দয়াল।”

রাগ বসন্ত

৪৩

তহঁ খেলোঁ নিতহীঁ পীৱ সূঁ ফাগ
দেখি সখিৱী মেরে ভাগ ॥
তহঁ দিন দিন অতি আনংদ হোই ।
প্রেম পিলাৱৈ আপ সোই ॥
সংগিয়ন সেতী রমৌঁ রাস ।
তহঁ পূজা অরচা চরণ পাস ॥
তহঁ বচন অমোলিক সবহীঁ সার ।
তহঁ বরতৈ লীলা অতি অপার ॥
দাদূ বলি বলি বারংবার ।
তহঁ আপ নিরংজন নিরাধার ॥

“সেখানে নিত্যই প্রিয়তমের সঙ্গে খেলি ফাগ, দেখ ওগো সখি আমার কি সৌভাগ্য!

সেখানে দিনে দিনে চলিয়াছে নব নব আনন্দ, আপনি তিনি পান করান প্রেমামৃত রস।

সঙ্গীদের সহ খেলিতেছি রাস। সেখানে তাঁর চরণের পাশেই চলিয়াছে পূজা অর্চ্চনা।

সেখানে (ধ্বনিত) সকলের সার অমূল্য বাণী। সেখানে চলিয়াছে অতি অপার লীলা।

যেখানে আপনি নিরঞ্জন নিরাধার বিরাজিত, দাদূ বারম্বার যায় সেখানে বলিহারি (আপনাকে করিয়া দেয় উৎসর্গ)।"

রাগ তোড়ী

৪৪

সুন্দর রাম রায়া।
পরম ধ্যান পরম জ্ঞান পরম প্রাণ আয়া॥
অকল সকল অতি অনূপ ছায়া নহিঁ মায়া।
নিরাকার নিরাধার বার পার ন পায়া॥
অতি গভীর অমৃত নীর নিরমল নিত ধারা।
অমৃত সুরস পরম পুরস আনন্দ নিজ সারা॥
পরম নূর পরম তেজ পরম জ্যোতি পরকাস।
পরম পুংজ পরাপর দাদূ নিজ দাস॥

"সুন্দর জগদীশ্বর প্রেমময় ভগবান; পরম ধ্যান পরম জ্ঞান পরম প্রাণ তিনি আসিলেন (এই জীবনে)।

অখণ্ড সর্ব্বময় অতি অনুপম, না আছে তাঁর ছায়া না আছে তাঁর মায়া। নিরাকার, নিরাধার, না পাইলাম তাঁর কূল কিনারা।

অতি গভীর অমৃত নীর, নির্ম্মল তিনি নিত্যধারা; অমৃত সুরস পরম পুরুষ তিনি আনন্দ নিজ সার।

তিনি পরম আলোক, পরম তেজ, পরম জ্যোতি পরকাশ ; তিনি পরম পুঞ্জ, পরাৎপর, দাদূ তাঁর আপন দাস।”

৪৫

অখিল ভাৱ অখিল ভগতি অখিল নাম দেৱা।
অখিল প্রেম অখিল প্রীতি অখিল সুরতি সেৱা ॥
অখিল অংগ অখিল সংগ অখিল রংগ রামা।
অখিল রতি অখিল মতি অখিল নিজ নামা ॥
অখিল ধ্যান অখিল গ্যান অখিল আনংদ কীজৈ।
অখিল লয় অখিলময় অখিল রস পীজৈ ॥
অখিল মগন অখিল মুদিত অখিল গলিত সাঈঁ।
অখিল দরস অখিল পরস দাদূ তুম মাহীঁ ॥

“তুমি অখিল ভাব, অখিল ভক্তি, অখিল নাম, হে দেবতা ; তুমি অখিল প্রেম অখিল প্রীতি অখিল স্মরতি (প্রেম ধ্যান) সেবা।

অখিল অঙ্গ অখিল সঙ্গ অখিল রঙ্গ তুমি রাম। অখিল রতি অখিল মতি তুমি অখিল নিজ নাম।

(হে দাদূ,) অখিল ধ্যান অখিল জ্ঞান অখিল আনন্দ কর সম্ভোগ, অখিল লয় অখিলময় অখিল রস কর পান।

অখিল মগন অখিল মুদিত অখিল-রস-গলিত তুমি স্বামী ; অখিল দরশ অখিল পরশ, তোমার মধ্যেই দাদূ করে বিহার।”

রাগ ধনাশ্রী

৪৬

মোহন ম্হারা কব মিলৈ সকল সিরোমণি রাঈ।
তন মন ব্যাকুল হোত হৈ দরস দিখাৱো আই ॥

নৈন রহে পংথ জোৱতাঁ রোৱত রৈণি বিহাই।
বাল্‌হা সনেহী কব মিলৈ মো পৈ রহ্যা ন জাই॥
চরণ কমল কব দেখিহোঁ সনমুখ সিরজনহার।
সাঁঈ সংগ সদা রহোঁ হাঁ হো তব ভাগ হমার॥
জীৱনি মেরী জব মিলৈ হাঁ হো তব হীঁ সুখ হোই।
তন মন মৈঁ তূঁ হী বসৈ হাঁ হো কব দেখোঁ সোই।
তন মন কী তূঁহী লখৈ হাঁ হো সুণি চতুর সুজান।
তুম্হ দেখে বিন ক্যূঁ রহোঁ হাঁ হো মোহি লাগে বান।

"হে মোহন আমার, সকল-শিরোমণি স্বামী, কবে আসিয়া মিলিবে আমার সনে? তনু মন আমার হইতেছে ব্যাকুল, আসিয়া দাও আমায় দরশন।

নয়ন রহে পথ নিরখিয়া, কাঁদিয়া পোহায় আমার রজনী, হে প্রেমময় বল্লভ, কবে আসিয়া মিলিবে আমার সাথে? আমি তো আর পারি না থাকিতে।

কবে দেখিব তোমার চরণ কমল, কবে হে প্রভু পরমেশ্বর, প্রত্যক্ষ দেখিব তোমার রূপ? ওগো, সদা যদি তোমার সাথেই থাকিতে পারি, তবেই আমার সৌভাগ্য।

হে জীবন আমার, যখন তুমি মিলিবে আমার সনে, ওগো, তখনই আমার হইবে আনন্দ। তনুতে মনেতে শুধু তুমিই করিবে বাস, ওগো, কবে সেই শোভা দেখিব নয়নে?

তনু মনের ভিতরের যে বেদনা তাহা তুমিই জান। ওগো চতুর রসিক সুজান, তুমিই শোন (আমার বেদনা), তোমাকে না দেখিয়া রহি কেমন করিয়া? ওগো, তোমার রূপ ও সৌন্দর্য্যের বাণ যে বিঁধিয়াছে আমাকে।"

৪৭

যে প্রেম ভগতি বিন রহ্যৌ ন জাঈ।
পরগট দরশন দেহু অঘাঈ॥

তালা বেলী তলফৈ মাহীঁ।
তুম্হ বিন রাম জিয়রে জক নাহীঁ॥
নিস বাসুরি মন রহৈ উদাসা।
মৈঁ জন ব্যাকুল সাস উসাসা॥
একমেক রস হোই ন আৱৈ।
তাথৈঁ প্রাণ বহুত দুখ পাৱৈ॥
অংগ সংগ মিলি য়হু সুখ দীজৈ।
দাদূ রাম রসাইন পীজৈ॥ *

"এই প্রেম ভগতি বিনা যায় না যে থাকা, সকল-ভরপূর-করা প্রকট দরশন আমায় দাও।

অন্তরের মধ্যে চলিয়াছে ছটফট ব্যাকুলতা, তোমা বিনা, হে ভগবান, জীবনে নাই সোয়াস্তি।

নিশি বাসর মন রহে উদাসী, প্রতি শ্বাসে শ্বাসে আমি আছি ব্যাকুল হইয়া।

তোমাতে আমাতে প্রেমে মাখামাখি হইয়া এক রস তো গেল না হওয়া, তাতেই প্রাণ পায় বহু দুঃখ।

অঙ্গে অঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে যাই মিলিয়া, দাও এমন আনন্দ। হে দাদূ, রাম রসায়ন কর পান।"

৪৮

তিস ঘরি জানা রে, জহাঁ রৈ অকল সরূপ।
সো ইব ধ্যাইয়ে রে, সব দেৱনি কা ভূপ॥
অকল স্বরূপ জীৱকা বান বরন ন পাইয়ে।
অখংড মংডল মাহিঁ রহৈ সোঈ প্রীতম গাইয়ে॥

"সেই ঘরেই হইবে যাইতে যেখানে সেই অখণ্ড স্বরূপ। তাঁহাকেই এখন কর ধ্যান, যিনি সকল দেবতার অধিদেবতা।"

---

* ইহার প্রথম দুই পংক্তি উপক্রমণিকা ১১৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে।

অখণ্ড স্বরূপ প্রিয়তমের, না পাই (জ্ঞানে) তাঁহার রূপ-শোভা না পাই তাঁহার বর্ণ। অখণ্ড মণ্ডলের মাঝে বিরাজিত যে প্রিয়তম তাঁহাকেই হইবে গাহিতে।”

৪৯

ইহি বিধি আরতী রাম কীজৈ।
আতম অংতরি বারণাঁ লীজৈ॥
আনঁদ মংগল ভাৱ কী সেৱা।
মনসা মংদির আতম দেৱা॥
ঘংটা সবদ অনাহত বাজৈ।
আনংদ আরতি গগনাঁ গাজৈ॥
ভগতি নিরংতর মৈঁ বলিহারী।
দাদূ কিম জানৈ সেৱ তুম্হারী॥

“(বিশ্বে যেমন তাঁর চলিয়াছে নিত্য আরতি) সেই প্রকার বিধানেই ভগবানের কর আরতি। আত্মার অন্তরেই করিয়া লও উৎসর্গ।

আনন্দই সেই আরতির মঙ্গল গীত, ভাবই তাঁহার সেবা, মানসই তাঁহার মন্দির, পরমাত্মাই সেখানে দেবতা।

অনাহত শব্দই সেখানে বাজিতেছে ঘণ্টা, আনন্দ আরতি গগনে হইতেছে উদিত।

(বিশ্বধামের) নিরন্তর এমন ভক্তিকে যাই আমি বলিহারি, দাদূ আর কেমন করিয়া জানিবে তোমার সেই সেবা?”

সর্ব্ব-বিশ্ব-আরতি

৫০

নিরাকার তেরী আরতি, অনঁত ভুৱন কে রাই॥
সুর নর সব সেৱা করৈঁ ব্রহ্মা বিস্নু মহেস।

দেৱ তুমহারা ভেৱ ন জানৈঁ পার ন পাৱৈ সেস ॥
চংদ সূর আরতি করৈঁ নমো নিরংজন দেৱ।
ধরনী পৱন আকাস অরাধৈঁ সবৈ তুমহারী সেৱ ॥
সকল ভুৱন সেৱা করৈঁ মুনিয়র সিদ্ধ সমাধ।
দীন লীন হোই রহে সংত জন অৱিগত কে আরাধ ॥
জয় জয় জীৱনি রাম হমারী ভগতি করৈঁ ল্যৌ লাই।
নিরাকার কী আরতি কীজৈ দাদূ বলি বলি জাই ॥

"হে অনন্ত ভুবনের রাজা, হে নিরাকার, আরতিও তোমার নিরাকার। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ সুর-নর সবাই করে তোমার সেবা, হে দেব, কেহই তো জানে না তোমার মর্ম্ম, অনন্তও পায় না তোমার পার।

চন্দ্রসূর্য্য করে তোমারই আরতি, নমো হে নিরঞ্জন দেবতা, ধরণী পবন আকাশ সবাই সেবায় সেবায় করে তোমার আরাধনা।

সিদ্ধ সমাহিত মুনিবর ও সকল ভুবনই করে তোমার সেবা, অনির্বচনীয় তোমার আরাধনায় সাধকজন সবাই হইয়া থাকেন দীন লীন।

জয় জয় আমার জীবন-রাম, প্রেম ও ধ্যান যোগে সবাই করিতেছে তোমায় ভক্তি। নিরাকার কর নিরাকারের আরতি, বার বার বলিহারী যায় তোমার দাদূ (দাদূ আপনাকে করে সেই আরতিতে উৎসর্গ)।"

সর্ব্ব-কাল-আরতি

৫১

তেরী আরতি এ জুগি জুগি জয় জয় কার ॥
জুগি জুগি আতম রাম জুগি জুগি সেৱা কীজিয়ে।
জুগি জুগি লংঘে পার জুগি জুগি জগপতি কোঁ মিলে ॥
জুগি জুগি তারণহার জুগি জুগি দরসন দেখিয়ে।
জুগি জুগি মংগলচার জুগি জুগি দাদূ গাইয়ে ॥

"তোমার এই, আরতি যুগে যুগেই জয় জয় কার।

যুগে যুগেই আত্মারাম, যুগে যুগেই কর সেবা, যুগে যুগে পারে উত্তীর্ণ হইয়া যুগে যুগে জগৎপতির সঙ্গে হও মিলিত।

যুগে যুগে তিনিই ত্রাণ কর্ত্তা, যুগে যুগে তাঁহাকে কর দরশন, যুগে যুগে মঙ্গল-আচার, যুগে যুগে দাদূ করে গান।"

[অর্থাৎ মুক্ত হইয়া লুপ্ত হইয়া যাইতে চাই না, যুগে যুগে নূতন নূতন করিয়া তোমার সহিত মিলনই দাদূর প্রার্থিত।]

প্রশ্নোত্তরী

মধ্যযুগে ভারতের সর্ব্বত্র কতকগুলি তত্ত্ব প্রশ্নোত্তরের আকারে মুখে মুখে ঘুরিত। বাংলাতেও শূন্যপুরাণের সময়ে তার আগে ও পরে এইরূপ অনেক প্রশ্নোত্তর দেখিতে পাই। যোগমার্গে ও গোরক্ষনাথ গোপীচন্দ্র ভর্ত্তৃহরি প্রভৃতির উপদিষ্ট পন্থে এই প্রশ্নোত্তরী সব চেয়ে বেশী। দাদূর কয়েকটি প্রশ্নোত্তরী এইখানে দেওয়া যাইতেছে। পরচা অঙ্গে কয়েকটি প্রশ্ন দ্রষ্টব্য। উপক্রমণিকায় "শূন্য ও সহজ" প্রকরণেও কিছু দেওয়া হইয়াছে (১৯০ পৃষ্ঠা)।

১

(অংগবধূ সংগ্রহে গৌরী রাগের ৫৩ শবদে এই প্রশ্নোত্তরটি আছে)।

প্রশ্ন—

কাদির কুদরতি লখী ন জাই।
কহাঁ থৈঁ উপজৈ কহাঁ সমাই॥
কহাঁ থৈ কীন্‌হ পরন অরু পানী।
ধরণি গগন গতি জাই ন জানী॥
কহাঁ থৈঁ কায়া প্রাণ প্রকাসা।
কহাঁ পংচ মিলি এক নিরাসা॥
কহাঁ থৈঁ এক অনেক দিখারা।
কহাঁ থৈ সকল এক হ্বৈ আরা॥
দাদূ কুদরতি বহুত হৈরানাঁ
কহাঁ থৈঁ রাখি রহে রহিমাঁনাঁ॥

উত্তর—

রহৈ নিয়ারা সব করৈ, কাহূ লিপত ন হোই।
আদি অংতি ভানৈ ঘড়ৈ, ঐসা সম্রথ সোই॥
স্রম নঁহি সব কুছ করৈ যোঁ কলধরী বনাই।
কৌতিগহারা হ্বৈ রহ্যা সব কুছ হোতা জাই॥
সবদৌঁ বন্ধ্যা সব রহৈ সবদৈঁ হী সব জাই।
সবদৈঁ হী সব উপজৈ সবদৈঁ সবৈ সমাই॥

প্রশ্ন—

"ভগবানের কলানৈপুণ্য তো যায় না বুঝা! কোথা হইতে সব হয় উৎপন্ন আবার কোথায় হয় সমাহিত?

কোথা হইতে করিলেন পবন ও জল? ধরণী ও গগনের গতি [রহস্য, মর্ম্ম] ও তো যায় না জানা।

কোথা হইতে কায়া ও প্রাণের হইল প্রকাশ? কোথায় পঞ্চ মিলিয়া রহে এক নিবাসে?

কোথা হইতে (কেমন করিয়া) সেই একই অনেক হইয়া দিল দেখা, কেমন করিয়া আবার সকল আসিল এক হইয়া?

হে দাদূ, বুদ্ধির অগম্য অপরূপ এই কলা-নৈপুণ্য। কোথা হইতে (এই বিচিত্র সৃষ্টি) রাখিয়া (কোথায়) রহিয়াছেন দয়াময় (কেমন করিয়া এই লীলা চালাইতেছেন ভগবান)?"

উত্তর—

"স্বতন্ত্র রহেন অথচ তিনিই সব করেন, কিছুতেই তিনি হন না লিপ্ত। আদি হইতে অন্ত তক চলিয়াছেন তিনি ভাঙ্গিয়া গড়িয়া, এমনই তাঁহার অপার সামর্থ্য!

অনায়াসেই তিনি সব কিছু করেন সৃষ্টি, এমন আনন্দেই চলিয়াছে তাঁর রচনা! শুধু কৌতুক-রসের রসিক হইয়া তিনি রহিলেন, আর সব কিছু চলিল আপনি রচিত হইয়া!

"শবদে" (সঙ্গীতে) বন্ধ হইয়াই রহিয়াছে সব সৃষ্টি, "শবদ" (সঙ্গীতের)

লয়ের সঙ্গেই সব যাইবে লয় হইয়া, "শবদ" (সঙ্গীত) হইতেই সব হইতেছে উৎপন্ন, "শবদ" (সঙ্গীতের) মধ্যেই সব হইতেছে সমাহিত।"

২

লয় অঙ্গের বাণীতে কয়টি প্রশ্নোত্তর আছে তাহা এখানে দ্রষ্টব্য। একটি হইল—

প্রশ্ন—

বিন পায়ন কা পংথ হৈ ক্যোঁ করি পহুঁচৈ প্রাণ ?
(লয়, ১০)

৩

আর একটি হইল—

কিহিঁ মারগ হ্বৈ আইয়া কিহিঁ মারগ হ্বৈ জাই ?
(লয়, ১২)

এই প্রশ্ন ও তাহার উত্তর উপক্রমণিকায় "শূন্য ও সহজ" প্রকরণে (১৮৫-১৮৬ পৃঃ) আছে।

৪

প্রশ্ন—

আবার প্রশ্ন দেখি—

কহাঁ মীঁচকো মারিয়ে কহঁ জুক্ত সত খংড।

"কোথায় মৃত্যুকে যায় মারা, কোথায় খণ্ডিত সত্য হয় যুক্ত অখণ্ড ?"

উত্তর—

রোম রোম লৈ লাই ধুনি খণ্ড সত সদা অখণ্ড।
দাদূ অবিনাসী মিলৈ মীচকো দীজৈ ডংড॥

"শরীরের রোমে রোমে ধ্বনিকে আনিয়া তাহাতে লয়লীন হইতে পারিলে (শরীরের অণু পরমাণুর সহজ নিত্য-জপ চলিলে) খণ্ড সত্য হয় সদা অখণ্ড। হে দাদূ, অমৃত-স্বরূপের (অবিনাশীর) সঙ্গ যদি মেলে, তবেই মৃত্যুকে দিতে পারিবে দণ্ড।"

৫

প্রশ্ন—

(এই প্রশ্নটিই একটু অদল বদল করিয়া কবীরের বাণীতেও আছে)।

কৌন ভাঁতি ভল মানৈঁ গোসাঈঁ ।
তুম ভাবৈ সো মৈঁ জানত নাহীঁ ॥
কৈ ভল মানৈঁ নাচৈঁ গায়েঁ ।
কৈ ভল মানৈঁ লোক রিঝায়েঁ ॥
কৈ ভল মানৈঁ তীরথ ন্হায়েঁ ।
কৈ ভল মানৈঁ মূংড মুড়ায়েঁ ॥
কৈ ভল মানৈঁ সব ঘর ত্যাগী* ।
কৈ ভল মানৈঁ ভয়ে বৈরাগী ॥
কৈ ভল মানৈঁ জটা বঁধায়েঁ ।
কৈ ভল মানৈঁ ভসম লগায়ে ॥
কৈ ভল মানৈঁ বন বন ডোলেঁ।
কৈ ভল মানৈঁ মুখহি ন বোলেঁ॥
কৈ ভল মানৈঁ জপ তপ কীয়েঁ ।
কৈ ভল মানৈঁ করব্রত লীয়েঁ ॥
কৈ ভল মানৈঁ ব্রহ্ম গিয়ানী ।
কৈ ভল মানৈঁ অধিক ধিয়ানী ।
জে তুম্হ ভাবৈ তুম্হ পৈ আহি ।
দাদূ ন জানৈঁ কহি সমঝাই ॥ (শব্দ, গৌড়ী ২২)

“হে গোঁসাই, কিরূপ করিলে তোমার ভাল লাগে ? তুমি যাহাতে প্রসন্ন হও তাহা তো আমি জানি না ।

নাচিলে গাহিলেই কি তুমি হও তুষ্ট ? অথবা লোক প্রসন্ন করিলেই তুমি হও খুসী ?

---

* (“লাগি” পাঠও আছে তখন অর্থ হইবে “সকল ঘরেই যে যুক্ত ।”)

তীর্থে স্নান করিলেই কি তোমার লাগে ভাল ? অথবা মাথা মুড়াইলেই কি তোমায় ভাল লাগে ?

সব ঘর ত্যাগ করিলেই (পাঠান্তরে, সকল ঘরে যুক্ত হইলেই) কি তুমি হও তুষ্ট ? অথবা বৈরাগী হইলেই তুমি হও খুসী ?

(কেশে) জটা বাঁধাইলেই কি হয় তোমার পছন্দ ? অথবা ভস্ম মাখিলেই তুমি হও প্রসন্ন ?

বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইলেই কি তুমি হও তুষ্ট ? অথবা মুখে কথাটিমাত্র না বলিয়া মৌন রহিলেই তুমি হও প্রসন্ন ?

জপ তপ করিলেই কি তোমার লাগে ভাল ? অথবা করপত্র-ব্রত”* লইলেই কি তোমার মন হয় তুষ্ট ?

ব্রহ্মজ্ঞানী হইলেই কি তোমার লাগে ভাল ? অথবা অধিক ধ্যানী হইলেই কি তুমি হও প্রসন্ন ?

যাহাতে তোমার সন্তোষ তাহা আছে তোমারই মধ্যে (অর্থাৎ তাহা তুমি-ই জান)। দাদূ তো জানে না, তাহাকে কহিয়া দেও বুঝাইয়া।”

উত্তর—

(অংগ বংধু সংগ্রহে ইহা ভেষ অঙ্গে দুই ভাগে আছে)

জে তূঁ সমঝৈ তৌ কহোঁ সাচা এক অলেখ।
ডাল পাত তজি মূল গহি কা দিখলাবৈ ভেখ॥
সচু বিন সাঈঁ না মিলৈ ভাবৈ ভেষ বনাই।
ভাবৈ করৱত অরধ মুখ ভাবৈ তীরথ জাই॥

(ভেখ অঙ্গ, ১০, ৪০)

“যদি তুই বুঝিতে পারিস্ তবে বলি, সত্য এক অলেখ। শাখা পল্লব ছাড়িয়া মূলই যদি গ্রহণ করিলি, ভেখ তবে আবার কি চাস্ দেখাইতে ?

---

* তখন কেহ কেহ কাশীতে গিয়া সদ্‌গতি লাভের আশায় করপত্রে অর্থাৎ করাতে দেহ দুইখণ্ডে বিদীর্ণ করাইতেন, তাহারই নাম করপত্রব্রত গ্রহণ।

সত্য বিনা স্বামী মেলেন না, চাই ভেখই বানাও, চাই অধোমুখই থাক লম্ববান, চাই করাতেই দেহ করাও দ্বিখণ্ডিত, চাই তীর্থে তীর্থেই কর পর্য্যটন।”

৬

প্রশ্ন—

কৌন সবদ কৌন পরখনহার।
কৌন সুরতি কহু কৌন বিচার॥
কৌন সুজ্ঞাতা কৌন গিয়ান।
কৌন উনমনী কৌন ধিয়ান॥
কৌন সহজ কহু কৌন সমাধ॥
কৌন ভগতি কহু কৌন আরাধ॥
কৌন জাপ কহু কৌন অভ্যাস।
কৌন প্রেম কহু কৌন পিয়াস॥
সেৱা কৌন কহো গুরুদেৱ।
দাদূ পূছৈ অলখ অভেৱ॥

(রাগ গৌড়ী,)

“কোন্-বা শব্দ কে-বা পরখ কর্ত্তা? কোন্-বা সুরতি, কহ কোন্-বা বিচার? কে-বা সুজ্ঞাতা, কোন্-বা জ্ঞান? কিই-বা উন্মনী, কেমন বা ধ্যান? কোন্-বা সহজ, কহ কেমন বা সমাধি? কেমন বা ভক্তি, কহ কোন্-বা আরাধনা? কেন্-বা জাপ, কহ কোন্-বা অভ্যাস? কোন্-বা প্রেম, কহ কোন্-বা পিয়াস? কেমন বা সেবা, কহ হে গুরুদেব। হে অলখ, হে ভেদাতীত, দাদূ সেই ভেদাতীত অলখ তত্ত্বই করিতেছে জিজ্ঞাসা।”

উত্তর—

আপা মেটৈ হরি ভজৈ তন মন তজৈ বিকার।
নিরবৈরী সব জীৱ সৌঁ দাদূ য়হু মত সার॥
আপা গরব গুমান তজি মদ মচ্ছর হঁকার।
গহৈ গরীবী বংদগী সেৱা সিরজনহার॥*

---

* “দয়া নির্বৈরতা” অঙ্গেও আছে।

"অহংভাব মিটাও, হরি ভজ, তনু-মনের বিকার কর ত্যাগ ; সকল জীবের সঙ্গে থাক নির্বৈর, হে দাদূ, ইহাই হইল সার মত।

গর্ব্ব মান ও অহংভাব ত্যজিয়া মদ মাৎসর্য্য অহংকার ত্যাগ করিয়া দৈন্যভাব প্রণতি ও ভগবানের সেবা কর গ্রহণ, (ইহাই হইল সার মত)।

৭

প্রশ্ন—

মৈঁ নহিঁ জানৌঁ সিরজনহার।
জ্যূঁ হৈ ত্যূঁ হী কহৌ করতার॥
মস্তক কহাঁ কহাঁ কর পাই।
অবিগত নাথ কহৌ সমঝাই॥
কহঁ মুখ নৈনাঁ শ্রবণাঁ সাঈঁ।
জানরায় সব কহৌ গুসাঈঁ॥
পেট পীঠি কহাঁ হৈ কায়া।
পরদা খোলি কহৌ গুররায়া॥
জ্যোঁ হৈ ত্যোঁ কহি অংতর জামী।
দাদূ পূছৈ সদগুর স্বামী॥

(গৌড়ী,)

"হে সৃজনকর্ত্তা ভগবান, আমি তো জানি না ; হে প্রভু (তোমার সত্য) যেমনটি আছে ঠিক তেমনই বল।

কোথায় বা মস্তক কোথায় বা কর ও পদ, হে অনির্বচনীয় নাথ, তাহা বল বুঝাইয়া। হে স্বামী, হে গোসাই, হে পরমজ্ঞাতা, বল কোথায় বা মুখ কোথায় কোথায় বা নয়ন ও শ্রবণ। কোথায় বা পেট পিঠ ও কায়া, হে গুরুরাজ, বল, সব পরদা খুলিয়া। ঠিক যেমনটি আছে তেমনটিই বল হে অন্তর্য্যামী। হে স্বামী, হে সদ্‌গুরু, দাদূ তোমাকেই করিতেছে জিজ্ঞাসা।"

উত্তর—

সবৈ দিসা সো সারীখা সবৈ দিসা মুখ বৈন।
সবৈ দিসা শ্রবনহুঁ সুনৈঁ সবৈ দিসা কর নৈন॥

সবৈ দিসা পগ সীস হৈ সবৈ দিসা মন চৈন।
সবৈ দিসা সনমুখ রহৈ সবৈ দিসা অংগ ঐন ॥

"হে দাদূ, সকল দিকেই তিনি সমরূপ, সকল দিকেই তাঁর মুখ ও বদন। সকল দিকেই তিনি শোনেন শ্রবণে, সকল দিকেই তাঁহার কর ও নয়ন। সকল দিকেই তাঁহার পদ ও মস্তক, সকল দিকেই তাঁহার মন ও আনন্দ। সকল দিকেই তিনি আছেন সম্মুখে, সকল দিকেই তাঁর অঙ্গ ও নয়ন (ঘর, সত্তা)।"

৮

প্রশ্ন—

অলখ দেব গুর দেহু বতাঈ।
কহাঁ রহৌ ত্রিভুবনপতি রাঈ ॥
ধরত্তী গগন বসহু কবিলাস।
তিনহূঁ লোক মেঁ কহাঁ নিৱাস ॥
জল থল পাৱক পৱনা পূরি।
চংদা সূর নিকট কৈ দূরি ॥
মংদির কৌন কৌন ঘরবার।
আসন কৌন কহৌ করতার ॥
অলখ দেৱ গতি লখী ন জাই।
দাদূ পূছৈ কহি সমঝাই ॥

(গৌড়ী শব্দ ৫৭)

"হে অলখ দেব, গুরু, দাও বলিয়া; হে ত্রিভুবনেশ্বর, প্রভু, কোথায় তুমি কর বাস? ধরিত্রীতে কি গগনে কি কৈলাসে, তিন লোকের মধ্যে কোথায় তোমার নিবাস? জল স্থল পাবক পবন পূর্ণ করিয়াই কি তুমি আছ? চন্দ্রে কি সূর্য্যে, কোথায় তোমার স্থিতি? নিকটে কি দূরে, কোথায় তুমি আছ? কোথায় তোমার মন্দির? কোথায় তোমার ঘর-দুয়ার? কোথায় তোমার আসন, হে প্রভু, বল (সেই তত্ত্ব)। হে অলখ দেব, তোমার গতি (লীলা) দেখা তো যায় না, দাদূ করে জিজ্ঞাসা, কহিয়া দাও বুঝাইয়া।"

উত্তর—

মুঝ হী মাহৈঁ মৈঁ রহূঁ মৈঁ মেরা ঘরবার।
মুঝ হী মাহৈঁ মৈঁ বসূঁ আপ কহৈ করতার॥
মৈঁ হী মেরা অরস মৈঁ মৈঁ হী মেরা থান।
মৈঁ হী মেরী ঠৌর মৈঁ আপ কহৈ রহিমান॥
মৈঁ হী মেরে আসিরে মৈঁ মেরে আধার।
মেরে তকিয়ে মৈঁ রহূঁ কহৈ সিরজনহার॥
মৈঁ হী মেরী জাতি মৈঁ মৈঁ হী মেরা অংগ।
মৈঁ হী মেরা জীর মৈঁ আপ কহৈ পরসংগ॥

"সৃজনকর্ত্তা প্রভু স্বয়ং কহেন, আমার মাঝেই আমি থাকি, আমিই আমার ঘর বাড়ী; আমার মাঝেই আমি করি বাস।

দয়াময় স্বয়ং কহেন, আমিই আমার অধ্যাকাশ* সিংহাসন, আমিই আমার স্থান, আমিই আমার ঠাঁই।

সৃজনকর্ত্তা প্রভু কহেন, "আমিই আমার আশ্রয়, আমিই আমার আধার, আমার সেই আসনেই (গদী তাকিয়া) আমি থাকি আসীন।"

"আমিই আমার জাতি, আমিই আমার অঙ্গ, আমিই জীবন্ত আমার জীবনে, এই প্রসঙ্গ(বিষয়) স্বয়ং তিনি বলেন।

---

* এই "অরস" শব্দ আরবী অর্শ। হিব্রুতেও এই শব্দ আছে। ইহার অর্থ হইল সকল স্বর্গের উপরে আকাশের উপরে ভগবানের সিংহাসন।

মাধুকরী

বৃন্দাবনে ও অন্যান্য তীর্থে সাধুরা এঘর ওঘর ঘুরিয়া কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়া দিন কাটাইয়া দেন। মধুকরের ন্যায় এই সংগ্রহ বলিয়া ইহার নাম "মাধুকরী।" দাদূর এই মাধুকরী প্রত্যেকটি একটি একটি স্বতন্ত্র রত্ন। প্রকরণ অঙ্গ প্রভৃতির ঐক্য দ্বারা ইহারা যুক্ত নয়। যেখান হইতে যে রত্ন মিলে তাহাই এখানে মাধুকরী নামে একত্রিত করিয়া রাখা হইয়াছে।

গভীর একটি কারণে সাধুদের মধুকর বলে। প্রত্যেক গৃহী আপনার গৃহে বদ্ধ। তাঁহাদের সাধনাও হয়ত সুন্দর ফলের মত, কিন্তু ফুলের সঙ্গে ফুলের যোগ হয় মধুকরের মারফতে। সাধুরা সেই মধুকর। তাঁহারা নানা ফুলের রস মাধুর্য্য সুরভি নানা ফুলে সঞ্চার করিয়া সকল ফুলকেই করেন সার্থক ও ধন্য। এইজন্যই এক দল ঘর-ছাড়া, সবার সঙ্গে যুক্ত, অথচ সব বন্ধন হইতে মুক্ত, মধুকরের দরকার। ফুলের মত আপন বোঁটায় বসিয়া মধু-রস-রেণু উৎপন্ন না করিলেও ইহাঁরাই সকলের রসের সমঝদার ও "পরখনহার"। তখনকার দিনে ফুলের মত সাধনা করিয়া গৃহী ছিলেন ধন্য, মধুকরের মত সাধনা করিয়া সাধু ছিলেন ধন্য, এবং পরস্পরের যোগে পরস্পর ছিলেন ধন্য।

তখন সাধুরাই ছিলেন মানবের সঙ্গে মানবের যোগ সেতু। এখন পুস্তক পত্রিকাদি ছাপা হইয়া, সভা সমিতি হইয়া, ডাকঘর ও তার প্রভৃতি হইয়া, মানুষের ব্যবসা বাণিজ্য রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি নানা রকম যোগের উপায় হইয়াছে। অথচ মানুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মের সাধনায় পরস্পর যোগের প্রয়োজন মানুষ অনুভব করিতেছে না! ব্যূহবদ্ধ ও জাতি-সম্প্রদায়-বদ্ধ হইয়া পূর্ব্বোক্ত নানা উপায়ে মানুষ অন্য সবাইকে লুটিয়া ধনী ও বিলাসী হইতেছে, অথচ ধর্ম্মের সাধনায় মানুষের লেন-দেন আজ বন্ধ হইয়াছে, তাই সাধুও হইয়াছে অকর্ম্মণ্য এবং তাহাদের প্রয়োজনও গিয়াছে চলিয়া।

১

মালিক জাগৈ জিয়রা সোৱৈ ক্যোঁ করি হোৱৈ মেলা।
সেজ এক সৌঁ মেল নহীঁ হৈ জৈ এক প্রেমি ন খেলা॥ (গৌড়ী)

"স্বামী আছেন জাগিয়া আর প্রাণ আমার আছে শুইয়া, কেমন করিয়া হয় তবে মিলন, এক শয্যাতে থাকিলেই কিছু মিলন হয় না, যদি এক হইয়া না খেলে প্রেমের খেলা।"

২

সোৱত সোৱত জনম হী বীতে অজ হূঁ জীৱ ন জাগৈ।
নীঁদ নিৱারি রাম সঁভারি প্রীতম সংগ লাগৈ॥ (মারূ)

"ঘুমাইতে ঘুমাইতে জনমই গেল শেষ হইয়া, আজও যে জাগিল না প্রাণ! নিদ্রা নিবারণ করিয়া ভগবানকে আশ্রয় করিয়া প্রিয়তমের সঙ্গে প্রেমে হও যুক্ত।"

৩

গগন* গলিত মহারসি মাতা,
তূঁ হৈ তব লগ পীজৈ।
দাদূ জব লগ অংত আৱৈ,
তব লগ দেখন দীজৈ॥ (গৌড়ী)

"গগন-গলিত সেই মহারসে হও মত্ত; যতদূর তোমার সত্তা ততদূর সেই রস করিয়া চল পান। হে দাদূ, যে পর্য্যন্ত না অন্ত আসিয়া হয় উপস্থিত, সে পর্য্যন্ত এই লীলা দিও দেখিতে।"

৪

লে করি সুখিয়া না ভয়া,
দে করি সুখিয়া হোই।
খালিক খেলৈ খেল করি,
বূঝৈ বিরলা কোই॥ (আসাৱরী)

---

* "গগন" স্থানে "মগন" পাঠও আছে।

"নিয়া কেহ হয় নাই সুখী, দিয়াই হয় সুখী, খেলার মত করিয়া জগদীশ্বর এই সদা দিবার খেলাই চলিয়াছেন খেলিয়া, ক্বচিতই কেহ বুঝে তাহার তত্ত্ব !"

৫

অমৃত রাম রসাইণ পীয়া।
তাতৈঁ অমর কবীরা কীয়া॥
রাম নাম কহি রাম সমানাঁ।
জন রইদাস মিলে ভগবানাঁ॥ (গৌড়ী)

"অমৃত রাম-রসায়ন পান করিয়াই কবীর করিল অমরত্ব লাভ। রাম নাম কহিয়া রামের মধ্যেই গেল ডুবিয়া, রইদাস তাই পাইল ভগবানকে।"

৬

ইহি রসি রাতে নামদেৱ পীপা অরু রয়দাস।
পীৱত কবীরা না থক্যা অজহূঁ প্রেম পিয়াস॥ (গৌড়ী)

"এই রসেই অনুরক্ত নামদেব পীপা এবং রইদাস; এই রস পান করিতে কবীরের নাই ক্লান্তি, আজিও তাহার প্রেমেরই পিপাসা।"

৭

ভাইরে ঐসা পংথ হমারা॥
দ্বৈ পখ রহিত পংথ গহি পূরা
অবরণ এক অধারা॥
বাদ বিবাদ কাহূ সৌঁ নাহীঁ
নাহিঁ* জগত থৈঁ ন্যারা॥ (গৌড়ী)

"ভাইরে, এমনই আমার পথ।

দুই পক্ষ রহিত, অবর্ণ, এক-আধার, পূর্ণ, সেই পথ। কাহারও সঙ্গে নাই বাদ বিবাদ, অথচ জগৎ হইতেও ইহা নয় বিচ্ছিন্ন।"

---

* "মাহিঁ" ও কেহ কেহ বলেন। তাহা হইলে অর্থ হইবে, জগতে থাকিয়াও জগৎ হইতে স্বতন্ত্র।

৮

সাধ সীংধর জগ ফটক হৈ উপরি সম্‌রংগ হোই।
সীংধর একৈ হ্‌ৱৈ রহ্যা পানী পত্থর দোই ॥ (সাধ অংগ)

"সাধু যেন সৈন্ধব আর জগৎ (জগতের লোক) যেন স্ফটিক, উপরে উভয়েরই রঙ্গ সমান। (কিন্তু জলে নামিলে দেখা যায়) সৈন্ধব যুক্ত হইয়া রহিল জলের সঙ্গে এক হইয়া, আর জল ও পাথর রহিল দুই হইয়া।"

৯

অলহ রাম ছূটা ভরম মোরা।
হিংদূ তুরুক ভেদ কুছ নাহীঁ দেখৌঁ দরসন তোরা ॥
সোঈ প্রাণ প্যণ্ড পুনি সোঈ সোঈ লোহী মাসা।
সোঈ নৈন নাসিকা সোঈ সহজৈঁ কীন্‌হ তমাসা ॥
স্রবনৌঁ সবদ বাজতা সুণিয়ে জিভ্যা মীঠা লাগৈ।
সোঈ ভূখ সবন কৌঁ ব্যাপৈ এক জুগতি সোই জাগৈ ॥
সোঈ সংধ বংধ পুনি সোঈ সোঈ সুখ সোই পীরা।
সোঈ হস্ত পাব় পুনি সোঈ সোঈ এক সরীরা ॥*

আল্লা রাম প্রভৃতি দ্বৈতের ভ্রম আমার গিয়াছে ছুটিয়া। হিন্দু মুসলমানে ভেদ নাই কিছুই। সর্ব্বত্র দেখিতেছি তোমারই রূপ।

সেই প্রাণ, সেই দেহ, সেই রক্ত মাংস, সেই নয়ন, সেই নাসিকা, সহজেই খেলিল অদ্‌ভুত খেলা।

শ্রবণে শব্দ (সমানই) শোনে, জিহ্বায় একই রূপ লাগে মিঠা, সেই এক ক্ষুধাই সর্ব্বত্র প্রবল, এক রকমই শোয় ও জাগে।

সেই একই সন্ধি একই বন্ধ, সেই একই সুখ ও সেই একই দুঃখ, সেই একই হাত, সেই একই পা, সেই একই শরীর।"

---

* গৌরীরাগের ৬৫ শব্দেও ইহা আছে। কবীরের মধ্যেও ঠিক এইরূপ বাণী আছে। উপক্রমণিকা ১০৭ পৃষ্ঠায় ইহার দুইটি পংক্তি উদ্ধৃত করা গিয়াছে।

১০

অলহ কহৌ ভাৱৈ রাম কহৌ।*
ড'ল তজৌ সব মূল গহৌ॥
কায়া কমল দিল লাই রহৌ।
অলখ অলহ দীদার লহৌ॥ (ভৈরূঁ)

"খুসি হয় তো আল্লাই বল, খুসি হয় তো রামই বল, ডাল ত্যাগ করিয়া সবাই মূলই কর গ্রহণ। কায়া-কমলে আন চিত্ত, অলখ আল্লার কর প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ।"

১১

কূ্ঁ্য হম জীৱৈঁ দাস গুসাঁঈঁ।
জে তুম ছাড়হু সমরথ সাঁঈঁ॥
জে তুম পরহরি রহৌ নিন্যারে।
তৌ সেৱক জাই করন কে দ্বারে॥ (গৌড়ী)

"হে গোঁসাই, তোমার দাস আমি কেন আর তবে বাঁচি? হে সমর্থ স্বামী, তুমি যদি ছাড়, তবে আর বাঁচি কিসের জন্য? তুমি যদি আমাকে ছাড়িয়া থাক দূরে, তবে সেবক তোমার যাইবে আর কাহার দ্বারে?"

১২

নীচ উচ মধিম কোউ নাহীঁ।
দেখৌ রাম সবনি কে মাহীঁ॥

---

* উপক্রমণিকা ১০৭ পৃষ্ঠাতেও এই পদটি উদ্ধৃত। ভৈরূঁ ৩৯৫ (ত্রিপাঠী), ভৈরূ ২২ (দ্বিবেদী) শব্দেও এই কথা আছে। জৈন সাধক আনন্দঘনতেও ঠিক এই বাণী আছে। তিনি দাদূর পরবর্ত্তী।

দাদূ সাচ সবনি মৈঁ সোঈ।
পৈঁড* পকড়ি জন নিরভয় হোই॥ (ভৈরূঁ)

"নীচ উচ্চ ও মধ্যম কেহ নাই, সবার মধ্যেই দেখিতেছি রামকে। হে দাদূ, সকলের মধ্যে তিনিই সত্য, এই পথ ধরিয়াই লোক হয় নির্ভয়।"

১৩

জহঁা দেখৌঁ তহঁ দূসর নাহিঁ।
সব ঘটি রাম সমানা মাহিঁ॥
জহঁা জাউঁ তহঁ সোঈ সাথ।
পূরি রহ্যা হরি ত্রিভুবন নাথ॥ (ভৈরূঁ)

"যেখানেই দেখি, দ্বিতীয় আর কিছু নাই; সকল ঘটেই রাম ভিতরে ভরপূর বিরাজমান। যেখানেই যাই সেখানেই তিনি আছেন সাথে সাথে; ত্রিভুবন-নাথ হরি ত্রিভুবন পূর্ণ করিয়া বিরাজিত।"

১৪

হম পায়া হম পায়া রে ভাঈ।
ভেখ বনাই ঐসী মনি আঈ॥
ভীতরকা য়হু ভেদ ন জানৈ।
কহৈ সুহাগনি ক্যূঁ মন মানৈ॥ (টৌড়ী)

ভেখ (বাহিরের সাজসজ্জা) বানাইতেই, "আমি পাইয়াছি, আমি পাইয়াছি রে ভাই", এইরূপ ভাব আসিয়া মনকে করে আবিষ্ট।

ভিতরের (প্রেমের) রহস্য তো জানে না কিছুই। সবাই বলে বলুক সৌভাগ্যবতী, মন তবু মানিবে কেন?"

---

* "পেড" পাঠও আছে, তাহার অর্থ "বৃক্ষ"। অর্থাৎ এই বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়াই লোক হয় নির্ভয়।

১৫

নিরংজন যূঁ রহৈ কাহূঁ লিপত ন হোই।
জল থল থাবর জংগমাঁ গুণ নহীঁ লাগৈ কোই॥
ধর অংবর লাগৈ নহীঁ নহিঁ লাগৈ সসী অরু সূর।
পানী পৱন লাগৈ নহীঁ জহাঁ তহাঁ ভরপূর॥
নিস বাসর লাগৈ নহীঁ নহিঁ লাগৈ সীতল ঘাম।
খুধ্যা তৃষা লাগৈ নহীঁ ঘটি ঘটি আতম রাম॥
মায়া মোহ লাগৈ নহীঁ নহিঁ লাগৈ কায়া জীৱ।
কাল করম লাগৈ নহীঁ পরগট মেরা পীৱ॥ (গুংড)

"নিরঞ্জন এমনই থাকেন, কিছুতেই তিনি হন না লিপ্ত। জল স্থল স্থাবর জঙ্গম কোনও গুণই তাঁহাতে লাগে না।

ধরিত্রী অম্বর তাঁহাতে লাগে না, না লাগে তাঁহাতে শশী আর সূর্য্য; জল পবন তাঁহাতে লাগে না, (তিনি) যেখানে সেখানে (সর্ব্বত্র) ভরপূর।

তাঁহাতে না লাগে দিন বা রাত্রি, না লাগে তাঁহাতে শীত বা গ্রীষ্ম, ক্ষুধা তৃষ্ণা লাগে না তাঁহাতে, ঘটে ঘটে বিরাজমান আত্মারাম।

তাঁহাতে লাগে না মায়া মোহ, না লাগে কায়া জীবন, কাল কর্ম্ম কিছুই লাগে না তাঁহাতে, প্রত্যক্ষ (বিরাজিত) আমার প্রিয়তম।"

১৬

জিহিঁ দিসি দেখৌঁ রহী হৈ রে।
আপ রহ্যা গিরি তরৱর ছাই॥ (মালৱ গৌড়)

"যে দিকেই চাই, দেখি তিনিই বিরাজিত, নিজেই তিনি আছেন গিরি তরুবর ছাইয়া।"

১৭

জুগি জুগি রাতে জুগি জুগি মাতে
জুগি জুগি সংগতি সার।

জুগি জুগি মেলা জুগি জুগি জীৱন
জুগি জুগি গ্যাঁন বিচার ॥* (মারূ)

“(নব নব ভাবে) যুগে যুগে রাতে (হয় অনুরক্ত), যুগে যুগে মাতে, যুগে যুগে সার সঙ্গতি (যোগ) ; যুগে যুগে মিলন, যুগে যুগে জীবন, যুগে যুগে জ্ঞানের উপলব্ধি !” [তাহাতেই আনন্দ, মুক্তি বা ফুরাইয়া যাওয়া নয়]

১৮

জব য়হু মৈঁ মৈঁ মেরী জাই।
তব দেখত বেগি মিলৈ রাম রাই ॥
দাদূ মৈঁ মৈঁ মেরী মেটি।
তব তূঁ জাণি রাম সৌঁ ভেটি ॥* (ভৈরূঁ)

“যখন এই “আমি আমি” “আমার আমার” ভাব যাইবে ঘুচিয়া, তখনই দেখিতে দেখিতে অবিলম্বে আসিয়া মিলিবেন পরমেশ্বর। হে দাদূ, “আমি আমি” “আমার আমার” ভাব মিটিলেই তুমি জানিবে রামের সঙ্গে হইল ভেট।”

১৯

পাহণ কী পূজা করৈ করি আতম ঘাতা।
নিরমল নয়ন ন আৱই মরণ দিসি জাতা ॥
পূজৈঁ দেব দিহাড়িয়া মহামাঈ মানৈঁ।
পরগট দেব নিরংজনাঁ তাকী সেৱ ন জানৈঁ ॥ (রামকলী)

“আত্মাকে মারিয়া পাষাণকে করে পূজা, নির্ম্মল [দেবতা] নয়ন-পথে আসেন না, [এমন করিয়াই] যাইতেছে মরণের দিকে।

দেবতা ও দেবালয়কে করে পূজা, মহামায়াকে করে মানত। প্রত্যক্ষ যে দেব নিরঞ্জন সুধু তাঁহারই জানে না সেবা !” *

---

* রামকলী ১৯৬ শব্দেও ইহা আছে। কবীরের বাণীতেও আছে। উপক্রমণিকা ১০৩ পৃষ্ঠায় ইহার একটি পংক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে।

২০

ধরতী অংবর তৈঁ ধর্‌য়্যা পানী পরন অপার।
চংদ সূর দীপক রচ্যা রৈন দিৱস বিস্তার॥ *

“ধরিত্রী অম্বর, অপার জল ও পবন তুমিই রাখিয়াছ ধরিয়া। রজনী দিবস-বিস্তার, চন্দ্র সূর্য্য প্রদীপ তোমারই রচনা।”

২১

ভাঈ রে তব ক্যা কথিসি গিয়াঁনাঁ।
জব দূসর নাহীঁ আনাঁ॥ (অড়ানা)

“ভাইরে তবে আর কি বকিস্ জ্ঞানের কথা, যখন দোসর আর নাই অন্য কিছুই [অর্থাৎ তিনি ছাড়া অপর তত্ত্ব আর কিছুই নাই]?”

২২

কায়া মাহৈঁ হৈ আকাস।
কায়া মাহৈঁ ধরতী পাস॥
কায়া মাহৈঁ চারূঁ বেদ।
কায়া মাহৈঁ পায়া ভেদ॥
কায়া মাহৈঁ লে অৱতার।
কায়া মাহৈঁ বারংবার॥
কায়া মাহৈঁ আদি অনংত।
কায়া মাহৈঁ হৈ ভগৱংত॥
কায়া মাহৈঁ সাগর সাত।
কায়া মাহৈঁ অৱিগত নাথ॥
কায়া মাহৈঁ নদিয়া নীর।
কায়া মাহৈঁ গহর গঁভীর॥

---

* ত্রিপাঠী রাগ ধনাশ্রী ৪২৬ শব্দেও ইহা আছে। দ্বিবেদী মহাশয়ের গ্রন্থে ইহা ভৈরো ১৫ শব্দ।

কায়া মাহৈঁ খেলৈ প্রাণ।
কায়া মাহৈঁ পদ নিরৱাণ॥
কায়া মাহৈঁ সেৱা করৈ।
কায়া মাহৈঁ নীঝর ঝরৈ॥
কায়া মাহৈঁ কলা অনেক।
কায়া মাহৈঁ করতা এক॥
কায়া মাহৈঁ লাগৈ রংগ।
কায়া মাহৈঁ সাঈঁ সংগ॥
কায়া মাহৈঁ কৱঁল প্রকাস।
কায়া মাহৈঁ মধুকর বাস॥
কায়া মাহৈঁ হৈ দীদার।
কায়া মাহৈঁ দেখণহার॥
কায়া মহঁ করতা রহৈ সো নিধি জানৌ নাহিঁ।
মাহৈঁ সতগুরু পাইয়ে সব কুছ কায়া মাহিঁ॥ *

"কায়ার মধ্যেই আছে আকাশ, কায়ার মধ্যেই ধরিত্রীর সঙ্গ। কায়ার মধ্যেই চারি বেদ, কায়ার মধ্যেই পাইলাম রহস্যের মর্ম্ম। কায়ার মধ্যেই নেয় অবতার, কায়ার মধ্যেই [নব নব জনম] বারম্বার। কায়ার মধ্যেই আদি অনন্ত, কায়ার মধ্যেই ভগবান। কায়ার মধ্যেই সাগর সাত, কায়ার মধ্যেই অবিজ্ঞাত নাথ। কায়ার মধ্যেই নদীর নীর, কায়ার মধ্যেই গভীর গম্ভীর।

কায়ার মধ্যেই খেলে প্রাণ, কায়ার মধ্যেই পদ নির্বাণ। কায়ার মধ্যেই করে সেবা, কায়ার মধ্যেই ঝরে নির্ঝর। কায়ার মধ্যেই কলা অনেক, কায়ার মধ্যেই করতা এক। কায়ার মধ্যেই লাগে রঙ্গ। কায়ার মধ্যেই স্বামীর সঙ্গ। কায়ার মাঝেই কমল প্রকাশ। কায়ার মাঝেই মধুকর বাস। কায়ার মধ্যেই রূপের প্রকাশ, কায়ার মধ্যেই বিরাজিত দ্রষ্টা।

---

* "কায়াবেলী" আরও বিস্তৃত রচনার আকারে লিখিত আছে। তাহাতে প্রায়ই পুনরুক্তি। এই সারটুকুই ভক্তেরা সচরাচর ব্যবহার করেন।

কায়ার মধ্যেই আছেন কর্ত্তা, সেই নিধিকেই জান না। অন্তরেই সদ্‌গুরুকে পাইলে সব কিছু (মিলিবে) কায়ারই মধ্যে।”

২৩

অংতরি পীব্র সৌঁ পর্চা নাহীঁ।
ভঈ সুহাগণি লোগন মাহীঁ॥
দাদূ সুহাগণি ঐসে কোঈ।
আপা মেটি রাম রত হোই॥ (রাগ টোড়ী)

“অন্তরে তো নাই প্রিয়তমের সঙ্গে পরিচয়, সংসারের লোকের কাছে গিয়া তিনি বনিলেন স্বামী-সৌভাগ্যবতী!

দাদূ কহেন, এমন সৌভাগ্যবতী কেহ কি আছেন যিনি অহমিকা মিটাইয়া ভগবানে হইয়াছেন রত?”

২৪

সংপতি বিপতি নহীঁ মৈঁ মেরা হরিখ সোক দউ নাহীঁ।
সরব্রর কব্র্ল রহৈ জল জৈসে বৈঠা হরিপদ মাহীঁ॥
(রাগ সারংগ)

“(সাধকের কাছে) সম্পত্তি বিপত্তি নাই, “আমি” ও “আমার” নাই, হর্ষ শোক এই দুইই নাই। কমল যেমন সরোবরে জলের মধ্যে থাকে, তেমন করিয়া হরিপদের মধ্যে সে আছে বসিয়া।”

২৫

বৌরী তূঁ বার বার বৌরাণী।
তন মন সব সরীর ন সৌপ্যৌ সীস নব্রাই ন ঠাড়ী।
এক রস প্রীতি রহী নহীঁ কবহূঁ প্রেম উমংগ ন বাঢ়ী॥
প্রীতম অপনৌ পরম সনেহী নৈন নিরখি ন অঘানীঁ।
নিস বাসরি ন আনি উর অংতরি পরম পূজ্য নহি জানীঁ॥
(গূজরী বা দেব্রগন্ধার)

"পাগলিনী, তুই বার বার করিলি শুধু পাগলামি। তনু মন সব শরীর (তাঁহার জন্য) সমর্পণ তো করিস্ নাই, তাঁর কাছে মাথা নত করিয়া খাড়া তো থাকিস্ নাই। এক-রস প্রীতি তো কখনও হয় নাই, উচ্ছ্বসিত হইয়া কখনও প্রেম হয় নাই উদ্বেল।

প্রিয়তম যে তোর পরম স্নেহী, নয়ন ভরিয়া তো তাঁকে কখনই দেখিস্ নাই। নিশিদিন তাঁহাকে তো আনিস্ই নাই হৃদয়ের মধ্যে। পরম পূজ্যকেই তো তুই জানিস্ নাই।"

২৬

সবগুণ রহিতা সকল বিয়াপী বিন ইংদ্রী রস ভোগী।
দাদূ ঐসা গুরু হমারা আপ নিরংজন জোগী॥
(রাগ রামকলী)

"দাদূ কহেন, আমার এমন গুরু যে তিনি নিরঞ্জন যোগী; তিনি সর্ব্বগুণ-রহিত, সর্ব্বব্যাপী, ইন্দ্রিয় বিনাই তিনি সর্ব্ব রস ভোগী।"

২৭

হরি মারগ মাহেঁ মরণা
তিল পীছে পাৱ ন ধরণা॥
অব আগৈ হোই সো হোই।
পীছেঁ সোচ ন করনা কোই॥ (রাগ রামকলী)

"হরি-পথের মাঝেই মরিও, তবু এক তিল পিছে সরাইও না পদ। ভবিষ্যতে যাহা হইবার তাহা হইবে, পরেও কোনো করিও না অনুতাপ।"

২৮

প্রেম বিনা রস ফীকা লাগৈ মীঠা মধুর ন হোঈ।
সকল সিরোমণি সব থৈঁ নীকা কঁড়ৱা লাগৈ সোঈ॥
জব লগ প্রীতি প্রেম রস নাহীঁ ত্রিখা বিনা জল ঐসা।
সব তৈঁ সুংদর এক অমীরস হোই হলাহল জৈসা॥

সুন্দর সাঈঁ খরা পিয়ারা নেহ নৱা নিত হোৱৈ।
দাদূ মেরা তব মন মানৈ সহজ সদা সুখ জোৱৈ ॥*

"প্রেম বিনা সেই রস লাগে নীরস, মিষ্ট-মধুর তো লাগে না। সকল শিরোমণি সব হইতে শ্রেষ্ঠ যে রস তাহাও লাগে কটু।

যে পর্য্যন্ত প্রীতি ও প্রেমরস না হয় সে পর্য্যন্ত সেই রস লাগে বিনা-তৃষ্ণার জলের মত (নীরস), সব হইতে সুন্দর (সুরস) যে এক অমৃতরস তাহাও তখন লাগে হলাহলের মত।

সুন্দর স্বামী যদি সত্য সত্যই হন প্রিয় তবে প্রেমও হয় নিত্য নূতন। হে দাদূ, তবেই আমার মন মানে, যদি সদাই দেখিতে পাওয়া যায় সেই সহজ আনন্দ।"

২৯

হস্ত কৱঁলকী ছায়া রাখৈ
কাহূঁ থৈঁ ন ডরৈ। (রাগ নটনারায়ণ)

"হস্তকমলের ছায়ায় যদি রাখ তবে কোনো স্থান বা লোক হইতেই নাই ডর।"

৩০

পূজা পাতী দেৱী দেৱল সব দেখৌঁ তুম্হ মাহীঁ।
মোঁ কৌ ওট আপনী দীজৈ চরণ কৱঁলকী ছাহীঁ ॥
(রাগ সোরঠ)

"পূজা পাতি, দেবী দেবালয়, সবই দেখিতেছি তোমার মধ্যে। আমাকে দাও তোমার আশ্রয়, রাখ তোমার চরণ কমলের ছায়াতে।"

৩১

জব মৈঁ সাচেকী সুধি পাই।
তব থৈঁ দৃষ্টি ঔর নহি আৱৈ
দেখত হূঁ সুখদাঈ ॥

---

* রাগ ধনাশ্রী ৪২৮ (ত্রিপাঠী) শব্দেও ইহা আছে। রাগ ভৈরো ১৪ (দ্বিবেদী)।

তা দিন থৈঁ তন তাপ ন ব্যাপৈ
সুখ দুখ সংগ ন জাউঁ।
পারন পীৱ পরসি পদ লীন্হা
আনঁদ ভরি হেঁৌ গাউঁ॥
সব সেঁৌ সংগ নহীঁ পুনি মেরে
অরস পরস কুছ নাঁহী।
এক অনংত সোঈ সংগী মেরে
নিরখত হেঁৌ নিজ মাঁহীঁ॥ *

"যখন আমি সত্যের সন্ধান পাইলাম, তখন হইতে দৃষ্টিতে আর কিছুই আসে না। শুধু দেখিতেছি (সর্ব্বত্র) আনন্দময়।

সে দিন হইতে তনুকে কোনো তাপই করিতে পারে না তপ্ত; সুখদুঃখের সঙ্গেও আর যাই না। প্রিয়তমের পাবন পদ পরশ করিয়া লইয়া আনন্দে ভরপূর হইয়া আমি করি গান।

আর আমার সবার সঙ্গে নাই সঙ্গ, নাই কিছুই মাখামাখি। এক অনন্ত, তিনিই আমার সঙ্গী; তাঁহাকেই নিরন্তর দেখিতেছি আপন অন্তরে।"

৩২

তুম্হ বিচ অংতর জিনি পড়ে মাধৱ
ভাৱৈ তন ধন লেহু।
ভাৱৈ সরগ নরক রসাতল
ভাৱৈ করৱত দেহু॥
ভাৱৈ বিপতি দেহু দুখ সংকট
ভাৱৈ সঁপতি সুখ সরীর।
ভাৱৈ ঘর বন রাৱ রংক করি
ভাৱৈ সাগর তীর।

---

* রাগ বিলাৱল, ৩৪৫ পদেও ইহা আছে। মীরা বাইর পদেও ঠিক এইরূপ একটি পদ আছে।

ভাৱৈ বংধ মুকুত করি মাধৱ
ভাৱৈ ত্রিভুৱন সার।
ভাৱৈ সকল দোষ ধরি মাধৱ
ভাৱৈ সকল নিৱার॥ * *

"(আমার ও) তোমার মধ্যে যেন কোন না আসে ব্যবধান ; হে মাধব, চাও তো ধন জন আমার সব যাও লইয়া। চাই আমাকে দাও স্বর্গ, চাই দাও নরক, চাই দাও রসাতল ; চাই করপত্রে কর আমাকে দ্বিখণ্ডিত।

চাই দাও বিপত্তি দুঃখ সঙ্কট, চাই দাও সম্পত্তি ও শরীরের সুখ ; চাই দাও ঘর বা বন, চাই কর রাজা বা কাঙ্গাল, চাই পাঠাও আমায় সাগর তীরে।

চাই কর বদ্ধ বা মুক্ত, হে মাধব, চাই কর ত্রিভুবনসার ; চাই সকল দোষ ধর, হে মাধব, চাই সকল অপরাধ কর ক্ষমা।"

৩৩

বৈকুণ্ঠ মুকতি স্রগ ক্যা কীজৈ সকল ভুৱন নহিঁ ভাৱৈ।
লোক অনংত অভয় ক্যা কীজৈ জে ঘরি কংত ন আৱৈ॥*

"যদি ঘরে কান্তই না আসিলেন তবে এমন বৈকুণ্ঠ দিয়াই বা করিবে কি, মুক্তি বা স্বর্গ দিয়াই বা করিবে কি ? সকল ভুবনও তবে আর নহে প্রার্থনীয়। লোক অনন্ত বা অভয় দিয়াই বা তবে কি কাজ ?"

৩৪

সহজৈ হী সো আৱা
হরি আৱত হী সচু পাৱা
সহজৈ হী সো জাঁনাঁ।
হরি জাঁনত হী মন মাঁনাঁ॥

---

* * সুহৌ, ৩৫৫ শব্দেও ইহা আছে। উপক্রমণিকার ১১৭ পৃষ্ঠায় ইহার খণ্ডিত অংশ কতকটা দেওয়া হইয়াছে।

* ধনাশ্রী ৪২১ (ত্রিপাঠি) শব্দেও ইহা আছে। ভৈরো ৭ (দ্বিবেদী)।

প্রেম ভগতি জিন্‌হ জাঁনী ।
সো কাহে ভরমৈঁ প্রাণী ॥ (রাগ সোরঠ)

“সহজেই তিনি আসিলেন, হরি আসিতেই পাইলাম সত্যকে। সহজেই তিনি জানিলেন, হরি জানিতেই মন মানিল। প্রেমভক্তি যে জানিল, সে প্রাণী আর কেন বেড়ায় বৃথা ভ্রমিয়া ?”

৩৫

হরি রংগ কদে ন উতরৈ দিন দিন হোই সুরংগ ।
নিত্য নরৌঁ নিররান হৈ কদে ন হোই লয় ভংগ ॥
সাচৌ রংগ সহজৈ মিল্যৌ সুংদর রংগ অপার ।
ভাগ বিনা কূঁ্য পাইয়ে সব রংগ মাহৈঁ সার ॥ (ধনাশ্রী)

“হরি রঙ্গ কখনও যায় না মিটিয়া, দিন দিন হইতে থাকে সে সু-রঙ্গ। নিত্যই নূতন নূতন হয় নির্ব্বাণ, কখনই হয় না লয়-ভঙ্গ।

সত্য রঙ্গের সঙ্গে সহজেই হও মিলিত, সুন্দর অপার সেই রঙ্গ। সকল রঙ্গের মধ্যে যে রঙ্গ সার, বিনা-ভাগ্যে তাহাকে পাইবে কেমন করিয়া ?”

৩৬

অপনা রূপ আপ নহিঁ জানৈঁ
দেখৈ দরপণ মাহিঁ ॥
আপ অপনকা রসমেঁ বৌরা
দেখি আপণী ঝাঁহীঁ ॥ (অসাররী)

“আপন রূপ আপনি তো জানে না, দেখিতে হয় দর্পণের মধ্যে। আপনি আপনারই প্রতিবিম্ব দেখিয়া নিজের রসেই নিজে পাগল।”

৩৭

কেঁ্যা করি য়হ জগ রচ্যৌ গোসাঈঁ ।
তেরে কৌঁন বিনোদ মন মাহীঁ ॥
কৈ তুম্‌হ আপা পরগট করনা ।
কৈ তুমহ রচিলে মন নহিঁ মানা ॥

কৈ য়হু রচিলে খেল দিখাৱৈ।
কৈ য়হু তুম্হকো খেলহী ভাৱৈ॥
কৈ য়হু তুম্‌কো খেল পিয়ারা।
কৈ য়হু ভাৱ কীন্হ পসারা॥
যহু সব দাদূ অকথ কহানী
মরম জানে সোই সমঝৈ বাণী॥ *

"হে গোঁসাই, কেন এই জগৎ করিলে রচনা? কোন্ আনন্দ উচ্ছসিল তোমার মনের মধ্যে?

তোমার কি নিজেকেই প্রকাশ করার ইচ্ছা? মন মানিল না তাই কি করিলে এই রচনা?

লীলা দেখাইবার জন্যই কি রচিলে এই বিশ্ব? তোমার মন কি এই খেলাই চায়?

এই খেলাই কি তোমার প্রিয়? এই খেলাতে তুমি কি আপন ভাবকেই করিয়াছ প্রসার?

হে দাদূ, এই সব রহস্য বুঝান অসম্ভব, যে মরম জানে সে-ই শুধু বোঝে এই কথা।"

৩৮

রস মাহৈঁ রস রাতা।
রস মাহৈঁ রস মাতা॥
অম্রত পীয়া।
নূর মাহৈঁ নূর লীয়া॥

"রসের মধ্যেই রসে হইলাম অনুরক্ত, রসের মধ্যেই হইলাম রসে মত্ত। অমৃত করিলাম পান, জ্যোতির মধ্যেই লইলাম জ্যোতি!"

---

* আসাবরী রাগের ২৩৫ শব্দের সঙ্গে ইহার কতকটা মিল আছে। উপক্রমণিকা ১৯৩ পৃষ্ঠায় ইহার প্রথম দুই পংক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে।

৩৭

(পথের গান)

সাথী সাৱধান হোই রহিয়ে।
পলক মাহিঁ পরমেস্থর জানৈঁ
কহা হোই কহা কাহিয়ে॥
বাবা বাট ঘাট কুছ সমঝি ন আৱৈ
দূরি গৱন হম জাঁনাঁ।
পরদেশী পংথি চলৈ অকেলা
ঔঘট ঘাট পয়াঁনাঁ॥
বাবা সংগ ন সাথী কোই নহিঁ তেরা
য়হ সব হাট পসারা।
তরৱর পংখী সবৈ সিধায়ে
তেরা কৌন গৱাঁরা॥
বাবা সবৈ বট্টাউ পংথি সিরানাঁ
অস্থির নাহীঁ কোই।
অংতি কাল কো আগেঁ পীছেঁ
বিছুরত বার ন হোঈ।
বাবা কাচী কায়া কৌণ ভরোসা
রৈনি গঈ ক্যা সোৱৈ।
দাদূ সংবল সুকরিত লীজৈ
সাবধান কিন হোৱৈ॥

"সাথী, থাক সাবধান হইয়া; পরমেশ্বরই জানেন, পলকের মধ্যে কি হয় কে বলিবে ?

বাবা, বাট ঘাট কিছুই তো যায় না বুঝা, দূরে আমার করিতে হইবে গমন ; পরদেশী, একেলা চলিতেছি পথে, ঘাটে অঘাটে করিতেছি প্রয়াণ।

বাবা, সঙ্গী সাথী কেহই তো তোর নাই, এই সবই তো হাটের বিস্তার। তরুবরের পাখী সবাই গিয়াছে চলিয়া, ওরে মূর্খ তোর আর রহিল কে?

বাবা, সব পথিকই দূরে মিলাইয়া গিয়াছে পথে, কেহই নহে স্থির। অন্তকালে সবাই আগে পিছে, বিচ্ছিন্ন হইতে একটুও হয় না বিলম্ব।

বাবা, কাঁচা কায়ার আর কি ভরসা? রাত্রি গিয়াছে, বৃথা এখন আর আছ কেন শুইয়া? হে দাদূ,আপন সুকৃতই কর সম্বল, এখনও কেন হও না সাবধান?"

পরিশিষ্ট

সহজ ও "শূন্য"

(উদ্ধৃতাংশ)

উপক্রমণিকায় পরিশিষ্টে "শূন্য ও সহজ" সম্বন্ধে আমার নিবন্ধটি দেখিয়া কেহ কেহ মনে করিয়াছেন যে শূন্য ও সহজ সম্বন্ধে দাদূর সব কথাই বুঝি বলা হইয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ তাহা হয় নাই। তবে সে বিষয়ে দাদূর মত কি ছিল, মোটামুটি তাহার একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা হইয়াছে মাত্র।

শূন্য ও সহজ সম্বন্ধে দাদূর বহু স্থানে বহু বাণী আছে। তাহার কিছু কিছু এই অংশে দেখাইতে চাই। ইহা ছাড়াও এই বিষয়ে তাঁহার বহু বাণী রহিয়া গিয়াছে। তবু ইহা দ্বারাই "শূন্য ও সহজ" সম্বন্ধে দাদূর কি মত ছিল তাহা মোটামুটি বুঝা যাইবে।

এই অংশে উদ্ধৃত বাণীগুলি অধিকাংশই দাদূর শব্দ বা সঙ্গীত ভাগ হইতে উদ্ধৃত। সাধারণ বাণীও দুই একটা আছে। সমস্তই দাদূর অংগবন্ধ, সংগ্রহ হইতে গৃহীত।

সহজ কথাটি ধর্ম্মের সাধনায় খুবই বড় কথা। কারণ, সাধনাতে সহজ [স্বাভাবিক] হওয়ার চেয়ে আর কি বড় লক্ষ্য হইতে পারে? রামানন্দ কবীর নানক প্রভৃতি সকলেই সাধনাতে সহজ হইতেই চাহিয়াছেন। তবে দুর্ভাগ্য-ক্রমে মানুষ, আপনার নির্ম্মল পবিত্র মানবধর্ম্ম ভুলিয়া, আপনাকে পশুধর্ম্মী মনে করিয়া, সেই ভাবের সহজকেই মনে করিয়াছে সহজ। বিশেষ করিয়া এই দুর্গতি ঘটিয়াছে বাংলাদেশে। কাজেই এই দেশে "সহজ" ও "সহজিয়া" বলিতে সকলেরই চিত্ত ওঠে বিমুখ হইয়া। ইহা বড়ই দুর্ভাগ্যের কথা যে শুধু প্রয়োগ ও ব্যবহারের দোষে এত বড় একটি সত্য আমাদের ধর্ম্ম-সাধনা হইতে হইবে নির্ব্বাসিত। এত বড় ক্ষতি সাধনার পক্ষে অসহনীয়। যেমন করিয়া হউক এই ভ্রান্তি দূর করাই চাই।

সহজ বলিতে কেহ বা বুঝেন ইন্দ্রিয়োপভোগের স্রোতে আপনাকে অবাধ-ভাবে ছাড়িয়া দেওয়া, অথবা নিশ্চেষ্টভাবে আপনাকে কোনো একটা স্রোতে

ভাসাইয়া দেওয়া। ইহা হইল ঘোর তামসিকতা। সত্বগুণের দ্বারা দীপ্ত হইতে হইবে ও তাহাতে জীবনের সর্ব্বাংশ দীপ্ত করিতে হইবে। জীবনের অল্প অংশই আমাদের জানা, অধিকাংশই অজানা।

কেহ বা এই নিশ্চেষ্টতার দোহাই দেন ভগবৎকৃপার বুলী আওড়াইয়া। কিন্তু যাবৎ আমরা কামনা বাসনার পাশব লোকে আছি তাবৎ সে দোহাই পাড়িলে চলিবে না। ততদিন ভিতরে বাহিরে আপনাকে হইবে চালাইতে। আত্ম-কল্যাণ ও সর্ব্ব-কল্যাণের দ্বারা আপনাকে করিতে হইবে নিয়মিত। যখন এই কামনার পশুবন্ধন যাইবে ঘুচিয়া, যখন জীব হইবে শিবভাবাপন্ন, তখনই আপনাকে সেই বিশ্বচরাচরব্যাপী ভাগবত সহজ ধারায় ছাড়িয়া দেওয়া চলে। কাষ্ঠ আপনাকে ধারায় ভাসাইয়া চলে দেখিয়া, লৌহ যদি আপনাকে লঘু না করিয়াই জলে ভাসায় তবে তার নাম আত্মঘাত বই আর কি?

সেই সহজ অবস্থায় পৌছিলে সাধনা স্বধু ধর্ম্মে কর্ম্মে বা আচারে অনুষ্ঠানে বদ্ধ রহে না। তখন সাংসারিক জীবনযাত্রা হইতেই একেবারে সাধনার করিতে হয় আরম্ভ। তখন আমাদের জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে নিরন্তর চলিবে সহজ সাধনা, তার কোথাও তখন থাকিবে না টানাটানি। সাধনার জন্য আমাদের জীবনযাত্রাকেও করিতে হইবে সহজ। জীবন যাত্রা যদি সহজ করিতে হয় তবে, "কিছুই কৃত্রিম-ভাবে আটকাইয়া সঞ্চয় করিয়া ধরিয়া রাখা চলিবে না, মিথ্যা ও ঝুটা চলিবে না, যাহা কিছু আসে তাহা সকলকে বিতরণ করিয়া ও সঙ্গে সঙ্গে নিজে সম্ভোগ করিয়া হইবে চলিতে। পূর্ণ নদীর প্রবাহের মত প্রাপ্ত সম্পদকে করিতে হইবে ব্যবহার, কারণ ধারার মত যাহা আসে ও যায়, তাহাই মায়া।"

রোক ন রাখৈ ঝূঠ ন ভাখৈ
দাদূ খরচৈ খায়।
নদী পূর পরৱাহ জ্যোঁ
মায়া আবৈ জাই ॥

(মায়া অংগ, ১০৫)

মায়ার ধর্ম্মই হইল নিরন্তর আসা যাওয়া। আসলে মায়ার কোনো দোষ নাই। তাহাকে স্থায়ী নিত্য বস্তু ভাবিয়া ধরিয়া রাখিতে গেলেই তাহা হইয়া

যায় ঝুটা। তাহাকে সঞ্চয় না করিয়া ব্যবহার কর, দেখিবে তাহার কোনো দোষ নাই। দোষ তাহারই, যে লোভবশতঃ তাহাকে করিতে গেল সঞ্চয়।

মানুষের সঙ্গে ব্যবহারেও এই সহজকেই করিতে হইবে সাধনা। "কাহারও সঙ্গে বাদ বিবাদে কাজ নাই, জগতের মধ্যে থাকিয়াও থাকিতে হইবে নির্লিপ্ত। আপনার মধ্যেই আত্মবিচার করিয়া স্বভাবে সমদৃষ্টি সাধনা করিয়া থাকিতে হইবে সহজের মধ্যে।"

বাদ বিৱাদ কাহূ সৌঁ নাহীঁ
মাহিঁ জগত থৈঁ ন্যারা;
সমদৃষ্টি সুভাই সহজ মৈঁ
আপহি আপ বিচারা॥
(রাগ গৌড়ী, শব্দ ৬৬)

এই সমদৃষ্টি না হইলে ব্যর্থ বাদ বিবাদও মেটে না, নির্লিপ্ত হওয়াও চলে না। আত্মার মধ্যে ঐক্য-বোধের উপলব্ধি হইলেই ঘটে বিশ্বে সমদৃষ্টি। প্রথমে অন্তরে ঐক্যকে উপলব্ধি করিতে হয়। পরে জন্মে বিশ্বময় ঐক্য-বোধ ও সমদৃষ্টি। অন্তরের মধ্যেই সহজ স্বরূপ, সেই অনুপম তত্ত্বের সৌন্দর্য্য দেখিলে মন যায় মুগ্ধ হইয়া। তাই দাদূ বলেন, "অন্তরের নয়নে অন্তরের মধ্যেই সদাই নিরখিতেছি সেই সহজ স্বরূপ। দেখিতেই মন গেল মুগ্ধ হইয়া, অনুপম সেই তত্ত্ব। সেখানে ভগবান উপবিষ্ট, সেখানে সেবক স্বামীর সঙ্গেই বিরাজিত। অন্তরের মধ্যেই দেখিলাম ভয়ের অতীত সেই ধাম শোভমান, সেখানে সেবক-স্বামী যোগযুক্ত। অনেক যতন করিয়া আমি সেখানে পাইলাম অন্তর্য্যামীকে।"

মধি নৈন নিরখৌঁ সদা সো সহজ সরূপ।
দেখত হী মন মোহিয়া, হৈ সো তত্ত অনূপ॥

* * * *

সেৱগ স্বামী সংগি রহৈ বৈঠে ভগবানাঁ॥
নির্ভৈ স্থান সুহাত সো তহঁ সেৱগ স্বামী।
অনেক জতন করি পাইয়া মৈঁ অন্তরজামী॥
(রাগ রামকলী, ২০৫ শব্দ)

এই উপলব্ধি পাইতে হইলে চাই শুধু প্রেমের ঐকান্তিকতা। এখানে বাহ্য ক্রিয়া-কর্ম্ম, সাধনা-সিদ্ধির বা উপায়ের কোনো সার্থকতা নাই। তাই দাদূ বলেন, "আমার তপও নাই, ইন্দ্রিয় নিগ্রহও নাই, তীর্থ পর্য্যটনও আমার নাই। দেবালয়, পূজা এসবও আমার নাই, ধ্যান ধারণাও কিছু আমার নাই। যোগ যুক্তিও কিছু আমার নাই, না আমি কিছু জানি সাধনা। দাদূ এক বিগলিত রত হইয়া আছে ভগবানে, ইহাতেই হে প্রাণ, কর প্রত্যয়।" কারণ "সুধু হরিই আমার একমাত্র অবলম্বন, তিনিই আমার তারণ তিনিই আমার তরণ।"

না তপ মেরে ইংদ্রী নিগ্রহ না কুছ তীরথ ফিরণাঁ।
দেৱল পূজা মেরে নাহীঁ ধ্যান কছু নহিঁ ধরণাঁ॥
জোগ জুগতি কছূ নহিঁ মেরে না মৈঁ সাধন জানৌঁ।
দাদূ য়েক গলিত গোবিংদ সৌঁ ইহি বিধি প্রাণ পতীজৈ॥
"হরি কেৱল এক অধারা।
সোই তারণ তিরণ হমারা॥"

(রাগ আসাররী, ২১৬ শব্দ)

বাহ্য ক্রিয়া কর্ম্মে আচারে অনুষ্ঠানে তো ইহা পাইবার কথা নহে। তাই দাদূ কহিলেন, "ঘরের মধ্যেই পাইলাম ঘর (আশ্রয়), তাহার মধ্যেই তো সমাহিত হইয়াছে সহজ তত্ত্ব, সদ্‌গুরুই তাহার সন্ধান দিলেন বাতাইয়া।

সেই অন্তরের সাধনাতেই সবাই আসিল ফিরিয়া, তিনি আপনিই দেখাইলেন আপনাকে। মহলের কপাট খুলিয়া দিয়া তিনিই দেখাইয়া দিলেন স্থির অচঞ্চল স্থান।

ইহা দেখিতেই ভয় ও ভেদ আর সকল ভরম পলাইল দূরে, সেই সত্যেই গিয়া মন হইল যুক্ত। কায়ার ও স্থূলের অতীত ধামে যেখানে জীব যায় সেখানেই সেই 'সহজ' সমাহিত।

এই সহজ সদাই স্থির নিশ্চল, ইহা কখনই চঞ্চল নয়, এই সহজই বিশ্বনিখিল পূর্ণ করিয়া। ইহাতেই আমার মন হইয়া রহিল যুক্ত, ইহার অতিরিক্ত আর কিছুই (দ্বৈততত্ত্ব) নাই।

আদি অনন্ত পাইলাম সেই ঘর, এখন মন আর যাইতে চায় না অন্যত্র। হে দাদূ সেই এক রঙ্গেই লাগিল রঙ্গ, তাহাতেই রহিল মন সমাহিত হইয়া।”

ভাঙ্গী রে ঘর হী মেঁ ঘর পায়া,
সহজ সমাই রহ্যো তা মাহীঁ, সতগুর খোজ বতায়া॥
তা ঘর কাজি সবৈ ফিরি আয়া, আপৈ আপ লখায়া।
খোলি কপাট মহল কে দীন্হেঁ, থির অস্থান দিখায়া॥
ভয় ঔ ভেদ ভর্ম সব ভাগা, সাচ সোই মন লাগা।
প্যংড পরে জহঁা জিব্র জাবৈ, তামৈঁ সহজ সমায়া॥
নিহচল সদা চলৈ নহীঁ কবহূঁ দেখ্যা সব মৈঁ সোঈ।
তাহী সৌঁ মেরা মন লাগা, ঔর ন দূজা কোঈ॥
আদি অনংত সোঈ ঘর পায়া, ইব মন অনত ন জাঈ।
দাদূ এক রংগৈ রংগ লাগা, তামৈঁ রহ্যা সমাঈ॥
(রাগ গৌড়ী, ৬৮ শব্দ)

অন্তরের মধ্যে যে ঐক্য যে যোগ তাহাতেই পরমানন্দ। এই উপলব্ধিই তো যথার্থ জ্ঞান, তাই দাদূ বলিতেছেন,

“এমন জ্ঞানের কথাই বল, মন জ্ঞানী। এই অন্তরের মধ্যেই তো বিরাজমান সহজ আনন্দ।”

ঐসা জ্ঞান কথৌ মন জ্ঞানী।
ইহি ঘরি হোই সহজ সুখ জানী॥
(রাগ গৌড়ী, ৭০ শব্দ)

এখানে ঘটের মধ্যে কায়াযোগের কথাও আছে। বাহিরে যেমন গঙ্গা যমুনা সরস্বতীর যোগে ত্রিবেণী-সঙ্গম, ভিতরেও তেমনি ঈড়া পিঙ্গলা সুষুম্নার যোগে ত্রিবেণী যোগ। কিন্তু সে সব কথা সাধারণ সকলের জন্য নয়, বিশেষজ্ঞেরই তাহাতে আনন্দ। তাই তাহা আর এখানে উল্লেখ করিলাম না।

সকলের পক্ষে সমান ভাবে গ্রহণীয় একটি ত্রিবেণীর মর্ম্ম দাদূ বলিতেছেন।

"সহজ আত্ম-সমর্পণ (self-surrender) স্মরণ ও সেবা এই তিনের যোগেই এই ত্রিবেণী। এই ত্রিবেণীর সঙ্গম কূলেই করিতে হয় স্নান। ইহাই তো সহজ তীর্থ।"

সহজ সমর্পণ সুমিরণ সেৱা
তিরবেণী তট সংগম সপরা ॥

রাগ গৌড়ী, ৭২।

এই যুক্ত ধারার সহজ ত্রিবেণীতে স্নানেই মুক্তি। কিন্তু এই ত্রিবেণী যে অন্তরের মধ্যে, বাহিরে নয়। তাই দাদূ বলেন,—

"কায়ার অন্তরেই পাইলাম ত্রিকুটীর তীর; সহজেই তিনি আপনাকে করিলেন প্রকাশ, সকল শরীরে রহিলেন তিনি ব্যাপ্ত হইয়া।

কায়ার অন্তরেই উপলব্ধি করিলাম সেই নিরন্তর নিরাধার, সহজেই তিনি আপনাকে করিলেন প্রকাশ, এমনই তিনি সমর্থ সার।

কায়ার অন্তরেই প্রত্যক্ষ করিলাম তিনি অসীম অনাহত বাজাইতেছেন বেণু; শূন্য মণ্ডলে যাইয়া সহজেই তিনি আপনাকে করিলেন প্রকাশ।

কায়ার অন্তরেই দেখিলাম সকল দেবগণের দেব; সহজেই সেই দেবদেব আপনাকে করিলেন প্রকাশ, এমনই তিনি অলখ অনির্ব্বচনীয়।"

কায়া অংতরি পাইয়া ত্রিকুটী কেরে তীর।
সহজৈঁ আপ লখাইয়া ব্যাপ্যা সকল শরীর ॥
কায়া অংতরি পাইয়া নিরংতর নিরধার।
সহজৈঁ আপ লখাইয়া ঐসা সম্রথ সার ॥
কায়া অংতরি পাইয়া অনহদ বেন বজাই।
সহজৈঁ আপ লখাইয়া সুন্য মংডল মৈঁ জাই ॥
কায়া অংতরি পাইয়া সব দেৱন কা দেৱ।
সহজৈঁ আপ লখাইয়া ঐসা অলখ অভেৱ ॥

পরচা অংগ, ১০-১৩।

অন্তরে মধ্যে প্রবেশ করিয়া এই লীলারস সম্ভোগ করিতে হইলে অহমিকাকে করিতে হইবে ক্ষয়। অহমিকাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিলে সেই সহজ মূলাধারকে পাওয়া কঠিন। দাদূ বলেন,—

“অহমিকাকে যদি কিছুই-না বলিয়া জান তবেই তুমি পাইবে প্রিয়তমকে। যেই বিশ্বমূল বিশ্বাধার হইতে এই অহম্ হয় উপজিত সেই সহজকেই লও চিনিয়া।

‘আমি’, ‘আমার’ এই সব যদি লুপ্ত করিয়া দিতে পার তবেই তুমি পাইবে প্রিয়তমকে। ‘আমি’ ‘আমার’ যখন সহজেই গেল মিলাইয়া তখনই হয় নির্ম্মল দরশন।”

তৌ তূঁ পাৱৈ পীৱকৌঁ আপা কছূ ন জান।
আপা জিস থৈঁ উপজৈ সোই সহজ পিছান॥
তৌ তূঁ পাৱৈ পীৱকৌঁ মৈঁ মেরা সব খোই।
মৈঁ মেরা সহজৈঁ গয়া তব নির্ম্মল দর্সন হোই॥

জীৱত মৃতক কৌ অংগ, ১৬-১৭

সেই মূলাধার সহজকে পাইতে হইলে “নেতি অস্তি” [negative-positive] দুই প্রকার সাধনাই প্রয়োজন। এই “নেতি”র মধ্য দিয়াই “অস্তির” মধ্যে হয় পৌঁছিতে। তাই দাদূ বলেন,

“প্রথমে মার তনু মনকে, ইহাদের অভিমানকে ফেল পিষিয়া, পরিশেষে আন আপনাকে বাহির করিয়া; তার পর ডুবিয়া যাও সেই সহজের মধ্যে।”,

পহলী তন মন মারিয়ে ইনকা মর্দৈ মান।
দাদূ কাঢ়ৈ অংতমৈঁ পীছৈ সহজ সমান॥

জীৱত মৃতক কৌ অংগ, ৪৩

“জাগ্রত লোক যখন ঘুমায় তখন যেমন তার মন শরীরকে যায় ছাড়াইয়া। তেমন করিয়া দৃষ্ট জগতকে যদি পারা যায় অতিক্রম করিতে, তবেই সদা সহজের সঙ্গে যুক্ত করিয়া আনা যায় ধ্যান ও লয়কে।”

যোঁ মন তজৈ সরীর কোঁ জেঁ্যা জাগত সো জাই।
দাদূ বিসরৈ দেখতাঁ সহজৈ সদা ল্যো লাই॥

লৈ কৌ অংগ, ৩৬

"সেই হরি-জল-নীরের নিকটে যেই আসিলাম, তখনই বিন্দু বিন্দুতে মিলিয়া সহজে হইলাম সমাহিত।"

হরি জল নীর নিকটি জব আয়া
তব বূংদ বূংদ মিলি সহজ সমায়া ॥

রাগ গৌড়ী, ৬৪।

সকল গগন ভরিয়াই সেই হরিরস। এই প্রেম-রসের সহজ-রসের নেশা নিরন্তর থাকে লাগিয়া। এই রসে রসিক জন সদাই করে অসীম গগনে অবস্থিতি। দাদূ বলেন,—

"গগন মাঝারে নিত্য করে অবস্থিতি, প্রেম পেয়ালার সহজ নেশা।

হে দাদূ, যে এই রসের রসিক, সে এই রসেই রহে মত্ত। রাম-রসায়ন পান করিয়াই সে নিরন্তর রহে ভরপূর তৃপ্ত।"

রহৈ নিরংতর গগন মংঝারী।
প্রেম পিয়ালা সহজ খুমারী ॥
দাদূ অমলী ইহি রস মাতে।
রাম রসাইন পীরত ছাকে ॥

রাগ আসাররী,২০৯।

এই নিত্য সহজ রসের যে রসিক সে সকল মলিনতার অতীত। পাপপুণ্য তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। দাদূ বলেন,

"বাবা কে এমন যোগী জন, যে অঞ্জন ছাড়িয়া রহে নিরঞ্জন, সদা সহজ রসের যে ভোগী?

পাপ পুণ্য কখনও তাহাকে পারে না করিতে লিপ্ত, দুই পক্ষেরই সে অতীত। ধরণী আকাশ উভয়েরই সে উপরে, সেখানে যাইয়া সে হয় রসলীলায় রত।"

বাবা কো ঐসা জন জোগী।
অংজন ছাড়ৈ রহৈ নিরংজন সহজ সদা রস ভোগী ॥
পাপ পুংনি লিপৈ নহিঁ কবহূঁ দোঈ পখ রহিতা সোই।
ধরণি আকাস তাহি থৈঁ উপরি, তহাঁ জাই রত হোই ॥

রাগ রামকলী, ২১০।

"সেখানে পাপ পুণ্যের দ্বৈত কিছুই নাই, সেখানে অলখ নিরঞ্জন স্বয়ং বিরাজমান, সেখানে স্বামী সহজে বিরাজিত, সকল ঘটেই সেই অন্তর্য্যামী।"

তহঁ পাপ পুংণি নহিঁ কোঈ।
তহঁ অলখ নিরংজন সোঈ॥
তহঁ সহজি রহৈ সো স্বামী।
সব ঘটি অংতরজামী॥

রাগ রামকলী, ২০৮।

কামনার কল্পনার অতীত সেই প্রিয় ও প্রেমময় পূর্ণ ব্রহ্ম। দাদূ বলেন, "কখনই করিও না কামনা কল্পনা, (প্রত্যক্ষ উপলব্ধি কর) প্রিয়তম সেই পূর্ণ ব্রহ্ম। হে দাদূ, এই পথেই পৌছিয়া কুল পাইয়া সেই সহজ তত্ত্বকে কর আশ্রয়।"

কাম কল্পনা কদে ন কীজৈ পূরণ ব্রহ্ম পিয়ারা।
ইহি পংথি পহুঁচি পার গহি দাদূ, সো তত সহজি সংভারা॥

রাগ গৌড়ী, ৬৬।

কামনা কল্পনার অতীত নির্ম্মল নয়ন বিনা সেই "রূপারূপ" "গুণাগুণ" ভগবানকে করা যায় না উপলব্ধি। একমাত্র "সহজ"ই এই লীলা পারে করিতে প্রত্যক্ষ। গুরুর মত সুদূর পর নহে এই "সহজ",—প্রিয়তমা সখীর মত সে অন্তরঙ্গ। তাই দাদূ কহিলেন, "হে আমার প্রিয় সখীটি, হে সহজ, তুই নির্ম্মল নয়নে দেখ্ চাহিয়া, ঐ যে রূপ-অরূপ গুণ-নির্গুণময় ত্রিভুবনপতি ভগবান।"

সহজ সহেলড়ী হে, তূঁ নির্ম্মল নৈন নিহার।
রূপ অরূপ গুণ নির্গুণ মৈঁ, ত্রিভুবন দেব মুরার॥

রাগ রামকলী, ২০৭।

তাঁহাকে দেখাই হইল পরমানন্দ, তাহাই পরম সমাধি। তাঁহাকে দেখা মাত্রই পূর্ণ ব্রহ্মের মধ্যে তনুমন প্রাণ সকলই যায় সহজে সমাহিত হইয়া।

পূর্ণ ব্রহ্মের মধ্যে যে সহজ সমাধি, তাহার আনন্দ উপলব্ধি করিলেও বর্ণনা করা অসম্ভব। দাদূ বলেন,

"স্থগিত হইয়া হারিয়া গেল মন, তবু তো যায় না কহা, সহজের মধ্যে

সমাধির মধ্যে রহ আপন লয় লইয়া। সাগরের মধ্যে বিন্দু, কেমন করিয়া করিবে তৌল। আপনিই যে অবোল, কি বলিয়া করিবে বর্ণনা ?”

থকিত ভয়ৌ মন কহ্যৌ ন জাই।
সহজি সমাধি রহ্যৌ ল্যৌ লাঈ॥
সাইর বুংদ কৈসৈঁ করি তোলৈ।
আপ অবোল কহা কহি বোলৈ॥

রাগ আসাৱরী, ২৪৪।

না-ই বা করা গেল বর্ণনা, সেই সহজই পরম আনন্দ। এই আনন্দই রসিক জনের জীবনের সারসর্ব্বস্ব। দাদূ বলেন,

“অন্তরে যে রাখে এককে, মন ইন্দ্রিয়কে যে না দেয় পসার করিতে, সহজ বিচারের আনন্দে যে রহে ডুবিয়া, হে দাদূ, সেই তো মহা-বিবেক।”

সহজ ৱিচার সুখমৈঁ রহৈ দাদূ বড়া বমেক।
মন ইংদ্রী পসরৈঁ নহীঁ অন্তরি রাখৈ এক॥

বিচার কৌ অংগ, ৩১।

মন-ইন্দ্রিয়ের সেখানে নাই পসার। মিথ্যা সেখানে পৌছিতেই পারে না। মিথ্যার সমস্যাই সেখানে নাই।

“সেই সত্যের মধ্যে মিথ্যা পৌছিতেই পারে না। সেই সত্যের মধ্যে কোনো কলঙ্কই লাগে না। দাদূ বলেন, সত্য-সহজে (চিত্ত) যদি হয় সমাহিত তবে সব ঝুটা যায় বিলীন হইয়া।”

সাচৈ ঝূঠন পূজৈ কবহূঁ
সতি ন লাগৈ কাঈ।
দাদূ সাচা সহজি সমানাঁ
ফিরি রৈ ঝূঠ বিলাঈ॥

রাগ রামকলী, ১৯১।

সত্য-মিথ্যার পাপ-পুণ্যের নৈতিক বন্ধনেই সাধারণতঃ সকলে অভ্যস্ত। কিন্তু সেই নৈতিক বন্ধন অতি সঙ্কীর্ণ, অতি ক্ষীণ দুর্ব্বল। তার মধ্যে

নিত্য ধর্ম্মই বা কোথায়? সহজের যে মুক্তি, তার মধ্যে এমন একটি মুক্ত সামঞ্জস্য আছে যাহা নিত্য, যাহা সকল কর্ম্ম বন্ধনের অতীত।

"কর্ম্মবন্ধন ঘুচিয়া গেলেও সহজের বন্ধন কখনই যায় না ছুটিয়া। বরং সহজের সঙ্গে বদ্ধ হইলেই সকল কর্ম্ম-বন্ধন যায় কাটিয়া। তাই সহজের সঙ্গেই হও বদ্ধ, সহজের মধ্যেই রহ ভরপূর নিমজ্জিত যুক্ত হইয়া।"

সহজৈঁ বাংধী কদে ন ছূটৈ
কর্ম বংধন ছুটি জাই।
কাটৈ করম সহজ সৌঁ বাংধৈ
সহজৈঁ রহৈ সমাঈ॥

রাগ গৌড়ী, ৭৩।

"সুন্দর সহজের মধ্যে যে আছে ভরপূর নিমজ্জিত, যে জন সহজ রসে সিক্ত, সে আপনাকে করিয়া দেয় উৎসর্গ, আপনাকে সর্ব্বতোভাবে করে সে সমর্পণ।"

জে রস ভীনাঁ ছাৱরি জাৱৈ
সুন্দরী সহজৈঁ সংগ সমাঈ॥

রাগ গৌড়ী, ৭১।

নিখিল সামঞ্জস্যের মূলে বিশ্ব সঙ্গীত। এই সঙ্গীতের যোগেই চরাচরের মধ্যে ঐক্যের সামঞ্জস্য। নিদ্রায় অচেতনতায় সেই যোগ সেই ঐক্যের সামঞ্জস্য হইতে হই ভ্রষ্ট। ক্ষুদ্রতার ও খণ্ডতার সঙ্কীর্ণ মোহের মধ্যেই সবাই নিদ্রিত। সেই উদার সঙ্গীত শুনিয়াই সকলে জাগিয়া ওঠে শূন্য সহজে। দাদূ বলেন,

"সেই এক সঙ্গীতেই মানুষ পায় উদ্ধার, জাগিয়া ওঠে শূন্য সহজে, অন্তরে অন্তরে রত হয় একেরই সঙ্গে, তখন আর কোনো স্বরসই রোচে না তার মুখে। সেই সঙ্গীতে ভরপূর নিমজ্জিত সমাহিত হইয়াই মানব সেই পরমাত্মার সম্মুখে রহে অবস্থিত।"

এক সবদ জন উধরে, সুঁনি সহজৈঁ জাগে।
অংতরি রাতে এক সূঁ, সরস ন মুখ লাগে॥
সবদি সমানা সনমুখ রহৈ পর আতম আগে॥

রাগ রামকলী, ১৬৭।

বিশ্ব সঙ্গীতে ভরপূর সেই সহজ শূন্য। এই ভরপূর শূন্যই হইল ব্রহ্মশূন্য। সেই ব্রহ্ম শূন্যে যখন সাধক পৌছায় তখন আর কোনো জপ-সাধনায় তাহার আর প্রয়াসের থাকে না প্রয়োজন। তখন "অখিল-ছন্দের" সাথে সাথে নিরন্তরই সহজে চলে তার "নখ-শিখ-জাপ"। তখনকার অবস্থা বুঝাইতে গিয়াই দাদূ বলিতেছেন,

"ব্রহ্মশূন্য অধ্যাত্ম ধামে (তুমি অবস্থিত), প্রাণ কমল মুখে কহ নাম, মন পবন মুখে কহ নাম, প্রেম ধ্যান (সুরতি) মুখে কহ নাম।"

প্রাণ কমল মুখি নাম* কহ মন পৱনা মুখি নাম।
দাদূ সুরতি মুখি নাম কহ ব্রহ্ম সুঁনি নিজ ঠাম॥
সুমিরণ কৌ অঙ্গ, ৭৪।

এই অখিল ছন্দের সঙ্গে ছন্দোময় হওয়াই হইল সহজ। সেই সাধনার জন্য আপনাকে করা চাই শান্ত, স্থির, নির্ম্মল। সেই সাধনার প্রসঙ্গেই দাদূ বলেন,

"মন মানস প্রেমধ্যান (সুরতি) "সবদ" ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে কর স্থির শান্ত। তাঁহার সহিত "এক-অঙ্গ" "সদা-সঙ্গ" হইয়া সহজেই কর সহজ রস পান।

সকল-রহিত মূল-গৃহীত হইয়া অহমিকাকে কর অস্বীকার। সেই এককেই মনে মানিয়া অন্তরের ভাব ও প্রেমকে কর নির্ম্মল।

সেই পরম-পূর্ণ প্রকাশ হইলে হৃদয় হইবে শুদ্ধ, বুদ্ধি হইবে বিমল, রসনায় অধ্যাত্ম নাম-রস প্রত্যক্ষ হইয়া অন্তর-ভাবে করাইবে অবস্থিতি।

পরমাত্মায় হইবে মতি, পূর্ণ হইবে গতি, প্রেমে হইবে রতি, ভক্তিতে হইবে অনুরক্তি। সেই রসেই দাদূ মগ্ন, তাহাতেই লয়-লীন বিগলিত, সেই রসেই পরস্পর মাখামাখি, সেই রসেই দাদূ মত্ত।"

মনসা মন সবদ সুরতি পাঁচৌ থির কীজৈ।
এক অংগ সদা সংগ সহজৈঁ রস পীজৈ॥
সকল রহিত মূল সহিত আপা নহিঁ জানৈঁ।
অংতর গতি নির্ম্মল রতি য়েকৈ মনি মানৈঁ॥

---

* "নাম" স্থলে রাম পাঠও আছে।

হিরদৈ সুধি বিমল বুধি পূরণ পরকাসৈ।
রসনা নিজ নাউঁ নিরখি অংতর গতি বাসৈ॥
আতম মতি পূরণ গতি প্রেম ভগতি রাতা।
মগন গলত অরস পরস দাদূ রসি মাতা॥

রাগ ধনাশ্রী ৪৩৪ সবদ, (ত্রিপাঠী)।
রাগ ভৈরো ২০ সবদ, (দ্বিবেদী)।

তাঁর দয়া বিনা অনন্তের উপলব্ধি অসম্ভব। জীবনের তাহাই পরম সার্থকতা। সেই অবস্থার উপলব্ধি ও পরমানন্দ তো বর্ণনা করা যায় না। তবু দাদূ বলিতেছেন,

"অখণ্ড অনন্ত স্বরূপ প্রিয়তমের, কেমন করিয়া করিবে বর্ণিত (আলেখিত)? শূন্য মণ্ডলের মধ্যে সেই সত্য স্বরূপ, নয়ন ভরিয়া লও সুধু তাঁহাকে দেখিয়া।

লোচন-সার দেখিয়া লও তাঁহাকে; দেখ, তিনিই লোচন-সার। তিনিই প্রত্যক্ষ হইলেন দীপ্যমান।

এমন প্রেমময় দয়াময় সহজেই আপনাকে আপনিই করান যাঁহার কাছে প্রত্যক্ষ, সেই জনই তো প্রাণের প্রাণ প্রিয়তমের অখণ্ড অনন্ত স্বরূপ পায় উপলব্ধি করিতে।"

অকল সরূপ পীৱকা, কৈসৈঁ করি আলেখিয়ে।
শূন্য মণ্ডল মাহিঁ সাচা, নৈন ভরি সো দেখিয়ে॥
দেখৌ লোচন সাররে, দেখৌ লোচন সার, সোঈ প্রগট হোঈ॥
অকল সরূপ পীৱকা, প্রাণ জীৱকা, সোঈ জন পাৱঈ।
দয়াবংত দয়াল ঐসৌ, সহজৈঁ আপ লখাৱঈ॥

রাগ ধনাশ্রী, ৪৩৭ সবদ (ত্রিপাঠি)।
রাগ ভৈরো, ২৩ সবদ (দ্বিবেদী)।

তাঁহার উপলব্ধি হইবে যে অন্তরলোকে বহু ব্যর্থ বস্তুতে ঠাসিয়া আছে আমাদের সেই অন্তরলোক। তাইতো তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করার হয় না অবসর। তাঁহার আবির্ভাবের জন্যই আমাদের অন্তরলোককে করা চাই শূন্য। এই শূন্যতা

নেতিধর্ম্মাত্মক নহে। কারণ শূন্য হইলেই আমাদের অন্তর লোক দেখি তাঁহার সহজ রসে ভরপূর। এই রস সরোবরেই আত্মকমল ব্রহ্মকমল উঠে বিকশিত হইয়া।

শূন্য সরোবরে আত্মকমলে পরমপুরুষের প্রেম বিহারের সেই অবস্থার কথা বলিতে গিয়াই দাদূ বলেন,

"ভগবান সেই আত্মকমলে প্রত্যক্ষ আছেন বিরাজিত। যেখানে সেই পরম পুরুষ বিরাজমান সেখানে ঝিলমিল ঝিলমিল করিতেছে জ্যোতি।

কোমল কুসুম দল, নিরাকার জ্যোতি জল; শূন্য সরোবর যেখানে, নাই সেখানে কূল কিনারা; হংস হইয়া দাদূ সেখানে করে বিহার, বিলসি বিলসি পূর্ণ করে আপন সার্থকতা।"

রাম তহাঁ পরগট রহে ভরপুর।
আতম কমল জহাঁ, পরমপুরুষ তহাঁ,
ঝিল মিলি ঝিল মিলি নূর॥
কোমল কুসুম দল, নিরাকার জোতি জল,
বার নহিঁ পার।
শূন্য সরোবর জহাঁ, দাদূ হংসা রহৈ তহাঁ,
বিলসি বিলসি নিজ সার॥

রাগ ধনাশ্রী ৪৩৮ সবদ (ত্রিপাঠী)
রাগ ভৈরো, ২৪ সবদ (দ্বিবেদী)

আমাদের অন্তরেরই মধ্যে সেই লীলা, তাহার জন্য বাহিরে কোথাও যাইবার প্রয়োজন নাই। দাদূ বলেন,

"ক্ষণমাত্রও দূরে না যাইয়া নিকটেই দেখিব নিরঞ্জনকে। বাহিরে ভিতরে এক-রূপ, সব কিছু আছে ভরপূর পরিপূর্ণ করিয়া।

সদ্‌গুরু যখন দেখাইলেন সেই রহস্য, তখনই পাইলাম সেই পূর্ণতাকে। সহজেই আসিলাম অন্তরের মধ্যে, এখন নয়নে নিরন্তর সেই লীলাই করিব প্রত্যক্ষ।

সেই পূর্ণ স্বরূপের সহিত পরিচয় হইতেই পূর্ণ মতি উঠিল জানিয়া। জীবনের মধ্যেই মিলিল জীবনস্বরূপ ও তাঁর প্রিয়তমা, এমনই আমার সৌভাগ্য!"

নিকটি নিরংজন দেখিহোঁ, ছিন দূরি ন জাঈ।
বাহরি ভীতরি য়েকসা, সব রহ্যা সমাঈ॥
সতগুর ভেদ লখাইয়া, তব পূরা পায়া।
নৈনন হীঁ নিরখূঁ সদা ঘরি সহজৈঁ আয়া॥
পূরে সোঁ পর্চা ভয়া, পূরী মতি জাগী।
জীৱ জাঁনি জীৱনি মিল্যা, ঐসৈঁ বড় ভাগী॥

রাগ রামকলী, ২০৬।

যিনি বনমালী তিনিই আবার মনমালী। তাঁর পরশে সদা সর্ব্বত্র উপজায় নবজীবন। তিনি অন্তরের সহজ লোকে স্বধু যে বিরাজই করেন তাহা নহে, তিনি মালীর মত সেখানে এমন মনোরম ফুলবন করেন রচনা যে প্রেমময় স্বামী হইয়া আপনি তিনিই আসেন সেখানে প্রেমের রাস খেলিতে। দাদূ তাই বলেন,

"মোহনমালী ভরপূর ভরিয়া আছেন অন্তরের সহজলোকে। ক্বচিতই কোনো রসিক সাধকজন জানে তাহার মর্ম্ম।

কায়া ফুলবনের মধ্যেই মালী, সেখানেই করিলেন তিনি রাস রচনা। সেবকের সঙ্গে খেলা করিতে সেখানে দয়া করিয়া স্বামী আপনি আসিয়া হইলেন উপস্থিত।

বাহির ভিতর সব নিরন্তর করিয়া সব কিছুর মধ্যে তিনি রহিলেন ভরপূর হইয়া। প্রকটই হইল গুপ্ত, গুপ্তই হইল প্রকট; ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির অতীত অবর্ণনীয় সেই লীলা।

অনির্বচনীয় লীলা সেই মালীর, কহিতে গেলেও যায় না বলা; অগম্য অগোচর চলিয়াছে আনন্দ, এই মহিমাই দাদূ করে গান।"

মোহন মালী সহজি সমানাঁ।
কোই জানৈঁ সাধ সুজানাঁ॥
কায়া বাড়ী মাঁহৈঁ মালী তহাঁ রাস বনায়া।
সেৱগ সোঁ স্বামী খেলন কোঁ আপ দয়া করি আয়া॥

বাহরি ভীতরি সর্ব্ব নিরংতরি সব মৈঁ রহ্যা সমাই।
পরগট গুপত গুপত পুনি পরগট অবিগত লখ্যা ন জাঈ॥
তা মালী কী অকথ কহাঁণী কহত কহী নহিঁ আবৈ।
অগম অগোচর করত অনংদা দাদূ যে জস গাবৈ॥

রাগ বসন্ত, ৩৭১।

অপূর্ব্ব তাঁহার রচনা শক্তি। তাঁহার রচনার মূল রহস্য হইল প্রেম ও আনন্দ। প্রেম আনন্দের ভাগবত রসে জীবন লতায় করেন তিনি অপূর্ব্ব প্রাণ সঞ্চার। ফুলে ফলে দিনে দিনে চলে তাহা ভরপূর হইয়া। দাদূরই বাণীতে দেখিতেছি,

"আনন্দে প্রেমে ভরপূর হইল এই আতম-লতা। ভাগবত রসের চলিয়াছে সেখানে সেচন, সেই সহজরসে মগন হইয়া দিনে দিনে বাড়িয়া চলিয়াছে সেই লতা।

সহজ-রসেই রোপন সেচন ও পোষণ করেন সদ্গুরু সেই লতা, সহজেই মগন হইয়া সেই লতা ছাইয়া ফেলিল অন্তর-ঘর। সহজেই সহজেই নব পত্রাঙ্কুর-দল লাগিল সেখানে মেলিতে, হে অবধূত রায়, ইহাই করিলাম প্রত্যক্ষ অনুভব।

সহজেই কুসুমিত হয় সেই আত্মাবল্লী, সদা ফল ফুল উপজায়; কায়া পুষ্পবন সহজেই বিকশিত হইয়া ভরিয়া ওঠে নব জীবনে, ক্বচিতই কেহ জানে এই রহস্য।

"হঠের" (সঙ্কীর্ণ জেদের) বশবর্ত্তী মন-বল্লী দিন দিন যায় শুকাইয়া, সহজ হইলেই যুগ-যুগই পারিত সে থাকিতে জীবন্ত। হে দাদূ, সহজ হইলে এই বল্লীতেই লাগে অমর অমৃত ফল, নিত্য রস পান করে সহজের মধ্যে।"

বেলী আনংদ প্রেম সমাই।
সহজৈঁ মগন রাম রস সীঁচৈ দিন দিন বধতী জাই॥
সতগুর সহজৈঁ বাহী বেলী সহজি মগন ঘর ছায়া।
সহজৈঁ সহজৈঁ কূঁপল মেল্হৈ জাণৈঁ অবধূ রায়া॥

আতম বেলী সহজৈঁ ফূলৈ সদা ফূল ফল হোঈ।
কায়া বাড়ী সহজৈঁ নিপজৈ জানৈঁ বিরলা কোঈ॥
মন হঠ বেলী সূকণ লাগী সহজৈঁ জুগি জুগি জীবৈ।
দাদূ বেলী অমর ফল লাগৈ সহজৈ সদা রস পীবৈ॥
রাগ রামকলী, ২০৩॥

অন্তরের মধ্যেই বিরাজিত যে, প্রিয় তাঁহার সঙ্গেই নিত্য চলুক সহজ রস পান। সকল কলায় ভরপূর তাঁর ঐশ্বর্য্য। তিনিই আমার সর্ব্বস্ব, তাঁহাকে বিনা জীবনে আর আমার আছেই বা কি?

"আমার মনে লাগিয়াছে সকল কলা স্বরূপ, আমি নিশিদিন তাঁহাকেই ধরিয়াছি হৃদয়ে।

হৃদয়ের মাঝেই হেরিলাম তাঁহাকে, নিকটেই প্রত্যক্ষ পাইলাম প্রিয়তমকে। আপন অন্তরের মধ্যে নিবিড় করিয়া লও তাঁহাকে। তখন সহজেই পান করিবে সেই অমৃত।

যখন সেই মনের সহিত যুক্ত হইল এই মন, তখনই জ্যোতি স্বরূপ জাগ্রত হইলেন জীবনে। যখন জ্যোতি স্বরূপকে পাইলাম, তখন অন্তরের মাঝেই একেবারে হইলাম অনুপ্রবিষ্ট।

যখন চিত্তে চিত্ত হইল অনুপ্রবিষ্ট, তখন হরি বিনা আর কিছুই রহিল না আমার জ্ঞানে। জানিলাম, জীবনে আমার তিনিই জীবনস্বরূপ, এখন হরি বিনা আর কেহই নাই।

যখন পরম আত্মার সঙ্গে একত্রেই হইল বাস, তখন অন্তরেই হইল পরম আত্মার প্রকাশ। প্রিয়তম প্রেমময় হইলেন প্রকাশিত, হে দাদূ, তিনিই তো আমার (একমাত্র) বন্ধু।"

মেরা মনি লাগা সকল করা।
হম নিস দিন হিরদৈ সো ধরা॥
হম হিরদৈ মাহৈঁ হেরা।
পীর পরগট পায়া নেরা॥

সো নেরে হী নিজ লীজৈ।
তব সহজৈঁ অমৃত পীজৈ॥
জব মনহী সৌঁ মন লাগা।
তব জোতি সরূপী জাগা॥
জব জোতি সরূপী পায়া।
তব অংতরি মাঁহিঁ সমায়া॥
জব চিত্তহি চিত্ত সমাঁনাঁ।
হম হরি বিন ঔর ন জাঁনাঁ॥
জানাঁ জীবনি সোঈ।
ইব হরি বিন ঔর ন কোঈ॥
জব আতম একৈ বাসা।
পর আতম মাঁহিঁ প্রকাসা॥
পরকাসা পীব পিয়ারা।
সো দাদূ মীংত হমারা॥

রাগ গৌড়ী, ৭৯।

পরমাত্মার সঙ্গে আত্মার, ব্রহ্মের সঙ্গের জীবের, এই নিবিড় মিলন কি বর্ণনা করা সম্ভব? অনির্বচনীয় সেই আনন্দের ঐশ্বর্য্য সঙ্গীতেই উঠে উচ্ছ্বসিত হইয়া। বাক্যে তেমন সঙ্গীতের ঠিক অনুবাদ করা সম্ভব নয়। অন্তরের এই প্রেম মিলনের এই সহজ ভাবের আনন্দে দাদূ গাহিতেছেন,

"হইল প্রকাশ, অতিশয় দীপ্যমান জ্যোতি, পরম তত্ত্ব তিনি হইলেন প্রত্যক্ষ। নির্ব্বিকার পরম সার হইলেন প্রকাশমান, ক্বচিতই কেহ বোঝে এই রহস্য।

পরমাশ্রয়, আনন্দ-নিধান, পরম শূন্যে চলিয়াছে লীলা। আনন্দে ভরপুর-নিমজ্জিত সহজ ভাব, জীব ব্রহ্মের চলিয়াছে মিলন।

অগম নিগমও হইয়া যায় সুগম, দুস্তর ও যায় তরিয়া। আদি পুরুষসনে নিরন্তর চলিয়াছে দরশ পরশ, দাদূ পাইয়াছে সেই (সৌভাগ্য)।"

হোই প্রকাস, অতি উজাস,
পরম তত্ত্ব সূঝৈ।
পরম সার নির্ব্বিকার
বিরলা কোঈ বূঝৈ॥
পরম থান সুখ নিধান
পরম সূঁনি খেলৈ।
সহজ ভাই সুখ সমাই
জীব ব্রহ্ম মেলৈ॥
অগম নিগম হোই সুগম
দুতর তিরি আবৈ।
আদি পুরুষ দরস পরস
দাদূ সো পাবৈ॥

রাগ মারু, ১৬২।

সীমা ও অসীম :

ভক্ত দাদূর বহু বহু বাণীই সীমা ও অসীম লইয়া। তাই এখানে তাঁহার মতামত খুব সংক্ষেপে তাঁহারই দুই চারিটি মাত্র বাণী দিয়া দেখান যাউক। যদিও ইহা ছাড়া তাঁর এই বিষয়ে আরও বহু চমৎকার চমৎকার বাণী আছে, তবু এই কয়টি বাণীর মধ্যে এই বিষয়ে তাঁহার মনের ভাবটা মোটামুটি বুঝা যাইবে। এই সব বাণী দাদূর "অংগবংধূ" সংগ্রহ হইতেই সঙ্কলিত।

সকল ভাবুক চিত্তের মূল প্রশ্নটি দাদূ প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন, "কি ভাবে, কেন এবং কেমনে এই জগৎ রচিলে, হে স্বামী? এমন কি অপরূপ আনন্দ ছিল তোমার মনের মধ্যে? এই সৃষ্টির মধ্য দিয়া তুমি আপনাকেই চাও রূপ দিতে, প্রকাশিত করিতে? কি তোমার লীলাময় মন মানে না, তাই করিলে এই রচনা? কি এই লীলাই তোমার লাগে ভাল? কি তোমার অন্তরের ভাবকে মূর্ত্তি দিতেই তোমার আনন্দ?"

ক্যোঁ করি য়হু জগ রচ্যৌ গুসাঁঙ্গঁ।
তেরে কৌন বিনোদ মন মাঁহিঁ॥
কৈ তুম্হ আপা পরগট করণাঁ।
কৈ য়হু রচিলে মন নহিঁ মানা॥
কৈ য়হু তুম্হ ক্যোঁ খেল পিয়ারা।
কৈ য়হু ভাৱৈ কীন্হ পসারা॥

রাগ আসাৱরী, ২৩৫ পদ।

ভাষায় কে কবে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিয়াছে? যে সৃষ্টি তাঁহার প্রেমানন্দ হইতে উচ্ছ্বসিত, তাহার রহস্যও বুঝিতে হয় অন্তরের প্রেমানন্দ দিয়াই। বাক্যে কি তাহার মর্ম্ম কখনও প্রকাশ করা যায়? তাই দাদূ নিজেই ইহার পরেই বলিতেছেন, "বাক্যে কহিয়া বুঝাইবার নহে এই রহস্য।"

য়হু সব দাদূ অকথ কহানীঁ॥

রাগ আসারৱী, ২৩৫ পদ।

দাদূর কাছে লোকে আসিয়া যখন এই বিষয়ে প্রশ্ন করিত তখন তিনি বলিতেন, “যিনি এই মোহন সৃষ্টির লীলা করিলেন রচনা, তাঁহাকে গিয়া কর তুমি জিজ্ঞাসা—এক হইতে কেন করিলে এই বহুধা বিচিত্র রচনা, হে স্বামী তাহা কহ তুমি বুঝাইয়া।”

জিন মোহনী লীলা রচী সো তুম্হ পূছৌ জাঈ ।
অনেক এক থৈঁ ক্যোঁ কিয়ে সাহিব কহি সমঝাঈ ॥
হৈরাণ অঙ্গ—২৭।

নিত্য অনাদ্যনন্ত পরব্রহ্মের রচিত এই সৃষ্টি ; তাহা কেন তবে এমন অনিত্য ও ক্ষণস্থায়ী ? এমন ক্ষণ-বিলীয়মান সৃষ্টিতে তাঁহারই বা কোন মহিমা ? এক দল জ্ঞানী বলিলেন, “এই সব সৃষ্টি মিথ্যা, মায়া, প্রপঞ্চ ; তাই ইহা মলিন”। প্রেমী মরমী বলিলেন, “সে কি কথা ? এ যে অন্তরের আনন্দের লীলার প্রকাশ। এর তো নিত্য নবরূপ হওয়াই চাই। মায়ের ভালবাসা সন্তানকে কখনও আলিঙ্গনে কখনো চুম্বনে, কখনো গানে, কখনো শান্ত পরশে ক্ষণে ক্ষণে নব নব রূপে করে আত্মপ্রকাশ। তাই সন্ধ্যায় ক্ষণে ক্ষণে নূতন রাগলীলার মত অহেতুক নিত্য নূতন ইহার রূপ ও রঙ্গ।”

আনন্দ তো সদাই চায় নিত্য নূতন ভাবে আপন লীলার প্রকাশ। তাই কবি বলিলেন,

ইহ সরজসি মার্গে চঞ্চলো যদ্ বিধাতা
হ্যগণিতগুণদোষো হেতুশূন্যত্বমুগ্ধঃ ।
সরভস ইব বালঃ ক্রীড়িতঃ পাংশুপূরৈঃ
লিখতি কিমপি কিঞ্চিৎ তচ্চ ভূয়ঃ প্রমার্ষ্টি ॥
বল্লভদেব সুভাষিতাবলি, ৩:৩৬।

“এই সৃষ্টিলীলার সংসারে চাহিয়া দেখিলাম, বিধাতা বসিয়া আছেন ধুলিময় পথে উপবিষ্ট চঞ্চল ক্রীড়াপরায়ণ শিশুর মত। অগণিত গুণ দোষ এই খেলার মধ্যে, তবু এই খেলার মধ্যে যে কোনো উদ্দেশ্যের তাগিদ নাই, এই আনন্দেই শিশুর মত তাঁহার মন মুগ্ধ। আনন্দে অধীর শিশুর মতই মুঠা মুঠা ধুলা লইয়া চলিয়াছে তাঁহার খেলা ; ক্ষণে ক্ষণে কত কি-ই করিতেছেন

তিনি রচিত ও অঙ্কিত, আবার বার বার তাহা ফেলিতেছেন মুছিয়া।" একবার আঁকা একবার মোছা—শিশুর মত চলিয়াছে তাঁহার এই অহেতুক আনন্দের লীলা।

এই সব কথার উপর দাদূ যে একটি নূতন কথা বলিলেন তাহার আর তুলনা নাই। বিধাতা আর্টিষ্ট; শিল্পী। শিল্পী কি কখনো কোথাও বলিতে পারিয়াছেন,"হ্যা, যাহা আমার মনে ছিল, ঠিক আমি তাহা তাহা রচনা করিতে পারিয়াছি! এই রচনাতেই আমার চরম তৃপ্তি!"

বিধাতার অপরূপ প্রেমানন্দ কি কিছুতেই তৃপ্তি মানে? অসীমের সেই ভাবানন্দের দুঃসহ ভার কোনো বিশেষ একটি রূপ অথবা কোনো সীমা কি সহিতে পারে? তাই দাদূ বলিলেন, "বলতো দাদূ, সেই অলখ আল্লার প্রকাশ কিরূপ? হে দাদূ, সেই অসীমের নাই কোনো সীমা, তাই তাঁহার ভাব-আনন্দের ভারে রূপের পর রূপ ক্রমাগতই হইয়া চলিয়াছে চূর্ণ-বিচূর্ণ।"

দাদূ অলখ অলাহ কা কহু কৈসা হৈ নূর।
দাদূ বেহদ হদ নহীঁ রূপ রূপ সব চূর॥ পরচা, ১০৩

এই কথাই তাঁহার শিষ্য রজ্জবজী বলিলেন,

"ঘটী-যন্ত্র যেমন কূপের গভীরতা হইতে জল লইয়া উঠিয়া রিক্ত হইয়া আবার নামিয়া যায় সেই গভীরে, পুনরায় পূর্ণ হইতে; তেমনি প্রতি রূপ ও আকার [ঘট] সেই অতল গভীর হইতে অপরূপ আনন্দ-রস লইয়া হয় প্রকাশ। সেই রসটুকু ঢালিয়া দিয়া রিক্ত ঘট আবার নামিয়া যায় সেই অতল গভীরে, এমন করিয়াই হয় রূপের আগম ও রূপের নাশ।"

অতল কূপ থৈঁ সুভর ভর্যা সব ঘট হোবৈ প্রকাস।
রীতা সব উতরে তহিঁ রূপ আগম রূপ নাস॥

রূপে রূপে চলিয়াছে তাঁহার আনন্দের খেলা, তাই সকল রূপেই তাঁহার সহজ বিহার। তাই তিনি নিরাকার সহজ শূন্য স্বরূপ। "সব ঘট ও সবারই মধ্যে বিরাজমান সেই সহজ শূন্য। সর্ব্ব রূপেই নিরঞ্জনের চলিয়াছে সহজ লীলা বিহার, তাই কোনো বিশেষ রূপ ও আয়তনের গুণ পারে না তাঁহাকে বদ্ধ করিতে বা গ্রাস করিতে।"

সহজ সুঁনি সব ঠৌর হৈ সব ঘট সবহী মাঁহি।
তহাঁ নিরংজন রমি রহ্যা কোই গুণ ব্যাপৈ নাঁহি॥

পরচা অংগ ৫৬,

তাই রজ্জব বলিলেন, "দেখ, রূপের পর রূপ আনন্দ-ধারার মত তাঁহা হইতে পড়িতেছে ঝরিয়া।"

দেখু রূপ সবহী ঝরৈ তাসেঁ আনংদ ধার॥

পর্ব্বতের মধ্যে ধারা যদি একটি বিস্তৃত আধার পায় তবে সঞ্চিত হইয়া সেখানেই একটি হ্রদ বা সরোবর হয় রচিত। বিশ্ব সংসার হইল সেই আধার যেখানে তাঁহার আনন্দ ধারা সঞ্চিত হইয়াছে এক অপরূপ সরোবর রূপে। তিনি পবিত্র, পবিত্র তাঁর ধারা, তাঁহার আনন্দ-ধারার সরোবরও তাই পবিত্র ও আনন্দময়। তাহা অশুচি মায়া মিথ্যা বা ফাঁকী মরীচিকা নহে। দাদূ বলিতেছেন, "এই বিশ্ব হইল হরি-সরোবর, সর্ব্বত্র সর্ব্বভাবে পূর্ণ। যেখানে সেখানে পান কর এই রস।"

হরি সরবর পূরণ সবৈ জিত তিত পানী পীব।

পরচা অংগ, ৬২

আসক্তি থাকিলে মন হয় অশুচি, তখন এই হরি-সরোবরের রস পান করা হয় অসম্ভব।

এই পবিত্র প্রেম সরোবরে সীমা অসীমের নিত্য-যোগ-লীলা। আত্মা ও পরমাত্মার চলিয়াছে সেখানে তরঙ্গে তরঙ্গে নিত্য দোললীলা। "হে দাদূ, প্রেমের এই সাগর, আত্মা ও পরমাত্মা এক-রসের আনন্দে রসিক হইয়া দুইজনে খাইতেছে ইহাতে দোলা।

হে দাদূ, সহজের এই সাগর, সেখানে চলিয়াছে প্রেমের তরঙ্গ। সেখানে সুখে দুঃখে দোল খাইতেছে আত্মা আপন স্বামীর সঙ্গে।

হে দাদূ, প্রেমরসের সেই দরিয়া, তাহাতে চলিয়াছে মিলনের তরঙ্গ। আপন প্রিয়তমের সঙ্গে দিনরাত্রি (আত্মা) খেলে তাহার ভরপূর খেলা।"

দাদূ দরিয়া প্রেমকা তামৈঁ ঝূলৈঁ দোই।
ইক আতম পরআতমা একমেক রস হোই॥

দাদূ সরব়র সহজ কা তামৈঁ প্রেম তরংগ।
সুখ দুখ ঝূলৈ আতমা অপনে সাঈঁ সংগ ॥
দাদূ দরিয়াব় প্রেম রস তামৈঁ মিলন তরংগ।
ভরপূর খেলৈ রৈন দিন অপনে প্রীতম সংগ ॥ পরচা অংগ

দুই জনের মধ্যে নিরন্তর চলিয়াছে প্রেমের দোললীলা। এই প্রেমের খেলায় সীমা অসীম উভয়েরই সমান মূল্য, তারতম্য নাই। এককে ছাড়িয়া অন্যের চলে না। এই দেহ, এই মানুষ, দেখে না নয়ন ছাড়া; আবার নয়নও দেখে না মানুষ ছাড়া। মানব দেহের সঙ্গে যোগ না থাকিলে নয়ন শক্তিহীন, আবার দেহেরও দৃষ্টি ঐ নয়নকেই আশ্রয় করিয়া। তেমনি অসীমের এক বিশেষ আনন্দ আমারই মধ্য দিয়া; আবার আমার সব আনন্দ পূর্ণ তাঁহারই সঙ্গে, এবং ব্যর্থ তাঁহাকে বিনা। তাই দাদূ বলিলেন,

যেঈঁ নৈনাঁ দেহকে, যেঈঁ আতম হোই।
যেঈঁ নৈনাঁ ব্রহ্মকে দাদূ পলটে দোই ॥ পরচা, ১৫৮

পরব্রহ্ম অসীম অরূপ। তিনি আপন প্রেমে গাঁঠ বাঁধিতে বাঁধিতে আসিলেন রূপ ও সীমার দিকে। দাদূ বলেন, "তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে হইলে আমাকে তাই গাঁঠ খুলিতে খুলিতে উল্টা পথে যাইতে হইবে অসীম অরূপের দিকে। যার সঙ্গে দেখা করিবার সে আসিবে আমার দিকে, আমি যাইব তার দিকে। উল্টা পথে চলিলে তবেই হইবে দেখা। নচেৎ এক মুখে উভয়েই ক্রমাগত চলিতে থাকিলে দেখা আর হয় কেমন করিয়া?"

প্রেমে তাঁহার সঙ্গে আমার যুক্ত এই খেলা। সাধনাতেও আমরা পরস্পরে যুক্ত। তিনি অসীম, তাই আমাকে বলিলেন, "তুমি সীমা, সাধনার অসীম ধ্যানে তুমি বস। তোমার উত্তর সাধক হইয়া আমিও বসি রূপের মালা লইয়া। তোমার অন্তরে নিরন্তর চলুক অরূপের ধ্যান, আর আমার মালায় চলুক নিরন্তর রূপ গুটিকার জাপ।" দাদূ বলেন, "কি অটুট তাঁহার বিশ্বাস আমার উপর! আমার ধ্যান চলুক বা না চলুক তাঁর জপ চলিয়াছে নিরন্তর! ঐ দেখ চলিয়াছে আকাশে গ্রহ চন্দ্র তারকার দীপ্ত মহা মালা! দিনে রাত্রিতে, উষায় সন্ধ্যায়, ঋতুতে ঋতুতে, জনমে মরণে, চলিয়াছে কালের মালায় অনন্ত

জাপ! প্রতি রূপ প্রতি কণার আগম-স্থিতি-নিগমে চলিয়াছে নিরন্তর রূপারূপ জাপ! হায়রে, ধ্যান কি আমার সেই জাপের সঙ্গে আছে যুক্ত? আমার যে অপরাধ হইতেছে, বিষম জপাপরাধ!” এত বড় বিশাল বিশ্বচরাচরের মালা, হে প্রভু, কি আমার সামান্য ধ্যানের সঙ্গে যুক্ত হইবার যোগ্য?”

“কে বলিল, তুমি সামান্য! তুমি আমার জপের সরীক। ক্ষুদ্র মালায় কি তোমার সাধনার যোগ্য জাপ চলে? তাই তো চলিয়াছে গ্রহ চন্দ্র তারার বিশ্বমালা।” তাই দাদূ বলিলেন, “সকল তনু সকল ঘট সকল রূপ যেন বলে ‘দয়াময় দয়াময়’ এমন নিবিড় কর জাপ।”

সব তন তসবী কহৈ করীম ঐসা করিয়ে জাপ॥ পরচা, ২৩০

“সকল আকারই যে তাঁর মালা”—

“দাদূ মালা সব আকারকী”

পরচা, ১৭৬

এই প্রসঙ্গে দাদূ একটি মহাতত্ত্ব বলিয়াছেন। রূপের পর রূপ যে ক্রমাগত চূর্ণ হইয়া যাইতেছে, তাহার কারণ অসীম-অরূপের প্রকাশের ভার সে পারিতেছে না সহ্য করিতে ধারণ করিতে। আর একটি অসাধারণ কথা দাদূ বলিলেন, “গভীর কূপের তল হইতে ঘট ভরিয়া উঠিয়া, জল দিয়া, রিক্ত হইয়া আবার সে নামিয়া যায় কূপে। তেমনি অরূপ হইতে রূপ উঠিয়া, অরূপ অতলের রসটুকু নিঃশেষে দান করিয়া, আবার পূর্ণ হইতে যাত্রা করে সেই অরূপের গভীরে। আমরা কি প্রতি রূপের সেই গভীর দান গ্রহণ করিতে পারি? সাধনা ছাড়া প্রত্যেকটি রূপের উপহৃত এই অরূপ রস কেমন করিয়া যায় লওয়া? অন্তরের চিন্ময় পাত্র ছাড়া সেই রস ধারণ করিবই বা কোথায়? প্রত্যেক রূপ প্রতি ক্ষণে নিঃশেষে দান করিতেছে সেই অরূপ অসীমের মহারস; কত বড় সাধনা কত বড় আধার চাই তাহা ধারণ করিতে!”

ইহার পর দাদূ বলিলেন, “রূপের পর রূপ যখন অরূপের গভীরতার মধ্যে করিয়াছে যাত্রা তখন ডাক দিয়া দিয়া সে যাইতেছে বলিয়া, “এই যে চলিয়াছি আমরা অরূপে।” সেই ব্যাকুল করুণ সুরে সকল আকাশ ব্যথিত। আমার আত্মাও তখন ব্যাকুল হইয়া লইতে চায় তাহাদেরই সঙ্গ।” “সুন্দরী মূরতি ডাক দিয়া গেল, ‘হে সুন্দরী, চলিলাম সেই অগম্য অগোচরের দিকে।’ আর দাদূর বিরহী আত্মাও উঠিয়া উঠিয়া ব্যাকুল হইয়া ধায় তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে।”

মূরতি পুকারৈ সুন্দরী অগম অগোচর জাই।
দাদূ বিরহিণী আতমা উঠি উঠি আতুর ধাই॥ সুন্দরী, ৭।

এইখানেই মনে হয় রবীন্দ্রনাথের,

ভাঙ্গিলে হাট দলে দলে
সবাই যখন ঘাটে চলে
আমি তখন মনে করি,
আমিও যাই ধেয়ে
ওগো খেয়ার নেয়ে।

(খেয়া) খেয়া,

সকল জপে সকল তপে পাইতে হইবে সেই সর্ব্বমূলাধার অসীম এককে। "হে দাদূ, যে-এক হইতেই সব আসিল, সবই যেই একের, সেই এককেই কেহ জানিল না! (নানা গুরু ধরিয়া নানা সম্প্রদায়ে ও ভাগে বিভক্ত হইয়া) এই পাগল জগৎ হইয়া গেল নানা জনের নানা মতামতের দলভুক্ত!"

দাদূ সব থে এককে সো এক ন জানা।
জণে জণে কা হ্বৈ গয়া য়হু জগত দিৱানা॥ সাচ, ১৫০

ভব সমুদ্রের নৌকা যিনি অখণ্ড এক, দলাদলি করিয়া মানুষ তাঁহাকেই করিতে বসিল খণ্ড খণ্ড! সম্প্রদায় মত আপন আপন ভাগ বুঝিয়া বুঝিয়া চায় সকলে আদায় করিতে, অতলে যে তলাইবে সবাই এক সঙ্গে, সেই বোধ তো নাই! "খণ্ড খণ্ড করিয়া ব্রহ্মকে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে লইল ভাগ করিয়া, দাদূ বলেন, পূর্ণ ব্রহ্মকে ত্যজিয়া বদ্ধ হইল কিনা ভ্রমের বন্ধনে!"

খংড় খংড করি ব্রহ্মকৌ পখি পখি লীয়া বাঁটি।
দাদূ পূরণ ব্রহ্ম তজি বংধে ভরম কী গাঁঠি॥ সাচ, ৫০

তাঁহাকে গ্রহণ করা পূজা করা অর্থই হইল তাঁহার সাধনায় ভাগী হওয়া, কিছু ভিক্ষা বা কামনা করা নয়। তিনি আপনাকে লুপ্ত করিয়া সকল জীবের মধ্যে নিজেকে দিয়াছেন বিলাইয়া, তুমিও কর সেই সাধনা। আপনাকে লুপ্ত করিয়া আপনার সর্ব্বস্ব আপনার সেবা সকলকে নিরন্তর দাও বিলাইয়া, ব্যর্থ দলাদলি আর করিও না।

দাদূ জিজ্ঞাসা করেন ভগবানকে, "হে প্রভু, তোমার এই তত্ত্বটি দাও বুঝাইয়া, যাহাতে সেবক আপনাকে দেয় মন হইতে লুপ্ত করিয়া কিন্তু কখনও সেবা হয়না বিস্মৃত।"

সেৱগ বিসরৈ আপকোঁ সেৱা বিসরি ন জাই।
দাদূ পূছৈ রাম কোঁ সো তত কহি সমঝাই॥ পরচা, ২৭০

এমন পরিপূর্ণ তাঁহার সেবা যে তাঁহার প্রত্যেকটি সেবার আড়ালে আপনাকে তিনি রাখিয়াছেন প্রচ্ছন্ন করিয়া। সেবার চরম উৎকর্ষের আদর্শই এই। এইজন্যই জগতে নিরন্তর আমরা তাঁহার সেবা স্বীকার করিয়াও তাঁহাকে অস্বীকার করিতে পারি। তাহাতে তাঁহার সেবার কিছুই আসে যায় না। তাঁহাকে আমরা এই যে অস্বীকার করিতে পারি ইহাতেই প্রমাণিত হয় তাঁহার অপূর্ব্ব আত্ম-বিলোপী সেবার অনুপম মহত্ত্ব।

সেবার মধ্যে এমন আত্ম বিলোপ চিন্ময় অসীম তিনিই করিতে পারেন। যিনি চিন্ময় নহেন অসীম নহেন এমন আর কোনো সেবক এমন করিয়া সেবার দ্বারা আপনাকে নিঃশেষে মুছিয়া ফেলিতে পারিবেন কেন? কাজেই তাঁহারা এক এক জনের পন্থ ধরিয়া হইয়া পড়েন এক এক সম্প্রদায়ভুক্ত।

দাদূ বলিলেন, ধরিত্রী আকাশ চন্দ্র, সূর্য্য জল পবন প্রভৃতি সেবকেরা তো চিন্ময় নহে অথচ কাহারও দলে না ভুক্ত হইয়াও নিত্য চালাইয়াছে ইহারা তাহাদের সেবা। "ইহারা সব আছে কোন সম্প্রদায়ে, এই ধরিত্রী, আকাশ, জল, পবন, দিন, রাত্রি? হে দয়াময় তাহা বল।"

য়ে সব কৈঁ কিস পংথ মেঁ ধরতী অরু অসমান।
পানী পৱন দিন রাতকা চংদ সূর রহিমান॥ সাচ, ১১৩

এই ভাবে সীমা যখন আপনাকে নিঃশেষে প্রেমের সেবায় করে উৎসর্গ, তখন সে প্রেমের বলেই আপন অজ্ঞাতসারে পায় তাহার প্রেমময়কে। তখন শোভায় সৌন্দর্য্যে সে উঠে ভরিয়া।

"আকাশকে পূর্ণ করিয়া বসিয়া আছেন যে অনন্ত অপার স্বামী। তাঁহাকে জ্ঞানে ভাল করিয়া না বুঝিলেও, হরিত পট্টাম্বর পরিধান করিয়া ধরিত্রী করিয়াছে প্রেমের প্রসাধন। বসুধা তাই ফলে ফুলে উঠিয়াছে

ভরিয়া। অনন্ত অপার পৃথিবী ফুলে ফলে তাই ভরপূর, গগন গরজিয়া ভরিয়া উঠিল সকল জল স্থল, হে দাদূ, সর্ব্বত্র চলিয়াছে সেই জয় জয়কার।"

অজ্ঞা অপরংপারকী বসি অংবর ভরতার।
হরে পটংবর পহির করি ধরতী করৈ সিংগার॥
বসুধা সব ফূলৈ ফলৈ পিরথী অনংত অপার।
গগন গরজি জল থল ভরৈ দাদূ জয়জয়কার॥

বিরহ ১৫৭, ১৫৮

সীমা অসীমের মধ্যে এই হে এমন নিবিড় যোগ, তাহার মধ্যেও যদি হঠাৎ "অহমিকা" আসিয়া উপস্থিত হয় তবে তৎক্ষণাৎ সব যোগের ঘটে অবসান। "সেবা সাধনা (সুকৃতি) সব গেল ব্যর্থ হইয়া, যেই মনের মধ্যে আসিল 'আমি ও আমার।' হে দাদূ, যতক্ষণ আছে অহমিকা তখন স্বামী কিছুতেই মনের মধ্যে করিতে পারেন না গ্রহণ।"

সেৱা সুকিরত সব গয়া মৈঁ মেরা মন মাঁহিঁ।
দাদূ আপা জব লগৈ সাহিব মানৈ নাঁহিঁ॥ সাখীভূত, ১৭

এই স্বার্থ ও অহমিকা নিতান্তই ঝুঠা; এই বাধাটুকু না থাকিলে সীমা ও অসীম নিরন্তর পরস্পরে চাহে পরস্পরকে। "সাধক ভালবাসেন প্রেমে জপিতে ভগবানকে, ভগবান ভালবাসেন প্রেমের সহিত জপিতে সাধককে।"

রাম জপই রুচি সাধকো সাধ জপই রুচি রাম॥

পরচা (সুধাকর) ৩০৪।

এইরূপ প্রেম যখন উপজে তখন প্রাণ চাহে নিরন্তর আপনাকে উৎসর্গ করিতে, ইহাই তো প্রেমের নিত্য-আরতি। তখন আমার অন্তর হইতে অনবরত উঠে এই বাণী—"এই তনুও তোমার, মনও তোমার, তোমারই এই দেহ এই প্রাণ, সব কিছুই তো তোমার। কাজে কাজেই তুমিও যে আমার, এই কথাই সার বলিয়া বুঝিয়াছে দাদূ।"

তনভী তেরা মনভী তেরা তেরা প্যণ্ড পরাণ।
সব কুছ তেরা তূঁ হৈ মেরা য়হ দাদূ কা জ্ঞান॥ সুন্দরী, ২৩

সীমা ও অসীম সম্বন্ধে এইবার দাদূ এমন একটি কথা বলিলেন যে তাঁহার

সঙ্গে ও এই যুগের মহামনীষী রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা যায় আশ্চর্য্য এক মিল। সীমা-অসীমের নিবিড় যোগের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিলেন—

ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে,
গন্ধ সে চাহে ধূপেরে রহিতে জুড়ে।
সুর আপনারে ধরা দিতে চাহে ছন্দে,
ছন্দ ফিরিয়া ছুটে যেতে চায় সুরে।
ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ,
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।
অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ,
সীমা হতে চায় অসীমের মাঝে হারা।
প্রলয়ে সৃজনে না জানি এ কার যুক্তি,
ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা।
বন্ধ ফিরিছে খুঁজিয়া আপন মুক্তি,
মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা।

উৎসর্গ ১৭,

সীমা অসীমের নিবিড় প্রেম সম্বন্ধে দাদূ কহিলেন, "গন্ধ কহে, হায়, আমি যদি পাইতাম ফুলকে; ফুল বলে, হায়; আমি যদি পাইতাম গন্ধকে! ভাস (প্রকাশ, ভাষা) কহে, হায়, আমি যদি পাইতাম ভাবকে; ভাব বলে, হায়, আমি যদি পাইতাম ভাসকে! রূপ কহে, হায়, আমি যদি পাইতাম সৎকে; সৎ বলে, হায়, আমি যদি পাইতাম রূপকে! পরস্পরে উভয়েই উভয়কে চায় করিতে পূজা! অগাধ এই পূজা, অনুপম এই প্রেমের পূজা!"

বাস কহৈ হৌঁ ফূল কো পাউঁ ফূল কহৈঁ হৌঁ বাস।
ভাস কহৈ হৌঁ ভাব কো পাউঁ, ভাব কহৈ হৌঁ ভাস॥
রূপ কহৈ হৌঁ সত কো পাউঁ সত কহৈ হৌঁ রূপ।
আপস মেঁ দউ পূজন চাহৈঁ পূজা অগাধ অনূপ॥

এই প্রেমের নিগূঢ় ধর্ম্মেই সীমা হইয়া গেল অসীম এবং অসীম ধরা দিলেন

সীমায়। "প্রেমিক হইয়া যদি যায় প্রেম-পাত্র তবেই তো তাহাকে বলি প্রেম।"

আশিক মাশূক হৈব গয়া প্রেম কহাব্রে সোয়॥ বিরহ, ১৪৭

এই কথাই মৌলানা রুমী বলিয়াছেন—

মন তূ শুদম্ তূ মন শুদী, মন তন শুদম্ তূ জান শুদী।
তা কস্ ন গুয়দ বা'দ অজ ইন, মন দীগরম্ তূ দীগরী॥

"আমি হইলাম তুমি, তুমি হইলে আমি; আমি হইলাম তনু, তুমি হইলে প্রাণ। যেন ইহার পর আর কেহ না পারে বলিতে যে তোমা ছাড়া আমি, আর আমি ছাড়া তুমি।"

তিনি-ময় যদি হইতে চাও তবে প্রেম-ময় হও; কারণ তিনি প্রেম-স্বরূপ, প্রেম-রূপ, প্রেম-জীবন, প্রেমই তাঁহার পরিচয়। দাদূ বলিয়াছেন, "প্রেমই ভগবানের (আশ্রয়) জাতি, প্রেমই তাঁহার অঙ্গ, প্রেমই তাঁহার জীবন ও সত্তা, প্রেমই তাঁহার রঙ্গ।"

ইশ্‌ক্ অলহ কী জাতি হৈ, ইশ্‌ক্ অলহ কা অংগ।
ইশ্‌ক্ অলহ ঔজূদ হৈ, ইশ্‌ক্ অলহ কা রংগ॥ বিরহ, ১৫২

ইহাই হইল প্রেমের নবজন্ম। প্রেমের এই নব জন্ম হইলে সীমাও হইয়া ওঠে অসীম। এই নব জন্মের কথাই রজ্জবজী বলিয়াছেন— "সীমা হইয়া গেল অসীম, প্রেমেই হয় এই নব জন্ম"—

হদ বেহদ হো গয়া প্রেম নব্ব জনম হোয়॥

এই নব জন্ম যখন হইল তখন আমাতে ও তাঁহাতে সীমাতে ও অসীমে নিত্য মাখামাখি। তখন দেখি আমার অন্তর বাহির ও বিশ্বের সর্ব্বত্র ভরিয়া আছেন আমার প্রিয়তম, তিনি ছাড়া তখন আর কেহ কোথাও নাই।

"হে দাদূ, আমি তো দেখিতেছি নিজ প্রিয়তমকে আর তো দেখিতেছি না কাহাকেও; সকল দিশা সন্ধান করিয়া শেষে পাইলাম তাঁহাকে ঘটেরই মধ্যে!

হে দাদূ, আমি তো দেখিতেছি নিজ প্রিয়তমকে, আর তো দেখিতেছি না কাহাকেও; ভরপূর দেখিতেছি প্রিয়তমকে, বাহিরে ভিতরে বিরাজিত তিনিই!

হে দাদূ, আমি তো দেখিতেছি নিজ প্রিয়তমকে, দেখা মাত্রই সব দুঃখ যায় দূরে ; আমি তো দেখিলাম প্রিয়তমকে, সব কিছু ও সকলের মধ্যে আছেন সমাহিত হইয়া !

হে দাদূ, আমি দেখিতেছি নিজ প্রিয়তমকে, সেই দেখাটাই তো হইল যোগ ; প্রত্যক্ষ আমি দেখিতেছি প্রিয়তমকে, আর লোকেরা বলে কিনা তিনি আছেন কোন ঠিকানায় !”

দাদূ দেখৌঁ নিজ পীর কোঁ, দূসর দেখৌঁ নাহিঁ ।
সবৈ দিসা সৌঁ সোধি করি, পায়া ঘটহী মাঁহীঁ ॥৭২
দাদূ দেখৌঁ নিজ পীর কোঁ, ঔর ন দেখৌঁ কোই ।
পূরা দেখৌঁ পীর কোঁ, বাহরি ভীতরি সোই ॥৭৫
দাদূ দেখৌঁ নিজ পীর কোঁ, দেখত হী দুখ জাই ।
হূঁ তৌ দেখৌঁ পীর কোঁ, সব মৈঁ রহ্যা সমাই ॥ ৭৬
দাদূ দেখৌঁ নিজ পীরকোঁ, সোহী দেখণ জোগ ।
পরগট দেখৌঁ পীর কোঁ, কহা বতাবৈঁ লোগ ॥ পরচা, ৭৭

“হে দাদূ, চাহিয়া দেখ্ দয়ালকে, সকল ভরপূর করিয়া তিনিই বিরাজমান । প্রতি রূপে রূপে তিনিই করিতেছেন বিহার । তুই যেন মনে না করিস তিনি রহিয়াছেন দূরে ।

হে দাদূ, চাহিয়া দেখ্ দয়ালকে, বাহিরে ভিতরে তিনিই বিরাজিত । সকল দিকেই দেখিতেছি প্রিয়তমকে, দ্বিতীয় আর তো নাই কেহই ।

হে দাদূ, চাহিয়া দেখ্ প্রিয়তমকে, সম্মুখেই প্রত্যক্ষ স্বামী, জীবনের সার : যে দিকেই চাহি সে দিকেই দেখি নয়ন ভরিয়া সৃজনকর্ত্তা বিধাতাই দীপ্যমান !

হে দাদূ, চাহিয়া দেখ্ দয়ালকে, সব ঠাই রহিয়াছেন তিনি ঠাসিয়া অধিকার করিয়া (অবরুদ্ধ করিয়া) ; ঘটে ঘটেই বিরাজিত আমার স্বামী, তুই যেন কিছু অন্য রকম আর মনে না করিস্ ।”

দাদূ দেখু দয়াল কোঁ, সকল রহ্যা ভরপূরি ।
রূপ রূপ মেঁ রমি রহ্যা, তূঁ জিনি জানৈ দূরি ॥৭৮

দাদূ দেখু দয়াল কোঁ, বাহরি ভীতরি সোই।
সব দিসি্ দেখোঁ পীর কোঁ, দূসর নাহীঁ কোই ॥৭৯
দাদূ দেখু দয়াল কোঁ সনমুখ সাঈঁ সার।
জীধরি দেখোঁ নৈন ভরি দীপৈ সিরজনহার ॥৮০
দাদূ দেখু দয়াল কোঁ, রোকি রহ্যা সব ঠোর।
ঘটি ঘটি মেরা সাঁঈয়া তূঁ জিনি জাণৈ ঔর ॥৮১

তাঁহার সুরে-সুরে-প্রাণে প্রাণে লও আপনাকে যুক্ত করিয়া। আপনাকে দেও তাঁহার মধ্যে ভরপূর ডুবাইয়া।

"তাঁহার সঙ্গীতেই করিয়া নে তোর সঙ্গীত সমাহিত (যুক্ত, মিলিত, পূর্ণ, এক সুরে বাঁধা,) পরমাত্মাতেই সমাহিত কর তোর প্রাণ। এই মন তাঁহার মনের সাথে নে তুই এক সুরে বাঁধিয়া, তাঁর চিত্তের সঙ্গে এক সুরে বাঁধ তোর চিত্ত, তবে তো তুই রসিক সুজান।

সেই সহজেই করিয়া নে তোর সহজ সমাহিত, তাঁর জ্ঞানের সুরেই বাঁধিয়া নে তোর জ্ঞান; তাঁর মর্ম্মেই সমাহিত কর তোর মর্ম্ম, তাঁর ধ্যানের সঙ্গেই বাঁধিয়া নে তোর ধ্যান।

তাঁহার দৃষ্টিতে সমাহিত করিয়া নে তোর দৃষ্টি, তাঁর প্রেম-ধ্যানে সমাহিত করিয়া নে তোর প্রেম-ধ্যান; তাঁর 'সমঝে' সমাহিত কর তোর 'সমঝ', তাঁর লয়ে সমাহিত করিয়া নে তোর লয়।

তাঁহার ভাবে সমাহিত করিয়া নে তোর ভাব, তাঁর ভক্তিতে সমাহিত করিয়া নে তোর ভক্তি; তাঁর প্রেমে সমাহিত করিয়া নে তোর প্রেম, তাঁর প্রীতির সঙ্গে প্রীতি মিলাইয়া কর প্রীতি-রস পান।"

সবদৈঁ সবদ সমাই লে পরআতম সৌঁ প্রাণ।
য়হু মন মন সৌঁ বাঁধি লে চিত্তৈঁ চিত্ত সুজাণ ॥২৮৮
সহজৈঁ সহজ সমাই লে জ্ঞানৈঁ বন্ধ্যা জ্ঞান।
মর্মৈঁ মর্ম সমাই লে ধ্যানৈঁ বংধ্যা ধ্যান ॥২৮৯
দৃষ্টৈঁ দৃষ্টি সমাই লে সুরতৈঁ সুরতি সমাই।
সমঝৈঁ সমঝ সমাই লে লৈ সৌঁ লৈ লে লাই ॥২৯০

ভাৱৈঁ ভাৱ সমাই লে ভগতৈঁ ভগতি সমান।
প্রেমৈঁ প্রেম সমাই লে, প্রীতৈঁ প্রীতি রস পান॥

২৯১, পরচা।

হে অসীম, তোমার ভাব ভক্তি প্রেম সবই অখণ্ড ও অসীম। তোমার সাথেই মিলিতে হইবে আমাকে, হে প্রেমময়, আমাকেও অসীম প্রেমের ভাবে লও যুক্ত করিয়া।

"হে দেবতা, অখিল ভাব, অসীম ভগতি, অখণ্ড তোমার নাম। অখিল প্রেম, অসীম প্রীতি, অনন্ত তোমার সেবা ও প্রেমধ্যান। অখিল জ্ঞান অসীম ধ্যান অনন্ত আনন্দ স্বামী; অসীম দরশ অখিল পরশ, দাদূ কহেন, তোমারই মধ্যে।"

অখিল ভাৱ অখিল ভগতি অখিল নাৱঁ দেৱা।
অখিল প্রেম অখিল প্রীতি অখিল সুরতি সেৱা॥
অখিল গ্যাঁন অখিল ধ্যান অখিল আনংদ সাঈঁ।
অখিল দরস অখিল পরস দাদূ তুম্‌হ মাঁহীঁ॥

টোড়ী, ২৮৯

এত বড় অসীমে আপনাকে যুক্ত করিয়া দিতে, সাধক, ভয় হয়? "হে সেবক, সেবা করিতে করিস্ ভয়? মনে করিস্, 'আমার দ্বারা কিছুই নহে হইবার।' তুই যে আছিস, ততটুকু প্রণতি করিয়াই না হয় যা! আর কিছুই না হয় না-ই করিলি মনে।"

সেৱগ সেৱা করি ডরৈ হম থৈঁ কছূ ন হোই।
তূঁ হৈ তৈসী বন্দগী করি, ঔর ন জানৈ কোই॥

পরচা, ২৫২

তখন দাদূ প্রত্যক্ষ করিলেন, বাহিরে তিনি সীমান্বিত হইলেও অন্তরে তাঁহার অসীম ঐশ্বর্য্য। তাঁহার অসীম ভগতির মহিমায় তিনি সেই অসীম ভগবান হইতে কম কিসে? সেই ভগতির অসীমে নিবিড় যোগ চলুক সর্ব্বসীমাতীত তাঁহার সঙ্গে। তাই দাদূ জোর করিয়া বলিতেছেন,

"যেমন অপার আমার ভগবান তেমনি ভগতিও আমার অপার; এই দুয়েরই নাই কোনো সীমা পরিসীমা, সকল সাধক-জনই দিবেন ইহার সাক্ষ্য।

যেমন অনির্বচনীয় আমার ভগবান তেমনই অলেখ (অবর্ণনীয়) আমার ভক্তি; এই দুইয়েরই নাই কোনো সীমা পরিসীমা, সহস্র মুখে শেষ (অনন্ত) কেও ইহা হইবে বলিতে।

যেমন পরিপূর্ণ আমার ভগবান, তেমনি সমান পূর্ণ আমার ভক্তি। এই দুইয়েরই নাই কোনো সীমা পরিসীমা, হে দাদূ, নাই ইহার কোনো অন্যথা।"

জৈসা রাম অপার হৈ তৈসী ভগতি অগাধ।
ইন দূনূঁ্য কী মিত নহীঁ সকল পুকারৈঁ সাধ ॥২৪৫
জৈসা অবিগত রাম হৈ তৈসী ভগতি অলেখ।
ইন দূনূঁ্য কী মিত নহীঁ সহস মুখাঁ কহ সেখ ॥২৬৪
জৈসা পূরণ রাম হৈ পূরণ ভগতি সমান।
ইন দূনূঁ্য কী মিত নহীঁ দাদূ নাহীঁ আন ॥

পরচা, ২৪৭

দাদূ ও রহীম খানখানাঁ ঃ

ভক্তদের মধ্যে প্রথিত আছে যে আকবরের বিখ্যাত সহায় মহা পণ্ডিত ভক্ত ও কবি আবদর রহীম খানখাঁনার সঙ্গে দাদূর ঘটিয়াছিল পরিচয়। রহীমের মত এমন বিদ্বান উৎসাহী ও অনুরাগী লোকের পক্ষে দাদূর মত মহাপুরুষকে দেখিবার ইচ্ছা না হওয়াই আশ্চর্য্য।

১৫৪৪ খ্রীষ্টাব্দে দাদূর জন্ম, রহীমের জন্ম ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে, সেই হিসাবে দাদূ হইতে রহীম বার বৎসরের কনিষ্ঠ। কেহ কেহ বলেন রহীমের জন্ম ১৫৫৩ খ্রীষ্টাব্দে। ১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দে যখন আকবরের সহিত দাদূর মিলন হয় তখন রহীম নানা কাজে ব্যস্ত থাকায় দাদূর সঙ্গে আলাপ করিতে পারেন নাই। হয়তো অন্যান্য সকল লোকের গোলমালের মধ্যে এই মহাপুরুষকে দেখিবার ইচ্ছাও রহীমের ছিল না। যাহা হউক ইহার কিছুকাল পরেই রহীম দাদূর সঙ্গে তাঁহার নিভৃত আশ্রমে গিয়া দেখাসাক্ষাৎ ও আলাপ করেন। ভক্তগণ বলেন রহীমের কয়েকটি হিন্দী দোহার মধ্যেই এই সাক্ষাৎকারের ছাপ রহিয়া গিয়াছে।

রহীম দাদূর নিকট গেলে, কথা উঠিল পরব্রহ্ম সম্বন্ধে। দাদূ কহিলেন “যিনি জ্ঞানবুদ্ধির অগম্য তাঁর কথা বাক্যে বলা যায় কেমন? যদি কেহ প্রেমে ও আনন্দে তাঁহাকে উপলব্ধিও করে, তবে প্রকাশ করিবার ভাষা তাহার কোথায়?” এই ভাবের কথা কবীরের ও দাদূর বাণীর মধ্যে নানা স্থানেই আছে।"

মৌন গহৈঁ তে বাবরে বোলৈঁ খরে অয়ান ॥”

সাচ অংগ, ১০৬

“যে মৌন রহে, সে পাগল; যে বলে, সে একেবারে অজ্ঞান।” তাই রহীমের দোহাতেও পাই।

রহিমন বাত অগম্য কী কহন সুননকী নাহিঁ।
জে জানত তে কহত নহিঁ কহত তে জানত নাহিঁ ॥

অর্থাৎ—“হে রহীম সেই অগম্যের কথা না-যায় বলা না-যায় শোনা। যাহারা জানেন, তাঁহারা বলেন না; আর যাঁহারা বলেন, তাঁহারা জানেন না।”

প্রসঙ্গক্রমে দাদূ বলিলেন, "তাঁহাকে "বিষয়" (objective) অর্থাৎ পর করিয়া দেখিলে চলিবে না, তাঁহাকে দেখিতে হইবে আপন করিয়া। তিনি ও আমি যদি একাত্মা না হইয়া, দুই পরস্পরে ভিন্ন, তবে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এমন স্থান নাই যে আমাদেরই এই দুই জনকে ধরে।" তাই দাদূ বলিলেন—

"যেখানে ভগবান আছেন সেখানে আমার (আর স্বতন্ত্র) নাই ঠাই, যেখানে আমি আছি সেখানে আবার তাঁহার নাই ঠাই; দাদূ বলেন, সঙ্কীর্ণ সেই মন্দির, দুইজন হইলে সেখানে নাই ঠাই।"

জহাঁ রাম তহঁ মৈঁ নহী মৈঁ তহঁ নাহীঁ রাম।
দাদূ মহল বারীক হৈ দ্বৈ কো নাহীঁ ঠাম॥ পরচা অংগ, ৪৪

"সেই মন্দির সূক্ষ্ম ও সঙ্কীর্ণ।"

"মিহীঁ মহল বারিক হৈ"। দাদূ পরচা অঙ্গ, ৪১

দাদূ বলেন,

"হে দাদূ, আমার হৃদয়ে হরি করেন বাস, দ্বিতীয় আর কেহ সেখানে নাই। সেখানে অন্য কাহারও আর স্থানই নাই, রাখিতে গেলেই বা রাখি কোথায়?"

মেরে হিরদৈ হরি বসৈ দূজা নাঁহী ঔর।
কহো কহাঁ ধোঁ রাখিয়ে নহীঁ আন কোঁ ঠৌর॥
নিহকরমী পতিব্রতা অংগ, ২১

রহীমের দোহাতেও দেখি—

রহিমন গলী হৈ সাঁকরী, দূজো না ঠহরাহিঁ।
আপু অহৈ তো হরি নহীঁ হরি তো আপু নাহিঁ॥

"হে রহীম, সঙ্কীর্ণ সেই পথ, দুই জন সেখানে পারে না দাঁড়াইতে। 'আপনি' থাকিলে সেখানে থাকেন না হরি, হরি থাকিলে সেখানে থাকে না 'আপনি'।"

তাঁহার সঙ্গে এমন করিয়া একাত্ম হইয়া গেলে আর "ভজন-ত্যজন" সবই হইয়া যায় এক। তাঁহার সঙ্গে তো আর ভেদ নাই, তাই ভজিলেও আর পরকে হয় না ভজা, ত্যজিলেই বা আর ত্যজিব কাহাকে? দাদূ এই সংশয়ই ও প্রশ্নই অংগবংধূ সংগ্রহের বিরহ অংগের ২৯৪—২৯৭ বাণীতে আছে।

তাঁহার অড়াণা রাগিণীর (১:৬) গান ও এখানে স্মরণীয়।

ভাইরে তবকা কথিসি গিয়াঁনাঁ।
জব দূসর নাহীঁ আনা॥……

"ভাইরে তবে আর জ্ঞানের কথা কি বলিস, যখন অন্য দ্বিতীয় আর কিছুই নাই?" রহীমের বাণীতেও দেখি,

ভজৌঁ তো কাকো ভজৌ তজৌঁ তো কাকো আন।
ভজন তজন তে বিলগ হৈঁ তেহি রহীম তূ জান॥

"হে রহিম, ভজিলেই বা ভজিবে কাহাকে, ত্যজিলেই বা ত্যজিবে কাহাকে? ভজন-ত্যজনের যিনি অতীত তাঁহাকেই কর তুমি উপলব্ধি।"

সংসারের সঙ্গে সাধনার, বিশ্বের সঙ্গে ব্যক্তির, কোনো বিরোধই নাই। এই বিশ্বের মতই, আমাদেরও যেমন আত্মা আছে তেমনই দেহও আছে। তাই দাদূ বলিলেন, "দেহ যদি থাকে সংসারে আর অন্তর যদি থাকে ভগবানের পাশে, তবে কালের জ্বালা দুঃখ ত্রাস কিছুই পারে না ব্যাপিতে।"

দেহ রহৈ সংসার মৈঁ জীৱ রাম কে পাস।
দাদূ কুছ ব্যাপৈ নহীঁ কাল ঝাল দুখ ত্রাস॥ বিচার অংগ, ২৭

তাই রহিমও ও কহিলেন,—

তন রহীম হৈ কর্ম্ম বস মন রাখো ওহি ওর।
জল মেঁ উলটী নাৱ জ্যোঁ খৈঁচত গুন কে জোর॥

"রহিম বলেন, তনু হইল কর্ম্মবশ, তাই মন রাখো তাঁর দিকে; জলের ধারায় উল্টা দিকে নৌকা যেমন স্বধু গুণের জোরেই যায় টানা।"

মন যখন এইভাবে ভগবানে থাকে ভরপূর, তখন সংসার তাহার উপর কিছুই করিতে পারে না প্রভাব। তখন সাংসারিকতাকে তাড়াইবার জন্য কোনো কৃত্রিম আয়োজন আর রাখিতে হয় না খাড়া, ভগবদ্ভাবে পূর্ণ মন হইতে সংসার বাসনা আপনি দাঁড়ায় সরিয়া।

দাদূ মেরে হিরদৈ হরি বসৈ দূজা নাহীঁ ঔর।
কহৌ কহাঁ ধৌঁ রাখিয়ে নহীঁ আন কৌঁ ঠৌর॥
নিহকরমী প্রতিব্রতা অংগ, ২১

"দাদূ বলেন, আমার হৃদয়ে একমাত্র হরিই করেন বাস, দ্বিতীয় আর কেহই নয়। অন্যের আর স্থানই বা কোনখানে? বল, অন্যকে রাখিই বা কোথায়?"

দূজা দেখত জাইগা এক রহ্যা ভরপূরী॥

দাদূ, নিহকরমী পতিব্রতা অংগ, ২৪

"একই ভরপূর আছেন পূর্ণ করিয়া, ইহা দেখিলে অপর যাহা কিছু তাহা আপনিই যাইবে সরিয়া।"

ঠিক দাদূর মতই রহীমও বলিলেন,

প্রীতম ছবি নৈনন বসী পর ছবি কহাঁ সমায়।
ভরা সরায় রহীম লখি পথিক আপ ফিরি জায়॥

"প্রিয়তমের ছবি যদি নয়নে থাকে ভরপুর বসিয়া, তবে পর-ছবি আর প্রবেশ করিবে কোথায়? হে রহীম, পান্থশালা পরিপূর্ণ দেখিলে (অপর) পান্থ আপনি যায় ফিরিয়া!"

এমন অবস্থায় কৃত্রিম ভেখ সাজ সজ্জা কিছুই লাগে না ভাল। ভগবানে যে জীবন ভরপূর, সে কি আর কোনো কৃত্রিম সাজ সজ্জা পারে সহিতে?

দাদূও বলিলেন,

বিরহিণী কোঁ সিংগার ন ভাবৈ.........
বিসরে অংজন মংজন চীরা
বিরহ বিথা যহু ব্যাপৈ পীরা॥

দাদূ, রাগ গৌড়ী ২০

"বিরহিণীর সাজ সজ্জা কিছুই লাগে না ভাল। বিরহের এই তীব্র ব্যথা তনু মন ব্যাপিয়া, তাই অঞ্জন মঞ্জন বসন ভূষণের কথা তাহার আর মনেই আসে না।"

এবং দাদূ বলেন,

জিন কে হিরদৈ হরি বসৈ.........
...মৈঁ বলিহারী জাউঁ॥ সাধ অংগ, ৬৩

"যাঁহাদের হৃদয়ে হরি বাস করেন, তাঁহাদের কাছে আমি নিজেকে করি উৎসর্গ।"

রহীমও বলেন,

অংজন দিয়ো তো কিরকিরী সুরমা দিয়ো ন জায়।
জিন আঁখিন সোঁ হরি লখ্যৌ রহিমন বলি বলি জায়॥

"অঞ্জন লাগে নয়নে চোখের বালির মত, 'সুরমা'* তো নয়নে যায়ই না দেওয়া। যেই নয়ন দেখিয়াছে শ্রীহরির রূপ, রহীম বার বার সেই নয়নের কাছে আপনাকে দেয় উৎসর্গ করিয়া।"

দাদূ কহিলেন, এমন নয়ন নিখিল-বিশ্ব জুড়িয়া দেখে—চলিয়াছে ভগবানের নিত্য রাস লীলা। সেই নয়ন দেখে, ঘটে ঘটেই চলিয়াছে সেই লীলা, ঘটে ঘটেই মহাতীর্থ। "ঘটে ঘটেই গোপী, ঘটে ঘটেই কৃষ্ণ, ঘটে ঘটেই রামের অমরা-পুরী। অন্তরে অন্তরে সর্ব্বত্রই গঙ্গা যমুনা, তাহাতেই বহিয়া চলে প্রস্যন্দিত সরস্বতীর নীর। কুঞ্জকেলির পরম বিলাস চলিয়াছে সেখানে, সকল সহচরী মিলিয়া সেখানেই খেলিতেছে রাস। বিনা বেণুতেই বাজে সেখানে বাঁশরী, সহজেই হয় চন্দ্র সূর্য্য আর কমলের পূর্ণ বিকাশ। পূরণ ব্রহ্মের সেখানে প্রকাশ, দাদূ দাস দেখে সেখানে এই নিজ শোভা।"

ঘটি ঘটি গোপী ঘটি ঘটি কান্হ।
ঘটি ঘটি রাম অমর অস্থান॥
গংগা জমনা অংতর বেদ।
সুরসতী নীর বহৈ পরসেদ॥
কুংজ কেলি তহঁ পরম বিলাস।
সব সংগী মিলি খেলৈঁ রাস॥
তহঁ বিন বেণু বাজৈ তূর।
বিগসৈ কমল চংদ অরূ সূর॥
পূরম ব্রহ্ম পরম পরকাস।
তহঁ নিজ দেখৈ দাদূ দাস॥

---

* "সুরমা" হইল চক্ষে লাগাইবার এক প্রকার কৃষ্ণবর্ণ চূর্ণ।

অবতার তত্ত্বের কথায় রহিম বলিলেন—

রহিমন সুধি সব তে ভলী লগৈ জো ইকতার।
বিছুরৈ প্রীতম চিত মিলৈ যহৈ জান অৱতার॥

“হে রহিম (প্রেমের) সেই স্মরণই তো সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যদি তাহা নিরন্তর একতানে থাকে লাগিয়া। চিত্তের মধ্যে হারানো প্রিয়তমকে যে ফিরিয়া পাওয়া, ইহাই তো হইল অবতার।”

সমান না হইলে তো হয় না প্রেমের লীলা। প্রেমের দায়ে আমাকেও তিনি লইয়াছেন সমান করিয়া। আমার মধ্যে তাঁর এই লীলাই হইল সীমার মধ্যে অসীমের লীলা। সিন্ধুতে-বিন্দুতে লীলা যে জন দেখিয়াছে সে আপনাকেই ফেলে হারাইয়া। রহিম কহিলেন,

বিংদু ভো সিংধু সমান কো অচরজ কাসোঁ কহৈ।
হেরনহার হেরান রহিমন অপুনে আপতেঁ॥

“বিন্দু হইল সিন্ধুর সমান এই আশ্চর্য্য বার্ত্তা কে আর বলিবে কাহাকে? রহীম কহেন, যে জন নিজের মধ্যে নিজের এই লীলা দেখিল, সে নিজেই সেখানে গেল বিলীন লইয়া।”

দাদূ বলিয়াছেন, “অন্তরেই কাঁদ।”

মনহীঁ মাহিঁ ঝূরণাঁ। বিরহ অংগ, ১০৮

নির্বাক্ হইলেই বা আর ক্ষতি কি? বাক্যের আর প্রয়োজনই বা কি? রহীম বলেন,

জিহি রহীম তন মন লিয়ো কিয়ো হিএ বিচ ভৌন।
তাসোঁ সুখ দুখ কহন কো রহী বাত অব কৌন॥

“হে রহীম, যিনি তনু মন অধিষ্ঠান করিয়া লইয়া হৃদয়ের মাঝেই লইলেন বাসা, তাঁহাকে (বাক্যে) সুখ দুঃখ জানাইবারই আর প্রয়োজনই রহিল কি?”

এই যে প্রেমের ভাবে ভক্ত ও ভগবানের অভেদ তত্ত্ব, তাহার নানা পরিচয় দাদূ কবীর প্রভৃতি মহাপুরুষদের বাণীর মধ্যে পাওয়া যায়। এখানে সে সব কথা বিশদ করিয়া বলা নিষ্প্রয়োজন।

দাদূর সঙ্গে রহীমের কথা কি এক বারেই হইয়াছিল বা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে

সাক্ষাৎকারের মধ্যে নানাপ্রসঙ্গে হইয়াছে তাহাও বলা কঠিন। তবে এই সব সাধকদের মতামতের ছাপ যে তাঁহার লেখায় পড়িয়াছে তাহা বেশ বুঝা যায়।

তবে ইহাও সত্য যে দুঃখের আঘাত ছাড়া মানুষের মন যথার্থভাবে ভগবানের দিকে যাইতে চায় না। তাই রহীম একবার দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, "মানুষের হৃদয় যখন বিষয়ে থাকে জড়াইয়া তখন কিছুতেই ভগবানকে ধরিতে চায় না আপন হৃদয়-আসনে।" "পশু খড় খাইবে স্বাদের সঙ্গে, কিন্তু গুড় খাওয়াইতে হইলেই গুলিয়া তাহাকে ধরিয়া দিতে হয় গিলাইয়া।"

রহিম রাম ন উর ধরৈ রহত বিষয় লপটায়।
পসু খড় খাত সৱাদ সোঁ গুড় গুলিয়াএ খায়॥

আকবর যত দিন বাঁচিয়া ছিলেন ততদিন রহীম সুখেই ছিলেন। নানাবিধ দান ও ঔদার্য্যে তাঁর নাম ছিল প্রখ্যাত। পরে যখন রহীমের দুঃখ দুর্দ্দিন আসিল তখন দাদূ পরলোকে। তাই রহীম তখন আর দাদূর কাছে যাইয়া সান্ত্বনা পাইবার আশা করিতে পারেন নাই। তখন রহীম দাদূর পুত্র গরীবদাসের সঙ্গে দেখা করিয়া মনের দুঃখের কথা বলিলেন। গরীবদাস ছিলেন একান্ত ভগবৎপরায়ণ প্রেমিক মানুষ, তাঁহার সঙ্গে কথায় বার্ত্তায় রহীমের মনও ভগবানের প্রতি ভক্তিতে উঠিল ভরিয়া। তাই ভগবানকে উদ্দেশ করিয়া রহীম বলিলেন,

সমৈ দসা কুল দেখি কৈ সবৈ করত সনমান।
রহিমন দীন অনাথ কো তুম বিন কো ভগবান॥

"সময় দশা বংশ ইত্যাদি দেখিয়াই সকলে করে সম্মান। রহীম বলেন হে ভগবান, দীন অনাথের তুমি ছাড়া আর কে আছে।"

গরীবদাস ছিলেন ভক্তিতে প্রেমে ভরপুর মানুষ। তাঁহার সংস্পর্শে রহীমের মন যখন উঠিল ভরিয়া, তখন তিনি ভাবিলেন, "ক্ষতি কি দুঃখ দুর্দ্দশায়? যদি ভগবানের জন্য ব্যাকুলতা উপজে আমাদের চিত্তে।"

রহিমন রজনী হী ভলী পিয় সোঁ হোয় মিলাপ।
খরো দিৱস কিহি কাম কো রহিবো আপুহি আপ॥

"হে রহীম, রজনীতেই যখন প্রিয়ের সঙ্গে হয় মিলন তখন রজনীই তো ভাল। উত্তম প্রখর দিন আর তবে কোনো কাজের ? তখন তো শুধু আপনাকে লইয়াই আপনি থাকা।"

এই কথাই রহীম আর একটি দোহাতেও বলিয়াছেন, "বৈকুণ্ঠ লইয়াই বা করিব কি, কল্পবৃক্ষের ঘন ছায়াতেই বা আমার প্রয়োজন কি ? (পত্র-বিরল) পলাশও আমার ভাল, যদি কণ্ঠে পাই আমার প্রিয়তমের বাহু-বন্ধন।"

কাহ করৌঁ বৈকুংঠ লৈ কল্পবৃক্ষকী ছাঁহ।
রহিমন ঢাক সুহাৱনো জো গল পীতম বাঁহ ॥*

---

* অনেকের মতে এই দোহাটি ভক্ত অহমেদের।

তখনকার সন্তমত সম্বন্ধে
ভক্ত তুলসীদাসজী :

এই গ্রন্থের উপক্রমণিকাতে ২৭—২৯ পৃষ্ঠায় দাদূ প্রভৃতি সন্তদের মত সম্বন্ধে ভক্ত তুলসীদাসের কিছু মতামত উদ্ধৃত করা হইয়াছে। উদ্ধৃত মাত্র করিয়াছি, নিজের কথা কিছু বলি নাই। কারণ, দাদূ-তুলসী উভয়ে মহাপুরুষ। তাঁহাদের মতের ঐক্য অনৈক্য সম্বন্ধে হঠাৎ কিছু বলিতে ভরসা হয় না। তাই সেখানে মহামহোপাধ্যায় ভক্তপ্রবর পরলোকগত সুধাকর দ্বিবেদী মহাশয়ের মতই উদ্ধৃত করিয়াছি। তিনি ছিলেন একাধারে ভক্তির ও নম্রতার আধার আর ভারতীয় সর্ব্ব বিদ্যার প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি।

যাহা হউক সেই অংশটা দেখিয়া আমার দুই একজন বন্ধু বলিলেন, “হয় তো ইহাতে তুলসীদাসের মত মহাপুরুষকে লোকে ঠিক বুঝিতে পারিবে না। আপনি নিজে কিছু বলিতে সঙ্কোচ বোধ করেন তো তুলসীদাসের বিশেষ ভক্ত কাঁহারও লেখা এই বিষয়ে উদ্ধৃত করুন।”

তখন ভাবিলাম তুলসীর শ্রেষ্ঠ ভক্ত কাঁহার লেখা উদ্ধৃত করি? মনে হইল নাগরী প্রচারিণী সভা হইতে প্রকাশিত তুলসী গ্রন্থাবলীই এখন তুলসীর সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সম্পাদিত গ্রন্থ, আর তাহার মুখ্য সম্পাদক শ্রীযুত রামচন্দ্র শুক্ল মহাশয় তুলসীদাসের একজন একান্ত ভক্ত। তাই দেখা যাউক এই বিষয়ে তাঁহাদের মতামত কিছু দেওয়া যায় কিনা। শুক্ল মহাশয় যে শুধু তুলসীরই ভক্ত তাহা নহে তিনি রাম নামেরও একজন মহাভক্ত। কাজেই তাঁহার মতামত উদ্ধৃত হইলে, প্রাচীন নবীন কোনো সম্প্রদায়েরই কাহারও আর কিছু বক্তব্য থাকিবে না।

তুলসীগ্রন্থাবলীর প্রথমভাগের শেষদিকে “কথা ভাগ” নামক অংশে তিনি নিজে কিছু কিছু “পরম্পরা” (tradition) ও লোক চলিত গল্প উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহা উদ্ধৃত করাতেই বুঝিতে পারি রাম নামের বিষয়ে শুক্ল মহাশয়ের শ্রদ্ধা কত গভীর। শুক্ল মহাশয় উদ্ধৃত করিতেছেন,

১। “এক সময় ব্রহ্মা দেবতাদের জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘আপনাদের মধ্যে অগ্রে

কে পূজনীয় ?' এই কথায় দেবতাদের পরস্পরের মধ্যে লাগিল বিবাদ। সকলেই করেন অগ্রপূজা দাবী। ব্রহ্মা বলিলেন, 'যিনি সর্ব্বাগ্রে পৃথিবী পরিক্রমা করিয়া আসিবেন, তিনিই অগ্রে পূজনীয় হইবেন।' সকল দেবতা স্ব স্ব বাহন সহ যাত্রা করিলেন। গণেশের বাহন ইন্দুর ; তাঁহার তো দৌড়ান অসম্ভব। তাই তিনি নারদের পরামর্শে মাটিতে রাম নাম লিখিয়া তাহার চারিদিকেই পরিক্রমা করিলেন। ব্রহ্মাও নামের প্রভাব বুঝিয়া গণেশকেই প্রথম-পূজ্য-পদ দিলেন।"

(তুলসীগ্রন্থাবলী, প্রথমভাগ, কথাভাগ, ১৫ পৃষ্ঠা, রামনামকা প্রভাব।)

২। "এক সময় মহাদেব পার্ব্বতীকে তাঁহার সঙ্গে খাইতে অনুরোধ করিলে, পার্ব্বতী কহিলেন, "আমার সহস্র-নাম পড়া বাকী আছে।" মহাদেব কহিলেন, 'একবার রাম নাম লও, তাহাতেই সহস্র-নামের ফল হইবে'।"

৩। "সমুদ্র মন্থনের সময় মহাদেব ঐ নাম স্মরণ করিয়াই বিষ পান করেন ; তাই বিষ কণ্ঠেই রহিল, হৃদয়ে আর প্রবেশ করিল না।"

৪। "জীবন্তী নামে এক নব যৌবনা নারী পতির মৃত্যুর পর ব্যভিচারিণী হইয়া বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করেন। তিনি আপন শুককে রাম নাম পড়াইতেন বলিয়াই তাঁহার মুক্তি হইয়া গেল।"

হউক উদ্ধৃত, তবু শুক্ল মহাশয়ের লিখিত এই সব নোট দেখিলেই বুঝা যায় তিনি কিরূপ রাম-নামে ভক্তি-পরায়ণ।

রামচন্দ্র শুক্ল মহাশয় কোথাও দাদূর নাম করেন নাই। তবে সন্তদের মতামতের প্রতি তুলসীদাসজীর কিরূপ মনোভাব ছিল তাহা তাঁহাকে লিখিতে হইয়াছে। তুলসীদাসজীর লেখা উদ্ধৃত করিয়াও তিনি তাহা দেখাইয়াছেন। শুক্ল মহাশয় তুলসীদাসজীর লেখা হইতেই উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে তুলসীজী কিরূপ বিনয়ী ছিলেন। তুলসীজী বলেন, "আমি কবি নহি, চতুর প্রবীণ ও নহি। আমি সকল কলা ও সব বিদ্যা বিহীন। কবিত্ব বিবেক আমার কিছুই নাই। সাদা কাগজে লিখিয়া ইহা আমি করিতেছি স্বীকার। যে সব কাম ক্রোধ ও কাঞ্চনের দাস রামের ভণ্ড ভক্ত বলিয়া দেয় পরিচয়, তাহাদের মধ্যে জগতে প্রথমে লেখা আমার নাম। ধিক্, এমন ব্যর্থ-কর্ম্ম-আড়ম্বরী ধর্ম্ম-ধ্বজকে ধিক্।" ইত্যাদি

করি ন হোউঁ নহিঁ চতুর প্রবীনা।
সকল কলা সব বিদ্যা হীনা॥
কবিত বিবেক এক নহিঁ মোরে।
সত্য কহৌঁ লিখি কাগদ কোরে॥
বংচক ভকত কহাই রাম কে।
কিংকর কংচন কোহ কামকে॥
তিন্হ মহঁ প্রথম রেখ জগ মোরী।
ধিগ ধর্মধ্বজ ধঁধরক ধোরী॥ ....

তুলসীগ্রন্থাবলী, তৃতীয় খণ্ড, প্রস্তাবনা, ৬১ পৃষ্ঠা

সঙ্গে সঙ্গেই শুক্ল মহাশয় লেখেন, “এই নম্রতা তাঁহার লোক ব্যবহারে কতটা প্রয়োগ করা সম্ভব হইয়াছিল, তাহার বিচারও আমাদের রাখিতে হইবে। দুষ্ট ও খল জনগণের সম্বন্ধে তিনি এতটা বিনয় রক্ষা করিতে পারিতেন না যে তাহাদের তিনি দুষ্ট ও খল না বলেন অথবা তাহাদের স্বরূপ সম্বন্ধে মনোযোগ না দেন। সাধুজনের বন্দনা সমাপ্ত করিয়াই তিনি খলদের কথা স্মরণ করেন।” .. ..

তুলসীগ্রন্থাবলী, তৃতীয় খণ্ড, প্রস্তাবনা, ৬২ পৃষ্ঠা

“তিনি সর্ব্বাপেক্ষা চটা ছিলেন, ‘পাষণ্ড’পনায় ও তাহাদের ‘অনধিকার-চর্চ্চায়’।”........... ঐ, ৬৩ পৃঃ

“তাঁহাদের কথা শুনিতেই তিনি চটিয়া উঠিতেন এবং কখনও কখনও তর্জ্জন করিয়া উঠিতেন। একজন সাধু একবার ‘অলখ অলখ’ কহিতেছিলেন, তুলসীদাসজী তাহা শুনিয়া থাকিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিলেন”—

তুলসী অলখহী কা লখৈ রাম নাম জপু নীচ।

[তুলসী বলেন, “অলখকে আর লখিবি কি ? ওরে নীচ, জপ, রামনাম” ।]

“এই “নীচ” শব্দেই বুঝা যায় তিনি কি পরিমাণে ইহাতে চটিয়া উঠিয়াছিলেন। এই সব “আড়ম্বরী” ও “পাষণ্ড”রাই তাঁহার মেজাজ করিয়া তুলিয়াছিল এমন চটা!” ঐ ৬৩ পৃঃ

“ইহাতেই বুঝা যায়, গোস্বামী তুলসীদাসজীর অন্তরের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান

বৃত্তি ছিল সরলতা, ইহার বিপরীতভাব তিনি সহিতেই পারিতেন না। কাজেই এই চটাভাবটুকুও তাঁর সরলতার অন্তর্ভুক্ত করিয়া আমরা সংক্ষেপে বলিতে পারি যে তাঁহার স্বভাব ছিল অত্যন্ত সরল শান্ত গভীর ও নম্র। সদাচারের তিনি ছিলেন প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি। ধর্ম্ম ও সদাচারকে যে সব ভাব দৃঢ় না করে, সে সব ভাব যতই উচ্চ হউক না কেন, তাহা তিনি ভক্তি বলিয়া মানিতেন না। তাঁর ভক্তি সেই ভক্তি নয় যাহাকে কেহ লম্পটতা বা বিলাসিতার আবরণ বানাইতে পারে।"………… ঐ ৬৩ পৃঃ

"প্রস্তাবনা"র পরবর্ত্তী প্রকরণে অর্থাৎ "ধর্ম্ম ঔর জাতীয়তাকা সমন্বয়" অধ্যায়ে (১২৪ পৃষ্ঠায়) শুক্ল মহাশয় বলেন,

"গোস্বামী তুলসীদাসজী কলিকালের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা তাঁহারই সময়কার। তাহাতে তিনি দেখাইয়াছেন যে তখন সাধারণ ধর্ম্ম ও বিশেষধর্ম্ম উভয়েরই ঘটিয়াছিল ন্যূনতা। সাধারণ ধর্ম্ম হ্রাসের নিন্দা সকলেরই লাগে ভাল; কিন্তু বিশেষ ধর্ম্ম হ্রাসের নিন্দা, সমাজ ব্যবস্থা উল্লঙ্ঘনের নিন্দা সেই সমস্ত লোকের ভাল লাগে না যাঁহারা আজকালকার অব্যবস্থাকেই মনে করেন মহত্ত্বের দ্বার। তাঁহারাই তুলসীদাসের এই সব চৌপাই কবিতাতে দেখেন তাঁহার হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা।"—

"নিরাচার যে শ্রুতি পথ ত্যাগী।
কলিযুগ সোই জ্ঞানী বৈরাগী ॥*
সূদ্র দ্বিজন্হ উপদেসহিঁ গ্যানা।
মেলি জনেউ লেহিঁ কুদানা ॥
জে বরনাধম তেলি কুম্হারা।
স্বপচ কিরাত কোল কলৱারা ॥*
নারী মুঈ ঘর সংপতি নাসী।
মুঁড় মুড়াই হোহিঁ সংন্যাসী ॥
তে বিপ্রন সন পাঁৱ পুজারহিঁ।
উভয় লোক নিজ হাথ নসারহিঁ ॥

---

* দ্র, রামচরিতমানস, না-প্র-সভা, উত্তরকাণ্ড, ৪৮৩ পৃঃ।

স্রূদ্র করহিঁ জপ তপ ব্রত দানা ।
বৈঠি বরাসন কহহিঁ পুরানা ॥” ‘

[“যাহারা আচার বিহীন ও শ্রুতিপথত্যাগী, কলিযুগে তাঁহারই জ্ঞানী বৈরাগী! শূদ্র করেন ব্রাহ্মণগণকে জ্ঞানের উপদেশ, উপবীত ধারণ করিয়া গ্রহণ করেন সব কু-দান! যাহারা সব বর্ণাধম তেলী কুম্ভকার শ্বপচ কিরাত কোল ও কলওয়ার (শুঁড়ি); অথবা যাহাদের নারী মরিয়াছে কি যাহারা সম্পত্তি নষ্ট করিয়াছে তাহারাই মাথা মুড়াইয়া হয় সন্ন্যাসী! তাহারাই বিপ্রদের দ্বারা পূজা করায় চরণ, ও উভয় লোক নিজ হাতে করে নষ্ট। শূদ্র করে জপ তপ ব্রত দান, আর শ্রেষ্ঠাসনে বসিয়া পুরাণ (শাস্ত্র) করে উপদেশ!”]
ঐ, ১২৪ পৃঃ

“প্রত্যেক জাতি অক্ষুণ্ণভাবে আপন আপন মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিবে, ইহাই ছিল গোস্বামী তুলসীদাসজীর দৃঢ় মত, একথা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে”……
ঐ, ১২৪ পৃঃ

“অতএব লোক-মর্য্যাদার দৃষ্টির দিক দিয়া নিম্নবর্ণের লোকের লোক-ধর্ম্মই হইল উচ্চ বর্ণের লোকের উপর শ্রদ্ধা-ভাব রক্ষা করা…… …ইহাই ছিল গোস্বামীজীর Social discipline অর্থাৎ সামাজিক ব্যবস্থা। এই ভাব হইতেই তুলসীদাসজী কহিয়াছেন—

“পূজিয় বিপ্র সীল-গুণ-হীনা।
স্রূদ্র ন গুণময় জ্ঞান প্রবীনা॥

[“শীলহীন গুণহীন হইলেও বিপ্র পূজনীয় এবং গুণময় ও জ্ঞানে প্রবীণ হইলেও শূদ্র পূজ্য নহে।”]
ঐ, ১২৫ পৃঃ।

“শৈব বৈষ্ণব শাক্ত এবং কর্ম্মকাণ্ডীদের মধ্যে তো নানা বাদ বিবাদ চলিতেই ছিল, তার পর মুসলমানদের সঙ্গে অবিরোধ দেখাইতে এবং নিরক্ষর জনতাকে স্বপক্ষে লইতে অনেক নব নব পন্থ ও সম্প্রদায় হইয়াছিল প্রবর্ত্তিত। তাহারা একেশ্বরবাদের অন্ধ বিশ্বাসী, উপাসনাতেও তাহাদের প্রেম ভাবের রঙ্গ ঢঙ্গ, জ্ঞান বিজ্ঞানে তাহাদের অবজ্ঞা। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত গণের প্রতি তাহাদের উপহাস, বেদান্তের দুই চারটি প্রসিদ্ধ শব্দের অপপ্রয়োগই ছিল তাহাদের বাঁধা

পদ্ধতি।”…“তাই ইহাদের মধ্যে মাঝে মাঝে এক এক জন সদ্‌গুরু হইয়া পড়িত বাহির! ইহারা ধর্ম্মের এক দিক হইতে পালাইয়া, অন্য দিকের এক আধ টুকড়া লইয়া, কোনো মতে কাজ চালাইত! আর কতক লোকে খঞ্জনী করতাল লইয়া তাহাদেরই করিত অনুবর্ত্তন! ইহাদের দম্ভ বাড়িয়াই চলিয়াছিল।”—

“ব্রহ্ম-জ্ঞান বিনু নারী নর কহহিঁ ন দূসরি বাত।*

[“ব্রহ্ম-জ্ঞান ছাড়া নর নারী আর অন্য কথাই কয় না” !]

(ঐ পৃঃ ৯৯-১০০)

“ভক্তির যখন এই বিকৃত রূপ উত্তর ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত তখন ভক্তপ্রবর গোস্বামী তুলসীদাসজীর হইল অবতার, তিনি বর্ণ-ধর্ম্ম আশ্রম-ধর্ম্ম কুলাচার বেদবিহিত কর্ম্ম, শাস্ত্রপ্রতিপাদিত জ্ঞান ইত্যাদি সকলের সঙ্গে ভক্তির সামঞ্জস্য স্থাপিত করিয়া ছিন্নভিন্নপ্রায় ধর্ম্মকে করিলেন রক্ষা।”

(ঐ ১০০ পৃঃ)

“অশিষ্ট সম্প্রদায়দের এই সব ঔদ্ধত্য ছিল তাঁহার অসহ্য।”

(ঐ ১০৩ পৃঃ)

“উত্তর কাণ্ডে কলিকালের ব্যবহারের বর্ণনায় গোস্বামীজী বলিতেছেন—

বাদহিঁ শূদ্র দ্বিজন সন হম তুম তেঁ কছু ঘাটি।
জানহিঁ ব্রহ্ম সো বিপ্রবর আঁখি দিখাবহিঁ ডাঁটি॥”

[“ব্রাহ্মণদের সঙ্গে শূদ্র করে বাদ্! বলে, ‘আমি কি তোমা হইতে কিছু হীন! ব্রহ্ম যে জানে সেই তো ব্রাহ্মণ!’ এই বলিয়া ধমকিয়া রাঙ্গায় চক্ষু!”]

(ঐ ১০৪ পৃঃ)

শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র শুক্ল মহাশয় গোস্বামী তুলসীদাসে অগাধ শ্রদ্ধাপরায়ণ, কাজেই তাঁহার লেখা হইতেই তুলসীদাসজীর ক্ষোভের কি কারণ তাহা বুঝিতে চেষ্টা করা গেল। মহামহোপাধ্যায় সুধাকর দ্বিবেদী মহাশয়ের কথাও পূর্ব্বে উপক্রমণিকায় ২৭-২৯ পৃষ্ঠায় দেখান হইয়াছে। এই সব দিক পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা তখনকার দিনের ধর্ম্মের ও সমাজের অবস্থাটি অনেকটা পারি বুঝিতে। এই সব আলোচনা করিলে আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাই তুলসীদাসের মতে

---

* দ্রঃ—রামচরিতমানস, না-প্র-স, উত্তর কাণ্ড, ৪৮৩।

ও দাদূর মতে একেবারে অনেকখানি পার্থক্য। সেই পার্থক্য সত্ত্বেও আমরা যেন উভয়কেই তাঁহাদের নিজ নিজ যথাযোগ্য স্থান দিতে কুণ্ঠিত না হই।

তুলসীদাস মধ্য যুগে উত্তর ভারতে রাম ভক্তির বন্যা বহাইয়া ভারতের তৃষিত নরনারীর চিত্তকে তৃপ্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। কবীরও ভারতের কিছু কম নরনারীর চিত্তকে তৃপ্ত করেন নাই। ভারতের চিত্তের উপরে কবীরের প্রভাব কত খানি তাহা দেখিলেও বিস্মিত হইতে হয়।

অত্যন্ত নম্রভাবে বলিলেও একটা কথা এখানে বলিতে ইচ্ছা করি। তুলসীদাসজী বার বার দুঃখ করিয়াছেন, "বিরতি বিবেক সংযুত যে শ্রুতিসম্মত হরিভক্তি পথ, তাহাতে মানুষ মোহবশে চায় না চলিতে ; মানুষ তাই অনেক পন্থ (সম্প্রদায়) করিয়াছে কল্পনা।"

শ্রুতিসংমত হরি-ভক্ত-পথ সংজুত বিরতি বিবেক।
তেহিঁ ন চলহিঁ নর মোহবস কল্পহিঁ পংথ অনেক।

(রামচরিতমানস, উত্তর কাণ্ড, দোহা ১৫৯)

কিন্তু এই হরিভক্তি অথবা রামভক্তি কি শ্রুতিসম্মত পথ? বুদ্ধাদি বেদ-বিরুদ্ধ মহাপুরুষের সাধনা ও উপদেশের পূর্ব্বে এমন করিয়া মহাপুরুষের পূজা কি বেদের মধ্যেই ছিল? গোস্বামীজীর উপদিষ্ট প্রেম মৈত্রী করুণা প্রভৃতি উত্তম উত্তম সব মত, সুনীতি শীল সদাচার প্রভৃতির সাধনা, কি সব শ্রুতি হইতেই গৃহীত? বেদ-বাহ্য মহাপুরুষদের উপদিষ্ট মতের কাছেই তাহা কি ঋণী নহে?

আমাদের দেশে লোকমত সংগ্রহ করিবার জন্য সবাই দেখি যুগে যুগে বেদেরই দোহাই পাড়িয়াছেন। তাই শাক্ত মতের ভক্ত কবিও তাঁহার দেবতাকে সনাতন ও বেদবিহিত করিতে গিয়া বলিয়াছেন—

"বেদে বলে তুমি ত্রিনয়না"!

বেদই যদি আশ্রয় করিতে হয় তবে আর মধ্যযুগের এই সব অর্ব্বাচীন সনাতনী মত অবলম্বন করা কেন? তবে তো সেই বৈদিক আদিম যুগের সংহিতা ব্রাহ্মণাদি উপদিষ্ট মতই আমাদের আশ্রয়ণীয়। কল্পসূত্র শ্রৌতসূত্র গৃহ্যসূত্র প্রভৃতির প্রণেতারা তো ভাল করিয়াই আমাদের নানাবিধ সব কর্ত্তব্য উপদেশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের পরবর্ত্তী কোনো মতবাদেরই আশ্রয়

করা আমাদের পক্ষে তবে অনাবশ্যক। কারণ যত পরবর্ত্তী কালে আসিব ততই পরবর্ত্তী কালের প্রভাব হইতে মুক্ত হওয়া কঠিন হইবে। কিন্তু সেরূপ ভাবে প্রাচীনকালে নিবদ্ধ হইয়া থাকা ভারতীয় সব ধর্ম্ম মতের পক্ষেও যে কেন সম্ভব হইয়া উঠে নাই তাহা ধর্ম্মের ইতিহাস-রসিক বিদ্বজ্জনকে বুঝান একান্তই অনাবশ্যক।

শুদ্ধিপত্র

প্রূফ দেখা বিষয়ে অনভিজ্ঞতার জন্য এই গ্রন্থের অনেক স্থলে, বিশেষতঃ প্রথম অংশে অনেক ভুল রহিয়া গিয়াছে। তাহার মধ্যে কয়েকটি এমন ভুলের প্রতি আমার দৃষ্টি পড়িয়াছে যাহা শুদ্ধ না করিলেই নয়। যথা—

পৃষ্ঠা	পুংক্তি	স্থলে	হইবে
১৭	৭	১৩০৩	১৬০৩
৩৫	২০	কৈনসা	কৌনসা
৩৯	১৮	খেলঁ	খেলূঁ
৭১	১৩	১৬৬২ (অব্দে)	১৬৪৩ (অব্দে)
৭৭	২২	কো	জো
৭৮	৯	হুজুর	হজূর
৮০	৮, ৯	পীঠে	পিঠে
১৫৭	৬	সাহিত্য সম্মেলন	হিন্দী মন্দির
২৬৯	২	তৃতীয়	দ্বিতীয়

"সুদ্ধ" এবং "সুধু" স্থলে অনেকবার যথাক্রমে "শুদ্ধ" এবং "শুধু" হইয়াছে। তাহা ছাড়াও ভুল ভ্রান্তি কিছু কিছু রহিয়া গিয়াছে। দয়া করিয়া দেখাইয়া দিলে অনুগৃহীত হইব।

এস্থলে বলা উচিত, বহু স্থলে মূলের অনুরোধে চলিত বাংলার হিসাবে ভুল বানানও রাখিতে হইয়াছে। সেখানে শুদ্ধ করিবার কোনো উপায় নাই।

নাম-সূচী (বর্ণানুসারে)

"দ্রষ্টব্য" অর্থে "দ্র" লেখা হইয়াছে। "ফুটনোট" বুঝাইতে "ফু" ব্যবহার করা হইয়াছে। সূচীপত্রে এক "ব" দ্বারাই দুই "ব"য়ের কাজ করা হইয়াছে।

অঙ্গদজী—১৭৫।
অঙ্গবংধূ (সংগ্রহ)—১৬৬, ১৬৭, ১৬৮, ৫৪৪, ৫৪৫, ৫৮৪, ৫৮৮, ৬৩১, ৬৪৭।
অজপা গায়ত্রীগ্রন্থ—৩৮।
অজপা গ্রন্থ—৩৮।
অজপা শ্বাস—৩৮।
অধ্যাত্ম যোগগ্রন্থ—৩৮।
অনভয় পরমোদ (গ্রন্থ)—১৫০।
অর্জ্জুন (গুরু)—১৭৪।
অলখ দরীবা—৫৭, ৫৮।
অশ্বঘোষ—১৭৯।
অসঙ্গ—১৭৯।
অহমেদ (ভক্ত)—৬৫৩, (ফু)।

আকবর (বাদশাহ, শাহ)—১২, ১৩, ২৪, ৬৪, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৭, ৭৮, ৮০, ৩০৭ (ফু), ৬৪৬, ৬৫২।
আগরা—৭০।
আজমীর—১৫, ১৬, ১৭, ১৭৩, ৫৪৪।
আদিগ্রন্থ—১৩২, ১৩৫।
আঁধীগ্রাম (শেখাবাটী)—৪৯, ১৫২, ১৭৩।
আনন্দঘন (জৈনভক্ত)—৬৫ (ফু), ১০৭, ৫৯৭ (ফু)।
আমেদাবাদ—১১, ১২, ১৩, ১৬, ৩০, ১৬৩।
আমের (জয়পুর)—১৩, ১৭, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬৪, ৬৫, ৬৮, ৬৯, ৭১, ১৪৬, ১৫৩, ১৫৭, ১৭৩।
আম্বের—(আমের দেখ)।
আর্য্যদেব—১৭৯।
আলেফ খাঁ—১৪৬, ১৪৯।

ইলাহি সন—২৪।

ঈশ্বরদাস (বাবা)—১৭৫।

উইলসন (Wilson)—১২, ১৫৬।
উত্তরাঢি—১৪২, ১৪৩।

একলব্য—১৪১।

ওয়ার্ডস্ ওয়ার্থ (Wordsworth)—৩।
ওমন (J. C. Oman)—১৫৫।

ঔরঙ্গজেব—১৪৯।

কংথড়ি—১৩২।
কপালী—১৩২।
কবীর—১২, ১৩, ১৫, ১৬, ১৭, ২০, ২১, ২২, ২৬, ৩১, ৩৬, ৪০, ৪২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৮১, ৮২, ৮৬, ৮৭, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ১৩২, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৮, ১৩৯, ১৪১, ১৬০, ১৬১, ১৬২, ১৭৫, ১৭৬, ১৭৭, ১৭৯, ১৮০, ১৮৯, ১৯১, ২০১, ২১৩, ২৪০, ২৮৫, ২৮৬, ২৯০, ৩০১, ৩০৬, ৩১০, (ফু) ৩১৫, ৩১৬, ৩৯৪, ৩৯৬, ৪১৩, ৪৩০, ৪৩১, ৪৪১ (ফু), ৪৯৩, ৫৯৫, ৫৯৬ (ফু), ৬০০ (ফু), ৬১২, ৬৪৬, ৬৫১, ৬৬০।
কবীর দ্বার—১৬।
কবীর পংথ—১৫৪।
কবীর পংথী—১১।
কবীর বট—১৫।
কবীর মনস্হর (পরমানন্দ রচিত)—৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭।
কমাল—১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৮, ২৭, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৭, ১৩০, ১৩১, ১৬১, ১৭৫, ২০২, ২৩২।
করুণাশঙ্কর কুবেরজী ভট্ট—১১।
করৌলী—৫৪।
কলিকাতা—১২।
কল্যাণদাস (ভাণ্ডারী)—১৭৫।
কল্যাণপুর—২৪, ৮২।
কবিরাজ গোস্বামী—৪৯৮।
কাঁকড়িয়া—১১।
কাণেরী—১৩২।
কাদমজী (কাজী)—২৫, ১৭৫।
কান্হাজী (কানাজী)—১৭৫, ১৭৮।
কাশী—১৩, ৩০, ১৪৫, ১৪৬, ১৫৩, ১৭১, ১৭৩, ২৭১, ২৮৪, ৩৭৬, ৪০১, (ফু), ৫৮৮।
কিতাজনস—২১।
কীল্হজী—১৭৫।
কুতব খাঁর গড়ী—১৭৫।
কুতব সাহেব—৫৪৪।
কুম্ভারী পাদ—৩৭।
কুম্ভারী পাব্ব—৩৭, ৩৮।
কুরসানা—১৪৬, ১৪৭।
কুশলানন্দ—১৫।
কৃপারামজী (পণ্ডিত)—১৬৫।
কৃপারাম বৈদ্য (সাধু পণ্ডিত)—১৮।
কৃষ্ণ—১।
কেনোপনিষৎ—৫৭৪ (ফু)।
কেশোদাসজী (সন্ত)—১৮, ১৬৫।
কোটা—১৭৩।
ক্রুক (W. Crooke)—১৩, ১৪২, ১৪৪, ১৫৫।